কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী

আবির্ভূয়পূর্ব নাদঃ সমজনি বিশুদ্ধং ব্যোম বিশ্বাশ্রয়ং যদ্
গত্যাখ্যা সোঽহমি হংসো জগদুদয়লয়ক্রান্তিবৃত্তিশ্চ বায়ুঃ।
রূপানাং চিত্রশালাং স মনসি চ বহির্নির্মমে নাম বহ্নিঃ
সর্বেষাং লীনলোকঃ সলিলমিতি পুনর্ধারিণেহভূদ্ধরিত্রী॥

...ভৌ চাগ্নীষোমৌ চ নাদবিন্দুকৌ।
...পানাবিতি দ্বন্দ্বাশ্চাধ্যাত্মিকাদয়স্ত্রয়ঃ॥
সমষ্টিবর্ত্তনমঙ্গং বৈ সমাসমসমতামিতাঃ।
অতএব সমাবৃত্তিরিতি বৃহৎপাদদ্বয়ে হি সা॥

মীনো বীজানি ধৃত্বা প্রসরতি পয়সি প্রোধৃতে গূঢ়সন্ধি
র্নাভাবাসীন ঈষ্টেহ খিলমিহ কমঠঃ সংজরীগৃহ্যতে চ।
উচ্চৈর্ধত্তে বরাহো ভুবমনিলনিঘৈহন্তি দৈত্যান্নৃসিংহো
যোষ্মাকীনং সুভদ্রং সমদমপি শিবচ্ছন্দসাং মাতুরব্যাৎ॥

জপসূত্রম্ ভারতীয় প্রাচীন মনীষার জ্ঞান-বোধ-উপলব্ধির এক সুগভীর এবং বিস্তীর্ণ আকর। গ্রন্থটির নির্মাণকাহিনিও সমধিক কৌতূহলপ্রদ। এই বিপুল গ্রন্থটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হল মাত্র। আরও দুটি পরবর্তী ভাগ প্রকাশের মাধ্যমে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হবে। নিখিল জগৎকে দেখবার জানবার বোঝবার যে প্রক্রিয়া এদেশের মনীষার, বিশ্বনিখিলের অনুভব ও উপলব্ধি, কণিকায় এবং মহানে 'অস্তি'র যে প্রকাশ আমাদের প্রাচীন মনীষার— জপসূত্রম্ প্রসঙ্গে অনবদ্য আলোচনা-বিশ্লেষণে স্বামীজি আমাদের অবহিত করেছেন। ষড়দর্শন, বেদ, বেদান্ত, গীতা থেকে প্রয়োজনীয় কারিকাসমূহে ব্যাখ্যা করে বিশ্বনিখিলের রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস নিয়েছেন তিনি। দেবদেবী মূর্তি যে প্রকৃত এই নিখিলবিশ্বেরই প্রতিরূপ তা তাঁর অসাধারণ ভাষাবিন্যাস ও শৈলীতে আমাদের কাছে মূর্ত হয়েছে। তাঁর সমকালীন আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞান ও আধুনিক বিজ্ঞানের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ক্রমশই অধ্যাত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসরমান। তাঁর উপলব্ধি-অনুভব-জ্ঞানের অতল গভীরতা, বিস্তীর্ণ ব্যাপ্তি, ভাষার মাধুর্য এবং সাবলীলতায়, এই গ্রন্থপাঠান্তে আমাদের মানসজগৎ উত্তরিত হয়ে এক অন্যলোকে বিচরণ করে।

ISBN 978-81-7955-199-8 (Vol.-1)
ISBN 978-81-7955-198-1 (Set)

₹ 450.00

5.2



শ্রীমৎ স্বামি প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিতম্

কারিকাসম্বলিতম্

জপসূত্রম্

(বঙ্গভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেনসহ)

প্রথম খণ্ড



সাহিত্য সংসদ

JAPASUTRAM
PART ONE & TWO
by Srimat Swami Pratyagatmananda Saraswati

ISBN 978-81-7955-199-8 (Vol.-1)
ISBN 978-81-7955-198-1 (Set)

প্রথম সংসদ সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০১২
মাঘ ১৪১৮

প্রচ্ছদ : চন্দন বসু

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.
৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
নটরাজ অফসেট
১ নিরঞ্জন পল্লি, তেঁতুলতলা
কলকাতা-৭০০ ১৩৬

₹ 450.00

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

সূচীপত্রম্*

দ্বিতীয় খণ্ড

* বর্তমান খণ্ডে প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিশ্লেষণ মূলগ্রন্থেই দেওয়া হইয়াছে। কতিপয়মাত্র বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধের সূচী দেওয়া হইল।

প্রকাশকের কথা

'প্রসঙ্গকথা'য় উল্লেখিত জপসূত্রম্-এর বৈদ্যুতিন গ্রন্থরূপ প্রকাশের উদ্যোগে আমরা ছিলাম। সেখানে পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজন এবং গ্রন্থটির অসামান্য গুরুত্বে সম্পর্কে বিশদে বলা আছে। পুনরুক্তি বাহুল্যমাত্র। গ্রন্থটির সংস্পর্শে এসে আমাদের মনে হয়েছে বৈদ্যুতিন গ্রন্থরূপের সঙ্গে সঙ্গে জপসূত্রম্-এর একটি মুদ্রিত গ্রন্থরূপ প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেজন্যই এই সুকঠিন কাজ হাতে নেওয়া। প্রথম ভাগটি প্রকাশের পর আরও দুটি ভাগ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে। জপসূত্রম্‌কে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সবকটি ভাগের পাঠই অবশ্যপ্রয়োজন, তবেই জপসূত্রম্-পাঠ সম্পূর্ণ হবে। বিশ্বাসী ও সংশয়ী উভয় পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি আদরণীয় হবে, আশা করি। বিশ্বাসীদের সাধনপথে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠুক এই গ্রন্থ। স্বামীজির বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সাবলীল চলন—প্রাচীন শাস্ত্র থেকে শুরু করে তাঁর সমকালীন আধুনিক বিজ্ঞানের নানা শাখার তুলনামূলক মেধাদীপ্ত আলোচনা ও বিশ্লেষণ সংশয়ীর কৌতূহল নিরসন করুক। আমাদের চিত্তবৃত্তির উদ্বোধক হোক জপসূত্রম্।

জানুয়ারি ২০১২ — দেবজ্যোতি দত্ত
কলকাতা ৭০০০০৯

পুনশ্চ: গ্রন্থটির মুদ্রিত পূর্ব সংস্করণের বানান যথাযথ রাখা হয়েছে। কেবল মুদ্রণপ্রমাদগুলির সংশোধন করা হয়েছে এবং 'রেফ'-এ দ্বিত্ব বর্জিত (সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত) হয়েছে।

'প্রকাশকের কথা', 'প্রসঙ্গকথা', 'জপসূত্রমের সূচনা' এবং 'স্বামীজির কথা' তে কেবল আধুনিক বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গকথা

আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী (পূর্বাশ্রমে অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়) রচিত 'জপসূত্রম্' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরপরে প্রায় দশ বছর ধরে গ্রন্থটির দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ খণ্ড ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ (ষষ্ঠ) খণ্ডটি প্রকাশিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩৬৬-তে। 'জপসূত্রম্'-এর সব কটি খণ্ডের প্রকাশক ছিলেন স্বামীজির শিষ্য আমার পিতৃদেব ৺কালীপদ মৈত্র। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজী লোকান্তরিত হন ২০শে অক্টোবর ১৯৭৩ সনে। স্বামীজি লোকান্তরিত হওয়ার পর কিছুদিন গ্রন্থটি প্রকাশিত থাকলেও ধীরে ধীরে এটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। স্বামীজির ভক্ত এবং শিষ্যদের প্রচেষ্টায় প্রথম দুটি খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ হলেও অন্য খণ্ডগুলি যথার্থই অপ্রাপ্য হয়ে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে।

তিন-চার বছর আগে আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু এবং স্বামীজির গুণগ্রাহী শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি থেকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজীর মতো অনন্যসাধারণ এবং বিরলপ্রতিভা মনীষীর স্মৃতিরক্ষার্থে বিশেষ কিছুই করা হয়নি। আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব কিনা। অরবিন্দবাবুর চিঠি পড়ার পরে মনে হয়েছিল যে স্বামীজির স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানোর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হতে পারে 'জপসূত্রম্'-এর পুনর্মুদ্রণ। আবার এই কাজের জটিলতা এবং বিপুল ব্যয়ভারের কথা চিন্তা করে মনে হয়েছিল যে এটা সম্ভবপর নয়। মুদ্রণ ব্যয়ভার ছাড়া এই রকম কাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে এই গ্রন্থের অক্ষরবিন্যাস করা এবং নির্ভুল প্রুফ-রিডিং। কারণ সামান্যতম ভুল (বানান এবং অন্যবিধ) থাকলে এই গ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। মুদ্রণপ্রমাদযুক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা স্বামীজির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশেরই নামান্তর হবে। এই পরিস্থিতিতে মনে হয়েছিল যে যথার্থ পরামর্শ দিতে পারেন দু-জন। প্রথম জন হলেন স্বামীজির শিষ্যা শ্রীমতী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় (বুলুদি) এবং দ্বিতীয় জন হলেন প্রীতিভাজন ও বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় (সাহিত্য সংসদ প্রকাশনার কর্ণধার)। শ্রীমতী প্রীতি

চট্টোপাধ্যায় সবকিছু শুনে আশ্বাস দেন যে এইরকম কাজ আরম্ভ করলে প্রুফ দেখার সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিতে রাজি আছেন। শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় গ্রন্থের অক্ষরবিন্যাসের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয় যে, নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কম্পিউটার-এ পাঠযোগ্য বৈদ্যুতিন বই (e-book) আকারে গ্রন্থটি প্রকাশ করা যেতে পারে। দু-টি সুবিধা এতে পাওয়া যাবে। প্রথমত, মুদ্রণ ব্যয় অনেক কম হবে এবং দ্বিতীয়ত, চিরাচরিত গ্রন্থ হিসাবে মুদ্রণ করার প্রয়োজন হলে অতি সহজেই অল্প সময়ে সেটা করা যাবে। কারণ নতুন করে অক্ষরবিন্যাস অথবা প্রুফ-রিডিং-এর প্রয়োজন তখন থাকবে না। আর একটি সুবিধাও এই সঙ্গে পাওয়া যাবে, বানান অথবা অন্যবিধ ভুল পরে যদি চিহ্নিত হয় তবে সহজে সেটি ঠিক করা যাবে। চিরাচরিত গ্রন্থের থেকে e-book-এর মূল্য অনেক কম হবে। এইরকম চিন্তাভাবনা করে আমরা যোগাযোগ করি অধুনাপ্রয়াত সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে। কারণ প্রথমাবধি তিনি এই গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিলেন (মূল গ্রন্থে পাঠক বিস্তারিত তথ্য পাবেন)। সবকিছু শুনে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যথাশীঘ্র কাজ শুরু করার পরামর্শ প্রদান করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এই কাজের পরিসমাপ্তি আমরা তাঁকে দেখাতে পারলাম না। এইভাবে কাজ শুরু হয়। যখন পঞ্চম খণ্ডের কাজ চলছে সেই সময়ে শ্রীদেবজ্যোতি দত্ত মহাশয় একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন যে e-book-এর সঙ্গে চিরাচরিত গ্রন্থ হিসাবেও 'জপসূত্রম্'-কে তিনি মুদ্রিত করে দেবেন এ-সংক্রান্ত সব দায়িত্ব নিয়ে। তাঁর কথায় আমরা যথার্থই অবাক হয়ে যাই, কারণ এরকম পরিকল্পনা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল। কোন মহাশক্তি কার মধ্য দিয়ে কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন সেটা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।

গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আমরা এখানে করলাম না—সেকাজের যোগ্যতাও আমাদের নেই, মূল গ্রন্থে পাঠক বিস্তারিত তথ্য পাবেন। নবপর্যায় 'জপসূত্রম্' প্রকাশের কাজ কীভাবে শুরু হয়েছিল সে-ব্যাপারে সংক্ষেপে কিছু তথ্য এখানে আমরা উল্লেখ করলাম। আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। স্বামীজি বর্তমান থাকাকালীন ইংরেজি ভাষায় Japasutram শিরোনামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটিকে অনেকে বাংলা জপসূত্রম্-এর অনুবাদ বলে মনে

করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই গ্রন্থে স্বামীজির লেখা আছে অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে। গ্রন্থটি স্বামীজির নামেই প্রকাশিত। আজকের কম্পিউটার-এর যুগে ইন্টারনেট-এ **Japasutram** এই নামে সন্ধান করলে ইংরেজিতে লেখা বইটির সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু মূল গ্রন্থের (সংস্কৃতে রচনা বাংলায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ) সঙ্গে ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থের কোনো তুলনা করা সম্ভব নয়। মূল গ্রন্থটি যাতে বিলুপ্ত না হয়ে যায় এবং কালক্রমে ইংরেজিতে রচিত গ্রন্থটিতে যাতে সকলে মূল 'জপসূত্রম্' বলে মনে না করেন আমাদের এই প্রচেষ্টার পিছনে সেটাও একটা বড়ো কারণ।

শেষে একটিমাত্র জিনিস-এর উল্লেখ করে আমাদের কথা শেষ করব। শাস্ত্রে 'অপৌরুষেয়' গ্রন্থের কথা আমরা শুনেছি। 'জপসূত্রম্' রচনা হবার সময়ে অনেকে এটা প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রদ্ধাবান পাঠক সেটা এখন প্রত্যক্ষ না করলেও অন্তরে উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

'জপসূত্রম্' গ্রন্থের নব পর্যায় প্রকাশনার কাজে যুক্ত সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। স্বামীজির আশীর্বাদ সকলের ওপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা তাঁর কাছে করি।

৭৭ যতীন দাস রোড
কলকাতা ৭০০০২৯
পৌষ সংক্রান্তি ১৪১৮

শেখর মৈত্র
মনোজ মৈত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের
নিবেদন

দীর্ঘ একযুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে 'জপসূত্রম্' প্রথম খণ্ডের আত্মপ্রকাশের পর। বিগত কয়েক বৎসরে খণ্ডের পর খণ্ডে ইহা পূর্ণকলেবর লাভ করিয়াছে ও ষষ্ঠ খণ্ডে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে 'পুষ্পিত, ফলিত, চন্দ্রতারকাদিবৎ প্রতিমণ্ডিত' এই সুবিশাল বনস্পতি যেন 'দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ':—দ্যুলোকের ভাস্বরতায় দীপ্যমান্ হইয়া একক বৈশিষ্ট্যে ও অনন্য মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশ হইতে হইতে ইতিমধ্যে প্রথম খণ্ডটি নিঃশেষ হইয়া যায়, অথচ ইহা এই মহাবৃক্ষের মূলস্বরূপ। ইহারই ভিত্তিতে এই সুবিশাল সৌধ বিরচিত হইয়াছে। তাই এটিকে অনুধাবন বা প্রণিধানপূর্বক আয়ত্ত না করিলে মূল গ্রন্থটির বক্তব্য উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। অবতরণিকারূপে কতকগুলি মূল্যবান বাংলা প্রবন্ধে পূজ্যপাদ স্বামিজি প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিপাদ্যটি বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন এবং এই মহাগ্রন্থের পটভূমিকা রচনা করিয়া দিয়াছেন। পাঠকবর্গ তাই এই প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণের জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁহাদের সেই আগ্রহ পূরণের জন্য প্রথম খণ্ডের এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে আমরা উদ্যোগী হইয়াছি।

জপসূত্র্ প্রথম খণ্ড 'ভূমিষ্ঠ' হওয়ার পুণ্য লগ্নে যাঁহারা আমাদের মধ্যে ছিলেন ও ইহার আবির্ভাবকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নাই। তবে পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার আজ ইহার 'দ্বিতীয় জন্ম' স্বয়ং আমাদের মধ্যে থাকিয়া দেখিয়া গেলেন। মানুষের 'দ্বিতীয় জন্ম' বা দ্বিজত্বলাভের যে অদ্বিতীয় রাজমার্গ, 'অজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ' তিনি এই মহাগ্রন্থের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করিয়া গেলেন তাহার একান্ত অনুসরণে 'সমর্থ' জপযজ্ঞের দ্বারা যদি আমরা সেই পরম লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি, তাহা হইলেই এই প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ সার্থক হইবে। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, শুধু

তত্ত্ব বা তথ্যের সমাহার ও উপস্থাপন এ মহাগ্রন্থের লক্ষ্য নহে, তত্ত্বের আলোকে সাধন-পথকে সমুজ্জ্বল করা, সাধনের তাৎপর্যকে ফুটাইয়া তোলাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাদের সাধন যেন অন্ধ গতানুগতিকতা বা যান্ত্রিকতার নিষ্পেষণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তাৎপর্যে সমুদ্বুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে ইহাই একমাত্র কাম্য। শিবমস্তু।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
রাসপূর্ণিমা ১৩৭২

জপসূত্রমের সূচনা

জপসূত্রম্ রচনার সূচনার কাহিনি এটা। জপসূত্রমের কোনো ভূমিকা নয়। কোনো এক সময়ে শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারীজির আশ্রমে ধর্মালোচনার সভা হত। তাতে প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীশ্রীবালানন্দজির শিষ্য শ্রীপ্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা) স্বামীজিকে (স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী) কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করে পাঠালে স্বামীজি তার সংক্ষেপে উত্তর লিখে পাঠাতেন। সেই উত্তরটুকু নিয়েই আবার তাঁদের আলোচনা শুরু হত। সেখানে ব্যাখ্যাকর্তা থাকতেন অধ্যাপক গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। এইভাবে বেশ কয়েকটি চিঠি সংগ্রহ হওয়ার পর স্বামীজি যখন দেওঘরে গিয়েছেন তখন বালানন্দজির শিষ্য প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ই সেই চিঠিগুলি দেখিয়ে বলেন—এটা দিয়ে তো বেশ একটি গ্রন্থ রচনা হয়ে যায়। তারপর সেই চিঠিপত্রগুলি দেখে স্বামীজিও সে ব্যাপারে উদ্‌বুদ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর না দিলেও তিনি আপন ভাবের গভীরে ডুব দিলেন। জপসূত্রম্ রচনার সময়ে তিনি তাঁর জগন্মাতার চরণে নিজেকে সমর্পণ করে নিজের প্রয়াসকে অকেজো করে যুক্ত করে খাতা কলম নিয়ে বসে থাকতেন। এক একটি অক্ষর, তারপর একটি পুরো সূত্র তাঁর কলমের ডগায় এসে যেত। তিনি নিজেই ভেবে পেতেন না এর অর্থ কী হবে? আস্তে আস্তে যখন অর্থ প্রকাশিত হয়েছে, তখন তিনি নিজেও আশ্চর্য অনুভব করেছেন। আমাদের কাছেও বারে বারে বলেছেন—"মা এটাকে দিয়ে কত কিছুই লিখিয়ে নিয়েছেন, এটা তাঁরই দেওয়া।" জপসূত্রমের ষষ্ঠ খণ্ডে তিনি যে ভূমিকাটি লিখেছেন, তাতে নিজেই তিনি বলেছেন, "কারিগর হিসাবে নয়, যোগানদারের কাজ করেছেন।" দৃষ্টিশক্তিও তখন ক্ষীণ হয়ে গিয়েছে, অথচ তা সত্ত্বেও তাঁর লেখায় কখনো কোনো লাইনের ওপর লাইন পড়ে যাওয়া বা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া তা হত না। সকলেই সেই দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতেন। স্বামীজি বলেছেন—"ঊর্ধ্বের অবতরণীধারার মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন, সেটা পদে পদে তিনি অনুভব করেছেন।" কারিকা এবং সূত্র ইত্যাদি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর

সারাজীবনের সাধন এবং পরীক্ষা উজাড় করে দিয়েছেন। এইভাবে বিজ্ঞানের আলোকে প্রজ্ঞানকে উদ্ভাসিত করে যে গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা অভিনব এবং অভূতপূর্ব। একদিকে সংস্কৃত এবং বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, শ্রুতি ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞান; অপর দিকে গণিত ও বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট চর্চা থাকায় এ কর্ম তাঁর পক্ষে অনায়াসসাধ্য হয়েছিল। শুধুমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠই নয় প্রয়োগবিধি দ্বারা সাধনে সিদ্ধিলাভ করে তিনি সত্যকে যাচাই করে নিয়েছিলেন। একাধারে জ্ঞান এবং ভাবের দুয়ার হতে মাধুর্যের ধারা যেভাবে প্রবাহিত হয়েছে তা দেখে সত্যই বিস্ময় বোধ হয়। এইভাবেই জপসূত্রম্ কলায় কলায় বর্ধিত হয়েছে। অধ্যাপক গোবিন্দগোপালও সহকারী হিসাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রুফ দেখা ইত্যাদি কাজে সহায়তা করে গেছেন। তাঁকে লেখা স্বামীজির কয়েকটি চিঠি এখানে মুদ্রিত হল যা থেকে জপসূত্রমের সূত্রপাত।

কলকাতা — প্রীতি চট্টোপাধ্যায়

রথযাত্রা ১৪১৪

শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীর লেখা অধ্যাপক ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কয়েকটি চিঠিপত্র

(১)

২৯.০৩.৪৩

কল্যাণীয়বরেষু

শ্রীমান গোবিন্দ,

এখান থেকে কয়দিন পূর্বে যে পত্র দিয়াছি তাহা বোধহয় পাইয়াছ। দৌলতপুরের পত্রে জানিলাম—জপ সম্বন্ধে আমার প্রেরিত পরের অংশটি তাঁরা পান নাই। খোয়া গিয়াছে মনে হইতেছে। তাতে আগেকার লেখার কোনো কোনো বিষয়ের কিছু বিশদীকরণ (যথা, "হংসঃ শুচিষৎ" মন্ত্রের) এবং কতক কতক নূতন কথাও ছিল। তার কোনো কপি রাখিয়া পাঠান হয়নি। নূতন করিয়া সেটা লেখাও আমার পক্ষে সুসাধ্য নয়। তবে চেষ্টা করিয়া দেখিব। আগেকার অংশটা বোধহয় তোমরা আলোচনা করিতেছ। তার একটা কপি মহেশ্বরপাশার ওঁরাও চান; এখানে এঁরাও চান্।

জপের প্রসঙ্গে চতুর্বিধ বাধার কথা লিখিয়াছি। কাল (= উপস্থিতি); নিমিত্ত = প্রতিরোধ; দেশ (= পরিস্থিতি) নিমিত্ত = অবরোধ; বস্তু (= অবস্থিতি বা অবস্থান) নিমিত্ত = নিরোধ; ছন্দঃ (= সংস্থিতি বা সংস্থান) নিমিত্ত = বিরোধ। এদের কিছু বিবৃতি আগের লেখাটায় আছে। বাহ্য অথবা আন্তর যে কোনো apparatus লইয়া কোনো সাধন করিতে গেলে, সাধন সমর্থ এবং সফল হবার পক্ষে, ঐ চারিপ্রকারের প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় পাইতে হয়, অথবা করিয়া লইতে হয়। ধর, দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশে কোনো জ্যোতিশ্চক্র দেখিবে। তজ্জন্য—(১) রাত্রিকাল এবং সম্ভবত এক নির্দিষ্ট সময়ও চাই; (২) objective conditions suitable হওয়া চাই, যথা, আকাশ মেঘমুক্ত ইত্যাদি; (৩) যন্ত্রটি fit condition-এ থাকা চাই; এবং (৪) যন্ত্রটিকে ঠিক correct orientation-এ adjust করা চাই। এ সকলগুলির সমাহার না হইলে প্রবৃত্তি সফল হইবে না। মনের ব্যাপারেও এইরূপ। এ

ক্ষেত্রে (১) time factor হইতেছে—অনুকূল বাসনা বা সংস্কারের উদয়; প্রতিকূলের নিরোধ বা ক্ষয়। এর নাম শুভবাসনা। (২) Space factor—কেবল শুভবাসনা হইলেই হইল না; বাহিরের পরিস্থিতিটাও অনুকূল থাকা চাই। একে বলে শুভযোগ। ধর, জপ করিতে বসিতেছ কিন্তু বাহিরে বড়ো ঝামেলা! (৩) Instrument factor—ধর, শুভবাসনা, শুভযোগ এসেছে, কিন্তু চিত্ত যদি (ক) ধৃতি গৃহীত, (খ) রতি গৃহীত হইয়া (অর্থাৎ ধৈর্য বীর্য সমন্বিত হইয়া) কাজ না করিতে অভ্যস্ত থাকে তো সমর্থ ও সফল সাধন হইল না। (৪) Accordance factor—ধর, শুভবাসনা, শুভযোগ এবং শুভাগ্রহ (ঐ তৃতীয় অনুকূলতাটির নাম) তিনই আছে; কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর সঙ্গো যেভাবে "সন্ধি" (correspondence বা accordance) করিতে হইবে, সেভাবে হইতেছে না। তাহা হইলেও সফল হইবে না। ইষ্টের সঙ্গো শুভসন্ধিও চাই। এই শুভসন্ধিকে বলে শ্রদ্ধা। শুভবাসনা ও শুভযোগের আধারে শুভাগ্রহ শুভসন্ধি বা শ্রদ্ধার (adjusted, attuned) অবস্থায় আসিলে জপাদি সাধন "সমর্থ" হয়। ভগবানের অনুগ্রহ শক্তি সূর্যরশ্মির মতো সতত সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সাধারণত ও সম্বন্ধে জীবের যন্ত্র ("খানি") "পরাঞ্চি" (scattering, dissipating) বলিয়া, সে রশ্মিসমূহ divergent থাকিয়া যায়। জীবের ভিতরে আগ্রহ জাগিলে যন্ত্র একটা concave mirror-এর মতো "প্রত্যঞ্চি" সেগুলি convergent করিতে সমর্থ হয়। Convergent হইতে হইতে একটা কেন্দ্রে (focus) ঘনীভূত হইলে, তাহা হইল গুরুশক্তি। তখন, সেই কেন্দ্রের সঙ্গো "শ্রদ্ধা" সহকারে আপন শুভসন্ধি (right accordance) স্থাপন করিতে পারিলে—কাজের ঠিক রাস্তা ধরা হইল।

আমি এই শুক্রবারে এখান থেকে রওনা হয়ে এলাহাবাদ ও কাশী হয়ে কলকাতা, এবং সেখান থেকে ১লা বৈশাখের ৪/৫ দিন আগেই কর্ণপুর (খুলনা) যাব। কলিকাতার ঠিকানায় চিঠি দিতে পার—

Dr. D. N. Chatterji,
16, Bhabananda Road
P.O. Kalighat
Kolkata

শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিও। ইতি স্বামিজী

সতেরো

(২)

৩১.০৩.৪৩

কল্যাণীয়বরেষু

শ্রীমান গোবিন্দ, কাল তোমার পত্র পাইলাম। জপের আধারটা তোমরা সকলে ধীরে ধীরে আলোচনা করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। নলিনীও আলোচনায় যোগ দিতে পারিয়াছিল আরও ভালো। ও সম্বন্ধে পরের অংশটি খোয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে। গতকল্য এক কার্ড লিখিয়া জপের বাধা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। শুভবাসনা, শুভযোগ, শুভাগ্রহ, শুভসন্ধি—এই ক্রমে কাল, দেশ, বস্তু এবং ছন্দগত বাধা দূর হইয়া থাকে। সাধনের পূর্বভূমিতে এসকল বাধা পরাভূত হইলেও, মধ্য এবং উত্তর ভূমিতে আবার নূতন আকারে দেখা দিয়া থাকে। মধ্য আর উত্তরভূমি কি এবং তাতে বাধাগুলি কি আকারের, আর তাদের পরাভবই বা কি ভাবের—ইহা ধীরভাবে চিন্তনীয়। যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান ত্রিবিধ সাধনেই এদের আকার প্রকার চিন্তনীয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনটি মাহাত্ম্য সাধনের পূর্ব, মধ্য এবং উত্তর ভূমিরূপেও বিবেচ্য। মুখ্যতঃ উক্ত ভূমিত্রয় চেতনার "অব", "সম" এবং "অতি" (sub, normal liminal, super) তিনটি স্তর বা "তল"। প্রথম তলে "যোগনিদ্রা" হইতে উত্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্ব হন পরাভবশক্তি (আত্মকৃপা)। দ্বিতীয় তলে অভিব্যক্ত নিখিল দৈবীসম্পৎ সংগ্রহ হইয়া পরাভবশক্তি (গুরুকৃপা। দৈবীসম্পৎ = সতত সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত অনুগ্রহশক্তি, সে সকলের সংগ্রহ = কেন্দ্রীভাব, focussing = গুরুশক্তি)। তৃতীয় তলে, অর্থাৎ চেতনার ঊর্দ্ধতন স্তরগুলিতে, বহুধা ক্রিয়মাণা দৈবীসম্পৎ (জ্ঞানৈশ্বর্য ইত্যাদি) যে একেতেই—অদ্বৈতেই—অধিষ্ঠিত ও পরিসমাপ্ত এইটি দেখাইয়া (যথা, শুম্ভবধে দেবীর উক্তি —একৈবাহং . . .") তবে পরাভব। এইটি ভগবৎ কৃপা। বাধাগুলিকে চারভাবে "প্রতিষেধ" করিতে হয়। (১) বাধার সঙ্গে সমতলে ও সমসূত্রে (same direction) থাকিয়া তুল্যবল প্রতিপক্ষ দ্বারা (by equal opposite force) এটি অভ্যাসযোগ। (২) বাধার সঙ্গে সমতলে আছি, কিন্তু সমসূত্রে নেই (changed direction) বাধার blow ঢাল পাতিয়া লইতেছি না; নিজের "অবস্থিতি"টাই, (angle of reaction) অন্যমুখ করিয়া লইতেছি। এটি বৈরাগ্য যোগ। (৩) নিজের "তল"ই বদলাইয়া লইতেছি—অনাসক্ত যোগ। (৪) বাধার বাণ যে মূলধনু থেকে বাহির

ক্ষেত্রে (১) time factor হইতেছে—অনুকূল বাসনা বা সংস্কারের উদয়; প্রতিকূলের নিরোধ বা ক্ষয়। এর নাম শুভবাসনা। (২) Space factor—কেবল শুভবাসনা হইলেই হইল না; বাহিরের পরিস্থিতিটাও অনুকূল থাকা চাই। একে বলে শুভযোগ। ধর, জপ করিতে বসিতেছ কিন্তু বাহিরে বড়ো ঝামেলা! (৩) Instrument factor—ধর, শুভবাসনা, শুভযোগ এসেছে, কিন্তু চিত্ত যদি (ক) ধৃতি গৃহীত, (খ) রতি গৃহীত হইয়া (অর্থাৎ ধৈর্য বীর্য সমন্বিত হইয়া) কাজ না করিতে অভ্যস্ত থাকে তো সমর্থ ও সফল সাধন হইল না। (৪) Accordance factor—ধর, শুভবাসনা, শুভযোগ এবং শুভাগ্রহ (ঐ তৃতীয় অনুকূলতাটির নাম) তিনই আছে; কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর সঙ্গে যেভাবে "সন্ধি" (correspondence বা accordance) করিতে হইবে, সেভাবে হইতেছে না। তাহা হইলেও সফল হইবে না। ইষ্টের সঙ্গে শুভসন্ধিও চাই। এই শুভসন্ধিকে বলে শ্রদ্ধা। শুভবাসনা ও শুভযোগের আধারে শুভাগ্রহ শুভসন্ধি বা শ্রদ্ধার (adjusted, attuned) অবস্থায় আসিলে জপাদি সাধন "সমর্থ" হয়। ভগবানের অনুগ্রহ শক্তি সূর্যরশ্মির মতো সতত সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সাধারণত ও সম্বন্ধে জীবের যন্ত্র ("খানি") "পরাঞ্চি" (scattering, dissipating) বলিয়া, সে রশ্মিসমূহ divergent থাকিয়া যায়। জীবের ভিতরে আগ্রহ জাগিলে যন্ত্র একটা concave mirror-এর মতো "প্রত্যঞ্চি" সেগুলি convergent করিতে সমর্থ হয়। Convergent হইতে হইতে একটা কেন্দ্রে (focus) ঘনীভূত হইলে, তাহা হইল গুরুশক্তি। তখন, সেই কেন্দ্রের সঙ্গে "শ্রদ্ধা" সহকারে আপন শুভসন্ধি (right accordance) স্থাপন করিতে পারিলে—কাজের ঠিক রাস্তা ধরা হইল।

আমি এই শুক্রবারে এখান থেকে রওনা হয়ে এলাহাবাদ ও কাশী হয়ে কলকাতা, এবং সেখান থেকে ১লা বৈশাখের ৪/৫ দিন আগেই কর্ণপুর (খুলনা) যাব। কলিকাতার ঠিকানায় চিঠি দিতে পার—

Dr. D. N. Chatterji,
16, Bhabananda Road
P.O. Kalighat
Kolkata

শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিও। ইতি স্বামিজী

(২)

৩১.০৩.৪৩

কল্যাণীয়বরেষু

শ্রীমান গোবিন্দ, কাল তোমার পত্র পাইলাম। জপের আধারটা তোমরা সকলে ধীরে ধীরে আলোচনা করিতেছ শুনিয়া সুখী হইলাম। নলিনীও আলোচনায় যোগ দিতে পারিয়াছিল আরও ভালো। ও সম্বন্ধে পরের অংশটি খোয়া গিয়াছে, মনে হইতেছে। গতকল্য এক কার্ড লিখিয়া জপের বাধা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। শুভবাসনা, শুভযোগ, শুভাগ্রহ, শুভসন্ধি—এই ক্রমে কাল, দেশ, বস্তু এবং ছন্দগত বাধা দূর হইয়া থাকে। সাধনের পূর্বভূমিতে এসকল বাধা পরাভূত হইলেও, মধ্য এবং উত্তর ভূমিতে আবার নূতন আকারে দেখা দিয়া থাকে। মধ্য আর উত্তরভূমি কি এবং তাতে বাধাগুলি কি আকারের, আর তাদের পরাভবই বা কি ভাবের—ইহা ধীরভাবে চিন্তনীয়। যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান ত্রিবিধ সাধনেই এদের আকার প্রকার চিন্তনীয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনটি মাহাত্ম্য সাধনের পূর্ব, মধ্য এবং উত্তর ভূমিরূপেও বিবেচ্য। মুখ্যতঃ উক্ত ভূমিত্রয় চেতনার "অব", "সম" এবং "অতি" (sub, normal liminal, super) তিনটি স্তর বা "তল"। প্রথম তলে "যোগনিদ্রা" হইতে উত্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্ব হন পরাভবশক্তি (আত্মকৃপা)। দ্বিতীয় তলে অভিব্যক্ত নিখিল দৈবীসম্পৎ সংগ্রহ হইয়া পরাভবশক্তি (গুরুকৃপা। দৈবীসম্পৎ = সতত সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত অনুগ্রহশক্তি, সে সকলের সংগ্রহ = কেন্দ্রীভাব, focussing = গুরুশক্তি)। তৃতীয় তলে, অর্থাৎ চেতনার ঊর্ধ্বতন স্তরগুলিতে, বহুধা ক্রিয়মাণা দৈবীসম্পৎ (জ্ঞানৈশ্বর্য ইত্যাদি) যে একেতেই—অদ্বৈতেই—অধিষ্ঠিত ও পরিসমাপ্ত এইটি দেখাইয়া (যথা, শুম্ভবধে দেবীর উক্তি —একৈবাহং . . .") তবে পরাভব। এইটি ভগবৎ কৃপা। বাধাগুলিকে চারভাবে "প্রতিষেধ" করিতে হয়। (১) বাধার সঙ্গে সমতলে ও সমসূত্রে (same direction) থাকিয়া তুল্যবল প্রতিপক্ষ দ্বারা (by equal opposite force) এটি অভ্যাসযোগ। (২) বাধার সঙ্গে সমতলে আছি, কিন্তু সমসূত্রে নেই (changed direction) বাধার blow ঢাল পাতিয়া লইতেছি না; নিজের "অবস্থিতি"টাই, (angle of reaction) অন্যমুখ করিয়া লইতেছি। এটি বৈরাগ্য যোগ। (৩) নিজের "তল"ই বদলাইয়া লইতেছি—অনাসক্ত যোগ। (৪) বাধার বাণ যে মূলধনু থেকে বাহির

হইতেছে, তার ছিলা (জ্যা) কাটিয়া দিতেছি। যে মূলাজ্ঞানের আধারে এ সমস্তই অধ্যস্ত, সেই আধারটাই রহিল না। এটিকে বলিতে পার—অস্পর্শযোগ। এখানে কেবল যে $x + y + z = 0$ এমন নয়; $x = 0, y = 0, z = 0$. প্রথম equationটিতে "ফল" নিত্য হয় না; কেননা, x, y, z কেহই individually vanish করে নাই; সুতরাং তাদের আবার পারস্পরিক অনুপাতের ব্যতিক্রমের ভয় আছে। কিন্তু সত্যকার অস্পর্শযোগে অভয়। ভক্তিসাধনের দিক দিয়েও এসব আলোচ্য। হারানো জপের আধার সম্বন্ধে লেখাটায় আর আর প্রসঙ্গের মধ্যে জপের ১০৮ সংখ্যা সম্বন্ধেও কথা ছিল। পঞ্চদোষের নক্সায় পাইতেছ—৫ x ৩ = ১৫। প্রত্যেকটি আবার সপ্ত সপ্ত। ১৫ x ৭ = ১০৫। এর সঙ্গে "মূল" তিন যোগ কর। হইল ১০৮। হারানো লেখাটায় বৃহদারণ্যকের কিছু কিছু আমিও আলোচনা করিয়াছিলাম—বাক্, মনঃ, প্রাণ। অয়ং—অসৌ—অন্তরীক্ষ। সপ্ত অন্ন ইত্যাদি। এই শুক্রবারেই এখান থেকে রওনা হচ্ছি। আনন্দময়ী মা এসেছিলেন শুনে আনন্দ হল।

ইতি

স্বামিজী।

(৩)

১.৪.৪৩

কল্যাণীয়বরেষু

শ্রীমান গোবিন্দ, পর পর দুইদিন দুইখানা পত্র (কার্ড) দিয়াছি। আজ তৃতীয় পত্র। তিন পত্রেই জপ সম্বন্ধে কিছু কথা রহিতেছে। জপ ধ্বনি (ব্যক্ত বা অব্যক্ত), সংখ্যা আর ভাব (অর্থ) এই তিনের ত্রিপুটী। বাক্, প্রাণ এবং মনঃ যথাক্রমে এ তিনের নির্বাহয়িতা। প্রত্যেকটি আবার, স্বানুগত, স্বগত ও সমষ্টিগত—এভাবে ত্রিবিধ। ধর "গুরু" এই মন্ত্র। গ, উ, র, উ—চারিটি অক্ষর। প্রতিটি অক্ষরের স্পন্দন সংখ্যা আর স্পন্দন রীতি (বা ছন্দ) এক নির্দিষ্ট "আকৃতি" (pattern বা type) অনুরূপ হওয়া আবশ্যক সমর্থ জপে। এই হইল "গুরু", এ মন্ত্রের স্বানুগত "সংখ্যা" (elements of rhythm)। তারপর, শুধু অক্ষর ব্যক্তিগুলির সংখ্যা (= সংখ্যা + রীতি) ঠিক রাখিলেই হইল না। তাদের মিলন (compounding)টিও ঠিক হওয়া চাই। যথা,

উনিশ

অক্ষরাবয়ব চারিটির স্পন্দন অযথা অন্তরিত বা ব্যবহিত হইলে হয় না; ব্যবধানে বিবাদী স্পন্দ প্রবিষ্ট হইলে হয় না; ইত্যাদি। সুতরাং, গ, উ, র, উ এদের ছাড়াও "গুরু" এই নামের একটা স্বগত সংখ্যা ও রীতি আছে। তারপর, ধর ঐ মন্ত্র জপ করিয়া যাইতেছি। ১০ বার, ১০৮ বার ইত্যাদি। এর দ্বারা সমষ্টিগত একটা স্পন্দন সংখ্যা ও রীতি প্রস্তুত হয়। সেটি "আকৃতি" ও "আয়তনে" (in type and magnitude) একটা নির্দিষ্ট কাষ্ঠায় (limit) না উপনীত হইলে সমর্থ জপকর্ম হইল না। ধর, আমি লাল রং দেখিতে চাই। আলোক তরঙ্গগুলির আয়তন (wave-length) ও সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমায় না পৌঁছিলে সেটি হয় না। শব্দের, সুরের বেলাতেও তাই। ঠিক ঠিক আকৃতি ও পরিমাণের কম বেশি হইলে হয় না। স্পন্দনগুলি পরস্পরের সঙ্গে ভগ্নাংশ সম্বন্ধে থাকিলে হয় না। একটা পূরা composite rhythm বা harmony সৃষ্টি হওয়া চাই। তবেই তাদের সঙ্ঘাতটি সমর্থ হইবে। স্বানুগত, স্বগত এদের ভগ্নাংশে সমাহার হইলে তাতে সমর্থ সমুচ্চয় বা সংগ্রহ হয় না (cumulative effect)। জড়বিদ্যা বলে—সামান্য একটা মৃদু কম্পন (oscillation) যদি ঠিক একই তালে ক্রমাগত প্রযুক্ত হয় তবে সে একটা পর্বতকেও পাড়িয়া ফেলিবে। মন্ত্রশক্তি অমোঘ হয় সমর্থ, সমঞ্জস সমুচ্চয় দ্বারা। তারপর, স্পন্দন দীর্ঘ, মধ্য, হ্রস্ব (long, medium, short) ভাবে ত্রিবিধ। অনুদাত্ত, স্বরিত, উদাত্ত—এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। Long waves-এ উচ্চতা কম হবার কথা। হ্রস্বে উচ্চতা অধিক। সংখ্যা লইয়া এই বিশ্লেষণ। ধ্বনি ও ভাব লইয়াও অনুরূপ বিশ্লেষণ হবে। সুতরাং জপ বৈখরী ইত্যাদি ভেদে চার। প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত নিয়মে ৩ x ৩ x ৩ । ৪ x ৩ x ৩ x ৩ = ১০৮। বলা বাহুল্য, পশ্যন্তী ও পরায় জপ মুখ্যত ভাবরূপ ও জ্ঞানরূপ হইলেও তার অব্যক্তক্রিয়া (স্পন্দ) রূপ থাকে। সুতরাং স্পন্দ নিয়ামক রীতি (low) সেখানেও নিরবকাশ হয় নাই। এই তিনটি কার্ডের আলোচ্য বিষয়গুলিও ভাবিয়া দেখিও। স্নেহাশীর্বাদ নিও। কাল এখান থেকে রওনা হবার কথা।

ইতি

স্বামিজী।

কুড়ি

(৪)

২.৫.৪৩

কল্যাণীয়বরেষু

শ্রীমান গোবিন্দ, গতকল্য রেজিষ্ট্রি করিয়া "জপ" সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত নূতন লেখা পাঠান হইয়াছে। তার শেষের দিকে জপের "Reserve Bank"-এ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে জমা হবার কথা ছিল। সুদ = Resonance effect বলা ছিল। এ ভাবার্থটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেননা, জপক্রিয়ার সাফল্য (efficacy) মুখ্যত ঐ resonance effect-এর উপরই নির্ভর করে। ধর, কোনো বাজনার যন্ত্র (যেমন, সেতার) বাজাইতেছি। আমার অঙ্গুলিদ্বারা তারের ঝঙ্কার resonance effect (অনুরণন) দ্বারা যে কিভাবে কতখানি সমৃদ্ধ (augmented, enriched) হইতেছে, তা সহজেই ধরিতে পারি। সেতারটা ঠিক "বাঁধা" থাকিলে উক্ত effectটি সৌষ্ঠব ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। অন্যথা, ব্যতিক্রম ঘটে। নিকটে অন্য অন্য যন্ত্রও যদি "সম অনুপাতে" বাঁধা থাকে তো, সেতারের ঝঙ্কার সে সবেও "অনুরূপ" resonance effect সৃষ্টি করিবে। আসল কথা—অনুরূপতা। বাজানটা সেতারেই হোক অথবা আর আর যন্ত্রেই হোক, যেখানেই অনুরূপতার বদলে বিরূপতা, সেখানেই বাজনার স্পন্দন (vibrations)গুলো harmony সমূহের harmonic combination হবার যে সব নিয়ামক ছন্দ (equations) আছে, সেসব ছন্দে আসিবে না; সুতরাং তাদের combination harmonic না হইয়া unharmonic হইবে। বিরূপতাবশতঃ resonance effect না হইয়া wavesগুলি refraction, defraction ইত্যাদি effect-এ বিভক্ত হইয়া নানাবিধ জটিল interference effect-এর সৃষ্টি করিবে। ফল—পরস্পর বিরোধ, উপমর্দ, জটলা। মূল স্পন্দনের প্রতিস্পন্দনটি বিবাদী, বিসম্বাদী হইবে। Waves সমূহের সম্বাদী অথবা বিবাদী হবার কতকগুলি সহজ গাণিতিক নিয়ম আছে। গণিতশাস্ত্রে ও শব্দবিজ্ঞানে সে সব নিয়মের বিশ্লেষ বিস্তার এবং পরীক্ষাদি আছে। এখন ধর জপ। প্রাণভূমি থেকে প্রাণের ঋতচ্ছন্দে উত্থিত হইয়া জপ "স্থূলে" দেখা দিলে, তার স্পন্দনকে পূর্বোক্ত অনুরূপতা বিরূপতার নিয়মে পড়িতেই হয়। অবশ্য, "সূক্ষ্মে" ও অনুরূপতা বিরূপতার নিয়ম আছে। তবে তাহা সাধারণ হিসাব ও পরীক্ষার বাহিরে। স্থূলের law সূক্ষ্মে

সঙ্কোচ (ব্যাপ্তি এবং বীর্য দুদিক থেকেই) রূপ। এখন, জপকারীর যন্ত্র (অন্নময়াদি) (১) হয় অনুরূপ আছে (অর্থাৎ পূর্ণ শ্রদ্ধায় "বাঁধা"); নয়তো (২) বিরূপ (একবারে শ্রদ্ধাহীন); অথবা (৩) আংশিকভাবে অনুরূপ। প্রথম স্থলে, resonance effect পূরা হইবে। ২য়তে interference effect-গুলো অতিমাত্রায় প্রবল হইবে। জপের দ্বারা system এবং environment-এ যে সমস্ত প্রতিস্পন্দন (reactions) সৃষ্টি হইবে তারা overpoweringly unharmonious + unhelpful হইতে পারে। ৩য় হইতেছে জপ সাধনের সাধারণ অনুকূল অবস্থা। আংশিক অনুরূপতাকে আশ্রয় করিয়া জপক্রিয়া একটা wedge-এর মতো প্রবিষ্ট হইবে। ক্রমে ক্রমে সমগ্র যন্ত্রটির সূক্ষ্ম অবয়বগুলির বিন্যাস এবং ক্রিয়ার ছন্দটি সে অনুরূপভাবে বদলাইয়া লইবে। জড় ও প্রাণরাজ্যের মৌলিক পরিবর্তনগুলো এইভাবেই সাধিত হয়। Atomic Number, Molecular distribution, Chromosomes + gene-এর পরিবর্তন—এইভাবেই। যন্ত্র যেমন অনুপাতে অনুরূপ হইতে থাকে সেই অনুপাতে তাতে resonance effect বেশি হইতে থাকে। ইহাই "চক্রবৃদ্ধি"। কেবল জপ বলিয়া কেন, সকল অভ্যাসেই যন্ত্রের একটা "molecular aptness" সুতরাং functional readiness সৃষ্টি হইতে থাকে। সমর্থজপে অন্নময় কোষের (এবং উত্তরোত্তর আর আর কোষেরও) বিরূপতা দূর হইয়া অনুরূপতা সৃষ্টি হয়। Hormone secretions, কুণ্ডলিনীর জাগরণ, "চক্র"গুলির উন্মেষ—সবই ঐ ক্রিয়ার ফল।

ইতি

স্বামিজী

(৫)

২২.৫.৪৩

কল্যাণীয়বরেষু

শ্রীমান গোবিন্দ, এখানে আসিয়া কয়দিন আগেই তোমার কার্ডখানা পাইয়াছি। জপ সম্বন্ধে ২য় নিবন্ধটি তোমার বাবা ও নলিনী আলোচনা করিয়া কিছু আনন্দ পাইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। "সপ্তান্ন" ও "পাংক্তকর্ম" সম্বন্ধে যথাসম্ভব সত্বর কিছু লিখিয়া পাঠাইব। বর্তমানে দৌলতপুর কলেজটি একান্তবাসের উপযোগী মনে

হইতেছে; দিন কয়েক সেখানে থাকার কথা আছে। বঙ্কুবাবু চোখের অসুখে ভুগিতেছেন। "গৈরিক কেতন" গীতটি আষাঢ়ের "উদ্‌বোধনে" সম্ভবতঃ বাহির হইবে।

সেদিন খুলনার শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে জপ সম্বন্ধে আমার মুখে তাঁরা কিছু শুনিলেন। জপকর্মের আধাররূপে জপ"বিদ্যা" বা "বিজ্ঞান" পাইলে যে কি উপকার হয় সে সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম। প্রাচীনকালে কোনো ক্রিয়ার সাথে সাথে তার বিদ্যাও উপদিষ্ট হইত। শ্রুতিতে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ। সেদিন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আলোচনায় মুখ্যভাবে যে দুটি প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিই :

(১) জপ, ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তত্ত্বসম্বন্ধী (Theory) আধার আবশ্যক বটে, কিন্তু বেশি আবশ্যক একটা practical background অথবা "frame", যথা—(ক) জপারম্ভে হৃদয়ে, ললাটে অথবা শিরসি শ্রীভগবানের শাশ্বতী ও সর্বগ অনুগ্রহশক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুধ্যান। শ্রীগুরুদেবের কৃপালব্ধ অভিনব সাধনদেহে "ভূমিষ্ঠ" হওয়া। এই ব্যবহারিক ভোগদেহের thought elimination এবং উক্ত সমর্থ, গুরুকৃপাজন্য, শুদ্ধ সাধনদেহ লাভের auto-suggestion। ইহা দ্বারা এই apparatusটি "in tune" (শ্রদ্দধান) হইয়া থাকে। এতে পূর্বোক্ত resonance effect-গুলি হবার সুবিধা হয়। (খ) তান্ত্রিক সন্ধ্যাদিতে বীজজপদ্বারা প্রাণায়াম পূর্বক এই পাপ্মাবিদ্ধ দেহটাকে ভস্মীভূত করা হয়; অমৃতময় নব কলেবর ধারণের suggestion দিতে হয়। (গ) শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে Mother-এর দেয়া একটা symbol picture বেশ লাগিল। সপ্তবর্ণালী চক্র বেষ্টিত এক মহান্ কেন্দ্রজ্যোতিঃ। নিম্নে এক শতদল প্রস্ফুটিত হইতেছে; তন্মধ্য হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া উক্ত সপ্তচক্র ভেদ করিয়া অন্তর্জ্যোতিতে মিলিত হইতে চাহিতেছে। প্রতীকের রহস্য স্পষ্ট—The flame of soul's aspiration leaping up to—। জপাদিকালে আপন কারবারি সত্তা ভুলিয়া এইটি ধারণা করা আবশ্যক। অগ্নের আকুতি ও সন্ধান ও সমাপ্তি ভূমায়। পার্বত্য-তটিনীর নদীনাথে। জীবের এটি মূল aspiration pattern বহু seperable accidents মধ্যে এইরকম সব জপাদি কর্মের practical আধার মেলান আবশ্যক। আর এক প্রসঙ্গ—জপধ্যানাদির "একান্ত" ফল আর "সজ্ঞ"

(congregation) ফল। একান্ত সাধনই সাধারণতঃ প্রশস্ত বটে, তবু দেশ (যথা তীর্থাদি), কাল (যথা যোগাদি), পাত্র বা বস্তু (যথা দেবতা বিগ্রহ, গুরু অথবা অপর মহাপুরুষ সান্নিধ্য) এবং ছন্দ (যথা ভাবের, বুদ্ধির ও কর্মের সমতানতা)—এই চারের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সঙ্ঘ কর্ম বিশেষভাবে ফলপ্রদ। তাতে resonance effect multiplied হইবার সুযোগ পায়। Minor ছাড়া major discordance factors অধিক থাকিলে resonance-এর বদলে interference effects গুলোই অধিক হইতে পারে। মূলকথা—Total effectটি "বিষম" না হইয়া "সুষম" হইবে। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তন রসেও বাধা হইয়াছিল বহির্ভাগে কোনো বহিরঙ্গ ব্যক্তি ছিল বলিয়া। Symphony বা synthesis of the elements of Harmony-র জন্য এত mathematically precise conditions আবশ্যক হয়। শুভেচ্ছা নিও।

ইতি

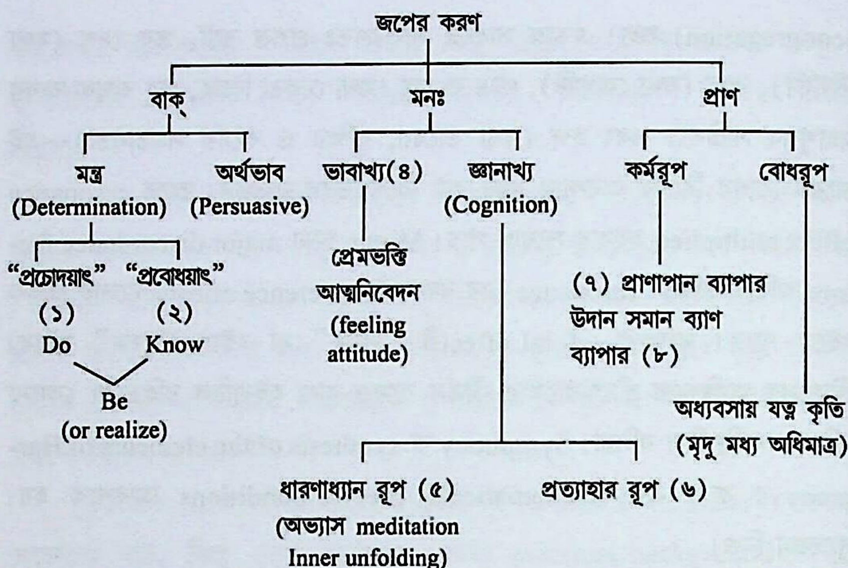
স্বামিজী

(৬)

২৯.৫.৪৩

কল্যাণীয়বরেষু

স্বামিজির আর একখানি পত্র আসিয়াছে মহেশ্বর পাশা হইতে, তাহার নকল নিম্নে দিলাম। গত পরশুর আগের দিন আমার শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে যাওয়া উপলক্ষ্য করিয়া জপের practical আধার সম্বন্ধে এক কার্ড লিখিয়াছি। তাহাতে ক, খ, গ এই তিনভাবে জপকর্মের আধার দেখান হইয়াছে। এই তিনটি নমুনা মাত্র। practical আধার অনেক ভাবেই পরিকল্পিত হইতে পারে। জপধ্যানাদি কর্ম তার উপযোগী আধার না পাইলে সমর্থ হয় না। এবম্বিধ আধারের একটা সুসমৃদ্ধ পরিচয় নীচের নক্সায় পাইবে। জপের আধার 'নির্মাণে' এই 'জপকরণ সম্পাত'টি মনে রাখিয়াই করিতে হয়। শাস্ত্র আচার্য ও গুরুবর্গ তাহাই উপদেশ করিয়াছেন। ইষ্ট মন্ত্র জপারম্ভে বাক্ মনঃ ও প্রাণ এই ত্রিবিধ করণের পূর্বোক্ত সম্পাত (collaboration) সম্বন্ধী একটা উপযোগ (appropriate field) তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। [বৈদিক সন্ধ্যায়



মুখ্য কর্ম গায়ত্রী জপ; আচমন, মার্জন প্রাণায়ামাদি পূর্ব পূর্ব ক্রিয়া দ্বারা তার উপযোগ] ১ + ২ এর দৃষ্টান্ত (১) আচমনাদি যথাশক্তি অসতো মা (২) তদ্ বিষ্ণো অথবা মুখ্যপ্রাণ ভূমি পর্যন্ত এখনও মানুষের বিজ্ঞানের সর্বত্র গতি নিশ্চয় হয় নাই। চেষ্টা চলিতেছে। যোগ বা আর্য বিমর্শ তার এক প্রশস্ত পথ। শুভেচ্ছা নিও।

স্বামিজী।

(৭)

১৩.৭.৪৩

কল্যাণীয়বরেষু

শ্রীমান গোবিন্দ,

মহেশ্বর পাশা থেকে "পাংক্তকর্ম" সম্বন্ধে একটা বিস্তারিত লেখা পাঠান হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেটা তোমরা পাইয়াছ এবং এতদিনে তার আলোচনাও হইয়া থাকিবে। একটা নকল রাখিয়া সেটা (এবং সেই পোস্টকার্ডগুলোর নকল) মহেশ্বর পাশায় সুবোধবাবুকে পাঠাইয়া দিও। সুবোধবাবু বর্তমানে কাশীধামে। তবে সত্বরই দেশে ফিরিবেন আশা করা যায়। কয়েকদিন হইল এখানে আসিয়াছি। গুরুপূর্ণিমা এবার

দেখিতেছি কলিকাতাতেই কাটিবে। তারপর কয়দিনের জন্য একবার জামসেদপুর যাবার কথা আছে। তারপরের স্থিতি এখনও ঠিক নাই. পরে জানাইব। আশাকরি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল যাইতেছে।

জপ সম্বন্ধে লেখাগুলিতে একটা mathematical structure এর অনুসন্ধান দেখিতে পাও। তাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। জড়বিজ্ঞান বিশেষভাবে, এবং প্রাণবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানাদিও কিয়ৎ পরিমাণে, বিশ্বের আধারভূমিতে সংখ্যা ও পরিমাণগত কতকগুলি মৌলিক অনুপাত সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে; এবং মনে করিতেছে—সেই সেই সংখ্যা—পরিমাণগত সম্বন্ধগুলিই বিশ্ব-প্রতীতির (world experience) এর সেই আধার যেখানে বুদ্ধি শেষপর্যন্ত আমাদের লইয়া যায়। অথচ, বিশ্বের যেটা যথার্থ (real) উপাদান + নিমিত্ত, তার উপরে এই mathematical structureটা মনের বা বুদ্ধির .অধ্যাস মাত্র নয় (Kant যেরূপ তাঁর Theoretical Reason গ্রন্থে মনে করিতেন)। বিশ্ব = X নয় যেটা বুদ্ধির ছাঁচে এই mathematical চেহারা পাইতেছে; বরং বিশ্ব = মহদ্‌বুদ্ধিরই অভিব্যক্তি। বিশ্ব আর বুদ্ধির ভিতর ঐকান্তিক Dualism নেই। থাকিলে বুদ্ধি জটিল গণনায় (Theory তে) যেটি deduce করে, বিশ্ব নিরপেক্ষ পরীক্ষা সমীক্ষায় সেটি corroborate করিতে বাধ্য থাকিত না। Mathematical Theory-তে যেটি পাই observation and experiment-এ সেটি মিলিয়া যায় দেখি। সময় সময় মেলে নাও দেখি। কিন্তু সে হয় এই কারণে যে মহদ্‌বুদ্ধি পরমং পদং অবধি ইত্যাদি (৩) স্তবস্তুতি বন্দনা ইত্যাদি (৪) Right feeling attitude বজায় রাখা আবশ্যক। Feeling হইতেই এই apparatus-এর tuning factor (৫) অভ্যাস বৈরাগ্য আবশ্যক, তাহারা দেশ-কাল-বস্তু নিমিত্ত বাধা সকল ভাবের দ্বারা . . . বাধা যায় . . .

৭ + ৮ প্রাণের দুটি মুখ্য ব্যাপার। উদানবৃত্তি দ্বারার মতো দুয়ের সহায়তা করিতে হয়। প্রাণায়াম, ন্যাসাঙ্গা ভূতশুদ্ধি ইহার অন্তর্গত। বেণাখ্য শক্তিটি মৃদু মধ্য হইলে সমর্থ আধার লাভে বিলম্ব হয়। Auto suggestion এই সমগ্রকরণ সম্পাতের সঙ্ঘাত, ফলে মহাবীর্য হয়।

স্বামীজির কথা

পরম পূজনীয় স্বামীজির (স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী) সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁর লীলাসংবরণের মাত্র দশবছর আগে। তাঁকে এর আগে পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের আশ্রমে একবার দর্শন করি। তাতে সে সময় আমার মনে কোনো রেখাপাত করেনি। এর বেশ কিছুদিন পরে আমার মন তখন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত—আর নিজেকে খুব অসহায় বোধ করছি। এই সময় খবর পেলাম গোলপার্কে ডা. পুলিনবিহারী বাবুর বাড়িতে ক্লাস মতন হয়, সেখানে পূজনীয় স্বামীজি আসেন। পরম শ্রদ্ধেয় গোবিন্দগোপালবাবু পাঠ করেন। তারপর সে সম্বন্ধে স্বামীজি কিছু বলেন। ওখানে সবাই যেতে পারেন শুনলাম। চিরকালই আমার নতুন কোনো জায়গায় যেতে কুণ্ঠা হয়। কিন্তু সে সব ঝেড়ে ফেলে আমি ওখানে যাই।

প্রথম যেদিন ওই বাড়িতে যাই সকলের সঙ্গে বসে আছি—এমন সময় দেখি স্বামীজী সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম এক জ্যোতির্ময় পুরুষ উঠে আসছেন—এর আগে এরকম কোথাও দেখিনি। পাঠের শেষে তাঁকে আশ্রমে পৌঁছে দেবার গাড়ি আসতে দেরি হওয়ায় একে একে সবাই উঠে গেলেন। আমি বসেই থাকলাম—উঠতে পারিনি। হঠাৎ স্বামীজি বললেন—শরীরটাকে শোবারতন না করে দেবারতন করবার চেষ্টা কর। আরও বললেন—মৌন সঙ্গই সব থেকে ভালো। আমি তখন ভাবছি আমাকে তো উনি চেনেন না—পরিচয়ও জানেন না। তাহলে একথা বললেন কেন?

পরমপূজনীয় স্বামীজির সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেন তাঁরই একান্ত স্নেহভাজন পরম শ্রদ্ধেয় গোবিন্দগোপালবাবু। তাঁরই নির্দেশে আমি গড়িয়ার আশ্রমে যাই। তারপর থেকে আশ্রমে যাতায়াত চলতে লাগল। স্বামীজির সান্নিধ্যে ও স্নেহভরে আমি সবদিক থেকেই উপকৃত হয়েছি।

একদিন আশ্রমে গিয়েছি—আর কেউ ছিল না। স্বামীজি বললেন—মধ্যপ্রদেশের ছোটো ছোটো পাহাড়গুলি তাঁর খুব ভালো লাগত। ভোরে উঠে চলে যেতেন জঙ্গালে,

সঙ্গে থাকত খাতা ও পেনসিল। খাতা খুলে রাখতেন, পেনসিলও ধরা থাকত। আপনা থেকেই শ্লোকের পর শ্লোক লেখা হয়ে যেত। স্বামীজি বলেছিলেন তখন তার অর্থ বুঝিনি, পরে বুঝেছি।

আরেকবার 'জপসূত্রম্' রচনার সময় স্বামীজি বলেছিলেন—একদিন সন্তোষ আশ্রমের বারান্দায় বসে আছি। প্রাণগোপালদাও আছেন—শঙ্করাচার্যের ভাষ্যে মানসজনের জপের ওপর পড়া হচ্ছিল। আমার মনে হল সবটা যেন বলা হয়নি—আরও বলা যেত। প্রাণগোপালদাকেও সে কথা বললাম। তারপর খুলনা যাই। সেখানে গোবিন্দকে জপের কথা লিখতাম। সেগুলো প্রাণগোপালদাও পড়তেন। মাঝে মাঝে কোয়ারি দিয়ে রাখতেন না বুঝলে। এগুলি ক্রমে জমে যায়। এই হল 'জপসূত্রম্'—লেখার সূচনা। পরে 'জপসূত্রম্' পুস্তকাকারে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

২য় খণ্ড 'জপসূত্রম্' প্রকাশিত হয় শ্রদ্ধেয় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং কালীপদ মৈত্র মহাশয়ের সৌজন্যে।

অসীমা গোস্বামী

প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনা

যে অভিনব গ্রন্থের প্রকাশনে আমরা ব্রতী হইয়াছি, তাহার ভূমিকার কিছু প্রয়োজন নাই। মূল গ্রন্থের বিস্তারিত ভূমিকারূপে পূজ্যপাদ স্বামিজীরই জপ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ একত্র সংকলিত করিয়া নিবিষ্ট করা হইয়াছে। তবুও গ্রন্থের অভিনবত্বের দরুণ পাঠকবর্গের কাছে ইহা দুর্বোধ্য রহস্যময় মনে হইতে পারে ভাবিয়াই মূল বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এখানে দুচার কথা বলার চেষ্টা করা যাইতেছে। এখানে এত বিভিন্ন বিচিত্র ও গভীর বিষয়ের সমাবেশ ও অবতারণা করা হইয়াছে যে মূল চিন্তাধারার সন্ধান না পাইলে অনেকেই লক্ষ্যে 'অপারগ' হইয়া পড়িতে পারেন। এজন্য সংক্ষেপে সেই মূল ধারাটির অনুসরণের বা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা যাইতেছে।

গ্রন্থের নামকরণ হইতেই ইহা সুস্পষ্ট যে ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে—জপ। অধ্যাত্মসাধনার গতি বহুমুখী ও বিচিত্র হইলেও এবং আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের পরস্পর বিরোধিতা থাকিলেও কোনো ধর্মমতই এই জপরূপ মহাকর্মকে পরিত্যাগ বা অবহেলা করিতে পারেন নাই। ইহা সকল সাধনারই অপরিহার্য অঙ্গরূপে চিরদিন গৃহীত ও সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া হিন্দু-সাধনার ইহাই মূল ভিত্তি। এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে এই যে জপরূপ সনাতন সাধনধারা, এ তো চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, নানা সাধক মহাজন ইহার অনুশীলনে তৎপর হইয়াছেন, সিদ্ধির শিখরে উঠিয়া কৃতার্থতাও লাভ করিয়াছেন,—তবে এ বিষয় লইয়া এরূপ বিশাল গ্রন্থের অবতারণার কি প্রয়োজন পড়িল? প্রয়োজন—এই চিরপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রচলিত জপরূপ অনুষ্ঠানের যাহা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য তৎসম্বন্ধে আমাদের যে গভীর অজ্ঞতা সেটি দূর করা। এই গ্রন্থ লেখার প্রেরণা এইজন্যই জাগিয়াছে যে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় এই পরম প্রয়োজনীয় ও রহস্যময় কর্মটি সম্বন্ধে অপরিসীম অজ্ঞতা বিদ্যমান। জপ বলিতে কি বুঝায়, কিভাবে জপ করিতে হয়, কেমন করিলে জপ যথার্থ 'সমর্থ' বা ফলবান্ হয়, কেনই বা সাধারণতঃ জপাদি করিয়া কোনো ফল বুঝা যায় না—এ

সব বিষয়ে আমাদের কোনো অনুসন্ধানই করা হয় না, এমন কি যথার্থ জিজ্ঞাসারও উদয় হয়-না। যদি বা জিজ্ঞাসা জাগে তো সদুত্তর মিলে না। আমরা কেবল যান্ত্রিকভাবে, mechanically, জপ করিয়া চলি, মালা ঘুরাইয়া যাই, শেষে হয়তো বিরক্ত বা হতাশ হইয়া এই অনর্থক কর্মের অর্থহীন আবর্তন হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লই. সাধনা সম্বন্ধে এই জিজ্ঞাসাই মৌলিক বা মর্মী জিজ্ঞাসাঃ যথার্থ কোন পদ্ধতিতে, right technique অনুসারে জপকর্ম করা উচিত? ইহারই সদুত্তর সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা। এখানে তাই দেখান হইয়াছে যে জপকর্ম কিন্তু অন্ধকারের কর্ম নয়, কুসংস্কারের অর্থহীন আচরণ নয়—ইহা আলোকের কর্ম, তমসা হইতে জ্যোতিতে উত্তরণের কর্ম। তাই উপনিষদ্ ইহার সার্থক নাম দিয়াছেন—"অভ্যারোহ জপ"। সুতরাং জপকর্মের পিছনে এক পরিপূর্ণ মহা-বিজ্ঞান রহিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞানে নয়, দিব্য বিজ্ঞানে। আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রসমূহে—বেদে, উপনিষদে, তন্ত্রে—সর্বত্র এই পরম বিজ্ঞানের রহস্যময় ইঙ্গিত ছড়ান রহিয়াছে। পূজ্যপাদ স্বামিজী এই নিখিল শাস্ত্রমহোদধি মন্থন করিয়া সেই বিজ্ঞানামৃত সমুদ্ধরণে তৎপর হইয়াছেন এবং নিজের অনুভূতির উজ্জ্বল আলোকে, সুনিপুণ বিচার-বিশ্লেষণের 'দ্রাবকে' তাহা পরখ করিয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

মূল জপসূত্রটি স্বামিজী সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বেদান্তসূত্রের ন্যায় ইহারও চারি অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। এই খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের কয়েকটি মাত্র সূত্র দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক সূত্রের আবার সংস্কৃত শ্লোক বা কারিকায় ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন এবং সেই শ্লোকগুলির আবার বাংলায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সর্বসমেত সূত্রসংখ্যা পাঁচশতের অধিক এবং শ্লোক সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র। গ্রন্থটি সুবিশাল, এজন্য খণ্ডে খণ্ডে ইহার প্রকাশের আয়োজন করা হইয়াছে। মূল জপসূত্রের উপোদ্ঘাত বা ভূমিকারূপে স্বামিজী শতাধিক সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছেন এবং সেগুলির বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। এই খণ্ডে সেইগুলিই বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। তাছাড়া, উপক্রমণী নামক অংশে আরও কতকগুলি শ্লোকও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জপসূত্রের এই উপোদ্ঘাত ও উপক্রমণিকায় যে শ্লোকগুলি এবং তার ব্যাখ্যা

দেওয়া হইল, তাহা বিশেষ অবধানপূর্বক এবং অত্যন্ত ধীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। এখানে নানা গূঢ়তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে—যেমন, প্রারম্ভেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপের তত্ত্ব, তারপর তিনটি ঋক্ বা ঋক্ত্রয়ের তত্ত্ব, তারপর পঞ্চভূতের তত্ত্ব, তারপর পঞ্চ অবতারতত্ত্ব, তারপর পঞ্চগঙ্গাতত্ত্ব, পঞ্চশুদ্ধিতত্ত্ব, পঞ্চরূপতত্ত্ব ইত্যাদি। আরম্ভেই সাধারণ পাঠকের মনে শঙ্কা জাগিতে পারে যে জপসূত্রের মধ্যে এ সব তত্ত্বের অবতারণা তো অবান্তর। জপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া জগতের মূলতত্ত্ব, বা তার সৃষ্টিতত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? জপের প্রসঙ্গে এ সব আলোচনার উপযোগিতা কোথায়? এরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক এবং তাই ইহার নিরসনের জন্য গোড়াতেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে জপকর্মটি একান্ত বহিরঙ্গ যান্ত্রিক কর্ম নয়। ইহা কেবল মন্ত্র আওড়াইয়া যাওয়া মাত্র নয়। জপের দুটি অঙ্গ শাস্ত্র সর্বত্র বলিয়াছেন—'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্'—ব্যাহরণ ও অনুস্মরণ। এই অর্থভাবন না হইলে জপ একান্ত ব্যর্থ না হইলেও যথার্থ 'সমর্থ' হয় না; কারণ, মন্ত্রাক্ষরের শুধু উচ্চারণ বা আবৃত্তিরও অবশ্য একটা ফল আছে, কিন্তু তাহা আংশিক, গৌণ। ইহার মুখ্য, সমগ্র ফল লাভ হয় মন্ত্রাক্ষরগুলির মধ্যে যে অগাধ রহস্য নিহিত আছে, তাহাতে ডুবিতে পারিলে। মন্ত্র হইল রত্নাকরস্থানীয়—ইহার মূলে ডুব দিতে পারিলে অনন্ত রহস্যময় তাৎপর্যের মণিমুক্তা আমরা আহরণ করিয়া আনিতে পারি। শুধু একবার ডুব দিয়া নিজের মুঠার মধ্যে যা' কিছু তুলিয়া আনিলাম তাহাতেই যেন আবার মন্ত্রের সমগ্র তত্ত্ব ছাঁকিয়া তুলিয়া আনিয়াছি বলিয়া ভুল না করি। বারম্বার যতই ডুবিব, ততই নিত্য নব নব অর্থের ও ভাবের অনুভূতি আমাদের আলোকে পুলকে ভরিয়া দিবে। এখানে তাই এই অগাধ রহস্য-সাগরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই, মন্ত্রের প্রতিটি অক্ষরের প্রতি একান্ত অভিনিবিষ্ট হওয়ার আহ্বান জানানোর জন্যই এই সব তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, কারণ বেদের প্রতিটি মন্ত্র, প্রতিটি বর্ণই রহস্যের খনি। সেইজন্য প্রয়োজন পরম শ্রদ্ধা ও একান্ত অভিনিবেশ সহকারে বেদাগমের বাঙ্ময় মহোদধিতে অবগাহন। বেদবাণী হইতেছেন বাক্‌রূপিণী কামধেনু; ইহা হইতে আমাদের অমৃতের ধারা দোহন করিতে হইবে—'দুহানা অমৃতস্য ধারাম্'। এই গ্রন্থে তাই প্রসঙ্গক্রমে বেদের কোন কোন মন্ত্রের (যেমন সৃষ্টিসূক্তের) রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা হইয়াছে, যাহাতে সুধী পাঠকের মধ্যে অনুরূপ রহস্য উদ্ভেদের প্রেরণা জাগে।

অনেকস্থলে মাত্র দিগ্‌দর্শন করান হইয়াছে—সবিশেষ বিস্তার করা হয় নাই। তন্ত্রের বা পুরাণের রহস্য সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

উপোদ্ঘাতের শ্লোকগুলির মধ্যে যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা যথার্থভাবে অনুধাবন করিতে হইলে একটি বিষয় সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন এবং তাহার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পূজ্যপাদ স্বামিজী যেখানে যে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন সেগুলি কিন্তু সর্বত্রই বিশ্বজনীন সার্বভৌম তত্ত্ব বা Universal Principles, সেগুলিকে পরিচ্ছিন্নভাবে মাত্র তাহাতেই পরিসমাপ্ত ভাবিলে চলিবে না। যেমন প্রারম্ভেই শ্রীশ্রীগুরুপাদবন্দনায় যে শ্রীগুরুতত্ত্বকে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা শুধু কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপ গুরুর তত্ত্ব নয়, কিন্তু যে গুরুশক্তি বিভিন্ন গুরুমূর্তির মধ্য দিয়া বিশ্বের আর্ত, দীন, দুঃস্থ জীবকে সর্বদাই সমুদ্ধরণের পথে লইয়া চলিয়াছেন সেই মৌলিক মহাকরুণাশক্তি বা উদ্ধারশক্তিরই তত্ত্ব। এইরূপ তিনি প্রসঙ্গক্রমে যে পঞ্চ অবতারের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা কিন্তু মাত্র সেই সেই পরিচ্ছিন্ন কূর্ম, বরাহাদি মূর্তিতেই পরিসমাপ্ত নয় বা কেবল জপাদির ক্ষেত্রেই ওই সকল শক্তির ক্রিয়া উপলব্ধ হয় তাহাও নহে, কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র ঐ অবতারতত্ত্ব মৌলিক শক্তিরূপে সক্রিয় রহিয়াছে। যেমন সাধারণ স্থূল ভৌতিক পরিণামেও আমরা ঐ শক্তিগুলির সক্রিয়তা উপলব্ধি করিতে পারি। একটা বৃক্ষের বীজ যখন তার সমস্ত অন্তর্নিহিত শক্তি লইয়া ঘুমাইয়া আছে, তখন তার মধ্যে ঐ মীনশক্তির ক্রিয়া। তারপর, তাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে কূর্মশক্তি; এই শক্তির সাহায্যেই সে নিজের সত্তাকে অন্যান্য সব কিছু হইতে পৃথক করিয়া ধরিয়া আছে। এখন সে বিকশিত হইবে—এই বিকাশের মুখে তাকে ঠেলিয়া দিতেছে, তুলিয়া ধরিতেছে ঐ বারাহী শক্তি। তারপর, বিকাশের পথে তার যে সমস্ত বাধা, তাহা অপনয়ন করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া চলিয়াছে ঐ নৃসিংহশক্তি। আবার, যে 'উরুক্রমের' প্রভাবে বীজাদি সমস্ত কিছুই আপন প্রাকৃতিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া উদ্‌বর্তন (Evolution) প্রাপ্ত হয়, সেটি হইল বামনশক্তি। সুতরাং এইরূপে একটি স্থূল বীজও এই কয়টি শক্তির আশ্রয়েই ক্রমশঃ অঙ্কুরাদিরূপে বিকাশ পাইতেছে। সৃষ্টির সর্বত্রই এইরূপ। দৃষ্টি ফুটিলে একটি ক্ষুদ্র বীজের জীবন-ইতিহাসের মধ্যেও আমরা এই পঞ্চ অবতারতত্ত্বের প্রকট লীলা দেখিতে পারি। প্রণবের অকারাদি পঞ্চ অবয়বও এইভাবে একটা বীজের জীবনে

উদাহৃত হইতেছে। পূজ্যপাদ স্বামিজী সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে চাহিয়াছেন। শ্রীগণেশাদি দেবতার তত্ত্ব সম্বন্ধেও ঐ একই কথা।

এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন এই যে যেহেতু ঐ তত্ত্বগুলি সর্বত্রই সার্বজনীন বা Universal, সেইজন্য যে কোনো আধারের মধ্য দিয়াই তাহার উপলব্ধি হইতে পারে। তাই পাঠকদের মনে হয় তো খট্‌কা জাগিতে পারে যে শ্রীগুরুর যেরূপ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হইল, শ্রীগণেশের বেলাতেও তো দেখিতেছি মূলতঃ তদনুরূপ। ইহা কি পুনরুক্তি? বাস্তবিক কিন্তু ইহা পুনরুক্তি নয়। মনে রাখিতে হইবে যে সর্বত্র একই পরম তত্ত্ব বা পরম দেবতার মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। কিন্তু আধারের এবং আধেয়ের ভেদ তো আছে—শ্রীগুরুর মূর্তি ও শ্রীগণেশের মূর্তি এক নয়। গ্রহণ ও গ্রহীতার ভেদ নিবন্ধন গ্রাহ্যও বিভিন্ন হন। তাই অনুভূতির বা আস্বাদনের তারতম্য আছেই, যদিও লক্ষ্য বা গম্যস্থল একই। শ্রীগুরুর দিব্যঅঙ্গ-গন্ধাদি যাহার ইঙ্গিত দিতেছে, শ্রীগণেশের রক্তবর্ণ, গজমুণ্ডাদিও হয় তো প্রকারান্তরে সেই তত্ত্বেরই সন্ধান দিতেছে—তাই 'নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'। অন্যান্য দেবতাতত্ত্বের বেলাতেও ঐ একই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, নতুবা বিভ্রমের সম্ভাবনা। বিভিন্ন দেবতাদিতত্ত্ব আর্যদৃষ্টিতে এই ভাবেই তো প্রতিভাত হইয়াছে! একই সব, একেতেই সব। একই 'বহুধা' ভাবিত ও কীর্তিত হয়েন। অথচ ব্রহ্মের এবম্প্রকার বহুধা 'কল্পনা' তাঁর নিজেরই 'একোঽহং বহু স্যাম্,' ইত্যাদি।

মর্মী দৃষ্টি ফুটিলে এইরূপেই দেবতার মূর্তি সাধকের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই পূজ্যপাদ স্বামিজীর তত্ত্ব-বিশ্লেষণে গণেশের ক্ষুদ্র মূষিক বাহনটি বা ধূমাবতীর রথস্থ কাকটিও বাদ যায় নাই। দেবতার প্রত্যেক অবয়বই যেন নিত্য নূতন নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়া চলে। তাই নানাভাবে সেই তত্ত্বের পরিচয় পাইয়া ও বর্ণনা করিয়াও সাধকের যেন আশ মিটে না। শ্রীশ্রীকালীতত্ত্বের বর্ণনায় পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারহস্যবারিধির অসীমতার সঙ্গে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন দেখি। শ্রীশ্রীকালিকার কৃষ্ণবর্ণ, এলায়িত কেশ, বিস্তীর্ণ জিহ্বা, কণ্ঠস্থ মুণ্ডমালা, করস্থ একটি ব্যস্তমুণ্ড প্রভৃতি সব কিছু রহস্যই তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তারা মূর্তিতে মন্ত্রোদ্ধার মন্ত্রচৈতন্য ইত্যাদি রহস্য; ছিন্নমস্তায় মহাবাক্যচতুষ্টয় এবং নাদানুসন্ধানরহস্য; ধূমাবতীতে মহাব্যাহৃতিরহস্য—ইত্যাদিও স্বামিজী আমাদের

দৃষ্টিতে ফুটিতে দিয়াছেন। এইগুলি পড়িবার সময় অত্যন্ত সাবধানে ও স্থিরচিত্তে তত্ত্বগুলির অনুশীলন করিতে হইবে। যিনি এইরূপে এক একটি তত্ত্বের ধ্যানে ডুবিতে পারিবেন, তিনিই এই গ্রন্থে যে সকল তত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নতুবা হয়তো এসব কবির কল্পনা বা উচ্ছ্বাস বলিয়াই মনে হইতে পারে, যেমন শাস্ত্রে দেবতাদির ধ্যান, রহস্য, স্তোত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেকের মনে হইয়াছে। সেইজন্য সর্বশেষে ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে এ সব তত্ত্বই ফুটিয়া উঠিবে কিন্তু কেবল জপাশ্রয়ে। তাই ইহা সাধনার ধন, কল্পনার জালবয়ন নয়। সেই সাধনার এক যুক্তিযুক্ত, নির্ভরযোগ্য আধার এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ-সমন্বয়-মুখে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সাধকমাত্রের কাছেই এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ গ্রন্থে (১।১।১,২,৩ ইত্যাদি) জপের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাতে জপকে মানবের অধ্যাত্মযোগের একটা গৌণী শাখা বা অববাহিকা মনে করা যায় না; ইহাই মুখ্যধারা, ধ্যানধারণা, মননবিচার, ভাবভক্তি—সব কিছুই ইহার ক্রোড়ীকৃত। সুতরাং জপের যে অনুবন্ধচতুষ্টয়, অর্থাৎ বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অধিকার, তার সম্যক্ আলোচনার নিমিত্ত একটা পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং ক্রিয়াতান্ত্রিক (practical) আধার প্রস্তুতির অপেক্ষা আছে। বর্তমান গ্রন্থে সেইরূপ আধারই লক্ষ্য হইয়াছে।

তারপর, পূজনীয় গ্রন্থকর্তা স্বামিজীর পরিচয়? একদিক দিয়া এই বিশাল অনুপম গ্রন্থই তাঁর সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু পরিচায়ক। পূর্বাশ্রমে ইঁহার নাম ছিল অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি সেযুগে শিক্ষাক্ষেত্রে ঁরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির সহকর্মী ছিলেন। তন্ত্রানুশীলনে এবং তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যানে স্যার জন উডরফের সঙ্গে ইঁহার সহযোগিতা সুধীসমাজে প্রায় সর্বজনবিদিত। বেদ, তন্ত্র, দর্শনাদি বিষয়ে ইঁহার নিজের অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং মৌলিক গ্রন্থও পূর্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এইরূপ গ্রন্থ তিনি আর ইতিপূর্বে রচনা করেন নাই। ইহার বিরচন কর্মটিতেও কিছু অসাধারণত্ব রহিয়াছে। জীবনের প্রান্তভাগে আসিয়া তিনি যেন এই গ্রন্থে তাঁর সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার পরিপক্ব অভিজ্ঞতা উজাড় করিয়া দিয়াছেন। আশা করি সাধকমণ্ডলীর মধ্যে ও সুধীসমাজে এই গ্রন্থটি সমুচিত সমাদর লাভ করিবে।

এই গ্রন্থের প্রকাশে পূজ্যপাদ স্বামিজীর বিশেষ অনুরাগী কয়েকজন ভদ্রলোক অর্থানুকূল্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। ভোলানাথ দত্ত কোম্পানির শ্রীরঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স, এই কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দিনে বিশেষ তৎপরতার সহিত প্রয়োজনীয় কাগজ সরবরাহ করিয়াছেন, সেজন্য তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। আমরা শীঘ্রই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশে তৎপর হইব।

পরিশেষে, উপোদ্‌ঘাতের শ্লোকগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণসূত্র দেওয়া যাইতেছে—

প্রথমেই শ্রীগুরুরহস্যপ্রকাশিকা শ্লোকাবলী—শ্রীশ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকম্। তৎপরে—

১। স্বরূপ তিন বা Triune সৎ-চিৎ-আনন্দ।

২। সাধন তিন—

(i) হংসবতী ঋক্ (ii) গায়ত্রী ঋক্ (iii) মধুমতী ঋক্

অথবা

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

৩। প্রাণরূপে Triune অভিব্যক্ত—ইহা প্রকাশ ও আকাশের মিলনকেন্দ্র বা মিথুনভাব, আবিঃ ও নাদের মিলিত রূপ, জ্ঞান ও গতির সন্ধি।

৪। ইহা হইতে প্রাণ, কাল, বায়ু—অগ্নি, সলিল, ধরিত্রী—এই তিন তিন বিভাগ।

৫। তিন হইতে পাঁচ—হংযংআদি প্রাণের ধারা বা হংসের সঞ্চরমাণতা।

৬। ছন্দের বা গায়ত্রীর ধারা—মীনশক্তি, কূর্মশক্তি, বারাহীশক্তি, নারসিংহীশক্তি।

তাহার পর পঞ্চধারা বা পঞ্চগঙ্গা—ওঁকারে এই পঞ্চের মিলন।

৭। পঞ্চশুদ্ধি ও ত্রিমল—অণু, তনু ও পৃথু। এই ত্রিমল শুদ্ধ হয় প্রণবজপে। এই প্রণবের মধ্যেই পঞ্চগঙ্গা ও পঞ্চগব্য—একের দ্বারা বাক্‌শুদ্ধি, অপর দ্বারা তনুশুদ্ধি। শুদ্ধি হইল স্বচ্ছন্দতা ও স্বাভাবিকতা।

৮। ছন্দ দুই প্রকার—অরিচ্ছন্দ, মিত্রচ্ছন্দ। এই মিত্র ও মধুচ্ছন্দের সাহায্যে বিরূপতা নিবারণ ও একরূপতা স্থাপন।

৯। ঘনীভূত কেন্দ্রীভূত ছন্দই হইল **প্রণব**, সুতরাং **প্রণব** আশ্রয়েই সাধন।

১০। প্রণবরূপ ঈশ্বরের আশ্রয়ে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধিকে বিকাশ করিয়া তাঁহার শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী মূর্তি দর্শন করিতে হইবে।

১১। সেইরূপ তাঁর প্রসন্না বরদা শক্তির মূর্তি যে কালীতারাদি তাহাও দর্শন করিতে হইবে এবং তাঁর **মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী**—এই রূপত্রয়ের সঙ্গেও পরিচয় করিতে হইবে।

১২। তেমনি তিনি আবার একদিকে **মৃত্যুরূপিণী**, অপরদিকে **অমৃতস্বরূপিণী**।

১৩। ঋতচ্ছন্দে সত্য বোধ বা **প্রমা জ্ঞান**, আর মধুচ্ছন্দে **আনন্দবোধ**। বোধরূপে সত্য, অনৃতাদি সকল বোধই একরূপ হইলেও তাহাদের সত্যত্ব ও আনন্দত্ব দেয় এই ছন্দ।

১৪। উভয় ছন্দের মিলনে হয় **ভূমাবোধ**—অন্বয়মুখে ও ব্যতিরেকমুখে।

১৫। সমাবৃত্তি হইল গায়ত্রী ঋক্, মধুমতী ঋক্ ও হংসবতী ঋকের সম্মিলিত রূপ সেইজন্য **সমাবৃত্তির মন্ত্র হইল হৌং সঃ**।

১৬। **অভ্যারোহ** সমাবৃত্তি ছাড়া হয় না।

১৭। সমাবৃত্তিতেই **জানা বা দেখা ও প্রবেশ হওয়া**—এই তিনবৃত্তি থাকে। তারপর সমাবৃত্তির লক্ষ্য ও অঙ্গটাও জানা প্রয়োজন।

১৮। শুদ্ধ প্রণবে, অনাহত ধ্বনিতে বা নাদে **জপের লয়** বা শান্তভাব। ইহা সত্ত্বোদ্রেকেরই ফল। সমাবৃত্তিই নিরুপদ্রব সমতা। প্রাণমনের সংযম দ্বারা ব্যাস বিষমতা পরিহারপূর্বক সমাস-সমতায়, ওঁকারের শান্ত সমতায় স্থিতি—ইহাকেই **সমাবৃত্তি** বলিয়া জানিবে।

১৯। এই সঙ্গে সমাবৃত্তির মূর্তি হিসাবে **শ্রীগণেশ** ও তাঁর মূষিকরূপ বাহন ও আয়ুধাদি তত্ত্বও বুঝা প্রয়োজন।

২০। এই সমাবৃত্তি ছাড়া প্রত্যাবৃত্তি ও পরাবৃত্তিও বুঝা আবশ্যক এবং বৃত্তির পঞ্চ বিভাগের উপরও ধ্যান দেওয়া কর্তব্য, তবে সমাবৃত্তিটা ঠিক বুঝা যাইবে। অনুবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এই চরম পরাবৃত্তি পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটি যদ্দ্বারা সুষ্ঠুরূপে নির্বাহিত হয়, তাহাই সমাবৃত্তি।

২১। ওঁকারের দ্বারা সমাবৃত্তি বিচার—ওঁকারের কোন্ মাত্রায় কি কাজ হয় এবং

তাহা হইতে ক্রমশঃ মীন, বারাহী ও কূর্মশক্তির বিকাশ ও পরে তাহা হইতে নাদ ও বিন্দু আকারে নৃসিংহ ও বামনের উদয়।

২২। অম্ভঃ বা জল হইল অজ্ঞান বা অবিদ্যা, আর উর্বী হইতেছে তত্ত্বসমূহের ব্যক্তরূপ। ইহাই ত্রয়ী—নাদবিন্দুকলাত্মিকা, সোম-সূর্য-অগ্নিরূপা।

২৩। সৃষ্টিকল্পনা—নাসদীয় সূক্ত ও সৃষ্টিসূক্ত। আবিঃ ও রাত্রি, ঋত ও সত্য, বায়ু ও ব্যোম, গতি ও জ্ঞান, আকাশ ও প্রকাশ—ইহাদের মিলিত রূপ ওঁকার বা প্রণব হইতে সৃষ্টি। সেইরূপ **সমুদ্র ও অর্ণব**।

২৪। তারপর আসিল কাল ও সংবৎসর, সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণ। তাহা হইতে এই সূর্যকে, এই তেজোরূপ ভর্গকে কেন্দ্র করিয়া **ভুবনচক্র ও কালচক্র**। এই কাল ও কলনবৃত্তিই হইল **ঈক্ষণ**—ইহার পূর্ব পর্যন্ত অকাল বৌদ্ধ পরিণাম। এখানে **সমুদ্র ও অর্ণবে ভেদ বিভাবনীয়**।

২৫। তারপর আসিল কালের raythmic গতি cyclic গতি, শুক্ল-কৃষ্ণ গতি, ধন ও ঋণ গতি।

২৬। এই ভুবনকোষের নাভিতে সবিতা ও পূষা—ইহার **নাভি, নেমি ও অর**।

২৭। **চতুর্ব্যূহ ও ছন্দ**।

২৮। চক্রচিন্তা—তাহার **শঙ্খাবর্ত গতি**, ও Axis of Ascent.

২৯। **জপরূপী রহস্য খগ**। নারায়ণ, কৃষ্ণ ও রাম।

৩০। পঞ্চোপাসনার অঙ্গারূপে শিবতত্ত্ব, অঘোরাদি পঞ্চমূর্তির মন্ত্রবর্ণে সম্মিলিতরূপ, এবং আদিত্যতত্ত্ব।

৩১। তারা, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী ও শ্রীশ্রীকালিকাতত্ত্ব। তারা—প্রণবাদি মন্ত্রচৈতন্য-পূর্বক পরম উপলব্ধি, ছিন্নমস্তা নাদানুসন্ধান এবং মহাবাক্য ভাবনা দ্বারা, ধূমাবতী মহাব্যাহৃতি সহকারে, কালী নিখিল তত্ত্বের ব্যাকলন এবং সঙ্কলন এবং নিষ্কলন দ্বারা।

উপোদ্‌ঘাতের পর উপক্রমণী। এ অংশেরও জপের তত্ত্বাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক দুই দিকেই উপযোগিতা।

ক্রান্ত এবং শান্ত এই দুটি 'দৃষ্টি' হইতে সূচনা। আবরক-আবরণীয়, প্রকাশক-প্রকাশ্য, সঙ্কোচ-সঙ্কোচ্য, নিয়ামক-নিয়ন্তব্য, হ্লাদক-হ্লাদ্য—ইত্যাদি বিশ্বে বহমান

কয়টি ধারার অনুসরণ পূর্বক পরমতত্ত্বে পৌঁছিবার পক্ষে যে যে সূত্র ও সঙ্কেতগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হয়, সেগুলি এই উপক্রমণীতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। যথা—জপাদি সাধনে সন্ধি, সেতু এবং মেরু এই ত্রিসূত্রী। বিভিন্ন বিচিত্র ধারায় পতিত জীবের 'সমাবৃত্তি'র নিমিত্ত বুদ্ধিযোগ এবং একান্ত শরণাগতিযোগের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া এই অংশের উপসংহার।

তৎপরে মূল সূত্রাংশ এবং তাদের কারিকা। জপের লক্ষণ, ঋত এবং সত্যের লক্ষণ; ছন্দের লক্ষণ, ব্যাজ এবং বিঘ্নের লক্ষণ, ছন্দের মান্দ্যস্থানগুলি এবং সেই মান্দ্যস্থানগুলিকে মুখ্য প্রাণাগ্নিতে হবন—এই পর্যন্ত বর্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের কতিপয় সূত্রমাত্র।

এই গ্রন্থের অনুশীলনে আমাদের ভ্রান্ত ও শ্রান্ত দৃষ্টি ক্রান্ত এবং শান্ত দৃষ্টি হবার ভরসাটুকুও যদি পায় তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

দশহরা।
সম্বৎ ২০০৭

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
(অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ)

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

("Natural Name")

ঐ নাম দিয়া দুইটি বক্তৃতা সাধারণ শ্রোতৃবর্গকে উদ্দেশ করিয়া বহু বর্ষ পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল। আজ মনে হইতেছে, বক্তৃতাদুটি অনেকদিন আগেকার হইলেও বর্তমান গ্রন্থের যেটি মুখ্য প্রয়োজন তৎসাধনে কিছু সহায়তা করিতে পারে। সেই কারণে বক্তৃতাদুটি গ্রন্থের ভূমিকায় পুনর্মুদ্রিত আকারে অন্তর্নিবিষ্ট হইল। আগে যে ভাবে ছিল প্রায় সেভাবেই এখানে দেওয়া হইল। ব্যাখ্যানের প্রাঞ্জলতা, এবং সম্ভবতঃ একটুখানি সরসতাও, তাতে বজায় থাকিল মনে হয়। তবে পুরানো জিনিস নূতনের মধ্যে ঠাঁই করিয়া দিতে গেলে সব দিকে এবং সব কিছুতে মিল করিয়া দেওয়া শক্ত। পরিভাষায় এবং বিবৃতিভঙ্গীতে সেটা আর এটার মাঝে কিছু তফাৎ থাকিলেও, মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ কোনো অমিল নেই। জপবিজ্ঞানের মুখ্যতঃ মন্ত্র লইয়া কারবার। এই "মন্ত্র" বস্তুটি কি, সেটা বোঝার পক্ষে এ বক্তৃতাদু'টা কাজে লাগিতে পারে।

এখানে, এবং প্রয়োজনমত অন্যত্রও, প্রস্তাবিত আলোচনায় আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science) এর "সহযোগিতা" নেওয়া হইয়াছে। কিভাবে এবং কতদূর, তা আলোচনাক্ষেত্রেই দেখা যাইবে। জপবিজ্ঞান মুখ্যতঃ অধ্যাত্মবিজ্ঞান। বলা হইয়াছে, বাক্, প্রাণ আর মন জপকর্মের নির্বাহয়িতা। জপকর্ম এই "স্থূল" শারীরযন্ত্র এবং এটার অবস্থিতি পরিস্থিতি "অমান্য" করিয়া হয় না। সুতরাং যেটাকে "স্থূল" ভাবিতেছি, তাতেই জপের অন্ততঃ গোড়াকার "পাদটি" ন্যস্ত রহিয়াছে। এখানকার আইনকানুন জপের অন্ততঃ সেই পাদটি সম্বন্ধে অপ্রযোজ্য অথবা অপ্রাসঙ্গিক নয়। এ কথাকয়টি ভূমিকার অন্যত্র এবং মূলগ্রন্থে খোলসা করিয়া বলা হইয়াছে। জপকর্ম প্রাণপ্রযত্নবিশেষসাধ্য। এই প্রযত্নবিশেষে "সৌষ্ঠব" (symmetry, harmony) থাকা আবশ্যক। সঙ্গীতে স্বরবিন্যাসে যেমন। সৌষ্ঠব না থাকিলে জপকর্মটি সুষ্ঠুভাবে হইবে না; ফলে কর্মটি "সমর্থ" হইবে না, সিদ্ধও হইবে না। একটা দৃষ্টান্তঃ "কৃষ্ণ" এই নামটি কেহ কেহ "কৃ স্ ন" (ষ কারটি দন্ত্য স এর মত উচ্চারণ করিয়া) "গ্রহণ"

করেন দেখিতেছি। এতে সত্যই যে "অপরাধ" হয়, তা বোঝা যায় বাহ্যতঃ এই লক্ষণে যে—এরূপ অবৈধ উচ্চারণে প্রাণপ্রযত্নবিশেষসৌষ্ঠবটি নষ্ট হইতেছে। Harmonic function-এর স্থলে discordant function সৃষ্টি হইতেছে। 'ক' বর্ণের উচ্চারণ স্থান জিহ্বামূল; ঋ, ষ, ণ এই তিন বর্ণের স্থান মূর্দ্ধা। কাজেই, মূল থেকে মূর্দ্ধা পর্যন্ত সুষম, সজাতীয় তিনটি "ধারা" পাইতেছি। এতে বিষম বক্রগতা নাই। এর ভিতর 'স'-কে প্রবিষ্ট করাইলে বিষম, বিজাতীয় একটা "স্বরশেল" যেন আসিয়া প্রবিষ্ট হইল; গানে যেমনধারা বিবাদী স্বর। মূর্দ্ধা আর দন্তের মাঝে কেবলমাত্র "স্থানিক" তফাৎ নয়, "ব্যবহারিক" (functional) ভেদ বর্তমান। দন্তাভিঘাতবৃত্তিনিমিত্ত যে স্বরবৃত্তি (phonetic function or moment) উৎপন্ন হয়, সেটিকে যত্র তত্র, বিনা বিচারে, অন্য জাতীয় স্বরবৃত্তির সঙ্গে "মিত্রচ্ছন্দে" গাঁথিয়া দেওয়া চলে না। তাতে "স্বরসঙ্কর" (incompatible confusion of sounds) হবার আশঙ্কা থাকে। সমজাতীয় ধ্বনিগুলির পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা (affinity) থাকে মনে রাখিতে হইবে। ব্যাকরণে সন্ধি এবং ষত্ব-ণত্ব বিধানের মূলে অনেকস্থলেই এই যুক্তি।

তত্ত্বের দিক থেকেও "স্বরশঙ্কর" আবশ্যক, "স্বরসঙ্কর" নয়। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে সৎ = চিৎ = আনন্দ 'ক' ভাবিলে, ঐ অদ্বৈত বস্তুটি নিজ "স্বরূপশক্তি"তে ত্রিধা অভিব্যক্ত হইতেছেন—এই "হৃল্লেখা"টি মেলে ঐ "কৃষ্ণ" নামেতেই, অথবা প্রকারান্তরে, "ক্লী" এই বীজে। "ষণ" স্থলে "সন" করিলে হৃল্লেখাটি আর ঠিক মিলিল না। এইরূপ "শিবায়" স্থলে "সিবায়" উচ্চারণ অবৈধ। কেবল যে বিষম বিজাতীয় বর্ণ (পূর্বোক্ত স্বরশেল) বর্জন করিলেই হইল, এমন নয়। ধ্বনিগত (intonation সম্পর্কে) অরি-মিত্র ভেদও আছে। যেমন, বেদে প্রসিদ্ধ "ইন্দ্রশত্রু"। কোন্‌টা উদাত্ত, কোন্‌টা অনুদাত্ত ইত্যাদি বিচার প্রাসঙ্গিক। যেমন, "হরি বোল" স্থলে "বোল" এই ধ্বনি প্লুতভাবে উচ্চারিত হওয়াই প্রশস্ত। "গোবিন্দ" নামের আদ্যক্ষর সম্বন্ধেও তদ্রূপ। প্রথমটায় "নাদে" (ওঙ্কারে) পর্যবসান, এবং দ্বিতীয়টিতে নাদে উত্থান অভীপ্সিত। এ সব ছাড়াও, নাম গ্রহণের বা জপের সংখ্যাদি বিচার আছে; পুরশ্চরণ আছে, আরও কত কি আছে। এ সবের মূলে যে যুক্তি সেটা "অবৈজ্ঞানিক" নয়, হবার কথাও নয়।

জপ অথবা অন্য যে কোনো কর্ম হউক, তার সামর্থ্যসিদ্ধির (efficacy) নিমিত্ত

এই তিনের অপেক্ষা রাখে—(১) বিদ্যা (correct technique), (২) শ্রদ্ধা (working belief and interest থেকে সুরু করিয়া), এবং উপনিষৎ (রহস্যজ্ঞান—grasp of basic principles)। বিদ্যাটির জন্য "বিজ্ঞানসম্মত" অভিজ্ঞ উপদেশ মেলা চাই এবং সে বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞান (জড়, প্রাণ ও মন বিষয়ে) এর কোনোই "ধার" ধারিবে না—এ বায়না একান্তই অচল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের বৈজাত্যও নেই; কোনো বিজ্ঞানই অন্ত্যজ নয়, অব্যবহার্য বা অস্পৃশ্য নয়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানই অবশ্য পূর্ণ বিজ্ঞান হবার যোগ্যতাসম্পন্ন। স্থূলের ক্ষেত্রে সমন্বয়, সামঞ্জস্য সাধন করিয়াই তাকে পূর্ণতা লাভ করিতে হয়। স্থূলের তথ্য এবং তত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াই তাদের সমাধান সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ করার যত্ন করিতে হয়। এ প্রয়াসে জড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান দুইএরই শ্রেয়োলাভ। ভূত-বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব অধ্রুব; অথচ তার গতি বা পদ্ধতি ক্রমেই অগ্রগা। কিন্তু তার প্রয়োগ কোথাও ভদ্র, কোথাও বা ভীষণ। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের লক্ষ্য হইবে—যেটি অধ্রুব তাকে ধ্রুবের সন্ধান মিলাইয়া দেওয়া; যেটি অগ্রগা, সেটিকে ঋতাধ্বগা করা; যেটা কখনো ভয়াল কখনো "কৃপাল" তাকে সর্বতোভদ্রভাবে পাওয়া। জপ (যে উদার অর্থে এখানে গৃহীত হইয়াছে) অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অন্তর্গত সাধন সন্দেহ নাই। তথাপি, পূর্বোক্ত বিচারে, ধ্বনি সম্বন্ধে, প্রাণপ্রযত্ন ও প্রবাহ সম্বন্ধে, এবং আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক অনেক কিছু সম্বন্ধে, জপকে ভূত-বিজ্ঞানের আইনগুলি মানিয়া চলিতে হয়। জপকারীর পক্ষে লেবরেটরির যন্ত্রপাতি সহকারে পরীক্ষায় সাক্ষাৎভাবে প্রবৃত্ত হইতে হয় না বটে (যেমন সুরশিল্পী অথবা বর্ণশিল্পীকে হয় না), কিন্তু সে পরীক্ষালব্ধ তথ্য ও তত্ত্বগুলির উপর নির্ভর করিতে হয়। তবে অবশ্য অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মার গভীর ভূমি থেকে উত্থিত শক্তিপ্রবাহেরই মুখ্যতা। "বাহিরের" যেগুলো, সেগুলো, "বাহ্য" বটে, কিন্তু ত্যাজ্য নয় অগ্রাহ্যও নয়। জীবের সত্তার সর্বস্তরেই একটা "মন্থন" আবশ্যক।

বেদে আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টি শব্দপূর্বিকা—জগৎ শব্দপ্রভব। এ শব্দ কোন্ শব্দ? আমরা কানে যে শব্দ শুনিয়া থাকি সেই শব্দ কি? আমরা কানে যে শব্দ শুনি তাহা কতকগুলি উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে। প্রথমতঃ বায়ুমণ্ডলে কোনো এক স্থান হইতে একট উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া চাই। সুস্থির জলরাশির মধ্যে একটা লোষ্ট্র ফেলিয়া দিলে যেমন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, মোটামুটি সেইরূপ। সেই

উত্তেজনা আবার তরঙ্গের মতো চারিধারে ছড়াইয়া পড়িয়া আমাদের কানে, স্নায়ুগুলিতে এবং মস্তিষ্কের কোনো কোনো কেন্দ্রে ধাক্কা না দিলে আমাদের চেতনা সাড়া দেয় না, আমরা শব্দ শুনি না। উত্তেজনা আবার অতিমৃদু বা অতিতীব্র হইলেও আমাদের শব্দ শোনা হয় না। স্পন্দনের বেগের (rate of vibration) একটা নিম্নসংখ্যা ও একটা ঊর্ধ্বসংখ্যা (lower-limit and upper-limit) আছে, এবং সেই দুইটি সীমার মধ্যের কোনো অবস্থা না থাকিলে বাতাসের ঢেউগুলি সাধারণতঃ আমাদের শব্দজ্ঞান জন্মাইবে না। অথচ, আমাদের চোখে দেখা বর্ণালি বা বর্ণগ্রামের অধঃ (infra) এবং ঊর্ধ্ব (ultra) ভূমিতে আলোক তরঙ্গের নানা গ্রামে অস্তিত্ব যেমনধারা প্রমাণিত, আমাদের কানে শোনা ধ্বনিগ্রামের "অতীত" ভূমিতে শব্দতরঙ্গের নানা গ্রামে অস্তিত্বও তেমনিধারা সিদ্ধ। বিজ্ঞানের Supersonics বা Ultrasonics পাদ এই সকল "অতীন্দ্রিয়" ধ্বনিতরঙ্গের গবেষণায় ব্যাপৃত আছে। এই সকল ধ্বনিরও আবার অঘটন-ঘটন-পাটব দেখিতেছি। যৌগিক পদার্থগুলির সংযোগ-বিয়োগে, "আণবিক কেন্দ্র" বা ব্যূহ বিদারণে, শারীরিক ও মানসিক সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণে এই সূক্ষ্মগ্রাম ধ্বনিতরঙ্গগুলির প্রভাব ক্রমশঃ অঙ্গীকৃত হইতে চলিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা কথাগুলির প্রমাণ মেলান যায়। যেমন সহজ শব্দজ্ঞানে—একটি বড় কাচের পাত্রের ভিতর বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিতেছে, আমি শুনিতেছি। যন্ত্র-সাহায্যে সেই পাত্রের বাতাস ধীরে ধীরে বাহির করিয়া যেমন ফেলা হইবে, আমি ততই শব্দ কম শুনিতে থাকিব। পাত্র প্রায় বায়ুশূন্য হইয়া আসিলে আর আমি শব্দ শুনিতে পাই না। অথচ ঘণ্টা তখনও পূর্ববৎ দুলিতেছে। আবার ধীরে ধীরে বাতাস ভিতরে পুরিয়া দেওয়া হউক; আমিও আবার ক্রমশঃ বেশি বেশি শব্দ শুনিতে পাইতেছি। অতএব বাতাস শব্দের বাহন ইহাই সাব্যস্ত হইল। অন্বয়-ব্যতিরেকে আমরা দেখিলাম যে ঘণ্টা-সঞ্চালন-সঞ্জাত স্পন্দনগুলি বাতাস বহিয়া আনিয়া আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারে পৌঁছাইয়া না দিলে আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাই না। শুধু দ্বারে পৌঁছাইয়া দিলেই তার খালাস নাই। শ্রবণযন্ত্র, স্নায়ুসূত্রসমূহ এবং মস্তিষ্কের অনুভূতিকেন্দ্র-গুচ্ছ-বিশেষ রীতিমত-ভাবে ধাক্কা দিতে না পারিলে আমার শব্দজ্ঞান হয় না। ইহাও পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার, এ সকল উপাদান ও নিমিত্ত ছাড়া আরও একটা জিনিষের অপেক্ষা রহিয়াছে—সেটা অল্প বিস্তর মনঃসংযোগ।

একটার তোপে যেদিন আমার ঘড়ি মিলাইতে হইবে সেদিন আমায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতে হয়। ইহা হইল ইচ্ছাকৃত-মনঃসংযোগ। অন্ধকারে কুটীরের গবাক্ষে বসিয়া শ্রাবণের বর্ষার সুরের মূর্চ্ছনা ও লয়গুলি শুনিতেছি এবং প্রথামত 'বাতায়নিকের কথা'ই ভাবিতেছি, এমন সময়ে চপলা ঘনীভূত অন্ধকাররাশি 'শকলানি' করিয়া দিয়া চমকিল, এবং একটু পরেই গুরুগম্ভীর মেঘমল্লারের একটা ছন্দঃ বিপুল উচ্ছ্বাসে নামিয়া আসিয়া বর্ষার সকল কোমল সুরগুলিকে মগ্ন করিয়া দিল। সকল ভাবনার মধ্য হইতে জাগিয়া আমার এ শব্দ শুনিতেই হইয়াছে। ইহা হইল অনিচ্ছাকৃত-মনঃসংযোগ। এস্থলে ধাক্কা এতই প্রবল যে আমায় শুনিতেই হয়। কিন্তু চাহিয়া দেখি এই অমাবস্যায়, 'ঘোর বাদরে' আমার কুটীরে যিনি আজ অতিথি, তাঁহার নাসাগর্জন পূর্ববৎই চলিতেছে। ধাক্কা তাঁহাকে জাগাইতে পারে নাই। তাঁহার মনঃসংযোগ হয় নাই। অতএব শুধু বাহিরে বাতাসের স্পন্দনই যথেষ্ট নয়, আরও অনেক উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা রহিয়াছে।

একটা ধাতুপাত্রে বাড়ি দিলাম। ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। ক্রমশঃ কিন্তু শব্দটা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া চলিয়াছে। শেষকালে আর কিছুই আমি শুনিতে পাইতেছি না। ধাতুপাত্রের কণিকাগুলি কিন্তু তখনও প্রহারের বেদনা ভুলিতে পারে নাই; তাহারা তখনও কাঁপিতেছে। কিন্তু কাঁপিলে কি হয়, সে কম্পন এত মৃদু, যে তজ্জনিত বাতাসের কম্পন আমার অনুভূতি জাগাইতে পারে না। কম্পন বেগের একটা নিম্নসংখ্যা আছে যার নীচে নামিয়া গেলে সাধারণতঃ আর আমরা শুনিতে পাই না। কিন্তু শুনিতে পাই না বলিয়া কম্পন বা স্পন্দনও যে থামিয়া গিয়াছে এমন নহে। কোনো একটা স্পন্দনের বেগ পূর্বোক্ত অধঃসীমা (lower limit) ছাড়াইয়া উঠিলে তবে সাধারণতঃ আমাদের শোনার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এ ছাড়া কানের ও মস্তিষ্কের রীতিমত উত্তেজনা চাই এবং অল্পবিস্তর মনঃসংযোগ চাই। সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সোজা কথায়, এক ক্ষণের মধ্যে অন্ততঃ বারকতক বায়ুকণিকাগুলির স্পন্দন না হইলে আমরা শুনি না। যেমন একটা অধঃসীমা আছে, তেমনি একটা উর্দ্ধসীমাও (upper limit) আছে; এক ক্ষণের মধ্যে স্পন্দন কয়েক সহস্রের চেয়ে বেশি দ্রুত হইলে হয়তো আমরা শুনিতে পাইব না। এই দুইটা সীমার মধ্যে অবশ্য নানান থাক, সুতরাং শব্দের নানান পরদা, নানান বৈচিত্র্য। ঐ দুই সীমার মধ্যে কোনো একটা বিশিষ্ট

বায়ুস্পন্দনের ফল একটা বিশিষ্ট শব্দজ্ঞান। কোকিলের ডাক বাহিরে একপ্রকার বায়ুস্পন্দন; কাকের ডাক আর এক প্রকার।

আমাদের শব্দজ্ঞানের মোটামুটি-বিবৃতি এইরূপ। আপাততঃ আর বেশি তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। শব্দের এই বিবরণ হইতে একটা কথা পরিষ্কার হইল যে, এইরূপ শব্দ সৃষ্টির মূল বা জগতের আদি বলিয়া মনে করা চলিতে পারে না। এইরূপ শব্দের জন্য বায়ুস্পন্দন দরকার, কিন্তু গোড়ায় বায়ু কোথায়? ইহার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক চাই, কিন্তু গোড়ায় সেগুলি আছে কি? মনঃসংযোগ, শব্দসংস্কার প্রভৃতি অপরাপর নিমিত্তেরও অপেক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু জগতের যখন সবে আরম্ভ, তখন এগুলিই বা পাইতেছি কোথায়? আমরা যেটাকে শব্দ বলিয়া অনুভব করিতেছি সেটা সৃষ্টিপ্রবাহের মূলে ছিল না, পরে দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন কারণের সহকারিতায় এবং বিবিধ অবস্থার যোগাযোগে পরে বিকাশ পাইয়াছে। সৃষ্টির প্রথম উপক্রম যাহা হইতে তাহাকে যদি 'প্রাথমিকস্পন্দ' (primordial causal movement) এই নাম আমরা দিই, তবে আমরা যেটাকে শব্দ বলিতেছি সেটা প্রাথমিক স্পন্দ নহে। সেই প্রাথমিক স্পন্দের মূল উৎস হইতে নানা দিকে নানা ভাবে অভিব্যক্তি হইয়াছে ও হইতেছে—নানা ধারায় সৃষ্টির প্রবাহ হইতেছে। এই ধারাগুলিকে 'কার্যাভিব্যক্তি-ধারা' (lines or streams of effectual manifestation) বলা চলিতে পারে। আমরা যে সকল রূপ দেখিতেছি, শব্দ শুনিতেছি, রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব করিতেছি, সুখ দুঃখের বেদনা পাইতেছি—সে সকল এইরূপ একটা একটা অভিব্যক্তির ধারা। মূল উৎসে যাহা রহিয়াছে তাহা রূপ, শব্দ, রস প্রভৃতি নহে, তাহাদের করণ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতিও নহে, তাহাদের গ্রহীতা মন বা বুদ্ধিও নহে; তাহা প্রাথমিক স্পন্দ মাত্র।

সৃষ্টির গোড়ার কথা অথবা শেষের কথা এখন আমরা আলোচনা করিব না। সৃষ্টির কি কোনো আদি আছে ও অন্ত আছে, অথবা তাহা অনাদি ও অনন্ত—এ সমস্যারও সমাধানের প্রয়াস আমরা আপাততঃ করিব না। বোধ হয় এ সমস্যার সন্তোষজনক কোনো সমাধান নাই-ও। সৃষ্টি ও লয়ের কথা বাদ দিলে 'প্রাথমিক স্পন্দ'কে শুধুই 'স্পন্দ' বলিতে হয়। আপাততঃ ইহা বলিয়া কাজ নাই যে, কোনো একপ্রকার জাগতিক-সুষুপ্তির পর এই জাগতিক-জাগরণ, কোনো একটা মহামৌনের পর এই বিশ্বকলরব, কোনো একরূপ সাম্যাবস্থার পর এই বিচিত্র বৈষম্যের উন্মেষ।

সোজাসুজি ভাবে বুঝিতে গেলেও আমাদের সকল প্রকার জানার (experience) মূলে যে ব্যাপারটা রহিয়াছে, সেটা স্পন্দ বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। আমাদের রূপজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রভৃতি সকল জানা ব্যাপারের গোড়ার কথা স্পন্দ—চাঞ্চল্য (stressing)। ঈথারে কোনো স্থানে একটা চাঞ্চল্য জন্মিল। সেটা তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া আসিয়া আমার চক্ষু ও মস্তিষ্ককে চঞ্চল করিয়া দিল; এই চাঞ্চল্যের (stress) আমার চেতনায় যে প্রকাশ বা অভিব্যক্তি (resultant manifestation), তাহাই তো আমার বস্তুর রূপজ্ঞান। আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি সকল রকম অভিব্যক্তি সম্বন্ধেই এই বিবরণ খাটে। কোনো একটি দ্রব্যের অণুগুলি অস্থির হইয়া কাঁপিতেছে; ঈথার বা তজ্জাতীয় কোনো একটা অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম বাহন (medium) সে কম্পন বহন করিয়া আনিয়া আমার স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দিল; এই উত্তেজনার যে চেতনায় সাড়া (response), তাহাই তো আমার তাপের অনুভব। বাগবাজারের রসগোল্লা মুখে ফেলিয়া দিলাম; রসের সঙ্গে মুখামৃতের রাসায়নিক সংযোগ হইল; সেই রাসায়নিক ক্রিয়া দেখিতে গেলে শক্তির আদান প্রদান; তলাইয়া দেখিলে তাহা স্পন্দেরই ব্যাপার। রসনার স্নায়ুগুলি সেই শক্তির খেলায় চঞ্চল হইল। চেতনায় ইহারই যে ছাপ তাহাই আমার রসগোল্লার রসাস্বাদ। বাহন ঈথারই হউক, আর বায়ুই হউক, অথবা আর যাহাই হউক, তাহা লইয়া মারামারি করিয়া লাভ নাই। সকল প্রকার অনুভূতির উৎপত্তি যে চাঞ্চল্যে (stir, agitationএ) সে পক্ষে আমরা সন্দেহ না রাখিলেও পারি।

অনুভূতি বা প্রত্যয়ের দিক হইতে দেখিতে গেলে যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে, অর্থ বা বিষয়ের দিক হইতেও সেই সিদ্ধান্তই আমরা পাই। কেমন করিয়া জানিতেছি শুনিতেছি, সে কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাক; জিনিষটা বস্তুতঃ কি? দৃষ্টান্তের জন্য অপর আর একটা বাগবাজারের রসগোল্লা অদৃষ্টে যদি নিতান্ত নাই-ই জুটে, তবে না হয় এই নীরস খড়ির টুকরাটি লইয়াই অগত্যা নাড়া চাড়া করা যাক। দেখিতে এই খড়িটা বেশ জমাট বাঁধা একটা জিনিষ; কিন্তু এখনি আমি ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারি। এই চূর্ণগুলি আবার আরও সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইতে পারে; রাসায়নিক বিদ্যা যাহাকে পরমাণু বলে সেইখানে গিয়া এইরূপ বিভাগের আপাততঃ বিরাম। কিন্তু আপাততঃ বিরাম, বস্তুতঃ নহে। কারণ, রাসায়নিক অণু

পরমাণুগুলিও যৌগিক-দ্রব্য, তাহাদের গঠন প্রণালী জটিল। যে সূক্ষ্মতর উপাদানে সেগুলি গঠিত, সেগুলিকে বিজ্ঞান ইলেকট্রন (electron) ইত্যাদি বলিতেছে; এগুলি তড়িতের অণু; ইহাদেরও মাপ পরিমাণ আছে, কিন্তু তাহা রাসায়নিক অণু (atoms) গুলির মাপের তুলনায় ঢের কম। একটা অণুর গঠন ব্যবস্থাও আবার কত জটিল, কত অদ্ভুত! এক একটা অণুকে এক একটা বালখিল্য সৌরজগৎ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সৌরজগতে যেমন গ্রহ-উপগ্রহগুলি নিজ নিজ নির্দিষ্ট পথে একটা কেন্দ্রের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আণবিক জগতে (atomic world) ও অনেকটা সেইরূপ। অণুতে পৌঁছিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম এইখানে বুঝি গতির বিশ্রাম, ছুটাছুটির শেষ; বাহিরে অণু যতই চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়াক না কেন, তার ভিতরটা সুস্থির। এই খড়িটার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশগুলি নিয়ত দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে—আমরা চর্মচক্ষে দেখিতে না পাইলেও হইতেছে। অণুগুলিতে পৌঁছিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এগুলি পরস্পরের সম্পর্কে যতই চঞ্চল হউক না কেন, নিজের-নিজের ভিতরে সুস্থির। কিন্তু ইলেক্ট্রনের গোষ্ঠী দেখা দিয়া আমাদের সে আশা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যেগুলিকে অণু বলিতেছি সেগুলিও যে এক একটা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড, এক-একটা জগৎ। স্থূল জগতে যেরূপ সঞ্চলন আবর্তন, কম্পন স্পন্দন চলিতেছে, অণুর ভিতরকার জগতেও সেইরূপ। এ চলা-ফেরার বিশ্রান্তি কোথায়? সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে ক্রমশঃ নামিয়া গিয়া কোথায় আবিষ্কার করিব একটা ধ্রুবলোক, একটা অচলায়তন? ইলেক্ট্রনে কি? ইলেক্ট্রনগুলি বাহিরে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্কে, বড়ই অশান্ত, চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে; সময়ে সময়ে তাদের গতি এতই ভীষণ হয় যে তাহা আলোক-তরঙ্গের-গতির কাছাকাছি আসিয়া থাকে—অর্থাৎ এক সেকেন্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল। ইহাই হইল বাহিরের ব্যাপার। ইলেক্ট্রনের ভিতরটা কিরূপ? ইলেক্ট্রনের ভিতরের কথা ভাবিতে কিছুদিন আগেও বিজ্ঞান সাহস পায় নাই; তাড়িত-অণুতে ব্রহ্মের 'অণো রণীয়ান্' মূর্তির যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতে আমাদের কল্পনাশক্তি মুগ্ধ স্তম্ভিত হইয়াছিল; আরও সূক্ষ্ম, আরও ছোট ভাবিবার মত অবস্থা তখনও আমাদের হয় নাই। কিন্তু সত্যসত্যই ইলেক্ট্রনকে অণুত্বের পরাকাষ্ঠা (absolute limit) মনে করা চলিতে পারে কি? ঊর্মিবিজ্ঞান (Wave Mechanics) ইলেক্ট্রনেরও 'হৃল্লেখা' (inner pattern) দেখিতে প্রয়াস

পাইয়াছে। ইলেক্ট্রনও তো সাবয়ব-দ্রব্য এবং তাহার একটা মাপও আছে; সুতরাং তার চেয়েও ছোট অংশ থাকারই সম্ভব; তাহারও কোনো একরকম 'কলা' এবং 'বর্ণ' (partial and element) থাকারই কথা। যদি থাকে, তবে তাহারাও কি অস্থির, চঞ্চল নহে? এক একটা ইলেক্ট্রনকে এক একটা ঈথারের আবর্ত ভাবিব কি? যদি তাহাই হয়, তবে ঈথারের সেই সূক্ষ্মতম অবয়বগুলি (ether-elements) তো চঞ্চল হইয়া পাক দিতেছে। পুনশ্চ, ঈথারই বা কি এবং তাহার সূক্ষ্ম অবয়বগুলিই বা কি এ সমস্যায় গণিত পরাভব স্বীকার না করিলেও আমাদের কল্পনা ভয়ে নিরস্ত হইয়া আসে। অথবা 'অবাস্তব' ঈথারকে বাদ দিয়া বিজ্ঞানের নূতন 'কাঠামো' (আপেক্ষিকতাবাদ ইত্যাদি) ধরিলে গণাগাথার অনাবশ্যক 'জঞ্জাল' অনেক পরিমাণে দূর হয় বটে, কিন্তু তাতে জগতের একটা সরল 'চিত্র' অবশ্য মিলে.না। এই ধর না কেন 'সম্ভাব্যতা-উর্মিগুচ্ছ' দ্বারা বুঝিতে চাহিলে গণাগাথার যতই সুরাহা হৌক, কল্পনার দিক থেকে কিছু আসান হইল কি? অবশ্য, জগতের যেটি হৃল্লেখা (মূল কাঠামো) সেটি একটা 'কল্পনাযোগ্য' চিত্র হইতে হইবে—এ ধারণা বিজ্ঞান প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছে, অণুর ক্ষেত্রেও বটে, বিপুলের ক্ষেত্রেও বটে। এ বিজ্ঞানের বাতিক—সব কিছু হিসাব মাফিক, হিসাব দুরস্ত রাখিতে হইবে। কিন্তু এ সাধেও বাদ—গোড়ায় হিসাবকে ঠকিয়া আসিতে হইতেছে—মানিতে হইতেছে অনিশ্চিত সম্ভাবনামাত্রকে।

গণিতের কল্পনা বস্তুতন্ত্রতার নাগপাশে বন্ধ নয়; গণিত ঈথারকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া যে সকল সূক্ষ্মতর অবয়ব (elements) তৈয়ার করিয়া লইয়াছে, এবং যেগুলির সাহায্যে জগতের চলাফেরা ব্যাপারের একটা ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস পাইতেছিল, সেগুলিকে গণিতের পরিভাষা (mathematical concepts)-র ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব, অথবা বাস্তব বলিয়া মনে করিব—এ সম্বন্ধে আপাততঃ বিতণ্ডা করিয়া লাভ নাই। সোজা কথায়, সূক্ষ্মের মধ্যে খুঁজিতে গিয়া আমরা শেষ পর্য্যন্ত সেই ঘোরাফেরা, দোলাকাঁপাই পাইলাম। সূক্ষ্মের দিক দিয়া দেখিতে গিয়া পাইলাম স্পন্দ, চাঞ্চল্য। জগতে এমন কিছু ছোট নাই যার ভিতরে ও বাহিরে ছুটাছুটি নাই। যে চলিতেছে সেই জগৎ; অণুও চলিতেছে, সুতরাং অণুও জগৎ; ইলেক্ট্রনও চলিতেছে, সুতরাং সেও জগৎ; ব্যোমাংশ (ether-elements) গুলিও চলিতেছে,

সুতরাং তারাও জগৎ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের গোড়ার কথা ও মর্ম্মের কথা এই চলাফেরা ব্যাপার! এই চলাফেরার নাম দিয়েছি স্পন্দ—ইহাকে সঞ্চলন (translation)-ই বল, আর আবর্তন (rotation)-ই বল, অথবা ইহাদের বিবিধ সংমিশ্রণই বল। ছোটর দিক হইতে যে কথাটা পাইলাম, বড়র দিক হইতেও সেই কথাটাই পাই। আমাদের বসুন্ধরা চঞ্চলা; আমাদের সবিতা চঞ্চল; আমাদের ধ্রুবলোকও চঞ্চল। কেহ বা বেশি, কেহ বা কম। বিশ্ব বর্দ্ধিষ্ণু। যাহাকে স্থির ভাবিতেছি সে কেবল মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলেই স্থির, বস্তুতঃ নহে। কোনো স্থানেই বিশ্রান্তি ঐকান্তিক নহে, কোথাও নিরতিশয় ভাবে সুস্থিরতা (absolute rest) নাই। ব্রহ্মের যে 'মহতো মহীয়ান্' মূর্তি সেও যে মহানটরাজের মূর্তি, শান্ত সমাহিত মূর্তি নহে। জগতের সংহারের ভার যে ঠাকুরটির উপর, তাঁর ভাঙের নেশা করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য করার একটা বাতিক আছে শুনিয়াছি; কিন্তু যে দেবতা আধারকমলে বসিয়া শব্দব্রহ্মরূপে এই নিখিল সৃষ্টিটাকে—বেদ ও বেদ্য উভয়কেই—'নিঃশ্বসিত' করিতেছেন, তাঁর 'জ্ঞানময়ং তপঃ' শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বা বিশ্বাত্মার সমাধির শান্ত, মগ্ন ভাবই এ সৃষ্টির গোড়ার কথা; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সে তো বাহিরকে গুটাইয়া আনিয়া ভিতরে আত্মস্থ করিবার সমাধি নয়, সে যে ভিতরের বাহিরে নিজেকে ছড়াইয়া দিবার বিপুল প্রয়াস, বিরাট আয়োজন; সে যে একেবারে বহু হইবার জন্য গভীর প্রসব-চাঞ্চল্য! তাই সৃষ্টিকর্তার অক্ষয়সূত্র, কমণ্ডলু প্রভৃতি তপস্যার অত আয়োজন দেখিয়া সৃষ্টির গোড়ার কথাটা যেন ভুলিয়া না যাই। আর যে দেবতাটি এই 'আজব কারখানা" তদারক করার ভার লইয়াছেন, তাঁর হাতে নিয়ত চলিষ্ণু চক্রটার পানে তাকাইলে আর আমাদের ভুল হইবে না, কেমন করিয়া ও কিসের জোরে এতবড় কারখানাটা চলিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, চলাই জগতের গোড়ায়, চলাই জগতের মাঝে এবং চলাই জগতের শেষে।

জগতে সবই চলিতেছে, কিন্তু অচল কি কিছুই নাই? অচলের সঙ্গে না মিলাইলে কি সচলকে সচল বলিয়া ধরা যায়? চলিতেছি যে, ইহা বুঝিতে ও মনে করিতে কোনো কিছু একটা অচলায়তন আমাদের ঠিক করিয়া লইতে হয়। সকল সচলকে বুকে ধরিয়া নিজে অচল রহিয়াছে এমন কোনো ভূমি বা আয়তন আছে (absolute frame of reference) কি? যদি থাকে, তবে সেটা কি? বেদ যাহাকে

অক্ষর পরম বলিয়াছেন তাহাই কি? অথবা অপর কিছু? এ প্রশ্নেরও আপাততঃ জবাব দিবার চেষ্টা করিব না। তবে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে শ্রুতি বা আর্যবিজ্ঞান এই বিপুল-চঞ্চল জগৎটাকে একটা শাশ্বত, সুস্থির ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন; সুতরাং এ হিসাবে আমাদের অনুভূতির অচল (quiescent), সচল (stressing) এই দুইটা দিক রহিয়াছে। এই দুইটা দিক জড়াইয়া লইয়া তত্ত্ব (Fact); একটা দিক বাদ দিয়া অপর দিকটা লইলে তত্ত্বের ভগ্নাংশ মাত্র আমরা পাই (Fact-section। তবে আপাততঃ এ কথার এই পর্যন্তই।

অপিচ, স্পন্দ বলিতে শুধু জড়ের চলাফেরাই যেন না বুঝি। জড় মানে এস্থলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত দ্রব্য। (matter)। গ্রহ নক্ষত্রগুলি ছুটিতেছে, ঈথারে বা আকাশে অণুগুলি, ইলেকট্রনগুলি দৌড়াইতেছে—এ সমস্ত চলাফেরা জড়ের চলাফেরা (motion)। কিন্তু বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়ার পর মনে এক ঘটি জল খাইবার ইচ্ছা হইল; মন একটা অবস্থা হইতে আর একটা অবস্থায় পরিণত হইতেছে; মনের যে এই প্রকার পরিণতি (becoming) তাহা তো রসগোল্লার হাত হইতে মুখবিবরে আসার মত ঠিক নহে; মন একদেশ হইতে অপরদেশে ঠিক যাইতেছে না; ইহা ঠিক দৈশিক বা স্থানিক পরিবর্তন (change of configuration) নহে। বালকের মন দ্বিতীয় ভাগের 'ঐক্য বাক্য মাণিক্য' ছাড়িয়া রাস্তায় যে লাটিম ঘুরিতেছে বা আকাশে যে ঘুড়ি উড়িতেছে তার দিকে গেল; এ যাওয়া কিন্তু গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের সন্নিধানে বসিয়াই হইতেছে। জড়দ্রব্যের মত মনেরও চলাফেরা হয় কি না, সে কথার এখানে আলোচনা করায় লাভ নাই। ভাবের বহিঃসঞ্চার (thought-transference) যথার্থ হইতেও পারে, তবে এখানে আমরা যে পার্থক্যের কথা বলিতেছি তাহা স্মরণ রাখাই ভাল। জড় মানে যদি দৃশ্য বা জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রই হয়, তবে স্পন্দ বা চাঞ্চল্য জড়েরই ধর্ম, চৈতন্যের নয়, এ কথা বলিতে পারা যায়। কিন্তু জড় মানে যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়দ্রব্য হয়, তবে 'স্পন্দ' শব্দটাকে শুধু জড়েতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না; জগতের গোড়ার কথা যে স্পন্দ তাহা শুধু জড়েরই স্পন্দ নহে। জগতের গোড়ায় একটা বিরাট নীহার-সমুদ্রের (nebulae) কণিকাগুলি কাঁপিতেছিল, ছুটিতেছিল, তা ছাড়া আর কিছুই ছিল না—শুধু ইহা আমরা বলিতেছি না। আমরা অমনধারা জড়বাদী হইতে বাধ্য নই।

এই স্পন্দ, চাঞ্চল্য অথবা বিক্ষোভই শব্দ, যে শব্দ হইতে জগৎ চলিয়াছে। আমরা সচরাচর যাহাকে শব্দ বলি তাহা এই মৌলিক ও বিশ্বপ্রসূ বাকেরই এক প্রকার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি (one stream of effectual manifestation)। এই প্রকার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি হইতে হইলে যে সমস্ত উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা থাকে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। মৌলিক, স্পন্দাত্মক শব্দের নাম দেওয়া হউক পরশব্দ; আর যে শব্দ আমরা বা আমাদের মত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবেরা কানে শুনিতেছি, সেটার নাম দেওয়া হউক অপরশব্দ, অথবা শুধুই শব্দ। পরশব্দ হেতুভূত, অপর শব্দ কার্যভূত; পরশব্দ বা চাঞ্চল্য হইতেছে বলিয়াই আমরা শব্দ শুনিতেছি—ট্রামের ঘণ্টার রেণুগুলি কাঁপিতেছে, বাতাসকে কাঁপাইতেছে এবং আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে কাঁপাইতেছে বলিয়াই আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছি। অপরশব্দ অভিব্যক্ত শব্দ; কতকগুলি সহকারী কারণ ও অবস্থার যোগাযোগ হইলে তবে পরশব্দ অপরশব্দরূপে অভিব্যক্ত হইবে, নতুবা হইবে না। কিন্তু সেরূপ ভাবে অভিব্যক্ত হউক আর নাই হউক, পরশব্দের পরশব্দত্ব তাহাতে ব্যাহত হয় না। হিমালয়ের কোন জন-সম্পর্ক-শূন্য এক স্থানে একটা জলপ্রপাত শিলার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে পর্বতমালাকে হয়ত চির-সজাগ করিয়া রাখিয়াছে; এ ক্ষেত্রে জলকণিকাগুলির কম্পন, বাতাসের কম্পন প্রভৃতিতে সচলতার, স্পন্দনের আয়োজন খুবই প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু শুনিবার কান যদি সেখানে না থাকে তবে সে বিপুল চাঞ্চল্য ভৈরবগর্জনরূপে আর নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে পারে না। এ স্থলে পরশব্দ রহিয়াছে কিন্তু অপরশব্দ বা শ্রাব্যশব্দ নাই। বাতাস, শ্রবণেন্দ্রিয়, মনঃসংযোগ প্রভৃতি নিমিত্ত বা সহকারী কারণ না পাইলে পরশব্দ শুধু চাঞ্চল্যরূপেই থাকিয়া যায়, শ্রবণগ্রাহ্য-শব্দরূপে উপস্থিত হয় না। চন্দ্রমণ্ডলে নাকি বায়ু নাই; অগ্ন্যুৎপাতে চন্দ্রমণ্ডলের কোন অংশ ভীষণ ভাবে ফাটিয়া গেল; আমাদের পৃথিবীর অথবা মঙ্গলগ্রহের কোন বৈজ্ঞানিক কান খাড়া করিয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কারণ, শব্দ এতই অভিজাত ব্যক্তি যে বাহন ছাড়া এক পাও চলেন না; এ ক্ষেত্রে বাহনের, অর্থাৎ বাতাসের অভাব। এ দৃষ্টান্তেও পরশব্দ রহিয়াছে কিন্তু অপরশব্দ নাই। অতএব অপরশব্দ ও পরশব্দ এ দুটা আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। অপরশব্দ বা ধ্বনি যেখানে রহিয়াছে সেখানে পরশব্দ বা চাঞ্চল্য মূলে থাকিবেই; কিন্তু পরশব্দ থাকিলেই যে আমরা বা অপর কেহ ধ্বনি

শুনিতে পাইব, এমন কোনো ধরাবাঁধা ব্যবস্থা নাই। যেখানে শুনিতে পাই সেখানে সহকারী কারণগুলি বিদ্যমান; যেখানে পাই না, সেখানে স্পন্দ হয় ত রহিয়াছে, কিন্তু সহকারী কারণগুলি রীতিমত ভাবে নাই।

সহকারী কারণগুলি শুধু থাকিলেই হইল না, রীতিমতভাবে থাকা চাই। কারণ বা হেতুগুলির রীতিমত ভাবে থাকার নাম আমাদের দেশি পরিভাষায় যোগ্যতা। কাজেই, হেতু বা নিমিত্তগুলি রীতিমত ভাবে না থাকিলে স্পন্দ বা চাঞ্চল্য শ্রবণযোগ্য হয় না। যে পরশব্দ শ্রবণযোগ্য নয় তাহাকে এখনি অশ্রাব্য শব্দ বলিয়া ফেলিতে লোভ হইতেছিল; তবে, এই নীরস, কঠিন কথা পাড়িয়া একে আপনাদের সহিষ্ণুতার সীমা পরীক্ষা করিতে হইতেছে, তার উপর কথাগুলা যদি আবার অশ্রাব্য হয়, তবে হয় ত আপনারা কানে আঙুল দিয়া উঠিয়া পড়িবেন; সুতরাং শব্দের শ্রাব্য ও অশ্রাব্য এরূপ দ্বৈবিধ্য পরিহার করিয়া, পরশব্দ ও অপরশব্দ এইরূপ দ্বৈবিধ্য লইয়াই আমায় সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, স্পন্দ বা চাঞ্চল্য যেমন তেমন হইলে আমাদের কানে তাহা শব্দরূপে ধরা দেয় না। অণুপরমাণুগুলির চলাফেরা আমি শুনি না। চিনির ঢেলা জলে ফেলিয়া দিলাম। চিনি জলে গুলিয়া যাইতেছে। শর্করা-কণার জলে ছড়াইয়া পড়া আমি শুনিতে পাই না, যদিও সে শর্করা-মিশ্রিত-জল অপর একটা বাচাল ও সরস ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসিলে আমার যে কেবল পিপাসা মিটে এমন নহে, প্রাণটাও মিঠা হইয়া যায়। অণুর মধ্যে ইলেক্ট্রনদের একটা চঞ্চল জগৎ আছে; কিন্তু আমার কাছে সে জগতের ভাষা নাই। জীবের জীবনকোষের (cell) মধ্যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম পাক দিতেছে (rotation of protoplasm); নিদাঘ মধ্যাহ্নে বনস্থলী যখন নীরব তখন পাদপরাজির পাতায় পাতায় জৈব পদার্থের নৃত্যশব্দ একটা মহামুখরতা রচনা করিয়া রাখিত, যদি সে শব্দ শুনিবার মত কান আমাদের থাকিত; বহুদিন হইল অধ্যাপক হক্সলি আমাদের সে বিপুল জীবন সঙ্গীত শুনিতে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমাদের সাধ্য নাই। অভ্যুদয়-বাদ (Evolution theory) এর কল্যাণে আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গেলে বড় সুবিধা হইবে না, তবে শ্রবণশক্তির বিস্তার যদি বাড়িয়া যায়, তবে না হয় একদিন আচার্য মহাশয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা সবান্ধবে যাইব। ম্যাক্সওয়েলের ভূত তাপবিজ্ঞানের সমীকরণের একটা ভয়ানক শক্ত আঁক কষিয়া ফেলিয়াছে; এবং

চঞ্চল জগতের অণুগুলিকে লইয়া দুইটা কামরায় আপন হিসাব মত বিলি করিয়া যাইতেছে; আমাদের সতর্কদৃষ্টি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঁচিয়া থাকিতে সেই বৈজ্ঞানিক ভূতটার সঙ্গে আমাদের মোলাকাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। ভরসা করি, যেদিন বৈজয়ন্তধাম হইতে রথ নামিয়া আসিয়া আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশ্বোত্তীর্ণ পদবীতে, সত্যলোকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেদিন তাঁহার আত্মা অব্যাহত, অনাবিল দৃষ্টিতে সেই ভূতটার হিসাবের খাতাখানাই যে বেশ করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন এমন নহে, তার এলাকাভুক্ত চঞ্চল জগৎটাকে বাঙ্ময় জগৎ, শব্দময় জগৎ রূপেও চিনিয়া গিয়াছেন। আমাদের কাছে অণুর জগৎ এখন পর্যন্ত শুধুই চঞ্চল জগৎ—তাহার ভাষা নাই।

আর দৃষ্টান্ত লইয়া কাজ নাই, কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ। মনেই হউক আর জড়েই হইক, ইলেক্‌ট্রনেই হউক আর গ্রহ-উপগ্রহেই হউক, চেতনাতেই হউক আর জীবকোষেই হউক, যে কোনো প্রকার স্পন্দ বা চাঞ্চল্যকে আমরা পরশব্দ বলিব। সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই আর নাই-ই পাই। যদি পাই তবে তাহাকে অপরশব্দ বা ধ্বনি (Sound) বলিব। যে চাঞ্চল্যে হরির শব্দজ্ঞান হয় না, তাহাতে হয়ত যদুর শব্দ জ্ঞান হয়। হরির চেয়ে যদুর কান তীক্ষ্ণ। কুকুর হয়ত মানুষের চেয়ে বেশি শুনিতে পায়; যে সব ক্ষেত্রে আমাদের শব্দানুভূতি নাই সেখানে হয়ত তার আছে। কুকুরের চেয়ে বেশি শুনিতে পায় এমন জীবও থাকিতে পারে। যন্ত্র সাহায্যে (megaphone, microphone প্রভৃতি) পিপীলিকার পাদসঞ্চারও হয়ত আমরা শুনিতে পারি। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলং'—সুতরাং যিনি যন্ত্র সাহায্যে সূক্ষ্মশব্দ শুনিতেছেন তিনি যোগী। যোগী অন্যপ্রকারও হইতে পারেন। হিন্দুদের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান যদি সত্য হয় তবে যে কোন ব্যক্তি সংযম প্রক্রিয়া (অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি) দ্বারা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শব্দও শুনিতে পারেন। চাই কি—অণু-পরমাণু, ইলেক্‌ট্রনদের চঞ্চলচরণে ছুটাছুটি তাঁর কাছে ভাষাহীন, নীরব না হইতে পারে। তবেই শ্রবণ-সামর্থ্য (capacity of hearing) আপেক্ষিক (relative), তারতম্য-বিশিষ্ট (variable) এবং অবস্থাধীন (conditional) হইতেছে। এ যোগ্যতা দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা করে। তুমি আমি সচরাচর যে শব্দ শুনি তাহাকে স্থূলশব্দ বলা যাক। যন্ত্র সাহায্যে যে শব্দ শোনা যায় বা যোগী যে শব্দ শুনিতে পান তাহাকে সূক্ষ্ম (subtle) শব্দ বলা যাক। কিন্তু সব যন্ত্র

এক রকম নয়, সকল যোগীর অনুভব-সামর্থ্য তুল্যমূল্য নয়; সুতরাং সূক্ষ্মশব্দেরও নানান থাক (gradations) অবশ্যই হইবে। বৈজ্ঞানিক বা যোগীও শব্দকে ঠিকভাবে বা পূরাপূরি (perfectly ও unconditionally) শুনিতে পান না; কারণ তাঁরও শ্রবণসামর্থ্য যে আপেক্ষিক ও অবস্থাধীন। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে—কোনও অবস্থায় শব্দের ঠিকভাবে, নিরতিশয়রূপে শোনা আছে কি? এমন কোনও শ্রবণসামর্থ্য আছে কি যাহা সম্পূর্ণ ও নিরতিশয় (perfect ও absolute)? সত্যসত্যই আছে কিনা কে বলবে, তবে গণিতশাস্ত্রের নজিরে ধরিয়া লওয়া হউক যে সেরূপ একটা অনুভব-সামর্থ্য আছে—এমন একটা জ্ঞানভূমি আছে যেখানে অন্য কোনও উপাদান বা নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াই আত্মা স্পন্দমাত্রকে শব্দরূপে যথাযথ ধরিতে পারে। বাতাস বা ঈথার থাকুক আর নাই থাকুক, বস্তুর চাঞ্চল্য বা স্পন্দ যদি কোন চৈতন্যে যথাযথ বা নিরতিশয়ভাবে শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়, তবে শ্রবণশক্তির যে পরাকাষ্ঠা আমরা খুঁজিতেছিলাম তাহাই সেখানে পাইলাম। এই প্রকার যে শ্রবণ-সামর্থ্য তাহাকে Absolute Ear বা নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য বলিতে পারা যায়। এই পারিভাষিক শব্দটাকে যদি আমরা আক্ষরিক অনুবাদ করিতে যাই, তবে হয়ত হাস্যাস্পদ হইব। নিরপেক্ষ কর্ণ বা নিরতিশয় কর্ণ, এইরূপ একটা অদ্ভুতকথা শুনিলে আমরা কেহই সহিষ্ণু থাকিতে পারিব না। কিন্তু পরিভাষা যাহাই হউক, জিনিষটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। আমার 'কর্ণ' বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝি ইহা সেরূপ কর্ণ না হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে শব্দানুভব-সামর্থ্য কম-বেশি হইয়া থাকে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে এ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা কোথায়? কোনো ব্যক্তিবিশেষে এ সামর্থ্য নিরতিশয়ভাবে পরিসমাপ্ত হউক আর নাই হউক, 'পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ' এমন ধারা কোনও একজন 'পুরুষ' সত্যসত্যই থাকুন আর নাই থাকুন, আমরা গণিতশাস্ত্রে বা বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে যদি একটা অনুভব-সামর্থ্যের বিরামস্থান, পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়া লই, তবে তাহাতে আমাদের অজ্ঞেয়বাদী অথবা নাস্তিক বন্ধুর শিরঃসঞ্চালন করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বৃত্তের ভিতরে একটা বহুভুজ ক্ষেত্র আঁকিয়াছি; যদি ক্ষেত্রের ভুজসংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে থাকি, তবে ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃত্তের পরিমাণের ক্রমেই কাছাকাছি হইতে থাকে। এ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, বহুভুজ ক্ষেত্রটির ভুজসংখ্যা যদি অনন্ত করিয়া লওয়া যায়, তবে

তাহার চৌহদ্দী বৃত্তের সঙ্গে শেষকালে মিলিয়া যাইবে না কি? সত্যসত্যই হাতে কলমে কিন্তু কখনই দুইটিকে একান্তভাবে মিলাইয়া দেওয়া যায় না; তবে পরীক্ষার জের কল্পনা সারিয়া লইতেছে। তুমি বৈজ্ঞানিক, অণুর কথা বলিতেছ; তাহা কি তোমার সূক্ষতা ভাবনার একটা কল্পিত পরাকাষ্ঠা (conceptual limit) নহে? ইলেকট্রনের কথা বলিতেছ, তাহাও যে তোমার সংজ্ঞার (unit charge of electricity) ঠিক লক্ষ্যার্থ, এ কথা কি তুমি হলফ করিয়া বলিতে পারিবে? যে জিনিষের একটা বেশি কমি আছে, ক্রমিকধারা (series) আছে, তাহারই একটা পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়া লইবার আমাদের অধিকার আছে, এবং সেরূপ কল্পনা করিয়া লওয়ায় অনেক সময় আমাদের বোঝাপড়ায় বিশেষ সুবিধা হয়; এরূপ কল্পনা করার অধিকার না দিলে ক্যালকুলাস নামক গণিতশাস্ত্রটাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়া থাকিত। যাহা হউক, অনুভব-সামর্থ্যের নানান্ থাক্ দেখিয়া তাহার একটা পরাকাষ্ঠা আমরা কল্পনা করিতেছি, এবং সেটারই নাম দিতেছি Absolute Ear. আমাদের শোনা অল্প, এ প্রকার শোনা সমগ্র; আমাদের শোনা প্রায়িক, এ প্রকার শোনা যথার্থ; আমাদের শোনা সাপেক্ষ, এ প্রকার শোনা নিরপেক্ষ। শুধু শোনা কেন, দেখা প্রভৃতি অনুভূতির অপরাপর ধারাগুলি সম্বন্ধে আমরা এক একটা পরাকাষ্ঠা ভাবিয়া লইতে পারি; তাহা হইলে Absolute Eye, Absolute Tongue প্রভৃতিও আসিতেছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, এগুলি এক একটা শক্তি বা সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র; চোখ, কান, জিব ইত্যাদির মত স্থূল কোন দ্রব্য না হইতেও পারে।

এরূপ কর্ণকে (Absolute Ear কে) পারমার্থিক-কর্ণ বলিব কি? নাম যাহাই দেওয়া হউক, স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য। শুনিবার জন্য এই কর্ণের কেবল একটা হেতুর অপেক্ষা করিতে হয়—সেটি স্পন্দ বা চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা থাকিলেই এই কর্ণ শুনিতে পাইবে, এবং এমনভাবে শুনিতে পাইবে যে, সে শোনার চেয়ে খাঁটি ও বেশী শোনা আর কিছু হইতে পারে না। এই পারমার্থিক-কর্ণ দ্বারা যে শব্দের অনুভব হয় তাহাকে এই প্রসঙ্গে শব্দতন্মাত্র বলিতেছি। দর্শনশাস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এ ব্যাখ্যার যাথার্থ্য বিচার করিবেন। পারমার্থিক-কর্ণ দ্বারা আমরা শব্দের বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় মূর্তিটি (sound as it is) গ্রহণ করিতে পারি। ইহা যেন শব্দের প্রকৃতি; আর তুমি আমি, এমন কি বৈজ্ঞানিক ও যোগীও যে

শব্দ শুনিতেছেন, সেটা অল্পবিস্তর শব্দের বিকৃতি—এ শব্দের বেশিকমি আছে, ভুলভ্রান্তি আছে; কেহ বেশি শুনিল, কেহ কম কম শুনিল; আমি যেভাবে শুনিলাম, তুমি সেভাবে শুনিলে না; আমি ভুল শুনিলাম, তুমি কতকটা ঠিক শুনিয়াছ; আমি যেখানে আদৌ শুনিতে পাইলাম না, তুমি সেখানে কিছু শুনিলে; এইজন্য ইহা শব্দের বিকৃতি। তবেই আমাদের লক্ষণানুসারে শব্দতন্মাত্র শব্দের প্রকৃতি হইল—শব্দের প্রকৃতি, শব্দের প্রসূতি নহে। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র এবং পরশব্দ এক জিনিষ নহে। পরশব্দ কারণীভূত (causal) চাঞ্চল্য (stress) মাত্র—যে চাঞ্চল্যের জন্য শব্দজ্ঞান হয় সেইটা মাত্র; সে নিজে শ্রুতশব্দ (sound) নহে। ইহা শব্দের প্রসূতি। কিন্তু শব্দতন্মাত্র শ্রুতশব্দ, তবে তাহা তোমার আমার কানে শোনা শব্দ নয়, পারমার্থিক-কর্ণে শ্রুত নিরতিশয় শব্দ। কাজেই শব্দতন্মাত্রও অপর শব্দের ভাগেই পড়িতেছে। তবে অবশ্য অপরশব্দগুলির সর্বোচ্চ থাক্ বা পরাকাষ্ঠা শব্দতন্মাত্রে। তার নীচে নানান্ থাকের শব্দ রহিয়াছে; সেগুলিকে মোটামুটি দুইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকযন্ত্র সাহায্যে অথবা ধ্যান-ধারণা দ্বারা যে শব্দগুলি আমরা শুনিতে পারি, কিন্তু যেগুলিকে সচরাচর আমরা শুনিতেছি না, সেইগুলি সূক্ষ্মশব্দ; তাহাদের পরাকাষ্ঠা শব্দতন্মাত্রে। আর সচরাচর কানে আমরা যে শব্দগুলি শুনিয়া থাকি (যথা বাঁশীর শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, মেঘের ডাক ইত্যাদি), সেগুলি স্থূলশব্দ। অতএব অপরশব্দের বা শ্রুতশব্দের (sound এর) মোটামুটি তিনটা বিভাগ পাইলাম—প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু থাক্ (gradations) গণনাতীত; যত রকমের কান তত রকমের শোনা; দেশ-কাল পাত্র বদলাইলেই শোনাও বদলাইয়া যায়। বিভাগ তিনটি এই:—শব্দতন্মাত্র (বা শব্দের প্রকৃতি); সূক্ষ্মশব্দ (অতীন্দ্রিয় বলিব কি?); এবং আমাদের আটপৌরে স্থূলশব্দ (normal sound)। এ তিনটি ছাড়া এবং এ তিনেরই মূলে যে চাঞ্চল্যের বীজ রহিয়াছে, যেটা না থাকিলে কেহই শুনিতে পান না, এমন কি স্বয়ং প্রজাপতিও শুনিতে পান না, সেইটাকে আমরা আগাগোড়া পরশব্দ বলিয়া আসিতেছি। তিন রকম শ্রুতশব্দের জন্য তিন থাকের কর্ণ বা শ্রবণ-সামর্থ্য আবশ্যক। শব্দতন্মাত্রের জন্য পরমার্থিককর্ণ (Absolute Ear); সূক্ষ্মশব্দের জন্য দিব্যকর্ণ (Yogik ear); এবং স্থূলশব্দের জন্য ভৌতিককর্ণ (Normal ear)। ফলকথা, শব্দের দিক হইতে হিসাব লইলে আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের পাঁচটা অবস্থা। অনুভবের যদি কোনও তুরীয় ভাব

থাকে, যেখানে আদৌ ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য নাই, তবে সেটা অশব্দের অবস্থা; কারণ, চাঞ্চল্য না থাকিলে শব্দ থাকে না। তারপর চাঞ্চল্য রহিয়াছে কিন্তু শুনিবার কোনোরূপ কান নাই; ইহাই পরশব্দ। তারপর, চাঞ্চল্য রহিয়াছে এবং তাহা নিরতিশয়ভাবে শোনা হইতেছে; ইহাই শব্দতন্মাত্র। তারপর, চাঞ্চল্যটাকে আমাদের ভৌতিককর্ণ ধরিতে পারিতেছে না, কিন্তু দিব্যকর্ণ ধরিয়া ফেলিতেছে, ইহাই সূক্ষ্মশব্দ। সর্বশেষে, চাঞ্চল্য ভৌতিককর্ণটাকেও উত্তেজিত করিয়া শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে। ইহাই স্থূলশব্দ।

একটা কথা, সকলপ্রকার শব্দের মূলে যে চাঞ্চল্য (stress) রহিয়াছে তাহাকে আদৌ 'শব্দ' বলিতেছি কেন? যখন সেটাকে শুনিলাম তখনই সেটা শব্দ, যখন শুনিতেছি না, তখন সেটা শব্দের সম্ভাবনা (possibility) মাত্র, শব্দ নহে। ঠিক কথা; কিন্তু পরশব্দকে শব্দ বলিবার কৈফিয়ৎ আমাদের একটা আছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—আমাদের অনুভূতির এই পাঁচটা ধারা। এই পাঁচটাই আবার যে উৎস হইতে নির্গত হইতেছে তাহা পরশব্দ বা চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য যে গোড়ায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু সেটাকে রূপ, রস প্রভৃতি আখ্যা না দিয়া শব্দ আখ্যা দিতেছি কেন? শব্দের এমন বিশেষত্ব কি আছে যাহাতে তাহাকেই সকলের মোড়ল করিয়া বসাইতে হইবে? পরশব্দ যে প্রকৃত প্রস্তাবে শব্দ (sound) নহে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; কাজেই তাহাকে শব্দ বলিতে গেলে আমাদের অধ্যাস (impose) করিতে হয়। এক কারণের যদি অনেকগুলি কার্য থাকে তবে তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট কার্যটিকে আমরা কারণের সঙ্কেত (symbol, sign) ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই। হ্রদের সুস্থির জলরাশির কাছে দাঁড়াইয়া নীরবতা অনুভব করিয়াছি; জলে যে চাঞ্চল্য নাই, শব্দ হইবে কেন? আবার, পুরীর সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া বিপুল সিন্ধুগর্জন শুনিয়াছি; শুনিব না কেন, লবণাম্বুরাশির ধারানিবন্ধা তরঙ্গমালা যে বেলাভূমিতে নিয়তই আছড়াইয়া পড়িতেছে। নীরবতা সুস্থিরতার সঙ্কেত, মুখরতা চাঞ্চল্যের সঙ্কেত। যেখানে শান্তি সেখানে মৌন; যেখানে ক্ষোভ, ছুটাছুটি সেইখানে কোলাহল। সাম্যাবস্থা, শান্তি বুঝাইতে মৌনের মত এমন স্পষ্ট সঙ্কেত কোথায় পাইব? বৈষম্য, অশান্তি, চাঞ্চল্য বুঝাইতে শব্দের মত এমন স্পষ্ট সঙ্কেত কি আছে? যেখানে রূপ দেখিতেছি, রসাস্বাদ করিতেছি, গন্ধ পাইতেছি, সেখানেও মূলে এক প্রকার না এক প্রকার চাঞ্চল্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে চাঞ্চল্য স্পষ্ট নহে—পরীক্ষায় ধরা পড়ে।

হরিদ্বারে চণ্ডীর পাহাড়ে বসিয়া হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গোটা কয়েক চূড়া দেখিতেছি; অথবা মুশৌরির সেনানিবাস পর্বতে বসিয়া সম্মুখে চিরতুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণীর কর্পূরকুন্দেন্দুধবল বিরাট বপুঃ নিষণ্ণ রহিয়াছে দেখিতেছি। এই যে রূপজ্ঞান, ইহার মূলেও ঈথারতরঙ্গগুলির বা ঐ রকম একটা কিছুর চঞ্চল অভিসার রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাকাইয়া দেখি যেন একটা বিপুল, ভাস্বর নিসর্গগৌরব চিত্রার্পিত হইয়াই রহিয়াছে—কোথাও একটু ক্ষোভ নাই, চাঞ্চল্য নাই; সব শান্ত, সমাহিত। এটা কিন্তু আমার দৃষ্টির স্বাভাবিক কৃপণতা, আমার বোঝার ভুল। অত সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য আমার কাছে চাঞ্চল্য বলিয়া ধরা পড়ে না। মন্দিরে পূজায় বসিয়া দেবতার পায়ে একটা প্রস্ফুটিত পদ্ম নিবেদন করিয়া দিয়াছি; তার স্নিগ্ধ সৌরভ আমার ভাব আরও গাঢ় করিয়া দিতেছে। অবশ্য, গন্ধবহ পদ্ম-পরাগরেণু বহিয়া আনিয়া আমার নাসিকার ত্বকে ছিটাইয়া না দিলে আমি গন্ধ পাই না; কিন্তু গন্ধ পাইয়া, এত আহরণ, বিকিরণ ও বিতরণের কথা তো কৈ আমার মনে হয় না; আমি মনে ভাবি পদ্ম-পরিমল যেন একটা স্নিগ্ধ শান্তি-প্রলেপের মত আমার প্রাণের উপর লাগিয়া রহিয়াছে। এখানেও চাঞ্চল্য অনুভবে ধরা পড়ে না, পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এই জন্য রূপ, রস প্রভৃতি চাঞ্চল্যহেতুক হইলেও চাঞ্চল্যের সব সময়ে স্পষ্ট প্রতীক নহে। কিন্তু শব্দ ও চাঞ্চল্য যেন এপিঠ-ওপিঠ; দেখিলে সন্দেহ বা ভ্রম থাকিতেও পারে, যেটা দেখিতেছি সেটা অস্থির কি সুস্থির; কিন্তু ডাক শুনিলে আর সন্দেহই থাকে না যে, যে ডাকিতেছে সে অস্থির। তাই শব্দ, চাঞ্চল্যের খুব স্পষ্ট ও অব্যভিচারী সঙ্কেত। কানে বায়ুতরঙ্গের ধাক্কা অনেকটা ধাক্কার মতনই বোধ হয়, কিন্তু চোখে (retina) ঈথারতরঙ্গের ধাক্কা আমরা প্রায়ই ধাক্কা বলিয়া জানিতে পারি না।

শব্দের শক্তিও অদ্ভুত। অভিধাশক্তি, লক্ষণাশক্তি, স্ফোট প্রভৃতি লইয়া তার্কিকেরা মারামারি করুন, আমরা আপাততঃ ওদিকে ভিড়িব না। একটা মসৃণ কাচের উপর সূক্ষ্ম ধূলিরেণুসমূহ পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিকটে বসিয়া বেহালার একটা গৎ বাজাইতেছি। শব্দতরঙ্গগুলি ধূলিরেণুগুলিকে ধীরে ধীরে সাজাইয়া একটা নির্দিষ্ট আকারে আকারিত করিয়া দিবে। শব্দের নিজের ছন্দের (harmony) অনুরূপ একটা মূর্তি সৃষ্টি করার শক্তি রহিয়াছে। অতএব শব্দ শুধু চাঞ্চল্যের সঙ্কেত নহে; তার গড়িবার ভাঙ্গিবার শক্তি আছে। জগতে গড়াভাঙ্গা মানে চাঞ্চল্য; শব্দও গড়িতে

ভাঙ্গিতে পারে; অতএব শব্দ, চাঞ্চল্যের আত্মীয় ও প্রতিনিধি। রূপ বা রসের সত্য সত্যই বাহিরে একটা কিছু গড়িবার ভাঙ্গিবার শক্তির পরিচয় আমরা বড় একটা পাই না। ভিতরে রূপের বা রসের ভাঙ্গিবার-গড়িবার শক্তি অস্বীকার করিতে আমার সাহস নাই। শব্দ স্পষ্টতঃ শক্তিস্বরূপ (dynamic) এবং স্রষ্টা (creative)। শুধু ধূলিকণা লইয়া নহে, অন্যান্য উপায়েও শব্দের এই স্বরূপ ও সামর্থ্য পরীক্ষিত হইতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আবিষ্কৃত রেডিয়াম (radium) নামক দ্রব্য নিয়তই তাপ বিকিরণ করিতেছে দেখা যায়। এ তাপের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। আমরা জানি যে তাপ কোনও একটা বস্তুর অণুগুলির এলোমেলো ভাবে স্পন্দন মাত্র (irregular molecular quiver); যে জিনিষের দানাগুলি ঐরূপ ভাবে কাঁপিতেছে সেই জিনিষটা আমাদের অনুভূতিতে গরম বলিয়া ঠেকে। রেডিয়াম অত তাপ পাইতেছে কোথায়? ব্যাখ্যাটা বোধ হয় এইরূপঃ—রেডিয়ামের অণু (radium) গুলি ফাটিয়া যাইতেছে, সবাই একসঙ্গে নয়, পালা করিয়া—বিজ্ঞানের অণু সাবয়ব ও পরিমিত দ্রব্য মনে রাখিবেন। অণুর টুকরাগুলিকে দহরাণু বা অবমাণু (sub-atoms) বলা যাক। সেই অবমাণুগুলির কতক-কতক রেডিয়ামের ভিতর হইতে ভীষণ বেগে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে; কতক বা রেডিয়ামের অন্যান্য অণুতে ধাক্কা (collision) খাইয়া সেগুলিকে কাঁপাইয়া দিতেছে। অণুগুলির এই প্রকার দোলনই তাপরূপে অভিব্যক্ত হয়। কতকগুলি সমিধ সাজাইয়া লইয়া 'শিক্ষা' নামক বেদাঙ্গের ঠিক নির্দেশ মত 'অগ্নিমীলে' প্রভৃতি বেদমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতেছি। এই শব্দের মূলে যে স্পন্দ (vibration) রহিয়াছে সেটা যেমন বায়ুকে কাঁপাইয়া তোমার আমার শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে, সেইরূপ সমিধের দানাগুলিতেও ধাক্কা দিতেছে। সে ধাক্কা এরূপভাবে ছন্দোবন্ধ যে, সে ধাক্কার ফলে সমিধের সূক্ষ্মদানাগুলি ফাটিয়া যাইলেও যাইতে পারে। তা ছাড়া, অণুর ভিতরে ইলেকট্রনগুলি একটা নির্দিষ্ট বেগে ও রীতিতে ঘুরিতেছে; তাদের ঘোরার একটা ছন্দঃ আছে (harmonic motion)। আমার উচ্চারিত মন্ত্রগুলির ছন্দঃ (super-sonic শব্দতরঙ্গের ছন্দঃ) ইলেকট্রনের গতিচ্ছন্দের অনুরূপ অথবা অনুপাতী হইলে, তাহার সহিত সংযুক্ত (compounded) হইয়া তাহাকে উপচিত করিয়া তুলিতে পারে। দুইটা বেহালা যদি এক সুরে বাজান হয় তবে সুরদ্বয়ের সংযোগ ও উপচয় হয়, সেইরূপ। এখন ইলেকট্রনগুলির বেগ উপচয়ের ফলে যদি

একটা নির্দিষ্ট সীমা (critical value) ছাড়াইয়া যায়, তবে তাহারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছটকাইয়া আসিবে। তারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছটকাইয়া গেলেই অণু-অঙ্গ ফাটিয়া গেল; গ্রহগুলি কক্ষচ্যুত হইয়া ছটকাইয়া গেলে সৌরজগতের যেমন অবস্থা হইবে, সেইরূপ। কক্ষচ্যুত গোটাকতক ইলেকট্রন অবশ্য প্রবলবেগে সমিধের দানাগুলিতে ধাক্কা দিবে এবং সেগুলিকে কাঁপাইতে থাকিবে। এ কম্পনের অভিব্যক্তি কিসে? তাপে। পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ ধরিয়া এ ব্যাপার চলিলে তাপ ক্রমশঃ উপচিত হইয়া সমিধ জ্বালাইয়া তুলিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তিতে সমিধ জ্বলিয়া উঠিল। রেডিয়ামের বা অন্যদৃষ্টান্তে এ কথাটাকে আর নিতান্ত গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভাবিয়া দেখিতে হইবে এবং পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষণীয় ব্যাপারে সুসংস্কার-কুসংস্কারের কথা অবান্তর,—সেখানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কেই সাবধানে পথ হাতড়াইয়া চলিতে হয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে অণুর "কেন্দ্র" (নিউক্লিয়াস) বিদীর্ণ করিয়া মহবিপুল শক্তি উন্মুক্ত করিবার যে নূতন পদ্ধতি (টেকনিক) আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে একটা ক্ষুদ্রাদপি বস্তুর মাঝে কেবল সামান্য অগ্নি কেন, প্রলয়াগ্নি পর্যন্ত কখনও মহাত্রাসরুদ্ররূপে—কখনও বা সর্বতোভদ্র বিশ্ব-শিল্পীরূপে আবির্ভূত হইবার বাধা নাই।

দহরাণুগুলিকে নাড়াচাড়া করার সামর্থ্য যদি শব্দের থাকে (থাকা অসম্ভব নয়), তবে সেগুলিকে ছড়াইয়া সাজাইয়া শব্দ অনেক অঘটন ঘটাইতে পারে। ঈথারের দানাগুলি অথবা ইলেকট্রনগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া শব্দ যে দেবতার তৈজসমূর্তি গড়িয়া তুলিতে পারে, সে কথার ব্যাখ্যা আপনারা হীরেন্দ্রবাবুর কাছে পাইবেন। আরও এক কথা—জলীয় বাষ্পের মেঘের দানারূপে পরিণত হইবার পক্ষে এক একটা ঘনীভাবকেন্দ্র (centres of condensation) চাই, অন্ততঃ পাইলে সুবিধা হয়; কোনও একটা ইলেকট্রন বা অন্য সূক্ষ্ম জিনিষকে কেন্দ্রস্বরূপ না পাইলে জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধিয়া জলকণায় পরিণত হয় না। এখন যদি আমরা ধরিয়া লই যে যজ্ঞীয় ধূম ছাড়া, মন্ত্রোচ্চারণ-জনিত শব্দ-স্পন্দগুলি উপযুক্ত ভাবে ইলেকট্রন প্রভৃতি ছড়াইয়া দিয়া ঐরূপ ঘনীভাবের কেন্দ্রসমূহ রচনা করিয়া দিতে পারে, তবে মন্ত্রশক্তির ফলে পর্জন্য ও বৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। এ ক্ষেত্রেও ভাবিয়া দেখার কথা অনেক। প্রথমতঃ, শব্দের ইলেকট্রনাদি পর্যন্ত পৌঁছিবার সত্য সত্যই সম্ভাবনা আছে কি না; অভিব্যক্ত

শব্দ (sound) যে বায়ুস্পন্দগুলি সৃষ্টি করিতেছে শুধু সেগুলির কথা বলিতেছি না; অভিব্যক্ত শব্দের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম পর্যায়ে (super-sonic গ্রামসমূহে) এবং মূলে যে চাঞ্চল্যাত্মক পরশব্দ রহিয়াছে সেটার কথাও ভাবিতে হইবে। হ্রীঁং বা ক্রীং উচ্চারণ করিতে যাইলে আমার ভিতরে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ প্রথমতঃ হয়; পরে তাহা উচ্চারণ যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া বাতাসকে চঞ্চল করে; সেই বাতাসের চাঞ্চল্য শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে চঞ্চল করিয়া তোমার ও আমার শব্দজ্ঞান জন্মায়।

গোড়ায় সেই প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ; আপাততঃ আরও তলাইয়া না হয় নাই-ই দেখিলাম। এখন প্রশ্ন এই—প্রাণশক্তি স্বরূপতঃ কি? তাহার স্পন্দ ঈথার অথবা ইলেকট্রন প্রভৃতি পর্যন্ত পৌঁছায় কি না? আবার, মন্ত্রশক্তি দ্বারা এ সকল অঘটন-ঘটনা যদি সম্ভবপর বলিয়া ধরিয়াও লওয়া হয়, তথাপি এ প্রশ্ন রহিয়া যাইবে—বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলিই সেই মন্ত্র কি না? এগুলি ভাবিয়া দেখার কথা এবং পরীক্ষায় যাচাই করিয়া লওয়ার কথা। আমি এখানে গোটা কয়েক কথা প্রশ্নরূপে পাড়িয়া পরীক্ষা ও মননের জন্য একটা পতিত জমির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যাটা এরূপও হইতে পারে, অন্য প্রকারও দাঁড়াইতে পারে। বস্তুর মোটা মোটা দানাগুলিকে শব্দ যে সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে পারে, তাদের একটা বিশিষ্ট আকার দিতে পারে, ইহা আমরা ইতিপূর্বে একখানা ধূলিধূসরিত কাচের সম্মুখে বেহালার গৎ বাজাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। অন্ততঃ এ সব পরীক্ষিত ক্ষেত্রেও আমরা শব্দকে স্রষ্টা (creative) বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। সূক্ষ্ম পর্যায়ের (super-sonic) শব্দগুলির ("silent sound") রাসায়নিক, জৈবিক ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে অদ্ভুত গড়ন ও ভাঙ্গানের ক্ষমতা আমরা তো জানিয়াছি। রোগ নিরাময় হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কিছু অন্যথাসিদ্ধিশূন্য অঘটনঘটনও ইহা দ্বারা সম্ভাবিত হইয়াছে বা হইতে পারে। এই জন্য বলিতেছিলাম শব্দ জগতের মৌলিক স্পন্দের (casual stress এর) খুবই উত্তম সঙ্কেত। আদিকারণের কার্য-প্রবাহরূপে, ব্রহ্মের জগৎরূপে আবির্ভুত হইবার যে উপক্রম ও অবস্থা তাহাকে "শব্দব্রহ্ম" বলিলে বেশ সুসঙ্গাতই হয়। ইহা যেন একটা বিরাট সুষুপ্তির পর বিরাট জাগরণ; মহামৌনব্রত-ভঙ্গের পর প্রথম আলাপন। ইহার উপক্রম একটা চাঞ্চল্যে—"এক আমি, আমার আর এক থাকিলে চলিবে না, বহু হইতে হইবে," এইরূপ "ঈক্ষণে"। মৌনের

অবস্থা অশব্দের অবস্থা; তারপর আদিম চাঞ্চল্যের যে প্রথমা বাক্ বা বাণীমূর্তি তাহাই প্রণব। এ কথাটা পরে পরিষ্কার হইবে।

সৃষ্টিটা প্রজাপতি মহাশয়ের সখের-যাত্রা। তিনি দলের অধিকারী। তিনি যেই একদিন "এতে" এই শব্দ করিলেন, অমনি তেত্রিশ কোটি দেবতা যাত্রার দলের ছোকরাদের মতো সাজিয়া গুজিয়া আসরে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। অতএব দেবতাসৃষ্টি শব্দপূর্বিকা—এইরূপ বেদের ব্যাখ্যা করার দিন আর নাই। শব্দব্রহ্ম মানে এ নয় যে একজন কেহ থাকিয়া থাকিয়া এক-একটা শব্দ করিতেছেন, আর এক-একটা পদার্থ সৃষ্টির আসরে আসিয়া হাজির হইতেছে। এ মোটা কথাটা ভিতরের সূক্ষ্ম-কথার সঙ্কেত মাত্র। শব্দের সৃষ্টি-সামর্থ্য অসম্ভব নহে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু প্রজাপতি যে শব্দ-সাহায্যে সৃষ্টি করেন তাহা কোন্ শব্দ? বেদে পুরাণে দেখিতে পাই যে প্রথমতঃ তাঁহার ধ্যানে বেদশব্দগুলি আবির্ভূত হন। বেদশব্দ বলিতে কি বুঝিব? এমন একটা শব্দ যাহার সহিত একটা নির্দিষ্ট অর্থের এবং একটা নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'গৌঃ' শব্দটা শুনিলাম; মনে নৈয়ায়িক মহাশয়ের দেওয়া লক্ষণ ও আকৃতিবিশিষ্ট একটা জন্তুর ছবি উদিত হইল; চাহিয়া দেখি সত্যই একটা গরু স্বচ্ছন্দমনে ঘাস খাইতেছে। প্রথমটা শব্দ, দ্বিতীয়টা প্রত্যয় এবং শেষেরটা অর্থ বা বিষয়। তোমার আমার কাছে এ তিনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও পূরাপূরি নিত্য নহে। 'গৌঃ' শব্দটার মানে যদি আমার জানা না থাকে তবে তাহা শুনিয়া আমার বিশেষ কোনও প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি হইবে না। অপিচ, 'গৌঃ' এই শব্দের বাচ্য বা অর্থ গরু নামক জন্তুটিরই যে হইতে হইবে এমন কোনও বাঁধাবাঁধি আইন নাই। আমরা পাঁচ জনে আজ হইতে পরামর্শ করিয়া, শুধু অসাক্ষাতে নয় সাক্ষাতেও, যদি পরস্পরকে 'গরু' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করি, তবে আমাদের ঠেকায় কে? যাদের ভাষা বিভিন্ন তারা হয়ত গরুকে গরু বলে না, আর কিছু বলে; আমরাও ইচ্ছা করিলে গরুকে গরু না বলিয়া আর আর কিছু বলিতে পারি। কাজেই শব্দ ও অর্থ, বাচক ও বাচ্যের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ কোথায়? শব্দ শুনিয়া প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি যে সকলের মনে একই রকম হয়, এরূপ নহে। 'গরু' এই শব্দ শুনিয়া আমার মনে পড়িল সেই শ্যামলা গাইটি, যার দুধ প্রসন্ন গোয়ালিনী বেচিয়াই মরিত কখনও খাইত না, এবং যার সাক্ষ্য দিতে স্বয়ং কমলাকান্তকে কাট্‌গড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল; তোমার হয়ত মনে পড়িল

কৈলাসের সেই বৃষরাজ যিনি দেবাদিদেবের রজতগিরিনিভ বপুটি বহন করিয়া স্থাবরজঙ্গমের সর্বত্র হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যয় ঠিক একরূপ হইল না। কাজেই আমাদের ব্যবহৃত কোন শব্দ একটা নির্দিষ্ট প্রত্যয় মনে জাগাইতে পারে, অথবা না-ও-পারে; তার একটা চিরনির্দিষ্ট বাচ্য বা অর্থ থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে। শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক আমরা ভবিষ্যতে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এখন প্রশ্ন এই—প্রজাপতি ধ্যানে যে বেদশব্দ পাইলেন তাহাও কি এই জাতীয়? উত্তর পাইতে হইলে কয়টা কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে মনে রাখা চাই। প্রথম, প্রজাপতি বা ব্রহ্মার মনে সৃষ্টি করার ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা, সেটা আদৌ শব্দ নহে; সেটা চাঞ্চল্যাত্মক, উন্মেষাত্মক পরশব্দ মাত্র। আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি, ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা ও মর্মের কথা। তারপর ধ্যানে বেদশব্দগুলির আবির্ভাব। এ শব্দগুলি শব্দতন্মাত্র।

প্রজাপতি ধ্যানে যে শব্দ শুনেন তাহা সেই নিরতিশয় শব্দ যাহার কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার কর্ণ পারমার্থিক-কর্ণ (Absolute Ear)। আমাদের, এমন কি যোগীদেরও ঠিক সে শব্দ শোনার সম্ভাবনা নাই। আমি যে শব্দটিকে 'গৌঃ' রূপে শুনিতেছি, প্রজাপতির কর্ণে তাহার শোনা নিশ্চয়ই অন্যরূপ। তাঁহার যে শোনা তাহাই 'গৌঃ' এই শব্দের প্রকৃতি, তোমার আমার শোনা সে শব্দের অল্পবিস্তর বিকৃতিমাত্র। যোগী সেই খাঁটি শব্দের কাছাকাছি যান, কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতির ভূমিতে না উঠিতে পারিলে, তাঁহারও ঠিক খাঁটি শব্দ শোনা হয় না। প্রণব, ঐঁ, হ্রীঁ, ক্রীঁ প্রভৃতি শব্দ আমরা যেভাবে শুনি বা বলি সেটা তাদের প্রকৃতি নহে, বিকৃতি। যতই উপরের থাকে (plane) উঠিবে, ততই শব্দগুলি স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া আসিবে। একটি বর্তিকা হইতে আলোকরশ্মি বিভিন্ন স্তরের বাহনের (medium) ভিতর দিয়া আমার চোখে আসিয়া পড়িতেছে; ধর, স্তরগুলি ক্রমশঃই জমাট (dense) হইয়া আসিতেছে; এ অবস্থায় রশ্মি ঠিক সরলভাবে আমার চোখে পৌঁছিবে না, বাঁকিয়া চুরিয়া, ছিন্নভিন্ন হইয়া আসিবে। ইহাই রশ্মির বিকার (refraction)। শব্দের বেলাও যে অনেকটা বিশেষভাবে এইরূপ তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রজাপতি তাঁহার পারমার্থিক শক্তির দ্বারা যে শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন ও শুনিতেছেন, তাঁহার এক মানসপুত্র অবিকল সেইটি উচ্চারণ করিতে ও শুনিতে পারেন না—তাঁহার বলা ও

শোনা ঈষৎ বে-ঠিক হয়, যদি ধরা যায় তিনি প্রজাপতির এক থাক্ নীচে। আবার তাঁহার পর যিনি বলিলেন ও শুনিলেন তাঁহার আরও একটু দোষ সম্ভাবিত হইল। এইরূপে গুরুপরম্পরায় নামিয়া আসিয়া সেই আদিম শব্দমালা যখন আমার রসনায় ও কর্ণে পৌঁছিল, তখন তাহাদের নিরতিশয়তা অপগত হইয়াছে, স্বাভাবিকতা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব ব্রহ্মার ধ্যানে যে বেদশব্দ প্রকাশ হইয়াছে তাহা তোমার আমার শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলির সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতে পারে না। নানা কারণে আমাদের থাকে আসিতে আসিতে শব্দের সঙ্কর ও বিকার হইয়াছে। এ কথার আলোচনাও পরে হইবে। তবে গুরুপারম্পর্য্য থাকাতে, সাঙ্কর্য্য (confusion) ও বিকৃতি (degeneration) যতটা হইতে পারিত, ততটা হয় নাই। প্রত্যেক গুরুই প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহার শিষ্যকে ঠিক নিজের শব্দসম্পদ অক্ষুণ্ণভাবে বহিয়া দিতে; এই কাণ্ডটাই বেদের প্রথম অঙ্গ—শিক্ষা। শিষ্যের শিক্ষার ব্যবস্থায় ইহার স্থান প্রথম। সর্বদাই যথাযথভাবে শব্দধারা পাইতে ও বহাইয়া দিতে গুরুশিষ্যপরম্পরা সচেষ্ট ছিলেন ও আছেন। এ চেষ্টা না থাকিলে আরও বিকৃতি ও গোলযোগ হইত। পরিশিষ্টে ১নং চিত্রে 'কখ' রেখা দ্বারা যদি আমরা শব্দের প্রকৃতি (Pure, normal transmission) বুঝাই, তবে অপর দুইটি 'কগ' ও 'কঘ' বক্ররেখার মধ্যে মাঝেরটি গুরুপরম্পরায় শব্দসন্ততি (transmission of sounds) বুঝাইতেছে এবং বাহিরের বক্ররেখাটি গুরুপরম্পরা না থাকিলে যতটা বিকৃতি হইতে পারে তাহাই বুঝাইতেছে। সমান্তরাল রেখাগুলি (horizontal lines) দ্বারা বিভিন্ন থাকের অনুভব সামর্থ্য দেখান হইয়াছে।

শুধু রমেশ দত্তের বেদ অথবা মক্ষমূলারের বেদ পড়িয়া নহে, কাশীতে গিয়া রীতিমত ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বেদপারগ আচার্যের নিকট শিক্ষা কল্প প্রভৃতি অঙ্গের সহিত যে বেদশব্দ আমরা শুনিয়া থাকি ও পড়িয়া থাকি, সে বেদশব্দও খাঁটি, অবিকৃত বেদশব্দ নহে, হইতে পারে না। বেদশব্দের বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় রূপ প্রজাপতির ধ্যানের মধ্যেই আবির্ভূত হইতে পারে। ঋষিদের দর্শনে শব্দের বা মন্ত্রের যে-রূপ ধরা পড়ে তাহাও প্রায় বিশুদ্ধ (approximate); তোমার আমার রসনায় ও কর্ণে তাহা অনেকটা বিকৃত। এ বিকৃতির হেতুগুলি পরে আলোচিত হইবে। এখন আমরা যে কথাটা বুঝিতে চাহিতেছি তাহা এই। গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, সুতরাং

বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার উৎপত্তি। বৈকুণ্ঠধাম ও গোলোকধাম, এবং গো-শব্দের অর্থ বাক্, ইহা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। স্বয়ং শিবজী কি যেন কি-একটা নেশা করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন; আর "বাজওত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গা নন্দভরে"। এই বিরাট নৃত্যে সর্বভূতান্তরাত্মা যিনি বিষ্ণু তাঁহার সাত্ত্বিকভাব হইল, তিনি চঞ্চল হইলেন। এ চাঞ্চল্য কি সহজ চাঞ্চল্য? সৃষ্টির গোড়ায় সর্বব্যাপী চিৎশক্তিতে যে দুই হইবার, বহু হইবার জন্য চাঞ্চল্য দেখা দেয়, ইহা সেই চাঞ্চল্য। গোলোকের পরাবাক্ পরশব্দ হইলেন। পরশব্দের যে লক্ষণ আমরা দিয়া রাখিয়াছি তাহা আপনারা যেন মনে রাখিবেন। 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—সেই বিষ্ণুপদ যখন চঞ্চল হইল তখনই গঙ্গা আবির্ভূতা হইলেন। এ কোন্ গঙ্গা? এ যে সনাতনী বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। ইহার তিন ধারা আমরা জানিতে পারিয়াছি—ঋক্, সাম, যজুঃ; বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী। সত্যসত্যই যে কত ধারা তাহা কে জানে? বিষ্ণুপদে গঙ্গার উদ্ভব হইল তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে কমণ্ডলুতে ধরিয়া লইলেন। এখানে পরাবাক্ অপরাবাক্ হইল, পরশব্দ শব্দতন্মাত্র হইল। শব্দের মূলীভূত চাঞ্চল্য বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দরূপে প্রকাশিত হইল। কোথায়? প্রজাপতির কমণ্ডলু (ধ্যানে) অথবা পারমার্থিক-কর্ণে। ব্রহ্মাতে আসিয়া শব্দের প্রসূতি শব্দের প্রকৃতি হইল। নাস্তিক মহোদয় এ ব্যাখ্যায় রাগ করিবেন না। আমরা আপাততঃ যাঁহাকে প্রজাপতি বলিতেছি তিনি আমাদেরই অনুভব-সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র। জীবে অনুভব-সামর্থ্যে নানান্ থাক্ রহিয়াছে (a variable magnitude, a series)। এই থাক্‌গুলি (series এর) পরাকাষ্ঠা (limit) কোথায়—ইহারই অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রজাপতিকে পাকড়াও করিয়াছি। গণিতশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে এরূপ পরাকাষ্ঠার অন্বেষণ হামেশা চলিতেছে; তাহাতে কাহারও কিছুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। আমার প্রজাপতিকে নাস্তিক মহোদয় যদি কেবল একটা কল্পিত পরাকাষ্ঠা (conceptual limit) বলিয়াই মনে করেন, তাহা হইলেও আপাততঃ আমি উচ্চবাচ্য করিব না। এ মামলায় আমরা এপর্যন্ত গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নজির লঙ্ঘন করিয়া রায় দিই নাই, এই কথাটি যদি এ পর্যন্ত খোলসা করিয়া বলিতে না পারিয়াছি তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বৃথায়ই বকিয়া মরিয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়কেই আমরা পাত পাড়িয়া বসাইয়া দিয়াছি; যিনি যে ভাবে লইবেন; রসগোল্লা পাতে পড়িলে যিনি বিনা ওজরে মুখে তুলিয়া দিয়া রসাস্বাদন করিবেন

তাঁহাকেও আমরা ডাকিয়া বসাইয়াছি; আর যিনি পাতের রসগোল্লার দিকে চাহিয়া 'এটা সংজ্ঞামাত্র, কল্পনামাত্র, অথবা সত্যসত্যই একটা-কিছু' এইরূপ বিচার করিতে করিতে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবেন, তিনিও আমাদের নিমন্ত্রণে বাদ যান নাই। সে যাহাই হউক, প্রজাপতির কমণ্ডলুতে যে গঙ্গা (পশ্যন্তী) রহিলেন, তিনি ঠিক আমাদের মর্ত্যের গঙ্গা নহেন। জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠায় যে শব্দরাজি, যে বেদ রহিয়াছে, আমাদের কুণ্ঠিত, কৃপণ জ্ঞানে সে শব্দরাজির, সে বেদের, ঠিকভাবে ও পুরাপুরিভাবে থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব বেদেরও নানান্ থাক্—Veda-series। একটা যদি চরম থাক্ থাকে (আমরা এখনও গণিতের নজিরে চলিতেছি) তবে তাহাই পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বেদ (pure and perfect Veda)। যে গল্পটা পাড়িয়াছিলাম সেটা চলুক। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে হর-জটায় আসিয়া সুরশৈবলিনী পথ হারাইয়া, কুলু-কুলু ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ইহা হইল শব্দের এবং বেদের সূক্ষ্ম, অব্যক্ত অবস্থা (মধ্যমা)—যে শব্দ যোগীরা দিব্যকর্ণে শুনিতে পান। মহাদেব যোগেশ্বর এ কথাটাও আপনারা মনে রাখিবেন। শেষে গোমুখীতে পতিতপাবনী শৈলসুতাসপত্নী বসুধাশৃঙ্গারহারাবলীরূপে বসুন্ধরায় নামিয়া আসিলেন। ইহাই শব্দের ও বেদের স্থূল প্রকট মূর্তি (বৈখরী)। গোমুখীর 'গো' মানে বাক্। গল্প এইখানে শেষ হইল; শব্দের পূর্বব্যাখ্যাত সব কয়টা থাক্ আপনারা এই গল্পের মধ্যে পাইলেন তো? বিষ্ণুর চাঞ্চল্য পরশব্দ; ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গঙ্গার আবির্ভাব শব্দতন্মাত্র বা শব্দের নিরতিশয় অবস্থা; হরজটাজালে গঙ্গার অবগুণ্ঠিতাবস্থা সূক্ষ্ম শব্দ; শেষে গোমুখী হইতে গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ শব্দের স্থূল অবস্থা।

ব্রহ্মার ধ্যানে যে বেদশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ কিসে? বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দকে চিনিয়া লইব কি লক্ষণ দ্বারা? পূর্বেই বলিয়াছি—অর্থ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে নিত্য, অব্যভিচারী সম্পর্ক থাকিলে, তবে বিশুদ্ধ শব্দ হয়। কান ধরিয়া টানিলে যেমন মাথাকে আসিতে হয়, সেইরূপ যে শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার বাচ্যবিষয় অথবা অর্থ তৎক্ষণাৎ নির্মিত হইবে তাহাই শব্দতন্মাত্র, বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ। বাইবেলে আছে—ঈশ্বর বলিলেন "আলোক হউক", আর অমনি আলোক হইল। বেদেও দেখিতে পাই প্রজাপতি "এতে" প্রভৃতি শব্দ করিলেন, আর এক এক জাতি সৃষ্টপদার্থ আবির্ভূত হইল। যে শব্দ হইলে তন্মূলীভূত বা তজ্জন্য স্পন্দক্রিয়া একটা

বিশিষ্ট পদার্থ তৎক্ষণাৎ গড়িয়া ফেলিবে, তাহাই সমর্থ ও স্রষ্টা শব্দ; তাহাই নিরতিশয় শব্দ। ধর 'গৌঃ' যদি এই জাতীয় শব্দ হয়, তবে যেই 'গৌঃ' শব্দ হইবে, অমনি তাহা সত্য সত্যই একটা গো সৃষ্টি করিয়া ফেলিবে। যদি তাহা পারে তবেই তাহা নিরতিশয় শব্দ, নতুবা নহে। নিরতিশয় শব্দ ও তাহার বিষয় বা অর্থের মধ্যে এমনই বাঁধন, যে শব্দ হইলে অর্থকে নির্মিত হইতেই হইবে। বিশুদ্ধ শব্দ হইল, অথচ তাহার বিষয় বা অর্থ কোথায় তার ঠিকানা নাই, এমন হয় না। বলা বাহুল্য, আমাদের শ্রুত বা উচ্চারিত কোন শব্দেই এ লক্ষণ খাটে না, সুতরাং কোনটাই বিশুদ্ধ শব্দ নহে। অবশ্য প্রত্যেক শব্দেরই অল্পবিস্তর ভাঙ্গিবার গড়িবার শক্তি আছে। প্রত্যেক শব্দই ছোট-খাট এক-একজন ব্রহ্মা ও রুদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া যেই আমি "টাকা" এই শব্দটা উচ্চারণ করিব, সেই সে শব্দস্পন্দগুলি অণু-পরমাণুগুলিকে সমন পাঠাইয়া ধরিয়া আনিবে এবং সাজাইয়া গুছাইয়া "রুপেয়া" গড়িয়া দিবে, টাঁকশাল ফাঁদিয়া বসিবে, এমন আশা কেহ যেন করে না। আমার অভিপ্রেত পদার্থটি রচিয়া দিবার শক্তি আমাদের চলিত শব্দগুলির নাই। মুনি-ঋষিদের উচ্চারিত শব্দের নাকি কতকটা এ সামর্থ্য—বস্তুকে গড়িয়া হাজির করিয়া দিবার শক্তি—ছিল। কপিঞ্জল শ্বেতকেতুর আশ্রমে যাইতে যাইতে শূন্যপথে বিমানচারী কোনও এক সিদ্ধকে তাড়াতাড়ি যেমন লাফাইয়া যাইলেন, অমনি সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে শাপ দিলেন—ঘোড়া হও; কপিঞ্জলকে ঘোড়া হইতেই হইল। এখানে শব্দশক্তি, না অপর কিছু? দুর্বাসা ঋষি আসিয়া কণ্বমুনির কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন—অয়মহং ভোঃ। শকুন্তলা বেচারী স্বামীচিন্তায় ডুবিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন না। দুর্বাসা রাগে গস্‌গস্ করিয়া "আঃ অতিথিপরিভাবিনি!" ইত্যাদি বলিয়া শাপ দিলেন। শাপ ফলিল। কিসের জোরে? এ সব দৃষ্টান্তে যাহাই হউক, আমাদের শব্দগুলি সাধারণতঃ এমনই ফাঁকা আওয়াজ যে বাক্‌সর্বস্ব কথাটা আমাদের কাছে গালই হইয়া আছে। শব্দ হইলেই অর্থ যদি আপনা হইতেই যুটিত, তবে বাঙ্গালীর মত সার্থক হইত আর কে?

যাহাই হউক, অর্থকে গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য-বিশিষ্ট যে শব্দ তাহাই নিরতিশয় শব্দ। এখানেও সেই পরাকাষ্ঠার (limit-এর) কথা। সকল শব্দই কিছু-না-কিছু নাড়াচাড়া দিয়া ভাঙ্গিবার গড়িবার চেষ্টা করে। তারা বাতাসের ঢেউ, স্নায়ুস্পন্দ, করিবারই কথা। কোনো শব্দ বেশী, কোনো শব্দ কম; সূক্ষ্ম-পর্যায়ের (super-sonic)

শব্দগুলির খুব বেশী। সাধারণতঃ ছন্দোবন্ধ শব্দগুলি গড়ার দিকে কতক কৃতিত্ব দেখায়। ছন্দই হইল প্রাণ-ব্যাকরণ। এইজন্য বেদ ছন্দ হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন। তাই বলিয়া যেই আমি জলদগম্ভীর সুরে গাহিব "বৃষ্টি পড়িছে টুপটাপ" সেই পর্জন্যদেব সত্যসত্যই এক পশলা বর্ষিয়া যাইবেন, এমন মেঘমল্লার আমি সাধিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে তানসেন দীপকরাগে পুড়িয়া মরিয়াছেন, একথাও স্মরণ রাখিবেন। অর্থাৎ আমার যে ছন্দোবন্ধ শব্দটি অনেক পরিমাণে ব্যর্থ, গুণীব্যক্তির সাধাগলায় বাহির হইলে তাহাই আবার সার্থক। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে—শব্দের কিছু একটা গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য কতদূর পর্যন্ত? এখানেও নাস্তিক মহাশয়কে আমি মাথা নাড়িতে দিব না। যদি শব্দের সৃষ্টি-সামর্থ্যের (dynamic or creative function-এর) একটা পরাকাষ্ঠা থাকে তবে তাহাই নিরতিশয় শব্দ। ইহাকেই স্বাভাবিক শব্দ (natural name) বলিতেছি। ইংরাজীতে বলিতে গেলে স্বাভাবিক শব্দের লক্ষণ (test) এইরূপঃ—the sound being given, a thing is evolved: conversely, a thing being given, a sound is evolved. যদি শব্দটা থাকে তবে তার অভিধেয় বস্তুটা গড়িয়া উঠিবে; যদি বস্তুটা থাকে তবে তার শব্দ (অবশ্য শুনিবার কান থাকিলে) অভিব্যক্ত হইবেই। অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থ যেন আমার হাতের দুইটা পিঠের মতন এদিক ওদিক।

মাথার উপরে পাখা ঘুরিতেছে, তার শব্দ আমি শুনিতেছি; কিন্তু আমার চশমার উপর একটি জলবিন্দু বা ধূলিকণা রহিয়াছে তাহার শব্দ কি আমি শুনিতে পাই? তাহার আবার শব্দ! আছে বৈকি! আমার ভৌতিক কর্ণের কাছে নাই; বৈজ্ঞানিক অথবা যোগীর দিব্যকর্ণের কাছে হয় ত থাকিতে পারে; পারমার্থিক-কর্ণের কাছে নিশ্চয়ই আছে। কি ভাবে? মনে রাখিবেন, চাঞ্চল্য থাকিলেই যে কর্ণ নিরতিশয়রূপে শুনিতে পায়, তাহাই পারমার্থিক-কর্ণ। ইলেকট্রনের চলাফেরাই হউক, ঈথার তরঙ্গগুলির অভিযানই হউক, অণুপরমাণুগুলির কম্পনই হউক, অথবা এ সকল অপেক্ষা স্থূল-সূক্ষ্ম কোন রকম চাঞ্চল্যই হউক—পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যে সবই শ্রুত হইবে। দিব্যকর্ণেও ইহাদের অনেকগুলি শ্রুত হইতে পারে। এখন দেখা যাক, চশমার উপর এই জলকণাটি কি? বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলের দানা পরস্পরকে ধরিয়া বাঁধিয়া এই জলকণাটি গড়িয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক দানার (molecule-এর) মধ্যে আবার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের অণুগুলি রহিয়াছে; তাহাদের ভিতরে ইলেকট্রনগুলি

আবার সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহের মতো পাক দিতেছে। দানাগুলি কাঁপিতেছে; অণুগুলি নিজেদের একটা ব্যূহরচনা করিয়া (রসায়নশাস্ত্র ইহা Space-representation দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে) স্পন্দিত হইতেছে; আর ইলেকট্রন প্রভৃতির তো কথাই নাই। অতএব জলকণাটি চাঞ্চল্যবিশিষ্ট; বিশেষভাবে তলাইয়া দেখিলে ইহা চিদবস্তুর ভিতরে একটা চাঞ্চল্যবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। সুস্থির জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম; একটি কেন্দ্র করিয়া লইয়া উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অপর জায়গায় আর একটা ঢেলা ফেলিলে অপর একটা উত্তেজনার কেন্দ্র আমরা পাই। এইরূপ বহু উত্তেজনা-কেন্দ্র (centres of disturbacne) আমরা পাইতে পারি। জগতে যে সকল বস্তুকে আমরা এক-একটা দ্রব্য বলিতেছি তাহারা (এবং আমরা নিজেরাও) ঐরূপ এক-একটা উত্তেজনার কেন্দ্র। আধার বা উপাদানটা কি তাহা আপাততঃ ভাবিয়া দেখার দরকার নাই; শাস্ত্র সেটাকে চিদবস্তু বা চিৎসত্তা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানও উন্মুখ। কতকগুলি শক্তি (forces) দ্বারা এক একটা উত্তেজনা-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় ও স্থিতি হয়। জলে একটা আবর্ত উৎপাদন করিতে এবং তাহাকে কিছুক্ষণ বাহাল রাখিতে কতকগুলি শক্তির সমাবেশ আবশ্যক। সেই শক্তিগুলিই আবর্তের সৃষ্টি ও স্থিতির মালিক। সেগুলিকে constituting forces বলিতে পারি। তুমি আমাকে টানিতেছ, আমি তোমাকে টানিতেছি; তুমি একটা শক্তি প্রয়োগ করিতেছ, আমি আর একটা। কিন্তু এই টানাটানি ব্যাপারকে যদি সমগ্র, সমস্ত করিয়া দেখা যায় তবে তাহার ইংরাজি পরিভাষা হইবে Stress (শক্তিগুচ্ছ বা শক্তিব্যূহ); বর্তমান দৃষ্টান্তে শক্তিব্যূহের দুইটা অংশ (elements or partials)—তোমার টানা ও আমার টানা। অতএব শক্তিব্যূহ শব্দটা ব্যবহার করিয়া আমরা বলিতে পারি যে জলের আবর্তটির মূলে শক্তিব্যূহ (causal stress) রহিয়াছে; তোমার মূলেও একটা শক্তিব্যূহ, আমার মূলেও একটা, সকল জিনিসের মূলেই এক-একটা শক্তিব্যূহ রহিয়াছে। আমরা নিজের প্রয়োজনমত ব্রহ্মাণ্ডটাকে টুকরা টুকরা দেখিতেছি; এবং ভাবিতেছি বুঝি একটা টুকরার সঙ্গে আর একটা টুকরার সম্পর্ক নাই, শক্তিব্যূহগুলি সব দুর্ভেদ্য ও পরস্পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, উদাসীন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু সেরূপ নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট অবিচ্ছিন্ন শক্তিব্যূহ (an infinite system of stresses); যাহাকে জলের বা ঈথারের অথবা সম্মিলিত দেশ-কালসত্তার আবর্ত বলিতেছি সেটা সেই বিরাট ব্যূহের একটা

অঙ্গ বা অবয়ব (partial) মাত্র। এখন, জলকণার কারণীভূত শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে—ইলেকট্রনদেরই বল আর স্থূলতর দানাগুলারই বল—সেই চাঞ্চল্য পারমার্থিক-কর্ণে (Absolute Ear-এ) শ্রুত হইলে যে শব্দাভিব্যক্তি হয়, সেই শব্দই জলকণার খাঁটি স্বাভাবিক শব্দ। জলকণার বেলায় যেরূপ, এই খড়ির টুকরা বা অপর যে-কোনও দ্রব্য ("চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ") এর বেলাতেও সেইরূপ। প্রত্যেকের সৃষ্টি ও স্থিতির মূলে শক্তিব্যূহ (constituting forces or causal stress) রহিয়াছে; নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্যে সেই শক্তিব্যূহের যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি, তাহাই পদার্থের বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ। জীবকোষের চলা-ফেরা হইতেছে; হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে; তাহার ভিতর ভাঙ্গা-চোরা (anabolism, catabolism) চলিতেছে; এই সর্ববিধ চাঞ্চল্যের মূলে যে শক্তিব্যূহ, তাহাই শব্দজ্ঞান জন্মাইলে, আমরা জীবকোষের স্বাভাবিক শব্দ পাই। আমি অবশ্য এ শব্দ ভৌতিক কর্ণে শুনিতে পাই না; ইলেকট্রনের চলা-ফেরা, ঈথারের অথবা অতিসূক্ষ্মসত্তা বা অপর কিছুরই আবর্ত শুনিব কি প্রকারে? বৈজ্ঞানিক ও যোগী দিব্যকর্ণে অতীন্দ্রিয় শব্দগুলির কতক কতক হয় ত শুনিতে পান; আমরা পারমার্থিক-কর্ণের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে, যেখানেই শক্তিব্যূহ কোনও প্রকার চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিবে, সেখানেই সে চাঞ্চল্য পারমার্থিক-কর্ণে শব্দরূপে শ্রুত হইবে; এবং তাহাই সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শব্দ। যে জিনিষের যাহা স্বাভাবিক শব্দ, তাহাই তাহার নাম দিলে আমরা স্বাভাবিক নাম (Natural Name) পাই।

স্বাভাবিক শব্দ বস্তুর বীজমন্ত্র। যথা, 'রং' অগ্নির বীজমন্ত্র। যে জিনিষটাকে আমরা অগ্নি বলিতেছি, তাহার মূলে অবশ্য শক্তিব্যূহ (constituting forces) রহিয়াছে; সেই শক্তিব্যূহ আমাদের চক্ষুকে উত্তেজিত করিয়া অগ্নির রূপজ্ঞান জন্মায়; ত্বগিন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তাপজ্ঞান জন্মায়; কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া কোনও শব্দজ্ঞান জন্মায় না। পারমার্থিক-কর্ণে কিন্তু তাহার একটা শব্দ আছে; দিব্যকর্ণও সে শব্দ কতকটা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। দিব্যকর্ণ সেই শব্দকে 'রং' বলিয়া শুনিয়াছেন; এটি পরীক্ষণীয় ব্যাপার—রসায়নশাস্ত্রের অনেক ব্যাপার যেরূপ; আমরা যতক্ষণ পরীক্ষা করিয়া মিলাইয়া না লইতেছি, ততক্ষণ গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে কেবল আমাদের শুনিয়াই রাখিতে হইতেছে

যে, লং বং রং যং হং এইগুলি ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমের স্বাভাবিক নাম এবং বীজমন্ত্র। পারমার্থিক-কর্ণের সংজ্ঞা আমরা করিয়া লইয়াছি, কিন্তু সে কর্ণ স্পর্শ করার অধিকার আমাদের নাই; আমরা খুব জোর দিব্যকর্ণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারি। এই দিব্যকর্ণের নজিরে আমরা বলিতেছি যে, অগ্নি বা ব্যোমের মূলে যে শক্তিব্যূহ রহিয়াছে, তাহার যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি (acoustic equivalents) তাহাই অগ্নির বা ব্যোমের বীজমন্ত্র—রং বা হং। অবশ্য দিব্যকর্ণের শোনা শব্দ প্রায় বিশুদ্ধ, নিরতিশয় নহে; এইজন্য রং বা হং হইতেছে *approximate* acoustic equivalents of the underlying stresses or constituting forces of fire and æther. শুধু পঞ্চভূতের কেন, যত্র জীব তত্র শিব—যত্র শিব তত্র শক্তি; কাজেই জীবমাত্রেরই একটা নিজস্ব বীজমন্ত্র আছে। আমি দীক্ষার সময় গুরুমুখে যে মন্ত্র পাই, সেটা আমার নিজস্ব বীজমন্ত্রের অনুরূপ অথবা অনুকূল হওয়া চাই, বিরোধ হইলে, আমার ভিতরকার শক্তিব্যূহ (causal stress) অস্বস্থ, এমন কি ব্যাহত হইয়া পড়িবে। গানে গলার সুর ও যন্ত্রের সুরের গরমিল (dis-harmony, discord) হইলে যাহা হয়, কতকটা তাহাই। বীজমন্ত্রের বা স্বাভাবিক নামের আর বেশি দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করার সময় আজ আমাদের নাই। বীজমন্ত্র মৌলিক (simple) ও যৌগিক (compound) হইতে পারে। আপেক্ষিক ভাবে, "রং" মৌলিক বীজ, "হংসঃ", "হ্রীঁ" "ক্রীঁ" প্রভৃতি যৌগিক। আর এক কথা। স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রকে আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। শঙ্খ বাজাইলাম, অথবা কাক ডাকিল; এখানে শঙ্খের শব্দ বা কাকের ডাককে আমরা সাধারণতঃ স্বাভাবিক শব্দ বলি। আমাদের লক্ষণ অনুসারে ঠিক স্বাভাবিক নহে। যে শক্তিব্যূহ শঙ্খকে শঙ্খ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি (পারমার্থিক-কর্ণেই হউক আর দিব্যকর্ণেই হউক), সেইটাই শঙ্খের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র হইবে। অবশ্য শঙ্খধ্বনিটা শঙ্খের বীজশক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বই সম্বন্ধশূন্য নহে। কাকের ডাক শুনিয়া আমরা কাকের নাম দিয়াছি কাক; এ নাম কাকের বীজমন্ত্র নহে; তবে কাকের ডাকটা কাকের কাকত্ব হইতেই নিঃসৃত হইতেছে; এইজন্য কাকের বীজমন্ত্রের নাম যদি মুখ্য (primary) স্বাভাবিক নাম হয়, তবে তার ডাক শুনিয়া তাহাকে যে নাম আমরা দিয়াছি, সে নামকে আমরা বলিব, গৌণ (secondary) স্বাভাবিক নাম।

স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্রের মোটামুটি বিবরণ আপনারা পাইলেন। স্বাভাবিক নামের যে শ্রেণীবিভাগ আছে সেটা বিশেষভাবে দেখার বিষয়। সে শ্রেণীবিভাগ (classification) প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচিত হইলেই ভাল হয়। আজ আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য নয়, জাগাইয়া দিবার জন্যই সেই শ্রেণীবিভাগের উল্লেখমাত্র করিলাম। বীজমন্ত্রের গোড়ার কথাগুলি (principles) আমরা এই প্রবন্ধে কতকটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম; শ্রেণীবিভাগটি বুঝিলে গোড়ার কথা কয়টি বুঝিবার আরও সুবিধা আমাদের হইতে পারে। আপাততঃ, স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্রের দুইটা দিক্ই আপনারা যেন স্মরণ রাখিবেন। কোন দ্রব্য মানে, একটা শক্তিব্যূহ ও চাঞ্চল্যের কেন্দ্র; এইটি থাকিলেই তার একটা শাব্দিক প্রতিকৃতি (acoustic equivalent) থাকিবে—পারমার্থিক-কর্ণেই হউক আর দিব্যকর্ণেই হউক; ইহাই তাহার বীজমন্ত্র। এই একটা দিক্। পক্ষান্তরে, বীজমন্ত্র বা স্বাভাবিক শব্দ থাকিলেই, দ্রব্য সঞ্জাত বা আবির্ভূত হইবেই; যোগীরা সমর্থ ভাবে 'রং' উচ্চারণ করিলে অগ্নির আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে। তুমি আমি 'রং' অথবা 'অগ্নিমীলে' প্রভৃতি যৌগিকমন্ত্র পুনঃপুনঃ রীতিমত ছন্দে উচ্চারণ করিলে শক্তির সংহতি (summation of stimuli, superposition of motions) হইয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারে, অন্ততঃ জঠরানল তো বটেই। ইলেকট্রনগুলি পুনঃপুনঃ ধাক্কা দিয়া মাথার উপর ঐ তারের মধ্যে যেমন বিজ্‌লি বাতি জ্বালাইয়া দিতে পারে, এখানেও সেইরূপ। আমার উচ্চারিত মন্ত্র বিশুদ্ধরূপে স্বাভাবিক নহে, কাজেই তাহাকে ফল দেখাইতে হইলে, ধ্বনি ছন্দ প্রভৃতি বাহাল রাখিয়া বার বার আমায় সেটি জপ পুরশ্চরণ করিতে হয়।

শেষ কথা, মন্ত্রের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখার কথা, বিজ্ঞানের কথার মত। হয়ত পরীক্ষায় সেগুলি 'হিং টিং ছট' রূপেই ধরা পড়িতে পারে; আপাততঃ তাহাই ধরিয়া লইবার কারণ নাই। বরং সম্ভাবনাটা অন্যদিকেই বেশি। এটা বিলক্ষণই জানা আছে যে ভারতের তিরিশ কোটি হিন্দুর (শুধু হিন্দুর কথাই বলিতেছি) জীবনে-মরণে, বিবাহে-শ্রাদ্ধে, ক্রিয়া-কর্মে ও নিত্য-নৈমিত্তিক সকল অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র এখনও এতটা আধিপত্য করিতেছে, সেট আমরা দু-পাঁচজন বাচাল কূপমণ্ডূক বাজে আলোচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও সেটার চেয়ে বেশি কেজো কথা কমই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

(শেষাংশ)

গতবারে আমরা শব্দের গোড়ার কথা কতক পরিমাণে আলোচনা করিয়াছি। শব্দের দিক হইতে দেখিতে যাইয়া আমরা আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের (experience of the world) পাঁচটা থাক্ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি—অশব্দ, পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্ম শব্দ এবং স্থূল শব্দ। শেষ তিনটাকে আমরা জড়াইয়া অপরশব্দ সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। সম্মুখে বিশাল জলরাশি। জলে যদি চাঞ্চল্যের লেশ না থাকে, জলরাশি যদি একখানা স্ফটিক দর্পণের মত সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার অবস্থা অশব্দের অবস্থা। জলে চাঞ্চল্য জাগিয়াছে, তরঙ্গগুলি ছুটাছুটি করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে, উঠিতেছে; ইহাই হইল পরশব্দের অবস্থা। আমি বা অপর কেহ সে ঊর্মিচাঞ্চল্য শুনিবার জন্য উপস্থিত না থাকিলেও তাহা পরশব্দ। কারণ, আমরা স্পন্দ বা চাঞ্চল্য মাত্রকেই পরশব্দ বলিব, এইরূপ পরামর্শ করিয়া লইয়াছি,—সে চাঞ্চল্য শ্রবণযোগ্য ও শ্রুত হউক আর নাই হউক। তারপর, স্বয়ং প্রজাপতি মহাশয় তাঁহার কর্ণে, অর্থাৎ নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য দ্বারা, জলরাশির সেই চাঞ্চল্য অবশ্য এমনভাবে শুনিলেন যার চেয়ে বেশি ও খাঁটিভাবে শোনা আর হইতে পারে না—ইহাই হইল শব্দতন্মাত্র—বর্তমান ক্ষেত্রে, তরঙ্গচাঞ্চল্যের বিশুদ্ধ অবিকৃত বাণীমূর্তি। ইহাই শব্দের প্রকৃতি ও আদর্শ (standard)। ঢেউগুলি যতই ছোট হউক না কেন, চাঞ্চল্য যতই মৃদু হউক না কেন, এমন কি বাহিরে স্পষ্টতঃ কোনওরূপ চাঞ্চল্য না থাকিয়া যদি শুধু অণু-পরমাণু ইলেকট্রন প্রভৃতিরই চাঞ্চল্য থাকে, তবুও তাহা প্রজাপতির কর্ণের নিকট পাশাইয়া যাইবে না; কারণ, আমাদের সংজ্ঞা-মত সে কর্ণ যে শ্রবণশক্তির পরাকাষ্ঠা নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য। যিনি কল্পিত পরাকাষ্ঠা বলিতে চাহেন তিনি তাহাই বলিয়া তৃপ্ত হউন। পক্ষান্তরে, চাঞ্চল্য যতই বিরাট বিপুল হউক না কেন তাহাও প্রজাপতি শব্দরূপে শুনিতেছেন। কোনও স্পন্দকে তোমার আমার শ্রবণযোগ্য হইতে হইলে একটা অধঃরেখা এবং একটা ঊর্দ্ধরেখার মাঝের কোনও অবস্থায় তাহাকে থাকিতে হইবে।

সূক্ষ্মতার একটা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইলে সেটা আর আমাদের শ্রবণযোগ্য হইবে না; আবার বিপুলতার একটা সীমা লঙ্ঘন করিলেও সে আমাদের কানে শব্দরূপে ধরা পড়িবে না। প্রজাপতির বেলায় এইরূপ কোন সীমারেখা নাই। এ প্রকার শ্রবণসামর্থ্যের কথা আমরা পূর্ব-প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। যেখানে ধাপের উপর ধাপ, থাকের উপর থাক্ দেখিতে পাই, সেখানেই একটা পরাকাষ্ঠার কথা, চরমের কথা আমরা ভাবিয়া লইতে পারি; সেই পরাকাষ্ঠার ভূমিই প্রাজাপত্য-পদবী—ঐশ্বর্য; যোগশাস্ত্র যাহার লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব-বীজম্।"

সে যাহাই হউক, এখন অগস্ত্য যদি এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিবার সংকল্প করিয়া আমাদের সিন্ধুতটে গিয়া উপস্থিত হন, তবে তিনি তাঁহার দিব্যকর্ণে হয়ত সাগরের এত মৃদু স্পন্দগুলির ভাষা শুনিবেন, যেগুলি তোমার আমার ভৌতিক কর্ণে আদৌ কোন সাড়া দেয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও বৈজ্ঞানিকযোগীরা তাঁদের যন্ত্ররূপদিব্যকর্ণের সাহায্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট জিনিষের স্পন্দগুলিকে ধ্বনিরূপে ধরিয়া ফেলিতেছেন, সেগুলির ভাষা যে অমনভাবে কোন কালে আমরা শুনিতে পাইব, তাহা পূর্বে কল্পনায় আনিতেও সাহস করিতাম না। এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা ফেলিয়া দিলেই টেলিফোঁ নামক যন্ত্রের নলটি কানের সন্নিকটে আনিয়া তাহাকে দিব্যকর্ণ বানাইয়া লইতে পারিব, এবং সেই দিব্যকর্ণের মাহাত্ম্যে, তুমি কাশীতে বসিয়া কথাবার্তা কহিলে, আমি এই তত্ত্ববিদ্যাসমিতির গৃহে বসিয়া ধ্যানস্থ (clairvoyant) না হইয়াই তাহা অবিকল শুনিতে পাইব। তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলকেরা ধ্যানধারণাপ্রসাদাৎ সে কাজ বে-খরচায় হাঁসিল করিয়া ফেলিতে পারেন; সুতরাং তাঁহাদের আর এখানে খরচা করিয়া টেলিফোঁর বন্দোবস্ত করিতে হয় নাই। তবে আবার, বিজ্ঞানও বোধহয় তত্ত্ববিদ্যার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। টেলিফোঁ-এ তোমার ও আমার মধ্যে তার টাঙ্গাইয়া লইতে হয়। তাহাতে হাঙ্গামা অনেক, খরচ বিস্তর। আমাকে যে পরিমাণে জড়ের সহায়তা লইয়া অভিলাষ পূরণ করিতে হইবে, সেই পরিমাণে জড়ের কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া তার গোলামি করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলাম আর কাজ হইল—এমনটা হইবে না; কাজ করিতে গেলে বাহিরের যে পাঁচটা জিনিসের উপর

আমাকে নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের রীতিমত ভাবে যোগাযোগ করিয়া লইতে হইবে। এইজন্য বৈজ্ঞানিকের টেলিফোঁ আমার অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও আমায় স্বাধীন করিয়া দিতে পারে নাই। শুধু টেলিফোঁ কেন, বৈজ্ঞানিকের অনেক আয়োজনই আমাকে গোলাম করিয়া রাখিতেছে—বাহিরটার কাছে, পরের কাছে। দেওয়ালে ওই বোতামটা টিপিলাম আর মাথার উপর সুরঞ্জিত কাচপুরীর ভিতর কেমন নিমেষে বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠিল। বেশ মজা। কিন্তু যে বিরাট তারের ব্যূহ আমাদের শহরটার মাথার উপর আকাশকে ছাইয়া রাখিয়াছে, অথবা আমাদের পদ নিম্নে সর্বংসহা ধরিত্রীর কলেবরে শিরা প্রশিরার মত নিজেকে চালাইয়া দিয়াছে, সেই তারের স্থল-বিশেষে যদি একটু গোলযোগ বাধিয়া যায়, তবে আমি দেওয়ালে বোতাম টেপা কেন, মাথামুড় খুঁড়িয়া আমার নিমতলা প্রাপ্তির সম্ভাবনা করিয়া তুলিলেও, আমার ঘরের ভিতর অন্ধকারের জমাট একটুখানিও ভাঙ্গিবে না। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মায়াপুরী আমাদের চিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেটা যে আবার গোলামখানাও, এ-কথাটাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানও মর্মে-মর্মে সেটা বিলক্ষণ অনুভব করেন। তাই টেলিফোঁ টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া, বিজ্ঞান, সূক্ষ্ম ও দূরবর্তী স্পন্দগুলিকে ধরিবার আর এক রকম ফন্দি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আচার্য মাক্সওয়েল ও হার্জ। মার্কোণিনামা পুরোহিতের কর্মকুশলতায় সে মন্ত্রের যথাযথ বিনিয়োগ হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরা পাইয়াছি তারহীন বার্তাবহ। সমুদ্রের গভীর জলে তার (cable) ফেলিয়া রাখিবার আর তেমন দরকার নাই; লম্বা লম্বা খুঁটি পুঁতিয়া শত শত যোজন তার টাঙ্গাইয়া আর না রাখিলেও খপরের বিনিময় চলিতে পারে। এ দৃষ্টান্তে তারের গোলামি আমাদের কমিল বটে, কিন্তু বাহিরে যে যন্ত্র আমাদের তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইতেছে, সময়ে-সময়ে সেটা এমন বিশাল মূর্তিতে দেখা দেয় যে তাহার সম্মুখে আমাদের মত আদার ব্যাপারীর প্রাণ বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। তারহীন বার্তাবহে এবং মূর্তিবহে আমাদের শক্তির বিস্তার বাড়িয়াছে এবং বাহিরের গোলামী অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে বটে, কিন্তু শক্তির পরাকাষ্ঠায় আমরা অবশ্য পৌঁছাই নাই এবং আমাদের গোলামীও একেবারে অপগত হয় নাই।

শক্তির পরাকাষ্ঠা যেখানে তাহাই প্রাজাপত্যপদবী; যে ভূমিতে উঠিলে সমস্তই আত্মবশ তাহাই স্বারাজ্যসিদ্ধি। ইহাই লক্ষ্য। বিজ্ঞানও নানা ভুল-ভ্রান্তি, সংশয়-সংস্কারের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। তত্ত্ববিদ্যা ও ভারতবর্ষের অধ্যাত্মশাস্ত্র যদি ঠিক হয়, তবে তাহার অনুশীলনের ফলে মানুষ ওই লক্ষ্যের দিকে আরও কাছাইয়া আসিতে পারে। যে ঈথারতরঙ্গগুলি তারহীন বার্তাবহ যন্ত্র (co-herer) পাতিয়া ধরিতেছে, সেগুলি এবং তার চেয়েও সূক্ষ্ম কম্পনগুলি যদি আমরা শুধু ধ্যানেই ধরিয়া ফেলিতে পারি, তবে শক্তির পরাকাষ্ঠার দিকে বেশি অগ্রসর ত হইলামই, অধিকন্তু সে শক্তি, বাহিরের সম্বন্ধে অনেক বেশি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হইল; দূরের সূক্ষ্ম স্পন্দগুলি গ্রহণ করিতে, বাহিরে একটা যন্ত্র বানাইয়া পাতিয়া রাখিতে আর হইল না। এ দৃষ্টান্তে পূর্বের কথাটাই পরিষ্কার হইতেছে—দিব্যকর্ণের বা যোগজ শব্দপ্রত্যক্ষের নানা থাক রহিয়াছে; যেমন যন্ত্র তেমন শোনা; আবার ধ্যানধারণা যত গাঢ়, অনুভবও তত গভীর। এই দিব্যকর্ণের চরম পরিণতি পারমার্থিক-কর্ণে; সকল যোগজ বিভূতির পূর্ণবিকাশ স্বয়ং যোগেশ্বরে। বলা বাহুল্য, তোমার আমার স্থূল কর্ণেরও শব্দ-গ্রহণ-সামর্থ্যের তারতম্য রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির জীবের ত কথাই নাই।

জলরাশির দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা এ পর্যন্ত পূর্ব প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত প্রধান কথা কয়টাই আবার ঝালাইয়া লইলাম। শব্দের পাঁচটা থাক্ এবং শব্দ-গ্রহণ-সামর্থ্যের তিনটা থাক্, ইহাই একটা প্রধান কথা। আর একটা কথা, স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রের লক্ষণ। দ্রব্য একটা শক্তিব্যূহ। সেই শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি কোনও নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা শব্দরূপে গৃহীত হয়, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র। এরূপ বিশুদ্ধ বীজমন্ত্রের নিজের দ্রব্য বা অর্থ গড়িয়া তুলিবার শক্তি আছে। আমরা গুরুমুখে বা সাধনায় যে বীজমন্ত্রগুলি পাই, সেগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে বিকৃত ও সংকীর্ণ। এইরূপ হইবার যে কারণ আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপতঃ পূর্ব প্রবন্ধে নির্দেশ করিয়াছি। আমাদের চলিত বীজমন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ নহে বলিয়া তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি (অর্থ গড়িয়া লইবার শক্তি) একপ্রকার সুপ্ত বলিলেই হয়। মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্য এবং জপ পুরশ্চরণ প্রভৃতির দ্বারা সে শক্তি ধীরে ধীরে জাগাইয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্ত

ও যুক্তি দেখাইয়া এই কয়টা কথা প্রতিপন্ন করিতে আমরা পূর্বপ্রবন্ধে প্রয়াস পাইয়াছি।

জড়জগতের সবিতা গ্রহ-উপগ্রহগুলির আদিম অবস্থারূপে একটা বিপুল নীহার-সমুদ্র কল্পনা করিতে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ভালবাসেন। ঋষিরাও জগতের (শুধু জড়জগতের নয়) আদি কারণ বা উপাদানকে কারণসলিলরূপে ভাবিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা আর-যাহা হউন আর না-ই হউন, কবি; তাঁহাদের বেদপুরাণগুলি কাব্য-সম্পদে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন, এই অপূর্ব চিত্রখানি আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? কারণসলিলে অনন্ত-শেষ-শয্যায় শুইয়া ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন। তাঁহার নাভিকমলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সমাসীন রহিয়াছেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু-কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইয়া 'ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ'—ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা বিপন্ন হইয়া যোগনিদ্রার স্তব করিয়া বিষ্ণুকে জাগাইলেন। বিষ্ণু জাগিয়া দৈত্য দুটার সঙ্গে লড়াই করিলেন। দৈত্যযুগল প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "আমরা খুসী হইয়াছি; তুমি আমাদের কাছে বর লও।" বিষ্ণু বলিলেন, "তোমরা আমার বধ্য হও।" এ গল্পটার রহস্য কি? আমরা যে শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনা এই দুই দিন ধরিয়া করিতেছি তাহারই গোড়ার কথা কয়টি এই গল্পের মধ্যে লুকান রহিয়াছে। বিষ্ণু সর্বব্যাপী আত্মা বা চৈতন্য। তিনি এক বই দুই নহেন। কিন্তু এক এক হইয়া থাকিলে ত সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির জন্য নিজেকে যেন বিভক্ত করিয়া দুই করিয়া লইতে হয়। তাঁহার এক ভাগ বা দিক্ (aspect) হইল আধার বস্তু; অপর ভাগ বা দিক্ হইল আধেয় বস্তু। অনন্ত-শেষ-শয্যা এই জাগতিক আধার বস্তুর সঙ্কেত; এবং সে বিরাট আধার বস্তু একটা অপরিসীম শক্তিব্যূহ (an infinite system of stresses)। আমরা মনে করি, বুঝিবা এই জলবিন্দুটিকে গোটা দু'চার শক্তি গড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে; আমাদের হিসাবের সম্ভাবনা ও সুবিধার জন্য আমাদিগকে ব্যাপারটাকে নিতান্ত ছোট করিয়া দেখিতে হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে আধারশক্তি জলবিন্দুর অণু-পরমাণু প্রভৃতিকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেটা ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল শক্তিব্যূহ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। জলবিন্দু কি জলবিন্দুরূপে বাহাল থাকিত, যদি তাহাকে পৃথিবী, বাতাসের রেণু প্রভৃতি টানিয়া ও চাপিয়া ও ধরিয়া না রহিত? পৃথিবী ও তার এত সাজ-সরঞ্জাম কি সম্ভবপর

হইত, যদি সৌরজগতের ও ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর দ্রব্য তাহাকে টানিয়া ও চাপিয়া ও সামলাইয়া না রহিত? এইপ্রকার টানিয়া, চাপিয়া রাখার নাম আমরা এক কথায় দিয়াছি শক্তিব্যূহ (stress)। অতএব জগতে এমন কোনো কিছু ছোট বা অল্প নাই যাহার আধার-শক্তিকে আমরা অনন্ত-শেষ-শয্যারূপে ভাবিতে না পারি। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে, তাহার আধার-শক্তি (constituting forces) নিখিল-শক্তি-ব্যূহের এক তিলও কম নহে। তুমি আমি অল্পই দেখিতে শিখিয়াছি, তাই অল্পর মূলে ও অল্পকে ঘিরিয়া যে ভূমা ও বিরাট রহিয়াছে, তাহাকে সহজে ধরিতে ছুঁইতে পারি না। বিজ্ঞান অনেক মাথা ঘামাইয়া পৃথিবী ও আতাফলের টানাটানির একটা বিবরণ দিল; বিবরণ খাসা হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদে আটখানা হইতেছি। কিন্তু ভুলিয়া যাই যে শুধু একটা গণিতের ফরমাসী আতাফল ও পৃথিবী লইয়াই এ বিশ্বের কাণ্ডকারখানা চলিতেছে না। দুইটা ছাড়িয়া তিনটা জিনিষের টানাটানি বুঝিয়া-পড়িয়া লইতে লাপ্লাসের মত মাথাও ঘুরিয়া যায়; নিখিল শক্তিব্যূহের বিবরণ দেবে কে? বিবরণ দিতে পারি আর নাই পারি, তাহাই কিন্তু ছোট, বড়, মাঝারি সকলেরই মূলে; আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে বিষ্ণু আধার-শক্তিরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন; সেই আধারশক্তির সংকেত অনন্তশয্যা। নব বিজ্ঞানের "মিথুনীভূত-দেশকাল" এই অনন্তশয্যার এক আস্তরণ!

তারপর নাভি-কমল। তাহার উপর ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। কে ব্রহ্মা? তিনি শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মের শব্দ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি যাঁহাকে আধার ও আশ্রয় করিয়া হইতেছে তিনি সর্বব্যাপী আত্মার অথবা বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যাস্তীর্ণ মূর্তি—সেই নিখিল শক্তিব্যূহ (সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ) যাহার কথা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছি। ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; এই বাজা ব্যাপারের মূলে ঘড়ির ভিতরকার চাকাগুলির, দোলক প্রভৃতির শক্তিগুলি (forces) রহিয়াছে; শুধু ভিতরকার হিসাব দিয়াই আমাদের রেহাই নাই; বাহিরের তাপ, আলোক, তাড়িত-চৌম্বক-শক্তি ও অপরাপর দ্রব্যের আকর্ষণ, এই বাজা ব্যাপারের পিছনে অবশ্যই রহিয়াছে। তবেই ঘড়ি যখন বাজিতেছে তখনও তাহার মূলে সেই অনন্তদেবই রহিয়াছেন, যাঁহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র অক্ষি প্রভৃতি বেদবাণী আমাদের বারবার শুনাইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত বুঝিলে আমরা বুঝিব কেন শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মাকে অনন্তশয্যাস্তীর্ণ বিষ্ণুর নাভিকমলে

বসাইয়া রাখা হইল। গল্পটা শুনিতে আজগুবি, কিন্তু ইহা সৃষ্টির বা অভিব্যক্তি-প্রবাহের মূল কথাটির দিব্য প্রতীক, এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। নাভি-বিবর হইতে পদ্মমৃণাল উদ্গত হইয়া আমাদিগকে ইহাই সংকেতে জানাইতেছে যে, ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম; কারণ, সকলপ্রকার শব্দাভিব্যক্তির মূলে যে নাদ বা প্রণবোচ্চার, তাহা ত নাভিস্থানকে বিশেষত আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে। নাদধ্বনি যে নিখিলধ্বনি-বৈচিত্র্যের মূল উৎস। প্রণবের আলোচনাস্থলে এ কথাটির আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। আপাতত নাভিকমলে শব্দব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মা কেন বসিলেন তাহার একটা কৈফিয়ৎ আমরা পাইলাম। সর্বব্যাপী আত্মা বা চিদ্বস্তু নিজেকে যেন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগে নিখিল-শক্তিব্যূহ-স্বরূপ আধার বা আশ্রয় হইলেন; অপরভাগে নিখিল-বেদশব্দাত্মক কলেবর ধরিয়া আধেয় বা আশ্রিত হইলেন। শব্দের স্রষ্টৃত্ব আমরা পূর্বেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শব্দের এই প্রকার সৃষ্টি-সামর্থ্য স্মরণ রাখিলে, আমাদের বুঝিতে আর গোল হইবে না কেন বিষ্ণুর নাভিপদ্মোপরিস্থিত শব্দব্রহ্মকে সৃষ্টির মালিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ আবির্ভূত হয়; সেই বেদশব্দপূর্বক সৃষ্টি হইয়া থাকে—জগৎ সেই শব্দ-প্রভব। বেদশব্দ মানে স্বাভাবিক শব্দ, এটা যেন মনে থাকে; অর্থাৎ কোনও পদার্থের মূলীভূত চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত হইলে যে বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ হয়, তাহাই; আমরা যেগুলিকে বেদশব্দ বলিয়া কহিতেছি ও শুনিতেছি, ঠিক সেগুলি নহে। আমাদের আপ্ত (inspired, revealed) শব্দগুলিতেও অল্পবিস্তর বিকৃতি ও সাঙ্কর্য্য হইয়াছে।

ব্রহ্মা শুধু আধার-কমলে বসিয়া আছেন এমন নহে; তাঁহার একটা বাহনও আমরা জুটাইয়া দিয়াছি; সেটা হংস। হংসটা কি? কোনওপ্রকার শব্দ উচ্চারণ ও শ্রবণ করিতে যাইলে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ (vital functioning) যে আদৌ হয়, সে পক্ষে হালের বিজ্ঞানও আর সন্দেহ রাখে না। সেই প্রাণন ব্যাপারের স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্র হংস; প্রাণিমাত্রেই, শুধু মানুষে নয়। গভীর রাত্রিতে জাগিয়া স্থির হইয়া বসিয়া শুনিলে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দটাকে মোটামুটি (roughly) "হংস" বলিয়াই মনে হয়। সাধকের দিব্যকর্ণে প্রাণনক্রিয়ার যে প্রায় বিশুদ্ধ ধ্বনি (approximate acoustic equivalent) ধরা পড়ে, তাহা যে সত্য সত্যই "হংস" সে বিষয়ে

শাস্ত্র, গুরু ও মহাজনেরা একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন। হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখার জিনিষ; শুনিয়াই মাথা নাড়িয়া বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রকাশ করায় কোনই লাভ নাই। বাহনের পরিচয় তো পাইলাম। বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বাহনও হংস—এ আপনারা স্মরণ রাখিবেন। বিরিঞ্চির হস্তে আবার অক্ষসূত্র। ইহা বর্ণমালা অর্থাৎ শব্দসমূহের মৌলিক অংশগুলি (units or elements of sounds)। যথা "গৌঃ" এই শব্দে গকারৌকার-বিসর্জ্জনীয়াঃ, গ, ঔ, ঃ। মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা অপর কোন দেবতার গলদেশে ইহাই মুণ্ডমালারূপে দুলিয়াছে। আসলে কিন্তু ইহা মাতৃকা—বর্ণময়ী। কমণ্ডলু, চতুরানন প্রভৃতির বিবরণ দিতে যাইলে আমাদের পুঁথি আর শেষ হইবে না। আপাততঃ শব্দের দিক হইতে মোটা মোটা আরও দু-একটা কথা আমরা ভাবিয়া দেখিব। নাদধ্বনি প্রধানতঃ নাভিস্থানে উত্তেজনা-বিশেষ হইতে সঞ্জাত হয়, এবং বাহন হংস প্রাণন ক্রিয়ার শাব্দিক মূর্তি—এই দুইটি কথা মনে রাখিলে, আমাদের আর বুঝিতে বাকি থাকিবে না যে, শব্দব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা শব্দতন্মাত্রবপুঃ, অর্থাৎ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ শব্দসমষ্টিই ব্রহ্মার কলেবর; আর, তিনি যাহার উপর আশ্রয় করিয়া এবং যাহাকে বাহন করিয়া রহিয়াছেন, সেই নাভিকমল ও হংস স্পন্দাত্মক পরশব্দের প্রতিমূর্তি। অতএব স্পন্দাত্মক পরশব্দকে মূল করিয়া শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূলশব্দ এই ত্রিবিধ অপরশব্দের যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছিলাম, তাহার একটা সাংকেতিক বিবরণ (symbolic representation) গল্পটার মধ্যে আমরা পাইলাম। আপাততঃ গল্প বলিয়াই চালাইতেছি, কিন্তু ঠিক গল্প ইহা নহে। বিষ্ণু সর্বব্যাপী ও সর্বাধার আত্মা। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছুর অভিব্যক্তি হইতেছে তাহার মূল বিষ্ণুতে। বিষ্ণুই অভিব্যক্ত হইতেছেন। আমরা যাঁহাকে বিষ্ণু আখ্যা দিতেছি তাঁহাকে, প্রাচীন বৈজ্ঞানিকের তরফের উকিল হার্বার্ট স্পেন্‌সার হয়ত "অজ্ঞেয় শক্তি" (Inscrutable Power) বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন। নাম যাহাই দেওয়া হউক, বিষ্ণুই বলি আর আদ্যাশক্তিই বলি, এই বিশ্বাভিব্যক্তির মূলে ও অন্তরালে একটা কিছু রহিয়াছে। নিখিল সৃষ্টির সম্ভাবনা, সূচনা ও প্রেরণা তাহারই ভিতরে। সেই বস্তুটি শব্দতন্মাত্ররূপে, শব্দপরাকাষ্ঠারূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন—অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই মূলবস্তু হইতে আবির্ভূত হইতেছেন। সেরূপ আবির্ভাবের জন্য পরশব্দের আবশ্যকতা যে আছে তাহা পূর্বেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু পরশব্দ থাকিলেই হইবে না,

দুটো একটা বাধা বা অন্তরায় অতিক্রম না করিতে পারিলে সেরূপ অভিব্যক্তি হইবে না। আমি শব্দ শুনিতেছি; আমার শ্রুত শব্দ নিরতিশয় শব্দ বা শব্দ পরাকাষ্ঠা নহে। কেন নয়? পূর্বপ্রবন্ধে আমরা শব্দ শোনার যে সমস্ত উপাদান ও নিমিত্তের আলোচনা করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে এই কথাটা পরিষ্কার হইয়াছে যে আমার শোনা শব্দতে বিকার (deformation) ও সঙ্কর (confusion), এই দুইটি দোষ অল্পবিস্তর থাকিবেই।

আমার স্থূল, ভৌতিক কর্ণ অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ শব্দ গ্রহণ করিতে যোগ্য নয়। আমার ভিতরে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন ইহাই তাঁহার কর্ণমল। এই কর্ণমল রহিয়াছে বলিয়া, আমার শ্রবণ-সামর্থ্যের এই ত্রুটি ও দোষ রহিয়াছে বলিয়া, আমি নিরতিশয় শব্দ বা স্বাভাবিক শব্দ শুনি না; এইজন্য আমার শোনা শব্দ স্থূল শব্দ, শব্দতন্মাত্র নহে; আমার কর্ণ ভৌতিক কর্ণ, পারমার্থিক-কর্ণ (Absolute Ear) নহে। শব্দ শোনার সামর্থ্য আমার মধ্যে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে পারে নাই; পারে নাই তার প্রমাণ, আমার কানে যন্ত্র লাগাইয়া অথবা ধ্যানস্থ হইয়া অনেক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে হয়। অভিব্যক্তির ধারা কোনও একটা বাধাতে ধাক্কা পাইয়া যেন থামিয়া রহিয়াছে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। সর্বভূতের মধ্যেই অভিব্যক্তির এই দশা দেখি। যতটা অভিব্যক্তি হইলে সম্পূর্ণতা হয়, পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা কখনও কোথাও হইয়াছে দেখি না। কি যেন একটা কি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, ষোল আনা ফুটিয়া উঠিতে দিতেছে না। আমার শ্রবণ-সামর্থ্যের এই যে দোষ বা প্রতিবন্ধক তাহাকে কর্ণমল বলিলে, বেশ বলা হয় না কি? বিষ্ণু মানে সর্বব্যাপী; কাজেই যেখানে কর্ণ বা শ্রবণ-সামর্থ্যের আয়োজন বা ব্যবস্থা, সেইখানেই এই বিষ্ণু কর্ণমল। অর্থাৎ শুধু তোমার আমার ঘরোয়া কথা নহে, ইহা একটি জাগতিক ব্যবস্থা। তবে, তোমার আমার দৃষ্টান্তে মূল তথ্যটি বুঝিবার সুবিধা আমাদের হইতে পারে। এখন, আমি যদি শ্রবণ-সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইতে চাই, তবে অবশ্য আমাকে কর্ণমল পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আমার ভৌতিক কর্ণটাকে পারমার্থিক-কর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কর্ণ নির্মল না হইলে শ্রবণ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ হইবে না। আমরা যে সকল লক্ষণ ও পরিভাষা করিয়া লইয়াছি, তাহাতে এ সকল কথা বলিয়া আমরা একটা কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছি মাত্র। কর্ণমল বা শ্রবণ-শক্তিনিষ্ঠ দোষ দুই কারণে হইতে পারে, অথবা

তাহার বিবৃতি দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। আবরণ ও বিক্ষেপ—তমঃ ও রজঃ। শব্দ হইল, অপরে শুনিতে পাইল, আমি পাইলাম না; এ ক্ষেত্রে কি যেন শব্দটাকে আমার কাছ হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; এই আবরণের জন্য বহু সূক্ষ্ম শব্দ আমি শুনি না, অনেক বিপুল শব্দও আমি শুনি না; দুইটি সীমা রেখার মধ্যে, একটা গণ্ডীর ভিতরে শব্দ আসিয়া হাজির হইলে, তবে আমি তাহাকে শুনিতে পাই। ইহার পরিভাষা করা হউক—তামসিক কর্ণমল। আবার শব্দ শুনিলেও ঠিকভাবে শোনার সম্ভাবনা আমার নাই। একই সময়ে নানা জিনিষের উত্তেজনা নানা শব্দ জন্মাইতেছে। বাগানে বসিয়া রহিয়াছি—কাকের ডাক, ঝিঁঝিঁর ডাক, চিলের ডাক প্রভৃতি কত শত শব্দ যে মাখামাখি জড়াজড়ি করিয়া আমার কানে আসিতেছে, তার হিসাব কে দিবে? মোটামুটিভাবে সেগুলিকে আমি আলাদা করিয়া চিনিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যে তাহারা মাখামাখি করিয়া, সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, সে পক্ষে আর সন্দেহ আছে কি? জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম; একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে চারিধারে সুশৃঙ্খলার সহিত ঢেউগুলি কেমন ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর একটা ঢেলা ফেলিলাম; নূতন একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইল, এবং তাহাকে বেড়িয়া আরও এক সার ঢেউ ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্বের ঢেউগুলি তখনও মিলাইয়া যায় নাই। নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সঙ্ঘর্ষ হইল, ফলে নূতন ও পুরাতন উভয়েই নিজস্ব প্রকৃতি ও শৃঙ্খলা হইতে অল্প-বিস্তর বিচ্যুত হইল। ইহা তাহাদের সাঙ্কর্য্য (interference of waves)। আমাদের শ্রুত শব্দগুলির এইরূপই দশা। কোন একটা জিনিষের নিজস্ব প্রকৃতি আমরা শব্দে তাই ধরিতে পারিতেছি না; যেটাকে কোন জিনিষের শব্দ বলিতেছি সেটা নিশ্চয়ই তাহারই নিজস্ব ও স্বাভাবিক শব্দ নহে। এ বিশ্বের হাটে সকলেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেছে; এ হট্টগোলের মধ্যে আমার হারানো মামার গলা বাছিয়া লওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছে। তবে অবশ্য "অধ্যেতৃবর্গ-মধ্যস্থ-পুত্রাধ্যয়ন-শব্দবৎ" মামার ডাক একেবারে যে না শুনিতেছি এমন নহে; সে ডাক আর পাঁচটা ডাকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। জগতের নিখিল সামগ্রীর যে ক্ষেত্রে গোলে হরিবোল দিবার ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে আমি বিকৃত, ভেজাল শব্দ শুনিতেই বাধ্য। ভেজাল ধরিয়া সংশোধন করিয়া লইবার সামর্থ্য আমার কর্ণের নাই। ইহা কর্ণের আর এক দোষ—ইহার নাম দিই রাজসিক কর্ণমল। এই কর্ণমলের

দরুণ শোনা শব্দগুলিও গোল পাকাইয়া যাইতেছে—প্রকৃতি বা স্বভাব হইতে বিচ্যুত, বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই দুই প্রকার কর্ণমলের একটা মধু, অপরটা কৈটভ; একটা তমঃ অপরটা রজঃ। এই কর্ণমলের সংস্কার না হইলে, কি আমাতে, কি তোমাতে, কি প্রজাপতিতে, পারমার্থিক-কর্ণ অথবা শব্দ-গ্রহণ-শক্তি-পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। বিষ্ণু, প্রজাপতি বা ব্রহ্মারূপে নিখিল স্বাভাবিক বা বৈদিক শব্দরাশি অভিব্যক্ত করিতে যাইতেছেন; সেরূপ অভিব্যক্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই, যতক্ষণ কর্ণমল রহিয়াছে। রূপকচ্ছলে বলা হউক, কথাটা কিন্তু সোজা, এবং কথাটায় আপত্তি করার কিছু নাই। অভিব্যক্তিধারা (stream of evolution) কে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে হইলে, সকল গণ্ডী, সকল বাঁধাবাঁধি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, এ কথা বলিলে উক্তেরই শুধু পুনরুক্তি করা হয় মাত্র। যে নির্মল হইবে তাহাকে ময়লা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এ কথা বলিলে নূতন কোন কথা বলা হয় কি? তুমি জলে ঢেলা ফেলিয়া দিলে, আমাকে তার শব্দ শুনিতে হইলে কান হইতে আঙুল সরাইয়া লইতে হইবে। সেইরূপ কারণসলিলে যে চাঞ্চল্য, তাহাকে নিরতিশয়ভাবে শুনিবার প্রয়োজন হইলে, শ্রবণ-সামর্থ্যের কুণ্ঠা ও কৃপণতা, অর্থাৎ কর্ণমল থাকিলে ত চলিবে না! এই জন্য প্রাজাপত্য অধিকার নিরুদ্বেগ করিতে হইলে কর্ণমল দূর করাই চাই। এই জন্যই শাস্ত্র বলিতেছেন মধু কৈটভ "বিষ্ণুকর্ণ-মলোদ্ভূতৌ ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ"। দৈত্যদ্বয় বিনষ্ট না হইলে অর্থাৎ কর্ণমল বিদূরিত না হইলে, ব্রহ্মার পদবী, অর্থাৎ নিরতিশয়-শ্রবণ-সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ ও চরিতার্থ হইতে পারে না। বিষ্ণুর যোগনিদ্রা না হইলে আবার দৈত্য দুইটার প্রাদুর্ভাব হয় না।

বীজের মধ্যে যাহা প্রসুপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তাহা যদি জাগ্রত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকিত, তবে ত বীজ গাছ হইয়াই রহিত। বীজ হইতে ধীরে-ধীরে গাছ হইতেছে—এই ক্রমিক ও ধারাবাহিক ব্যাপারটার তাহা হইলে কোনই অর্থ থাকিত না। অভ্যুদয় বা ক্রমবিকাশ নামক প্রবাহটা তাহা হইলে নিরর্থক হইয়া রহিত। বীজের মধ্যে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন, যে বৈষ্ণবী-শক্তি রহিয়াছেন, তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন বলিয়াই বীজ আপাততঃ বীজই হইয়া রহিয়াছে; সে শক্তির নিদ্রা, অর্থাৎ মূর্চ্ছিতাবস্থা (potential condition) যেমন যেমন অপগত হইবে, বীজের পাদপরূপে পরিণতিও তেমনি তেমনি প্রকৃত হইতে থাকিবে। এই জন্য সর্বভূতান্তরাত্মা বিষ্ণু না ঘুমাইলে ও

জাগিলে কোনও জিনিষের বাড়া-কমা, উদয়-বিলয়ের প্রসঙ্গই অর্থহীন হইয়া যায়। জিনিষের হ্রাস বৃদ্ধি মানেই তার ভিতরকার শক্তিব্যূহের বিভিন্ন অবস্থা। বিশ্বের উদয় বিলয় হইতেছে দেখিয়াই আমরা ভাবিতেছি যে, যে বস্তুটি বিশ্বের বীজ বা মূলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার একরকম সঙ্কোচ ও বিকাশ যেন আছে। জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি, অথবা নিখিল শক্তির আশ্রয় যে জগন্নিবাস, তাঁহার অনন্ত শক্তিব্যূহ সকল সময়ে ঠিক একভাবে থাকিলে, কোনরূপ চলা-ফেরা, হ্রাস-বৃদ্ধি, উদয়-বিলয় সম্ভবে না, সুতরাং সৃষ্টি অথবা জগৎ বলিলে যাহা বুঝি সেটা আদৌ সম্ভবপর হয় না। এটা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও স্বীকৃত কথা, দর্শন-শাস্ত্রের দুর্বোধ্য হেঁয়ালি নহে। বিজ্ঞান যাহাকে কার্যকরী শক্তি (Energy) বলেন, তাহার দুইটি অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। একটা প্রচ্ছন্নাবস্থা (potential বা static condition); অপরটা উদার বা ব্যক্ত অবস্থা (kinetic condition)। জলের কণিকাগুলি নূতনভাবে বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইলে বরফ হইল; এই অভিনব বিন্যাসের (new configuration-এর) ফলে বরফের উৎপত্তিতে প্রচুর তাপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে; আবার বরফ যখন গলিয়া জল হইতে থাকিবে তখন সেই প্রচ্ছন্ন তাপশক্তি হিসাবে ধরা পড়িয়া যাইবে। পুনশ্চ, জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখনও ওই প্রকার একটা অবস্থা হয়। জলের ভিতর যে বিষ্ণু রহিয়াছেন তিনি সব সময়ে ঠিক এক অবস্থায় থাকিলে জল জলই রহিয়া যায়, বরফ বা বাষ্প হইতে পারে না। এরূপভাবে দেখিলে, আমার মধ্যেও বিষ্ণু রহিয়াছেন, তোমার মধ্যেও রহিয়াছেন; আমার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি সব সময়ে ঠিক সমবস্থ হইয়া থাকিলে আমিও সব সময়ে সমবস্থই রহিয়া যাইতাম; আমার জ্ঞান ও কর্ম সব সময়ে ঠিক এই ভাবেই হইত; হয় না যে, ইহাতেই বুঝিতেছি, আমার মূলে একটা পরিবর্তনের ও ক্রমিকতার বন্দোবস্ত রহিয়াছে; আমার জ্ঞান ও শক্তি যে অল্প ও সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি, অথবা এই ব্যাপারটাকে বলিতেছি, যে, বিষ্ণু আমার মধ্যে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন। আমার অভিভূতাবস্থাই আমার বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। আমার যে ক্রমিক বিকাশ বা অভ্যুদয় তাহাই আমার বিষ্ণুর জাগরণ। শুধু আমার বেলায় নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেই এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়া রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ, জগৎ। রহিয়াছে বলিয়াই সৃষ্টি হইতেছে, বিকাশ হইতেছে। এই জাগতিক রহস্য ও সৃষ্টির গোড়ার কথাটি স্মরণ রাখিলে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ও প্রবোধ, এই

পৌরাণিক গল্প শুনিয়া আর হাসিব না। কার্যকরী শক্তির (Energy-র) ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা শুনিয়া বৈজ্ঞানিক হাসিয়া থাকেন কি?

ঘুমাইয়া থাকিলেই জাগা হয়, নামিয়া থাকিলেই উঠা হয়। বিষ্ণু কারণসলিলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ইহা যেন বিশ্ব-শক্তির একটা মগ্ন ও মূর্চ্ছিত অবস্থা (static condition)। এ ভাবটা সব সময়ে থাকিলে কোনও পরিণতি ও পরিবর্তন অবশ্য থাকে না। যে ধারাটিকে সৃষ্টি বলিতেছি সেটি আর আদৌ চলে না। বিষ্ণু আর ব্রহ্মারূপে, সৃষ্টিকর্তাভাবে দেখা দিতে পারেন না। ব্রহ্মাতে শব্দগ্রহণ-সামর্থ্যের যে পরাকাষ্ঠা, বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্র শুনিবার ও বলিবার শক্তির যে চরমোৎকর্ষ, তাহা সম্ভবে না যদি বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত না হন। বীজের শক্তির ব্যক্তাবস্থা মানেই অঙ্কুরাদি উদ্‌গম। যোগনিদ্রাবস্থাতেই কর্ণমল সম্ভবে; সেই অবস্থাতেই মধুকৈটভের প্রাদুর্ভাব। ব্রহ্মা স্তব করিয়া যোগনিদ্রা ভাঙ্গিলেন—প্রচ্ছন্নকে (potential-কে) উদার (kinetic) করিয়া লইলেন। যোগনিদ্রাভঙ্গে কর্ণমল, অর্থাৎ শ্রবণ-সামর্থ্যের অল্পতা ও কৃপণতা, অপগত হইল। মধুকৈটভের সংহার হইল। মধুকৈটভ শব্দের বিকার ও সঙ্কর। শব্দের বিকার ও সঙ্কর ঘুচিয়া গেলেই শব্দ বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক হইল। বীজমন্ত্রগুলির উদ্ধার ও চৈতন্য হইল। এইরূপ সমর্থ (dynamic ও creative) বীজমন্ত্রগুলি না পাইলে ত সৃষ্টি হইবে না, ব্রহ্মার অধিকারই সাব্যস্ত হইবে না। মধুকৈটভ বিনাশের পর ব্রহ্মা নিরুদ্বেগ ও চরিতার্থ হইলেন।

মধুকৈটভের আখ্যায়িকার ভিতরে শব্দের পূর্বালোচিত সব-কয়টা আসল কথা পাইলাম ত? আখ্যায়িকাটির এরূপ ব্যাখ্যাই আমরা দিতেছি কেন? কোন আখ্যায়িকার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে বসিয়া প্রথমেই ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তাহার মধ্যে কোনও নির্দেশসূত্র, স্পষ্ট সঙ্কেত, অথবা দিগ্‌দর্শন (pioneer) প্রচ্ছন্নভাবে দেওয়া আছে কি না। বর্তমান আখ্যায়িকার সেরূপ সঙ্কেত তিনটি। প্রথম সঙ্কেত ব্রহ্মার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। কাজেই ব্রহ্মা শব্দসম্পর্কীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা বেদশব্দ মানে বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দ। এইরূপ শব্দকে, অর্থাৎ বীজমন্ত্রকে, পুরোহিত করিয়াই ব্রহ্মার সৃষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া থাকে, অন্যথা, হয় না। মধুকৈটভ যে কাহারা তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য অতি স্পষ্ট সঙ্কেত রহিয়াছে—বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ। বস্তুতঃ "কর্ণমল" এই শব্দটিই এ মহারহস্য-পেটিকার

চাবিকাটি। তারপর ব্রহ্মা যোগনিদ্রার প্রবোধনের জন্য যে স্তব করিলেন, তাহা যে মুখ্যতঃ বাগ্‌দেবতার, শব্দব্রহ্মের স্তব; ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম হইবার জন্য পরমা বাকের স্তুতি করিতেছেন—সাধক তাঁহার সিদ্ধিকে বরণ করিয়া লইতেছেন। "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।" ইত্যাদি স্তব শুনিয়া আর সংশয় থাকে কি, কিসের এ স্তব, কেন এ স্তব?

সেদিন আমরা গঙ্গার গোলোকধামে উৎপত্তি, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থিতি, হরজটাজালে অবগুণ্ঠন এবং শেষকালে গোমুখীদ্বারে ভূতলে অবতরণ—এই আখ্যায়িকাটিরও শব্দপক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছি। গোলোক ও গোমুখীর "গো" শব্দ সেখানে আমাদের নির্দেশসূত্র (guiding line); আর ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া অগ্রসর হইতে হইতে এই মহারহস্যটিরই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে গঙ্গা বেদশব্দময়ী; ভগীরথের ঐ শঙ্খধ্বনি ত শব্দসঙ্কেত; এবং তাহাই গঙ্গামাহাত্ম্যের মর্মকথা আমাদিগকে ডাকিয়া শুনাইয়া যাইতেছে। গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে বেদশব্দধারা, বীজমন্ত্রসমষ্টি কতক কতক তোমার আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে; কর্ণমলের দরুণ তাহার বিকৃতি ও সঙ্কর অবশ্যই কিছু হইয়াছে; কিন্তু গুরুশিষ্যের অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় না থাকিলে বীজশব্দগুলির যতটা বিকৃতি ও সঙ্কর হইত, সম্প্রদায় থাকায়, ততটা হইতে পারে নাই। আমাদের প্রচলিত শব্দগুলির নানাকারণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হওয়ার একটা রোগ আছে। সেদিন চিত্র আঁকিয়া এ রোগের একটা নিদান দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কর্ণমল ও রসনামলের মাহাত্ম্যে আমাদের শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলি গোল পাকাইয়া ক্রমশঃই ভেজাল ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে। শব্দ যত অস্বাভাবিক হইবে ততই তাহা অশক্ত অসমর্থ হইতে থাকিবে। শব্দ হইবে অথচ বিষয়ের কোনও ঠিকানা থাকিবে না, বকিয়া মরিব কিন্তু অর্থ অদৃষ্টে যুটিবে না। এইরূপ অসমর্থ (uncreative) শব্দ লইয়া জীবন-যাপন ঝকমারি, সাধন ও সিদ্ধি ত দূরের কথা। ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে ভগবান যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, একথা তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি। ধর্মের ও সদাচারের একটা আদর্শ (standard) আবার বাহাল করিয়া দিতে, তাঁহার আমাদের এই কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ। বিষ্ণু আসিলেন কিন্তু তাঁহার পাদোদ্ভবা-গঙ্গা আসিলেন না, এমনটা হয় না। ধর্মের

গ্লানি দূর করিয়া আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য আসিলেন বিষ্ণু; আর শব্দ-বিভ্রাট দূর করিয়া স্বাভাবিক ও সমর্থ শব্দসমষ্টির ধারা পুনঃ বহাইয়া দিয়া জীবের সুখদা-মোক্ষদা হইবার জন্য আসিলেন গঙ্গা। স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্রগুলি হারাইয়া ফেলিলে জীব তার অন্তরাত্মায় ইষ্টদেবতার জন্য মণিমণ্ডপ, রত্ন-সিংহাসন গড়িবে কি দিয়া? কপিল আদিবিদ্বান শ্রুতি বলিতেছেন; তাঁহা হইতে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় স্বাভাবিক শব্দরাশি, নিখিল বেদ প্রবাহিত হইতেছে; সে ধারা অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিলেই কল্যাণ ও চরিতার্থতা। সগরপুত্রগণ মদোদ্ধত হইয়া সেই আদি-বিদ্বানের অবমাননা করিল, ধর্ষণা করিল; মানুষ, সেই আদি-বিদ্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া যে স্বাভাবিক-শব্দ ধারা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় বহিয়া আসিতেছে, তাহাকে উপেক্ষা করিল, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইল; বলিল—"আমরা শ্রুতি-স্মৃতি মানিতে যাইব কেন? বেদ যাহাকে স্বাভাবিক-শব্দ বলিতেছে সেটাই যে স্বাভাবিক-শব্দ তার প্রমাণ নাই; আমাদের চলিত শব্দেরই বা দোষ কি? আমরা এইগুলির দ্বারাই কাজ চালাইব।" এই অবিচারপূর্বক, অপরীক্ষাপুর্বক, বিদ্রোহের ফলে শব্দসঙ্কর ও শব্দবিভ্রাট সীমা উপচাইয়া ভয়ানক হইল। সম্প্রদায়েও (tradition-এ) শব্দসঙ্কর ছিল, তবে বাড়াবাড়ি হইতে পারে নাই, এবং সেটাকে সারিয়া লওয়ারও একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সম্প্রদায় মানিব না বলাতে, শব্দসঙ্কর আয় ছাড়াইয়া গেল; সেরূপ শব্দসঙ্করের ফল নিষ্ফলতা, বৈয়র্থ্য। ইহাই সগরপুত্রগণের ভস্মত্বপ্রাপ্তি, জীবসাধারণের পাতিত্য। ভগীরথ তপস্যা করিয়া আবার সেই বীজশব্দময়ী সনাতনী বেদবাণীকে মঙ্গল-ভৈরব শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে এই পতিত ধরায় বরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। পথিমধ্যে জহ্নুমুনি একবার সেই পুণ্যতোয়াকে পান করিয়া আবার বাহির করিয়া দিলেন, পদ্মাসুর পথ ভুলাইয়া অন্য পথে লইয়া যাইতে গেল। স্বাভাবিক শব্দরাশির মর্ত্যে বাহাল থাকিয়া আমাদের চতুর্বর্গ সাধন করার পথে দুইটি প্রধান বিঘ্ন বা অন্তরায়। বিস্মৃতি ও বিকৃতি। ভুলিয়া গেলে চলিবে না, আবার রূপান্তরিত, বিকৃত করিয়া ফেলিলেও চলিবে না। জহ্নুমুনি প্রথমটার সঙ্কেত, পদ্মাসুর দ্বিতীয়টার সঙ্কেত। তবে জহ্নুমুনি কেওকেটা নহেন, তাঁহার বিস্মৃতি যোগবিস্মৃতি, নির্বীজ সমাধিতে, তুরীয়ভাবে যে প্রকার বিস্মৃতি হয় সেই প্রকার বিস্মৃতি। সে ত অশব্দেয় অবস্থা, সে অবস্থায় শব্দের, এমন কি স্বাভাবিক শব্দেরও, কি স্মরণ থাকে? ইহা হইল শেষ থাকের অনুভূতি; ইহার সহিত

নীচের থাকের অনুভূতিগুলির সম্বন্ধ একটা চিত্র-সাহায্যে (পরিশিষ্ট—২ নং চিত্র) বুঝিবার চেষ্টা করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই।

ক-রেখা আমাদের সাধারণ-অনুভূতির দ্যোতক রেখা (Curve of Normal Experience)। খ-রেখা যোগীদের অনুভূতির দ্যোতক রেখা (Curve of Yogik Experience)। গ-রেখা এমন এক উচ্চ থাকের অনুভূতি বুঝাইতেছে, যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি না হইতেও পারে। আত্মা সত্যরূপের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই 'শরবত্তন্ময়' হইয়াই থাকিয়া গেলেন, তাহার সংবাদ বহন করিয়া নিম্নলোকে আর নামিয়া আসিলেন না। আবার কোনও আত্মা অমৃতের আস্বাদ পাইয়া আমাদিগকে তাহার কথা শুনাইবার জন্য সাধ করিয়া যেন আমাদের থাকে নামিয়া আসিলেন—শাস্ত্র রচিয়া জীবশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রবক্তা ঋষি। ইঁহারাই গুরু। গ-রেখা দ্বারা এমন এক আত্মার গতি ও পদবী আমরা দেখাইয়া দিলাম যিনি আর নামিয়া আসিলেন না। ঘ-রেখায় পাইতেছি ঋষি, পূর্বাচার্য ও গুরুবর্গকে। অনুভূতির একটা মুখ্যধারা শব্দ। সুতরাং শব্দের নানান্ থাক্ বুঝাইতেও এই চিত্রের ব্যবহার চলিবে। জহ্নুমুনি বেদশব্দরাশি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া যদি তাহা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে চালাইয়া না দেন, তবে ত ধারা ঐখানেই থামিয়া গেল; আমাদের মত ভস্মত্বপ্রাপ্ত সগরসন্ততিগণের উদ্ধারের ত কোনো ব্যবস্থা হইল না। তাই জহ্নুমুনিকে জঙ্ঘা চিরিয়া আবার গঙ্গাজীকে বাহির করিয়া দিতে হইল। "জঙ্ঘা" বলিতে উত্তমাঙ্গ হইতে অধমাঙ্গে অবতরণ—উচ্চ থাক্ হইতে শিষ্যসম্প্রদায়-কল্যাণ-কামনায় নিম্ন থাকে নামিয়া আসা বুঝান হইল। পদ্মাসুরের পিছন পিছন গিয়া আমাদের আর পথভ্রষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। সাধক-সম্প্রদায়-প্রবাহটাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বেদশব্দের গ্লানি ও শব্দসঙ্করের অভ্যুত্থান নিবারণ করিবার জন্য, ভগীরথের তপস্যাকে সূত্র ও উপলক্ষ্য করিয়া, সনাতন শব্দমালার আমাদের লোকে যে অবতরণ, তাহাই গঙ্গার আবির্ভাব—এই মূল কথাটি উপাখ্যানের ভিতর হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল না কি? পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূলশব্দ, এই কয়টি ধাপে ধাপে শব্দ যে আমাদের লোকে (Plane-এ) নামিয়া আসে, তাহার সন্ধান এই আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা পূর্বেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। "সনাতন-শব্দমালা" শুনিয়া নাস্তিক মহাশয় যেন চম্‌কাইয়া না উঠেন। ইহা একটি সংজ্ঞা, যেমন গণিত

শাস্ত্রের অনেক সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি এই:—যে কোনও দ্রব্যের মূলে অবশ্যই একটি শক্তিব্যূহ (System of Constituting Forces) রহিয়াছে। যদি সেই শক্তিব্যূহ-জনিত চাঞ্চল্য কোনও পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যের কাছে শব্দরূপে ধরা পড়ে, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক শব্দ, বীজমন্ত্র বা বৈদিক শব্দ। বলা বাহুল্য, লক্ষণ মানিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, এ প্রকার শব্দের সহিত তাহার বিষয়ের বা অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বা সনাতন। কোনও দ্রব্যের তিনটি বিন্দু সংযুক্ত করিয়া ধর, একটা সরলরেখা পাইলাম; এখন দ্রব্যটি স্থিরই থাকুক আর চলিয়াই বেড়াক, তাহার সেই তিনটি বিন্দু যদি এক সরলরেখাতেই বারবার থাকিয়া যায়, তবে সেই দ্রব্যকে গণিতের পরিভাষায় কঠিন দ্রব্য (Rigid Body) বলে। সত্য সত্যই সেরূপ কোনও জড়দ্রব্য আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তার কোনও মনগড়া (*à priori*) উত্তর দেওয়া যায় না; পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও, স্ব স্ব অর্থের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধের বন্ধনে বদ্ধ ("বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" উপমা দিবার জিনিষ হইয়া আছে) কোনও স্বাভাবিক শব্দমালা সত্যসত্যই আছে কি না, তাহারও কোনও মনগড়া উত্তর দেওয়া যায় না। ইহারও সত্যতা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। আমাদের কিন্তু লক্ষণ ও পরিভাষা করিতে কোনই বাধা নাই। কেন এইরূপ পরিভাষা করিতেছি তাহার কৈফিয়ৎ পূর্বপ্রবন্ধে বোধ হয় কতকটা পরিষ্কার হইয়াছিল। নাস্তিক মহাশয়ের সঙ্গে আপাতত আমরা আর আলাপ করিব না। মধুকৈটভবধ ও গঙ্গার ভূতলে অবতরণ, এই দুইটা বৃত্তান্তের মধ্যে আমাদের শব্দতত্ত্বের অনেক মর্মকথা আমরা টানিয়া বাহির করিতে পারিলাম। উপাখ্যানের যে যে অংশে শাস্ত্রকাররা রহস্যোদ্‌ঘাটনের চাবিকাটিটি ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেই সেই অংশ হাতড়াইয়া আমরা একেবারে বিফলমনোরথ হই নাই। পূর্বোপাখ্যানে "কর্ণমল" শব্দটি এবং পরের উপাখ্যানে "গোমুখী" প্রভৃতি শব্দ না পাইলে, আমাদের তথ্যান্বেষণ সহজ ও সফল হইত না। "গঙ্গা গঙ্গেতি যো·ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি"—গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিয়া এই মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে গঙ্গার মন্ত্রাত্মিকা মূর্তিটিই উজ্জ্বল হইয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে; মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাহা অর্থসফলতায় ধন্য হইয়া উঠিবে, এই মহাসত্যটিই আমাদের বুদ্ধিতে ভাসিয়া উঠে। যন্ত্রশুদ্ধি এবং তন্ত্রশুদ্ধি তার জন্য আবশ্যক। তবে আশঙ্কা হয়, কলির প্রভাবে

শব্দসঙ্কর, শব্দবিকার ও শব্দ-সঙ্কোচ যে-মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে গুরুপরম্পরাগত স্বাভাবিক শব্দমালা গঙ্গারূপে এই মেদিনীমণ্ডলের কলুষ-কলঙ্ক ক্ষালন করিতে, সাধকের যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিতে, আর বেশী দিন বুঝি থাকিবেন না। ভগবানের মীনকলেবরে, বরাহমূর্তিতে যে পুনঃ পুনঃ বেদ-সমুদ্ধার, প্রলয়পয়োধিজলে বটপত্রে শয়ান হইয়া তাঁহার যে বেদ রক্ষা—সে সকল কথার তলাইয়া আলোচনা করিতে যাইলেও আমরা শব্দতত্ত্বেই গিয়া উপনীত হইব। তবে সে আলোচনার অবসর আজ আর আমাদের নাই। মোটামুটি উপাখ্যান দুইটির যতটুকু আলোচনা আমরা করিতে পারিলাম, তাহাতে, আশা করি, আমাদের বেদপুরাণের আখ্যায়িকাগুলি যে একেবারে গুলির আড্ডায় রচিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিতে নাস্তিক মহোদয়েরও কতকটা দ্বিধা অতঃপর হইবে।

আমাদের দেওয়া শব্দের বিবরণটি শাস্ত্রসিদ্ধান্তের কতটা কাছে বা দূরে রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার নিজের বিশ্বাস, বড় বেশী দূর দিয়া যায় নাই। দুই একটা পরিভাষা পণ্ডিত মহাশয়দের দেওয়া পরিভাষার সঙ্গে হয় ত ঠিক খাপ্ না খাইতে পারে। পরশব্দকে "পরশব্দ" বলিবার ভিত্তি কি? আমরা যাহাকে শব্দতন্মাত্র বলিলাম তাহাই কি আমাদের পূর্বাচার্যগণের অনুমোদিত শব্দতন্মাত্র?—এইরূপ দুই-একটা পরিভাষা-সংক্রান্ত প্রশ্নের ঠিক উত্তর কি দিব, সে বিষয়ে হয় ত কতকটা ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু প্রধানত বিজ্ঞানের দিক হইতে অগ্রসর হইয়া, বেদশব্দের ও মন্ত্রের যে লক্ষণ ও ব্যাখ্যানটা মিলিল, তাহা আদৌ শাস্ত্রের দিক মাড়াইল না, একথা বলিলে, আমার বোধ হয়, কতকটা আনাড়ির মত কথা বলা হইবে। দর্শনগুলিসম্বন্ধে যাহাই হউক, উপনিষৎ বা অধ্যাত্মশাস্ত্র নৈয়ায়িক মহাশয়ের ফরমাইশ-মত ঠিক চলেন নাই। শিশু জিজ্ঞাসা করিল—পৃথিবী কেমনধারা পথে সূর্যের চারিধারে পাক দিতেছে? আমি তাহাকে বলিলাম—বৃত্তের মত গোলাকার পথে। কিন্তু পথ ত ঠিক বৃত্তের মত নয়; শিশু বড় হইলে, তার বুদ্ধি আরও একটু পরিপক্ব হইলে, আমি ভুল সংশোধন করিয়া দিলাম; বলিয়া দিলাম যে পথটি বৃত্ত নহে, বৃত্তাভাস (ellipse)। বিশেষজ্ঞরা জানেন যে এখানেও অব্যাহতি নাই, প্রয়োজনমত আরও সংশোধন করিয়া লইতে হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এইরূপ। শিষ্যের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইল, গুরু বলিলেন, "তুমি যে অন্ন খাইতেছ তাহাই ব্রহ্ম"। পরে

সংশোধন করিয়া বলিলেন, "প্রাণ ব্রহ্ম"; এইরূপে শিষ্যের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি যতই প্রস্ফুটিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহাকে গুরু ব্রহ্মের নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন; "ব্রহ্ম" শব্দটা বাহাল রাখিলেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ ক্রমশঃ বদলাইয়া দিতে লাগিলেন; শেষকালে শিষ্য আপনিই উপলব্ধি করিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। একই শব্দের এই পাঁচটা লক্ষণ একসঙ্গে পাশাপাশি ফেলিয়া রাখিলে নৈয়ায়িক মহাশয়ের শিরঃপীড়ার গুরুতর কারণ অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু যেখানে সাধকের বুদ্ধি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া একটার পর আর একটা, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর, লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া লইতেছে, সেখানে আগাগোড়া একটা শব্দই বাহাল্ রাখিলে ক্ষতি নাই; বরং তাহাই স্বাভাবিক। ব্রহ্ম কি—আত্মা কি—তাহাই আমি জানিতে চাহিয়াছি; আমার জানা ক্রমশঃই হয় ত গভীরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকিবে; কিন্তু আমার অনুসন্ধান-অন্বেষণের জিনিষ ত একই রহিয়াছে—ক্রমশঃ তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে ও ধরিতে পারিতেছি মাত্র। এ ক্ষেত্রে আমার অন্বেষণের সামগ্রীর নামটা বদলাইয়া না ফেলাই ভাল। তাই, অন্নই ভাবি, আর প্রাণই ভাবি, আর মনই ভাবি, আমি খুঁজিতেছি আত্মাকে, ব্রহ্মকে। যেমনটা বুঝিতেছি তেমনটা লক্ষণ দিতেছি। অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইহাই রীতি। অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়। নবোঢ়া বধূকে পাতিব্রত্যের নিদর্শনস্বরূপ অরুন্ধতী-নক্ষত্র দেখানর প্রথা পূর্ব্বে ছিল। অরুন্ধতী কিন্তু ছোট তারা, সহজে দেখা যায় না। তাই নিকটের একটা স্থূল, উজ্জ্বল তারার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া স্বামী বধূকে বলিলেন—"ঐ দেখ অরুন্ধতী"। যখন বধূর দৃষ্টি তাহাতে সুস্থির হইল তখন আবার স্বামী বলিলেন—"না ওটা নয়, উহার নিকটে যে ছোট তারাটি রহিয়াছে, উহাই অরুন্ধতী"। অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই রীতিতে আমাদের আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকেন। শব্দ একটা, তার পরিভাষা পাঁচ রকমের। যাঁহারা উপনিষৎগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে "আকাশ", "প্রাণ", "বায়ু" প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা ও প্রয়োগ পূর্ব্বোক্ত অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মবস্তুই লক্ষ্য, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া, এই শব্দগুলির মোটা মোটা লক্ষণগুলি আদৌ আমাদের সম্মুখে উপনীত করা হইয়াছে। এই নজিরে চৈতন্যের সম্পন্দ চঞ্চল অবস্থাটাকে পরশব্দ বলিলে অন্যায় হইল কি? বিশেষতঃ শ্রুতি জগৎ-প্রবাহকে যে শব্দপূর্বক বলিতেছেন তাহা মূলতঃ স্পন্দ বা

চাঞ্চল্য বই আর কিছুই নহে। সাম্যাবস্থার (cosmic equilibrium-এর) অবসানে যে বৈষম্যের প্রথমোন্মেষ (initial cosmic dis-equilibrium), তাহাকে চাঞ্চল্য ছাড়া আর কি বলিব? সাংখ্যকার প্রকৃতি এবং শব্দতন্মাত্রের মাঝে যে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার নামক দুইটা তত্ত্ব বসাইয়াছেন, সে দুটাকে জড়াইয়া, পরশব্দ বলিলে বিশেষ দোষ হয় না; কারণ, সে তত্ত্ব দুইটা বৈষম্যাত্মক এবং বিক্ষোভাত্মক; এবং আমাদের পরিভাষা মত বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্যই পরশব্দ; শ্রুতি ঈক্ষণাপূর্বক শব্দতন্মাত্র ও আকাশের সৃষ্টি করিতেছেন; আমরা সেই ঈক্ষণাকে পরশব্দ এবং "পশ্যন্তীবাক্", এই দুই পর্যায়ে লইতে পারি না কি? বলা বাহুল্য, আমরা শব্দের দিক হইতেই হিসাব লইতেছি। ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা। আমরা ইহাকে পরশব্দ বলিয়া নৈয়ায়িকের কাছে হয় ত দোষ করিলাম, কিন্তু শ্রুতির রীতি-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া যাইলাম কি? শব্দতন্মাত্র-সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা আর করিব না। তবে স্মরণ রাখিবেন, আমাদের লক্ষণমত, ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ—নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা গৃহীত শব্দ।

স্বাভাবিক শব্দের কিভাবে পরীক্ষা লইতে হইবে, তাহা আমরা পূর্বপ্রবন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছি। দ্রব্য ও অর্থ থাকিলেই যে শব্দ থাকে (অবশ্য পারমার্থিক-কর্ণে-শ্রুত), এবং যে শব্দ থাকিলেই তাহার অর্থ নির্মিত হইয়া যায় (অবশ্য বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে), সেই শব্দই স্বাভাবিক শব্দ। ইহাই স্বাভাবিক শব্দের পরীক্ষা (test)। স্বাভাবিক শব্দ-সম্বন্ধে আর দুইটি আসল কথা বলিয়া আমরা আপাতত বিদায় লইব। প্রথম কথাটি এই। লাটিম ঘুরিতেছে, তার ঘোরাটা অবশ্য একটা অক্ষের (axis of rotation-এর) অবলম্বনে হয়; আমাদের পৃথিবীও একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া পাক খাইতেছে। চুরুটের ধোঁওয়া পাক দিতে দিতে উপরে উঠিতেছে, এইরূপ পাক দেওয়াও অবশ্য একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। হেল্‌মহোল্‌জ ও লর্ড কেল্‌ভিন মনে করিতেন যে অণুগুলি ঈথারসাগরে ঐরকম এক একটা আবর্ত। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের আবর্তনও এক-একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। ইলেট্রনগুলো অণুর (atom-এর) ভিতরে পাক খায়—সেখানেও তবে অক্ষ ভাবিয়া লইতে আমাদের অধিকার আছে। যেখানে গতি কেবল একদিকে সোজাসুজি চলিয়া যাওয়া, সেখানে সেই গতির রেখাটিই অক্ষ। যেখানে আবর্তন

(rotation) হইতেছে, সেখানে অক্ষ সেই রেখাটি, যার চারিধারে এবং যার আশ্রয়ে আবর্তন হইতেছে। গাড়ির চাকার অক্ষ যেমন। যে দুই প্রকারের গতি বলিলাম, সেই দুইটার বিবিধ সংমিশ্রণে সকল প্রকার গতি হইতেছে। এইজন্য অক্ষের সাহায্যেই সকল প্রকার গতির হিসাব আমাদের লইতে হয়। গণিতশাস্ত্র অক্ষের সাহায্যে (co-ordinate axis-এর সাহায্যে) গতির (curve of motion-এর) বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিতে গিয়া নিতান্ত অদ্ভুত একটা কিছু করিয়া বসেন নাই। তাই আমাদের বলিতে সাহস হয়, অক্ষের কথা গত্যাত্মক এই জগতের গোড়ার একটা কথা। গতির পরীক্ষা করিয়া ইহা আমরা পাইলাম। পদার্থসমূহের, বিশেষতঃ সজীব পদার্থসমূহের উৎপত্তি কিরূপে হইতেছে, তাহা যদি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে আমরা অক্ষ (axis of generation) জিনিষটাকেই বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। গাছ হইতেছে—একটা মূলকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া শাখা প্রশাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; একটা পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, একটা মুখ্য শিরাকে অবলম্বন করিয়া শত শত শিরা প্রশিরা পত্রাবয়বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতএব এখানে অক্ষের ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটা লতা এই বর্ষার রসে বাড়িয়া গাছ ছাইয়া ধরিয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখিব একটা মূল অক্ষের আশ্রয়ে লতার নানাদিকে নানা ফেঙড়া বাহির হইয়াছে। একটা মূল (primary) অক্ষ; তাহা হইতে আবার কত গৌণ (secondary) অক্ষ বাহির হইয়াছে। উচ্চশ্রেণির জীবদেহ পরীক্ষা করিলে দেখি মেরুদণ্ড (spinal Axis) কে আশ্রয় করিয়া স্নায়ুজাল সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রাণনব্যাপার নির্বাহ করিতেছে। ভাইজ্‌মান প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদেরা আমাদের বলিয়াছিলেন যে বংশ-পরম্পরায় একটাই বীজপদার্থ (Germplasm) বরাবর বহিয়া যায়; তোমাতে আমাতে তাহার অল্পবিস্তর বিভিন্ন মূর্তি প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের ভিতর বংশগত বীজটি, তাহার নিজস্ব প্রকৃতিটিকে প্রায় অবিকৃত ও অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াই, বহিয়া যায়। আমার পিতামহ, পিতা ও আমি একই অক্ষকে আশ্রয় করিয়া লতার নানা ফেঙ্ড়ার মত এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু আমাদের সকলকে একসূত্রে সম্বন্ধ করিয়া রাখিতে বংশধারা, লতার মুখ্য অক্ষ-দণ্ডটির মত, অবিচ্ছিন্নভাবেই বহিয়া যাইতেছে। আমার উৎপত্তি আমার পিতার উৎপত্তি এই অক্ষকে আশ্রয় করিয়াই হইয়াছে। Mendelism, Emergent Evolution প্রভৃতি এ তত্ত্বের নানাভাবে বিস্তার করিয়াছে। আর দৃষ্টান্ত লইব

না, তবে কথাটা দাঁড়াইল যে অক্ষ জিনিষটা সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ব্যাপারে গোড়ার কথা। অক্ষ, মুখ্য বা গৌণ হইতে পারে—লতার দৃষ্টান্তে, মূল অক্ষ ছাড়া, ফেঙ্ড়াগুলিরও ছোট ছোট অক্ষ আছে। এখন সমস্যা এই—জগতে বিচিত্র শব্দ রহিয়াছে; নানা জীবের নানা শব্দ; নানা জাতির নানা ভাষা; তোমার আমার শব্দও ঠিক এক নহে; বিশ্বে এই শব্দ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি—নানাপ্রকার ভাষার উৎপত্তি—কি কোনও অক্ষ আশ্রয় করিয়া হয় নাই; ধ্বনিবৈচিত্র্যগুলি ভাল করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে তাদের মধ্যে আমরা কি কোনও মূল শব্দের (primaries) আবিষ্কার করিতে পারি না? ফুরিয়ারের রীতিতে গণিতবিৎ যে কোনও জটিল ছন্দোবন্ধ গতিকে (complex harmonic motionকে) সরল ছন্দোবন্ধ গতিতে (simple harmonic motion-এ) ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন, একথা আপনারা ভুলিবেন না। বিরাট শব্দ-বৈচিত্র্যের ভিতরে আমরা কি একটা অবিচ্ছিন্ন মৌলিক শব্দ-ধারা আবিষ্কার করিবার আশা করিতে পারি? লতা টানিয়া তার মুখ্য মেরুদণ্ডটি আমরা যেরূপ বাহির করিয়া লইতে পারি, সেইরূপ? এ প্রশ্নের উত্তর,—আমাদের সেরূপ আবিষ্কার করিতে পারাই উচিত; এবং তাহাই যদি হয়, তবে এটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শব্দের এই বিরাট বিশ্বরূপ মূর্তির যাহা মেরুদণ্ড (axis of generation), নিখিল শব্দরাশির যাহা মূল প্রকৃতি, তাহাই সেই স্বাভাবিক শব্দপ্রবাহ, বেদশব্দ ধারা, গঙ্গার আবির্ভাব, যাহার কথা এই দুই দিন ধরিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। "ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"—এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে আমরা এতক্ষণে চিনিতে পারিলাম কি? প্রাজাপত্য-ভূমি হইতে আমাদের থাকে শব্দপ্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, তাই ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ এই বৃক্ষ। বৃক্ষের একটি মূলকাণ্ড অবলম্বন করিয়া চারিদিকে নানা শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়ে, পত্র পুষ্পাদি উদ্‌গত হয়, সেইরূপ প্রজাপতির স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রগুলি নিম্ন ভূমিতে (lower plane-এ) নামিয়া আসিতে গিয়া একটা মেরুদণ্ডের আশ্রয় লইয়াছে—সেই মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়াই নিখিল শব্দ-বৈচিত্র্য একটা মহাপাদপের মত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সেই মেরুদণ্ডই হইল স্বাভাবিক শব্দ-ধারা, যাহা গুরুপরম্পরাক্রমে কতক পরিমাণে আমাদের কাছেও পৌঁছিয়াছে। এ স্বাভাবিক শব্দ-ধারাই সকল শব্দের প্রকৃতি ও আশ্রয়। যে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে

চিনিয়াছে, সে বেদ চিনিয়াছে—যস্তং বেদ স বেদবিৎ। যাবতীয় শব্দের সঙ্গে স্বাভাবিক শব্দের সম্বন্ধ এই প্রকার।

আর একটা কথা। একটা চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিলাম। সেই চুম্বকটি যে শক্তিব্যূহ (field, lines of force) রচনা করিয়া রাখিয়াছে, আমরা পরীক্ষা দ্বারা সেই শক্তিব্যূহের (lines of force-এর) একটা প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিতে পারি। বিজ্ঞানাগারে প্রত্যেক বালককে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া চৌম্বক-শক্তি ও তাড়িত শক্তির সমাবেশ বা সংস্থানের নক্সা আঁকিয়া ফেলিতে হয়। যে নক্সাখানা আমরা পাই তাহা সেই শক্তিব্যূহের চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual representation)। এখন দেখুন, রং বা হং এক একটা বীজমন্ত্র। ইহারা এক-একটা শক্তিব্যূহের শাব্দিক প্রতিকৃতি। কথাটা পূর্বেই বুঝাইয়াছি। কিন্তু সেই সেই শক্তিব্যূহের এক-একটা চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual or optic equivalent-ও) থাকিবে। চুম্বকের যেমন ধারা থাকে। আমরা ধরিতে পারি আর নাই পারি, আছে। চুম্বকের বেলায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি, পরীক্ষা দ্বারা সেই চাক্ষুষ প্রতিকৃতি আমাদের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ফল কথা, শব্দের দিক হইতে দেখিলে শক্তিব্যূহ যেরূপ স্বাভাবিক শব্দরূপে ব্যক্ত হয়, রূপের দিক হইতে দেখিলে, তাহা সেইরূপ স্বাভাবিক রূপভাবে ব্যক্ত হয়। শব্দের বেলায় যেমন পারমার্থিক-কর্ণ, দিব্যকর্ণ ও ভৌতিক কর্ণ রহিয়াছে, রূপের বেলায়ও তেমনি পারমার্থিক চক্ষু, দিব্যচক্ষু ও ভৌতিকচক্ষু থাকিবে। স্বাভাবিক শব্দকে আমরা বলিয়াছি মন্ত্র, আর স্বাভাবিক রূপকে আমরা বলিতেছি যন্ত্র—যথা, শ্রী-যন্ত্র। বৈদিক যজ্ঞ এবং তান্ত্রিক হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে মন্ত্র যেমন চাই, যন্ত্রও তেমনি চাই। মন্ত্র ও যন্ত্রের "কুসংস্কার" এতক্ষণে আমরা একটু বুঝিতে পারিলাম কি?

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া খাঁটি স্বাভাবিক শব্দের আলোচনাই করিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক শব্দের অর্থটাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) মনে করিয়া ইহার বেশ একটা শ্রেণীবিভাগও করা চলিতে পারে। পূর্বপ্রবন্ধে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আজও আমাদের আর অবকাশ নাই। সে শ্রেণীবিভাগের সামান্য একটু নমুনা দেখাইয়াই আজিকার মত ক্ষান্ত হইব। অপর শব্দ লইয়া শ্রেণীবিভাগ করিতেছি।

অপর শব্দ দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক (artificial)। কোন একটি

পদার্থকে বুঝাইবার জন্য আমরা অনেক সময় যদৃচ্ছাক্রমে (arbitrarily) কোনও একটি বাচনিক সংকেত (vocal sign) ব্যবহার করিয়া থাকি; যে সংকেতটি ব্যবহার করিয়া থাকি, সেই সংকেতটি ব্যবহার না করিয়া অন্য সংকেত ব্যবহার করিলেও চলিত; যে নামে ডাকিতেছি সেই নামেই ডাকার কোনও নিয়ত হেতু নাই। যেমন, আমরা কোনও ব্যক্তিকে যদু বা হরি এই নামে ডাকিয়া থাকি। এই নাম অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বা মনগড়া নাম। বলা বাহুল্য, আমাদের স্বাভাবিক শব্দ বা নামের যে লক্ষণ তাহা এ-সব ক্ষেত্রে নাই। নাম স্বাভাবিক হইতে হইলে তাহাকে পদার্থের সত্তা ও স্বরূপের সঙ্গে কোনও রূপ একটা সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। যে নাম দিতেছি তাহার একটা হেতু বা কৈফিয়ৎ থাকিবেই। সুতরাং এ রকম নাম আমরা আমাদের খোস্ খেয়াল মত দিতে পারি না।

তারপর, স্বাভাবিক নাম আবার দুই প্রকার—নিরতিশয় ও সাতিশয়; প্রকৃত ও বিকৃত (pure এবং approximate)। পারমার্থিক-কর্ণে শ্রুত শব্দতন্মাত্রই নিরতিশয় শব্দ; তাহাই শব্দের প্রকৃতি। শ্রবণসামর্থের পরাকাষ্ঠা নাই, এমন কর্ণে শ্রুত শব্দ সাতিশয় শব্দ; তাহা অল্প বিস্তর বিকৃতিপ্রাপ্ত; একেবারে খাঁটি শব্দ নহে। দিব্যকর্ণ ও লৌকিক কর্ণ এই শব্দ শুনিতে সমর্থ। নিরতিশয় শব্দের পরিভাষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। সাতিশয় শব্দের শ্রেণীবিভাগ আমরা করিতেছি। কোনও পদার্থ রহিয়াছে, তাহার মূলীভূত শক্তিব্যূহ সমষ্টিভাবে (as a whole) দিব্যকর্ণে যে শব্দ উৎপাদন করে, সেই শব্দ সেই পদার্থের মুখ্য (primary) সংজ্ঞা। এইটি পদার্থের বীজমন্ত্র। যেমন ধর, অগ্নির মুখ্য নাম রং; আকাশের হং; প্রাণনক্রিয়ার হংস, ইত্যাদি। এইগুলি মৌলিক অথবা যৌগিক (simple অথবা compound) হইতে পারে। রং পূর্বোক্ত প্রকারের, হ্রীঁ বা ক্রীঁ শেষোক্ত প্রকারের। মৌলিক বীজগুলির সংযোগে বা সংমিশ্রণে যৌগিক বীজগুলি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পদার্থের শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে (specifically), আংশিকভাবে, ক্রিয়া করিয়া যে শব্দানুভূতি জন্মায়, সে শব্দকে, সেই পদার্থের গৌণ (secondary) নাম বলা চলিবে। এ নাম বীজমন্ত্র নহে। ধর কাক ডাকিল; তাহার ডাক শুনিয়া তার নাম দিলাম কাক; এখানে যে শক্তিব্যূহ কাককে কাক করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটা আংশিক অভিব্যক্তি তাহার ডাকে; কাকের চলা-ফেরা, খাওয়া-বসা প্রভৃতি অপরাপর অভিব্যক্তিও

রহিয়াছে; কাক শব্দও নানা রকমের করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, 'কাক' এই শব্দটা কাকের গৌণ স্বাভাবিক নাম। আবার, কাক নিজেই ডাকে; কেহ তাহাকে ডাকাইয়া দেয় না। অতএব, তাহার শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত। ঢাকে কাটি দিয়া তাহার ধ্বনি শুনিলাম, ধ্বনি শুনিয়া তার নাম দিলাম ঢাক। এই নাম তাহার গৌণ স্বাভাবিক নাম। তবে এ ক্ষেত্রে শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত নহে, পরতঃ-সম্ভূত। এই দুই স্থলেই শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রবণেন্দ্রিয়টাকে উত্তেজিত করিতেছে; কাকের শব্দ বা ঢাকের শব্দ আমি শুনিতেছি ও শুনিয়া নাম দিতেছি।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশ শব্দ অন্য রকমের। অগ্নির মুখ্য স্বাভাবিক নাম বা বীজ রং। কিন্তু তাহাকে অগ্নি বলিতেছি কেন? অগ্নি জ্বলিলে তাহার লেলিহান শিখা এবং কুণ্ডলাকারে ঊর্দ্ধগামী ধূম আমরা দেখি; এই বক্রগতি বা আবর্তের মত গতি বুঝাইতে চাই; তাহা করিতে গিয়া "অগ্" ধাতু আমরা আবিষ্কার করি; তাহার উপর যথাযোগ্য প্রত্যয় করিয়া "অগ্নি" শব্দ পাই। এই "অগ্নি" শব্দ আমাদের চোখে দেখা অগ্নির একটা ধর্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। শুধু "রং" বলিলে এই ধর্ম বা সম্বন্ধ বিশেষভাবে সূচিত হয় না। "অগ্" ধাতু 'অ' ও 'গ' এই দুইটা বর্ণের সমাবেশে হইয়াছে; 'অ' ও 'গ' খুব-সম্ভবতঃ দিব্যকর্ণে শ্রুত গতিবিশেষের মুখ্য স্বাভাবিক নামের উপাদান। প্রত্যেক বর্ণ এক-একটা অর্থের (যোগভাষ্যকারের মতে নিখিল অর্থের) মুখ্য নাম বা বীজ; এবং তাহাদের বিবিধ সংযোগ ও সংস্থান দ্বারা কোনও একটা পদার্থের বা ক্রিয়ার মুখ্য স্বাভাবিক নাম হওয়া বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিব। একটা ধর্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য "অগ্নি"; অপরাপর ধর্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য সেইরূপ "বহ্নি" (হুতদ্রব্য দেবতার উদ্দেশ্যে বহন করে), "হুতাশন", "বৈশ্বানর" (বিশ্বনর বা সর্বজীবে পাচকাগ্নিরূপে বর্তমান) প্রভৃতি নাম রহিয়াছে। কাকের ডাকের মত এগুলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কানে শোনা শব্দের অনুরূপ নহে। শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে চক্ষু, ত্বক্ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চেতাইয়া কতকগুলি ধর্ম ও সম্বন্ধের জ্ঞান আমাদের দিতে পারে—যেমন অগ্নির দৃষ্টান্তে বক্রগতি প্রভৃতি। সেই ধর্ম ও সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ধাতু, উপসর্গ, প্রত্যয়াদি লইয়া আমাদের এক-একটা নাম গড়িয়া লইতে হয়—আমরা নিজেরাই গড়িয়া লই, অথবা পরম্পরাক্রমেই প্রাপ্ত হই। এগুলিও খুবই প্রয়োজনীয় শব্দ। এগুলির যথাযথ

সংযোগ সংস্থানেও সমর্থ বেদমন্ত্র বা তান্ত্রিক মন্ত্র হইতে পারে। তবে এ বিরাট ব্যাপারের আলোচনায় আজ আর প্রবৃত্ত হইব না।

বহু বর্ষ পূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতা দুটি এইখানে শেষ হইল। মাঝে কিছুদিনের ব্যবধানে বক্তৃতা দুটি দেওয়া হয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলী উভয় ক্ষেত্রে ঠিক একই ছিলেন না বলিয়া, এক কথা বার বার বলিতে হইয়াছে। যাঁরা সতর্ক সারগ্রাহী তাঁরা এইসব পুনরুক্তি, রূপক, আখ্যায়িকা ও বহুধা পল্লবিত প্রসঙ্গের মাঝেও সার কথাগুলি সহজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন আশা করি। আলোচ্য বিষয়টি দুরূহ ও নীরস, সেটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ও সরস করিয়া উপনীত করার চেষ্টা হইয়াছে। রূপক এবং আখ্যায়িকাগুলিও মূল উদ্দেশ্যেরই অনুবাদক। বহির্বিজ্ঞান বিদ্যা বর্তমান শতকে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে। যে "বৈজ্ঞানিক কাঠামো"তে উপরের আলোচনা দুটি হইয়াছিল সে কাঠামোও কতক বদ্‌লাইয়াছে। তবে, সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, আমাদের আলোচিত "সিদ্ধান্তের" সাথে বিজ্ঞান বিদ্যার (জড়, প্রাণ ও মানস ক্ষেত্রে) "সহযোগিতা" এবং মৈত্রী বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। প্রাচীন অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এবং নবীন পদার্থ বিজ্ঞান আর সর্বথা বিভিন্নমুখী (divergent) নয়; তথ্য, তত্ত্ব, লক্ষ্য পদ্ধতি—সব দিকেই ব্যবধানটা ক্রমেই হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে। "নৈমিষারণ্য" ও লেবরিটরির মিলন অবাস্তব স্বপ্ন আর নয়। মিলনটি না ঘটিলে জগতের কল্যাণ নেই। তাই মিলনটির জন্য দুই-দিক থেকেই আগ্রহ ও প্রস্তুতি আবশ্যক। অথচ, নিজেদের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য ও শুদ্ধি রক্ষা করিয়াই মিলনটি ঘটাইতে হইবে। কেহ কাহারও "তল্পিবাহক" হইলে চলিবে না। ভারতের স্বাধীনতার মুখেই "সমর্থ" মিলন মন্ত্রটি উচ্চারিত হইবে, মনে হয়। তার জন্য, স্বাধীন ভারতকে আপন "স্বভাবে" প্রতিষ্ঠিত, সমর্থ থাকিতে হইবে। লেবরিটরিকেও তার সত্যানুসন্ধানের "ঋত"টি স্বভাবে রাখিয়াই শিব ও সুন্দরের সাধনে ও উপলব্ধিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

শেষে আর একটা কথা। পূর্বের আলোচনায় "স্বাভাবিক শব্দকে" সকলেই যেন আমাদের নাগালের বাহিরে এক "কল্পিত পরাকাষ্ঠা" (theoretical possibility or limit) ভাবিয়াই ছাড়িয়া না দেন। "নিরতিশয়" শ্রবণ বা উচ্চারণ সামর্থ্যেই শব্দের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সামর্থ্য আমাদেরও অর্জ্জনের বস্তু। তার সাধনই

জপাদি। প্রধানতঃ বাগ্‌যন্ত্র বা শ্রবণ যন্ত্রের অভ্যুদয় সাধন করিয়া এ সিদ্ধি অর্জিত হয় না। যেমন, গুণী তানসেনের সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধি শুধু গলার কসরৎ-এর হিসাবে নয়। দেহ, প্রাণ ও মন—এ তিন লইয়া গোটা যন্ত্র। সুতরাং, সাধনের উদ্দেশ্য—এ তিনেরি সুষ্ঠুভাবে যোগ্যতা সম্পাদন। এর নিমিত্ত অনেক কিছু আধ্যাত্মিক সম্পদের অনুশীলন আবশ্যক। শ্রদ্ধা, ভাব-ভক্তি, প্রেম—বিশেষ করিয়া। কেননা, "যন্ত্র"টাকে শুদ্ধ, একতান, উন্মুখ, একাগ্র করিতে—সনাতনী গঙ্গা-প্রবাহকে আপন আধারে ধারণ করিতে—এ সবের তুল্য আর কি আছে?

স্বাভাবিক রূপ বা যন্ত্র

এই নামেও দুইটি বক্তৃতা বহুবর্ষ পূর্বে দেওয়া হইয়াছিল, এবং একটি প্রকাশিতও হইয়াছিল। অপরটি, সম্ভবতঃ, প্রকাশিত হয় নাই, এবং সেটার পাণ্ডুলিপিও বর্তমানে গরমিল। যেটা প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইটাই—প্রায় সেই আকারেই—এখানে সন্নিবেশিত হইল। "যন্ত্র"-এর রহস্যটা যে কি তাহা বুঝার পক্ষে এটার উপযোগিতা কিছু থাকিতে পারে। জপাদি সাধনে মন্ত্রের মত যন্ত্রেরও উপযোগ আছে।

যে "বৈজ্ঞানিক কাঠামো" সম্মুখে রাখিয়া বহুদিন আগে ওই আলোচনা হইয়াছিল, সে কাঠামোটা ঠিক আর তাই নাই। মূর্ত পদার্থগুলির ক্ষেত্রে সে কাঠামো এখন নব "শক্তিকণা"বাদ, আপেক্ষিকতাবাদ (সামান্য ও বিশেষ), কেন্দ্রীণ বিজ্ঞান (Nuclear Physics), মৌলিক ঊর্মি-বিজ্ঞান (Wave Mechanics), সম্ভাব্যতা—অনিশ্চয়তাবাদ (Probability cum Uncertainty), ব্যোম-বিজ্ঞান (Astral Physics) এই সব বিভিন্ন "অবয়বে" বিভক্ত হইয়া সেগুলিকে পরস্পর সুসমঞ্জস করার যত্ন করিতেছে। হিসাব ও পরীক্ষা—দুই দিক দিয়াই প্রয়াস চলিয়াছে। পূর্ণ সমন্বয়টি এখনও হইয়া ওঠে নাই। কিন্তু যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাতে আশা হয় United Field Physics সুদূরবর্তী আদর্শমাত্র না থাকিতে পারে। তবে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—অতর্কিত "অন্তরায়" দেখা দিয়া হিসাব ওলট-পালট করিয়া দেওয়াও বিচিত্র নয়। এ বিশ্বটা আমাদের বুদ্ধির দরবারে "বেয়াড়া" হইতেই বা কতক্ষণ। যখনই "এইবার বুঝি কাজের সুরাহা হইল" ভাবিয়াছি, তখনই কোথা হইতে সব-ভণ্ডুল-কারী কেহ আসিয়া হাজির হইয়াছে। সে যাই হোক, পদার্থবিজ্ঞান অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন করার দিকেই অগ্রসর হইতেছে—এটা নিঃসংশয়ে মনে করার সময় আসিয়াছে। "মন্ত্র" "যন্ত্র" প্রভৃতির যেটা "বৈজ্ঞানিক" ভিত্তি সে ভিত্তি দৃঢ়তরই হইতেছে। বিজ্ঞান পরীক্ষা-সমীক্ষায় যে যন্ত্র ব্যবহার করে, তার নাম Apparatus বা Instrument. অন্বীক্ষা বা বিচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধির (Logic-এর) যে বিশেষ "যন্ত্র"টি ব্যবহার করে, তার সাধারণ নাম গণিত—Calculus. এই দ্বিবিধ যন্ত্র সাহায্যে বিজ্ঞান

সৃষ্টির সর্বাবয়বে (অণু কি মহানে) যে মৌলিক যন্ত্র (Basic Structure) রহিয়াছে, তাই ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যন্ত্ররূপ বলিতে তিনটিই বুঝিতে হইবে—আকৃতিরূপ (Form Pattern), ক্রিয়ারূপ (Function Pattern) এবং শক্তিরূপ (Force or Power Pattern)। অণুর ভিতর নাভি, অর, নেমি—এ তিনের সন্ধানই বহুদিন মিলিয়াছে। সম্প্রতি "নাভি" বা কেন্দ্রনিষ্ঠ যে যন্ত্র সেইটায় বেশী মনোযোগ। ফলে নাভিতে মহাশক্তিব্যূহের আবিষ্কার ও প্রয়োগও সম্ভাবিত হইয়াছে। প্রয়োগটি আমাদের বর্তমানে আশ্বস্ত করে নাই, সন্ত্রস্ত করিয়াছে। সে যাই হোক, সূক্ষ্মের দহরাকাশে বিন্যস্ত ঐ বিপুল শক্তিযন্ত্রটাই আসল কথা। সে যন্ত্রের একটা প্রতিকৃতি (Graphic representation) আঁকিবার চেষ্টাও যে না হইতেছে এমন না। কিন্তু প্রতিকৃতি সাব্যস্ত হয় নাই। সে প্রতিকৃতি আমাদের "কল্পনাযোগ্য" (Picturable) না হইলেও ক্ষতি নাই। পূর্বশতকে লর্ড কেল্‌ভিনের মত এ বায়না আমরা আর করি না—যে কোনও "তথ্য" কে বাস্তব হইতে গেলে তার একটা "যান্ত্রিক আদর্শ" (mechanical model) আমাদের করিতে পারা আবশ্যক। Mechanical কেন, mental image-এরও বালাই আর তেমন নাই। বড়্—রাদারফোর্ডের আণবিক কাঠামো এখন সবদিকে সামাল দিতে অপারগ। তবু এটা ঠিক যে, অণুর নাভিতে একটা শক্তিব্যূহরূপ আছেই। সে ব্যূহটা যে ঠিক কিরূপ তাহা নয় এখন না জানিতে পারা গেল।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মনে হয়—যেটাকে অণুর নাভি ভাবিতেছি, সেটাও তার বাহিরেরই কাঠামো—disposition of crustal or shell forces. মূল হইতে সৃষ্টির ধারা ঐখানে নামিয়া আসিয়া যেন তার ব্যক্ত শক্তিরাশি "জমাট" করিয়া রাখিয়াছে; ভিতরে প্রাণরূপে, মনরূপে, চৈতন্য ও আনন্দরূপে শক্তির "অন্দর মহলগুলি" আপন আপন স্বাভাবিক ভঙ্গীতে (অর্থাৎ "যন্ত্রে") সাজান রহিয়াছে। সে সবের সন্ধান এখনও আমরা পাই নাই। ক্রমশঃ অন্য উপায়ে, পাইব। কেননা, জড় যন্ত্র আয়ত্তে আনার যে উপায়, যে কৌশল, প্রাণাদির যন্ত্র আয়ত্তে আনার ঠিক সে উপায়, সে কৌশল নয়। তার বিদ্যা (technique) আলাদা। সে বিদ্যা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কাছে পাইতে হইবে।

বিরাটের ক্ষেত্রেও Sapce-এর সান্ততা, বক্রতা, বস্তু ও বক্রতার সম্পর্ক, স্থূল বিশ্বের বর্দ্ধিষ্ণুতা—ইত্যাদি বিরাটের আলেখ্যটাকেও কল্পনার গণ্ডী ছাড়াইয়া লইতেছে।

তবে, অন্বীক্ষায় পদার্থ সমন্বয় ও সঙ্গাতির সুরাহাই হইতেছে মনে হয়। বিরাটেরও নিশ্চয় একটা "যন্ত্র" রূপ আছে—আকৃতি, ক্রিয়া এবং শক্তিবিন্যাস এই তিন ভাবেই। সে রূপ কল্পনা আঁকিতে না পারিলেও আছে। যেমন, হিসাবে অতিমাত্রায় জটিল হইল, অথবা পরীক্ষার "ধোপে টিকিল না" বলিয়া আগেকার সেই ঈথারকে না হয় ছাড়িলাম। কিন্তু স্বগত-সংস্থান-বিশিষ্ট Space (intrinsic geometry of Space), বিরাটের যে যন্ত্রমূর্তি সেটাকে নূতন করিয়া দেখাইয়া দিল। যন্ত্রদ্বারাই মাধ্যাকর্ষণাদির (gravitation) ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। আলোকগতিবেগের ধ্রুব সংখ্যাটি ধরিয়া বিশ্বের সব কিছু "সমীকরণে" লাগিয়া যাইল! কাল্পনিক সংখ্যা "*i*" টি-সকল মৌলিক গণাগাথার (যথা হাইজেন্‌বার্গ সমীকরণে) প্রবিষ্ট করাইল! এতে ঠিকই হইতেছে মনে হয়। যন্ত্র আর "যান্ত্রিক" (mechanical) রহিব না, "মানসিক" ও (mentally picturable) রহিব না বলিতেছে। ঠিকই বলিতেছে। মূলে যে আদ্যাশক্তি তিনি যদি অনন্ত চিচ্ছক্তি লীলাশক্তি হন, তবে কোন "বস্তুতান্ত্রিক" কাঠামোতে সে শক্তিকে পূরিবে কে? "অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্"—সর্বত্র সর্বতোভাবে প্রবিষ্ট হইয়াও তিনি যে সব অতিক্রম করিয়া থাকেন। তাঁর—একাংশেন স্থিতং জগৎ। অতএব, সব কিছু যন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের বিবৃতি—বড়জোর নৈকটিক approximate. তবে মূল যন্ত্রটি কিরূপ—এর অনুসন্ধান চলিবেই। পদার্থবিজ্ঞানে যতদূর চলে চলুক। প্রাণ ও মনোবিজ্ঞানে যতদূর চলে চলুক। এক্ষেত্রেও আগের চেয়ে আগাইয়া আসিতেছি মনে হয়। কিন্তু শেষের কাছ দিয়াও এখনও ঘেঁষিতে পারি নাই।

এ কথাটাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্রের "কু-সংস্কার"টা মানুষের আদিমতম সংস্কার। সকলদেশে, সভ্য অসভ্য সকল মানব গোষ্ঠীতেই এ সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। "ম্যাজিক" বলিয়া তুড়ি দিয়া উড়াইলে চলিবে না তো! "ম্যাজিক" গভীর ভাবে বিবেচিত হবার যোগ্য মনে হইয়াছে। আদিম পর্বত গুহাগাত্রেও "যন্ত্র", মিশর-ব্যাবিলন-মহেঞ্জদারোতেও "যন্ত্র", বৈদিক যজ্ঞে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেও "যন্ত্র"। আর বর্তমান সভ্যতা তো "যন্ত্র" সভ্যতাই। এ যন্ত্র কি বাদ দিবার? এর মূল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। সে মূল কথা শুধু সাধন বিশেষের ঘরওয়া কথা নয়; সে কথা স্থূলেই আরম্ভ করিতে হয় বটে, তবে "এহ বাহ্য আগে কহ আর"—এভাবে ভিতরে আগাইয়া যাইতে হয়। যত গভীরে যাইব, তত

"স্বাভাবিক" ও "সমর্থ" যন্ত্রের সন্ধান পাইব। জড়বিজ্ঞানাদি খানিকদূর বেশ গাইডের কাজ করিবে। কিন্তু তার পর? অধ্যাত্মযোগেই আশ্রয় লইতে হইবে। তাতে বহির্বিদ্যার পূরণও হইবে, মার্জনও হইবে।

বক্তৃতা সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া দেওয়ার কথা হইয়াছিল। ভাষা ও ভঙ্গী তাই কথঞ্চিৎ "ফেনিল"। সতর্ক সারগ্রাহী অসহিষ্ণু হইবেন না। ফেনার মাঝেও দৈবক্রমে দুটো একটা শুক্তি মিলিতে পারে। সাবধানে খুলিয়া দেখিবেন—তাতে কি আছে, না আছে।

একটা না একটা মুখোস আমরা সকলেই এবং সৃষ্টির সকল সামগ্রীই পরিয়া বসিয়া আছি। মুখোস মানে এমন একটা বন্দোবস্ত, যার ফলে আমরা কেহই আমাদের ঠিক স্বাভাবিক রূপটি জানিতে পারিতেছি না; যেরূপটি জানিতেছি, তাও পুরাপুরি নয়। এই বন্দোবস্তের ফলেই রূপ আমাদের কাছে দেখা ও অদেখা, সাচ্চা ও ঝুটা, মোটা ও চিকন এইসব রকমের হইয়া রহিয়াছে। সংসার-ব্যবহারের খাতিরেই এই রকম বন্দোবস্ত বোধহয় হইয়া থাকিবে। আমাদের ব্যবহারিক বা কারবারী জীব হবার কি প্রয়োজন ছিল—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে "এটা সেই মূল কারবারীর লীলা"—এ-বলা ছাড়া অধিক স্পষ্ট করিয়া বলার কোনই উপায় দেখি না। এ-লীলার কোথায় আদি, কোথায় মধ্য, কোথায় অন্ত—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে ত আমাদের একটা বৃত্তের পরিধির মুড়ো খুঁজিয়া বাহির করিতে যাইবার মত মুস্কিলে পড়িতে হইবে। একটা সাপ তার ল্যাজটা মুখের মধ্যে দিয়া গোল হইয়া রহিয়াছে; তার কোনটা মুখ, কোনটা ল্যাজ ঠিক করিবার যেন উপায় নাই;—এইটাই যেন হইল এই দুনিয়ার বন্দোবস্তের চেহারা। প্রাচীনেরা যে-সকল সাঙ্কেতিক রূপ বা যন্ত্র ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে এই আজব দুনিয়াদারীর হা'ল বুঝাইতে চাহিতেন, সে সবের মধ্যে আমি উপরে ঐ যে সাপের নক্সাটি আঁকিলাম, সেটাও অন্যতম প্রসিদ্ধ যন্ত্র। ও সঙ্কেতের মধ্যে হয়ত আরও গূঢ় রহস্য লুকান আছে। আমি উপরের পর্দাখানা একটু সরাইয়া আপনাদিগকে রহস্যের সোজাসুজি চেহারাটাই দেখাইলাম মাত্র। স্বস্তিক, পদ্ম, চক্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও ওই কথা। সাধারণতঃ "যন্ত্র" (Mystic Diagram or Apparatus) তিন রকমের:—(১) বাস্তব (realistic); (২) সাঙ্কেতিক (symbolic); এবং (৩) তাত্ত্বিক (ideal)। এ তিনেরি মূলে থাকে মৌলিক (Basic) বা স্বাভাবিক

যন্ত্র। পূর্বোক্ত তিনটির আবার অবান্তর ভেদ আছে। যথা—বাস্তব যন্ত্র (ক) কারণীভূত যে শক্তিবিন্যাস তারই আধার বা প্রতিকৃতি; অথবা (খ) কার্যাভিব্যক্তির (effectual manifestation) প্রতিকৃতি; ইত্যাদি। সে যাই হোক—আপনারা আসল কথা কয়টার খেয়াল রাখিয়া যাইবেন।

বুঝিতেছি যে, আমাদের দেখা গাছের পাতার সবুজ রঙ ও বিচিত্র চেহারাটা বাহিরে ঈথার সাগরে (আগেকার বৈজ্ঞানিক কাঠামোই লইতেছি) অণু-পরমাণু রাজ্যে একটা ছন্দোবদ্ধ নৃত্য বা উত্তেজনার ফল। বাহিরে একটা শক্তির খেলা হইতেছে; সেই শক্তির খেলা আমার রেটিনা, নার্ভ মগজ ও মনকে চেতাইয়া আমার কাছে যে ভাবে প্রতিভাত হইল, সেইটা হইল, আমার কাছে পাতাটির চেহারা ও রঙ। বাহিরে ঈথারের স্থান বিশেষে ঐ প্রকার শক্তির বিন্যাস ও শক্তির বিলাসকে আমরা স্থানান্তরে শক্তিকূট বা শক্তি-ব্যূহ বলিয়াছি। অনেক বৈজ্ঞানিক আজকাল ঈথার মানিতে নারাজ, এমন কি শেষ পর্যন্ত অণু-পরমাণু মানিতেও নিমরাজী বা গররাজী। কিন্তু কোনও বৈজ্ঞানিকেরই শক্তি নইলে চলে কি? শক্তিকূট যে চাইই চাই; বৈজ্ঞানিক মাত্রেই "শাক্ত"। আমরা এদেশে আজকাল দেখি আর নাই দেখি, তাঁরা দেখিতেছেন যে, বস্তু মাত্রেই শক্তি-মূর্তি বা শক্তি-বিগ্রহ। আমাদের প্রাচীনেরা আবার শৈবও ছিলেন; বস্তুমাত্রকেই (কেবল জীবকেই নয়) শিব-বিগ্রহ বা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে দেখিয়া গিয়াছিলেন। প্রত্যেক বস্তুকেই তো (একটা ধূলিকণাই হৌক, আর একজন ইন্দ্রচন্দ্রই হৌন) তাঁরা শক্তি ও শিব এই দুইরূপেই দেখিয়াছিলেন; প্রত্যেক পদার্থের শক্তিকূট মূর্তি এবং শুদ্ধ, নিরঞ্জন "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" মূর্তি তাঁহারা পাশাপাশি রাখিয়া এবং অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন; পদার্থের এই অপরূপ রূপটি, তাঁহাদের দৃষ্টিতে যুগল অথচ অভিন্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি। বৈজ্ঞানিক শক্তি-মূর্তিটা দেখিতে সুরু করিয়াছেন। সে যুগের বৈজ্ঞানিকদের আম্ মোক্তার দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার এই মূর্তিটাকে একটা বিরাট Inscrutable Power বলিয়া প্রণিপাতও করিয়াছেন বটে। কিন্তু অভিন্ন যুগলমূর্তি, ওই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি—এখনও বৈজ্ঞানিকের চোখে প্রকটিত হন নাই। তবে একটু সবুর করুন, দেরিও হয়ত বেশী নাই। এডিংটন, জিন্স প্রমুখ যাঁরা বিজ্ঞানের তরফে নূতন ওকালতি করিয়াছেন, তাঁরা ওই মহাশক্তিকে "জড়" অথবা অজ্ঞেয় ভাবার চাইতে চেতন বুদ্ধিশক্তি ভাবার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছেন।

প্রাচীনেরা যে শুধু এইভাবে শাক্ত-শৈবই ছিলেন এমন নহে, বৈষ্ণবও ছিলেন। নিখিল পদার্থের মধ্যে যে অদ্বৈত স্বরূপটি কোথাও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত, কোথাও প্রায় অব্যক্ত ভাবে রহিয়াছেন, তিনি শুধু যে শিব, শান্ত, শুদ্ধ এমন নহেন; তিনি যে রস, তিনি যে আনন্দ, তিনি যে সুন্দর, তিনি যে মধুর! নারিকেলের ছোবড়া চিবাইতে ব্যস্ত থাকিয়া তার ভিতরকার রসের সন্ধান আমরা রাখি নাই। ভোগ্যের স্থূল রূপটা ভোগ করিয়া আমরা সুখের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা ব্যথা পাই, তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা আপশোষ বুকের ভিতর লইয়া যাই। বস্তুর সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর একেবারে অন্দরের বা মর্মের রূপটি বুকে ধরিতে পাইলে দেখিতাম, সেটা যে নিবিড়-ঘন রস-স্বরূপ; বিশ্বভুবনের মহাব্রজে কোন্ নীপকুঞ্জে লুকাইয়া আপন মুরলী ধ্বনিতে নিখিলের মন প্রাণ আকর্ষণ করিতেছে; অখিলের মর্মবাসিনী নিত্য-রস-পিপাসাটিকে বিরহ-বিধুরা গোপীদের মতন নিজের অন্বেষণে এই চরাচর মধুবনে অভিসারিকা করিয়া পাঠাইয়াছে। নিখিলের মর্মস্থলবাসী, অথচ নিখিলের মরম-আকুল করা এই যে নিবিড়-ঘন-রস-স্বরূপ, তাহাই যে কৃষ্ণরূপ। সে রস-স্বরূপ কৃষ্ণরূপে পাগল শুধু যে জীবেরই "পরাণী" এমন নয়; এ মহাব্রজে কোথাও এমন একটা রজঃ বা ধূলিরেণুও পড়িয়া নেই, যেটা সেই ব্রজসুন্দরের "দরশ-পরশ" কাঙালী হইয়া নাই। সত্যি কথা। প্রত্যেক এটম বা অণুর ভিতরেই একটা লীলা, একটা রসানুভূতি, ও রসান্বেষণ চলিতেছে, যার খবর গতিবিজ্ঞানের (Dynamics) বড় বড় ইকোয়েশন ফরমুলাগুলো পায়নি। পদার্থবিদ্যা তাই এই সেদিন পর্যন্ত পদার্থকে "পুতুল" বা "কল" বানাইয়াই রাখিয়াছিল। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার জারিজুরি ভাঙ্গিতে সুরু হইয়াছে,—নয় কি? সে বিদ্যারও ঘরের মেজের তলে কোন্ অজানা সুন্দরের সুড়ঙ্গ কাটার শব্দ এখনই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, এবং আঘাতের কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে গরবিণী বিদ্যারও হিয়া যে এরই মধ্যে দুরু দুরু কাঁপিতে সুরু করিয়াছে। বুঝি বা এইবার জড়বিদ্যার কুল-শীল-মান সবই ভাঙ্গিয়া যায়! তা যায় যাক—যেদিন এই বিদ্যাসুন্দরের মিলন হইবে—পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা নিখিল পদার্থের মাঝে ওতপ্রোত রস ও আনন্দের লীলাবিলাসের সন্ধান পাইবে—সেদিন "মরিয়া" হইয়া আগেকার পদকর্তাদের সুরে সুর মিলাইয়া আমরাও গাহিব "ননদিনি বলো নগরে ডুবেছে রাই-রাজনন্দিনী আজ কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।" কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগর যে নিবিড় ঘন রস-

সায়র! ও কলঙ্কে কলঙ্কিনী হবার সাধ যে সবারই! ও রসে বঞ্চিত হতে চাইবে কে?

আর শ্রীরাধা? তিনি যে এই নিবিড়-ঘন রসেরই লীলামূর্তি; যিনি লীলা করিতে বসিয়া বিশ্বভুবনময় আপন স্বরূপ হ্লাদিনী শক্তির বিচিত্র ভঙ্গিমায় উছলিয়া যাইতেছেন, কাজেই ব্রজবিলাসিনী; যিনি লীলা করিতে গিয়া বিশ্বের বিবিধ ব্যবহারের গণ্ডীতে নিজেকে স্বেচ্ছায় বাঁধিয়াছেন, আয়ানের ঘরে জটিলার কুটিলার গিন্নীপনার বধূ সাজিয়া বসিয়াছেন; ব্যবহারিক জীবের ছোটখাট ঘরটিতে ঘরণী সাজিয়াছেন; তার রস বা আনন্দের কারবারী কূপটুকু, গর্তটুকু ভরিয়া রাখিয়াছেন। মনে কর না কেন; জটিলা কুটিলা অবিদ্যা ও ভেদ বা দ্বৈত দৃষ্টি। অবিদ্যা দুর্জ্ঞেয়া, গহনা, অনির্বচনীয়া, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী; কাজেই, জটিলা; ব্যবহারী জীবকে সে গর্ভে ধারণ করিয়াছে। আর ভেদদৃষ্টি বড়ই মুখরা। লাগানো ভাঙ্গানো তার স্বভাব। সে জীবের সহোদরা। জীবের সাথে সাথে থাকে। তাকে আগুলিয়া লইয়া বেড়ায়। জীবের বেলাতেও এই শাশুড়ী ননদীর ঘরে যিনি রসময়ী রসিকা বধূ হইয়া ঘর করিতে আসেন, তাঁর যে উঠিতে বসিতে লাঞ্ছনা; তাঁকে যে "শানান ক্ষুরের ধারে বাস করিতে হয়, নড়িলে কাটে!" কিন্তু আমার অন্তরে জটিলা কুটিলার শাসনে যে রসিকা, যে হ্লাদিনী শক্তির একটি কণা বধু সাজিয়া ঘর করিতেছেন, তাঁর তো কোনও মতেই আমার ভিতরেই সমাপ্ত হইয়া, নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইয়া থাকার উপায় নাই! কোনো গণ্ডী দিয়াই তো তাঁকে বাঁধিয়া রাখার পথ নাই! যিনি ব্রজবিলাসিনী, তাঁকে আয়ানের ঘরণী হইয়াই থাকিলে চলিবে কেন? সমস্ত বিশ্ব ভুবনে ওতপ্রোত যে রস বা আনন্দ, যাহা হইতে সকল সৃষ্টির প্রেরণা, সকল গতির আবেগ আসিতেছে, সে রস বা আনন্দের "সায়রের" সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সম্পর্কশূন্য হইয়া আমার অন্তরের রসধারা থাকিতে পারে কি? আমার অন্তরের রসকণাটি "রসো বৈ স" এর তরে উতলা না হইয়া থাকিতে পারে কি? ব্রজ বা বিশ্বের অভ্যন্তরে বহমানা যে বিপুল রসধারা তাই তো যমুনা। আমার অন্তরের বধূটিকে এই যমুনায় জল আনিতে সাঁঝ সকাল যাইতে হয়ই হয়! আমার রসের কলসটিকে লইয়া এই বিশ্বের বিচিত্র রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ, ভাব বেদনায় নানা ভঙ্গিতে তরঙ্গায়িত যমুনার জল ভরিতে না যাইলে যে নয়! জল আনিতে গিয়া "বিধি যে বড়ই সাধিল বাদ।" যমুনার ঘাটে গিয়া রসময়ী নিজের সেই

স্বাভাবিক রূপটি, কিনা, নিবিড় ঘন রস-রূপটির সন্ধান শনৈঃ শনৈঃ পাইয়া থাকেন। আগে বাঁশরীর সুরে পরিচয়। তখন সেই পরিচয়ের ভিতর দিয়া জীবের রসাত্মিকা, রাগাত্মিকা বৃত্তিটির নিজেরই নিত্য পূর্ণ স্বাভাবিক রূপটির কিনা কৃষ্ণের পানে পূর্বরাগ। এই পূর্বরাগ হইতে সুরু করিয়া ক্রমে ব্রজের সকল লীলা। এর সাধিকা ও সহায় গোপী ও রাখালগণ সঙ্গে সঙ্গে আছেন। যাঁর এ লীলা, তাঁর মুরলী-ধ্বনিতে যমুনা নাকি উজান বহেন। বিশ্বের রসধারা বহিয়া গিয়া কেবলই বিশেষ বিশেষ নাম রূপে ব্যবহারের গণ্ডীর মাঝে নিজেকে কৃপণ ও কুণ্ঠিত করিয়া ফেলিতেছে; চির-পূর্ণ মধুর যিনি, তাঁহার আকর্ষণ অন্তরে বুঝিতে পারিলে এই অধঃস্রোতঃ ঊর্ধ্বস্রোতঃ হইয়া যায়; ধারা উলটাইয়া হয় রাধা-ভাবানুগা। অরসিক আমরা—এই অপূর্ব রসতত্ত্ব বুঝিবার প্রাণ আমাদের কই? পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক নিখিল বস্তুর আড়ালে শক্তি মূর্তিটিকে এরই মধ্যে কতকটা দেখিয়াছেন; কিন্তু এ শক্তি যে স্বরূপতঃ শিব ও রস হইতে অভিন্ন এটা তাঁরা এখনও ধরিতে পারেন নাই। এইজন্য স্বাভাবিক রূপের চরম বা পরম ভাবটি—যে ভাবটি ধরিতে পারিলে স্বয়ং শ্রুতির আশ্বাস বাণী—"অপাম সোম অমৃত অভূম," সে-ভাবের থাকে, এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু না পারুন, যতটা উঠিয়াছেন, ততটাতেই তাঁহার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আপনারা ব্যস্ত হবেন না, সময়ে বিজ্ঞানের "পূর্ণাভিষেক"ও হইবে। কারণে পক্ষপাত তাঁর তো আছেই; সাক্ষাৎ শক্তি-স্বরূপ "কারণানন্দের" আস্বাদে তিনি আর কতদিন বঞ্চিত থাকিবেন?

গাছের একটা সবুজ পাতা পরীক্ষা করিতে আমরা এতকথা ছাঁদিলাম, তার কৈফিয়ৎ আমাদের আজও দিতে হইবে কি? সবুজ পাতাই বলুন, ধূলিকণাই বলুন, আর জীবই বলুন—প্রত্যেক জিনিষই, তলাইয়া দেখিলে এক একটা শক্তি-বিগ্রহ—system of forces, বা এককথায় stress-system। একথায় বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে। তলাইয়া দেখিলে নাদ-বিন্দু-কলা মূলে স্পন্দ। এই মূল স্পন্দের স্থূল স্পন্দনরূপটি-ও বিজ্ঞানের সম্মত। আরও তলাইয়া দেখিলে, তাহা শান্ত, শিব, অদ্বৈতমূর্তি; যোগীরা সমাধিতে সচ্চিদানন্দ-ঘন রূপে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। এখানে পাতাতে, আমাতে, ধূলাতে ভেদ নাই। ইহা নির্বিশেষ নিরঞ্জন সত্তা। রসিকেরা এই পরম সত্তাটিকে আবার রস রূপে ও রসের বিলাস রূপে, লীলা রূপে প্রাণে অনুভব করিতে

ভালবাসেন। শানাই বাজাইবার সময় একজন শুধু পোঁ ধরিয়া বসিয়া থাকেন; অপর জনে তারই উপর নানান পর্দায় রাগ রাগিণীর আলাপ করেন। দুই-ই কিন্তু সুর—স্বরূপে। জ্ঞানীরা নিরঞ্জন সত্তা শানাইয়ের পোঁ; রসিকের রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস, সেই পোঁ এর উপরে নানান সুরের মনোহারী কর্‌তব। পশ্চিমের বিজ্ঞান যে শক্তিরূপটি দেখিয়াছেন বা দেখিতেছেন তার আড়ালেও এইরূপ শানাই-এর পোঁ ও কর্‌তবের আলাপচারী চলিতেছে! সে আলাপচারী শোনার কান এখনও যে হয় নাই।

যাই হৌক সবুজ পাতাতেই ফিরিয়া আসুন। এই চর্মচক্ষে পাতাটি মোটামুটি একরকম দেখিয়াছি। আপনার চোখ ভাল হইলে, আপনি আমার চেয়ে আরও একটু ভাল দেখেন। একখানা ম্যাগনিফাইইং গ্লাস লইয়া পরীক্ষা করি। পাতাতে আগে যেসব দেখিতে পাই নাই, তার কতক কতক এখন দেখিতেছি; কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা; কত ছোট ছোট দাগ; কত ছোট ছোট প্রাণীর পঙ্গপাল তার উপরে ইত্যাদি। বেশি জোরের অণুবীক্ষণ হইলে আরও অনেক অদেখা জিনিষ উহাতে দেখি। আমাদের বিশ্ব-বিশ্রুত আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর ক্রেস্‌ক্রোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে গাছপালার, লতা পাতার এমন সব সূক্ষ্ম ব্যাপার চাক্ষুষ দেখাইয়াছিলেন যে, সে-সব দেখিবার কল্পনাও কস্মিন্ কালে করিতে পারি নাই। এক আধ মিনিটের মধ্যে গাছটা কতটুকু বাড়িল; সামান্য একটু বিষ প্রয়োগে বা অন্যরকমের উত্তেজনায় তার কোথায় কতটুকু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইয়া গেল; এসব ব্যাপার এতই সূক্ষ্ম যে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় করিয়া না দেখিলে ইহারা চক্ষুগোচর হয় না। অথচ যন্ত্রের কৃপায় এই সকল অতীন্দ্রিয় ঘটনা আমাদের দেখা হইতেছে। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? পাতার প্রত্যেক জীবনকোষ বা 'সেল'টির না হয় আমি অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরখ্ করিলাম। কিন্তু যেসব যৌগিক অণু (Molecules) এর সংহতিতে বা 'সংঘাতে' এক একটা সেল এর দানা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই মলিকিউলার মশলাগুলাকে আমাকে দেখাইবে কে? রাসায়নিক পরীক্ষা? রাসায়নিক পরীক্ষা—মলিকিউলদের হিসাব নিকাশ দেয়; জমাখরচ খতাইয়া আমাকে বুঝাইয়া দেয়; কিন্তু কোনও রাসায়নিক পরীক্ষাগারেই একটা জলের মলিকিউল, অথবা একটা কার্বো-হাইড্রেট মলিকিউল আমি কস্মিন্ কালেও চক্ষে দেখি নাই। এক ফোঁটা জলে এত মলিকিউল আছে যে, তাদের হিসাব দিতে গেলে এক একটা তারার দূরত্বের কথা মনে পড়ে; যেসব তারা হইতে আলো সেকেন্ডে প্রায় দুলাখ মাইল ছুটিয়া আমাদের কাছে

হাজার বছরে আসিয়া পৌঁছে। তাই বলিতেছিলাম যে অণুবীক্ষণে আমার কাছে পাতার খানিকটা অদেখা দেখা হয় মাত্র, সবটা নয়।

কিন্তু ধরুন, একটা আদর্শ অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিতে লাগিলাম। এমন কি, ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপও তার কাছে হার মানে। পাতার মলিকিউলগুলা সবই না হয় এখন দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পাতার এই সব সাবয়ব, পরিমিত পরিচ্ছিন্ন, জটিল সূক্ষ্ম বা "অণিষ্ঠ" অংশগুলিই কি চরম এবং এদের দেখাই কি চরম দেখা? তা ত নয় বৈজ্ঞানিক একটা মলিকিউল ভাঙ্গিয়া তার দেহের মশলা "এটম"গুলি আমাকে দেখাইবেন, অবশ্য চক্ষে নয়, যন্ত্রেও নয়,—হিসাবে গণাগাথায়। পাতাটা যেমন মলিকিউলদের সংহতি বা সংঘাত, তেমনি মলিকিউলটা আবার এটমদের 'সংঘাত'। সংঘাত মানে ব্যূহ। এটম বা মলিকিউলদের এই রকম ব্যূহ রচনা পরস্পরের শক্তি বিন্যাসের ফল। পরস্পর পরস্পরের শক্তিদ্বারা বিধৃত হইয়া ঐ রকম ব্যূহ রচনা করে; যেমন ধারা, বাহিরে সৌরজগতে শ্রীমান সূর্য ও তস্য গ্রহোপগ্রহ বাবাজীগণ। একটা মলিকিউলে এটমেরা শক্তিবিন্যাস করিয়া যে কেমন করিয়া ব্যূহ রচনা করে তার আন্দাজ রসায়ন শাস্ত্রের এক শাখার (Physical Chemistry-তে) খুবই নিপুণভাবে করা হইয়া থাকে। এক একটা বেনজিন মলিকিউলের ব্যূহের নক্সা কত না বিচিত্র! এ সবই কিন্তু অদেখা রূপ। তবে আজ আমরা আদর্শ অণুবীক্ষণে অদেখা রূপও দেখিতে বসিয়াছি। মলিকিউলে পৌঁছিয়া দুইটা ব্যাপার দেখিতেছি। প্রথম ঐসব বামনাবতার, বালখিল্য ভূতদের রূপ। পাতার রূপ, রস, গন্ধ উহাদেরও নাকি আছে। পশ্চিমের Psychology-তে যে গুলাকে Secondary qualities বলা হইত, সেগুলা ঐ বালখিল্যদের আছে। আমাদের আদর্শ অণুবীক্ষণে তাই তাদের রূপ দেখিলাম। তারপর আর একটা ব্যাপার। এ-বালখিল্যদল কোনো গাছের ডালে পা ঝুলাইয়া দিয়া তপস্যা-নিরত হইয়া নাই। বাউলদের মত এদের অফুরান নাচের আর বিরাম নাই। পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া এ উহার জটাতে গ্রন্থি বাঁধিয়া ব্যূহ রচিয়া কি অবিশ্রান্ত নৃত্য তাদের! পাতার সেলের মধ্যে যখন জৈব পদার্থ (Protoplasm) পাক খাইতেছে, তখন সে পাক খাওয়ার সঙ্গে তারাও পাক খাইতেছে। সূর্য-কিরণ সম্পাতে পাতার হরিৎ অঙ্গরাগ (Chlorophyl) যখন বাতাসে অক্সিজেনটুকু বাদ দিয়া কার্বন ভাগটুকু লইয়া আপনার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে, তখন সেই নীরব

শান্ত দৈনন্দিন ব্যাপারটুকুর অন্তরালে যে কতবড় জটিল ও রহস্যময় একটা শক্তির খেলা চলিয়াছে, তাও না হয় আমরা ঐ আদর্শ অণুবীক্ষণের মাহাত্ম্যে দেখিলাম। সূর্যকিরণ হইতে তাপ চুরি করিয়া নিজের নিজের মলিকিউলদের ব্যূহের মাঝখানে পুরিয়া রাখা—এ রোগটাও নাকি লতাপাতাদের বিলক্ষণ আছে। কুরু সেনারা যেমন ধারা বিরাট রাজ্যে গরুর পাল আটকাইয়া ছিল, তেমন ধারা। তাপ, আলোক, তাড়িতশক্তি, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতিতে সে-সব ব্যূহের চেহারা যে কেমনধারা বদলায়, তাও না হয় আদর্শ অণুবীক্ষণ আমাদের দেখাইল। এই পর্যন্ত দেখিয়াই—শক্তিমন্দিরের মণিমণ্ডপ রত্নবেদিকার পশ্চাদ্‌ভাগে দাঁড়াইয়া যা যা দেখিলাম তাহাতেই আমাদের বিস্ময়ের অবধি নাই। কিন্তু দেখার কি শেষ হইয়াছে! না তা তো নয়।

রত্নবেদিকার আরও নিকটে, আরও একটু পাশে আসিয়া দেখিলাম ব্যূহের অভ্যন্তরে আবার যে ব্যূহ; চক্রের মধ্যে আবার যে চক্র; পদ্মের ভিতরে আবার যে পদ্ম রহিয়াছে! মলিকিউল ছাড়াইয়া এবার এটম দেখিলাম। এখানে আর নাকি রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই;—অর্থাৎ Secondary quality গুলি নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন Primary quality গুলিই এখন রহিয়া গেল; অর্থাৎ সাবয়ব, গুরুত্ববিশিষ্ট, গতিমৎ, পরস্পরব্যাবর্তক (impenetrable) সূক্ষ্ম রেণুপুঞ্জ মাত্রই রহিয়া গেল; সেটা আর পাতার সবুজ রঙ পায়নি, পাতার রস ও গন্ধও পায়নি। রঙ, গন্ধ, রস, আর আর সব গুণ, মলিকিউল ছাড়াইয়া আরও সূক্ষ্ম পর্যায়ে গেলে পাওয়া যায় না। আদর্শ অণুবীক্ষণ মলিকিউলেও রঙ আমাদের দেখিতে দিবে, কিন্তু তারও ভিতরে, এটমের রাজ্যে বা এলাকায় ঢুকিলে আর তো রঙ নেই। এটা অবশ্য শিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের আন্দাজ। আমরা আপাততঃ তাঁরি দেওয়া যন্ত্র হাতে করিয়া তাঁরই ফরমাইস মত চলিতেছি। তথাস্তু—ধরুন, তাঁর আন্দাজই ঠিক। গতিশীল, গুরুত্ববিশিষ্ট, পরস্পরব্যাবর্তক এটমদের এলেকায় আমরা এখন আসিয়া পড়িয়াছি। এ রাজ্যে কতকগুলি গুণ (যথা—বর্ণ, গন্ধ, রস) নাই; কিন্তু অপর কতকগুলি আছে। শুধু তাই নয়; গুণকর্ম-বিভাগশঃ এদের বিভিন্ন "গ্রাম" ও শ্রেণীও নিরূপিত আছে। একটা মলিকিউলের মাঝে তার গোষ্ঠীভুক্ত এটমগুলা একটা শক্তিব্যূহ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। এরাও যে আরও ছোট ছোট বালখিল্য বাউল। এদের নাচের, হেলাদোলায় চলাফেরার বিরাম নাই। এই যে এটমদের

শক্তিব্যূহ ও শক্তিবিলাস ইহা মলিকিউলদের শক্তি ব্যূহ ও শক্তিবিলাস অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও মৌলিকতর। এ শক্তিব্যূহ আরও গোড়ার কথা।

যাক—আদর্শ অণুবীক্ষণ এই পর্যন্ত দেখাইয়াই কি রেহাই পাইল?—না। গেল শতাব্দীতে হয় ত পাইত, যখন এটমকে নিরেট বর্তুল ভাবিয়াই বিজ্ঞানের ব্যবহার চলিত। এখন আরও ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এটমও নিরেট মৌলিক পদার্থ নয়। তারও ভিতরে বিচিত্র এক জগৎ আছে। ইহা নাকি তড়িদণু বা ইলেকট্রন প্রোটনাদির জগৎ। এই তড়িদণু নাকি এক একটা এটমের মাঝে গ্রহ উপগ্রহের মত পাক খাইতেছে। তাদের বেগ অদ্ভুত, শক্তিও প্রায় অপরিসীম। এটমে ঢুকিয়া শক্তির যে চেহারা দেখিলাম, তা দেখিয়া অবাক হইবার কথা। আমাদের এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ শক্তি এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অণুর অন্দর মহলে মজুদী (intra-atomic) শক্তির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে? "বেদ ও বিজ্ঞানের" অনেক বক্তৃতায় এসব কথা সবিস্তার বলিয়াছি। আজ আমরা এটম-নিগূঢ় শক্তিব্যূহটি কেবল একবার কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। যে আদর্শ অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিতে সুরু করিয়াছি, তার কি এইখানেই ছুটি? কৈ—কোথায় ছুটি? তড়িদণুগুলিও সাবয়ব, পরিমিত পদার্থ; কাজেই তাদেরও একটা অন্তঃপুর বা অন্দর মহল থাকার কথা। থাকিলে, সেখানে আবার শক্তির রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে চলিয়া কোথায় গিয়া বিশ্রান্তি? একটা পাতা দেখিতে শুরু করিয়া যদি এইভাবে দরজার পর দরজা খুলিয়া তার সহস্রমহল পুরীর একেবারে মাঝখানে পৌঁছিয়া, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পূর্ণশক্তিমূর্তিটি আমি দেখিতে পাই, তবেই আমার দেখা পুরা বা চরম দেখা হইল। আদর্শ অণুবীক্ষণ ততদূর পর্যন্ত আমায় না দেখাইয়া খালাস পাইবে কি? বৈজ্ঞানিকের দেখা এখনও অনেকটা কুয়াশায় ঘেরা। তিনি কিছুদিন আগেও ঈথার সমুদ্রে ইলেকট্রন লইয়া পাক খাওয়াইতেছিলেন; ইলেকট্রনকেও হয়ত ঈথারের অবস্থাবিশেষ (intrinsic Strain Centre বা Gyrostatic Strain) ভাবিতেছিলেন; ঈথারের মধ্যে নানা রকমের ঢেউ তুলিয়া চারিধারে ছড়াইয়া আমাদিগকে রং-বেরং দেখাইতেছিলেন; এখনও রেডিও শুনাইতেছেন, আরও কত কি অনুভব করাইতেছেন। গোড়াকার হিসাবে আজকাল পূর্ব শতাব্দীর ঈথার একরূপ বাদ পড়িতেছে, কিন্তু কার্যকরী শক্তিকণা ("Energy quanta"),"Point Event", Four-dimentional Continuum, Intrinsic Geometry of Space ইত্যাদি না মানিয়া উপায় দেখা যায়

না। এই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, তাও আবার অণুবীক্ষণে সত্যিকার দেখা নয়; কল্পনার চক্ষে, আন্দাজের চক্ষে, গণা-গাথার চক্ষে দেখা। আমরা ওই আদর্শ অণুবীক্ষণ হাতে করিয়া বৈজ্ঞানিকের কল্পনার সাথেই সায় দিতে গিয়াছিলাম। তাঁহাকে ছাড়াইয়াও আগাইয়া যাইতেও নিতান্ত অভরসা করি নাই। চরমে উপস্থিত হইলাম গিয়া এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পূর্ণশক্তিমূর্তিতে। এখানে সূক্ষ্মতারও পরাকাষ্ঠা, পূর্ণতারও পরাকাষ্ঠা। আমরা স্থানান্তরে যেটাকে চরম বা পরম চক্ষু বলিয়াছি, আজ রকমারি করিয়া তাকেই আদর্শ অণুবীক্ষণ বলিতেছি। তবে পরমচক্ষু—স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্টাদি, সকল রূপ দেখার নিরতিশয় সামর্থ্য; বাহিরের কোনও যন্ত্র নয়, এমন কি, যাকে "চোখ" বলি, সেটাও নয়। যে সামর্থ্য দ্বারা আমরা দেখি, তাহারই পূর্ণ বিকাশ এই পরম চক্ষু। বলা বাহুল্য এ চক্ষু স্বয়ং প্রজাপতির চক্ষু। এ চক্ষু "ভৌতিক চক্ষু" নয়; যেমন তেমন "দিব্যচক্ষু"ও নয়।

শক্তিকূট (Stress System) মূর্তিকে "যন্ত্র" বলিব, এই প্রতিজ্ঞা যদি গোড়ায় করিয়া লই, তবে দেখিতেছি যে যন্ত্রেরও নানান্ থাক্, নানান পর্যায়। পাতার যে স্থূলরূপ, সেটাও যে একভাবে শক্তিরূপ। পাতার স্থূল শিরা প্রশিরাগুলির মধ্যে অবিরত রস সঞ্চার করিতেছে এই শক্তি; সেলগুলিকে তাপ ও আহার যোগাইতেছে এই শক্তি; উদ্ভিদ সেলের মাঝে প্রোটোপ্লাজম্‌কে পাক খাওয়াইতেছে এই শক্তি; এই শক্তিতে পাতাটি বাড়ে, কমে; সবুজ হয়, আবার হলদে হইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। পাতার মধ্যে এইসব বন্দোবস্ত বহাল রাখার জন্য, পাতাটিকে একটা বটের পাতা বা আমের পাতা করিয়া রাখিবার জন্য, শক্তি-ব্যূহ (Constituent forces or Stress System) স্বীকার করিতেই হয়। এটাকে আমরা ঠিক চোখে দেখি না, কাজ দেখিয়া অনুমান করি। পাতার ওই মোটা রকমের জীবনযাত্রা চালাইবার জন্য শক্তির যে বন্দোবস্ত বা শক্তিকূট চাই, সেইটাকে আমরা পাতার "স্থূলযন্ত্র" বলিব। ইহা পাতাটির সঙ্গে আমাদের যেন "সদর মহলে" পরিচয়। এইটা হইল পাতাটির স্বাভাবিক রূপের First Sketch বা প্রাথমিক নক্সা। ম্যাগনেটের উদাহরণ লইয়া তাহার শক্তিকূট বা lines of forces এর নক্সা আঁকিয়া আমরা এই সদর মহলের পরিচয় পাই। বৈজ্ঞানিকও বলিবেন যে ম্যাগনেটের lines of force চরম তত্ত্ব, চরম কথা নহে। ম্যাগনেট স্বরূপতঃ কি, এবং তাহার 'পোল' দুইটা হইতে শক্তিরেখাগুলি কেন অমন

ভঙ্গীতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার অবশ্যই কৈফিয়ৎ আছে; এবং সে কৈফিয়ৎ আমাদিগকে ম্যাগনেটের মলিকিউলগুলা, এবং তাদের "নাচের আসর" ঈথারে অথবা অপর কোন উপযুক্ত ফ্রেমে খুঁজিয়া পাইতে হইবে। ম্যাগনেটের "lines of force" যে শক্তিকূট বা যন্ত্র আমাদিগকে দেখাইতেছে, সে শক্তিকূট বা যন্ত্র একটা সূক্ষ্মতর ও মৌলিকতর শক্তিকূট (subtler and more fundamental Stresses) এর কার্য বা অভিব্যক্তি। তার মানে, উপযুক্ত ডাইনামিক ফ্রেমে ও মলিকিউলগুলার মধ্যে যে শক্তিপিণ্ড (Stresses) রহিয়াছে, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাগনেটকে দুই-পোল-বিশিষ্ট ও lines of force বিশিষ্ট একটা যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। সেই Stress গুলি না থাকিলে ম্যাগনেট হইত না, হয়ত একটা পাথরের কুচি হইত। আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত lines of force লইয়া ম্যাগনেটের যে স্থূল যন্ত্রমূর্তি, তাহাই ম্যাগনেটের অভিব্যক্ত ধর্ম বা গুণগুলির মূলে। ঐরূপ lines of force না ছড়াইয়া থাকিলে, ম্যাগনেট অমন ভাবে লোহার গুঁড়া টানিয়া লইত না; অপর একটা ম্যাগনেটের সমীপে অমনধারা ব্যবহার করিত না; ইত্যাদি।

যে দরকারি কথাটায় আপনাদের মনোযোগে ভিক্ষা করিতেছি সেটা এই:—**স্থূল শক্তিকূট বা যন্ত্র স্থূল রূপ ধর্মাদির আশ্রয় বা কারণ; সূক্ষ্ম শক্তিকূট (যথা মলিকিউলদের) স্থূল শক্তিকূট বা যন্ত্রের কারণ ও অধিষ্ঠান। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম যন্ত্র তাহারও অধিষ্ঠান; এইরূপে কার্যকারণের শিকল ধরিয়া আমরা শেষকালে চরম বা পরম সূক্ষ্ম কারণ বা অধিষ্ঠানে গিয়া উপনীত হই. সেই চরম অধিষ্ঠান বা যন্ত্র হইতেছে প্রকৃতি বা প্রধান,** যাকে শাস্ত্র বলিয়াছেন "অমূলং মূলম্"। কথাটা বিজ্ঞানের তরফ হইতে আপনারা বুঝিয়া দেখিলেন তো? ম্যাগনেটের মলিকিউলদের যে ঘরোয়া শক্তির বিন্যাস, তার ফলে ম্যাগনেটের "পোল", lines of force; এবং তাদের সেভাবে থাকার জন্যই ম্যাগনেটের ম্যাগনেটত্ব। এই গেল একধাপ। তারপর একটা পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, মলিকিউলগুলা চরম অবিভাজ্য, নির্বিকার পদার্থ নয়; তারা সূক্ষ্মতর মশলার অপূর্ব পাকপ্রণালী ক্রমে প্রস্তুত (এবং সে পাকপ্রণালী পশ্চিমের রসায়ন বিদ্যা খুব ফলাও করিয়া লিখিয়াছেন); সেই সূক্ষ্মতর মশলাগুলির নাম এটম। এই এটমেরা নিজেদের শক্তি সাজাইয়া, সংহত করিয়া যেমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে, মলিকিউল তেমনটাই

হইয়াছে। শক্তির কারবারে মলিকিউল তাই মূলধনী (capitalist) নহে; সে স্বয়ং কোম্পানী কি খুব জোর কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট। যে সকল অংশী মিলিয়া যৌথ কারবার ফাঁদিয়াছে তারা হইল এটম। অতএব দেখিতেছি যে, কি গাছের পাতায়, কি ম্যাগনেটে এটমদের শক্তিকূট বা যন্ত্র, মলিকিউলদের যন্ত্রের কারণ ও অধিষ্ঠান। এটমদের রাজ্যে বা এলাকায় যে ব্যাপার হয়, প্রধানতঃ তারই ফলে মলিকিউলদের এলাকায় ব্যাপারগুলি হইয়া থাকে। আমরা আদর্শ অণুবীক্ষণ হাতে করিয়াছি কাজেই আমরা এটমে গিয়াও থামিতে পারি নাই। আমাদের দেখিতে হইয়াছে যে এক একটা এটম এক একটা বালখিল্য সৌরজগৎ— তাদের ভিতরে সূক্ষ্ম তৈজস রেণুগুলি বিপুল শক্তি লইয়া খেলিতেছে, কখনও বা এটমের এলাকা ছাড়াইয়া বাহিরে ছটকাইয়াও আসিতেছে। কাজেই এটমের শক্তিকূট বা যন্ত্রের মধ্যে পাইতেছি আরও সূক্ষ্ম, আরও মৌলিক যন্ত্র। এ যন্ত্র এটমিক যন্ত্রের কারণ, অধিষ্ঠান। বর্তমানে এটমের "কেন্দ্রীণ" (Nuclear) শক্তিব্যূহ বা যন্ত্র কেবল যে পরিকল্পিত হইয়াছে এমন নয়, ব্যবহৃতও হইয়াছে। বায়োলজি বা জৈববিদ্যাও পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। কিন্তু মূলে শক্তির রূপটাই বা কি, আর তার "লেখ" টাই কীদৃশ? পূর্ণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ছাড়া কে এর উত্তর দিবে?

এ-ভাবে এগিয়ে চলার যে অন্ত নাই! যন্ত্রের ভিতর যন্ত্র, তার ভিতরে যন্ত্র, তার ভিতরে আবার যন্ত্র—এইভাবে চলিয়াছে। তন্ত্রের যে কোনও যন্ত্র, যথা শ্রীযন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করুন; এই সার্বভৌম বিশ্বজনীন সত্যের চেহারা সেখানে দেখিতে পাইবেন। বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত, তার মধ্যে আবার বৃত্ত, তার মধ্যে ত্রিভুজ, তার মধ্যে আবার ত্রিভুজ এইভাবে চলিয়াছে। একথাটার বিস্তার এখানে করিব না। মূলগ্রন্থে কিছু আভাস মিলিবে। আজ মূল সূত্রগুলিই হাতের মুঠাতে ধরিয়া লউন। আমরা বিশ্বের যে কোনও পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি যে, তাহার মধ্যে যন্ত্র, তার মধ্যে সূক্ষ্মতর যন্ত্র, এইভাবে পরস্পর কার্যকারণ ভাবে, অধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠান ভাবে নিহিত রহিয়াছে। যন্ত্র মানে বিন্যস্ত Stresses বা শক্তিকূট, এটা যেন আমরা না ভুলি। সূক্ষ্মতর যন্ত্রটি স্থূলতর যন্ত্রের কারণ ও অধিষ্ঠান। কারণ ও অধিষ্ঠান যে কি অর্থে, তাও বলিয়াছি। ভিতরকার যন্ত্রটি না থাকিলে বাহিরের যন্ত্র থাকে না বা থাকিলেও না থাকার মত হয়। ভিতর বাড়িতে যাঁরা ভাঁড়ার ও রান্না-বান্না লইয়া আছেন তাঁরা

জবাব দিলে বাহির বাড়িতে ভোজে যে কাহারই পাতা পড়ে না। স্থূল চাইতে সূক্ষ্মের, ব্যক্ত বা "দেখা"র চাইতে অব্যক্ত বা "অদেখার" মাহাত্ম্য শুনিয়া আপনারা চমৎকৃত হইতে হয় হউন কিন্তু সন্দিগ্ধচিত্ত হইবেন না। পশ্চিমের বিজ্ঞান সম্প্রতি সূক্ষ্মের মাহাত্ম্য কীর্তনে সবার চেয়ে বড় গলা জাহির করিয়াছে। পশ্চিমের "কাজে লাগানো বিদ্যা" বা Applied Science যে এখনও বাহিরের বড় বড় কল কারখানায় বেশী মমতা বিলাইয়া রাখিয়াছে, "অন্দরের" খপর রাখিয়াও রাখিতেছে না, এটা আমাদেরও দুর্ভাগ্য, পশ্চিমেরও দুর্ভাগ্য, এবং এ সিদ্ধি নিশ্চয়ই খাঁটি বিজ্ঞানের দেওয়া মন্ত্রের বৈধ পুরশ্চরণের ফলে হয় নাই। বিজ্ঞান এখন অণুর অন্দর মহলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের দিকেই আঙ্গুল দেখাইতেছে; পশ্চিম কিন্তু সে সঙ্কেত না বুঝিয়া ক্রমাগত কয়লা পোড়াইয়া, পেট্রল পোড়াইয়া জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নানান রকমের উৎকট মেশিন চালাইতেছে; চালাইয়া এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে নোংরা করিয়া ফেলিতেছে; মানুষের এমন সোনার সংসারটাকে শয়তানের মুলুক করিয়া ফেলিতেছে! সূক্ষ্মের ব্যবহারেও স্থূলের দানবটার দাপটই বাড়িতেছে। চিকিৎসা বিদ্যায় হোমিওপ্যাথি রোগের নিদানে ও ভেষজের নিরূপণে স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মে পক্ষপাত করিয়া খাঁটি পথই ধরিয়াছেন; হিপ্‌নটিজম্, মিস্‌মেরজিম্ প্রভৃতি ওদেশেও ক্রমশঃ সূক্ষ্ম-শক্তি-কূট বা যন্ত্রে আস্থাস্থাপন করিতে লোককে শিখাইতেছে। কিন্তু মোটামোটা ভূত গুলো একবার কাঁধে চাপিয়া বসিলে, সেই আরব্য উপন্যাসের সিন্ধবাদ বণিকের গল্পে বিজনদ্বীপবাসী বুড়া শয়তানটার মত, তাকে কাঁধ হইতে নামান দায়! আর যে "সরিষায়" ভূত ছাড়াইবে, সেই মন-সরিষাই যে ভূতগ্রস্ত!

সে যাই হৌক, সূক্ষ্ম শক্তিকূট বা যন্ত্র স্থূল শক্তিকূট বা যন্ত্রের কারণ বা অধিষ্ঠান বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে এই নিয়মে "তদভাবে তদ্‌ভাবঃ, তদভাবে তদভাবঃ", সূক্ষ্ম যন্ত্র না থাকিলে স্থূল থাকে না; সূক্ষ্ম থাকিলে স্থূল থাকিতে পারে। ইহা হইতে স্বতঃসিদ্ধভাবে আমরা এই কাজের কথাটাও পাই; যদি কোনও পদার্থকে আমরা স্থূলভাবে দেখিতে চাই, তবে তার সূক্ষ্ম-শক্তিকূট বা যন্ত্র আমাদিগকে সংগ্রহ বা উপস্থিত করিতে হইবেই। অন্য উপায় নাই। ধরুন একটা ইস্পাতকে আমি ম্যাগনেট করিতে চাই। আমায় কি করিতে হইবে? বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পাতেই হউক, অথবা অন্য ম্যাগনেটের সংস্পর্শ দ্বারাই হউক, আমাকে ইস্পাতটুকুর মলিকিউলগুলা এমন

একটা শক্তিকূটে সাজাইতে হইবে, যার ফলে ইস্পাতটিতেও lines of force গুলি ম্যাগনেটের রীতিক্রমে দুইটি 'পোল' হইতে ইতস্ততঃ প্রসারিত হয়। এ-করা ছাড়া অন্য উপায় আছে কি? আমি যে Electric Current বা অন্য উপায়ে ইস্পাতটিকে চুম্বকত্বাপন্ন করিতে পারিয়াছি, তার প্রমাণ আপনারা পাইবেন কিসে? লোহার গুঁড়া টানিতেছে কিনা, অন্য চুম্বককে সদৃশ 'পোলে' বর্জন ও বিসদৃশ 'পোলে' আকর্ষণ করিতেছে কি না, ইত্যাদি দেখিয়া। মোট কথা, স্থূল যন্ত্র আমায় পাইতে হইলে সূক্ষ্ম যন্ত্রটি আমার আদৌ পাইতে হয়। তন্ত্রের দৃষ্টান্ত লউন। ত্রিপুরসুন্দরী শক্তির এক বিশেষ মূর্তি। তন্ত্রে তাঁর ধ্যান আছে; বীজমন্ত্র আছে। ধরুন তাঁর ধ্যান যেরূপ আছে, সেই ভাবে তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করিতে চাই। তাঁর মূর্ত ব্যক্ত রূপটি আমি দেখিব। কি করিতে হইবে? পূর্বে যে মূল সূত্র নির্দেশ করিয়াছি, তদনুসারে আমাকে তাঁর সূক্ষ্ম শক্তিকূট বা যন্ত্র উপস্থিত করিতে হইবে। সূক্ষ্ম যন্ত্র তদপেক্ষা স্থূল যন্ত্রের কারণ ও অধিষ্ঠান—এই নিয়মে। সেই সূক্ষ্ম যন্ত্র ধরা যাক শ্রী-যন্ত্র। রূপের দিক হইতে যন্ত্র যা করে, শব্দের দিক হইতে মন্ত্রও তাই করে; যার যন্ত্র বা যার মন্ত্র, তাকে আমার কাছে "ধরিয়া" আনিয়া দেয়। কেন হাজির করিবে, তার হেতু দিয়াছি। মন্ত্র ও যন্ত্রের সংযোগ তো মণিকাঞ্চন সংযোগ—সিদ্ধিকে আরও সুকর করিয়া দেয়। আর স্বাভাবিক ক্রিয়া বা তন্ত্রের সহায়তা পাইলে ত কথাই নাই। আপাততঃ সে কথা যাক।

সূক্ষ্ম যন্ত্রের নানান্ থাক্ বা স্তর আমরা গাছের পাতা বা চুম্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি; তাদের পরস্পরের যে সম্বন্ধ, তাও আমরা দেখিলাম। এই সাতমহল পুরীর একেবারে বাহিরে যে শক্তিপিণ্ড রহিয়াছে, তাকেও আমরা যন্ত্র বলিয়াছি। আবার একেবারে কেন্দ্রস্থানে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি রহিয়াছে, তাহাকেও আমরা যন্ত্র বলিয়াছি। বটগাছের পাতাটার একেবারে বাহিরে যে যন্ত্রটা রহিয়াছে, সেটা সেই পাতাটার কোষাণু, শিরা, উপশিরা ঘটিত জীবনযাত্রা-নির্বাহের কলটা, যার খানিকটা আমরা চোখেই দেখি, আর বাকিটা ক্রমশঃ অণুবীক্ষণে বা অন্য উপায়ে আমাদের দেখিতে হয়। ইহাই হইল পাতাটার শক্তিকূটের নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান চালানোর কাঠামোখানা। ইহার কথা আবার পরে বলিতেছি। সাতমহলের একেবারে মাঝখানে কেন্দ্রস্থলে কোন্ যন্ত্র? মলিকিউল সম্বন্ধী যন্ত্র? না। এটম সম্বন্ধী—না, তাও না। করপাসল বা ইলেকট্রন সম্বন্ধী—না, তাও বুঝি নয়। কারুর সম্বন্ধী নন—তবে তিনি কে? তিনি হইতেছেন শক্তির চরম সূক্ষ্মাবস্থা, যার

চাইতে আর সূক্ষ্ম নাই, অথচ তিনি শক্তির পূর্ণ সমর্থাবস্থা—কারণ, সেই অবস্থা যে অন্য সব অবস্থার কারণ বা অধিষ্ঠান। ওই কেন্দ্রে যেটি রহিয়াছে, তার জন্যই এবং তাকে আশ্রয় করিয়াই ত আর সব রহিয়াছে। সেটিকে আর ভাগ করা চলে না; কারণ ভাগ করা চলিলেই তার ভিতরে আবার যন্ত্র বাহির হইবে। শক্তির এই কেন্দ্রীভূত, চরম সূক্ষ্ম, পরম কারণ ও পরম অধিষ্ঠানরূপ অবস্থা, তারই নাম বিন্দু। এই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই সকল শক্তি রহিয়াছে ও খেলিতেছেঃ সকল যন্ত্রই এই বিন্দুরই অভিব্যক্ত বা উচ্ছুনাবস্থা। যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁরা তন্ত্রশাস্ত্রের "কামকলাবিলাস" প্রভৃতি দেখিবেন। এই বিন্দু তত্ত্বই যন্ত্রের গোড়ার তত্ত্ব—শুধু তান্ত্রিক শ্রীযন্ত্র প্রভৃতির নয়; বিশ্বের চেতন অচেতন, সজীব নির্জীব, স্থূল, সূক্ষ্ম সকল যন্ত্রেরই। আজ এই পর্যন্ত খেয়াল করিয়া যান যে, বিন্দুই শক্তিকূটের বা যন্ত্রের মূল প্রকৃতি বা কারণ।

"যন্ত্রম্" এই-কথাটার "যম্" এই অংশটাকে বায়ুবীজ মনে কর। বায়ু মানে শুধু বাতাস নয়। শ্রুতি বায়ুকে ব্রহ্মেরই এক রূপ বলিয়াছেন—"বায়ুর্যথৈকঃ" ইত্যাদি নানা মন্ত্রে নানা ভাবে। সর্বব্যাপী যে সত্তাশক্তি তার যে "সচল" ভাব তাকে বায়ু বলা যায়। এ সচলতা শুধু যে দেশে-কালে (Space-Time Continuum-এ) এমন নয়। বিরাট মনে কাম-সঙ্কল্পাদিও এই বায়ুর সংজ্ঞার ভিতর আসিয়া পড়ে! শক্তিতন্ত্রের ভাষায় স্পন্দ। জড়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি—সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে—এই বায়ুর অধিকারে। বায়ু মূলবস্তুরই গতিরূপ (স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ)। তারপর, "যন্ত্রম্" এই কথাটার অন্তে আছে "রম্"—অগ্নিবীজ। অগ্নিও ব্রহ্মের এক রূপ। সংক্ষেপে, যদ্দ্বারা রূপ বা আকৃতি আসিয়া থাকে, অথবা রূপান্তর সাধিত হয়, তাহা অগ্নি (Informing, Conforming, Transforming Cosmic Factor)। বলা বাহুল্য, রূপ এখানে কেবল বাহিরের রূপ নয়—জড়, প্রাণ, মন এ সবের সকল "গ্রামেই" অগ্নিকে চিনিতে হইবে।

তাহা হইলে, দুইটা তত্ত্ব আমাদের মিলিল। বায়ু বা বিশ্বস্পন্দ (Cosmic Stress)। সর্ববিধ গতি ও গতির সম্ভাবনারূপ এইটি। এটিকে আধার করিয়াই অগ্নির "রূপায়ণ" কর্মটি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, স্পন্দরূপে বায়ু দিলেন উপাদান বা material; আর, অগ্নি হইলেন নিমিত্ত (Informing Principle)। বিশ্বে সকল সৃষ্টি "অগ্নিসখ" (বায়ু) এবং অগ্নি—এ দুটিকে লইয়াই হইতেছে। মানসসৃষ্টি বা সঙ্কল্পসৃষ্টিও বাদ পড়ে না। "তপসোঽধ্যজায়ত" বা "জ্ঞানময়ং তপঃ" স্থলেও তপঃ=আদি অগ্নি।

কিন্তু প্রশ্ন—বিশ্বের প্রাণ শৃঙ্খলা বা ছন্দঃ। কাজেই, কেবল একটা উপাদান আর এক নিমিত্ত থাকিলেই চলে কি? Form বা রূপ যেটি হইবে, সেটি বিষম, যেমন-তেমন, হইলে ত চলিবে না। সেটি লক্ষ্যের সঙ্গে এবং সমগ্রের সঙ্গে সুসমঞ্জস হওয়া চাই। সুসঙ্গতি বা Harmony চাই। "যন্ত্রম্" এর মাঝে "ত" (= অমৃত = ইষ্ট = শ্রেয়ঃ + প্রেয়ঃ) ঐ সন্ধিটি ঘটাইতেছে। "যন্ত্রম্" এই কথাটার বর্ণবিশ্লেষণ করিয়াই আমরা যন্ত্রের আসল কথাটা পাইলাম। সে আসল কথার তিনভাগেই দৃষ্টি রাখিবেন—উপাদান, আকৃতি ও ছন্দঃ। তাহা হইলে, যেখানে একটা সত্তাশক্তি (জড়, প্রাণ বা মনরূপে অভিব্যক্ত) সম্পন্দ (ক্রিয়মাণ) অবস্থায় বিদ্যমান, সেখানে কোনও শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ-সিদ্ধির নিমিত্ত তদুপযোগী ছন্দঃ আশ্রয়ে এক নির্দিষ্ট রূপায়ণ (shaping and adjusting of the "material" or energy) হইল যন্ত্র। বেদ বার বার ছন্দঃ হইতে সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের কথাও শুনাইয়াছেন। শ্রেয়ঃ-প্রেয়ঃ আপেক্ষিক সামগ্রী। পরাকাষ্ঠায় সেটি অমৃত। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ এই অমৃত দেবতাদের জন্য দোহন করিয়াছিলেন—ঐতরেয়ে উপাখ্যান আছে। মন্ত্রের বেলা যেমন, যন্ত্রের বেলাতেও তেমনি ছন্দঃ চাই। ছন্দঃটি সমর্থ হইলে যন্ত্র সমর্থ হইবে। Radio-isotopes গুলিতে কেন্দ্রীণ শক্তি তো "উন্মুখ" (prone) ভাবেই বিপুল; ধ্বংসের ব্যাপারে সমর্থ ছন্দঃটি পাইয়া আণবিকবোমা বানাইয়াছি। কিন্তু সে ত মহামারী ছন্দঃ! অমৃত ছন্দঃটি কবে আবিষ্কৃত হইবে? তার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররকমের যন্ত্র আবশ্যক, এবং সে যন্ত্র মুখ্যতঃ "জড়যন্ত্র" (mechanical contrivance) হইবে না। জড়ের অণুতে অগ্নিকে কালাগ্নিরুদ্রমূর্তিতে আবিষ্কৃত করিয়াছে আমাদের বিষচ্ছন্দা বুদ্ধিপ্রসূত জড়যন্ত্র। শক্তিসাগর মন্থনে হলাহল উঠিয়াছে। কিন্তু অগ্নিকে নিখিল দৈবীসম্পদের "পুরোহিত" "রত্নধাতম" (Supreme Giver of all Value) রূপে পাইতে হইবে যে! জড়াণু, জীবকোষ আর কারবারী চেতনার মূলে যে মহান শক্তিভাণ্ডার, শুধু তার "বহিঃপ্রকোষ্ঠ"টাতেই অভিজ্ঞ প্রয়োগকুশলী হইলেই ত চলিবে না; অগ্নি হইবেন "জাতবেদাঃ" এবং মধুচ্ছন্দাঃ (Knower of all that exists and functions, সুতরাং perfect Wisdom)।

আবার, "যন্ত্রম্" শব্দের "যম্"টাকে "যমন" বা control অর্থেও নেওয়া যায়। কোনও প্রস্তাবিত শক্তিক্ষেত্র (given power field) যদ্দ্বারা "trained, con-

trolled" হইয়া এক নির্দিষ্ট আকৃতি (pattern) রূপ পরিগ্রহ করে, তাহাই যন্ত্র। এই "যমন" (control) কর্মটি নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে হইতে পারে (canalizing, redirecting, focussing ইত্যাদি), সুতরাং যন্ত্র নানাবিধ। শাস্ত্রে চতুর্দশ মনু, চতুর্দশ যম এবং চতুর্দশ ভুবনের কথা আছে। ৭ x ২ = ১৪, এই চতুর্দশ এক "রহস্য" সংখ্যা, আমরা পরে দেখিতে পাইব। মনু থেকে মন্ত্র, যম থেকে যন্ত্র— ইহাও দেখিব। ভুবন ও তন্ত্র পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত। সর্বতন্ত্রেশ্বরী শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী।

শক্তিভাণ্ডারের বহিঃপ্রকোষ্ঠ থেকে ক্রমশঃ অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। বহিঃপ্রকোষ্ঠে শক্তিবিন্যাসের যে আকৃতি (Pattern), অন্তঃপ্রকোষ্ঠে সেটি নাকচ হয় না, সামর্থ্যে, প্রয়োগে, সম্ভাবনায় এবং ব্যঞ্জনায় সেটি আরও সমৃদ্ধ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আর বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান (জড়, প্রাণ, মন—সমষ্টি ও ব্যষ্টি সব দিকেই) তুলনা করিলে এটি বুঝা যাইবে। অণু, জীবকোষ, কারবারী মন—এ সবের ভিতরের নক্সা (Pattern) আমরা পাইতেছি। আরও ভিতরের সন্ধানও মিলিবে। সমষ্টিগত দৃষ্টিটাও (macrocosmic appreciation) ক্রমে গভীর ও ব্যাপক হইতেছে সন্দেহ নাই। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর—এভাবে খোঁজার কি কোন অবধি আছে? যদি মনে করা যায় আছে, তবে 'ক' নামক বস্তুটার নিরূপক শক্তিকূটের (determining stress system) যেটি সব চাইতে মূলীভূত (basic) অবস্থা বা সংস্থা, সেটি হইল 'ক' সম্বন্ধে তার "হৃৎ" (core) বা নাভি। এবং সেই হৃৎকে আশ্রয় করিয়া 'ক'এর সত্তাশক্তির যে আকৃতি, সেটি হইল তার "হৃল্লেখা" (Basic causal pattern)। এইটি 'ক'এর মৌলিক যন্ত্ররূপ। এটি রহিলে 'ক' অন্ততঃ বীজ বা সম্ভাবনা রূপে রহিবেই। এটি না থাকিলে 'ক' নাই। এর তুলনায় 'ক'এর আর সব Pattern "বাহ্য"। মূল প্যাটার্ন বা হৃল্লেখাই হইল তার স্বাভাবিক রূপ বা যন্ত্র। মন্ত্রের বেলায় যেমন, এখানেও তেমনি মূল প্যাটার্নটি ক্রিয়াভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরে আসিয়া বহুধা আবৃত ও সংকীর্ণ (veiled and confused) হইয়াছে। অনেক আবরক ও বিক্ষেপক সরাইয়া তবে শুদ্ধ সম্পূর্ণ "রূপতন্মাত্র"টি পাইতে হইবে। শব্দতন্মাত্রর বা মন্ত্রের মত রূপতন্মাত্র বা যন্ত্রেরও তার বস্তুটির সঙ্গে "তদ্‌ভাবে তদ্‌ভাবঃ তদভাবে তদভাবঃ" সম্বন্ধ।

শক্তির বা সামর্থ্যের যেটি নিরতিশয় "কেন্দ্রীণ" ঘনীভাব তাকে "বিন্দু" আখ্যা

দিলে, হৃল্লেখা হইল বিন্দুরই কোনও বিশেষ সৃষ্ট্যুন্মুখ কারণযন্ত্র (causal pattern) রূপ প্রাথমিক অভিব্যক্ত অবস্থা। বিন্দু নিখিল সৃষ্টির বীজ (Cosmic Causal Potency), কিন্তু ক, খ বা গ সৃষ্ট হইতে গেলে গোড়াতেই এক একটা বিশেষ আকৃতি (Pattern) তাতে মেলা আবশ্যক। এই "বিশেষ" গুলি গোড়াতে "বর্ণ" (element) এবং "কলা" (Partial or aspect) আকারে অভিব্যক্ত। পরে, সংখ্যা ও পরিমাণ, এবং সেটি আবার কাল ও দেশের বিশেষ 'সংস্থা' রূপে অভিব্যক্ত হয়। এ সবের আলোচনা জপসূত্রে মিলিবে। হৃল্লেখা স্বয়ং সংখ্যা-পরিমাণাদির সম্ভাবনামাত্র; তাতে সে সব এখনও 'ব্যাকৃত' (evolved) হয় নাই। সুতরাং যেটিকে বর্তমান বিজ্ঞান "এটমিক্ নাম্বার", "ক্রমোসোম নাম্বার" ইত্যাদি বলিতেছে, সেটি সূক্ষ্মের পর্যায়ে পড়িলেও জড়ের বা জীবকোষের হৃল্লেখা নয়। অবচেতন মনের যে চিত্রখানা পাইতেছি সেটি সম্বন্ধেও এই কথা। হৃল্লেখা স্বয়ং দেশ-কালাবচ্ছিন্ন নয়; কারণতা বা সম্ভাব্যতা দ্বারা অবচ্ছিন্ন মাত্র। দেশে (Extension, মাত্র Physical space নয়) ও কালে "অবতরণ" করিয়া হৃৎ হয় হৃদ্দেশ এবং হৃদয়। এ আলোচনাও পরে মিলিবে। এ প্রসঙ্গে Plato আর Whitehead-এর "চিন্তা" তুলনাযোগ্য।

সূক্ষ্মে ও স্থূলে অবতরণে ক বা খ এর যেটি হৃল্লেখা সেটি বিচিত্র আকার-পরম্পরা পরিগ্রহ করিয়াছে। এগুলি শুদ্ধ, সম্পূর্ণ রূপ বা যন্ত্র নয়। পরস্পরের সঙ্ঘর্ষ (interference), অভিভব (encroachment) ইত্যাদি ঘটিয়া স্বাভাবিকরূপের ব্যত্যয় এবং স্বাভাবিক সামর্থ্যের সংকোচ ঘটিয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি "লোক" বা plane জপসূত্রে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এগুলি মুখ্যতঃ seven planes and orders of experience। জপসূত্রে "সপ্তখ্যাতি"। প্রত্যেকটি আবার "পরাক্" (negative) এবং "প্রত্যক্" (positive) দুইভাবে লইলে পাই চৌদ্দ সংখ্যা। "এই" বলিয়া গোচর হইতেছে যে সব রূপ, আকৃতি ও যন্ত্র, সেগুলিকে শোধন ও সম্পূরণ করিতে করিতে "সত্য" পর্যন্ত পৌছিতে হইবে। সেখানে তত্ত্বরূপে (as it in itself) ও ধারারূপে (as a process)—দুইরূপেই সেটিকে দেখিতে হইবে। সেভাবে দেখিলে = "সত্যঞ্চ ঋতঞ্চ", যাহা হইতে সৃষ্টির সূচনা। বিশ্বের বিচিত্র apparatus ত মিলিতেছে। কিন্তু গোড়াকারটা?

শব্দের দিক থেকে হৃল্লেখার অনুকৃতি (equivalent) হইল মায়াবীজ হ্রীঁ। 'হ'কার = শক্তির ব্যোমবৎ বিপুল নাদাবস্থা; 'র' কার = যে শক্তিদ্বারা ওই শক্তিব্যোম (Power Continuum) মথিত ও রূপিত হইতেছে (অগ্নি) ; 'ঈ' কার = মন্থনদণ্ড = যে Axis বা সূত্র আশ্রয় করিয়া মন্থন ও রূপায়ণ ক্রিয়াটি চলিতেছে; ঁ = নাদ ও বিন্দু এই দুই-এর অধ্যক্ষতায় এবং এই দুয়ের "কাষ্ঠা" (limit) অভিমুখেই ক্রিয়াটি চলিতেছে। অর্থাৎ একদিকে Continuum অন্যদিকে Point (dynamic)—এই দুই প্যাটার্ন রক্ষা করিয়াই নিখিল ব্যাপার চলিতেছে। যেমন, আলোকের বেলা, ইলেকট্রনের বেলা ঊর্মিরূপ এবং রেণুরূপ; প্রাণ ও মনের ব্যাপারেও তদ্রূপ। তবেই, হ্রীঁ প্রভৃতি বীজ শক্তিক্ষেত্রে এক একটি ফর্মূলা—পদার্থবিজ্ঞানে যেমন পাই। একটা ফর্মূলার ভিতরেই "যন্ত্র"টারও নিরূপণ রহিয়াছে। পূর্বোক্ত বিশ্লেষণটি প্রাণপ্রযত্নের মৌলিক রূপবিশেষ হিসাবেও দেখান যাইবে। মূলগ্রন্থে তত্ত্ব (Principles) আলোচিত হইয়াছে।

শেষকালে, আমাদের শরীরযন্ত্রটা পরীক্ষা কর। শারীরবিজ্ঞান (Anatomy ও Physiology) অণুবীক্ষণাদি apparatus সাহায্যে যতদূর দেখাইতেছে, সেইখানে শেষ করিলে কি চলিবে? প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যা ত দূরের কথা, এই স্থূল যন্ত্রটারই পূরা ব্যাখ্যা তাতে মিলে না। সুতরাং, আরও সূক্ষ্মস্তরের যন্ত্র নিশ্চয়ই আছে। প্রশ্ন উঠিবে—কিরূপ উপাদানে সে যন্ত্র নির্মিত এবং তার রূপের এবং ক্রিয়ার প্যাটার্নটাই বা কি? তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যাকে সুষুম্না, ষট্‌চক্রাদি বলিয়াছেন, সেগুলির স্থান কোথায়? যোগীরা যাকে সূক্ষ্মদেহ, নির্মাণকায়, দিব্যদেহ ইত্যাদি বলেন, সেগুলো কি? উৎক্রান্তির পর যে আতিবাহিকাদি দেহ, সেগুলো? নিত্যমুক্ত (যথা সনৎকুমার) ও সিদ্ধদের দেহ? জরামৃত্যু প্রভৃতির এলেকা কতদূর পর্যন্ত? সব কিছুর মূলে স্পন্দ ত বটেই। কিন্তু স্পন্দের "ঋতম্" (Rhythm, ছন্দঃ) কোন্ "গ্রামে" উপনীত হইলে সে ছন্দঃ Entropy বা Cosmic running down" এর ঊর্দ্ধে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, কাজেই অজর অমর করিয়া দেয়? পরাকাষ্ঠায় হইল—"সত্যঞ্চ ঋতঞ্চ"। যন্ত্র এবং তার ছন্দঃ কত পাদে ও মাত্রায় সে পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইবে? এটা জরুরি প্রশ্ন। তারপর, অন্নময়াদি "কোষ" হিসাবে যে যন্ত্রবিভাগ, তার মূলেই বা কি? জপাদি সাধনের সঙ্গে এ সব প্রশ্নের যথার্থ উত্তরের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

জপ

জপ সম্বন্ধে কিছুদিন আগেকার এই (প্রকাশিত) লেখাটাও ভূমিকায় সন্নিবেশিত হইতেছে। শাস্ত্র "জপাৎ সিদ্ধিঃ" ইহার তিন সত্য দিয়া জপ কার্যে সংশয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সন্ত মহাজনদেরও ওই এক কথা—"নাম লও, নামেই সব হইবে। নামই পরম সম্বল, নাম বই আর গতি নাই।" নাম লওয়াই ভজন; আর, ভজন বিধিপূর্বক হইলে তাহাই সাধন। নাম বলিতে কার নাম, কোন নাম এ প্রশ্ন যেমন আসে, নাম কোথা হইতে, কিভাবে লইতে হইবে এ প্রশ্নও তেমনি আসিয়া থাকে। আগের প্রশ্নটার উত্তর মিলে যখন "ইষ্টনাম" বা —"মন্ত্র" পাই। পরেরটার উত্তরের জন্য কোন "নামদাতা" এবং নাম দেওয়ার একটা "প্রণালী" বা পদ্ধতি ঠিক হওয়া চাই। সচরাচর নামদাতাকে "আচার্য্য", "গুরু", "ইষ্টদেব", আর নামদানের প্রণালীকে "দীক্ষা" বলা হয়। দীক্ষার সঙ্গে অথবা পরে আবশ্যক ভজনবিধির উপদেশকে "শিক্ষা" বলা হয়। দীক্ষায় একনিষ্ঠ হওয়া চাই; উপদেশের বেলা তাদৃশ বাঁধাবাঁধি নাই। তবে সেক্ষেত্রেও অরিচ্ছন্দ-মিত্রচ্ছন্দের বিচার করিতে হয়। এক কথায় উপদেশের উপযোগিতা ও উপাদেয়তা আছে।

এ সব কথা প্রায় সকলের শোনা আছে। যাঁদের মূলে সংশয় তাঁহাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া সহজ নয়। তবে মনে রাখিতে হইবে, যে বোঝা-পড়া শেষ করিতে হইলে পরীক্ষা, তত্ত্ব এবং তথ্য দুই ক্ষেত্রেই নিষ্ঠাপূর্বক চালাইতে হইবে, যেরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় করিতে হয়। থিওরি এবং এক্সপেরিমেন্ট—দুয়েরি প্রয়োজন আছে। তত্ত্ব এবং তথ্যের মধ্যে সন্ধি আবশ্যক। বিচ্ছেদ বিগ্রহ হইলে বুঝিতে হইবে যে সত্য সন্ধানটি এখন পর্যন্ত হয় নাই। তত্ত্ব এবং তথ্য পরস্পরের সম্বাদী হইবে, বিসম্বাদী নয়। সত্য বা যথার্থের জ্ঞানকে যদি বলি "প্রমা", তবে এই সত্য সন্ধানকে বলিব প্রমাণ।

জপ একরূপ ক্রিয়া—কায়িক (অজপা), বাচিক, মানস, বিমিশ্র যে ভাবেই লই না কেন। এই ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। বিশ্বাস করিব, কি করিব না—এটি নির্ভর

করে সত্যসন্ধান বা প্রমাণের উপর। প্রমাণের ব্যাপ্তি তত্ত্ব এবং তথ্য—principle and fact উভয়তঃ। শোনা যায় অঙ্গারও নাকি কর্মযোগে হীরক হয়। শুনিয়াই বিশ্বাস হয় কি? প্রমাণ চাই। তত্ত্বের ক্ষেত্রে জানিলাম (১) দুয়েরই মূল বস্তু বা উপাদান একই; আর (২) সেই মূল বস্তুর দানাগুলি অঙ্গারে যে রীতিতে সাজানো, হীরাতে সে ভাবে নয়, অন্যভাবে সুতরাং (৩) সাজানোর রীতিটি অঙ্গারানুরূপ না হইয়া হীরকানুরূপ হইলেই অঙ্গারের হীরকত্ব প্রাপ্তি। পদার্থবিজ্ঞান অধুনা আরও অগ্রসর হইয়াছে দেখিতেছি। সব কিছু পদার্থের মূল বস্তু Energy বা শক্তি (নাদ বা Continuum, বিন্দু বা Quantum) এবং শক্তির বিভিন্ন অবস্থিতি-পরিস্থিতি (সংস্থা বা ব্যূহ) হইতেই বিভিন্ন পদার্থ। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যাহা জানিলাম, তথ্যের ক্ষেত্রে সমীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারা সেটি যাচাই না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সংস্থাপক (conclusive) প্রমাণ মিলিল্ না, এবং বিশ্বাসও সুস্থির হইল না; স্থিরমতি স্থিতধীও হওয়া গেল না।

জপের মূলে যে principle বা তত্ত্ব আছে, তাহাকে বলা যাক—রহস্য। "উপনিষদ্" কথাটার একটা মানেও তাই। তত্ত্ব সর্বক্ষেত্রেই "গুহানিহিত" বা নিগূঢ়। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বটে। তবে সে গুহা ভেদের কৌশল (বিদ্যা) বা technique অধুনা আমরা বেশ দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারিতেছি। জপের যেটি রহস্য (সত্যস্য মুখং) সেটি পিহিত হইয়াই আছে "হিরণ্ময় পাত্রেণ" কি "প্রস্তরস্তূপেন" তা বুঝিতেছি না। সেটিকে "গুহ্য", "গুহ্যাদপি গুহ্য", "রাজগুহ্য", ইত্যাদিরূপে রহস্য করিয়াই রাখা হইয়াছে বরাবর। তার হেতু তখনও ছিল, এখনও আছে। তবে তখন হিরণ্ময় পাত্র জুটিত ব্রহ্মবর্চের অধিকারী হিরণ্যরেতাদের যুগে। কিন্তু রহস্য হইলেও সেটি অত্যাধুনিক "বৈজ্ঞানিক বর্বরতা" যুগে অজ্ঞাতব্য, অনধিগম্য ত নয়। বিষয়, সম্বন্ধ, অধিকার, প্রয়োজন—এই চারিটিকে অনুবন্ধ বলা হয়। অনুবন্ধ বিচার করিয়া সব কিছুর সুতরাং জপের অথবা অন্য যে কোনও রহস্যের অনুসন্ধান করিতে হয়। নচেৎ শ্রেয়ঃ নাই, চরিতার্থতা নাই। যেমন, বর্তমান যুগে আণবিক-শক্তি-ভাণ্ডারের চাবিকাটি হাতে পাইয়া আমাদের সম্প্রতি শ্রেয়োলাভ ঘটে নাই, ঘটিয়াছে সম্ভাবিত মহতী বিনষ্টি। জপ যে শক্তি-ভাণ্ডারের সন্ধান দেয়, সে শক্তি আরও "মৌলিক", আরও বিপুল, ব্যাপক শক্তি। সে শক্তিসাধনায় সংযত সাবধানতা এবং স্বচ্ছ গাম্ভীর্যের প্রয়োজন আরও বেশী। এই জন্য সিদ্ধ ও সাধকেরা সর্বত্র রহস্য

ভাঙ্গিতে নারাজ হইয়াছেন এবং বৈদ্যুতাগ্নি লইয়া তাঁহারা বিজলি বাতির বিপণি সাজান নাই। তথাপি সাধকের পক্ষে তত্ত্ব জানার প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। "ইতর" জনের পক্ষেও সেরূপ সাক্ষাৎ প্রয়োজন না থাকিলেও পরোক্ষ প্রয়োজন কিছুটা থাকিতে পারে। যেমন, যে আণবিক শক্তি লইয়া কারবার করে না, তার পক্ষে আণবিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন। অনেকের পক্ষেই কারবারের জন্যই জানার প্রয়োজন থাকিতে পারে। কোথাও বা জানাতেই ইষ্টসফলতা। জানার পর করার প্রবৃত্তিও আসিতে পারে। ফল কথা, প্রয়োজনটা যে ভাবেই হোক, সেটা যদি নেহাৎ সখ না হইয়া সত্যকার গরজ হয় তবে সেটা যে কোনও উপায়ে নিজেকে মিটাইতে চাহিবে। এখন ভাবিয়া দেখ, জপের যেটা রহস্য সেটা জানার জন্য গরজী, দরদী, মরমী অধিকারী কয়জন?

তারপর জপ লইয়া কার্যতঃ পরীক্ষায় নামা। আগে যদি জপের তত্ত্ব বা রহস্যের কথা কিছু জানা থাকে তবে জপ কর্মে কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধা (working belief) সুতরাং প্রবৃত্তি আসা সহজ হয়। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে কোনও পরীক্ষায় নামাতেও তাই। প্রস্তাবিত পরীক্ষার theory বা যুক্তিটা জানা থাকিলে ত কথাই নাই; অন্ততঃ পক্ষে এই বিশ্বাসটি থাকা চাই যে মূলে যুক্তি আছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি (বিশেষজ্ঞ) সেটি জানেন, এবং অপরে ঠিক ঠিক বিদ্যা (technique) প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষার সফলতা প্রমাণিত করিয়াছেন। এইটি "আপ্ত" প্রমাণ। জপাদির ক্ষেত্রেও এটিকে আশ্রয় করিতে হয়। সকল ব্যবহারিক বিজ্ঞানেই এই দস্তুর। যে ব্যবহারী, তার আপন বুদ্ধির একটা "প্রাথমিক" অনুমতি পাইতে হয়। সেটাকে ঠিক বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বলে না। বুদ্ধি যদি কারবারে নামার আগে তার মূলে যে যুক্তি আছে বা থাকিতে পারে, সেটিকে যথাসম্ভব যাচাই করিয়া লয়, তবে ঐ প্রাথমিক অনুমতি পত্রখানা আরও "পাকা" হইয়া গেল। তখন সেটা আর শুধু অনুমতি নয়। সেটা তখন অনুমোদন (permit) নয়, approval. এতে কাজে গরজ বাড়ে, কিন্তু এতেই কাজের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। যুক্তি, শাস্ত্র, মহাজন বাক্য, এবং আত্মপ্রত্যয়—এই চার পর্যায়ে পর্যাপ্তি শেষ। শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা পূরা হয় না। তবে স্ব-বুদ্ধির একটা permit লইয়াই সবক্ষেত্রে, সমীক্ষাক্ষেত্রে বা পরীক্ষাগারে ঢুকিতে হয়। যুক্তি মিলিলে অনুমোদন; শাস্ত্র ও মহাজন বাক্যে সংস্কার ও সমর্থন; আত্মপ্রত্যয়ে সর্বসংশয়-নিরসনে পাকা

"স্বাক্ষর"টি—পর্যন্ত হইয়া যায়। তিনি 'পর'ই হউন আর "অবর"ই হউন, যতক্ষণ না তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ "দেখা"টি হইতেছে ততক্ষণ সর্বসংশয় কদাপি ছিন্ন হবার নয়। যতক্ষণ সমীহ ততক্ষণ সমীক্ষা; যতক্ষণ পরোক্ষ ততক্ষণ পরীক্ষা।

জপের কাজে যাহার আপন বুদ্ধির permit মিলে নাই, তার পক্ষে তত্ত্বই বা কি, তথ্যই বা কি, কোনও বোঝাপড়া করিয়া বিশেষ লাভ নাই। সে ক্ষেত্রেও কিন্তু permit-এর জন্য আরজি করার মত একটা মরজি আছে, কিম্বা হইতেছে কিনা সেটা অবশ্য বিবেচ্য। অগ্রে শুভেচ্ছা, পরে বিচারণা। আগে চাওয়া, তারপর পাওয়া। না চাইতেই যেখানে পাওয়া যায় সেখানে বুঝিতে হইবে পাওনাটা মালখানায় মালেকের নামে মজদুই ছিল।

ধরা গেল জপের কাজে permit মিলিয়াছে। এ permit সর্বাগ্রে নিজের ভিতরেই মিলাইতে হয় দেখিয়াছি। কিন্তু বাহিরে সেটা endorse বা মঞ্জুরী করারও অপেক্ষা আছে। কেন আছে তাহার অবশ্য হেতুও আছে। ভিতর আর বাহির পরস্পরকে সাক্ষী করিয়া নিজ নিজ "সই"টি দিয়া থাকে। ধরা গেল, এই মঞ্জুরীটিও মিলিয়াছে। ভিতর থেকে কেহ বলিল—কাজটা করেই দেখো না কি হয়। বাহির হইতে আর কেহ বলিল—করই না, ফল মিলিবে। তখন ভিতর বাহির দুইয়ে মিলিয়া ঠিক হইল—লাগিয়াই যাই। এই রকমধারা ভিতর বাহির মিলাইয়াও যে কাজে নামিল, তাহারও কিন্তু কাজটি সহজে হাসিল হইতে দেখি না।

"আমি এতদিন ধরে জপ করলাম, কিন্তু পেলাম কি? অমুক ব্যক্তি তো জিন্দেগিভর জপেই লেগে আছে, কিন্তু তারই বা হোল কি? কৈ, রংও তো ফিরল না; হাড়ের টকও ঘুচলো না!"

এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, জপের সত্যকার যেটা কাজ সেটা হয় আসলে সূক্ষ্ম বা সংস্কারের ক্ষেত্রে,—সুতরাং আমার এই বাজার-চলতি কারবারী হিসাবের খাতায় তার ফলাফলের অঙ্কগুলো সরাসরি পড়িতে দেখি না। এমন কি, উল্টা ফলও কিছুটা ফলিতে দেখিতে পাই। তাতে ঘাবড়াইলে চলিবে না। হোমিওপ্যাথিক high potency ঔষধের মত কাজটা আরম্ভ হয় গভীর স্তরে, এবং সেথায় "মন্থন আলোড়নের" ফলে অনেক সূক্ষ্ম, গূঢ় দৃঢ় অশুভ সংস্কার শিথিল হাল্কা হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিতে পারে। অর্থাৎ aggravation, কিনা, রোগের লক্ষণগুলির সাময়িক

বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে। তাতে রোগী অথবা বৈদ্য কাহারও ভয় পাইবার কারণ নাই। জপের "বুনো শূয়োরটি" আসলে "মুষিক বৃদ্ধি" নয়, "গজক্ষয়"—বৃহৎ বলবৎ অশুভ সঙ্কীর্ণ অথচ উদগ্র হইয়া বুখিয়া তাড়া করিতেছে। বৈখরী জপের ক্রিয়া "অন্নময়" কোষে সুরু হয় বটে, কিন্তু "সমর্থ" জপ হইলে সেটি "প্রাণময়", "মনোময়" ইত্যাদি ক্রমে সত্তার গভীর হইতে গভীরতর স্তরে গিয়া কাজ করিতে থাকে। সমর্থ জপের আসল কাজটি এক কথায় হইতেছে এই—এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণযন্ত্রটার ভিতর যেখানে যেখানে স্পষ্ট অথবা গোপন বিষম বা বিষচ্ছন্দের "দৌরাত্ম্য" আছে, সেখানে সেখানে সুষম বা মধুচ্ছন্দ আনিয়া সৌষ্ঠব ও স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া দেওয়া। বিষমচ্ছন্দঃকেই (disharmony) বলে "অসুর" বা সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে পাপ্মা। সমর্থ জপের ক্রিয়ার ফলে যেটি "অসুর" সেটি হয় "সুর"। জপে যন্ত্রশুদ্ধি হওয়া মানে অপহতপাপ্মা হওয়া। "মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা শোধন করি বলে তারা"। "তারা" মায়ের তারক ব্রহ্ম নাম ত বটেই, তা ছাড়া তারা = তার = ওঁকার। জপে পাপ্মা অপগত হইবে। অপগত হওয়া মানে বেমালুম উধাও হওয়া নয় ত। আলাদা হইয়া তফাৎ হইয়া যাওয়া, elimination. গোড়ায় এইটিই হয়—পাপ পুরুষ বাহির হয় এবং পরে সরিয়া যায়। পরে অবশ্য—বিজ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধ ভূমিতে গিয়া "পরশ পাথরের" সন্ধান মিলিলে সবকিছুই "সোনা" হইয়া যায়—"বিষোঽপি অমৃতায়তে"। মধু-কৈটভ সংহার হইল, কিন্তু তাহাদের "মেদ" দিয়া রচিত হইল "মেদিনী"। এইটিই হইল Transformation, Sublimation. ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ, তখন "চিতি রূপেণ" ও "ভ্রান্তি রূপেণ" দুইই এক বস্তু।

দ্বিতীয় এবং আসল কথাটা কিন্তু হইতেছে জপকে "সমর্থ" বা "বীর্যবান" করা। জপবীর্যে অমোঘ শক্তি। কিন্তু জপবীর্য হয় কি করিয়া? শ্রুতি বলেন,—যে কাজই করা যাক না কেন, সেটা "বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া উপনিষদা বা বীর্য্যবত্তরং ভবতি"। বৈষয়িক আধ্যাত্মিক সবতাতেই ঋদ্ধি সিদ্ধির নিমিত্ত অত্যাবশ্যক হইতেছে—ওই তিনটি। বিদ্যা মানে এখানে প্রয়োগপদ্ধতি (মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্র), ব্যবহারবিজ্ঞান বা আর্ট। যেমন প্রাচীনকালে "মধু বিদ্যা", "দহর বিদ্যা", "পঞ্চাগ্নি বিদ্যা" ইত্যাদি। বর্তমানে যে কোনও কাজ সুষ্ঠু সফল ভাবে করার যে correct technique তাহাকেই তাহার আর্ট বলে। "শ্রদ্ধা" বলিতে মোটামুটি বুঝায় কাজটার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ কাজটায়

"দরদ"—সত্যিকার interest. এই থেকে আসে আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা, বিশ্বাস। আর উপনিষদ্ মানে রহস্য বা অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির জ্ঞান। এই শেষেরটা হইল Science, Mystic Science ও বটে। লক্ষ্য কর যে শ্রুতি "বা" শব্দটার প্রয়োগ করিয়াছেন। "বা" মানে বিকল্পও বটে, সমুচ্চয়ও বটে। অর্থাৎ তিনটি চাই, কিন্তু তিনের অন্তত একটার বীর্য, কিনা "জোর" থাকা চাই। আর, শ্রদ্ধাই যখন মূল, তখন মূলে জোর ধরিলে শাখাতেও জোর ধরিবে। একটায় যদি জোর থাকে তবে কর্মটি (জপ) "বীর্য্যবৎ" হইবে। অন্যথা "বীর্য্যহীন"; নির্বীর্য যেমন ঢোঁড়া সাপ। ঢোঁড়া সাপের মাথায় সাত হাজার ধন একটি মাণিক থাকে না ত! জপ "ঢোঁড়া" হইলে সে হয় মামুলি, ঢিমে তেতালা, এমন কি, morbid.

আরও লক্ষ্য কর—শ্রুতি "বীর্য্যবত্তর" বলিলেন, "বীর্য্যবত্তম" বলিলেন না। তার মানে, বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ সহকারে অনুষ্ঠিত সকল রকম ক্রিয়ারই "বীর্য্যবত্তার" কিনা জোর ধরার, একটা তরতমতা, ক্রমোন্নত ধারা অথবা "অভ্যুদয়" আছে; সুতরাং একটা কাষ্ঠার বা পূর্ণতার বা নিঃশ্রেয়সের দিকে প্রবণতা আছে। সেই ধারাকে বলিতে পার শঙ্কর ধারা। এটি শুক্ল ধারা। বিদ্যা শ্রদ্ধা উপনিষদের শৈথিল্য বৈকল্য ক্লৈব্যের নিমিত্ত এর বিপরীতটিও হইয়া থাকে। সেই উল্টা স্রোত এবং তজ্জন্য আড়ষ্ট আবিল উচ্ছৃঙ্খল ভাবকে বলি ধূম্রমলিন সঙ্কর ধারা। আগেরটা তালব্য শ, এটা দন্ত্য স। শঙ্কর ধারাই সেই শাশ্বতী গঙ্গা প্রবাহ, ভগীরথ তপস্যা করিয়া যাঁহাকে আদি বিদ্বানের অভিশপ্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন। আমাদের সকল কর্মেই তাহাই করিতে হয়। অঙ্গার লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়। অঙ্গার হইবে আঙ্গিরস। গীতা "তপ"কে তিন ভাবে বলিয়াছেন। প্রকারান্তরে তাই হইল বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষদ্। বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণী। সরস্বতী বহুদিন থেকে বালুকায় লুকাইয়াছেন। জপের বা অপর কোনও অধ্যাত্ম-সাধনের রহস্যের সন্ধানী আমরা অনেকদিন থেকেই নই। কিন্তু সন্ধান ত চাই। প্রচলিত, অনুসৃত বিদ্যাও খণ্ডিত, কুণ্ঠিত, কৃপণ। সিদ্ধ বিদ্যা—correct technique—কি মুখের কথায় আয়ত্ত করা যায়? আর, শ্রদ্ধা? প্রায় সবাই "অশ্রদ্ধধানাঃ" হইয়াছি। বুদ্ধির যে permit-এর কথা বলিয়াছি, সেটাও অনেকক্ষেত্রে জাল, নকল। সাচ্চার কারবার প্রায় বন্ধ। ওই তিনেরই উন্মেষ উৎকর্ষ

হইতে থাকিবে—ঋদ্ধি বিবৃদ্ধি হইবে, যতক্ষণ না পূর্ণতায়, পরাকাষ্ঠায় না পৌঁছিতেছি। অফুরান চড়াই-উৎরাই এর পথে অনন্তের যাত্রী তবে কি? তা নয়। কিছুটা চলার পর কৃপার সন্ধান মিলে, তখন পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। আগে প্রয়াস পরে প্রসাদ, আগে race পরে grace.

শ্রদ্ধাই মূল, সন্দেহ নাই। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ"। কিন্তু শ্রদ্ধা তামস হইলে তা থেকে বিশেষ কিছু হয় না। শ্রদ্ধাবীর্য থাকা চাই। তা হইলে বিদ্যাও হইবে উপনিষদ্‌ও হইবে। সে সাধক গরজী, দরদী, মরমী তাঁহার কাছে সকল দরজাই খোলা। যার গরজ সেই গরজী—ব্যস্ত বাগীশ বা হঠকারী নয়। যার বুকে ব্যথা সেই দরদী, যার মরমে বাজে সেই মরমী। যাহাতে দুইয়ের মধ্যে একতানতা (unison) আনিয়া দেয় তাকেই বলে শ্রদ্ধা। নাম ও নামদাতার সত্তা-শক্তির সঙ্গে সাধকের সত্তা-শক্তির যখন সমচ্ছন্দতাটি (concordance) চালু হয় তখনই বলিব নামে বা গুরুতে শ্রদ্ধা হইল। শ্রদ্ধার একটুখানি "ছোঁয়াচ" লইয়া সব কাজই সুরু করিতে হয়—অর্থাৎ, যথাসম্ভব অন্তরের যোগটি। কিন্তু "শ্রদ্ধাবীর্য্য" যে অনেক সাধনের ধন। শ্রদ্ধা যখন আসিল তখন সমাধানের আর বাকি রহিল কি? এই বিশ্বাস, এই ব্যাকুলতার কথাই তো শ্রীমুখে শুনিয়াছি। "শ্রীকর্ণের" শ্রদ্ধা হইয়াছে কি?

সব ব্যবহারক্ষেত্রেই ওই তিন "বজ্রের" মিলনেই যে সিদ্ধি হয়, তা আমরা স্বতঃসিদ্ধের মত স্বীকার করিয়া থাকি। সব কিছু সিদ্ধির জন্য রহস্যবিৎ, প্রয়োগকুশলী এবং শ্রদ্ধালু সাধক চাই। কিন্তু আশ্চর্য, জপ বা অপর কোনও আধ্যাত্মিক সাধনের বেলা এটি আর মনে থাকে না। তখন নিতান্ত নিরীহটি—যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রটি—সাজিয়া কৃপার দোহাই দেই, নির্ভর শরণাগতির দোঁহা শোনাই। কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব কিনা! কৃপা বলে কাহাকে? নির্ভরশরণাগতি যখন তখন যত্রতত্র "পতন ও মূর্চ্ছার" ভাবটি আনিতে পারিলেই হয়?

কৃপা অহেতুক শাশ্বত এবং সর্বত্রগ হইলেও তাহার সঙ্গে "সজীব সংযোগ"টি সংঘটিত হয় অনেক সাধ্য সাধনায়; আর শরণাগতি তো ঠাকুরের পায়ে আমার শ্রেষ্ঠ ও চরম অর্ঘ্যদানটি! যে অকৈতবকাতর কৃপাভিখারী তার কাছেই না কৃপাঘনমূর্তি ঠাকুর "প্রকট"! সব ছাড়িতে (সর্ব-ধর্মান্ পরিত্যজ্য) না পারিলে তদেকশরণ হওয়া যায় না। কাজেই আত্মনিবেদন (বিশেষ করিয়া ভক্তের মত কোনও নিষ্কৈতব ভাব বা

রসাশ্রয়ে) হইতেছে "সাধ্য শিরোমণি"। তবে অবশ্য বিদ্যা-বীর্যাদির সঙ্গে সঙ্গে "রোখের" সহিতই শরণাগতি ও কৃপাভিখারীর অনুকূল মনোভাবটি আনিবার সাধনও করিতে হয়। নহিলে, শ্রদ্ধার মূল কাঁচিয়া পচিয়া শুকাইয়া যাইবে। হয়ত বা জপাদিও করিব, আর দুই বেলা শিকড় শুদ্ধ চারাটি উঠাইয়া দেখিব শিকড় কতখানি "বড়" হইল না হইল! যেন মূলের হিসাব রাখার ভার যে শাখাপল্লবচারী—তাহার! মূলের ভাবনা ভাবিবেন যিনি মূলের মালিক। "মনুয়ারে, তুই বেয়ে যা রে দাঁড়। তোর হাইল্যা ব'স্যা আছে মাঝি ভাবনা কি রে আর।"

জপ-রহস্য

(১)

আমরা এতক্ষণ শব্দ এবং রূপ বা মন্ত্রশক্তি এবং যন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন শব্দ বা মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া যে জপক্রিয়া অনুসৃত হয়, তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। জপকর্মের রহস্য পরিস্ফুট করার জন্যই মুখ্যতঃ এ গ্রন্থের অবতারণা। তবে মূল গ্রন্থ অনুধাবনের পক্ষে সুবিধার জন্য প্রারম্ভে একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লওয়া মন্দ নয়। তাই এখানে একটা "কাঠামো" খাড়া করার চেষ্টা করা যাইতেছে :—

জপের স্বরূপ বিশ্লেষ করিতে গেলে দেখিতে পাই—জপ,—ধ্বনি (ব্যক্ত বা অব্যক্ত), সংখ্যা, আর ভাব (অর্থ)—এই তিনের ত্রিপুটী। বাক্, প্রাণ এবং মন—যথাক্রমে এ তিনের নির্বাহয়িতা। শ্রুতির সাঙ্কেতিক ভাষায়—অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্রমাঃ। প্রত্যেকটি আবার স্বানুগত, স্বগত ও সমষ্টিগত—এভাবে ত্রিবিধ। ধর, "গুরু" এই মন্ত্র। গ, উ, র, উ—চারিটি অক্ষর। প্রতিটি অক্ষরের স্পন্দন সংখ্যা, আর স্পন্দন রীতি (বা ছন্দঃ) এক নির্দিষ্ট "আকৃতি" (Pattern বা Type) অনুরূপ হওয়া আবশ্যক "সমর্থ" জপে। এই হইল "গুরু" এই মন্ত্রের স্বানুগত "সংখ্যা" (elements of rhythm)। তারপর শুধু অক্ষরব্যক্তিগুলির সংখ্যা (= সংখ্যা + রীতি) ঠিক রাখিলেই হইল না। তাদের মিলন (compounding) টিও ঠিক হওয়া চাই—যথা, অক্ষরাবয়ব চারিটির স্পন্দন অযথা অন্তরিত বা ব্যবহিত হইলে হয় না; ব্যবধানে বিবাদী স্পন্দ প্রবিষ্ট হইলে হয় না, ইত্যাদি। সুতরাং, গ, উ, র, উ—এদের ছাড়াও "গুরু" এই নামের একটা স্বগত সংখ্যা ও রীতি আছে। তারপর, ধর ঐ মন্ত্র জপ করিয়া যাইতেছি। ১০ বার, ১০৮ বার ইত্যাদি। এর দ্বারা সমষ্টিগত একটা স্পন্দন সংখ্যা ও রীতি প্রস্তুত হয়। সেটি "আকৃতি" ও "আয়তনে" (in type and magnitude) একটা নির্দিষ্ট কাষ্ঠায় (limit-এ) না উপনীত হইলে সমর্থ জপকর্ম হইল না। ধর, আমি লাল রঙ্ দেখিতে চাই। আলোক তরঙ্গগুলির আয়তন (wave-

length) ও সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমায় না পৌঁছিলে সেটি হয় না। শব্দের, সুরের বেলাতেও তাই। ঠিক ঠিক আকৃতি ও পরিমাণের কম বেশী হইলে হয় না। স্পন্দনগুলি পরস্পরের সঙ্গে ভগ্নাংশ সম্বন্ধে থাকিলে হয় না। একটা পূরা composite rhythm বা Harmony সৃষ্টি হওয়া চাই। তবেই তাদের সঙ্ঘাতটি সমর্থ হইবে। স্বানুগত, স্বগত,—এদের ভগ্নাংশে সমাহার হইতে তাতে সমর্থ-সমুচ্চয় বা সংগ্রহ (cumulative effect) হয় না। জড়বিদ্যা বলে,—সামান্য একটা মৃদু কম্পন (oscillation) যদি ঠিক একই তালে ক্রমাগত প্রযুক্ত হয়, তবে সে একটা পর্বতকেও পাড়িয়া ফেলিবে। মন্ত্রশক্তি অমোঘ হয় সমর্থ, সমঞ্জস সমুচ্চয় দ্বারা। তারপর, স্পন্দন দীর্ঘ, মধ্য, হ্রস্ব—(Long, Medium, Short) ভাবে ত্রিবিধ। অনুদাত্ত স্বরিত, উদাত্ত; বাচিক উপাংশু, মানস ইত্যাদি ভেদ এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। দীর্ঘায়ত স্পন্দনে (তরঙ্গে) এ "উচ্চতা" কম হবার কথা। হ্রস্বে উচ্চতা অধিক। "তল", "লম্ব" এবং "বেধ"— এই তিন পর্বে জপাদির বিশ্লেষণ (analysis) এবং তার দ্যোতনা (interpretation) মূলগ্রন্থে সবিশেষ মিলিবে। পাদ (Magnitude), মাত্রা (Measure), কলা (Moment, Aspect or Partial) এবং কাষ্ঠা (Limit, Merger, or "Motive")—এই "চতুঃসূত্রী" অবলম্বনে সর্ববিধ বিশ্লেষণ। সংখ্যা লইয়া যেরূপ বিশ্লেষণ, ধ্বনি ও ভাব লইয়াও অনুরূপ বিশ্লেষণ হ'বে। সুতরাং, জপ যদি বৈখরী ইত্যাদি ভেদে চার হয়, তা হইলে প্রত্যেকটি পূর্বোক্ত নিয়মে—৩ x ৩ x ৩। ∴ ৪ x ৩ x ৩ x ৩ = ১০৮। বলা বাহুল্য, পশ্যন্তী ও পরায় জপ মুখ্যতঃ ভাবরূপ ও জ্ঞানরূপ হইলেও তার অব্যক্ত ক্রিয়া (স্পন্দ) রূপ থাকে। সুতরাং স্পন্দনিয়ামক রীতি (Law) সেখানেও নিরবকাশ হয় নাই।

(২)

পূর্বোক্ত স্পন্দনটি কিন্তু সমতালে হওয়া চাই। সমতালে হইলে একটি অনুরণন (resonance) সৃষ্ট হয়। জপক্রিয়ার সাফল্য (efficacy) মুখ্যতঃ ওই resonance effect-এর উপরই নির্ভর করে। ধর, কোনও বাজনার যন্ত্র (যেমন, সেতার) বাজাইতেছি। আমার অঙ্গুলি দ্বারা তারের ঝঙ্কার, resonance effect (অনুরণন) দ্বারা যে কি ভাবে কতখানি সমৃদ্ধ (augmented, enriched)

হইতেছে তা' সহজেই ধরিতে পারি। সেতারটা ঠিক "বাঁধা" থাকিলে উক্ত effectটি সৌষ্ঠব ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। অন্যথা ব্যতিক্রম ঘটে। নিকটে অন্য অন্য যন্ত্রও যদি "সম অনুপাতে" বাঁধা থাকে ত সেতারের ঝঙ্কার সে সবেও "অনুরূপ" resonance effect সৃষ্টি করিবে। আসল কথা,—অনুরূপতা। বাজানো সেতারেই হোক, অথবা আর আর যন্ত্রেই হোক—যেখানেই অনুরূপতার বদলে বিরূপতা, সেখানেই বাজনার স্পন্দন (virbrations) গুলো Harmony সমূহের harmonic combination হবার যে সব নিয়ামক ছন্দঃ (Equations) আছে, সে সব ছন্দে আসিবে না; সুতরাং তাদের combination, harmonic না হইয়া unharmonic হইবে। বিরূপতাবশতঃ resonance effect না হইয়া wavesগুলি refraction, defraction ইত্যাদি effect-এ বিভক্ত হইয়া নানাবিধ জটিল interference effect-এর সৃষ্টি করিবে। ফল—পরস্পর বিরোধ, উপমর্দ, জটলা। মূল স্পন্দনের প্রতিস্পন্দনটি বিবাদী, বিসম্বাদী হইবে। Waves সমূহের সম্বাদী অথবা বিবাদী হবার কতকগুলি সহজ গাণিতিক নিয়ম আছে। গণিতশাস্ত্রে ও শব্দবিজ্ঞানে সে সব নিয়মের বিশ্লেষ বিস্তার এবং পরীক্ষাদি আছে। গীত ও বাদ্যের বেলাতে যেমন, জপকর্মের বেলাতেও তেমনি, স্পন্দনগত ও স্পন্দনজন্য সমঞ্জসতা (Harmony) অথবা অসমঞ্জসতা (Discord) উক্ত নিয়মগুলির শাসন মানিয়া চলে। জপের জ্ঞানরূপ এবং ভাবরূপ—এ দুয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং এ দুয়ের "আধার" এবং "উদ্‌বোধক" কর্ম বা ক্রিয়ারূপ থাকে, এবং সে ক্রিয়াটি স্পন্দনাত্মক। জপের ভাব এবং জ্ঞানরূপে "ক্রিয়ার" স্পন্দনরূপটি অস্তমিত বা বিলীনপ্রায় মনে হয়; কিন্তু "স্পন্দ" রূপটি, সুতরাং জপকর্ম থাকে। একান্ত নৈঃস্পন্দ্যে জপকর্মেরই লয়। সেটি জপাতীত বা "অজপ" (অজপা নহে) অবস্থা।

এখন দেখ জপক্রিয়াটি হয় কিরূপে। প্রাণভূমি থেকে প্রাণের ঋতচ্ছন্দে উত্থিত হইয়া জপ স্থূলে দেখা দিলে, তার স্পন্দনকে পূর্বোক্ত অনুরূপতা-বিরূপতার নিয়মে পড়িতেই হয়। অবশ্য, "সূক্ষ্মে"ও অনুরূপতা-বিরূপতার নিয়ম আছে। তবে, তাহা সাধারণ হিসাব ও পরীক্ষার বাহিরে। স্থূলের Law সূক্ষ্মের সঙ্কোচরূপ (ব্যাপ্তি এবং বীর্য দুদিক থেকেই)। অর্থাৎ, সূক্ষ্মে যেটি ঋত তার ব্যাপ্তি (field) ও বড়, এবং তার বীর্য, কিনা "শক্তিমান" ও অধিক। স্থূলের হিসাব (calculation)

অপেক্ষাকৃত "সঙ্কীর্ণ কাঠামো" (restricted data) লইয়া চলে বলিয়া, তাকে সরাসরি সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে চালান যায় না। তথাপি ইহা বলা চলিবে যে—জপকারীর যন্ত্র (অন্নময়াদি) হয়—(১) একান্ত অনুরূপ আছে (অর্থাৎ পূর্ণ শ্রদ্ধায় "বাঁধা"); নয় তো (২) একান্ত বিরূপ (একেবারে শ্রদ্ধাহীন); অথবা (৩) আংশিকভাবে অনুরূপ (শ্রদ্ধার ছয়টি কল্পের পূর্ব পূর্ব কল্পগুলিতে ক্রিয়াশীল)। প্রথম স্থলে resonance effect পুরা হইবে, ফলে জপক্রিয়ায় "সমূহ" সাধিত হইবে। দ্বিতীয়তে, interference effect গুলো অতিমাত্রায় প্রবল হইবে, ফলে "স্তব্ধব্যূহ" অথবা "ব্যামোহ" ঘটিবার সম্ভাবনাই অত্যধিক। জপের দ্বারা system এবং environment-এ যে সমস্ত প্রতিস্পন্দন (reaction) সৃষ্টি হইবে, তারা (overpoweringly unharmonious and unhelpful. অত্যন্ত বিষম ও বিরুদ্ধ হইতে পারে। এই বিষমতা নিবন্ধন স্তব্ধব্যূহ (মূঢ়রূপ—inert staticity) এবং ব্যামোহ (ঘোররূপ—dissipating excitability) দেখা দেয়। তৃতীয় হইতেছে জপসাধনের সাধারণ অনুকূল অবস্থা। আংশিক অনুরূপতাকে আশ্রয় করিয়া জপক্রিয়া একটা wedge বা শলাকার মত সাধনযন্ত্রে ও শক্তিক্ষেত্রে (functional field) প্রবিষ্ট হইবে। ক্রমে ক্রমে সমগ্র যন্ত্রটির সূক্ষ্ম অবয়বগুলির বিন্যাস এবং ক্রিয়ার ছন্দটি সে অনুরূপভাবে বদলাইয়া লইবে। জড় ও প্রাণরাজ্যের মৌলিক পরিবর্তনগুলো এইভাবেই সাধিত হয়। Atomic Number, Molecular Distribution, Chromosomes & Gene-এর পরিবর্তন বাহ্য কারণবশতঃ ঘটিলে—এই ভাবেই ঘটিয়া থাকে—আন্তরকারণবশতঃ ঘটিলেও পরিবর্তনের রীতি এবং রূপটি পূর্বোক্তরূপই হইয়া থাকে। যন্ত্র যেমন অনুপাতে অনুরূপ হইতে থাকে, সেই অনুপাতে তাতে অনুরণন সমুদয় বা resonacne effect বেশী হইতে থাকে। কেবল জপ বলিয়া কেন, সকল অভ্যাসেই যন্ত্রের একটা "molecular aptness," সুতরাং functional readiness, একটা উপাদানগত যোগ্যতা, সুতরাং মৌলিক উন্মুখতা সৃষ্টি হইতে থাকে। অর্থাৎ যন্ত্রটি বাজাইতে বাজাইতে তার মধ্যে একটা স্বাভাবিক সুরপ্রবণতা সৃষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং তখন অঙ্গুলিস্পর্শমাত্র তাহা সুরে ও তালেই বাজিয়া উঠিতে অভ্যস্ত হয়, বেসুরা বা বেতালা হইতে চায় না। সেইরূপ সমর্থ জপে অন্নময় কোষের এবং উত্তরোত্তর আর আর কোষেরও বিরূপতা দূর

হইয়া অনুরূপতার সৃষ্টি হয়। স্থূল দেহে অনুলোম ও অনুকূল পোষণ, Hormone Secretions, সূক্ষ্মে কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং "চক্র"গুলির উন্মেষ, কারণে "আণবমল" শুদ্ধি—সবই ঐ ক্রিয়ার ফল।

কিন্তু জপের অভ্যারোহ বা লক্ষ্যাভিমুখে আরোহণ সর্বত্র অনায়াসে ঘটে না। এর কারণ চার রকম বাধা এসে বিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করতে চায়। এই বাধার জন্যই চরিতার্থতা সহজে হয় না। বাধাগুলিঃ (১) কাল (= উপস্থিতি) নিমিত্ত = প্রতিরোধ; (২) দেশ (= পরিস্থিতি) নিমিত্ত = অবরোধ; (৩) বস্তু (= অবস্থিতি বা অবস্থান) নিমিত্ত = নিরোধ; (৪) ছন্দঃ (= সংস্থিতি বা সংস্থান) নিমিত্ত = বিরোধ। [বৈদিক উপাখ্যান যথাক্রমে অহি, পণিঃ, বৃত্র ও অসুর (= অ-সুর = বেসুর)। ১ম+২য় = Resistance due to Space-time interval; ৩য় = due to Ingress or Intrusion; ৪র্থ = due to Interference.]

বাহ্য অথবা আন্তর যে কোন apparatus লইয়া কোনও সাধন করিতে গেলে সাধন সমর্থ এবং সফল হবার পক্ষে ওই চারিপ্রকারের প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় পাইতে হয় অথবা করিয়া লইতে হয়। ধর, দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশে কোন জ্যোতিশ্চক্র দেখিবে। তজ্জন্য—(১) রাত্রিকাল এবং সম্ভবত এক নির্দিষ্ট সময়ও চাই; (২) Objective conditions suitable হওয়া চাই, যথা, আকাশ মেঘমুক্ত ইত্যাদি; (৩) যন্ত্রটি in a fit condition-এ থাকা চাই; এবং (৪) যন্ত্রটিকে ঠিক correct orientation-এ adjust করা চাই। এ সকলগুলি সমাহার না হইলে প্রবৃত্তি সফল হইবে না। মনের ব্যাপারেও এইরূপ। এক্ষেত্রে—(১) Time factor হইতেছে অনুকূল বাসনা বা সংস্কারের উদয়, প্রতিকূলের বিরোধ বা ক্ষয়। এর নাম শুভবাসনা। Space factor—কেবল শুভবাসনা হইলেই হইল না। বাহিরের পরিস্থিতিটাও অনুকূল থাকা চাই। একে বলে শুভযোগ। ধর, জপ করিতে বসিতেছ, কিন্তু বাহিরে (নিজের এই স্থূলদেহটাও বাহিরের সামিল) বড় ঝামেলা। তাহা হইলে জপে বিঘ্ন ঘটিবে। (৩) Instrument factor—ধর, শুভবাসনা, শুভযোগ এসেছে কিন্তু চিত্ত যদি (ক) ধৃতিগৃহীত, অথবা (খ) রতিগৃহীত হইয়া (অর্থাৎ ধৈর্যবীর্যসমন্বিত হইয়া, এক কথায়, মতিগৃহীত হইয়া) কাজ না করিতে অভ্যস্ত থাকে তো সমর্থ ও সফল সাধন হইল না। (৪) Accordance factor—ধর, শুভবাসনা, শুভযোগ এবং

শুভাগ্রহ (ওই তৃতীয় অনুকূলতাটির নাম)—তিনই আছে; কিন্তু অভীষ্ট বস্তুর সঙ্গো যেভাবে "সন্ধি" (correspondence বা accordance) করিতে হইবে, সেভাবে হইতেছে না। তাহা হইলেও সফল হইবে না। ইষ্টের সঙ্গো শুভসন্ধিও চাই। এই শুভসন্ধিকে বলে শ্রদ্ধা। এই শুভসন্ধিটি একবারেই ঘটে না; ইহার পর পর কতকগুলি ভূমি বা কল্প আছে। শুভবাসনা ও শুভযোগের আধারে শুভাগ্রহ, শুভসন্ধি বা শ্রদ্ধার (adjusted, attuned অবস্থায়) আসিলে জপাদি সাধন "সমর্থ" হয়। ভগবানের অনুগ্রহশক্তি সূর্যরশ্মির মত সতত সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত বটে। কিন্তু সাধারণতঃ ও-সম্বন্ধে জীবের যন্ত্র ("খানি") "পরাঞ্চি" (scattering, dissipating) বলিয়া, সে রশ্মিসমূহ divergent, "বিক্ষিপ্ত" সুতরাং কার্যতঃ অনভিব্যক্ত থাকিয়া যায়। জীবের ভিতরে আগ্রহ জাগিলে যন্ত্র একটা concave mirror-এর মত, "প্রত্যঞ্চি"—সেগুলি convergent (সংহত ও কেন্দ্রগ) করিতে সমর্থ হয়। Convergent হইতে হইতে একটা কেন্দ্রে (focus-এ) ঘনীভূত হইলে, তাহা হইল গুরুশক্তি। তখন সেই কেন্দ্রের সঙ্গো "শ্রদ্ধা" সহকারে আপন শুভসন্ধি (right accordance) স্থাপন করিতে পারিলে—কাজের ঠিক রাস্তা ধরা হইল।

শুভ-বাসনা, শুভযোগ, শুভাগ্রহ, শুভসন্ধি—এই ক্রমে কাল, দেশ, বস্তু এবং ছন্দোগত বাধা দূর হইয়া থাকে। সাধনের পূর্বভূমিতে এ সকল বাধা পরাভূত হইলেও, মধ্য এবং উত্তরভূমিতে আবার নূতন আকারে দেখা দিয়া থাকে। মধ্য আর উত্তরভূমি কি এবং তাতে বাধাগুলি কি আকারের, আর তাদের পরাভবই বা কি ভাবের—ইহা ধীরভাবে চিন্তনীয়। যোগ, ভক্তি এবং জ্ঞান—ত্রিবিধ সাধনেই এদের আকার প্রকার চিন্তনীয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিনটি মাহাত্ম্য সাধনের পূর্ব, মধ্য এবং উত্তরভূমিরূপেও বিবেচ্য। মুখ্যতঃ—উক্ত ভূমিত্রয় চেতনার "অব", "সম", এবং "অতি" (sub, normal, or liminal, super) তিনটি স্তর বা "তল"। প্রথম তলে, "যোগনিদ্রা" হইতে উত্থিত বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইল পরাভবশক্তি (আত্মকৃপা)। দ্বিতীয় তলে, অভিব্যক্ত নিখিল দৈবী সম্পৎ সংগ্রহ হইয়া পরাভব শক্তি (গুরুকৃপা, দৈবী সম্পৎ = বহির্বিশ্বে Cosmic Rays যেমন, তেমনি অন্তর্বহিঃ সর্বত্র সতত সমন্তাৎ বিক্ষিপ্ত অনুগ্রহশক্তি; সে সকলের সংগ্রহ = কেন্দ্রীভাব, focussing = গুরুশক্তি)। সাধকের আগ্রহ শক্তি বা "আত্মকৃপা" দ্বারা বিপুল, বিশ্বজনীন দৈবীসম্পৎটিকে

"canalize" বা "ধারা" রূপ করিতে হয়। ইহাই শ্রুতির ভাষায়—"দুহানা অমৃতস্য ধারাম্।" ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া মৃত্যুরূপ তমসা থেকে উত্তরণের নিমিত্ত দেবতারা গায়ত্রীচ্ছন্দকেই বরণ করেন। তৃতীয়তলে, অর্থাৎ চেতনার ঊর্দ্ধতন স্তরগুলিতে বহুধা ক্রিয়মাণা দৈবীসম্পৎ (জ্ঞানৈশ্বর্য ইত্যাদি) যে একেতেই—অদ্বৈতেই—অধিষ্ঠিত ও পরিসমাপ্ত—এইটি দেখাইয়া (যথা, শুম্ভবধে দেবীর উক্তি—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা") তবে পরাভব। এইটি বিশেষভাবে ভগবৎ কৃপা। এটি ব্যতীত শেষ গ্রন্থি কিছুতে অপগত হবার নয়। আগে আগ্রহ = শুভবাসনা + শ্রদ্ধা + বীর্য (= আত্মকৃপা) সৃষ্টি; তারপর প্রত্যকপ্রবণ উজ্জ্বলধারার (সঙ্কর ছন্দের অবসানে শঙ্কর ছন্দের) পালন ও পোষণ (= গুরুকৃপা); শেষকালে, আত্মনিগ্রহ বীজটার লয়—অর্থাৎ যে বীজটা জীবকে বিশ্ববাধা যন্ত্রে পাতিত করে, তাকে কখনও সঙ্কুচিত কখনও প্রসারিত করে "নিগ্রহ" (নিতরাং গ্রহঃ) করছে সেটার লয় হয়। ইহা ভগবৎ কৃপা। এক কৃপারই তিন প্রকাশ। যেমন, এক চক্রের নাভি, অর (সেতু বা সন্ধি) এবং নেমি (পরিধি); অথবা, অব্যয়নিধান (আকর), বীজ এবং ক্ষেত্র বা স্থান।

বাধাগুলিকে চারভাবে "প্রতিষেধ" করিতে হয়। যথাঃ—

(১) বাধার সঙ্গে **সমতলে** বা **সমসূত্রে** (same direction-এ) থাকিয়া তুল্যবল প্রতিপক্ষ দ্বারা (by equal and opposite force)—এটি অভ্যাস যোগ।

(২) বাধার সঙ্গে **সমতলে** আছি কিন্তু সমসূত্রে নেই (changed direction)। বাধার blow ঢাল পাতিয়া লইতেছি না; নিজের "অবস্থিতিটা"ই (angle of reaction) অন্য মুখ করিয়া লইতেছি। এটি বৈরাগ্য যোগ।

(৩) **নিজের** "তল"ই বদলাইয়া লইতেছি—অনাসক্ত যোগ।

(৪) বাধার বাণ যে মূল ধনু থেকে বাহির হইতেছে, তার ছিলা (জ্যা) কাটিয়া দিতেছি। যে মূল অজ্ঞানের অথবা স্বরূপ-সম্বন্ধ-পরিচয়াভাবের আধারে এ সমস্তই অধ্যস্ত, সেই **আধারটাই** রহিল না। এটিকে বলিতে পার—অস্পর্শযোগ। বৌদ্ধ সাধনে যেটি "নবম" ধ্যান (সংজ্ঞা ও বেদনা দুয়েরি অভাব যেখানে) এবং মাণ্ডূক্যকারিকার অস্পর্শযোগ এস্থলে বিবেচ্য। এখানে কেবল যে $X+Y+Z=O$ এমন নয়; $X=O, Y=O, Z=O$. প্রথম equation-টিতে 'ফল' নিত্য হয় না; কেননা, X, Y, Z কেহই individually vanish করে নাই; সুতরাং তাদের আবার

পারস্পরিক অনুপাতের ব্যতিক্রমের ভয় আছে। কিন্তু সত্যকার অস্পর্শযোগ অভয়, যদিও, বলা হয়, যোগীরা সচরাচর এতে ভয় পান। উক্ত চার প্রকার যোগে মুখ্যতঃ বাধাকে সরাইবার বা এড়াইবার প্রয়াসটি স্পষ্ট। কিন্তু "এ সমস্ত আত্মাই অথবা ব্রহ্মই"; সুতরাং যেটি "বিষ" সেটিও আসলে অমৃত, যেটি "ভয়" সেটিও অভয়—এইভাবে তাদাত্ম্য এবং সামরস্য উপলব্ধিতে পূর্বোক্ত আহুতি চতুষ্টয়ের সমাপনরূপ "পূর্ণাহুতি"টি শেষ করিতে হয়। এটি সমাপত্তি বা সামরস্য যোগ। ইহা ব্যতীত সর্বাবস্থায় সর্বদা নিত্যোদিত আনন্দ নাই। ভক্তি-সাধনের দিক দিয়েও এ সব অনুরূপভাবে আলোচ্য। সে ক্ষেত্রে সম্বন্ধের দিক থেকে, (১) তদারোপিত সম্বন্ধ, (২) তৎপ্রপন্ন সম্বন্ধ; (৩) তদেকাশ্রিত সম্বন্ধ; এবং (৪) তদ্‌ভাবভাবিত সম্বন্ধ—এইগুলি সিদ্ধ হয় পর পর উক্ত চারি বাধা অপগমে। অষ্টাঙ্গযোগে দেশগত বাধা জয়ে ধারণা; কালগত বাধা জয়ে ধ্যান; ছন্দঃ এবং বস্তুগত বাধা জয়ে দুই প্রকারের সমাধি। চতুর্বিধ বাধার দিক থেকে সবিকল্পের অন্তর্গত সবিচারাদি চারিটি ভূমিও বিচার্য। সানন্দ সমাধিতে বিশেষভাবে ছন্দোনিমিত্ত এবং সাস্মিতে বস্তুনিমিত্ত বাধার "সাপেক্ষ" (conditional) অপগম হইয়া থাকে। সাপেক্ষ-নিরপেক্ষাদির বিচার মূলগ্রন্থে মিলিবে।

প্রাচীনকালে কোন ক্রিয়ার সাথে সাথে তার বিদ্যাও উপদিষ্ট হইত। শ্রুতিতে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ। ইহার রহস্য হইতেছে এই যে উপাসনা মূলতঃ জ্ঞান ও ক্রিয়ার মিলিতরূপ বা যুগ্মরূপ। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ক্রিয়ার নিবিড় সম্মিলন ও পরিণয় ব্যতীত জপাদি সাধন "সমর্থ" হয় না। এখানে ক্রিয়াহীন জ্ঞান পঙ্গু এবং জ্ঞানহীন ক্রিয়া অন্ধ। প্রথমের ফলে হয় শুধু অবাস্তব কল্পলোকে বিচরণ, দ্বিতীয়ে শুধু যান্ত্রিকতার "ঘাণিপাকে" আবর্তন ("শ্রম এব হি কেবলম্")। এই বিচ্ছিন্ন দুই পথেই তাই সিদ্ধির "আলো" ফোটে না, "রস" উৎসারিত হয় না। প্রজ্ঞালোক থাকে একেবারেই অন্তর্হিত, কারণ প্রাণ বা প্রজ্ঞার তনুটি এই দুইয়েরই "মিথুনে" সমুৎপন্ন হয়। এই বিচ্ছেদের ফল সম্বন্ধে শ্রুতি সাবধান ও সতর্ক করেছেন বারবার—ঐ "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" বলে। তবে প্রথমকে অর্থাৎ কেবল জ্ঞানীকে আরো বেশী সাবধান করেছেন, কারণ তার সামনে "ভূয়ঃ তমঃ"। দ্বিতীয়ে অর্থাৎ শুধু ক্রিয়াতে তবু কিছু সচেষ্টতা আছে, তাই ক্রিয়ার সংঘর্ষে, এই "পবমানতা"য়

তবু কিছুটা অন্ধকার পাতলা হয়, আর ওখানে বিনিয়োগের (application-এর) একান্ত অভাবে, শুধু অপরিসীম নিশ্চেষ্টতা, তাই অন্ধকারও অন্তহীন। সেই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বিচার ও আচারের সম্মিলনের উপর ("উভয়ং সহ") এত জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু এই "সাহিত্য" বা সম্মিলনের দ্বারাই "মৃত্যুং তীর্ত্বা... অমৃতমশ্নুতে"। নতুবা মৃত্যুর অন্ধকারেই আবর্তন।

আমরা এতক্ষণ জপকর্মের আধাররূপে যে জপ "বিদ্যা" বা "বিজ্ঞান" প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। অর্থাৎ জপকর্মের মূলে (background-এ) যে মহাবিজ্ঞান বর্তমান, তাকে উদ্ঘাটন করার প্রয়াস করিয়াছি। জপ, ধ্যান, কীর্তন ইত্যাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত তত্ত্বসম্বন্ধী (Theory) আধার আবশ্যক বটে, কিন্তু বেশী আবশ্যক একটা practical background অথবা "frame" (নিরূপিত ক্ষেত্র)—সে সম্বন্ধে এখন সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) জপসিদ্ধির এবং জপক্রিয়ার মূলই হইল শ্রীগুরুশক্তি। ভগবান তাঁর সৃষ্টিতে "অনুপ্রবিষ্ট" হয়েছেন মুখ্যতঃ পাঁচটি ধারায়। এই গ্রন্থে তাদের "পঞ্চগঙ্গা" সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এদের নাম (তাৎপর্য মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য) সংগ্রহাখ্যা, প্রতিগ্রহাখ্যা, বিগ্রহাখ্যা, পরিগ্রহাখ্যা এবং অনুগ্রহাখ্যা। এই চরম ও পরম ধারাটিই গুরুশক্তি। উপোদ্ঘাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে—শ্রীগুরু শ্রীভগবানের মূল পঞ্চাবতার এবং প্রণবের পঞ্চতত্ত্বের একাধারে সম্মিলিত মূর্তি ইত্যাদি। এই গুরুশক্তিই শলাকার মত প্রবিষ্ট হয়ে এই অশুদ্ধ, মলিন, আবিল "কোষ"গুলোকে ক্রমশঃ শুদ্ধ, স্বচ্ছ, ভাস্বর করে তোলেন—এ কথা পূর্বে বলেছি। সেইজন্য এই গুরুশক্তিকে সর্বভাবে আশ্রয় করাই সাধকের সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য। এখানে একটি জিনিষ বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে; জপারম্ভে হৃদয়ে, ললাটে অথবা "শিরসি" শ্রীভগবানের শাশ্বতী ও সর্বগা অনুগ্রহশক্তির মূর্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুর ধ্যান। এর ফলে আমরা কারবারী, "কাঠামো"টা ছেড়ে একটা নব কলেবর যেন লাভ করি। এরই নাম শ্রীগুরুদেবের কৃপালব্ধ অভিনব সাধনদেহে "ভূমিষ্ঠ" হওয়া। এর জন্য প্রয়োজন এই ব্যবহারিক ভোগদেহের thought elimination বা বোধ দূরীকরণ এবং উক্ত সমর্থ গুরুকৃপাজন্য, শুদ্ধ সাধনদেহলাভের auto-suggestion. ইহা দ্বারা apparatusটি, যন্ত্রটি "in tune" (শ্রদ্দধান) হইয়া থাকে। যন্ত্রটি, এইরূপ

সুরে বাঁধা হইলে পূর্বোক্ত 'resonance effect'গুলি বা অনুরণনগুলি হবার বিশেষ সুবিধা হয়। গুরুশক্তিরূপে শঙ্করধারায় যে "মূলস্পন্দ", তার সঙ্গে বৈরূপ্যই হইল মল, অশুদ্ধি দোষ, কার্পণ্য, "অপরাধ" (পরা নয়, কিন্তু অপরাতে যে "ধূনন" বা স্পন্দন তাই হইল অপরাধ)। এই বৈরূপ্যবশতঃই সঙ্কর ধারা। ইহা হইতে শঙ্কর ধারায় ফিরিবার উপায় "মূল" এর সঙ্গে অনুরূপতা সাধন। গুণী সুরশিল্পীর সঙ্গে সুরসাধককে যেমনটি করিতে হয়—"গুরু কা সাথ ধ্বনি ফুকারো"। আদৌ "অনুরূপ", পরে ক্রমে ক্রমে "প্রতিরূপ", "একরূপ" এবং "সমরূপ" বা সরূপ—এইভাবে পাদ-মাত্রায়, কলায়-কাষ্ঠায় পরমে পৌঁছিতে হয়।

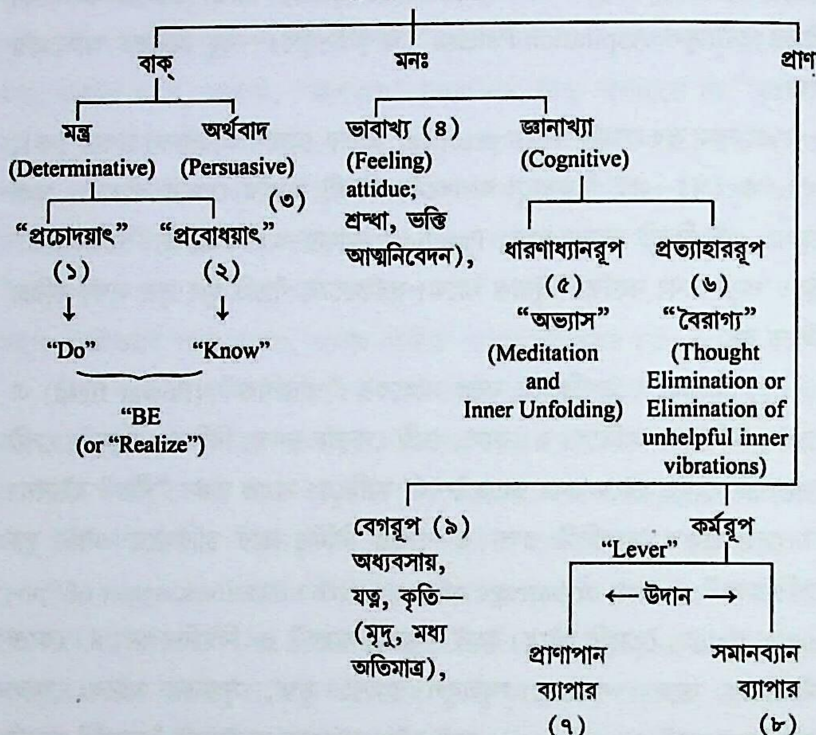
(খ) পূর্বোক্ত সাধন-দেহলাভের আর একটি প্রক্রিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যাদিতে দেখা যায়। সেটিও বিশেষ সহায়ক হয়—যথা, বীজজপ দ্বারা প্রাণায়ামপূর্বক এই পাপ্মাবিদ্ধ দেহটাকে ভস্মীভূত করা হয়; অমৃতময় নব কলেবর ধারণের suggestion দিতে হয়। ইহাই সাধারণতঃ "ভূতশুদ্ধি" নামে পরিচিত। গোড়ায় এটি "অভ্যারোপ" (pointed suggestion) মাত্র বটে, কিন্তু অভ্যাসের দৃঢ়তায় এবং ভাবের গাঢ়তায় ইহা হয় "অভ্যারোহ" (An acutal Ascent towards the Supreme Object)। জপসূত্রে দেখান হইয়াছে যে এই অভ্যারোহ কর্মটি কৃচ্ছ্রোদয়, অভ্যুদয়, মহোদয়—এইরূপে সোপানে সোপানে পরমের পানে অগ্রসর হয়। পরমে উপনীত হইলে আর "উদয়" নয়—নিত্যোদিত। সে যাই হৌক, এখানে মনে রাখা কর্তব্য যে "দহন" ক্রিয়াটির আগে "শোষণ" ক্রিয়াটি অবশ্য হওয়া প্রয়োজন। নতুবা আর্দ্র ইন্ধনে অগ্নিসংযোগ করিয়া কোনো ফল লাভ হইবে না, কেবল ধূমেই আকুল হইতে হইবে। পাতঞ্জল দর্শনেও তাই প্রথমে "ক্লেশ" গুলোকে "তনূকরণ" করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পরে হয় "সমাধিভাবন"।

(গ) অনেক সময় কোনো বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাময় প্রতীক বা প্রতিকৃতি ভাবের উদ্বোধনে সহায়ক হয়। যেমন ধর কোনো Symbol Picture:—সপ্ত-বর্ণালী-চক্র-বেষ্টিত এক মহান কেন্দ্রজ্যোতিঃ। নিম্নে এক শতদল প্রস্ফুটিত হইতেছে; তন্মধ্য হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া উক্ত সপ্তচক্র ভেদ করিয়া অন্তর্জ্যোতিতে মিলিতে চাহিতেছে। প্রতীকের রহস্য স্পষ্ট—the flame of the Soul's Aspiration leaping up to—. জপাদিকালে আপন কারবারি সত্তা ভুলিয়া এইটি ধারণা করা

আবশ্যক। অগ্নের আকুতি ও সন্ধানের সমাপ্তি ভূমায়। পার্বত্য তটিনীর নদীনাথে। জীবের এটি মূল Aspiration Pattern (আকুতি-রূপ)—বহু অনিয়ত আসঙ্গের মধ্যে।

এইরকম সব জপাদি কর্মের practical আধার মেলান আবশ্যক। উপরে (ক), (খ), ও (গ)—এই তিনভাবে জপকর্মের তিনটি আধার দেখান হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ওই তিনটি নমুনা মাত্র। Practical আধার অনেকভাবেই "পরিকল্পিত" হইতে পারে এবং কার্যতঃ হইয়াও থাকে। সর্বক্ষেত্রেই পাঁচটি মূল সূত্র লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়:—

১। মিত্রচ্ছন্দে জপক্রিয়ার ফলে সাধকের "শক্তিপিণ্ড" (Power field) এ গাঢ়তা, নিবিড়তা আসিবে। ২। ফলে, যেটি গোড়ায় চপল, বিক্ষিপ্ত, বহুমুখ, সেটি এককেন্দ্রে সংহত হইবে এবং তাতে স্থৈর্য্য আসিবে। সাধক তখন "ধীর" হইবেন। ৩। সেই প্রস্তুত সংহতিটি রক্ষা ও পুষ্টির নিমিত্ত তার চারিধারে একটা দৃঢ় "শক্তিকবচ" (a belt or barrage of protective vibrations, a sort of "potential field") তৈয়ারি হইবে। ইহাই "ভূতাপসারণ" ও দিগাদিবন্ধন। ৪। কেন্দ্রে ঘনীভাবের ফলে স্পন্দনের স্থূলরূপ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর হইবে; ফলে "অতিগস্পন্দন" (super-sonic) সৃষ্ট হইয়া সাধকের যন্ত্রটাকেই "সমর্থ" রূপের অনুরূপ করিয়া লইবে। এইবার সাধক "বীর"। অতিগস্পন্দনগুলিই, বিশেষভাবে, অরি অথবা উদাসীনকে মিত্র করিবার পক্ষে ক্ষম। Transformation এবং Sublimation ব্যাপারটি এই অতিসূক্ষ্ম পর্যায়ের স্পন্দন এবং স্পন্দের দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। জড়ের ক্ষেত্রেও তাই দেখি। ৫। সুতরাং, এর ফলে, স্থূল, বৈখরী জপ "মধ্যমার সেতু" অতিক্রম করিয়া পশ্যন্তী ও পরায় জ্যোতিঃ এবং আনন্দে পৌঁছিবে। প্রাণ, মন, বিজ্ঞান এবং আনন্দের শুদ্ধ (positive phase) ভাবগুলি গ্রথিত করিয়া এই মহোদয়টি ঘটিয়া থাকে। জপ ধ্যানাদি কর্ম তার উপযোগী আধার (বিদ্যা বা বিজ্ঞান ছাড়া practical আধারের কথা বলিতেছি) না পাইলে "সমর্থ" হয় না। এখন, এবম্বিধ আধারের একটা সুসম্বন্ধ পরিচয় নীচের নক্সায় পাওয়া যাইবে মনে হয়:—



[দ্রষ্টব্য:—পূর্বে যে তিনটি নমুনা দেওয়া হইয়াছে, তার ভিতর (ক) ও (গ) মুখ্যতঃ (৪), (৫), (৬) এর পর্বে পড়ে; (খ) পড়ে মুখ্যতঃ (৭), (৮) এবং (৫), (৬) এ।]

জপের আধার "নির্মাণে" এই "জপকরণসম্পাত"টি মনে রাখিয়াই করিতে হয়। শাস্ত্র, আচার্য এবং গুরুবর্গ তাহাই ভাবিয়া উপদেশ দিয়াছেন। ইষ্টমন্ত্র জপারম্ভে বাক্, মনঃ এবং প্রাণ—এই ত্রিবিধ করণের পূর্বোক্ত সম্পাত ("collaboration") সম্বন্ধী একটা "উপযোগ" (appropriate field) তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। যেমন, বৈদিক সন্ধ্যায় মুখ্যকর্ম গায়ত্রীজপ; আচমন, আপোমার্জন, প্রাণায়ামাদি পূর্ব পূর্ব ক্রিয়া দ্বারা তার উপযোগ তৈয়ারী হয়। সংক্ষেপতঃ শুদ্ধি, ঋদ্ধি ও বুদ্ধি—এই তিনের সম্মিলনে উপযোগটি তৈয়ারী হয়। যথাক্রমে মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতীর "অনুগ্রহ"। বিদ্যা দ্বারা শুদ্ধি, শ্রদ্ধা দ্বারা ঋদ্ধি এবং "উপনিষৎ" বা রহস্যজ্ঞান

দ্বারা বুদ্ধিকে লাভ করিতে হয়। "বিদ্যা" বলিতে কেবল theoretical দিকটা বুঝিলে চলিবে না; practical দিকটাই বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। সুতরাং পাইতেছি—right (and enlightened) procedure, right attitude or disposition, and right understanding and intuition.

উপরের অঙ্কিত আধারের (১) এবং (২) এর দৃষ্টান্ত যথাক্রমে:—

(১) "আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি..." ইত্যাদি উপনিষদের শান্তিপাঠ; "অসতো মা সদ্গময়..." ইত্যাদি উপনিষদের মন্ত্র।

(২) "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং..." ইত্যাদি শ্রুতি-মন্ত্র। "আবিরাবীর্ম এধি..." ইত্যাদি।

(৩) স্তবস্তুতি বন্দনাদি।

(৪) Right Feeling-attitudeটি বজায় থাকা আবশ্যক। যেহেতু, feeling হইতেছে এই apparatus-এর "tuning" factor. ভাবের দ্বারা বিশেষভাবে ছন্দোনিমিত্ত বাধা দূর হয়। ভাবের দ্বারাই "ছন্দোগ" হয়।

(৫) (৬) অভ্যাস ও বৈরাগ্য (যথোক্ত অর্থে) আবশ্যক। যেহেতু, তদ্দ্বারা বিশেষভাবে "যন্ত্রের" দেশ-কাল-বস্তুনিমিত্ত বাধা দূর হবার সহায়তা হয়।

(৭) এবং (৮)—প্রাণের দুটি মুখ্য ব্যাপার। উদান-বৃত্তির দ্বারা lever-এর মত দুইয়ের সহায়তা করিতে হয়। (প্রাণায়াম, ন্যাসাদি, ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি এর অন্তর্গত)।

(৮)—প্রাণ as Driving force—জপাদিকর্মে এই বেগাখ্যশক্তিটি মৃদু, মধ্য হইলে সমর্থ আধারের উপযোগ ঘটিতে বিলম্ব হয়। Auto-suggestion, এই সমগ্র করণসম্পাতের সঙ্ঘাতফলে হইলে মহাবীর্য হয়। সঙ্কল্পশক্তির সমৃদ্ধি ঘটিলে কুণ্ডলিনীর জাগৃতি হয়, এবং জাগৃতি একটা ভূমিতে পৌঁছিলে মহাকুণ্ডলিনীর সত্য ও অমোঘ সঙ্কল্পশক্তির ধারায় অবগাহন করে। তখন প্রাণ আর ব্যক্তি বা invididual ভাবে নয়, অখণ্ড সমগ্র ভাবে—"প্রাণব্রহ্ম"রূপে ক্রিয়াশীল হয়। সৃষ্টির অবসানে বা লয়ে মহাকুণ্ডলিনীর "নিদ্রা" (যোগনিদ্রা) কল্পিত হয় বটে, কিন্তু যেহেতু এটি শক্তিরূপিণী, সুতরাং স্বরূপে ইহার নিত্যোদিত বা অব্যয় ভাবটি আছেই; সুতরাং "মূলস্পন্দ" ও (Basic Harmony Structure and Function) আছে; সাধককে জপাদিসাধন দ্বারা আপন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করিয়া উক্ত মূলস্পন্দের সঙ্গে আদৌ

অনুরূপতা এবং পরিণামে সমরূপতা ঘটাইতে হয়। ক্রিয়াদ্বারা স্পন্দনটি বর্ত্মগ বা অধ্বগ, ভাবদ্বারা ছন্দোগ, এবং জ্ঞানদ্বারা ধামগ হইয়া থাকে। এ তিনকে যথাক্রমে নামগ, কামগ ও ধামগও বলিতে পারি।

সঙ্ঘাতফলের কথায় আর একটি প্রসঙ্গ মনে জাগিতেছে—জপধ্যানাদির "একান্ত" ফল আর "সঙ্ঘ" ফল (Congregational)। একান্তসাধনাই সাধারণতঃ প্রশস্ত বটে, তবু দেশ (যথা, তীর্থাদি), কাল (যথা, যোগাদি), পাত্র বা বস্তু (যথা, দেবতাবিগ্রহ, গুরু অথবা অপর মহাপুরুষ-সান্নিধ্য) এবং ছন্দঃ (যথা, ভাবের, বুদ্ধির ও কর্মের সমতানতা)—এই চারের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সঙ্ঘকর্ম বিশেষভাবে ফলপ্রদ। তাতে Resonance Effect multiplied হবার সুযোগ পায়। Minor ছাড়া major discordance factors অধিক থাকিলে resonance-এর বদলে interference effect গুলিই বেশী হইতে পারে। মূল কথা—Total effectটি "বিষম" না হইয়া "সুষম" হওয়া প্রয়োজন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কীর্তনরসেও বাধা হইয়াছিল বহির্ভাগে কোনো বহিরঙ্গ ব্যক্তি ছিল বলিয়া। Symphony বা Synthesis of the elements of Harmonyর জন্য এত mathematically precise conditions আবশ্যক হয়।

* * *

(৫)

এখন জপ সম্বন্ধে practical problem—জপ "সমর্থ" হইবে কি প্রকারে? অর্থাৎ জপ কি প্রকারে পূর্বালোচিত আধারের অন্নময়, প্রাণময়াদির শুদ্ধ (পূরক, +) ভাগগুলিকে অশুদ্ধ, মলিন (হরক,—) ভাগগুলির "আক্ষেপাদি" হইতে মুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে সংযুক্ত, সক্রিয়, একতান করিয়া দিবে? অথবা, এক কথায় কি করিয়া অধোমুখ, তির্যক, রজস্তমোবিশাল, সঙ্কর স্রোতটাকে ঊর্দ্ধমুখ, সত্ত্ববিশাল, ঋজু শঙ্করধারায় পরিণত করিবে? অর্থাৎ মূল প্রশ্ন এই—কে বা কিসে বুদ্ধিকে ভাবরূপ ও বোধ (অথবা জ্ঞান) রূপে কুণ্ঠা-কার্পণ্য-দোষমুক্ত, শুদ্ধ, সুতরাং "যুক্ত" করিবে?

উত্তর—শ্রীভগবানের অনুগ্রহশক্তি, জীবের পূর্বালোচিত শুভ বাসনা, শুভযোগ,

শুভাগ্রহ ও শুভসন্ধি—এই চারিটির দ্বারা আকৃষ্ট ও কেন্দ্রীভূত (সুতরাং ঘনীভূত, মূর্ত) হইয়া গুরুশক্তিরূপে প্রকট হন। তিনি জীবের "প্রথম পুরুষ"টিকে (Surface consciousness-কে) অবলম্বন করিয়া তার ক্রিয়াকারকফলাত্মক অথবা পঞ্চকোষাত্মক সঙ্ঘাত (apparatus) এ প্রবিষ্ট হন। প্রথম পুরুষটির শ্রদ্ধার পোষণ করিয়া তাকে "শ্রদ্ধাবীর্য্য" করেন। "মধ্যমপুরুষ"টি (Sub-conscious এর অধিবাসী) কে মিত্রচ্ছন্দে আপূরণ করার জন্য প্রস্তুত করিয়া লন। "উত্তমপুরুষ"টি (Super এর অধিবাসী) কে প্রসন্নও করেন। অবশ্য প্রথম পুরুষটিকে আবশ্যক ও যথেষ্ট পরিমাণে "সহযোগ" করিতেই হয়। ব্যাপারটা একতরফা হয় না। গুরুই সব করিয়া দিবেন—আমি ত কিছুই নই—এ শরণাগতি ও সমর্পণ একটা passivity মাত্র নয়। সুতরাং গোড়াতেই, "যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ" হবার পূর্বেই, এটা স্বাভাবিক সুস্থ নয়। "সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য..." শ্রদ্ধাবীর্যসহকারে অভ্যাসযোগের পরিপক্কাবস্থাতেই স্বাভাবিক। কারণ, "ধর্ম" যতক্ষণ "সর্ব" না হইয়া "খর্ব", ততক্ষণ তার "ত্যাগ" ত্যাগই নয়; ত্যাগের মিথ্যাগর্ব মাত্র।

আচ্ছা, তিনটি পুরুষ গুরুশক্তি দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া ত্রিবিধ "বীর্য্য" লাভ করেন। এ বীর্যই প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বোক্ত বজ্র হইয়া থাকে। প্রথম পুরুষ দেন—শ্রদ্ধাবীর্য। মধ্যমটি দেন ভাব অথবা সংস্কারবীর্য (সংস্কার = state of being regrouped, rearranged, reformed)। উত্তমটি দেন বিদ্যা বা জ্ঞানবীর্য। গুরুশক্তি প্রথম পুরুষটিকে "আক্রমণ" করেন সাধারণতঃ এবং বাহ্যতঃ অক্ষর (মন্ত্র) রূপে। অর্থাৎ, জীবের ব্যবহারিক সঙ্ঘাতটি ব্যাবৃত্তি, হরণ, কৃপণ-সঙ্কীর্ণচ্ছন্দে বিন্যস্ত ও অভ্যস্ত। প্রকাশও আনন্দের সাগর এবং তার পরিপূর্ণ ঋতচ্ছন্দ ও সত্যচ্ছন্দের সন্ধান সে দিতে অভ্যস্ত নয়। সে-সন্ধান থেকে বঞ্চিত রাখাতেই সে অভ্যস্ত। সাগরের বার্তা ভুলাইয়া খানা, নালা, ডোবার বার্তাতেই সে বাতিকগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্রিয়া-কারক-ফলসঙ্ঘাতটিকে সমাবৃত্তি, পূরণ, উদার, শুদ্ধ, মুক্ত, ছন্দে বিন্যস্ত করার ক্রিয়াটি (positive processটি) সুরু করিয়া দেন গুরুদত্ত ক্রিয়া। ইহাই মুখ্যতঃ জপক্রিয়া।

জপকর্তা "normal", "sub" এবং "super" ভেদে ত্রিবিধ। ইহাদেরই আমরা "প্রথম", "মধ্যম" ও "উত্তম" পুরুষ নাম দিয়াছি। এখন, "আটপৌরে" কর্তাটি হইতেছেন "প্রথম পুরুষ"। গুরু তাঁহাকেই মন্ত্রাক্ষর শোনান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মধ্যম

আর উত্তম পুরুষদ্বয়ের চেতাইবার সঙ্কেতটিও ধরাইয়া দেন। "মধ্যম" পুরুষটি জাগিয়া বৃত্তিগুলির মোড় ফিরাইয়া দেন—অর্থাৎ subconscious mind-এর "আপূরণ"টা জপক্রিয়ার প্রতিকূলে না হইয়া অনুকূলে করিয়া দেন। বিরাট সংস্কারভূমির অরিচ্ছন্দ মিত্রচ্ছন্দ হইতে থাকে। ফল্গুরীতিতে—behind the screen —মধ্যম পুরুষের কর্মটি নির্বাহ হইতে থাকে। প্রথম পুরুষ জপ করিলেন, থামিলেন, মধ্যম পুরুষ অলক্ষিতে জপের মালা হাতে করিলেন। জপ-ক্রিয়াটিকে শ্বাসাদি স্বাভাবিক (involuntary) ক্রিয়ার সঙ্গো জুড়িয়া দিয়া তাকে "প্রাণন" ব্যাপার করিয়া লইলেন। গোড়াতে যেটি মুখ্যতঃ আয়াসসাধ্য আস্য অথবা বাক্‌প্রযত্নসৌষ্ঠব, সেটিকে যথাসম্ভব অনায়াস প্রাণপ্রযত্নসৌষ্ঠব করিলেন। এর ভিত্তিতে হয় চিত্ত-(মন ও বুদ্ধি) প্রযত্নসৌষ্ঠব। কাজটা শুধু এই একদিকেই সমাপ্ত হয় না। Super-consciousness-এর plane-এ যে উত্তমপুরুষটি রহিয়াছেন, তাঁহারও প্রসারিত হস্ত চাপিয়া ধরার উপায় করিয়া দেন। অর্থাৎ জপক্রিয়ায় Sub, Super, Normal-তিন Plane এই একটা co-ordinated, concerted action-এর সম্ভাবনাটি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টভাবে সৃষ্ট হয়। সমর্থ বৈখরীজপে গুরুশক্তিসহায়, শ্রদ্ধাবান প্রথম পুরুষ ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত, অভ্যাসপরায়ণ। তাঁর নিষ্ঠাতপস্যায় "ভূঃ" এবং "স্ব" এই দুই লোকের "তাড়িতশক্তি" যেন আকৃষ্ট, ঘনীভূত হইতে থাকে। মধ্যমটি প্রস্তুত হন; উত্তমটি প্রসন্ন হন। তিনের "অবস্থা" একটা সীমায় আসিলেই তিন বজ্রের একত্র মিলন।

[দ্রষ্টব্যঃ—(১) প্রথম পুরুষ—"পশু" → মধ্যম পুরুষ—"বীর" → উত্তম পুরুষ—"দিব্য" → সম্মিলিত পুরুষ ত্রিপুটী। (২) জাপক = প্রথম পুরুষ; জপয়িতা (গুরু) = মধ্যমপুরুষ, জপ্য (মন্ত্র) = উত্তমপুরুষ. (৩) তন্ত্র (সমর্থ-ক্রিয়া) = প্রথমপুরুষ; যন্ত্র = মধ্যমপুরুষ; মন্ত্র = উত্তমপুরুষ। এই প্রকার বিভিন্নরূপে "পুরুষ" তিনটিকে মিলাইতে না পারিলে, যিনি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেই পুরুষোত্তমে মিলিত হওয়া যায় না।

উক্ত বীর্যত্রয়সহকৃত হইয়া জপক্রিয়াটি যতই চলিতে থাকে, বর্তমান "কারবারী" যন্ত্রের বা apparatus-এর system of veilers and inhibitors, আবরক ও অবরোধক "ছাঁচ"টি, সেই পরিমাণে স্বতঃসিদ্ধ, বিপুল প্রকাশ আনন্দ এবং তার পরিপূর্ণ ঋতসত্য ছন্দের releasing and revealing system-এ, উন্মোচক ও

প্রকাশক ছাঁচে, transformed বা রূপান্তরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা যন্ত্রশুদ্ধি, যন্ত্রের দ্বারা তন্ত্রশুদ্ধি, তন্ত্রশুদ্ধি দ্বারা পুনশ্চ মন্ত্রশুদ্ধি—এইভাবে vicious নয়, "virtuous" circle, ধর্মচক্র চলিতে থাকে। এই ক্রিয়াটি পূর্বোক্ত "তিনলোক" এবং তাদের অধিবাসী পূর্বোক্ত তিন পুরুষকেই টানিয়া লইয়া চলিতে থাকে।

এইরূপে ক্রিয়াটি উত্তরোত্তর পূর্ণতর ও শুদ্ধতর "ভাবরূপ" ও "জ্ঞানরূপে" উদ্ভূত হইতে থাকে। ক্রিয়া, ভাব ও জ্ঞানরূপে উদ্ভূত হয়; ভাব, ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপে; জ্ঞান, ক্রিয়া ও ভাবরূপে। যেটা "অসৎ" তাকে "সৎ" করিয়া উদ্ভূত হয় না, বস্তুতঃ যেটি সৎ তাকে release, reveal, recognise, reaffirm করিয়াই উদ্ভূত হয়। ক্রিয়া কোনোরূপে উদ্ভূত হইতে গেলে তার "প্রাপ্তি" (পূর্ব) ও "প্রত্যপ্তি" (উত্তর) কতকগুলি রূপ হইয়া থাকে।

ধর, কোনো জপক্রিয়া ভাবরূপে ও জ্ঞানরূপে উদ্ভূত হইবে। "একলাফে"ই তা' হয় না। কর্মটি অবশ্য "লাফে লাফে"ই হয় (in definite quanta of energy), তবু লাফ মারিতে হয় অনেকগুলি। কর্মটি যেমন যেমন একটা একটা শক্তির critical value reach করিতেছে, তখনি এক একটা "লাফ"। এক একটা sudden change বা transformation-এর মতন একটা কিছু। বীজ অঙ্কুরিত হবার সময় যেমন। বালক age of puberty-তে আসিলে যেমন—ইত্যাদি। এইরকম "লাফ" প্রকৃতির নিয়মেই চলে বলিয়া না রক্ষা! নহিলে বিন্দু বিন্দু করিয়া কে সিন্ধুকে আহরণ করিবে?

নিষ্ঠার সঙ্গো কিছু সময় বিন্দু আহরণ (যথা, বৈখরী জপ) চালাইবার পর দেখি বিন্দু আহরণকারীর ভিতরে "কুম্ভযোনি" অগস্ত্য "ভূমিষ্ঠ" হইতেছেন, (পূর্বোক্ত প্রথম + মধ্যম + উত্তম বীর্যসমন্বিত "বজ্র") যিনি এইবার গণ্ডূষেই সিন্ধু আত্মসাৎ করিবেন! কর্মটি আসলে যে release করা, ঢাকনা সরাইয়া লওয়া! 'হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্'। কাজেই ঠিক point টা reach করার আগে পর্যন্ত বিশেষ কিছু বোঝবার জো নেই। ভাদ্রের জমাট থম্‌থমে মেঘ। গুরুগুরু ডাকিতেছে, বর্ষণ কই? হঠাৎ একেবারে কড়্ কড়্ কড়্। তারপর ঝম্‌ঝম্ ঝম্। ঋগ্বেদাদিতে এই কাহিনী কতরকমে না শোনান হইয়াছে!

জপের বৈখরী ও মধ্যমায় প্রাপ্তি বা পূর্বরূপগুলো, পশ্যন্তী ও পরায় প্রত্যপ্তি

বা উত্তররূপগুলো "উদ্ভূত" হইতে থাকে। প্রত্যেকটাতে আবার চারিটি করিয়া পাদ।

Mechanics-এ যেমন কোনো load (ভার) কে (১) এমনি drag করা; (২) কোনো smooth frame এর উপর drag করা; (৩) pulley দ্বারা; (৪) lever ব্যবহার করিয়া; (৫) inclined plane বানাইয়া (যথা ঈজিপ্টে পিরামিড্ নির্মাণে); এবং (৬) load টাকে resolve (বিশীর্ণ) করিয়া—এই সমস্ত উপায়ে "আয়ত্ত" করিতে হয়, জপ ক্রিয়াতেও resistance system-কে অনুরূপভাবে জয় করিতে হয়। জপের প্রথমটায় (১) ও (২) দ্বারা জপক্রিয়াটিকে যথাসম্ভব সহজ অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। তখন জপ প্রায় mechanical (যান্ত্রিক)। (৩) এবং (৪) উপায়ে প্রাণ ও মন উপযুক্তরূপে সক্রিয় সহায় হয়। (৫) এ, অর্থাৎ plane এর তফাৎ করিয়া দিয়া বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় সত্তা সহায় হয়। আর (৬) এ আনন্দ বা উজ্জ্বল রস load, আয়াস বা সমগ্র resistance টাকেই finally resolve ("গলিতকষায়") করিয়া দেয়। (৫) হইতেই resolution এর আরম্ভ (তখন "মৃদিতকষায়")। অবিপক্ককষায়ে "কুযোগী"।

অতএব, জপ চালাও। অভ্যাস যাতে ধীর, সুস্থ, শ্বাসক্রিয়ার মত সহজ, সরল হয়, তার যত্ন কর। প্রাণের pulley আর অন্তরের lever খাটাও। বুদ্ধি-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বিচার, মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা ক্রিয়ার plane বদলাও, যাতে সে ভাব ও জ্ঞানরূপে উদ্ভূত হইতে পারে। প্রেমে ও আনন্দে পৌঁছাও—তখন সর্ববাধা-বিনির্মুক্ত অপ্রাকৃত-অমায়িক স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক উল্লাস ও প্রকাশ।

জপ-সাধন কেবল ও সহিত ভেদে দ্বিবিধ।

অনেক মহাপুরুষ কেবল নিষ্ঠা-পূর্বক (কর্মনিষ্ঠা এবং ভাবনিষ্ঠা পূর্বক) জপক্রিয়াতেই উত্তরোত্তর এ ভূমিগুলো লাভ করিয়াছেন। নাম বা জপই কেবল আশ্রয়। 'হরের্নামৈব কেবলম্' অথবা, শুদ্ধ প্রণব। সব কিছুই ঐ একেই ফুটিয়াছে। Everything else shall be added unto it. ইহা জপসূত্রে আলোচিত "শুশ্রূষা" জপ। শুশ্রূষাটি শ্রবণেচ্ছা এবং সেবা বা সৎকার এ দুই অর্থেই। নাম এর যেটি "মর্মবাণী" সেটি শোনার একান্ত সাধ থাকিলে নামই সে সাধ পূরাইবেন। আর, নাম প্রাণপণে "সেবা" করিলে তিনিই "নামীকে" মিলাইবেন। এই এক অভিন্ন শুশ্রূষা "কাণ্ড" থেকেই বিজ্ঞানভাতি এবং ভজনরস-মাধুরী দুই সাধিষ্ঠ শাখা বাহির হইয়া

তৎপরমোজ্জ্বলরস-সমাপত্তিরূপ পরম প্রয়োজনটি নির্বাহ করিবে। পূর্ব-শাখার প্রসারে বিবিদিষাজপ এবং বিদ্বজ্জপ, অপর শাখায় বৈধী, রাগানুগা, রাগরূপা। দুটি শাখা একেই এসে মিলিত হয়। এ সবের মূলেই যখন নাম তখন নামকেই সর্বতোভাবে আশ্রয় কর। "নিরপরাধ" হইয়া আশ্রয় কর। যেটি "অপরা", যেটি "প্রাকৃত" তার অধঃ কিনা অধীন হইলে ত যিনি অধোক্ষজ তাঁকে মিলিবে না! তবে এরূপ একাগ্র শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠা সব আধারে সম্ভবে না। তাই সহিত বা mixed method prescribed (অবলম্বনীয়)। তাতে জপক্রিয়া পূর্বোক্তক্রমে স্বয়ংই যেটি করিতে চায় এবং সমর্থ হইলে স্বয়ংই যেটি করিবে, তাকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়াদি কোষের শোধনবোধনাদির অন্যবিধ উপায় (auxiliary means) দ্বারা অনুকূল করিয়া লও। তবে সাবধান! জপক্রিয়াটির co-ordinating, accumulating work টিকে (ব্যাবৃত্তি থেকে সমাবৃত্তিসাধনকে) বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ইত্যাদি হইতে দিলে চলিবে না।

এখন এইটি মনে রাখিয়া বৈখরীজপ অথবা অনুরূপ সাধন ভজন চালাইতে হইবে। অবশ্য জপ-বিদ্যা বা বিজ্ঞান সমর্থ সহায় ও সাধন। শ্রুতিতে ক্রিয়ার সঙ্গে বিদ্যার বা বিজ্ঞানের এত স্তুতি তাই দেখি। পূর্বোক্ত প্রাণের পাঁচটি মুখ্য ঋতচ্ছন্দ, আর পাঁচটি অনুগত ঋতচ্ছন্দের অনুবর্তনে ক্রিয়াটিকে "শুক্লাগতি" পথে চালাইতে হইবে। অনুবৃত্তি হইলে জপই জপকর্তার গুরু, 'গতি, ভর্ত্তা, সহায়, শরণ, সুহৃৎ' হইবে। কেননা, জপের অক্ষরে যিনি প্রভু, যিনি সাক্ষী, যিনি নিবাস, যিনি "নিধানং বীজমব্যয়ম্", তিনি স্বয়ং সমাসীন।

পরিশেষে এই কয়টি বিষয়ে লক্ষ্য দাও:—

১। প্রথমতঃ জপের "আগমাপায়" এর অনুপাতগত অনুকূল পোষক (positive) সমতা রক্ষার দিকে যত্ন। "প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা"। জপকে প্রাণের একটা উদাসীন ভূমি ("মধ্যে বামনমাসীনং") হইতে নির্গত করিয়া ছন্দঃক্রমে আবার তাতে লয় করিতে হইবে। শনৈঃ শনৈঃ। পুনঃ পুনঃ। Engineএ যেমন পালাক্রমে vacuum সৃষ্টি করা হয়। অনুপাত সমতা সাধনের জন্য কখনো আগমে (প্রাণে) অপায়ের (অপানের) "আহুতি" দিতে হয়; কখনো বা বিপরীত ক্রমে। এ সব ধীরভাবে আলোচ্য। ফলে যেন জপক্রিয়ার সমগ্র systemএ আদান-প্রদানগত "সংখ্যাটি", proportional depositটি ধনরাশি হয়।

২। জপক্রিয়ায় নানাদিকে নানা reactionsএর (প্রতিক্রিয়া) ফলে যেসমস্ত transformations, dissipations এবং "running down" (রূপান্তর, আক্ষেপ-বিক্ষেপাদি) হইতে থাকে, তার মাঝে জপক্রিয়ার যেন "উদ্বৃত্ত" (Surplus Credit) থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জপক্রিয়া, জপের আধার ইত্যাদি ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। অন্যথা জপ ব্যর্থ বা নষ্ট হইবে না বটে, কিন্তু তার "ফল" গোচর হইতে বিলম্ব ঘটিবে। জপের reactions (negative, প্রতিকূল) গুলো ক্লান্তি, অবসাদ, প্রমাদ, তন্দ্রা ইত্যাদি রূপে জমাট হইতে থাকিবে। এগুলো তামস reactions; রাজস reactions (unhelpful) ও আছে। চিত্ত-চাঞ্চল্য, রিপুর প্রাবল্য, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য (১):—জপের "সুর" বা ছন্দোগ ক্রিয়া এবং ভাষা যত বলিষ্ঠ, সক্রিয় হইতে থাকে, জপকর্তার System (সঙ্ঘাত) এর এবং তার Environment (পারি-পার্শ্বিকের) এর অ-সুর ভাবগুলোও তত প্রবল আকারে "উত্থিত" হইতে থাকে। কেন না, Nature (প্রকৃতিতে) এর একটা general stirring up (আলোড়ন) তাহাতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধের ফলে "aggravation" এর মত অবস্থাও আসে। প্রকৃতির প্রবৃত্তি ধারায় যারা কায়েমি স্বত্বে ভোগদখলিকার তাদের উচ্ছেদ সহজে হয় না। সুরাসুর সংগ্রাম তাই সাধনসমরের আসল কথা। রক্তবীজের ঝাড় সব! জিহ্বায় রাখিয়া তবে সংহার—অর্থাৎ সমর্থ জপাস্ত্র দ্বারা।

দ্রষ্টব্য (২):—তেমনি অপরদিকে, মধুচ্ছন্দে মন্ত্রজপের ফলে সকল অন্তঃকোষগুলিই যে মধুচ্ছন্দে বিন্যস্ত হইতে থাকে, concordant elements গুলো সংহত, আর discordant গুলো বিচ্যুত হইয়া,—তাহা বুঝিতে পারা যায় অনেক চিহ্ন ও নিদর্শন দ্বারা। যথা—সদৃশ উদ্ভূত নানাবিধ মধুর ও গভীর ছন্দোবন্ধ আন্তর-ধ্বনি শ্রুতি দ্বারা। বিসদৃশ উদ্ভূত নানাবিধ বিচিত্র অপরূপ, সুন্দর রূপ ও বর্ণময় মানস প্রত্যক্ষে (Visionএ)। এই উদ্ভূত আন্তর ধ্বনি, রূপ, বর্ণ, গন্ধাদি এতই অপরূপ ও সজীব (live and vivid) যে, তাদিগকে কোনো বাহ্য প্রত্যক্ষাদির নকল (images) কিছুতেই মনে করা যায় না। বরং তারা কোনো "অপ্রাকৃত ধাম", upper world of eternal freshness and pristine purity থেকে আমাদের কারবারি এই "ধূসর লোকে" projection ("প্রক্ষেপ") বলিয়াই মনে হয়।

৩। জপক্রিয়ার সমাহার, সঙ্গতি, সমন্বয় আবশ্যক। বৈখরী ও মধ্যমায় এ

কাজটি অনেকটা "যন্ত্রে তন্ত্রেই" চলে। শ্রদ্ধাবীর্য সহকারে দীর্ঘকাল নিরন্তর সৎকারাসেবিত বিধিপালন দ্বারা। কিন্তু কাজটি বুদ্ধিপূর্বক ও আনন্দসিক্ত (শুদ্ধ বিজ্ঞান ও আনন্দ কোষের অনুগ্রহযুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ তুষ্টি নেই, পুষ্টি নেই। [Realisation and Satisfactionএর ভূমি আনন্দ—এটা মনে রাখিতে হইবে। সৎ, চিৎ, আনন্দ তিনে এক হইলেও আনন্দকে বলিতে পার the core, the inmost "হৃৎ" সত্তা। "জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং"—সৎ চিৎ আনন্দকে লাভ করা। সাধন-জীবনে এই ক্রমটি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়: তাকে অস্তিরূপে জানিলাম, ভাতিরূপেও দেখিলাম; তবু যেন একটা "ফাঁকা" রহিয়া গেল। প্রিয়ং বা রসরূপে তাতে প্রবেশ না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা নেই। অনেক সময়, এই শেষ গ্রন্থিটি পেরুতে দেরি হইয়া থাকে। জীবনে কৃষ্টি আসিল, দৃষ্টিও ফুটিল; তবু তুষ্টি নেই। তার প্রতীক্ষায় কৃষ্টি দৃষ্টিকে আরও উদার ও অগ্র্যা হইতে হয়। শেষকালে, এমন একটা কি আসে, যাতে সব কিছুর পরিপূর্ণতা, সমাপ্তি হয়।] তবে কোন গতিকে মধ্যম পুরুষটিকে প্রস্তুত করিয়া মধ্যমার সেতু পার করাইতে পারিলে, মুখ্যপ্রাণের আপন সমাহার, সমাবৃত্তি ছন্দে জপক্রিয়া আপতিত হইল। তখন তার সমাহার ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অনায়াস, সহজ ও স্বাভাবিক। জপক্রিয়া এইভাবে সমাহৃত, সুসম্মত, সুসম্বন্ধ হইলে একটা মহাবীর্য harmony (ছন্দঃ) সৃষ্টি করে। সে হয় সুরব্রহ্ম বা ছন্দোব্রহ্ম। জপসূত্রের "আধিকারিক" কল্পটি।

৪। শেষকালে জপক্রিয়ার সিদ্ধিতে ধৈর্য আর বীর্য প্রকাশ আর আনন্দের এমন একটা Permanent Solvencyর ভূমি, "অচ্যুতপদ" মেলে, যেখানে থেকে ঐ নিরন্তর হরণ বা "running down" process এর ফলে আর কাঁচিয়া insolvencyতে পড়ার "ভয়" থাকে না। জপসূত্রের "আনপায়িক" কল্প।

দ্রষ্টব্য (৩):—জপের "ফল" গুলো অমর কিন্তু তারা সাধারণতঃ জমা হয়, প্রথম পুরুষের কারবারি ব্যাঙ্কে নয়, মধ্যম পুরুষের গোপন Reserve Bankএ। জমা ঠিক ঠিক হইতে থাকিলে বেশ "চক্রবৃদ্ধি"তে সুদও জমে আসলের সাথে। কিন্তু সে ব্যাঙ্কের "পাশ বই" প্রথম পুরুষ প্রথম প্রথম দেখতেই পান না। ভাবেন সবই বুঝি "জলে পড়িতেছে।" যেন আপন ঘরের আপন কারবারের সব খবরই তাঁর নখদর্পণে! শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রাখিয়া জপ-ক্রিয়া চলিলে—"পাশ বই" কখনো কখনো

দেখিতেও পাওয়া যায়—স্বপ্নরূপে, অনিচ্ছাজপে (সাক্ষাৎ ক্রিয়ারূপেই); তা ছাড়া নানাবিধ অভূতপূর্ব, অসাধারণ ভাবরূপে ও দর্শনরূপেও। তখন বোঝা যায়, জপফল শুধু জমা হইতেছে এমন নয়, বেশ মোটাহারে সুদও দিতেছে। সুদ =Resonance Effect. তবে জপকর্তার "overdraft" না করার সম্বন্ধে হুঁসিয়ার হইতে হইবে।

৫। সর্ববিধ সমর্থ জপক্রিয়ার একটা "অবসান" ভূমিও আছে। সমর্থ জপ "মহান আত্মা" এবং তাঁকে "যচ্ছেৎ" পর্যন্ত। তারপর "শান্ত আত্মনি" সব ঠাণ্ডা! এ "শান্ত" বৈষ্ণবাদি রসশাস্ত্র শান্তদাস্যাদি বলিয়া যাকে গোড়ায় ফেলিয়াছেন, সে শান্ত নয়। শুদ্ধ ক্রিয়া, শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ ভাবের অভেদ পরাকাষ্ঠায় যে "মহামৌন"—তাই। এখানে না আসা পর্যন্ত মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিবেন না। কঠশ্রুতির ওই প্রসিদ্ধ সাধনটিকে যে কেবল "জ্ঞানমার্গী"র সাধন ভাবিয়াছে, তার—সেই শ্রুতির ভাষায়—"শির" (মূর্দ্ধা) "পতিত" হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

কেহ মনে করিতে পারেন—জপের যখন ভাব (feeling-attitude) এবং জ্ঞান (consciousness of the meaning) রূপটাই "আসল" এবং সেইটাই যখন লক্ষ্য (end) তখন কেবল জপক্রিয়ায় (সংখ্যাদির নিয়ম রাখিয়া বাচিকাদি জপে) জোর দেওয়ার কি আবশ্যক? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—এবং পূর্বে বলাও হইয়াছে—যে ক্রিয়া, ভাব এবং জ্ঞান (বাক্ প্রাণ ও মন যাদের নির্বাহয়িতা)—এ তিনে মিলিয়া এক অবিভাজ্য ত্রিপুটী। এরা বস্তুতঃ এবং কার্যতঃ পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। একের সঙ্গে অপরের উদয়, লয়, স্থিতির ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক বিদ্যমান (organic relationship)। যেমনধারা বৃক্ষের "সফলতা" শাখাতে হইলেও কাণ্ড ব্যতীত সে সফলতার সম্ভাবনাই থাকে না, তেমনি যথার্থ ভাব এবং জ্ঞানে জপের পরিণতি হইতে হইলে, জপক্রিয়ারূপ শুশ্রূষা কাণ্ডটিকে আশ্রয় করিতেই হয়। ভাব ও জ্ঞানের পরিপক্ক দশায় "ক্রিয়া"টি (ব্যক্ত স্পন্দনরূপে) মিলাইয়া যাইবে বটে, কিন্তু অব্যক্তস্পন্দন (অর্থাৎ স্পন্দ, সুতরাং "কর্ম") রূপে সেটি থাকে। পূর্বোক্ত "শান্ত আত্মনি" অথবা "মহাভাবে" "যচ্ছেৎ" (পূর্ণাহুতি) না হওয়া পর্যন্ত থাকে। তার নীচের, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক ভূমিগুলিতে, জপক্রিয়াটি জোর করিয়া থামাইতে গেলে, ফল শুভ হয় না, পূর্বে যে সফলতার কথা বলা হইল, সেইটিই ব্যাহত হইয়া পড়ে। কেননা, ভাব এবং জ্ঞান দুইই তাদের "বাস্তবী তনু" (real form and character) লাভ করে, একটা

সুবিন্যস্ত, সুগঠিত ক্রিয়ার কাঠামোতেই। স্পন্দনাদির অনুরূপতা এবং অনুরণনের (resonance effect) সমঞ্জস-সমুচ্চয় (harmony integration) উপেক্ষা করিয়া ঐরূপ কাঠামো (যেটি স্থায়ী ভাবের উদ্দীপক এবং অকুণ্ঠ জ্ঞানের উন্মেষক) তৈয়ারী হইবে না। এ নিমিত্ত বিধিপূর্বক (শ্রদ্ধাবীর্য এবং ধৃতি সহকারে) জপক্রিয়াটি চালাইতে হইবেই। গোড়া থেকেই "কৈ ভাব"? "কৈ জ্ঞান" বলে ব্যস্ত হয়ে ক্রিয়াটি ছেড়ে দিলে বা তাতে ঢিল দিলে চলবে না। পাখী যেমনধারা তার ডিমে তা দিয়ে যায় তেমনি করে মিত্রচ্ছন্দ আশ্রয়ে অরিচ্ছন্দ ত্যাগে "জপাক্ষরে" "তা" দিয়ে যেতে হবে। তাতে সাধারণ "মৃত" অক্ষরবুদ্ধি ত্যাগ করতে হবে। পাখী তার ডিমটাকে একটা "জড়পিণ্ড" ভাবলে তা দিয়ে যেত কি? সঙ্গে সঙ্গে ভাবের "তাপ" এবং জ্ঞানের "আলো" যতটা যোগাতে পার ভালই। কিন্তু তা করতে যেয়ে গোড়াকার আসল কাজটায় (ঐ "তা" দিয়ে যাওয়ায়) যেন শৈথিল্য, বিচ্যুতি না ঘটে। Dissipation, defraction (আক্ষেপ-বিক্ষেপাদি) প্রভৃতি যথাসম্ভব বর্জনীয়। বিচ্যুতি ঘটলে—ভাবের আমেজ একটু আধটু এলেও তা "উপে" যাবে, প্রকাশের ছটা একটু খানি ফুটলেও আবার ঢেকে মিলিয়ে যাবে। যোগ এবং ক্ষেত্রের উপযুক্ত কাঠামোটি না পেলে ভাব তার চপলতা, তরলতা, আবিলতা ছেড়ে, শান্ত, প্রগাঢ় এবং স্বচ্ছ হয় না; জ্ঞানও অবাস্তব কল্পনা আরোপ সংশয়াদি কাটিয়ে তার উরু নির্মল প্রকাশ লাভ করে না। "কাঁচা" কাঠামোতে অসমঞ্জস (misfit) ভাব আর জ্ঞান দুই-ই প্রতিক্রিয়া (unhelpful reactions) সৃষ্টি করেও থাকে। সুতরাং জপক্রিয়াটিকে তার স্বাভাবিক ছন্দে ও গতিতে চলে ভাবের গভীরতায় এবং প্রকাশের উজ্জ্বলতায় গিয়ে আপনি শান্ত হতে দাও। বৈখরী জপকে সহজভাবেই মধ্যমার সেতু পেরিয়ে পশ্যন্তী ও পরায় যেতে দাও। "সেতু" উড়িয়ে দিতে যেও না। ওটা bad strategy, ভুল চাল। তাই যদি কর তা হলে এক মহাবীর হনুমান ছাড়া আর কে এপার থেকে ওপারে লাফ দিতে ভরসা পাবে? স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকেও যো সো করে একটা সেতু বাঁধতে হয়েছিল যে! কাঁঠাল গাছের গুড়িতেও কাঁঠাল ফলতে পারে বটে, কিন্তু সেটা ত সবক্ষেত্রে হয় না, আমজামের গাছেও হয় না। এই জন্য, মালাজপ বা করজপ জোর করে ছেড় না—মালাই তোমায় ছাড়বে সময় হলে। "তজ্জপ-স্তদর্থভাবনম্"—মন্ত্রের জপেই তার অর্থ (কিনা বাচ্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও জ্ঞান) হাজির হবে। অবশ্য জপকে

"সমর্থ" করে নেয়া চাই। সূত্র "ভাবন" (হওয়া) বললেন, "ভাবনা" (ভাবা) বললেন না, লক্ষ্য করো।

৬

উপসংহারে, জপ কর্মের মূল আধারটি আর একবার সংক্ষেপে স্মরণ করাইয়া দিতেছি—

মানুষের কার্যকরণ-সঙ্ঘাতের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিন "স্তর" ব্যেপে মোটামুটি পাঁচটা কোষ (অন্নময়াদি)। প্রত্যেকটা আবার তিন, তিন। পরাগ্‌বৃত্তি (নেগেটিভ্ = ভূঃ = পৃথিবী); প্রত্যগ্‌বৃত্তি (পজিটিভ = স্বঃ = দ্যৌঃ); পরস্পর-ব্যাবর্তক অন্তরাল বৃত্তি (মিডিয়াম = ভুবঃ = অন্তরীক্ষ)। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এবং অন্য অন্য ব্যাহৃতির মৌলিক বিশ্লেষণ মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। সেখানে দেখিবে যে ভূঃ = পৃথিবী এবং স্বঃ = দৌঃ এই সমীকরণ দুটি ব্যাহৃতিদ্বয়ের অর্থ বিশেষেই করা যায়। সে যাই হোক, সবগুলোর পজিটিভ (+) সংযুক্ত হলে অবিচ্ছেদে এক প্রত্যঙ্‌মুখী ধারা (শুক্লা সৃতি); আর সবগুলোর নেগেটিভ্ (–) সংযুক্ত হলে পরাঙ্‌মুখী ধারা (কৃষ্ণা সৃতি)। বিশ্বে শুক্লা ও কৃষ্ণা ধারা, পূরণ ও হরণ প্রবাহের পরস্পর মিশ্রণ এবং সঙ্কর (mixture and confusion) ঘটেছে দেখছি। তাদের শুদ্ধরূপে পাচ্ছি না। সর্বত্র এইজন্য (+ –) plus minus এর আকর্ষণ। শুক্ল এবং কৃষ্ণ মিশে এক "ধূম" ধারা (প্রাকৃত ধারা) প্রবাহিত রেখেছে ("খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ"). সেই ধূম (কুটিল, জটিল গতি সঙ্কর ছন্দঃ) প্রবাহের সঙ্গেই জীবের সাধারণ পরিচয় ও কারবার। দুটি শুদ্ধ ধারার পরস্পর বেধনিমিত্ত যে মলিন সঙ্কর (ধূম) ধারা আর জটিল সঙ্কর ছন্দঃ চলেছে, তাতেই জীব পতিত। এখন, জপের কাজ—অন্নময়ের যেটা শুদ্ধ সাত্ত্বিক "ভাগ," তাতে ক্রিয়া (স্পন্দন) সৃষ্টি করে' সেটাকে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের শুদ্ধে (পজিটিভ্‌এ) পৌঁছে দেওয়া। প্রত্যেকটারই শুদ্ধ, অশুদ্ধ দুটো দিক আছে, তাহা মনে রাখা কর্তব্য। প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানের ও আনন্দের শুদ্ধ (পজিটিভ) দিক কি কি, তাও গভীর ভাবে চিন্তনীয়। জপ ভাবরূপ ও জ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট ভূমিতে আরূঢ় হলে জীবের ভেতরে যে নিত্য প্রকাশ ও আনন্দের ধাম বিরাজমান, সেখানে উপনীত করে।

তাহা হইলে বোঝা গেল, এই সঙ্কর মলিন ছন্দকে শুদ্ধ উজ্জ্বল ছন্দে আনাতেই কল্যাণ। এই শুভ পরিণাম (transformation) ঘটান যায় যে ছন্দে তাকে বলে মিত্রছন্দঃ; রুদ্ধ বা ব্যাহত হয় যাতে করে, তাকে বলে অরিচ্ছন্দঃ। তার ফলে জীবের মহতী বিনষ্টি। সঙ্কর ধারার মাঝে মাঝে এক একটা "শান্তভূমি" (zone of placidity) মেলে; সেখানে শুদ্ধ ঊর্দ্ধাভিমুখ ধারা যেন একটা বাহু (arm) প্রসারিত করে দেয়—সেই বাহু হয় সেতু বা "সন্ধি"। সে সন্ধিকে পাকড়াতে পারলে সঙ্করের অসামান্য টান থেকে কেটে শঙ্করধারায় (অনায়াস, অনাময় নিরুপদ্রব প্রশান্তবাহিতায়) গিয়ে পড়া যায়। সেই সন্ধির সন্ধান দেয় যে ছন্দঃ সেই হচ্ছে মিত্রচ্ছন্দঃ। সৃষ্টির চাকা ঘুরছে, জীবও তাতে ঘুরছে। আবর্তনের মাঝে মাঝে এক একটা "ফাঁক" (point of escape), ব্যাবৃত্তি বা আবৃত্তিবেগের সাময়িক অভিভব, exhaustion—জন্য সমাবৃত্তি—release ও return এর একটা বাহু (positive component) যেন আবৃত্তির মাঝেই "প্রকট" হয়—সেখানে একটা "ফাঁক," "সন্ধি", "শান্তভূমি"র সৃষ্টি করে। তার ফলে একটা "শুদ্ধোন্মুখতা", প্রসাদস্বচ্ছতা, প্রকাশাবরণক্ষীণতা, উজ্জ্বলতা আসে। তার ফলে আবর্তে পতিত বস্তু তার আবর্তনগণ্ডী ("routine of life") কেটে বেরুবার একটা সুযোগ পায়।

কিন্তু সাধারণতঃ অশুদ্ধ মলিন স্তরগুলিতেই জীব (অন্ন, প্রাণ, মন এসব) কারবারী (normally functions)। এই ধূম ধূসর স্রোতের সঙ্কর ছন্দঃ (complex, confused rhythms, স্পন্দন) পাপ্মাবিদ্ধ, অসুরবিদ্ধ, অব্যবসায়াত্মিক, অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাসমাকুল। জপ এই সঙ্করক্ষেত্রে একটা মিত্রচ্ছন্দঃ শলাকা (wedge) রূপে প্রবিষ্ট হয়ে, জটিল, কুটিল, সঙ্কীর্ণ ছন্দগুলোকে ভেঙ্গে অমৃত বা মধুচ্ছন্দের (শুক্ল, +) অংশকে মৃত্যু বা বিষচ্ছন্দের (কৃষ্ণ, –) "আলিঙ্গান" থেকে মুক্তি দেয়, তাকে শুদ্ধভাবে সক্রিয় করে তোলে। ইহাই সংসৃতির (ধূম-ধারার) "মন্থন"। এই মন্থন, শোধন, মোচন মুক্তি, কাজটা জপের স্পন্দনে সিদ্ধ হলে "জপাৎ সিদ্ধি" অবশ্যই। গুরু সঙ্কর ছন্দের মধ্যে শলাকার মত প্রবিষ্ট হয়ে শুদ্ধ, উজ্জ্বল, শঙ্কর (শিব) ছন্দটি আদায়ের উপায় করে দেন। এই মন্থনের প্রসাদে মলিন, মিশ্র, সঙ্কর হতে উজ্জ্বল, শুদ্ধ, শঙ্কর ভাগ, "অমৃত" ভাগ "বিষ" ভাগ হতে তফাৎ হয়ে পড়ে। এ মন্থন-ক্রিয়ার সাধক-বাধক হিসাবে সুর-অসুর (মিত্রচ্ছন্দ

ও অরিচ্ছন্দ) দুটি পক্ষ (components) যুগপৎ সক্রিয়। কিন্তু শুদ্ধাধারাশ্রয়ে অভিরোহ (outgrowing ascent) হতে হলে মিত্রচ্ছন্দের জয়ী হওয়া আবশ্যক। জয়ী না হলে অবরোহ অথবা stagnation (জাড্য)। মন্থনের অবসানে যিনি শিবশঙ্কর তিনি "বিষ"কে আর তফাৎ করেন না, "আত্মসাৎ" করেন। তখন দ্বন্দ্বাতীত চিদানন্দৈকরস তিনি। কালিয়নাগের রহস্যও চিন্তনীয়।

এইবার এই নক্সাটাঃ—

তত্ত্বালোক = অতদ্ভাবনানিবৃত্তি
(কারণাত্মক অব্যক্তক্রিয়া) বিপরীতভাবনা নিবৃত্তি (নিবর্তক শুদ্ধনাদরূপ ক্রিয়া)
(স্থূল বা সূক্ষ্ম) অসম্ভাবনার নিবৃত্তি

জ্ঞান ও আনন্দরূপ (ভবৎ, প্রবেষ্টুং) — পরা
+ আনন্দময়
অন্তরীক্ষ
– আনন্দময়
+ বিজ্ঞানময়

× × ×

মুখ্যতঃ ভাবরূপ (পশ্যৎ, দ্রষ্টুং) — পশ্যন্তী
– বিজ্ঞানময়
+ মনোময়

× × ×

মধ্যমা
– মনোময়
+ প্রাণময়

× × ×

মুখ্যতঃ স্থূলসূক্ষ্মক্রিয়ারূপ (কুর্বৎ, জ্ঞাতুং)

মিত্রচ্ছন্দরূপে→ বৈখরীজপ
– প্রাণময়
+ অন্নময়

× × ×

– অন্নময়

গুরুশক্তির প্রবেশ

শেষে দুটো গোড়ার কথা

শেষকালে কয়টা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভাল। "এত কাঠখড় যোগাড়" করে তবে জপে লাগতে হবে! তবে ত দেখছি জপসাধন এক প্রকার অসাধ্য সাধন—এ মনে করে কেউ বা ভয়ে পেছিয়ে যেতে চাইবেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে উপযুক্ত "কাঠ খড় যোগাড়" না করে জীবনের ব্যবহারক্ষেত্রে কোনও "সিদ্ধি"ই লাভ হয় না। আর জীবনের সব চাইতে সেরা যে সিদ্ধি তার জন্যে "বিনি পয়সার একটা সহজ মুষ্টিযোগ", অগত্যা "পয়সা পাঁচেকের এক সস্তা মাদুলী"—এতেই কাজ হাঁসিল করার কল্পনা দেখে মনে হয় "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"! লক্ষ্যটা যে পরিমাণে বড় তার সাধনটাও সেই অনুপাতে বড় হবারই কথা। সর্বদেশে সর্বকালে সাধকদের জীবনই এর প্রমাণ। কোথাও, কোনক্ষেত্রেই, "সস্তায় কিস্তিমাৎ" হয়নি। জপ বলে কেন, কোনও সাধনই "সহজ" নয়। বিশেষ করে, প্রারম্ভটা ত সদোষ আর আয়াসবহুল হয়েই থাকে। বাধা আর গ্রন্থিগুলো শেষ পর্যন্তই চলে, তবে তাদের "ভোল" বদলে বদলে যায়। গোড়ায় যেটা শক্ত সেটা পরে সহজ হতে পারে বটে, কিন্তু সেখানেও নতুন এবং আরও শক্ত একটা না একটা কিছু এসে দেখা দেয়। আঁক শিখব, কি গান শিখব, কি আর যাই কিছু শিখব, তাতেই এই রকম। প্রথম শিক্ষার্থীর বাধাগুলো পরের শিক্ষার্থী মিটিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর নিজেরগুলো? অত "তোড়জোড়" করে জপ কেন করতে হবে? —তাঁর নামে, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস কর; তাঁর কাছে প্রার্থনা কর; ব্যাকুল হও; তাঁর শরণ নিয়ে শান্ত হও; সরল হও; খাঁটি ধেয়ান ধরো, প্রেম লাগাও—এ সব উপায়েরই বা কোনটা যে "সহজ" তা কেউ বলে দেবে? মন্তর তন্তর ওসব কি করছো, "মন তোর আর তন তোর" নৈলে যে কিছু হবে না—কথা ত সবই ঠিক; কিন্তু শুধু কথাতেই কি গোটা মামলাটা "জল" হয়ে গেল? "বিনা প্রেমসে নেহি মিলে নন্দলালা"—কিন্তু প্রেম মেলে কিসে? সহজ কেউই নয়। সহজ সাধন বলে যেটা চলে আসছে অন্ততঃ বৌদ্ধযুগ থেকে, সেটা হচ্ছে "সহজ" অবস্থা লাভের জন্য

সাধন, নিজে সহজ নয়। বরং একটা নিয়ম করে, ফল হবে এই বিশ্বাস রেখে, জপ করাটাই কতকটা সহজ মনে হতে পারে।

ফলকথা, ক্রিয়াপ্রধান, ভাবপ্রধান কিংবা জ্ঞানপ্রধান যে ভাবেই সাধনটি চলুক, বিদ্যা (বিধি, পদ্ধতি), শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ (রহস্য)—এ তিনের যথানুরূপ সম্মিলন না হলে সে সাধন (শ্রুতির কথায়) "বীর্য্যবত্তর" হবে না, সমর্থ ও সিদ্ধিপ্রদ হবে না। শ্রদ্ধা বা ভাব এ তিনেরি মূল সন্দেহ নেই; কেননা মূলে ভাব থাকলেই ক্রিয়া "স্বচ্ছন্দে" তার পথটিতে চলবে (নামগ, অধ্বগ হবে), আর জ্ঞানও "স্বচ্ছন্দে" পরম উপলব্ধি ও আস্বাদনে গিয়ে পৌঁছুবে (ধামগ হবে)। কিন্তু ধৃতি ও উৎসাহ সহকারে পথটি ত চলতেই হবে, আর পরিপূর্ণ উপলব্ধিকে আড়াল দেওয়া "পরদা"গুলো ত পর পর সরিয়েই নিতে হবে। অন্যদিকে, শ্রদ্ধা বা ভাব গোড়াতেই "পাকাপোক্ত" হয়ে দেখা দেয় না। গোড়ায় রুচি বা রতি বড় "লাজুক" (shy) বড় "চল চপল চঞ্চলা" (fickle, variable)। একদিকে বিদ্যা, অন্যদিকে উপনিষৎ—এই দুয়ের বিশ্বস্ত আলিঙ্গানেই তাকে রক্ষা করতে হয়, আর সাবধানে, তার যেটি সম্ভাবনা তাকে "তা" দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হয়। এই গ্রন্থের ৪।৪।৩০ সূত্রের কারিকায় যে কল্পতরুটির কথা বলা হয়েছে, শ্রদ্ধা বা ভাব নিয়েই তার মূলটি আশ্রয় করতে হবে; নিষ্ঠা দিয়ে সে কল্পবৃক্ষের কাণ্ডটা। তাই করলে—সে কাণ্ড থেকে দুটি "সাধিষ্ঠ" শাখা উদ্‌গত হবে—একটি উত্তরোত্তর উজ্জ্বল, পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রতি উন্মুখতা, অপরটি, ভাবশক্তি বা ভজনরসমাধুরীর উত্তরোত্তর রসঘনগাঢ়তা। এ দুটি শাখা যেখানে আবার সামরস্যে সম্মিলিত, সেইখানেই "সান্দ্রামুকুলমঞ্জরী"র উদ্‌গম, এবং সেইখানেই হচ্ছে পূর্ণ সমাপত্তি এবং পরম সফলতা। এই মহোদয়টি হতে দাও। গোড়াতেই "কুঠার" হাতে করো না, অনাবশ্যক "বাড়তি" ছেটে ফেলতে; অমৃত কল্পতরু তোমার ভাগ্যদোষে শুধুই ঠুঁটো জল্পতরু যেন না হন!

এ না হয় হল। কিন্তু জপকর্তাকে সমর্থজপের নিমিত্ত স্পন্দন ও বীচি বিজ্ঞানের "বোদ্ধা"ও হতে হবে, এতে সাধনার সঙ্গে একটা প্রায় অসম্ভব সর্ত যুড়ে দেয়া হল না কি? উত্তর—সে রকমের কোনও সর্ত যুড়ে দেয়া হচ্ছে না। এদেশে তানসেন অথবা ওদেশে ভাগনার, বিটহোফেন, মোজার্ট প্রমুখ প্রতিভাবান সুরশিল্পীরা গভীরভাবে শব্দবিজ্ঞান (Acoustics), সূক্ষ্মধ্বনিবিজ্ঞান (Supersonics), বীচিবিজ্ঞান

(Wave Mechanics) আলোচনা না করে থাকতে পারেন, কিন্তু এটা ঠিক যে তাঁদের সুরশিল্পসৃষ্টি, যেখান থেকে যেভাবেই হোক, ঐ সব বিজ্ঞানের "আধারেই" হয়েছে; অর্থাৎ, melody, harmony, resonance ইত্যাদি ঘটিত সূত্রগুলো মান্য করেই হয়েছে, অমান্য করে হয়নি। হওয়া সম্ভবও নয়। শারীর-বিজ্ঞান এবং জৈবরসায়নবিদ্যা (Bio-chemistry) ইত্যাদিতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পোষণ করা সম্ভব বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ত ঐ সব বিজ্ঞানের নিরূপিত সূত্রগুলোর ওপরই নির্ভর করে। সেইরকম, জপের পেছনেও যে মহাবিজ্ঞান রয়েছে, সেটার কোন কোন ভাগে অভিজ্ঞ না হলেও জপ চলতে পারে সন্দেহ নেই; তবু সে বিজ্ঞান পরিচয়ে কাজে সুরাহাই হয়ে থাকে। জপ তা হলে আর আঁধারে হাতড়ে চলার কর্ম হল না। তবে এটা ঠিক যে, জপের বেলা তার পথের আলোটিকে (পদার্থ-বিজ্ঞানের মত) "গাণিতিক বিশ্লেষণ" করে অথবা লেবরেটরির যন্ত্রে যাচাই করে নেবার প্রয়োজন নেই। এমন কি, সুরশিল্পী বা বর্ণশিল্পীর মত সে আলোর অথবা ধ্বনির সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর পরদাগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খতম ভাগ বিচার করে নেবারও তেমন প্রয়োজন নেই। জপের বেলা যেটি relevant analysis সেটি মুখ্যতঃ subjective; তবে তার objective কাঠামো অবশ্যই আছে। কেন না, জপ মুখ্যতঃ স্থূলকে অবলম্বন করে একটা অভ্যারোহ কর্ম। আর, এ অভ্যারোহটি ঘটে থাকে মুখ্যতঃ সাধকের আপন আস্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা এবং ঊর্দ্ধতন লোকের "অনুগ্রহ" এই দুয়ের সুসঙ্গত "পরিণয়ে"। এই পরিণয়টিই বিশেষভাবে শেখায় জপকে ছন্দোগ হতে। ছন্দোগ হলে না অধ্বগ ও ধামগ! যে পর্যন্ত এবং যে পরিমাণে সেটা স্থূলে চলে, সে পর্যন্ত এবং সে পরিমাণে সেটা স্থূলের "শাসন" মেনে চলেই। সে শাসনটা কি ধরণের তা জানলে লাভই আছে। কেননা, সেটাকে অতিক্রম করে উঠতে হবে যে! যার "আঁত-ঘাঁত (মর্ত্তস্য ধূর্তিঃ)" জানিনে, তাকে সহজে এড়িয়েই বা যাই কি করে? আর, শুধুই—কি এড়িয়ে যাওয়া? তাকেও (অর্থাৎ তার ছন্দের শাসনটাকে) আপন মিত্রচ্ছন্দে পেতে হবে যে আমাকে! জপ প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানের ও আনন্দের ভূমিতে যেতে যেতে তাদেরও আপন আপন "ঋত" (Law) গুলোকে নিজের "মিত্র" করে নিতে থাকে। সবই "স্বারসিক" হতে থাকে। এইটের নিমিত্ত শ্রদ্ধা, ভাব-ভক্তি ত মূলে চাই-ই, তা ছাড়া বিদ্যা এবং উপনিষদেরও সাক্ষাৎ উপযোগ আছে। এবম্বিধ ক্রিয়ার ফলে এই

"কারবারী" প্রাকৃত অনুভবের জগৎ থেকে সেতুর পর সেতু পেরিয়ে, নতুন নতুন অনুভূতির জগতে গিয়ে পৌঁছুতে হবে। আমাদের "এই" প্রাকৃত অনুভূতিটিকে যদি বলি ভূঃ, আর এর অতীত সেই দিব্য অনুভূতি ও দৈবীসম্পৎকে যদি বলি স্বঃ, তবে এ দুয়ের সেতু হল ভুবঃ। আবার দৈবীঅনুভূতির যেটি পরাকাষ্ঠা বা পরমতা সেটি "তুরীয়"। জপ তাই চতুষ্পাৎ। সেতু কিন্তু প্রায় "পদে পদে" পেরুতে হয়। এক এক সেতু পেরুলাম, আর আগেকার "হাল চাল" বদলে গেল। গোড়ায় যেখানে বিধিনিষেধের নাগপাশ, সেতু পেরিয়ে দেখি, সে নাগপাশ এলিয়ে এসেছে—একটা স্বতঃস্ফূর্ত উন্মেষের দেশে এসে পড়ছি। আরও এগিয়ে চল, আবারও সেতু পেরোও। কৃপার ("করে পাওয়ার") সন্ধান—যেটি গোড়ায় কুণ্ঠিত ছিল,—"অপাবৃত" ছিল, পূরাপূরি মিলতে লাগল। এইভাবে চলতে হবে। পূর্ব পূর্ব ভূমির "আইন"গুলো উত্তর ভূমিতে "নাকচ" হয় না, বদলে আর এক রকম হয়ে যায় তনুরজাঃ হয়; সত্ত্ববিশাল হয়। আচ্ছা, এ যাত্রা কি আখেরে আমার, না তোমারি? "যাবন্নদ্যা নদীনাথে নৈকান্তিক-সমর্পণ। মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছ্বাসো বেতি জল্পনা।" (জপসূত্রকারিকা)। নদীনাথে ঐকান্তিক সমর্পণটি হবার আগে পর্যন্তই নদী ভাবে—আমার বুকের এ উচ্ছ্বাস কি আমার, না তোমার? কিন্তু পূর্ণসমর্পণে?

জপসূত্রম্

ওঁ

শ্রীশ্রীগুরুপাদাব্জদলপঞ্চকম্

তিস্রো মাত্রাঃ প্রসন্নাস্ত্রিতয়মপি ভৃশং ঘ্নন্তি শিষ্যে মলানাং
কোষা নির্মোকজাড্যং জহতি চ বিমলা ভর্গসে ভান্তি পঞ্চ।
সেতুর্যাঽপ্যর্দ্ধমাত্রা নয়তি চ পরমং ব্যক্তমব্যক্তভাবং
মাত্রাক৯প্ত স্ত্বমাত্রো নিয়ত উরুযশাঃ শ্রীগুরুস্তারমূর্ত্তিঃ॥ ১॥

শ্রীগুরু হইতেছেন 'তার' বা প্রণব বা ওঁঙ্কারের মূর্তি। ওঁঙ্কারের যে ত্রিমাত্রা—অ, উ, এবং ম—তাহারা প্রসন্ন হইলে শিষ্যের যে ত্রিবিধ মল, অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ মল, অথবা যাহাকে অণু, তনু ও পৃথু মল, অথবা তন্ত্রোক্ত আণবাদি মল বলিয়াও নির্দেশ করা যাইতে পারে, সেই ত্রিবিধ মলকে নাশ করিয়া থাকে, এবং অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়—এই পঞ্চকোষের যে জড়তা, তাহার পরিহার ঘটায় এবং অতি বিশুদ্ধ যে ব্রহ্মবর্চস বা তেজঃ তাহাকে প্রকাশিত করিয়া দেয়।

ওঁঙ্কারের যে অর্দ্ধমাত্রা, তাহা ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত তত্ত্বে লইয়া যাইবার সেতুস্বরূপ। এই অর্দ্ধমাত্রাকে আশ্রয় না করিলে কিছুতেই সে পরম অব্যক্ত তত্ত্বে প্রবেশ করা যায় না। একদিকে ব্যক্তরূপ—যাহা অ, উ, ম—এই ত্রিমাত্রার দ্বারা গৃহীত হয়, আর একদিকে পরম অব্যক্ত, যাহা অমাত্র বা মাত্রাতীত, অর্থাৎ কোনো মাত্রা দ্বারা গৃহীত হয় না—এই দুইয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত ওঁঙ্কারের অর্দ্ধমাত্রা। ইনি নিত্যা ও বিশেষরূপে অনুচ্চার্য্যা। ইনি হইতেছেন এই দুইয়ের সংযোগকারক সেতু, অর্থাৎ ইঁহাকে আশ্রয় করিলেই ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে প্রবেশ লাভ হয়।

ওঁঙ্কারের মধ্যে ছন্দঃ, প্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত এবং তাহা হইতে জাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পুটিত থাকে বলিয়া ওঁঙ্কারের যে শক্তি তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু

এই শ্রীগুরুরূপে প্রকট যে প্রণবমূর্তি তিনি নিয়ত যশোমণ্ডিত—তাঁহার মধ্যে সর্বশক্তি সম্যকভাবে প্রস্ফুটিত। তিনি সর্বলোকনয়নগোচর হইয়া তাঁহার অনন্ত মহিমা খ্যাপন করেন। এই ওঁঙ্কারের প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে মাত্রাতীত বা অমাত্র। এই মাত্রাতীত স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তিনি ত্রিমাত্রা এবং অর্দ্ধমাত্রার মধ্যে কৢপ্ত বা কল্পিত।

ওঁঙ্কারের ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্রা—এই পঞ্চাবয়বের সহিত শ্রীগুরুর অভিন্নতা নির্দেশই এই প্রথম শ্লোকের লক্ষ্য॥ ১॥

গন্ধেন স্থূলসূক্ষ্মং যদশিতমিতরদ্ বা পুনীতেঽসবশ্চ
যস্যাস্যাব্জপ্রকাশাদমৃতরসকণৈরাচরন্তীহ সাধু।
রূপং চেতঃ পুনীতে রুতিরবতি ধিয়ং স্পর্শ আনন্দমাত্রা
গন্ধাদ্যৈঃ পঞ্চশুদ্ধীর্বহতি স পরমোঽস্পর্শশব্দাদিতত্ত্বঃ॥ ২॥

শ্রীগুরুর যে দিব্য অঙ্গগন্ধ, তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম ভোগ্য, তাহাদিগকে শুদ্ধ করে। যাহা অন্নরূপে অশিত কিনা ভক্ষিত হয়, শুধু তাহাই নহে, অন্যান্য সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাও যাহা আহৃত হয়, সেই সমস্ত আহারই শ্রীগুরুর দিব্য অঙ্গগন্ধ দ্বারা শোধিত হইয়া যায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের আহারশুদ্ধিই হইতেছে শ্রীগুরুর দিব্য অঙ্গগন্ধাস্বাদনের ফল। ইহা ক্ষিতিতত্ত্বের শুদ্ধি।

শ্রীগুরুর বদনকমলের যে মধুর হাস্য, তাঁহার নয়নকমলের যে প্রসন্ন দৃষ্টি, তাঁহার মুখকমলাবয়বের যে শান্ত, স্নিগ্ধ মধুর ভঙ্গী—তাহারা সকলে যে অমৃতরস ক্ষরণ করিতে থাকে, তাহার দ্বারা শিষ্যের আচার শুদ্ধ হইয়া যায় এবং সে তখন সাধু, শোভন অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীগুরুর পরম সুন্দর, পরম রমণীয়, শুদ্ধ মধুর বিমোহন ভঙ্গী দর্শনে প্রাণ পুলকিত হয় ও শুদ্ধ হয়। প্রাণশুদ্ধির ফলে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান পবিত্র হইয়া যায়। যে একবার শ্রীগুরুর প্রসন্ন ভঙ্গিমা দর্শন করিয়াছে এবং তাঁহার প্রসাদ অনুভব করিয়াছে, যে শ্রীগুরুর মুখপদ্ম হইতে ক্ষরিত অমৃতরসকণা পানের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার দ্বারা আর অসাধু অশোভন কর্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহা অপ্‌তত্ত্বের শুদ্ধি।

শ্রীগুরুর বিশ্ববিমোহন রূপ যাহার মনোমধ্যে প্রতিফলিত হয়, যে সর্বদা সেই মনোহর মূর্তির ধ্যান করে, যাহার চিত্ত সেই শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, পরম পবিত্র মূর্তির

দ্বারা সর্বদা ভরিত হইয়া থাকে, তাহার চিত্ত বা বিচার শুদ্ধ হইয়া যায়। অন্য কোনো চিন্তা বা বিচার আর তার মনে স্থান পায় না। শ্রীগুরুর বিশুদ্ধ মূর্তির ধ্যানে মন তার নিবিষ্ট হইয়া যায় ও পবিত্র হইয়া উঠে। ইহা তেজস্তত্ত্বের শুদ্ধি।

শ্রীগুরুর মুখনিঃসৃত বাক্য দ্বারা শিষ্যের ধী অর্থাৎ বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। শ্রীগুরুই সর্বধীসাক্ষী। শ্রীগুরুর বাক্যের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা শিষ্যের বুদ্ধি সৎপথে চালিত হয়। শ্রীগুরুবাক্যই মহামন্ত্র। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্। শ্রীগুরুর বাক্য, শ্রীগুরুর উপদেশ হৃদয় মধ্যে থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরক হয়। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে, বুদ্ধিকে ফুটাইয়া তুলিতে শ্রীগুরুবাক্যের ন্যায় শক্তিধর আর কিছুই নাই। শ্রীগুরু-বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিলে বুদ্ধি আর বিপথে চালিত বা প্রচারিত হইতে, ছড়াইতে পারে না। তাই শ্রীগুরুবাক্যই প্রচারশুদ্ধির হেতু। "যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ"—বুদ্ধির পারে যে পরতত্ত্ব তার উপলব্ধির উপায়ও গুরুবাক্য হইতেই হইয়া থাকে। ইহা আকাশতত্ত্বের শুদ্ধি।

কিন্তু তৎপূর্বে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের দিব্য স্পর্শ শিষ্যের সর্বাঙ্গে আনন্দলহরী তুলিয়া দেয়। শ্রীচরণস্পর্শমাত্রই শিষ্য কি যেন এক দিব্য আনন্দ, কি যেন এক মধুর শিহরণ, কি যেন এক দিব্য পুলক অনুভব করে। কি যেন এক শক্তির সঞ্চার এই স্পর্শের ফলে ঘটে। জীবের স্বাভাবিক আনন্দমাত্রার পোষণ ও পরিপূরণে ইহা সর্বোত্তম। এটি বায়ুতত্ত্বের শুদ্ধি।

যদিও শ্রীগুরুর এই অঙ্গগন্ধ, মুখপদ্মের অমৃতরসকণা, অপরূপ রূপ, শুদ্ধ শান্ত হৃৎকর্ণরসায়ন শব্দ এবং আনন্দময় স্পর্শ—আহার, আচার, বিচার, প্রচার ও সঞ্চার—এই পঞ্চবিধ শুদ্ধি আনয়ন করে, তবুও পরমার্থতঃ শ্রীগুরু কিন্তু অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ, অরস অর্থাৎ ব্রহ্মাভিন্ন, ব্রহ্মস্বরূপই। ইহাতে মূল শুদ্ধি, কিনা, মূলাবিদ্যার শুদ্ধি। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ শ্রীগুরুতত্ত্বের পর্যবসান হইলেও শ্রীগুরু ভগবানের প্রকৃতিত্রয়ের (অপরা, পরা, পরমা) এবং শক্তিত্রয়ের (অন্তরঙ্গাদি) ত্রিবেণীসঙ্গম। সুতরাং স্থূল হইতে পরম পর্যন্ত সকল "গ্রামেই" গুরুতত্ত্বের প্রকাশ এবং প্রভাব। কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।

অতএব মূলসহিত পঞ্চশুদ্ধির কারক যে শ্রীগুরু তাহাই এই দ্বিতীয় শ্লোকে দেখান হইল॥ ২॥

বাগ্‌বুদ্ধিপ্রাণমূলং গময়তি কৃপণং ভ্রষ্টমূলং গবর্ণে।
মূর্ধন্যেনাপি ধাম্না রসয়তি বিধুরং ক্ষয্যতৃষ্ণং রকারঃ।
উচ্ছেদং মোহমূলং বিমলসমুদয়ং নেষ্যতো দ্বাবুবর্ণৌ
নীয়াচ্ শীর্ণং শ্রিয়ৈ শ্রীঃ পরমমুপরমং শ্রীগুরৌ যো বিসর্গঃ॥৩॥

'শ্রীগুরুঃ' এই পদটির মধ্যে পাঁচটি বর্ণ আছে। শ্রী, গ, উ, র, উ এবং বিসর্গ এই পাঁচটি। দুইটি, উকে একটি বর্ণই ধরিতে হইবে। এখন 'গ' কারের উচ্চারণস্থান হইতেছে জিহ্বামূল। ইহা কি সূচনা করিতেছে? মূল হইতে ভ্রষ্ট যে দীন জীব, তাহাকে বাক্ বুদ্ধি ও প্রাণের মুলে যে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মতত্ত্ব রহিয়াছেন, সেই আত্মতত্ত্বকে প্রাপ্ত করায় এই 'গ' বর্ণ। আর 'র'কারের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। সুতরাং ইহা যেন জানাইয়া দিতেছে যে 'গুরু'শব্দস্থ 'র'কার ক্ষয়শীল বিষয়ে তৃষ্ণাযুক্ত অথবা যার তৃষ্ণা ক্ষয়প্রবণ হইয়াছে, এমন কাতর জীবকে মূর্দ্ধাস্থিত তেজঃ বা প্রকাশ দ্বারা সঞ্জীবিত করে। আর দুইটি 'উ'কারের মধ্যে একটি মোহের মূলে যে অবিদ্যা তাহাকে উৎপাটিত করে, অর্থাৎ সমূলে বিনাশ করে, এবং আর একটি বিমল তত্বজ্ঞানের উদয় করে। একটি 'উ'কারের দ্বারা অজ্ঞানের **উচ্ছেদ**, আর একটি 'উ'কারের দ্বারা জ্ঞানের **উদয়** বুঝাইতেছে। এতদ্‌দ্বারা একভক্তিরূপ যে উৎকৃষ্ট জ্ঞান তাহাও বুঝিতে হইবে। 'উ'কারের এই দ্বিবিধ বৃত্তি। উকারের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। এই ওষ্ঠ দ্বারা সব বর্ণ নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ কোন কোন স্থলে ছিন্ন (inhibited) হয় এবং ইহা দ্বারাই আবার বর্ণের বহিঃপ্রকাশ বা উদয়ও (exhibition বা expression) ঘটিয়া থাকে। ইহা আমাদের মুখে (এবং লক্ষণায় সৃষ্টির সর্বত্র) যেন valve-এর মত কাজ করে—সবকিছুর গতাগতি ইহাই যেন নিয়ন্ত্রিত করে।

এখানে আরও লক্ষ্য করিতে হইবে যে; 'নেয্যতঃ' পদে ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ দ্বারা এই অজ্ঞান-উচ্ছেদ ও জ্ঞান-উদয় যে পরে ক্রমশঃ হইবে—তাহাই দেখান হইয়াছে। কিন্তু প্রথম দুইটিতে 'গময়তি' ও 'রসয়তি' পদে বর্তমান কাল প্রয়োগের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে এদুটি—অর্থাৎ বৃথা অমূলক বস্তুর পিছনে ভ্রাম্যমাণ জীবের মূলাভিমুখে গমন ও বিষয়তৃষ্ণাকাতর জীবের দিব্যরস আস্বাদন—শ্রীগুরুর কৃপালাভের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে।

আর আদিতে শ্রী শব্দটি, যাহা শীর্ণতার দরুণ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে শ্রীসম্পন্ন সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তোলে—ইহাই বুঝাইতেছে। আর 'শ্রীগুরুঃ' পদে সর্বশেষে যে বিসর্গ, তাহার দ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চোপশমাত্মক পরম উপরম বা শান্তং শিবং অদ্বৈতং রূপ পরম তত্ত্ব সূচিত হইতেছেন। তাহা হইলে শ্রীগুরুঃ পদের পাঁচটি বর্ণ—মূল তত্ত্ব প্রাপণ (গময়তি), তেজঃসঞ্চার বা বলাধান (রসয়তি), অজ্ঞানের উচ্ছেদ এবং জ্ঞানের উদয় এবং অভ্যুদয় (শ্রী) ও উপশমাত্মক জ্যোতীরসাভিন্ন পরম মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স—(বিসর্গ)—এই পাঁচটিকে সূচনা করিতেছে। শ্রীগুরুঃ এই মন্ত্রটি বা শব্দটির মধ্যেই এত অপূর্ব রহস্য!

প্রত্যঙ্‌নিষ্ঠঃ স ধীরঃ পরিহরতি সনাৎ সংগ্রহাদ্ বৈ পরাঞ্চি
যস্যাঙ্গীকারলেশাৎ প্রভবতি বিশদং ব্রহ্মসৌখ্যং চ দৌঃস্থ্যে।
লীয়েতামূর্ত্তমাত্রং ঘটপটবিষয়ং বিগ্রহাদ্ যস্য মূর্ত্তং
কারুণ্যেনাবতীর্ণং জয়তু শিবগুরোরঙ্ঘ্রিজং পঞ্চগঙ্গাম্॥ ৪ ॥

শ্রীগুরু পরাঙ্‌মুখী বা বহির্মুখী সমস্ত বৃত্তিকে প্রত্যঙ্‌মুখী বা অন্তর্মুখী করিয়া শিষ্যকে ধীর করিয়া দেয়, যাহাতে সে বাহিরের বিষয়ে আবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া অন্তরাত্মাকে, প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে। বাহিরে বহুদিকে প্রসারিত, বহু বিষয়ে প্রধাবিত শক্তিনিচয়কে সংগ্রহশক্তি দ্বারা শ্রীগুরু প্রত্যঙ্‌মুখী করিয়া দেন।

আর দুর্দশাগ্রস্ত দুঃস্থ জীবকে শিষ্যরূপে অঙ্গীকার করিবামাত্র তিনি তাহাকে পরম প্রসন্ন যে ব্রহ্মানন্দ তাহা অনুভবযোগ্য করাইয়া দেন। এই শিষ্যরূপে স্বীকার বা প্রতিগ্রহ দ্বারা, এই অঙ্গীকারের লেশমাত্র দ্বারাই ত্রিবিধ তাপক্লিষ্ট দুঃখতপ্ত জীবকে তিনি সর্বোত্তম ভজনানন্দ এবং অপার ব্রহ্মানন্দের অনুভবযোগ্য করিয়া তোলেন। ইহাই তাঁর প্রতিগ্রহশক্তির মহিমা।

আর শ্রীগুরুর বিগ্রহশক্তি দ্বারা তিনি মূর্ত হইয়া প্রকটরূপে দেখা দিয়া অর্থাৎ দেহরূপ বিগ্রহধারী হইয়া মূর্ত বা স্থূল ঘট-পটাদি বিষয়কে অমূর্ত পরমতত্ত্বে লীন বা লয় করাইয়া দেন। নিজে স্বরূপতঃ অমূর্ত হইলেও মূর্তি ধরিয়া আসিয়া মূর্তকে অমূর্তে

লইয়া যাইবার কারণ হন। এমনই তাঁর মূর্তি ধারণের বিচিত্র রহস্য! যে মূর্তি তিনি ধারণ করেন সেটিও 'অমায়িক, অপ্রাকৃত'।

এই মূর্তবিগ্রহরূপে যে তাঁর অবতরণ ইহাই তাঁর পরিগ্রহ শক্তি। শ্রীভগবানের অবতাররূপ পরিগ্রহ নৈমিত্তিক, কিন্তু শ্রীগুরু-বিগ্রহরূপে অবতরণ নিত্য। কালেনানবচ্ছেদাৎ। মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।

এই সব—তাঁহার সংগ্রহ, প্রতিগ্রহ, বিগ্রহ, এবং পরিগ্রহ—সবই তাঁহার করুণা, তাঁহার অনুগ্রহশক্তিরই লীলা, অনুগ্রহশক্তিরই রূপায়ণ।

শিবের মস্তক হইতে মা গঙ্গার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু শিবের প্রকটমূর্তি শ্রীগুরুর শ্রীচরণ হইতেই গঙ্গার উদ্ভব। হরজটাজাল হইতেও আবার একটি মাত্র গঙ্গার উৎপত্তি, আর এখানে সাক্ষাৎ শঙ্করমূর্তি শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্ম হইতে কিন্তু পঞ্চগঙ্গার আবির্ভাব হইয়াছে।

সংগ্রহ, প্রতিগ্রহ, বিগ্রহ, পরিগ্রহ এবং অনুগ্রহ এই পঞ্চশক্তিরূপা পঞ্চগঙ্গা, শ্রীগুরুর এই শক্তিধারা পরমপাবনী মন্দাকিনী ধারার মতই শুদ্ধকরী।

ভারং কর্ম্মার্পিতমতিগুরুং ঘোরতাদিপ্রবৃদ্ধং
মগ্নামূর্বীমিব পয়সি যো লীলয়াপ্যুদ্দিধীর্ষুঃ।
ধত্তে বীজং শ্রুতিপথচরং বর্চসে চাত্মমন্থং
ক্লেশব্যূহচ্ছিদুরুমখভৃচ্ শ্রীগুরুঃ পঞ্চমূর্ত্তিঃ॥ ৫॥

অনন্ত জন্মার্জিত কর্মের গুরুভারে শিষ্য যখন একেবারে অতল জলধিজলে ডুবিয়া যাইতে থাকে, ঘোর, মূঢ় প্রভৃতি গুণের দ্বারা ঐ কর্মভার যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতে থাকে, তখন প্রলয়পয়োধিজলে পৃথিবী মগ্ন হইয়া যাইবার সময় শ্রীভগবান বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া যেমন দংষ্ট্রা দ্বারা বসুন্ধরাকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীগুরুও গুরুভারাক্রান্ত পৃথিবীর ন্যায় অনন্ত কর্মভারাক্রান্ত শিষ্যকে 'লীলয়া' অর্থাৎ অনায়াসে বা করুণাবশতঃ ঊর্দ্ধে ধারণ করেন, উদ্ধার করেন।

আবার শ্রীগুরু শ্রুতিপথে বীজমন্ত্র ধারণ করেন। এই মন্ত্র হইতেই আত্ম-চৈতন্য উদ্ভাসিত হয়। মীন অবতারে যেমন শ্রীভগবান সমস্ত পৃথিবীর বীজ ধারণ করিয়াছিলেন

এবং তাহা হইতেই সমস্ত পৃথিবী (এখানে পৃথিবী—Earth নয়। পৃথু, কিনা, বিস্তারিত ভাবে থাকার "ভূমি" হইল পৃথ্বী বা পৃথিবী) পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল, শ্রীগুরুও তেমনি এই বীজমন্ত্র ধারণ করেন ও শিষ্যের শ্রুতিপথের গোচর করেন এবং এই বীজ হইতেই মূলতত্ত্ব আবির্ভূত হয়। আত্মবস্তু সর্বদাই বিদ্যমান, তথাপি তাহার যেন বীজমন্ত্র হইতে আবির্ভাব হয়। উপলব্ধিই তাহার আবির্ভাব। সমস্ত সৃষ্টিও বীজাকারে থাকে, পরে এই বীজ হইতে পুনরায় আবির্ভূত হয়। আবার, কূর্ম অবতারে যেমন শ্রীভগবান সমুদ্র মন্থনের সময় মন্থনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীগুরুও সেইরূপ ব্রহ্মবর্চঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত শিষ্যের আত্মাকে মন্থন করিবার দণ্ড স্বয়ং ধারণ করিয়া থাকেন।

পুনঃ, নৃসিংহ অবতারে শ্রীভগবান যেমন হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীর পাপ হরণ করিয়াছিলেন, তেমনি শ্রীগুরুও শিষ্যের ক্লেশব্যূহ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চক্লেশের সমষ্টিকে নিঃশেষে বিনাশ করেন।

শেষ, বামন অবতারে শ্রীভগবান উরুক্রমরূপে যেমন বলির যজ্ঞকে ভরণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে শ্রীগুরুও শিষ্যের 'উরু', কিনা, বিস্তীর্ণ পদবী বা অভ্যুদয় লাভের জন্য যে 'মখ', কিনা যজ্ঞ, তাহাকে ভরণ বা পালন করিয়া থাকেন।

এইরূপে শিষ্যকে ঊর্দ্ধে ধারণ, তার বীজমন্ত্র সংরক্ষণ, তার মন্থনদণ্ড ধারণ, তার ক্লেশ বিদারণ ও স্বাধ্যায়াদি যজ্ঞভরণরূপ পঞ্চকর্ম দ্বারা দেখান হইল শ্রীগুরু একাধারে মীন, বরাহ, কূর্ম, নৃসিংহ এবং বামন এই পঞ্চাবতারের প্রকট মূর্তি॥ ৫॥

মন্তব্য:—'ওঁঙ্কার শব্দটি অনেক স্থলে এভাবে লিখিবার হেতু, শেষ প্লুতধ্বনিটির নির্দেশ। অর্থাৎ, মকারে যাইয়াই প্রণবের সহসা ধ্বনি বিরাম হইতেছে না। পুনশ্চ, 'ভর্গ' শব্দটিকে অকারান্ত না করিয়া 'স্'কারান্ত করাতেও মূলীভূত প্রাণ প্রযত্ন বিশেষের আকৃতিটি (Pranik Function Pattern) সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট হইতেছে। বেদাদি মন্ত্রশাস্ত্রে এবম্বিধ 'মূল আকৃতি' গুলিই দেখিতে পাই। লৌকিক প্রয়োগে শক্তি এবং আকৃতি উভয়েরই সঙ্কোচ ঘটিতে দেখা যায়।

শ্রীগুরুপঞ্চকে যে 'অর্দ্ধমাত্রা', সেটি জপসূত্রে বিশেষ সূত্রদ্বারা লক্ষিত এবং কারিকায় আলোচিত হইয়াছে। এটি একটি মৌলিক রহস্য। বলা বাহুল্য, 'অর্দ্ধ' মানে

'অর্দ্ধেক' নয়। পরে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইবে এমন একটা 'পরিচয়' শ্লোক এখানে সানুবাদ দেওয়া হইতেছেঃ—

অব্যক্তস্ফোটযোনিঃ স্ফুটমুদয়মিতা চোর্মিরূপাস্তি মাত্রা
স্ফোটণ্ডাব্যক্তমাপ্তা স্বরসলিলচয়ে বীচিবিশ্রান্তিমেতি।
ব্যক্তের্গ্রামানভীত্য প্রসরতিতনুগা ঋর্ধ্যমানা স্ববৃত্তৌ
দ্বে কাষ্ঠে নাদবিন্দু ত্বসকলযুগলা সাঽর্দ্ধমাত্রা হ্যমাত্রম্॥

আমাদের বোধে অব্যক্ত কিন্তু পূর্ণবোধে যে নিত্য অকুণ্ঠিত স্ফুটীভাব (স্ফোট), সেটি এক নিস্তরঙ্গ অগাধ মহোদধিতুল্য, অথচ বিশ্ববোধে অসংখ্যেয় শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়রূপে সেটি আবার তরঙ্গায়িতও হইতেছে। সেই অব্যক্ত স্ফোটের আধারে ঊর্মিরূপে জাত হইয়া যেটি স্ফুট আকারে উদিত হইতেছে, সেটিকে (মূল আকৃতিভাবে—as Pattern) দেখিলে বলা যায় 'মাত্রা'। অর্থাৎ সমস্তই মূলতঃ স্পন্দ এবং ঊর্মিরূপে উদিত হইতেছে। উদিত হইয়া তার বীচিরূপের বিশ্রাম ভূমি কোথায় পায়? নিখিল অভিব্যক্ত স্বরাদির 'সলিলচয়', কিনা লীনতার স্থান যে অব্যক্তস্ফোট, তাকেই আবার প্রাপ্ত হয়। যাহাতে উৎপত্তি তাহাতেই ফিরিয়া শান্ত হয়। এই উত্থান এবং অবসানের মধ্যে যে অভিব্যক্তি, সেটি নানা গ্রামে, নানান্ পরদায় হইতেছে। যখন কোনও গ্রামে অভিব্যক্তি হয়, তখন সে গ্রামটিকে ঊর্দ্ধ এবং অধঃ (ultra এবং infra) উভয় দিকেই অতিক্রম করিয়া মাত্রা (Measure Principle) সূক্ষ্মগতি (তনুগা) হইয়া স্বকীয় বৃত্তিতে (স্বকীয় সামর্থ্যে ও ছন্দে) 'ঋধ্যমান' হইতে থাকে। এই যে ঋধ্যমানতা (Progression) ইহার দুই দিকে সীমা ('কাষ্ঠা')—একটি বিস্তারের দিকে (নাদ), অপরটি কেন্দ্রীণ ঘনীভাবের দিকে (বিন্দু)। দুটি কাষ্ঠার অভিমুখে অসংখ্য অভিব্যক্ত 'কলায়' মাত্রার এবম্বিধ যে ঋধ্যমানতা, তাই 'অর্দ্ধমাত্রা'। অর্দ্ধমাত্রা একদিকে নাদ অপরদিকে বিন্দু পর্যন্ত ঋধ্যমানতার পরিপূর্ণ রূপ। আবার, 'অসকলযুগলা', কিনা, নাদবিন্দুকলাতীত বা রহিত রূপে এটি হইতেছে. 'অমাত্রম্'॥

জপসূত্রম্

অথ জপসূত্রে
উপোদ্ঘাতঃ।

নাস্ত্যস্তীতি প্রতীতৌ নিয়তমনুগতং শ্রৌতসত্যং হ্যনন্তং
ভানেঽভানে বিভাতি প্রতিপদবিদিতং জ্যোতিষাং জ্যোতিরাবিঃ।
ভূয়স্ত্বেনৈব কাষ্ঠা শ্রুতিগণশিখয়াঽদর্শি যো বৈ রসঃ স
ভূমেতি প্রত্যগাত্মাঽস্ত্বনপিহিতমুখঃ শ্রেয়সে প্রেয়সে বঃ॥ ১॥

ঘটশরাবাদি পদার্থে মৃত্তিকা যেমন নিয়ত অনুগত থাকে, সেই প্রকার অস্তি এবং নাস্তি—এই উভয় প্রকার প্রতীতিতে অস্তিতামাত্ররূপ যে সৎ নিয়ত অন্বিত রহিয়াছে, তাহাই উপনিষদ্-প্রতিপাদ্য সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম। দেশ, কাল, বস্তু ও সম্বন্ধজন্য কোনো পরিচ্ছেদ তাতে নাই এবং কোনোপ্রকার অভাবের প্রতিযোগী বিষয়ও সেটি নয়; সুতরাং সেই সৎ অনন্ত। পুনশ্চ, জাগ্রৎ, স্বপ্নাদি অবস্থায় যখন বিষয়ের ভান হয়, অথবা সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদিতে যখন কোনো বিষয়ের ভান হয় না, তখনও চিজ্জ্যোতিরূপে সাক্ষাৎ নিরবচ্ছিন্ন এটি স্ব-প্রকাশ; ইহা সকল জ্যোতির জ্যোতিঃ এবং ইহার প্রকাশেই আর সমস্তের প্রকাশ হইয়া থাকে এবং এই স্ব-প্রকাশ সংবিদের উদয়-অস্তও নাই। এই সংবিৎ প্রতিবোধ-বিদিত, অথচ ইহা বিদিত ও অবিদিত—এই দুইএর কোনোটাই নয়। বস্তুতঃ ইহা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। শ্রুতিগণশিখা, বেদশিরোমণি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে "ততো ভূয়ঃ" এই ক্রমে যে শেষ সীমা দেখাইয়াছেন, তাহা হইতেছে সাক্ষাৎ সুখ বা রসস্বরূপ ভূমা। অল্পে, খণ্ডিতে, পরিচ্ছিন্নে তাহা নাই। অতএব, সদ্বস্তু কেবল যে অনন্ত এবং জ্ঞানস্বরূপ, এমন নয়—ইহা আবার নিরতিশয় সুখস্বরূপ। সেই ভূমা প্রত্যগাত্মা (Inner Self) রূপে সর্বভূতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। প্রবিষ্ট হইয়া আপন মায়াশক্তিতে সেই সত্য প্রত্যগাত্মার স্বরূপ (সাক্ষী, চেতয়িতা, রসয়িতা, বিভর্তা) আবরণ করিয়াছেন।

তোমাদের স্বরূপ-জ্ঞানরূপ শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত এবং পরমানন্দরূপ প্রেয়োলাভের জন্য সত্যের সেই মুখ নিরাবরণ হউক্॥ ১॥

হংসো যো হংসবত্যামৃচি ঘৃণিরিতি বা প্রাণ ইত্যেবমৃচে
গায়ত্র্যা যদ্ বরেণ্যং প্রণব ইতি গিরোদীরিতঞ্চাপি ভর্গঃ।
গা মাধ্বীরিন্দুবিন্দুনৃগপি মধুমতী মন্ত্রবর্ণৈরদুগ্ধ
সূর্য্যো বহ্নিশ্চ সোমঃ সপদি বিজয়তামৈকপদ্যেন হৌংসঃ॥ ২॥

হংসবতী ঋক্, যাঁকে 'হংস' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন, অন্যত্র যিনি 'ঘৃণি' কিম্বা 'ভাস্বান্' প্রাণরূপে কথিত হইয়াছেন; গায়ত্রী ঋক্ ওঁঙ্কার এই বাকের দ্বারা যে বরেণ্য জ্যোতিঃকে কীর্তন করিয়াছেন; মধুমতী ঋক্ "মধু বাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণের দ্বারা যে অমৃতবর্ষিণী গাভীকে দোহন করিয়া সোমবিন্দু বর্ষণ করিয়াছেন, সেই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য গুহ্যাতিগুহ্য হংস, বহ্নি, ও সোম "হৌংসঃ" এই মহাবীজে একপদে মিলিত হইয়া জয়যুক্ত হউন্॥ ২॥

আবীরূপেণ নাদঃ সমজনি বিততং ব্যোম বিশ্বাশ্রয়ং যদ্
গত্যাত্মা সোঽপি হংসো জগদুদয়লয়ক্রান্তবৃত্তিশ্চ বায়ুঃ।
রূপাণাং চিত্রশালাং স মনসি চ বহির্নির্ম্মমে নাম বহ্নিঃ
সর্ব্বেষাং লীনতৌকঃ সলিলমিতি পুনর্ধারণেঽভূদ ধরিত্রী॥ ৩॥

সৃষ্টির অভিমুখে ব্রহ্মের যে আদিম অভিব্যক্তি তাহা হইতেছে আবিঃ এবং সৃষ্টির মূলীভূত পরাবাক্‌রূপে ব্রহ্ম হইতেছেন (পরম) নাদ। এতদুভয়ের সম্মিলনে, অর্থাৎ পরাবাক্ আবীরূপে,—প্রণব। এই প্রণবের মূল অভিব্যক্তি সর্বাশ্রয় এবং সর্বব্যাপী আকাশ। সেই সর্বাশ্রয়, সর্বব্যাপী আকাশ পরিদৃশ্যমান ভূতাকাশ, এমন কি মহাকাশ মাত্র নয়; ইহা ব্রহ্মাকাশ, আকাশরূপ সচ্চিদানন্দ সামগ্রী। এই নিমিত্ত কেবল মাত্র স্থূলসৃষ্টির আধার ইহা নয়; সূক্ষ্ম এবং কারণেরও আধার এই আকাশ। এইটি ব্রহ্মের অথবা তদ্‌বাচক প্রণবের আবার মূল আবীরূপ। এই মূল অভিব্যক্তিতেই যখন ক্রিয়োন্মুখ-কারণতারূপ গতি দেখা দেয়, তখন সেটি হয় হংস অথবা প্রাণ। আশ্রয়রূপে দেখিলে যেটি আকাশ, গতিরূপে সেটি প্রাণ, এবং স্বরূপে সেটি আনন্দ।

এই প্রাণ বা হংস জগতের উদয়, স্থিতি এবং লয়ব্যাপাররূপে বৃত্তিমান হইলে হয় কাল ও বায়ু। জগতে অন্তর্বহিঃ যে অপরূপ চিত্রশালা—তার নির্মাতা হইতেছেন দিগ্‌দেশাদিপটচিত্রক অগ্নি বা বহ্নি। এই অনন্ত বৈচিত্র্যের যেটি লীনতার স্থান, অর্থাৎ যেখানে গিয়া সব লয় পায়, তাহাই হইল সলিল। আর যেটি এ সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাই হইল ধরিত্রী বা পৃথিবী।

একটি দৃষ্টান্ত লইয়া এই পাঁচটি তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর। ধর, বায়োস্কোপের চলচ্চিত্র দেখিতেছ। সেখানে প্রথমেই একটি আধারপট বা screen প্রয়োজন, যার উপর ছবিগুলি পড়িবে। এইটিকে আকাশরূপে কল্পনা করিতে পার। তারপর, ছবিগুলি পরপর আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে—এই যে সঞ্চরমাণতা বা গতি—এটিকে বায়ুরূপে দেখ। ছবিগুলির একটি বিশিষ্ট প্রকাশ বা রূপ না থাকিলে তাহা আমাদের নয়নগোচর হইতে পারে না। যাহা ছবিগুলিকে বিস্পষ্ট বা মূর্ত করিয়া আমাদের চোখের সামনে ধরিতেছে, সেই principle বা তত্ত্বটিকে অগ্নি বলিয়া জানিবে। তারপর, ছবিগুলি দেখিতেছি কোনোটাই থাকিতেছে না, চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তারা যাইয়া শেষে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে বা লয় পাইতেছে? একটা জায়গায় নিশ্চয়ই তারা গিয়া আশ্রয় লইতেছে বা জমা হইতেছে। সেই লয়ের বা আশ্রয়ের স্থান হইতেছে সলিল বা অপ্। শেষে, দেখ প্রত্যেকটি চিত্রের বা বস্তুর একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, প্রত্যেকটা অপরটি হইতে স্বতন্ত্র। তাদের এই নিজস্ব বিশিষ্টতাকে বজায় রাখে কে? তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ধারক যদি কোনো তত্ত্ব না থাকিত, তাহা হইলে তো সব মিলিয়া মিশিয়া একরূপ হইয়া (confused) পড়িত। তাহা তো হয় না, প্রত্যেকেই তার স্বকীয়বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখিয়াই চলে। ইহা সম্ভব হয় মূলে একটি ধারক তত্ত্ব থাকার দরুণ। ইহাই ধরিত্রী। পূর্বে বলিয়াছি, আকাশ সব কিছুর ধারক, আবার ধরিত্রীকেও ধারকতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা হইল। কিন্তু এখানে বুঝিতে হইবে, আকাশ সব কিছুর ধারক সামান্যভাবে আর ধরিত্রী বিশেষভাবে, অর্থাৎ নিখিল পদার্থব্যষ্টিকে ধরিয়া আছে। আকাশ তাদের সকলের সামান্য আধার, Common Ground বা Basis রূপে, আর ধরিত্রী প্রত্যেকটির নিজস্ব রূপকে, বিশিষ্ট রূপকে ধরিয়া রাখিয়াছে। মনে রাখিতে হইবে সকল কিছুর পরম আধার প্রথম শ্লোকোক্ত সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব, তারপর, সামান্য আধার আকাশ এবং শেষ, বিশেষ আধার ধরিত্রী।

প্রথমটি সর্বাধার, দ্বিতীয়টি বিশ্বাধার, তৃতীয়টি কৃৎস্নাধার (support of individuality)। প্রকারান্তরে, ধরিত্রী = "এই" প্রতীতির আধার ব্যোম = "এই" এবং "সেই" দুই প্রতীতির আধার; আর অক্ষর পরম = "এই", "সেই" এবং "না-এই-না-সেই" এই তিনেরি আধার। পরে ব্যাখ্যাত হইবে। অতএব, পরম অব্যক্তের আবীরূপ হইতে হইল প্রণব। প্রণবের আবীরূপ আকাশ। প্রণবের প্রাণরূপে প্রকাশ 'হংস' এই মন্ত্র। প্রণবের আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বরূপে প্রকাশ হইতেছে হং, যং, রং,বং, লং—এই পাঁচটি মূল বীজ। ক্ষরাক্ষর সর্ববিধ তত্ত্বই এই গুলিতে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে॥ ৪॥

মীনো বীজানি ধৃত্বা প্রসরতি পয়সি প্রৈধতে গূঢ়সন্ধি
র্নাভাবাসীন ঈষ্টেঽখিলমিহ কমঠঃ সংজরীগৃহ্যতে চ।
উচ্চৈর্ধত্তে বরাহো ভুবমশনিনখৈর্হন্তি দৈতান্নৃসিংহো
যৌষ্মাকীণং সুভদ্রং সপদমপি শিরচ্ছন্দসাং মাতুরব্যাৎ॥ ৪॥

সকল ছন্দের মাতা গায়ত্রী, তাঁর যেটি শির সেটি, সপ্তব্যাহৃতি এবং ত্রিপাদ সহিত, তোমাদের সুমঙ্গল রক্ষা করুন; জীবের সুষুপ্তিতে অথবা প্রলয়ে যখন সকল পদার্থ লীনতা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই লীনতার স্থান সলিলরাশিতে স্বয়ং নিগূঢ়সন্ধি রহিয়া ছন্দোমাতা গায়ত্রী মীনশক্তিরূপে নিখিল বীজ ধারণ করিয়া পুনশ্চ অভিব্যক্তির অপেক্ষায় বিদ্যমান থাকেন; আবার ইনি নিখিল বীজের নাভিতে আসীন হইয়া কূর্মশক্তিরূপে তাদিগকে সংগ্রহ ও শাসন করিয়া থাকেন; ইনিই আবার কালশক্তিকে আশ্রয় করিয়া বারাহী তনুতে বিশ্বভুবনকে অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে ধারণ করেন; এবং নারসিংহী তনুতে যাবতীয় ব্যূঢ় বাধা বিদীর্ণ করেন, যেমন নৃসিংহ তাঁহার বজ্রনখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিয়াছিলেন॥ ৪॥

পূর্বশ্লোকে সৃষ্টির উপাদানরূপে আকাশাদিকে যেমন দেখান হইয়াছে, এখানে তেমনি নিমিত্তরূপে চারিটি অবতার শক্তিকে দেখান হইল। সৃষ্টির সকল বস্তুকে ধারণ করেন মীনশক্তি, তাদের basic pattern, প্রত্যেকটির যথাযথরূপে বজায় রাখেন; আর সব কিছুকে শাসন করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখেন কূর্মশক্তি; আর তাদের ধাপে ধাপে উন্নয়ন বা উদ্‌বর্তন ঘটান বরাহ; এবং বিকাশের পথের সমস্ত

বাধা বিঘ্ন বিদারণ করেন নৃসিংহ। পঞ্চমাবতার বামনের তত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে। এই পাঁচটিই বিশ্বব্যাপী (cosmic) ও নিত্যসক্রিয় (eternally functioning) তত্ত্ব। সর্ববিধ সৃষ্টিতেই এই তত্ত্বপঞ্চক অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। "পৌরাণিক ঘটনা" মাত্র এগুলি নহে। ধর সুষুপ্তি থেকে জাগৃতি; (১) সব কিছু অব্যাকৃতরূপে লীন রহিয়াছে, কিন্তু তাতে তাদের সংস্কারগুলি, পুনরভিব্যক্তির সম্ভাবনাটি বিদ্যমান; (২) প্রতিটি সংস্কার বা বীজ কোনও এক "নাভিশক্তি" (Nuclear Power) দ্বারা সংগৃহীত, শাসিত, যে কারণে তারা অব্যক্ত হইয়াও স্বরূপে (আপন Norm এবং Pattern-এ) বর্তমান; (৩) যেগুলিকে উত্তরোত্তর ফুটাইয়া তোলার কোনও আবেগ (Urge) ও বর্তমান; (৪) তাদের বিকাশের মুখে বাধাগুলি নিরসনের কোনো সামর্থ্যও আছে; (৫) তাদের পরিণতির এক সীমা নির্দেশক—অবধি-নিয়ামক—একটা কিছু আছে। এইটি সীমা এবং সীমার পার এ দুয়েরি নিরূপক হয়। এইরূপ সর্বত্র।

জীবান্তর্য্যামিভেদাদ্ দ্বিবিধগতিরসৌ সংগ্রহাখ্যৈকধারা।
গৃহ্যাতেরাদিতশ্চ প্রতিলিখনবলাল্লভ্যতে যা দ্বিতীয়া।
সা স্পর্শাবেশবৃত্তিবিপরিসহচরী যা তৃতীয়া তুরীয়া
যৈষা-পূর্বানুযোগাৎ প্রবহতি পরমেত্যাশ্রয়েৎ পঞ্চগঙ্গাম্॥৫॥

পঞ্চগঙ্গাকে আশ্রয় কর। সেই পঞ্চগঙ্গার একটি ধারা সংগ্রহাখ্যা বা "সংগ্রহ" নামক। এই সংগ্রহাখ্যা ধারা জীব এবং অন্তর্যামী ভেদে দ্বিবিধ গতি। গ্রহ ধাতুর আদিতে "প্রতি" এই উপসর্গ যোগে "প্রতিগ্রহ" এই যে সংজ্ঞা লাভ হয়, তাহাই হইতেছে দ্বিতীয় ধারা। এই দ্বিতীয় ধারার স্পর্শ এবং আবেশ—এই দ্বিবিধ বৃত্তি। এই ভেদগুলি পরে ব্যাখ্যাত হইবে। "বি" এবং "পরি" দুই উপসর্গ যোগে "বিগ্রহা"খ্যা এবং "পরিগ্রহা"খ্যা—এই তৃতীয় এবং চতুর্থ ধারা। আদিতে "অনু" এই উপসর্গ যোগে 'অনুগ্রহা'খ্যা—এই পঞ্চম এবং পরম ধারা। এই পঞ্চগঙ্গা সৃষ্টির সব কিছুতে অবতরণ করিয়া অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। সুতরাং এই পঞ্চগঙ্গার সমাশ্রয় ব্যতীত বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব,

বিষ্ণুর পরম পদ পাইতে চাহিলে।
পঞ্চগঙ্গা ধারা ধর মহা কুতূহলে॥
'সংগ্রহ' প্রথম ধারা, জীব অন্তর্যামী।
'প্রতিগ্রহ' ধারা পরে স্পর্শাবেশগামী॥
'বিগ্রহ' ও 'পরিগ্রহ' তৃতীয় চতুর্থ।
'অনুগ্রহ' শেষ ধারা পরম পদার্থ॥
এ পাঁচে আশ্রয় ছাড়া না আছে উপায়।
বিষ্ণুর পরম পদ যাহে পাওয়া যায়॥ ৫॥

তিস্রো মাত্রা অকারাদ্যা নাদবিন্দু চ মূর্দ্ধনি।
এবমোঙ্কারমীক্ষস্ব পঞ্চগঙ্গা যথাক্রমম্॥ ৬॥

ওঁঙ্কারকেই যথাক্রমে এই পঞ্চগঙ্গায় দর্শন কর। অকার, উকার, মকার এই তিন মাত্রা এবং মূর্দ্ধায় নাদ ও বিন্দু এই দুইটি—এই পঞ্চই হইল যথাক্রমে পঞ্চগঙ্গা। সুতরাং প্রণবকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতে হইবে॥ ৬॥

আচারসঞ্চারবিচারশুদ্ধি
মাহারপূর্ব্বামপি সন্দধীত।
যুঞ্জীত তাভির্জিতসঙ্গদোষঃ
প্রচারশুদ্ধিং ক্রতুসিদ্ধিগোপ্ত্রীম্॥ ৭॥

সর্বতোভাবে আশ্রয়ের নিমিত্ত শুদ্ধি আবশ্যক: আহারশুদ্ধি, আচারশুদ্ধি, বিচারশুদ্ধি, প্রচারশুদ্ধি ও সঞ্চারশুদ্ধি। এ সকল শুদ্ধির মধ্যে প্রচারশুদ্ধি, সাধনক্রিয়ার যাহা সিদ্ধি সেটিকে বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া থাকে। আহার, আচার ও বিচারশুদ্ধির দ্বারা সঙ্গদোষ জয় করা যায় এবং সঞ্চারশুদ্ধি দ্বারা যুঞ্জান ও যুক্ত হওয়া যায়॥ ৭॥

পুনাতি হ্যন্নমাহারোঽসূনাচারস্ততঃ ক্রমাৎ।
অঞ্জসৌপয়িকাশ্চান্যে পুনন্তি কোষপঞ্চকম্॥ ৮॥

আহারশুদ্ধি অন্নময় কোষকে শোধন করে, আচারশুদ্ধি প্রাণময় কোষকে; বিচারশুদ্ধি মনোময়কে; প্রচারশুদ্ধি বিজ্ঞানময় এবং সঞ্চারশুদ্ধি আনন্দময় কোষকে শুদ্ধ করিয়া থাকে। এইভাবে শুদ্ধিপঞ্চক কোষপঞ্চক-শোধানর নিশ্চিত ও প্রকৃষ্ট উপায়॥ ৮॥

অণুতনুপৃথুভেদৈর্গৃহ্যতে কোষদোষ-
স্ত্বধিকরণনিধানাৎ পার্থিবাদিত্বমেতি।
ত্রিতয়মপি মলানাং পাঞ্চমল্যং পুনর্বা
প্রণবপুটিতশুদ্ধিস্তানপাস্তান্ করোতি॥ ৯॥

কোষপঞ্চকে যে দোষ বা মল রহিয়াছে, তাহা অণু, তনু ও পৃথুভেদে ত্রিবিধ। ইহার ভিতরে যেটি মলের সূক্ষ্মতম বা কারণ অবস্থা, তাহাকে বলে অণু বা 'আণব' মল। সূক্ষ্ম মলকে বলে তনু বা 'মানস'; আর স্থূল বা ব্যক্ত মলকে বলে পৃথু বা 'পার্থিব'। শৈবাগমের আণবাদি মলত্রয়ও এ স্থলে আলোচ্য। এই মল আবার অধিকরণ অনুসারে, অর্থাৎ কোথায় রহিয়াছে এই বিচারে, অন্নাদিরূপে পঞ্চবিধ, অর্থাৎ অন্নগতমল, প্রাণগতমল ইত্যাদি। মল ত্রিবিধই হইক আর পঞ্চবিধই হইক, প্রণব (অথবা ঈশ্বরবাচক) জপাশ্রিত আহারাদিশুদ্ধি তাহাদিগকে বিদূরিত করে॥ ৯॥

পঞ্চমাত্রা অকারাদ্যা আহারাদিকপাবকাঃ।
তাভিঃ পুনীত বাচস্তু তনূঃ পুনীত তৈরপি॥ ১০॥
পঞ্চগঙ্গাঃ পুনীরন্ গাঃ পঞ্চগব্যানি বৈ তনূঃ।
মূলস্পন্দনবৈরূপ্যে সারূপ্যং বিদ্ধি পাবনম্॥ ১১॥

প্রণবাদি বীজমন্ত্রে অকারাদি পঞ্চমাত্রা হইতেছে পঞ্চগঙ্গা, আর আহারাদি পঞ্চশুদ্ধি হইতেছে পঞ্চগব্য। পঞ্চগঙ্গার দ্বারা বাক্‌কে পবিত্র কর, এবং পঞ্চগব্যের— আহারাদি পঞ্চপাবকেরদ্বারা স্থূল সূক্ষ্মাদি তনু পবিত্র কর. মূলীভূত স্পন্দন কোনও কারণে বিরূপ হইলে যাহার দ্বারা তাহার আবার সারূপ্য ঘটিয়া থাকে, তাহাকেই পাবন

অথবা শুদ্ধি বলিয়া জানিবে। অতএব, মূল স্পন্দনে বিরূপতা দূর করিয়া তাহার স্বভাব-স্বাচ্ছন্দ্য পুনরায় আনয়ন করাই সকল শুদ্ধির লক্ষ্য॥ ১০-১১॥

অরিচ্ছন্দো বিষচ্ছন্দঃ স্পন্দস্য প্রাতিকূল্যতঃ।
মিত্রচ্ছন্দো মধুচ্ছন্দো যদানুকূলতান্বয়ম্॥ ১২॥

স্বভাব ও স্বচ্ছন্দের প্রতিকূল স্পন্দন যদ্দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলে অরিচ্ছন্দঃ ও বিষচ্ছন্দঃ এবং যদ্দ্বারা স্বভাব স্বচ্ছন্দের অনুকূলতা অক্ষুণ্ণ থাকে, অথবা ক্ষুণ্ণ হইলে আবার সেটি স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে বলে মিত্রচ্ছন্দঃ ও মধুচ্ছন্দঃ॥ ১২॥

বিপশ্চিচ্ছন্দসাং মাতুর্ব্রহ্মযোনেঃ স্বরূপতাম্।
সমীহতে মধুচ্ছন্দঃ ক্রমবর্ত্মানুসারতঃ॥ ১৩॥

যিনি ব্রহ্মযোনি ছন্দোমাতা গায়ত্রী, যিনি সাক্ষাৎ অমৃত দোহন করেন, ধীর এবং বিজ্ঞ সাধক, মধুচ্ছন্দে ক্রমবর্ত্ম অনুসরণ করিয়া তাঁহারই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে যত্নবান হন॥ ১৩॥

আনুরূপ্যঞ্চ সারূপ্যং প্রাতিরূপ্যৈকরূপতে।
চতুর্ণামনুযোগিত্বমভাবস্য বিরূপতা॥ ১৪॥

যে বস্তু যাহা ঠিক সেইটিই তাহার স্বরূপ। এই স্বরূপের অনুগত এবং অনুকূল হয় চারিটি—অনুরূপ, সমরূপ, প্রতিরূপ এবং একরূপ। ইহার ভিতর স্বগত, স্বজাতীয় এবং বিজাতীয়—এই তিনপ্রকার ভেদের কোনোটিই না থাকিলে, সেটি হয় স্বরূপের সঙ্গে একরূপ; স্বগতভেদ অল্পবিস্তর থাকিলেও সজাতীয় ভেদ যদি না থাকে, তবে হয় সমরূপ বা সরূপ; স্বগত এবং সজাতীয় এই উভয় ভেদ থাকা সত্ত্বেও যদি বিজাতীয় ভেদের অভাব হয় তবে হয় প্রতিরূপ; আর বিজাতীয় ভেদ

কিয়ৎপরিমাণে রহিয়াও যদি সেটি স্বরূপের অনুগত ও অনুকূল হয়, তবে হয় অনুরূপ। এখন এই চারিটিরই (অর্থাৎ অনুরূপতা ইত্যাদির) অভাব যেখানে থাকে তাহাকে বলে বিরূপতা বা বৈরূপ্য। মিত্রচ্ছন্দঃ ও মধুচ্ছন্দঃ দ্বারা মূলস্পন্দনের সঙ্গে বিরূপতা বিদূরিত হইয়া ক্রমশঃ অনুরূপতা, প্রতিরূপতা, সমরূপতা এবং একরূপতা হইয়া থাকে॥ ১৪॥

দিবৌকসো যদিচ্ছন্তোঽ বারিষুর্বেদমাতরম্।
অমৃতচ্ছন্দসা স্বেন তদমৃতমদূদুহং॥ ১৫॥

সকল ছন্দের মাতা ব্রহ্মযোনি গায়ত্রী স্বয়ং হইতেছেন পরম মধুচ্ছন্দঃ। প্রণবের ছন্দ গায়ত্রী। প্রণবে এই ছন্দ ব্যক্তভাবে না থাকিলেও অব্যক্ত বীজভাবে রহিয়াছে। সেই অব্যক্ত বীজের ভিতরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে হয়। ব্রহ্মবর্চ্চঃ (অগ্নি) প্রণবের দেবতা, সুতরাং ব্রহ্মবর্চ্চসের অনুগ্রহে প্রণবের মধ্যে নিগূঢ় ছন্দোমাতাকে প্রকাশিত করার নামই প্রণবের সাধনা। প্রকাশিত হইলে, প্রণব সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই বাঙ্ময় রূপ; সুতরাং এই বিশ্বই প্রণবের রূপ। 'ওঁঙ্কারমেবেদং সর্ব্বম্'। দেবতারা যেটিকে ইচ্ছা করিয়া বেদমাতাকে বরণ করিয়াছিলেন, বেদমাতা আপন অমৃতচ্ছন্দ দ্বারা দেবতাদের নিমিত্ত সেই অমৃত দোহন করাইয়াছিলেন॥ ১৫॥

অধ্মাসীচ্ছ্রু তিসারমূর্জিতমৃতং শঙ্খং য এবার্পিপদ্
যঃ সৌদর্শনমধ্বরং কুশলকৃচ্ছন্দোভিরাতীতনৎ।
যোঽদারীন্মধুকৈটভোরুসহসং কৌমোদকীং গীর্পতি
র্ধৃত্বাজং ব্যচকাশদাশু সুধিয়াং বোধায় তস্মৈ নমঃ॥ ১৬॥

শ্রুতিসার যে প্রণব, সেই প্রণবের যাহা নিরতিশয় শুদ্ধ ও সমর্থ স্বরূপ (ঋতং উর্জিতং), সেটিকে পাঞ্চজন্য শঙ্খরূপে যিনি বাদন করিয়াছিলেন (অধ্মাসীৎ); কুশলকর্মা যিনি আবার এই বিশ্বসৃষ্টিরূপ যজ্ঞকে তাঁর সর্বতোভদ্র সুদর্শন চক্ররূপে চালিত করিয়াছিলেন (আর্পিপৎ) এবং বিচিত্র ছন্দসমূহের দ্বারা বিস্তারিত করিয়াছিলেন

(আতীতনৎ); পুনশ্চ যিনি এই বিশ্বযজ্ঞের মহাবাধা-স্বরূপ মধুকৈটভের বিপুল সাহসকে কৌমোদকী গদা ধারণ পূর্বক বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, (কৌ = বেদে, মোদক = রসয়িতা; অতএব, কৌমোদকী = বেদমন্ত্রসমূহের যাহা চেতয়িতা ও রসয়িতা), সেই গীস্পতি ভগবান এই সমস্ত বাধা নিরসন পূর্বক স্বয়ং পদ্মপাণিরূপে প্রজাপতির বুদ্ধিরূপ (বাঙ্‌মনোরূপ) কমল আশু বিকশিত করাইয়াছিলেন (ব্যচকাশৎ), সুধীগণের বুদ্ধি যাহাতে সম্যক বেদোজ্জ্বলা হয় (বোধায়), সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবানকে সেই নিমিত্ত নমস্কার করিতেছি॥ ১৬॥

ঋতং বিদ্যান্মহাকালীং সত্যং বিদ্যাৎ সরস্বতীম্
ছন্দো বিদ্যান্মহালক্ষ্মীং যোজিতে যেন তে উভে॥ ১৭॥

ঋতকে মহাকালী বলিয়া জানিবে এবং সত্যকে মহাসরস্বতী বলিয়া জানিবে এবং যে ছন্দ ঋত এবং সত্যকে পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া রাখে, তাহাকে মহালক্ষ্মী বলিয়া জানিবে॥ ১৭॥

ঋতাধ্বনা লয়ং যাতি প্রপঞ্চোপশমং পুনঃ।
অস্তিতয়া চকাস্তীদং সত্যেন সচ্চিদাত্মনা॥ ১৮॥

ঋতকে আশ্রয় করিলে এই প্রপঞ্চের উপশমরূপে যে লয়, সেই লয় প্রাপ্ত হওয়া যায় : সচ্চিদাত্মাস্বরূপ যে সত্য তাহা দ্বারা এই সমস্ত অস্তিতা ও ভাতিতারূপে রহিয়াছে ও প্রকাশ পাইতেছে॥ ১৮॥

পিহিতস্যাপি সর্ব্বস্মিন্নানন্দস্যাবগুণ্ঠনম্।
যদপাবৃণুতে সুষ্ঠু মধুচ্ছন্দস্তদীরিতম্॥ ১৯॥

অস্তি ও ভাতিরূপে সব কিছু রহিয়া এবং প্রকাশিত হইয়াও তাহাদের আনন্দস্বরূপ যেন কি একটা অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; এই নিমিত্ত সমস্ত

কিছুই যে আনন্দ এবং আনন্দই ব্রহ্ম এ ভাবে ভান হইতেছে না। যদ্দ্বারা স্বরূপগত আনন্দের যেটি অবগুণ্ঠন সেটির সর্বথা উন্মোচন হইয়া থাকে, তার নাম মধুচ্ছন্দঃ॥ ১৯ ॥

ঋতং তদনৃতং জ্ঞেয়ং যদৃচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
অবস্যত্যালয়ন্ত্যেকমন্যদ্বৈতং নিরস্যতি॥ ২০॥

যেটির কেবলমাত্র গতিই আছে, কিন্তু স্বরূপতঃ স্থিতি নাই, সেটিকে অনৃত বলিয়াই জানিবে, সেটি ঋত নয়। যাতে অনৃত থাকে, অথবা যেটিকে অনৃত আশ্রয় করে, সেটি শ্রম, ক্লান্তি, মৃত্যুর অধিকারেই থাকে, কিন্তু ঋত সকল দ্বৈত, সুতরাং ভয় নিরসনপূর্বক, নিত্যস্থিতিতে লইয়া যায়।। ২০।।

খড়্গমুণ্ডকরা সব্যে করালী প্রলয়ঙ্করী।
বরাভয়করাঽসব্যে কালী কৈবল্যদায়িনী॥ ২১ ॥

মা কালী বামে খড়্গমুণ্ডকরারূপে করালী প্রলয়ঙ্করী সাজিয়াছেন, তিনিই আবার দক্ষিণে বরাভয়করারূপে কালী কৈবল্যদায়িনী হইয়াছেন। এখানে একদিকে অনৃতের অথবা মৃত্যুর রূপ, অন্যদিকে ঋতের অথবা অমৃতের রূপ॥ ২১॥ (কালিকারহস্য উপোদ্‌ঘাতের শেষাংশে।)

অস্তীতি চ চকাস্তীতি সংসর্গবিরহাদিমে।
ঋতস্য ছন্দসো বোধে প্রমাত্বেতরতামিতঃ॥ ২২॥

আমাদের সকল কিছু বোধ অস্তি এবং ভাতি এইভাবে হইলেও তার মধ্যে কোনোটা বা প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান হয়, আবার কোনোটা বা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান হয়। যেমন, রজ্জুসর্প, গন্ধর্বনগর ইত্যাদি। এরূপ হওয়ার কারণ কি? অস্তি ও ভাতিরূপে সর্বত্র তো একই রূপ। যথার্থ জ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের ভেদ কি প্রকারে

আসিয়া থাকে, এটি বুঝিতে গেলে আমাদের বিচার করিতে হয় যে অস্তি ও ভাতিমাত্র এই বোধের সঙ্গে অপর এক বস্তু বিদ্যমান আছে অথবা নাই। সে অপর বস্তুটি বিদ্যমান থাকিলে প্রমা হয়, অন্যথা অপ্রমা। সেই অপর বস্তুটির নাম ঋতচ্ছন্দ। সুতরাং ঋতচ্ছন্দ সহকারে যে অস্তি ও ভাতির বোধ, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, এবং সেটির আশ্রয় ব্যতিরেকে যে অস্তি ও ভাতির বোধ সেটি মিথ্যাজ্ঞান॥ ২২॥

ঋতস্য ছন্দসো জ্ঞেয়া সত্যত্বে ব্যবসায়িতা।
মধুচ্ছন্দঃ সমাবৃত্ত্যা চানন্দে পর্য্যবস্যতি॥ ২৩॥

ঋতচ্ছন্দ তাহাকেই জানিবে যাহা দ্বারা সত্যত্বের নিশ্চয় হইয়া থাকে; এবং মধুচ্ছন্দ তাহাকে জানিবে যেটি সমাবৃত্তি দ্বারা আনন্দে পর্যবসান প্রাপ্ত হয়॥ ২৩॥

উভাত্মকেন ছন্দসা ভূমা যো বৈ রসোঽপি সঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং তস্য স্বারূপ্যমীহ্যতে॥ ২৪॥

উভয়াত্মক ছন্দ দ্বারা, অর্থাৎ সম্মিলিত ঋতচ্ছন্দ ও মধুচ্ছন্দ দ্বারা সাক্ষাৎ রসস্বরূপ যে ভূমা, সেই ভূমার স্বারূপ্য, অন্বয়মুখে এবং ব্যতিরেকমুখে লাভ করিতে চেষ্টিত হও। "মধু বাতা ঋতায়তে"—ইত্যাদি হইল অন্বয়মুখে অন্বেষণ; এবং "নেতি নেতি" করিয়া সকল অল্প এবং খণ্ডিত নামরূপ পরিহারপূর্বক যে শুদ্ধ একরস ব্রহ্মানুভূতি হয়, সেটি হইল ব্যতিরেকমুখ॥ ২৪॥

উভাত্মকতয়া সম্যগাব্রহ্মাকারবৃত্তিতা।
বর্ত্তিতা যেন তচ্ছন্দঃ সমাবৃত্তিতয়োদিতম্॥ ২৫॥

এখন বিচার করিতে হইবে সমাবৃত্তি কাহাকে বলে। যে ছন্দ ঋতচ্ছন্দ ও মধুচ্ছন্দ এই দুইরূপে সম্যক্ ব্রহ্মাকারাবৃত্তি পর্যন্ত উপনীত হওয়ার যেটি ধারা, সেটিকে প্রবর্তিত করে, সেই ছন্দই 'সমাবৃত্তি' এই নামে কথিত॥ ২৫॥

সত্যমেব সকারঃ স্যান্ মকার ইতি যন্মধু।
আনন্দশ্চ য আকারো বকারো ব্রহ্মতা পুনঃ॥ ২৬॥
ঋতং বিদ্যাদৃকারেণ তর্ত্তুং তর্প্তুঞ্চ তদ্বয়ম্।
জনিমৃতিসৃতেঃ পারমাত্মনীয়াদিসংজ্ঞকঃ॥ ২৭॥

এইবার 'সমাবৃত্তি' এই শব্দের অক্ষরগুলি বিচার করিয়া দেখ। সত্যই 'স'কার, সেটি মধু সেটি 'ম'কার, আনন্দ 'আ'কার, 'ব'কার হইতেছে ব্রহ্মত্ব, 'ঋ'কার হইতেছে ঋত, দুইটি 'ত'কারের মধ্যে একটি হইতেছে তরণ এবং অপরটি হইতেছে তৃপ্তি, অর্থাৎ একটি শ্রেয়ঃ, অপরটি প্রেয়ঃ বাকী যে হ্রস্ব ইকার থাকিল তদ্দ্বারা কি বুঝিতে হইবে? জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের পারে যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মস্বরূপ রহিয়াছেন, সেই আত্মস্বরূপে লইয়া যাইতে সমর্থ ইহাই 'ই'কারের রহস্য ('ই' ধাতু = গমন)॥ ২৬—২৭॥

সমিতি চানুসন্ধত্তে ধামেত্যাকারসূচিতম্।
যদ্গত্বা না নিবর্তন্ত ইতি চরমবৃত্তিতা॥ ২৮॥

পুনশ্চ বিচার কর—'সম্' এই শব্দের দ্বারা 'অনুসন্ধান কর' এই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে; সম্-এর পর যে 'আ'কার রহিয়াছে, সে আকার ধামবাচক। কিন্তু সে ধাম কোন ধাম? যে ধামে যাইয়া আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, সেই পরম ধামই লক্ষ্যার্থ। সুতরাং সমাবৃত্তি বলিলে সেই প্রকার অনুসন্ধান বুঝিতে হইবে যাহা পরম ধামে 'বৃত্তি' কিনা, বিশ্রান্তি ঘটাইয়া দেয়॥ ২৮॥

গায়ত্র্যাকার আয়াতি মধুমত্যা সমিত্যূচা।
হংসবত্যা চ বৃত্তিত্বং হৌংস ইত্যর্য্যতে ত্রিভিঃ॥ ২৯॥

মধুমতী ঋক্ হইতে 'সম্', গায়ত্রী ঋক্ হইতে 'আ'কার, হংসবতী ঋক্ হইতে 'বৃত্তি'—এইভাবে 'সমাবৃত্তি' এই শব্দে তিনটি ঋকের ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে। আবার যেহেতু আমরা দেখিয়াছি যে "হৌংসঃ" এই বীজে ওই তিনটি ঋক্ সম্মিলিত হইয়াছেন, অতএব সমাবৃত্তির মন্ত্র হইতেছেন "হৌংসঃ"॥ ২৯॥

সমিত্যস্য ত্রিধা বৃত্তিরাকারস্য পুনস্তথা।
তদ্ধানিমদবৃত্তিত্বং সমাবৃত্তিরিতীরিতম্॥৩০॥

পরে আমরা দেখিতে পাইব যে 'সম্' ইহার ত্রিবিধ বৃত্তি এবং আকারেরও ত্রিবিধ বৃত্তি। সুতরাং 'সমা' এই শব্দের উক্ত ত্রিবিধ বৃত্তি যেস্থলে নাই, সেস্থলে সমাবৃত্তিও নাই—এইরূপ অনুমান করিতে হইবে॥৩০॥

সত্ত্বং জ্যোতিষ্ট্বরসত্বে মা গময় ইতি শ্রুতিঃ।
সমাবৃত্তিমৃতে তু স্যান্ মা গমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ॥৩১॥

শ্রুতি যে বলিয়াছেন—"অসৎ হইতে সৎ-এ লইয়া চল। তমঃ হইতে জ্যোতিঃতে এবং মৃত্যুরূপ মহাদুঃখ হইতে সাক্ষাৎ রসস্বরূপ অমৃতে"—এই গমন বা অভ্যারোহ সমাবৃত্তি ব্যতীত সম্ভবে না। সমাবৃত্তিব্যতিরেকে অসত্য, অজ্ঞান ও মৃত্যুর পারে অনন্তকালেও উত্তীর্ণ হইবে না॥৩১॥ ('গময়' প্লুতভাবে উচ্চারিত, সেইজন্য সন্ধি হইল না।)

কিঞ্চিদ্ বা বাধতে সম্যক্ সম্যগন্বেতি কিঞ্চন।
বিশিনষ্টি পুনঃ সম্যক্ তিস্রঃ সমিতি বৃত্তিতাঃ॥৩২॥

এইবার সেই ত্রিবিধ বৃত্তি যে কি—তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। 'সম্যক' এই শব্দটির ভিতরেই ঐ তিন প্রকার বৃত্তি লক্ষ্য করিতে হইবে। কিরূপে? কোনো কিছু সম্যক্‌রূপে বাধিত হয়, আবার কোনো কিছু সম্যক্‌রূপে অন্বিত হয়, আবার অপর কিছু সম্যক্‌রূপে বিশেষিত বা নিরূপিত হয়। এই তিন প্রকার "সম"এর বৃত্তি বুঝিতে হইবে। কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার নিরসন, কোথায় কোথায় সে-তত্ত্বটির অন্বয় রহিয়াছে, তাহার দর্শন এবং তত্ত্বটির স্বরূপে প্রবেশ এই তিনটি সর্বথা না হওয়া পর্যন্ত সমাবৃত্তি হয় না॥৩২॥

সঞ্জানীতে সমাবৃত্তৌ সমীক্ষতে সমেতি চ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুঞ্চ স্বরূপতো যথাক্রমম্॥৩৩॥

অতএব সমাবৃত্তিতে সম্যক্‌রূপে জানে, সম্যক্‌রূপে দেখে এবং সম্যক্‌রূপে প্রবিষ্ট হয়, কি না, তদ্‌ভাবভাবিত হইয়া যায়। যে কোনো তত্ত্বকে স্বরূপতঃ প্রাপ্ত হইতে গেলে এইটিই ক্রম বলিয়া জানিবে—"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুঞ্চ"॥৩৩॥

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ চাগ্নীষোমৌ চ নাদবিন্দুকৌ।
প্রাণাপানাবিতি দ্বন্দ্বাশ্চাধ্যাত্মিকাদয়স্ত্রয়ঃ॥৩৪॥
সম্যগ্‌বর্ত্তেরনস্যাং বৈ সমাসসমতামিতাঃ।
অতএব সমাবৃত্তিরিতি ব্যুৎপাদ্যতে হি সা॥৩৫॥

সূর্য ও চন্দ্রমা, অগ্নি ও সোম, নাদ ও বিন্দু, প্রাণ ও অপান ইত্যাদি বিবিধ দ্বন্দ্ব এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এবম্বিধ সর্বপ্রকার ত্রিপুটীভেদ যে অবস্থায় পরস্পরের বৈষম্য ও বিরোধ পরিহার পূর্বক সুষম সমন্বয় লাভ করে, সেই অবস্থা সমাবৃত্তির লক্ষ্য জানিতে হইবে। সমা = সমঞ্জসা, বৃত্তি গতি ও স্থিতি। ধর,—প্রাণ ও অপান এই দুইটি বৃত্তি। এই দুইটি বৃত্তি পরস্পরের সহিত সঙ্গত রহিয়াছে বটে, কিন্তু সচরাচর সুসঙ্গত হইয়া নাই, অর্থাৎ প্রাণ ব্যাপার ও অপমান ব্যাপারের মধ্যে সমতা রক্ষিত হইতেছে না। প্রাণায়ামের দ্বারা এই সমতা রক্ষার যত্ন করিতে হয়—"প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্ব" অগ্নি ও সোম প্রভৃতি যুগ্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও এবম্বিধ সমতা বিধানের যত্ন করিতে হইবে। এই সমস্ত সাধনই সমাবৃত্তির অঙ্গ॥৩৪-৩৫॥

ছন্দসাং সমতাবৃত্তিঃ সমাসতঃ সমঞ্জসা।
সমাবৃত্তির্হি সা জ্ঞেয় ব্যাসবিষমতাং বিনা॥৩৬॥

পুনশ্চ, যখন সমাস অথবা অবিভক্ত অবস্থা হইতে ব্যাস অথবা বিভক্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হইবে, তখনও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ব্যাস-বিষমতা আসিয়া উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ বিভক্ত হইয়াও যেন প্রাণাপানাদি বিষমতা প্রাপ্ত না

হয়। যথা, কুম্ভকে বায়ু স্থির হইয়া প্রাণ ও অপানের স্বতন্ত্র বৃত্তিদ্বয়ের লয় ঘটায়; কুম্ভকের অবসানেও এটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রাণ ও অপান বৃত্তিদ্বয় সুষমভাবেই প্রবর্তিত হইল, বিষমভাবে নয়। মন্ত্রসহকারে জপাদি সাধনেও এই দুইটি মূল সূত্র অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে—সমাসে অথবা জপস্পন্দনসমূহের সমুচ্চয়ে সমতা রহিবে, এবং সমুচ্চয় হইতে আবার বিচয়ের ভূমিতে ফিরিয়া আসিলেও বিষমতা উপস্থিত হইবে না। প্রাণায়ামের ফলে যেরূপ প্রাণাপানাদির লয় হইয়া বায়ুর স্থিরতা বা কেবল কুম্ভক উপস্থিত হয়, সেরূপ জপ করিতে করিতেও শুদ্ধ প্রণবে অথবা অনাহত ধ্বনিতে অথবা নাদে জপের লয় হইয়া যায়। এবম্বিধ লয়ের অবস্থা শান্ত অবস্থা। ক্ষোভ অথবা উত্তেজনা রহিলে বুঝিতে হইবে সমাস-সমতা ঘটে নাই। কোনও বাধা দ্বারা আহত হইয়া জপ মূর্চ্ছিত ও স্তব্ধ হইয়াছে মাত্র। এইপ্রকার জপমূর্চ্ছা কাম্য নহে। পুনশ্চ, অব্যক্ত শান্ত ভূমি হইতে জপ যখন ব্যক্তরূপে সক্রিয় হয়, তখনও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে ব্যাস-বিষমতা দোষ আক্রমণ না করে। জপজন্য যে সত্ত্বোদ্রেক হয় তার ফলেই উক্তপ্রকার অব্যক্ত শান্ত ভাব। কিন্তু সত্ত্বেও উদ্রেক হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মে রজঃ ও তমের দিক দিয়া প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। পুরাণের আখ্যায়িকায় হইাই হইল মধু ও কৈটভের প্রাদুর্ভাব। জপজন্য যে তন্ময়ভাব সেটির অবসানে যখন আবার স্পষ্টতঃ জপক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হবার উপক্রম, করি, তখন রজঃ ও তমের সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়াটি বাস্তবরূপে দেখা দিতে পারে। দেখা দিলে ব্যাস-বিষমতা দোষ আসিবে। অতএব লক্ষ্য রাখিতে হইবে জপের তন্ময়তা হইতে নামিয়া আসিয়াও যাহাতে জপের নিরুপদ্রব প্রশান্তবাহিতায় রহিয়া যাইতে পারি। "সমাবৃত্তি" বলিলে আরোহ ও অবরোহ—দুই ক্ষেত্রেই নিরুপদ্রব সমতাটি বুঝিতে হইবে॥৩৬॥

নাদবিন্দুকলাত্মা যঃ প্রণবাদিবপুশ্চ যঃ।
গিরাং চতুষ্টয়ং যস্য চত্বারো বাহবঃ ক্রমাৎ॥৩৭॥
শঙ্খেন বৈখরীং বাচং গদয়া মধ্যমাং গিরম্।
সুদর্শনেন পশ্যন্তীং পদ্মেন চ পরাং ভ্রিয়াৎ॥৩৮॥
একদন্ত উদগ্রেণ দতা ব্যামোহদারকঃ।
মূষিকো বাহনং যস্য সোহব্যাদ্রহস্যবিগ্রহঃ॥৩৯॥

যিনি নাদবিন্দুকলাত্মা, প্রণবাদি বীজমন্ত্র যাঁহার শরীর, বাক্‌চতুষ্টয় যাঁহার চারিটি বাহু, সেই গণপতিকে স্মরণ করিতেছি। তিনি শঙ্খের দ্বারা বৈখরী বাক গদা দ্বারা মধ্যমা, সুদর্শনের দ্বারা পশ্যন্তী এবং পদ্মের দ্বারা পরা বাক্ ভরণ করিতেছেন। সেই রহস্যবিগ্রহ (Mystic Figure) ভগবান একদন্ত তাঁহার উদগ্র দন্তের দ্বারা ব্যামোহ বিদারণ করিয়া থাকেন; মূষিক তাঁহার বাহন; তিনি আমাদের রক্ষা করুন॥৩৭-৩৯॥

দ্বে রূপে মূষিকস্যাস্য সিতাসিতেঽখিলাত্মনঃ।
কৃৎস্নচ্ছিদশ্চ ভূতানামন্তঃকুহরগাহিনঃ।
নক্তন্দিবঞ্চ সর্ব্বেষামায়ুর্ম্মূলানি কৃন্ততঃ॥৪০॥

তাঁহার বাহন মূষিক অখিলাত্মা বিশ্বরূপ; সেই মূষিকের শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটি রূপ. তিনি নিখিল ভূতের অন্তঃকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত 'কর্ত্তন' অর্থাৎ ছিন্ন করিতেছেন, এবং রাত্রি ও দিবা (কৃষ্ণ ও শুক্ল) এই দুই রূপে চরাচর সর্বভূতের আয়ুর মূল কাটিয়া যাইতেছেন॥৪০॥

ব্যস্তৌ চ বিষমৌ যৌ তু নাসাবিবরচারিণৌ।
রূপে মূষিকবর্য্যস্য তৌ জানীয়াদ্ বিশেষতঃ॥৪১॥

প্রাণীর নাসাবিবরচারী ব্যস্ত ও বিষম যে দুটি বায়ু—প্রাণ ও অপান—সেই দুটিকে বিশেষভাবে মূষিকবরের রূপ বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে নাসিকারূপ ছিদ্রের মধ্যে একবার প্রবিষ্ট হইতেছে ও আবার বাহির হইয়া আসিতেছে যে প্রাণ ও অপানরূপ বায়ু, তাহাই যেন মূষিকের প্রকট রূপ, কারণ ইহা দ্বারাই সমস্ত প্রাণীর আয়ু অজ্ঞাতসারে ক্ষয় বা নাশ প্রাপ্ত হইতেছে॥৪১॥

সমাসেন সমত্বেন সংযমেন সমীহয়া।
তয়োঃ সন্ধৌ সমারোহং নাদবিন্দুকলাত্মনঃ॥৪২॥
ওঙ্কারস্য বিজানীত মাতৃকাগণগীঃপতেঃ।
সমাবৃত্তিং গণেশস্য যা বহুশ্রেয়সী মতা॥৪৩॥

প্রাণ-সংযম ও মনঃসংযম দ্বারা এই ব্যস্ত ও বিষম বায়ুদ্বয়ের সমাস-সমতা বিধান পূর্বক তাহাদের যেটি স্থির সন্ধি তাহাতে সমারোহণ করিতে হইবে।

যিনি নাদবিন্দুকলাত্মা ওঁঙ্কার, তিনি মাতৃকাগণ-বাচস্পতি স্বয়ং গণেশ, অর্থাৎ গণেশই ওঁঙ্কারের প্রকট মূর্তি। প্রাণ-মনের সংযমন দ্বারা ব্যাস-বিষমতা পরিহার পূর্বক সমাস-সমতায় ওঁঙ্কারের শান্তস্বরূপে স্থিতি—ইহাকেই সমাবৃত্তি বলিয়া জানিবে। এবম্বিধ সমাবৃত্তি বহু শ্রেয়োলাভের হেতু॥ ৪২-৪৩॥

সমাবৃত্তৌ সমাধানং প্রত্যাবৃত্তৌ প্রতিক্রিয়া।
পরাবৃত্তৌ পরেত্যস্য পারীণবৃত্তিতা মতা॥ ৪৪॥

[ওঁঙ্কারের অকার, উকার, মকার, নাদ, বিন্দু, শান্ত, শান্তাতীত—এই সাতটি লোক আছে। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটিতে প্রত্যাবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল অকার, উকার, মকার—এই তিনের আশ্রয়ে প্রণবজপে আমাদের এই ব্যস্ত ও বিষম অবস্থায় ফিরিয়াই আসিতে হয়। যদি নাদ ও বিন্দুর অনুগ্রহ লাভ ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যাবর্তনের বেগ কাটাইয়া শান্ত ভূমিতে আরূঢ় হবার বেগ লাভ হয়। এই দ্বিতীয় বেগটি না আসা পর্যন্ত আমরা সমাবৃত্তি ধারায় পতিত হইতে পারি না।] সমাবৃত্তিতে লক্ষ্য বস্তুর সঙ্গে ব্যবধান দূর হইয়া থকে। ব্যবধান দূর হইলেই সমাধান হয়। প্রত্যাবৃত্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়ামাত্রেরই প্রতিযোগী ক্রিয়া অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই দুইটি ব্যতীত আরও একপ্রকার বৃত্তি আছে, তাহার নাম পরাবৃত্তি। এই পরাবৃত্তির অর্থ—যে ভূমিতে বা স্তরে যেভাবে বৃত্তি হইতেছে, সে ভূমি, স্তর, বা ভাব অতীত হইয়া যাওয়া। যেমন প্রণবজপের ফলে যদি শান্ত ভূমিতে উপনীত হই, তাহা হইলে যে বৃত্তির দ্বারা আবার সেই শান্ত ভূমিরও পারে—শান্তাতীতে, গতি হয়, তাহাকে পরাবৃত্তি বলা যাইবে॥ ৪৪॥

অনুক্রমোঽনুবৃত্তৌ চ ব্যাবৃত্তৌ ব্যূঢ়বাধনম্।
অন্যোন্যতা পরীতৌ চ বৈকল্পিকী হ্যতাদৃশী।
এবং ভেদা ইমে পঞ্চ বিদ্যন্তে সর্ববৃত্তিষু॥ ৪৫॥

এই স্থলে সকল প্রকার বৃত্তিতে পাঁচটি ভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে—প্রথমে,

ব্যাবৃত্তি। ইহার দ্বারা সর্বভূত ও নিখিল প্রাণী এক একটি ব্যূহরূপ ধারণ করিয়াছে। এই ব্যূহরূপ ধারণের ফলে তাহাদের ব্রহ্মস্বরূপ অথবা ওঁঙ্কারস্বরূপের বাধ হইয়াছে। ব্যূহরূপতা প্রাপ্তির ফলে সমস্ত কিছুই অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের বিষয় হইয়াছে। যখন এই ক্লেশসঙ্কুল ব্যূহরূপতা নিজেকে শিথিল বা মুক্ত করার চেষ্টা করে, তখন যে বৃত্তিটি উদিত হয়, সেটি হইল দ্বিতীয়—অনুবৃত্তি। কিন্তু অনুবৃত্তি উদিত হইলেই তাহাতে নিরুপদ্রব নৈরন্তর্য আসে না; অর্থাৎ এই বৃত্তিটি বিচ্ছিন্ন হয় এবং ব্যাহত হয়। প্রকৃতি-জন্য প্রতিক্রিয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। ব্যূহটি খুলিতে খুলিতে আবার বন্ধ হইয়া যায়, ঋজু হইতে হইতে আবার কুটিল হইয়া পড়ে। এই তৃতীয় বৃত্তির নাম—প্রত্যাবৃত্তি। কিন্তু ব্যূহমোচনের অনুকূলে যেটি বেগ, সেটি যদি ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে ব্যূহের সম্প্রসারণ এবং শঙ্খাবর্ত ভঙ্গীতে ক্রমে ঊর্দ্ধগতি হইতে থাকে। এইটি চতুর্থ বৃত্তি—পরিবৃত্তি। কিন্তু পরিবৃত্তি আরম্ভ হইলেই বিপদ কাটিয়া গেল না; কেননা, তখনও ব্যূহাকারে বন্ধ রহিবার যে বেগ এবং ব্যূহ হইতে মুক্ত হইবার যে বেগ—এই দুই বেগের অন্যোন্যতা অর্থাৎ পারস্পরিক অপেক্ষাটি রহিয়া যায়। সুতরাং এই পরিবৃত্তির ক্ষেত্রে আসিয়াও আমাদের সাবধান হইতে হয় যাহাতে বৃত্তি বৈকল্পিকী না হয় এবং অতাদৃশী না হয়। বৈকল্পিকী অর্থ—যেটি লক্ষ্য এবং যেটি লক্ষ্য নয়—এই দুই-এর মধ্যে অনিশ্চয়বৃত্তিতা; কোন্‌টি মিত্রছন্দ, কোন্‌টি মিত্রছন্দ নয়—ইহাতে সংশয়-দোলায়মান অবস্থা। অতাদৃশী অর্থ—গতি ও স্থিতির যেটি ঋত ও সত্যরূপ, সেটির অনুরূপ না হইয়া বিরূপ হওয়া। এই দ্বিবিধ অন্তরায় পরিহার পূর্বক শঙ্খাবর্তে ঊর্দ্ধগতি হইতে হইতে যখন আবৃত্তি হইতে একান্তভাবে মুক্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ যখন ব্যূহসাধক শক্তি এবং ব্যূহবাধক শক্তি—এতদুভয়ের অনুপাতের অপেক্ষা আর না করিতে হয়, তখন যে চরম বৃত্তিটি হয়, সেইটি পঞ্চম—পরাবৃত্তি। বলা বাহুল্য, এই পরাবৃত্তি দুস্তর-ভব-সাগর-পারীণ। অনুবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এই চরম পরাবৃত্তি পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটি যদ্দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহিত হয়, তাহারই নাম সমাবৃত্তি। অতএব প্রণবাদি জপ সমাবৃত্তির অঙ্গীভূত॥ ৪৫॥

অনুবৃত্তিরকারস্যোকারস্য বৃত্তিতা দ্বিধা।
একয়াপোহতে বাধমন্যয়েষ্টে প্রতিক্রিয়াম্॥ ৪৬॥

অতঃপর ওঁঙ্কারের দ্বারা সমাবৃত্তি বিচার করিতে হইবে। ওঁঙ্কারের যেটি প্রথম মাত্রা 'অ'কার, তদ্দ্বারা অনুবৃত্তি আরব্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কারের দ্বিবিধ বৃত্তি—একের দ্বারা অনুবৃত্তির পথে যে বাধা সেটিকে অপনোদন করিতে প্রবৃত্ত হয়, অপরটির দ্বারা অনুবৃত্তির ফলে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই প্রতিক্রিয়াকে বশীভূত করে। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে সাধনের দ্বারা কোনও অনুকূল বৃত্তির সূচনা হইলেই অন্তরায় দুই আকারে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ যে ব্যূহ ভেদ করিয়া মুক্ত হইতে চাহিতেছি তার জড়তা অথবা নিজস্ব সংস্কারগুলি সম্মুখে একটা প্রস্তরের দেউলের মতন মস্তক উত্তোলন করে, কিছুতেই অগ্রসর হইতে দেয় না। যে যন্ত্র আমার ব্যবহার হইতেছে, সেই যন্ত্রেরই জড়বেগ (momentum) আমি কাটাইয়া উঠিতে পারি না। এইটি হইল প্রথম অন্তরায়। যন্ত্রপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমি যে যত্ন করি, তার ফলে সেই যন্ত্রে এবং তার পারিপার্শ্বিক সব কিছুতে একটি প্রতিক্রিয়াও (reaction) উপস্থিত হয়। যথা—এই শরীরে কোনো ব্যাধি হইয়াছে। সেই ব্যাধিটি সারাইবার জন্য কোনো ঔষধ খাইলাম। ঔষধ সেবনের দ্বিবিধ ক্রিয়া—রোগজন্য শরীরের স্বচ্ছন্দতার যে বাধা উপস্থিত হইয়াছে, সে বাধা দূর করা; এবং শরীর যন্ত্রে বিশেষ একপ্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। এই প্রতিক্রিয়াটি স্বাস্থ্য পুনর্লাভের জন্য অনুকূলও হইতে পারে, আবার প্রতিকূলও হইতে পারে। যদি প্রতিকূল হয়, তবে সে প্রতিক্রিয়াটি অপক্রিয়া বা বিক্রিয়া। এইজন্য ঔষধ সেবনের ফলে শরীরের কোনো বিক্রিয়া উপস্থিত হইল কিনা, এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সাধনমাত্রেই এই নিয়মের দৃষ্টান্ত মিলিবে। কোনো মন্ত্র জপ করিতেছি। জপের ফলে জপকর্তার যন্ত্রে অবশ্যই একটি প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। সে প্রতিক্রিয়াটি অনুকূল হইলে শুভ। প্রতিকূল অথবা বিক্রিয়া হইলে সেটিকে দমন (control) করিবার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে হওয়া চাই। এখন প্রণবের যেটি দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কার, সেটি দুই ভাবেই কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়—যন্ত্রের যেটি জড়বেগ বা momentum সেটিকে কাটাইতে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রতিক্রিয়াটি যাহাতে বিক্রিয়ায় পর্যবসিত না হয়, সে বিধানটিও করে ॥ ৪৬॥

বাধাপ্রতিক্রিয়ে যেঽপি রিপুচ্ছন্দোঽনুগচ্ছতঃ।
ঋতস্য বর্ত্মনি যাভ্যামনৃজুত্বঞ্চ জন্যতে ॥ ৪৭ ॥

তারপর, লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাধা এবং প্রতিক্রিয়া রিপুচ্ছন্দের অনুবর্তী হইতে পারে অথবা মিত্রচ্ছন্দের অনুবর্তী হইতে পারে। প্রতিক্রিয়ার মত বাধাও অনুকূল, প্রতিকূল—শুভ, অশুভ—দ্বিবিধ। বন্ধ সংস্কারের যে বাধা তাহাই অশুভ বাধা; এ বাধা অরিচ্ছন্দের অনুগত, যেহেতু ব্যূহবন্ধন কাটাইয়া এ বাধা বাহির হইতে দেয় না। কিন্তু জপাদি সাধনের দ্বারা যতই আমার ভিতরে জপাদির সংস্কার দৃঢ় হইতে থাকিবে, ততই, অথবা সেই পরিমাণে, শুভ সংস্কার পূর্বতন অশুভ সংস্কারগুলিকে বাধা দিতে সমর্থ হইবে। সংস্কার মাত্রেরই একটি নিজস্ব বেগ আছে। শুভ সংস্কারের বেগ প্রবল হইলে অশুভ সংস্কারের বেগকে সেটি সফল বাধা দিতে সমর্থ হয়। Positive দিকে momentum সৃষ্টি করিয়া negative momentum কাটাইয়া উঠিতে হয়। এই যে শুভ সংস্কারের বেগনিমিত্ত শুভ বাধা, এটি মিত্রচ্ছন্দের অনুবর্তী। তাহা হইলে দেখিতেছি যে, রিপুচ্ছন্দের অনুবর্তী বাধা এবং প্রতিক্রিয়া—সেটি ঋত ও সত্য সাধনার যেটি সরল পন্থা, সেটিকে সরল থাকিতে দেয় না—বক্র কুটিল করিয়া দেয়॥ ৪৭॥

তয়োর্নিরসনে হি স্যাদুকারস্যায়মুদ্যমঃ।
মিত্রচ্ছন্দস্যৃজুত্বে চ মকারবৃত্তিতা ভবেৎ॥ ৪৭॥

এই বক্র কুটিলতার নিরসনের নিমিত্তই ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কারের উদ্যম বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ, যখন প্রথম মাত্রা 'অ'কার উচ্চারিত হইল, তখন অনুবৃত্তি অথবা অনুকূল প্রবাহের সূচনাটি হইল। কিন্তু বাধা-প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া প্রবাহটি সরল স্বচ্ছন্দগতি হয় না; বক্র, কুটিল হইয়া যায়, স্তব্ধও হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মাত্রা 'উ'কার উচ্চারিত হইয়া এই স্তব্ধতা ও বক্রতা নিরসন করিয়া থাকে। তৃতীয় মাত্রা যে 'ম'কার সেটি মিত্রচ্ছন্দকে আশ্রয় করে এবং ঋজুতা আনয়ন করে॥ ৪৮॥

লীনা বৈকল্পিকী নাদে বিন্দাবতাদৃশী পুনঃ।
ওমিত্যস্য সমাবৃত্তির্যয়া সর্ব্বং সমাপ্যতে॥ ৪৯॥

পূর্বে যে বৈকল্পিকী ও অতাদৃশী এই দ্বিবিধ অন্তরায়ের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে বৈকল্পিকীর লয় হয় নাদে এবং অতাদৃশীর লয় হয় বিন্দুতে; অর্থাৎ অকার, উকার, মকার—এই তিন মাত্রার ঊর্দ্ধে যে অর্দ্ধমাত্রা নাদ-বিন্দু, তাতে জপের যেটি সংশয় বৃত্তি এবং যেটি অযথার্থ বৃত্তি—সেই দুইটি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন প্রণব নিঃসংশয়রূপে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ওঁঙ্কারের সমাবৃত্তি এইভাবে বুঝিতে হইবে—যে সমাবৃত্তি দ্বারা সর্ব সমাপন হইয়া যায়॥ ৪৯॥

বীজং যদ্ বিশতি ক্ষেত্রং শেতে তু জাড্যমূর্চ্ছিতম্।
তদ্ জাগর্ত্তি যদা বাধা প্রতিবধ্নাতি নোদয়ম্।।
অকারবৃত্তিতাব্যাপ্য এষ এব হ্যনুক্রমঃ।
অব্যাকৃতে বীজমাত্রে জিজাগরিষতি পুনঃ।
চঞ্চল্যতে সুপ্তমীনস্তদা স্যাদঙ্কুরোদ্‌গমঃ।।
উকার তনুভাগ্ ভাস্বান বরাহো হেতুরুদ্‌গমে।
যেন বাধাবিক্রিয়ে চ তৃহ্যেতে অবলীলয়া॥ ৫০-৩॥

এইবার একটি স্থূল বীজের দৃষ্টান্ত লইয়া এই সমাপন ক্রিয়াটি বুঝিতে যত্ন কর। ক্ষেত্রে বীজ পতিত রহিয়াছে, কিন্তু সে বীজ জড়তায় মূর্চ্ছিত, তাতে প্রাণসঞ্চারের কোনো লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে না। কিন্তু সেই বীজের জাগরণ হয় কখন? যখন কোনো বাধা তাহার উদয়ের প্রতিবন্ধক না হয়, তখন। বীজটি যখন জাগিতে ইচ্ছা করে, তখন বীজের নাভিতে যে ওঁঙ্কার বিরাজ করিতেছেন, সেই ওঁঙ্কারের যে প্রথম মাত্রা 'অকার' তাহার ব্যাপার আরম্ভ হয়।

এতক্ষণ যেটি অব্যাকৃত, অব্যক্ত বীজমাত্র ছিল, সেটি অঙ্কুরিত হইবার উপক্রম করে। আমরা দেখিয়াছি যে এই উপক্রম বা অনুক্রমই হইতেছে অকারের বৃত্তি। বীজের মধ্যে যে প্রসুপ্ত মীনশক্তি রহিয়াছে, সে শক্তির স্তব্ধতার ঘোর যেন কাটিয়া যায়, সে শক্তি চঞ্চল হইয়া উঠে। এইটিকে বীজের উচ্ছূন অবস্থা (swelling) বলে। এখনও কিন্তু অঙ্কুর উদ্‌গম হয় নাই। সুষুপ্তি ভাঙ্গিল, কিন্তু জাগরণ এখনও হয় নাই। এটি সুপ্তি-জাগরণের সন্ধি অবস্থা। তারপর, সুপ্ত মীন-শক্তি চঞ্চল হইবার পরে বীজের

মধ্যে উকারতনুধৃক্ বা তনুধারী তেজস্বতী যে বারাহী শক্তি, সেই শক্তির উদ্রেক হয়। উদ্রেকের ফলে বাধা ও বিক্রিয়া অবলীলায় বিদূরিত হয় এবং বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে॥ ৫০-৩॥

সাংগ্রহিকশ্চ ধাতূনামসূনাং পরিপোষকঃ।
প্ররোহয়তি কূর্ম্মো যো মকারমধিতিষ্ঠতি॥ ৫৪॥

কিন্তু বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইলেই তো সেটি পূর্ণ বিকাশ হইল না। অঙ্কুরের যাহা উপাদান সেটি সংগ্রহ করিতে নিপুণ এবং তন্মধ্যে যে প্রাণস্রোতগুলি বহমান রহিয়াছে, সে সমূহের পরিপোষক কোনো এক শক্তি তন্মধ্যে বিরাজ করা আবশ্যক। সে শক্তিটি বর্তমান না থাকিলে বীজ হইতে যে অঙ্কুরটি উদ্গত হইয়াছে, সেটি একটি বিশেষ রূপ ও ধর্ম পরিগ্রহ করিয়া কোনো এক বিশেষ জাতীয় পাদপে পরিণত হইতে পারে না। বীজাভ্যন্তরে এই সংগ্রহ-কুশল, পোষক শক্তিটিকে কূর্মশক্তি বলে। প্রণবের যে তৃতীয় মাত্রা 'ম'কার, সেটি হইতেছে এই কূর্মশক্তি॥ ৫৪॥

নাদবিন্দূ চ বিজ্ঞেয়ৌ নৃসিংহবামনৌ ততঃ।
বেবিষ্টে পূর্ব্বয়া বৃত্ত্যা পুনর্বীজায়তেঽন্যয়া॥ ৫৫॥

নাদ এবং বিন্দুকে যথাক্রমে নৃসিংহ ও বামন বলিয়া জানিবে। নৃসিংহরূপ নাদশক্তি বীজকে তাহার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে বিস্তার করেন; এবং বামনরূপে বিন্দুশক্তি সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত পাদপকে আবার বীজরূপে রূপায়িত করেন॥ ৫৫॥

অন্তসাত্র বিজানীত লীনসংস্কারসঙ্করাম্।
ক্লেশপঞ্চমূলাবিদ্যাং যত্রাসতেঽস্মিতাদয়ঃ॥ ৫৬॥

এখানে যে মীন কূর্মাদি পঞ্চশক্তির কথা বলা হইল, শ্রীগুরুই যে একাধারে ওই পঞ্চশক্তি বা পঞ্চাবতার রূপ তাহা শ্রীগুরু-পাদাব্জ-পঞ্চকের শেষ শ্লোকে বর্ণিত

হইয়াছে। সেখানে শ্রীগুরুর পঞ্চমূর্তি বর্ণন প্রসঙ্গে যে পয়ঃ বা জলের কথা বলা হইয়াছে ('মগ্নামুর্ব্বীমিব পয়সি'), সে জল কোন্ জল? অন্তঃ বা জল বলিতে বুঝিতে হইবে স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান বা অবিদ্যা—যাহাতে শুভ অশুভ, শুক্ল-কৃষ্ণ অনাদি সংস্কার সমূহ লীন অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে; যেটি ক্লেশপঞ্চকের মূল, সুতরাং যেটি হইতে অস্মিতাদি ক্লেশচতুষ্টয়ের অর্থাৎ অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের উদ্ভব হইয়া থাকে॥ ৫৬॥

উর্ব্বীং বিদ্যাৎ ত্রয়ীমত্র নাদাবিন্দুকলাত্মিকাম্।
সোমাগ্নিসূর্য্যরূপাং বোষধিবনস্পতী চ গাম্॥ ৫৭॥

"জলে মগ্না উর্বীর মতন"—এই স্থলে উর্বী বলিতে কি বুঝিতে হইবে? মূল তত্ত্বসমূহের যেটি উরু বা ব্যক্তরূপ, তাহাই উর্বী শব্দের অর্থ। এই উর্বী হইতেছে ত্রয়ী যে ত্রয়ী নাদবিন্দুকলাত্মিকা, সোমাগ্নিসূর্যরূপা, অথবা ওষধি, বনস্পতি, গাভীস্বরূপা॥ ৫৭॥

তত্ত্বানামুরুরূপত্বং লীযতেঽব্যাকৃতেঽম্ভসি।
যদম্ভো হি নাসদীয়ে সৃষ্টিসূক্তে চ কল্পিতম্॥ ৫৮॥

তত্ত্বসমূহের যেটি উরুরূপ, সেটি অব্যাকৃত হইয়া যাহাতে লীন থাকে, সেটিকে বেদের নাসদীয় সূক্ত এবং সৃষ্টিসূক্তে যথাক্রমে 'অন্তঃ' ও 'সমুদ্রঃ' বলা হইয়াছে॥ ৫৮॥

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ভর্গোরূপঞ্চ তত্তপঃ।
যতোঽভীদ্ধাদৃতং সত্যমধ্বরায়াধ্যজায়ত॥ ৫৯॥

শ্রুতি বলিতেছেন—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"। এ তপঃ যে জ্ঞানময় তাও শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন। সুতরাং তপঃ বলিতে ভর্গই বুঝিতে হইবে। জগৎ-সবিতার এই বরণীয় ভর্গকেই গায়ত্রীমন্ত্রে ধ্যান করিতে হয়। সৃষ্টিরূপ যজ্ঞবিস্তারের নিমিত্ত অভীদ্ধ তপঃ হইতে প্রথমে ঋত ও সত্য জাত হইল—এই কথা সৃষ্টিসূক্ত বলিতেছেন॥ ৫৯॥

তপস আবিরায়াতি সর্গতাবচ্ছিন্নতা সতঃ।
বীজাঙ্কুরপ্ররোহাণাং বিশেষাভাবরূপতা॥৬০॥

একমাত্র সৎ বস্তু রহিয়াছেন। সর্গ বা সৃষ্টি হয় নাই। এমত অবস্থায় সদ্বস্তু সৃষ্টির সামান্য সংকল্পরূপ অথবা সর্গাভিমুখীন যে আদিম অব্যক্ত ভাবটি সেইটিকে সদ্বস্তুর আবীরূপ বলা হইবে। এই আবিঃ অবস্থায় বীজ, অঙ্কুর প্ররোহ প্রভৃতি কোনো বিশেষ এখন পর্যন্ত দেখা দেয় নাই; অর্থাৎ আবিঃকে সৃষ্টির বীজ অথবা অঙ্কুর অথবা প্ররোহ এ সব কোনো আখ্যাই দেওয়া যায় না। বস্তুত—"সদ্বস্তু কল্পনা করিয়াছিলেন, কামনা করিয়াছিলেন, ঈক্ষণ করিয়াছিলেন"—ইত্যাদিরূপে সৃষ্টির যে বীজাবস্থার কথা শ্রুতি আমাদের বারংবার বলিয়াছেন, সে অবস্থাটিও 'আবিঃ'র যেন পরবর্তী অবস্থা। এই নিমিত্ত সকল প্রকার অভিব্যক্তির আদিতে যে 'আবিঃ' সেটি সকল প্রকার বিশেষ বা নিরূপকের অভাব বশতঃ স্বয়ং অব্যক্ত॥৬০॥

পয়োধের্নিস্তরঙ্গাস্য প্রাগ্বীচিভঙ্গাতো যথা।
বায়ূর্জিতস্য দৃশ্যেত কদাপ্যুচ্ছুনতাগতিঃ॥৬১॥

বাহিরের এক চিত্র দিয়া এটি বুঝিতে চেষ্টা কর। সীমাহীন মহাসমুদ্র নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে। সমুদ্রবক্ষে বীচিভঙ্গ দেখা দিবার পূর্বে বায়ু প্রভাবে সমুদ্রবক্ষে একটা উচ্ছ্বাসমাত্র প্রথমে পরিলক্ষিত হয়। বিচিত্র নামরূপ বিশিষ্ট সৃষ্টিরূপে দেখা দিবার পূর্বে ব্রহ্মের বা 'সৎ' বস্তুর যে আবির্ভাব—সেটিকে কতকটা এই ভাবেই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। গাঢ় সুষুপ্তির পরে জাগরণের ঠিক আরম্ভে এই প্রকার একটা অব্যক্ত অবস্থা হইয়া থাকে॥৬১॥

বিশেষসর্গতাদৌ যা বিশেষাভাবরূপতা।
উচ্ছ্বাসমাত্রভাবেনাকল্পনীয়া তু কল্প্যতে॥৬২॥

সর্বপ্রকার বিশেষ সৃষ্টির আদিতে বিশেষের এই প্রকার একটি অভাবরূপতা

বিদ্যমান থাকে। সেটিকে অনির্বচনীয় উচ্ছ্বাসমাত্ররূপে আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ সেটি কল্পনার যোগ্য নহে॥ ৬২॥

আনন্দস্য য উল্লাসারাম্ভোপক্রম এব চ।
আত্মপ্রত্যয়গম্যোঽপি যোঽবাঙ্‌মনসগোচরঃ॥ ৬৩॥

আনন্দের স্বভাবই এই—যখন আনন্দের যেটি উল্লাস, তার আরম্ভ ও উপক্রম হয়, তখন সেটিকে আমরা আত্মপ্রত্যয়ে জানিতে পারি বটে, কিন্তু সেটিকে আমরা কি বাক্য, কি মন—এ দুয়ের কোনোটা দ্বারা ধারণা করিতে পারি না॥ ৬৩॥

নান্তঃপ্রজ্ঞো বহিঃপ্রজ্ঞো ন চাপ্যুভয়রূপতা।
নাস্তি যত্র ঘনপ্রজ্ঞা যত্রোপক্রমতে সনাৎ॥ ৬৪॥

যেটি বহিঃপ্রজ্ঞও নয় আবার অন্তঃপ্রজ্ঞও নয়, যেটিকে উভয়তঃ-প্রজ্ঞ বলা যায় না, এমন কি যেটি ঘনপ্রজ্ঞও নয়—এমন যে অলক্ষণ, অনিরুক্ত, অব্যবহার্য সৎ বস্তু সেটি হইতে এই সকল বিবিধ প্রজ্ঞার যেটি সূচনা বা আরম্ভ, সেটি কোন্ মনের দ্বারা ধারণা করা অথবা কোন্ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব?॥ ৬৪॥

অহর্নিশং গতং সন্ধিং যত্রাহর্ন চ শর্ব্বরী।
ন জাগৃতি র্ন সুপ্তি র্বা তস্যাবিশেষতা মতা॥ ৬৫॥

দিন ও রাত্রি যেখানে সন্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং যেখানে দিনও নাই, রাত্রিও নাই, জাগরণও নাই, সুপ্তিও নাই—সেইটিকে অবিশেষভাব বলিয়া জানিবে॥ ৬৫॥

ভর্গোরূপাদভীন্ধাত্তজ্ জাতমাবিরিতীর্য্যতে।
তস্য প্রতিকৃতী রাত্রি র্যা রাত্রিসূক্ত মন্বিতা॥
যতোঽধিকৃত্য চাত্মানং ভাবোঽতশ্চ স্বভাবতা।
ব্রহ্মমুখীনতাবির্হি সর্গাভিমুখতা ক্ষপা॥ ৬৬-৭॥

আত্মাকে অধিকার করিয়া, আত্মার সম্বন্ধে যে ভাব, তাহাকে 'স্বভাব' বলিয়া জানিবে। স্বভাব সত্যস্বরূপ ও ঋতস্বরূপ। তত্ত্বতঃ বস্তুরূপে যেটি সত্যস্বরূপ, গতিরূপে সেটি হইল ঋতস্বরূপ। এ গতিও তত্ত্বতঃ গতি—আমাদের কল্পিত বা অনুমিত গতি নহে। যে কোনও পদার্থ সম্বন্ধে আমরা এ দুইটি মূল প্রশ্ন করিতে পারি—পদার্থটি তত্ত্বতঃ কি এবং যথার্থ কিভাবে তার বৃত্তি হইতেছে? এই দুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের উত্তর জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নই হইয়া থাকে। যেমন লৌকিক সাধারণ জ্ঞানে এক প্রকার, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানে অন্যপ্রকার, আবার যোগজ জ্ঞানে হয় তো বা তৃতীয় প্রকার। কিন্তু যোগজ জ্ঞানেরও নানা স্তর বা ভূমি রহিয়াছে। সুতরাং জিজ্ঞাসা রহিয়া যায়—পদার্থটির নিরতিশয় রূপটি বা কি, গুণই বা কি, বৃত্তিই বা কি? একটা অনন্ত সোপান শ্রেণীর ধাপে ধাপে আমরা অগ্রসর হইতেছি। শেষ বা চরম ধাপে উপনীত হইলে পূর্ণ প্রজ্ঞান—এইটি 'বেদ' শব্দের মুখ্য অর্থ। পূর্ণ-প্রজ্ঞার ভূমিতে উপনীত হইলে বস্তুর স্বভাবের যে তত্ত্বদৃষ্টি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়, সেই তত্ত্বদৃষ্টিই আমাদের দেখাইয়া দেয় সত্য কি এবং ঋত কি। বলা বাহুল্য, এই দুইটি সম্বন্ধে আমাদের সকলকারই ধারণা অল্পবিস্তর ভ্রান্ত-কল্পনাদিমিশ্রিত, সুতরাং অযথার্থ। সকল সৃষ্ট পদার্থ ব্রহ্মাভিমুখীন ভাবে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে যে প্রতিভাত হইতেছে, এইটি হইল আবিঃ এবং বিচিত্র নামরূপাত্মক প্রপঞ্চরূপে স্বরূপকে আবরণ করিয়া তাদের যেটি প্রকাশ, তাহার নাম ক্ষপা বা রাত্রি।

অভীদ্ধ যে ভর্গঃ বা তপঃ তার যেটি আদিম রূপ সেইটি আবিঃ। রাত্রি তাহার প্রতিকৃতি, কি না, 'উল্টা' রূপ, সুতরাং যেটি আবিঃ সেইটিই রাত্রি—যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে এ দুটিকে আলোক ও অন্ধকারের মত বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। সৃষ্টির সর্বত্র এই দুইটি—আবিঃ ও রাত্রি—পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত রহিয়াছে। সামনে একটা গাছ দেখিতেছি। অস্তি ও ভাতিরূপে এটি আবিঃ। কিন্তু স্বরূপগত যে আনন্দ এবং আনন্দের যেটি ভূমত্ত্ব—এই সকল স্বরূপের পরিচয় আবৃত হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষটিকে খণ্ডিত এবং পরিবর্তনশীল বিচিত্র ধর্মবিশিষ্টরূপেই দেখিতেছি। এই আবরণ হইল রাত্রি। নিজের আত্মাসম্বন্ধেও এইরূপ—ভান হইয়াও অভান হইতেছে, আবার অভান হইয়াও ভান হইতেছে। আবিঃ এবং রাত্রি—দুয়ে মিলিয়া এটি ঘটাইতেছে। ইহার ফলে সব কিছুই ব্যক্তাব্যক্ত। সৃষ্টিসূক্তে এবং প্রসিদ্ধ রাত্রিসূক্তে এই অঘটন-

ঘটন-পটিয়সী রাত্রির কথাই বলা হইয়াছে। আমরা পরে দেখিব যে এই রাত্রির আবার বিচিত্র মূর্তি—মহারাত্রি, মোহরাত্রি, কালরাত্রি ইত্যাদি ॥ ৬৬-৭ ॥

সত্যে ব্রহ্মস্বরূপে স্যাদভিমুখীনতা কুতঃ।
ঋতমৃতে প্রসজ্যেত নাভিমুখীনবৃত্তিতা ॥ ৬৮ ॥

সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে দিক, দেশ, কালাদির কোনো পরিচ্ছেদ নাই। তাহা হইলে ব্রহ্মসম্বন্ধে অভিমুখীনতাই বা কি, বিমুখীনতাই বা কি? বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপে অভিমুখীনতাদির প্রশ্ন অনবকাশ। তবে আবিঃ ও রাত্রির যে পরস্পর ভেদ কল্পিত হইয়াছে, সেটি সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? বলা বাহুল্য, ব্রহ্মস্বরূপে, অথবা যেটি সত্য তাহাতে অথবা তৎসম্বন্ধে, কোনো গতি কল্পিত না হইলে এবংপ্রকার অভিমুখীনতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কেন না, গতিরই দিক আছে, সত্যের দিক নাই। অতএব, "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" এইভাবে দ্বিধা অভিব্যক্তি না হওয়া পর্যন্ত আবিঃ ও রাত্রির ভেদ কল্পিত হইতে পারে না ॥ ৬৮ ॥

আবীরাত্রী ইতি দ্বে চ ব্যোমবায়ু ইতীরিতে।
সত্যেঽনবসরত্বেঽপি স্যাতামৃতস্য বৃত্তিতে ॥ ৬৯ ॥

আবিঃ রাত্রি—এই দুইটি যথাক্রমে ব্যোম ও বায়ুরূপেও কথিত হইবে। এই উপোদ্ঘাতের তৃতীয় শ্লোকে ব্যোম ও বায়ুর প্রসঙ্গ আমরা করিয়াছি। সত্যকে ব্যোম ও বায়ু—এই দুইয়ের কোনোটি দ্বারা অবচ্ছিন্ন করা যায় না; কিন্তু "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" এইভাবে সেটি যুগ্মতত্ত্ব হইলে তার ব্যোম ও বায়ু এবং অন্যান্য তত্ত্বরূপে বিবর্তিত হইতে বাধা নাই ॥ ৬৯ ॥

অভীদ্ধাদিতি জানীয়াদাবিরভিমুখীনতা।
পরাঞ্চি খানি মন্ত্রে তু পরাক্ প্রত্যগিতি দ্বিধা ॥ ৭০ ॥

"অভীদ্ধাৎ"—এই মন্ত্রে আবীরূপে যে অভিমুখীনতার কথা উঠিতেছে সে অভিমুখীনতা পরাক্ এবং প্রত্যক্ এইভাবেই দ্বিবিধ। শ্রুতি "পরাঞ্চি খানি" ইত্যাদি মন্ত্রে সেটি দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রভেদ এই যে—প্রত্যগ্ দৃষ্টিতে শুদ্ধ (আবরণ ও

বিক্ষেপ তিরস্কার পূর্বক) আবিষ্কার; অপর পক্ষে, পরাক দৃষ্টিতে অশুদ্ধ (আবরণ ও বিক্ষেপ সহকারে) আবিষ্কার। দুই স্থলেই আবিষ্কারটি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অস্তি-ভাতিরূপে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ এই ভাবেই জ্ঞানটি হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক, ব্যবহারিক, পারমার্থিক—কোনো স্তরেই ইহার ব্যতিক্রম নাই॥ ৭০॥

র ইতি বাগ্নিরূপত্বমত্রীতি ন ত্রিধা মতা।
অভীদ্ধাত্তপসো বায়ুরগ্নিতাময়তে যতঃ।
অগ্নিরেবাদিমা রাত্রিরব্যাকৃতবিধাত্রয়ঃ॥ ৭১॥

অথবা রাত্রিকে এইভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর। রাত্রি = র + অ + ত্রি। র = অগ্নি। এই র বা অগ্নি 'অত্রি' অর্থাৎ এখনও ত্রিধা ব্যাকৃত হয় নাই। অগ্নি-সূর্য-সোম, অথবা ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ—এইভাবে অগ্নির ত্রিধা ব্যাকরণ হইয়া থাকে। সে ব্যাকরণটি বা বিস্তারটি এখনও হয় নাই। সুতরাং রাত্রিরূপ যে অগ্নি, সেটি হইতেছে বিশ্বের মূলীভূত অব্যাকৃত শক্তিপিণ্ড। ইহা তেজঃ স্বরূপ, সাক্ষাৎ ভর্গেরই পরিণাম বলিয়া এ শক্তি অচেতন জড়শক্তি নয়। রাত্রিসূক্ত চিৎশক্তিই কীর্তন করিয়াছেন। মূল সদ্বস্তুটিকে গতি বা বৃত্তিরূপে দেখিলে সেটি হইতেছে ঋত = বায়ু; এবং গতির জনক ও গতিজন্য শক্তিরূপে দেখিলে তাহাই হইতেছে অগ্নি। 'আবিঃ' এ শব্দের শেষ অক্ষরটি 'র্' (অথবা 'স্') লক্ষ্য করিতে হইবে—অর্থাৎ ব্রহ্মের মূল প্রকাশ শক্তিরূপেই হইয়া থাকে। শক্তি ও শক্তিমানে কিন্তু ভেদ নাই। ব্রহ্মস্বরূপে যেটি প্রকাশ, সৃষ্টির অভিমুখে সেইটিই আবার ভর্গঃ = তেজঃ = অগ্নি। এইভাবে সেই আদিম রাত্রি হইল অগ্নি॥ ৭১॥

আবিরিতি প্রকাশস্য মূলা বৃত্তিশ্চ বিস্তৃতেঃ।
তদেবান্বেতি সর্ব্বাসু পরাসু সর্গবৃত্তিষু॥ ৭২॥

"আবিঃ"—এই প্রকাশ এবং বিস্তৃতির যেটি মূলরূপ, সেটি সৃষ্টির সকল বৃত্তিতেই অনুস্যূত রহিয়াছে। কি ভাবে? আবিঃ = আ + বি + র্। এই তিন অক্ষরে আমরা যথাক্রমে বায়ু, বিয়ৎ বা আকাশ ও বহ্নি—এই তিনটিকে প্রাপ্ত হই। মধ্যে

বিয়ৎ বা ব্যোমরূপে ব্রহ্ম আপনার অসীম বিস্তার করিয়াছেন। এ বিস্তার কেবলমাত্র দেশে বিস্তার নহে, এমন কি মাত্র কালেও নহে। দেশ-কাল-কারণাদির যে সীমাহীন ব্যাপ্তি, সেইটিই হইল এই বিশ্বের মৌলিক আধারপট। শব্দতত্ত্বের দিক হইতে ব্রহ্মের এই রূপটি হইল নাদ। এইজন্য এই উপোদ্ঘাতের তৃতীয় শ্লোকে 'আবীরূপেণ নাদঃ সমজনি বিততং ব্যোম সর্ব্বাশ্রয়ং যদ্'—এইভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই ব্যোম বা নাদরূপে দেশ, কাল, কারণতা প্রভৃতি সম্বন্ধের এখনও ব্যাস বা ব্যাকরণ হয় নাই। এই জপসূত্রের একটি সূত্রে "ওমেব ব্যোম" এইভাবে 'ওম্' ও 'ব্যোম' এই দুইয়ের অভিন্নতা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষ মাত্র এইটুকু যে 'ব্যোম' এই শব্দে একটি অতিরিক্ত 'বি' আছে যেটি = বিয়ৎ বা বিস্তৃতি। তারপর আবিঃ এই শব্দে লক্ষ্য কর যে মধ্যস্থলে 'বি'-কে আশ্রয় করিয়া দুটি পক্ষ রহিয়াছে—একটি আ = বায়ু (গত্যাত্মক), অপরটি র্ অথবা স্ = অগ্নি অথবা প্রাণ = বিশ্বের আদিম শক্তিরূপ। সুতরাং 'আবিঃ' এই শব্দে বুঝিতেছি যে ওঁকার ক্রিয়াত্মক ও শক্ত্যাত্মক—এই দুইভাবে এই বিশ্ব প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। প্রণবের মূর্তিতেও এই রহস্যটি আমরা দেখিতে পাই—একদিকে, অকার, উকার, মকার—এই কলাত্রয়রূপে প্রণবের বা নাদের ক্রিয়ারূপ; অন্যদিকে বিন্দুরূপে নাদের শক্তিরূপ। অতএব স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে ওঁকার হইতেই এই সমস্তের অভিব্যক্তি হইয়াছে এবং এ সমস্তই হইতেছে প্রণবের রূপ॥ ৭২॥

সমুদ্রোঽর্ণব আয়াতি হ্যাকারে রাত্রিমন্বিতে।
সংপরিষ্বক্তরূপোঽয়মব্যক্তত্বেঽপি চান্যথা॥
উচ্ছূনতা সমুদ্রেণ চার্ণবেনৈজনং সনাৎ।
তয়োরেব সমাসেন কারণস্য ক্রিয়োদ্যমঃ॥ ৭৩॥

তারপর সৃষ্টিসূক্তে দেখিতেছি—"সমুদ্রোঽর্ণবঃ"। এটি কোথা হইতে কি ভাবে আসিল? সকল সৃষ্টির আদিতে যে অনির্বাচ্য অব্যাকৃত অবস্থা, সেইটিই রাত্রিনামে অভিহিত হইয়াছে। ব্যষ্টির জীবনে এটি সুষুপ্তি। সুষুপ্তির সময়ে অজ্ঞান বা আবরণেরই জ্ঞান হইয়া থাকে। এই বিরাট বিশ্বেরও সুষুপ্তির মত একটা অবস্থা আছে। নিখিল সুষুপ্তিরূপ রাত্রি যখন 'আ'কার, কিনা, গত্যাত্মক বায়ুর দ্বারা ক্ষোভিত হয়, অর্থাৎ

সেই মহাসুষুপ্তির স্তব্ধতা যখন ভঙ্গোন্মুখ হয়, তখন তাহার কুক্ষিতে যে অনন্ত সংস্কাররাশি স্থিরভাবে ছিল, সেগুলি যেন চঞ্চল হইয়া উঠে; অথচ এখন পর্যন্ত তাহাদের বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিটি কার্যতঃ হয় নাই। এ অবস্থাটিও প্রায় অব্যক্ত হইলেও সুষুপ্তি বা রাত্রির মত একান্ত অব্যক্ত নহে। আমাদের সাধারণ অনুভূতির দিক হইতে সেই আদিম রাত্রিকে আমরা অন্য ভাবেও কল্পনা করিতে পারি। রূপ, রসাদি যা কিছু আমাদের অন্তরিন্দ্রিয়ের কিম্বা বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে, সেগুলি তো দেশকালের পটভূমিতে চলচ্চিত্রের মত। সেগুলি আসে কোথা হইতে, সেগুলির পশ্চাতে কি রহিয়াছে? এইভাবে জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। অনুসন্ধানের কোনো একটি ধারা অনুসরণ করিতে করিতে আমরা স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—এইভাবে ক্রমশঃ একটা মহা অজানার দিকে অগ্রসর হইতে থাকি। গীতা তাই বলিয়াছেন—ভূতসমূহ আদিতেও অব্যক্ত, অন্তিমেও অব্যক্ত, কেবল মাঝখানে কিছুটা ব্যক্ত। এই যে আদি এবং অন্তে একটা মহা অজানা, সেইটিই রাত্রি। অনেকের তত্ত্বদৃষ্টি জগতের মূল কারণ সম্বন্ধে এর বেশী আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। রাত্রির ওপারে কি আলোক, না রাত্রি জগতের মূল সম্বন্ধে শেষ কথা? আমরা আবিঃ ও রাত্রি এই দুই দিক দিয়া মূলটিকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। দুইটিই অনিরুক্ত ও অলক্ষণ বটে, তথাপি একটি প্রকাশস্বরূপ, অপরটি আবরণস্বরূপ। সৃষ্টির অভ্যন্তরে কোনো দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে দেখিলে, সৃষ্টির মূলটি রাত্রিই সন্দেহ নাই। বেদের নাসদীয় সূক্ত এবং মনুসংহিতা গোড়াতেই এই লক্ষণহীন, মহা অজানার কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু আবার "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—তমের পারে সাক্ষাৎ ভাস্বর আদিত্যের মত এক পরম প্রকাশ রহিয়াছেন,—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। এমন কি, সেই মূল রাত্রিকেও তিনিই প্রকাশ করেন। নচেৎ "আসীদিদং তমোভূতং"—এভাবে জ্ঞানই বা হইবে কিরূপে? সুষুপ্তিতে যেরূপ কিছুই ছিল না—এই প্রকার অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, জগতের সুষুপ্তি সম্বন্ধেও সেরূপ একটি নিত্য জ্ঞান অবশ্যই রহিয়াছে। চলচ্চিত্র আলোকে ফুটিতে থাকিলেও সেই নিত্যজ্ঞানই সেটিকে জানে, এবং চলচ্চিত্র অন্ধকারে মিলাইয়া যাইলেও সেই লয়টিকেও তাহা জানে। এ ছাড়াও সর্বতশ্চক্ষুঃ নিত্য-অকুণ্ঠিত-জ্ঞান যদি কোনো পুরুষ রহেন, তবে তাঁর দৃষ্টিতে জগতের কাছে যেটি তমসাচ্ছন্ন রাত্রি, সেটি হয় পৌর্ণমাসীর রাত্রি। রাত্রি হইয়াও, সেটি সেই পুরুষের পরম

পশ্যন্তী দৃষ্টিতে আপন মহা অজানার ভাণ্ডার আর অজানা করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ সমগ্রভাবেও জানেন, আবার বিশেষ বিশেষ ভাবেও জানেন। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী"—গীতার এই সংযমীটি যে কে তাহা ভুলিলে চলিবে না। রাত্রির এই দ্বিবিধ প্রকাশ (শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ ও সর্বজ্ঞ সর্ববিদের দ্বারা প্রকাশ) ছাড়াও তৃতীয় আর এক প্রকাশও আছে বা হইতে পারে। সেইটি হইতেছে রাত্রির শুক্লপক্ষে কলা বা আংশিক প্রকাশ। যে ভূমিতে নিরতিশয় সর্বজ্ঞত্ব বীজ নাই, অথচ বুদ্ধির স্বচ্ছতাবশতঃ সর্বজ্ঞতার মত একটা বোধ উদিত হইয়াছে, সে স্থলে রাত্রি শুক্লপক্ষের পৌর্ণমাসী না হইলেও তদপেক্ষা ন্যূন কোনো তিথির রাত্রি হইতে পারে। এইরূপ দৃষ্টি যোগজ দৃষ্টি। জগতের মূলটি এ দৃষ্টিতে সমগ্রভাবে জ্ঞাত না হইলেও আংশিকভাবে জ্ঞাত, এবং সে জ্ঞান ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষ রহিত বলিয়া যথার্থ জ্ঞান বলিয়াই বিবেচিত হইবার যোগ্য।

এইবার রাত্রি হইতে সমুদ্র ও অর্ণবের উৎপত্তি হইল—বেদের এই অংশের অর্থ আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে। সমুদ্র শব্দটির অক্ষর-সন্নিবেশ পরীক্ষা করিলে সমুদ্রতত্ত্বের যেটি অগাধ রহস্য সেটির কতকটা আভাস আমরা পাইতে পারি।

সমুদ্র=সম্+উৎ+র। ইহার দ্বারা কি বুঝিব? সৃষ্টির মূলে রাত্রিরূপ যে অব্যক্ত মহাবীজটি রহিয়াছে, সেটি যেন কিসের প্রেরণায় আপনাকে অভিব্যক্ত করার নিমিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। নিস্তরঙ্গ মহাসাগরে বায়ুবেগে যেমন একটা উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়—সেইপ্রকার। এখনও কোনো তরঙ্গ দেখা দেয় নাই। অব্যক্ত কারণের অভিব্যক্তির নিমিত্ত এই প্রকার যে আদিম উচ্ছ্বাস, 'সমুদ্র' এই শব্দের দ্বারা সেইটাকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। কেবলমাত্র বিশ্বসৃষ্টির আদিতে নহে, সকল প্রকার সৃষ্টির আদিতেই এই অব্যক্ত উচ্ছ্বাসটি রহিয়াছে, দেখিতে পাই। কবি বা শিল্পী যখন তাঁর কাব্য বা শিল্প সৃষ্টি করিতে উন্মুখ হন, তখনও তাঁর মধ্যে এই মৌন উচ্ছ্বাসটি প্রথমেই দেখা দেয়। এই উচ্ছ্বাস এখনও পর্যন্ত কোনো ভাষা বা চিত্র, অথবা সুরে নিজেকে ফুটাইয়া তোলে নাই। বাহিরের সৃষ্টিতেও এইটি ঘটিতে দেখি। একটা বীজ পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও তাহা হইতে অঙ্কুরোদগম হয় নাই। অঙ্কুর উদ্গামের সূচনা যখন হয়, তখন বীজের অভ্যন্তরে ঘুমন্ত শক্তি জাগ্রত হইয়া নিজেকে ছড়াইয়া দিতে চায়। তার ফলে, বীজ স্ফীত হইয়া উঠে। যে আবরণে সেই বীজের বিকাশের প্রস্রবণটি

এতদিন রুদ্ধ ছিল, সে আবরণটি যেন সহসা ফাটিয়া যায়। বীজটি যতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিল, ততক্ষণ বীজের পক্ষে সেটা 'রাত্রি'। অঙ্কুরের জন্য যখন সে ভাঙিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে, তখন বীজের ভিতরে যে অবস্থাটি আমরা পাই, সেইটি হইতেছে বীজের পক্ষে 'সমুদ্র'। এই সমুদ্রের আবার দুইটি রূপ : একটি হইল তার উচ্ছ্বাসরূপ, অপরটি হইল তার চঞ্চলতা। বীজ আর চুপটি করিয়া রহিবে না, সে আপন আবরণটি ভাঙিয়া বাহির হইল, অঙ্কুরাদিক্রমে বিচিত্র বিকাশের পথে সে এইবার যাত্রা করিবে। এইটি হইল তার চঞ্চল গতিরূপ। এই রূপটির বৈদিক পরিভাষা হইতেছে অর্ণব। গত্যর্থক ঋ (অথবা ঋণ) ধাতু এই শব্দের বীজ। সুতরাং 'সমুদ্র'—এই শব্দের দ্বারা উচ্ছ্বাস বা উচ্ছূনতা এবং 'অর্ণব' এই শব্দের দ্বারা 'এজন' বা গতি—এই দুইটি দিকই আমরা একসঙ্গে পাইতেছি। মূলে রাত্রিতে উপাদানভূত শক্তিসমূহের যে সাম্যাবস্থা ছিল, এখন পর্যন্ত সে সাম্যাবস্থায় বিসদৃশ পরিণাম স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। শক্তিগুলি পিণ্ডাবস্থা হইতে পরস্পর তফাৎ হইতে চাহিয়াও এখনো পর্যন্ত পরস্পরের আলিঙ্গনমুক্ত হইতে পারে নাই। রাত্রির অবস্থায় শক্তিব্যূহের যে pattern বা আকৃতিটি ছিল, সেটি চঞ্চল হইয়াও এখনও বজায় রহিয়াছে। এইটাকে 'সম্পরিষ্বক্ত' অবস্থা বলে। এ অবস্থাটি অব্যক্ত হইয়াও আবার অব্যক্ত নহে। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি এই অবস্থার প্রতীক। অব্যক্ত এবং ব্যক্তের মাঝখানে এই অবস্থাটি আসিয়া থাকে। যে কোনো কারণ হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে গেলে এই সম্পরিষ্বক্ত অবস্থা—অর্থাৎ বেদের "সমুদ্রোঽর্ণবঃ" অবশ্যই পাইতে হয়॥ ৭৩॥

আবিরিতি তমশ্ছিদ্ যা রাত্রৌ গম্ভীরবাধতা।
বিদ্যুত্বত্যম্ভসাং রোধরূপতয়া চ কল্পিতা।
মঘবামোঘবজ্রেণ তাং বারয়তি বৃত্রহা॥ ৭৪॥

তমশ্ছিদ্ বা তমোহারী যে প্রকাশ, সেইটি আবিঃ। রাত্রিতে প্রকাশের একটা গহন গম্ভীর বাধরূপতা বিদ্যমান থাকে। বেদের অনেক উপাখ্যানে মেঘে জলের রোধ বা বাধারূপে এইটি কল্পিত হইয়াছে; অর্থাৎ মেঘ হইয়াছে, বিদ্যুতের চমক দেখিতেছি কিন্তু বৃষ্টি পড়িতেছে না। কি বা কিসে যেন মেঘের জলবিন্দুকে মিলিত এবং ভূতলে পতিত হইতে দিতেছে না। এই রোধরূপতাকে বেদ অনেক স্থলে 'বৃত্র' এই আখ্যা

দিয়াছেন। ইন্দ্র তদীয় অমোঘ বজ্রের দ্বারা এই রোধিকা শক্তিকে বিচূর্ণ করিয়া বারিবর্ষণের সম্ভাবনা ঘটাইয়া দেন। কেবল মেঘ বলিয়া নয়, নিখিল পদার্থের বিকাশের মুখে এই রোধরূপ বাধা বিদ্যমান থাকে। আমরা পরে দেখিব যে এই রোধরূপ বাধা চতুর্বিধ—দেশনিমিত্ত (অবরোধ), কালনিমিত্ত (প্রতিরোধ), ছন্দোনিমিত্ত (বিরোধ), এবং বস্তুনিমিত্ত (নিরোধ)। 'সমুদ্র'-এই অবস্থায় এই চতুর্বিধ বাধাই এখনও রোধরূপে রহিয়াছে, কিন্তু সে বাধাটি বিদূরিত করার নিমিত্ত একটা আবেগ বা প্রয়াসও যেন ভিতর হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে। এই অবস্থাটির নাম উচ্ছ্বাস বা উচ্ছূনতা॥ ৭৪॥

ক্রিয়ামারভমাণে চার্ণবে কলনবৃত্তিতা।
যয়া রূপায়তে বিশ্বং সৃষ্টিস্থিতিলয়ক্রমাৎ॥ ৭৫॥

তারপর, 'সমুদ্র' যখন 'অর্ণব' হইল, তখন তাতে একটি অভিনব বৃত্তি দেখা দিল। সেই বৃত্তিকে বলিব কলনবৃত্তি। ইহাই কালশক্তি। এ পর্যন্ত মূলতত্ত্বের যে পরিণাম, সেটি কালকে আশ্রয় করিয়া নহে। সেটি অকাল বৌদ্ধ পরিণাম। কিন্তু 'অর্ণব' অবস্থায় কলনবৃত্তি, সুতরাং কালিক পরিণাম আরম্ভ হইল। ইহার ফলে, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ক্রমে নিখিল বিশ্ব রূপায়িত হইতে থাকে॥ ৭৫॥

সাবির্ভবতি তস্যা হি সংবৎসর ইতীক্ষণম্।
যতো দ্বৈতমহোরাত্রং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ পুনঃ॥ ৭৬॥

সেই আদি কলনবৃত্তি 'আমি সংবৎসর হইব' এইভাবে ঈক্ষণ করেন। তাহা হইতে সংবৎসররূপ ক্রমিক কালের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ কালের যেটি কলন, সেটি অক্রমিক এবং ক্রমিক—এই দুই রূপেই বুঝিতে হইবে। কলাকাষ্ঠাদিরূপে কাল ক্রমিক হইলে তাহার আখ্যা হইল সংবৎসর। 'বৎসর' এবং 'সংবৎসর'—এই শব্দ দুইটিকে আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। সৃষ্টিসূক্তে যে 'সংবৎসর' শব্দটি রহিয়াছে, সেটি কলনবৃত্তির একটি বিশেষ রূপ তা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই 'সংবৎসর'—এইরূপ ঈক্ষণের পর 'অহোরাত্র' এবং তাদের বিধায়ক সূর্য ও চন্দ্রমার উৎপত্তি হইল। একটা অনন্ত ক্রমিক কলনধারার মধ্যে আবৃত্তি বা পালা

দেখা দিল। সকল প্রকার আনুক্রমিক গতি বা rhythmic movement-এর বীজ এইখানে। স্থূলে, সূক্ষ্মে—সর্বত্র। এখন কালস্রোত কেবলমাত্র একটি ধারা নহে; এই ধারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; হেলিতেছে, দুলিতেছে, তরঙ্গায়িত হইতেছে; চক্রগতিতে কিম্বা শঙ্খাবৃত্ত গতিতে ইহা নিজেকে রূপায়িত করিতেছে। এবম্প্রকার গতির নিমিত্ত দুইটি পক্ষ এবং দুইটি সীমার আবশ্যকতা হয়। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা—'অহোরাত্র' এবং 'অহোরাত্রে'র গতিসীমা যদ্দ্বারা নিরূপিত হয়, তাহার সাধারণ সংজ্ঞা—হইতেছে . "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ"। বলা বাহুল্য, এগুলিও বিশ্বের মূলীভূত তত্ত্ব, স্থূলভাবে বুঝিলে চলিবে না॥ ৭৬॥

অহঃ শুক্লং ক্ষপা কৃষ্ণা দ্বে গতী সর্ব্ববৃত্তিষু।
ঋচা সাম্না চ কল্প্যেতেঽর্কেন্দু চ ভর্গরোচিষী॥ ৭৭॥

পুনশ্চ, অহঃকে শুক্ল এবং ক্ষপাকে কৃষ্ণা—এইভাবে অভিহিত করা হয়। সকল পদার্থের সকল বৃত্তিতে শুক্ল এবং কৃষ্ণ—এই দুইটি গতি অনুসন্ধান করিতে হইবে। একটি প্রকাশ বিকাশের দিকে গতি, অপরটি বিক্ষেপ ও আবরণের দিকে গতি। একটি ধন অপরটি ঋণ। ঋক্ এবং সাম—উভয়ই ঋক্ এবং উদ্‌গীথ দ্বারা অর্ক এবং ইন্দুরূপে, এবং ভর্গঃ ও রোচিঃরূপে এই দুইটিকে কল্পনা করিয়াছেন॥ ৭৭॥

সুয়ত ঋধ্যতে যেন তেজো ভুবননাভিষু।
সবিতেতি চ তং বিদ্ধি পূষেতি ভর্গরূপিণম্॥ ৭৮॥

নিখিল ভুবনের নাভিতে যে তেজঃ শক্তি রহিয়াছে, সেই তেজঃ শক্তিকে যিনি প্রসব করেন ও পোষণ করেন, সেই সাক্ষাৎ ভর্গরূপী দেবতাকে সবিতা ও পূষা বলিয়া জানিবে॥ ৭৮॥

নিখিলনাভিনিষ্ঠেন সূর্য্যনারায়ণেন বৈ।
অরনেমিবিভেদেন কল্পিতা বিশ্বচক্রতা॥ ৭৯॥

নিখিল পদার্থের নাভিনিষ্ঠ ভগবান সূর্যনারায়ণ, অর ও নেমি এই প্রকার বিভাগ দ্বারা এই ভুবনচক্রটিকে কল্পনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি স্বয়ং কেন্দ্রে অবস্থিত হইয়া

অর, নেমি বিস্তারপূর্বক এই ভুবনচক্র রচনা করিয়া ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন ও পোষণ করিতেছেন॥ ৭৯॥

অণীয়ানণুতৌকঃসু মহীয়ান্ ব্যোমনীশ্বরঃ
সঙ্কর্ষণঃ স নোদেতি নাস্তমেতি স্বরূপতঃ॥ ৮০॥

তিনি 'ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে' ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্ররূপে অনুপ্রবিষ্ট; আবার মহৎ হইতে মহান যে ব্যোম, তাহাতে মহীয়ান্‌রূপে তিনি ঈশ্বর, কিনা, প্রভু। ইহাকে মহাসঙ্কর্ষণরূপে জানিবে। পরিদৃশ্যমান সূর্যের মত ইঁহার স্বরূপতঃ উদয়ও নাই, অস্তও নাই॥ ৮০॥

নাভৌ সঙ্কর্ষণোঽব্যান্নো নেমৌ প্রদ্যুম্নবিগ্রহঃ।
অরেষু চানিরুদ্ধশ্চ বাসুদেবো হি সর্ব্বতঃ॥ ৮১॥

নাভিতে সঙ্কর্ষণ আমাদের রক্ষা করুন, নেমিতে যিনি প্রদ্যুম্নবিগ্রহ তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অরসমূহে অনিরুদ্ধ আমাদের রক্ষা করুন, এবং সর্বতঃ সর্বদিকে সর্বভাবে বাসুদেব আমাদের রক্ষা করুন॥ ৮১॥

সঙ্কর্ষণঞ্চ কূর্ম্মাখ্যং বিন্দুরূপমপি ক্রমাৎ।
তৌ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধৌ চ বরাহমীনবিগ্রহৌ।
বিজানীয়াৎ কলানাদৌ বাসুদেবং পরাৎপরম্।
বিন্দুনাদকলাত্মানং বিন্দুনাদকলাতিগম্॥ ৮২॥

পুনশ্চ, সঙ্কর্ষণকে বিন্দুরূপে ও কূর্মরূপে জানিবে, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধকে কলা, নাদরূপে এবং বরাহ মীনরূপে জানিবে, এবং পরাৎপর বাসুদেবকে বিন্দ্নাদকলাত্মা এবং বিন্দুনাদকলাতীত—এই দুইভাবেই জানিবে॥ ৮২॥

কলারূপতয়া নেমি র্বিদধানা ক্ষয়োদয়ৌ।
নাভেররাগতানংশূংশ্চিন্বানা কেন ছন্দসা॥ ৮৩॥

নেমি কলারূপতা-বশতঃ সকল পদার্থের ক্ষয় ও উদয় বিধান করিয়া থাকে, অর্থাৎ সকল পদার্থের ক্ষয় এবং উদয় হইয়া থাকে এই কারণেই যে তাদের যেটি আকৃতি ও

অবয়ব সেটি কলাধর্মী; তাদের কলা আছে, সুতরাং তাদের ক্ষয় ও পুরণরূপ পরিবর্তন ধর্মটিও আছে। কিন্তু নাভি হইল সকল তেজঃ বা শক্তির ভাণ্ডার। নাভিকেন্দ্র হইতেই শক্তি ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যবস্থিত রেখায় নাভিকেন্দ্র হইতে শক্তিরশ্মিসমূহের বিকিরণ হয়, সেইগুলিকে বলে অর। সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে এই যে নাভিকেন্দ্র হইতে যে রশ্মিসমূহ (raditions) বিকীর্ণ হইতেছে, কলাত্মক নেমি কোন্ ছন্দঃ দ্বারা সেগুলিকে আপন ক্ষয় ও পূরণের নিমিত্ত বাছিয়া লইয়া থাকে?॥৮৩॥

পুষ্ণাত্যন্নঞ্চ সর্ব্বস্মৈ যদোষধ্যুপলক্ষণম্।
সোম গতাগতিচক্রং বিভর্ত্তি ক্ষয়পূরণাৎ॥৮৪॥

(পরা জাতিভাবে দেখিলে সেই ছন্দঃ দ্বিবিধ—সোমচ্ছন্দঃ এবং অগ্নিচ্ছন্দঃ)। এই বিরাট গতাগতিরূপ ভুবনচক্রের ক্ষয়ের পূরণার্থ যে ছন্দঃ, (জড়, উদ্ভিদ, চেতন) সকলের নিমিত্তই "অন্ন"কে পোষণ করেন, তাঁকে সোম বলিয়া জানিবে; "ওষধি" একটি তাঁর উপলক্ষণ॥৮৪॥

নেমিবৃত্ত্যা পরাগ্ বৃত্তিরাবৃত্তির্ধূমযানতঃ।
নাভাবর্কং তু বিধ্যেতার্চিরাদিনা য ঈয়িষুঃ॥৮৫॥

(বলা বাহুল্য, অগ্নিচ্ছন্দঃ দ্বারা সকল কিছুর দহন, পচন, ক্ষরণ হইতেছে। আমরা দেখিব যে ইহার কালাগ্নিরুদ্র প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়াত্মক বিবিধ রূপ রহিয়াছে। বস্তুতঃ, নিখিল পদার্থের অঙ্গসমূহ রূপায়িত করিয়া আছেন অগ্নি—রূপ,—পৃথুলেখ, তনুলেখ, অণুলেখ যে ভাবেই দেখি না কেন।)

এই মহা গতাগতিচক্রের নেমি (নী ধাতু) বা পরিধিতেই যদি বৃত্তি চলিতে থাকে, তবে সেটি পরাগ্‌বৃত্তি। তার ফলে, ধূমযান দ্বারা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিই হইতে থাকে। এই "চলতি চাক্কি"র ঘূর্ণন ও পেষণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই নিরন্তর আবর্তনটি কাটাইবার নিমিত্ত যিনি অর্চিরাদি মার্গে চলিতে ইচ্ছুক, তাঁকে প্রত্যগ্‌বৃত্তি আশ্রয় করতঃ ভুবনের নাভিতে (Nucleus-এ) যে (কাল ও যমরূপে) অর্ক রহিয়াছেন, তাঁকেই ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। চক্রের নাভির ভিতর দিয়াই সেই ক্ষুরের ধারের মত নিশিত পথ॥৮৫॥

ভূরিতি নেমিতা জ্ঞেয়া হ্যরতেতি ভুবর্ম্মতা।
নাভিতা স্বরিতীখণ্ড সর্গে কল্পিতচক্রতা॥৮৬॥

'ভূঃ' এইটি নেমিতা, 'ভুবঃ' এইটি অরতা, 'স্বঃ' এইটি নাভিতা—এইভাবে স্থূল-সূক্ষ্ম, ব্যষ্টি-সমষ্টি ইত্যাদি সকল সর্গের চক্রতা কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে॥৮৬॥

নাভিনেমিক্রিয়াশক্তি-তরতমতয়া পুনঃ।
অরাণামন্তরীক্ষস্য সংস্থাবিশেষভাবনাৎ।
সপ্তব্যাহৃতিভিশ্চক্রে শঙ্খাবৃত্তেন বৃত্তিতা॥৮৭॥

নাভিতে স্বঃ, নেমিতে ভূঃ—উভয়ত্র শক্তি। নাভিতে শক্তির ঘন (কারক) রূপ, নেমিতে বিতত (ক্রিয়া) রূপ। এই নাভিশক্তি (Nuclear Evolving Power) এবং নেমিশক্তি (Revolving Power) সর্বত্র পরস্পরের সঙ্গে একই অনুপাত রাখিয়া নাই; অনুপাতে তরতমতা রহিয়াছে। এই কারণে 'চক্র'টি স্থির (stable) নয়, সঙ্কোচ-বিকাশধর্মী। চক্রের যেটি বর্তমান সংস্থা (configuration scheme) সেটির নিরূপক (determinant) হইতেছে 'অন্তরিক্ষ'='অর'=দেশকালাদিগত ব্যবধান (Time-space-power-interval)। এই ব্যবধান বা সংস্থানিয়ামক যে অন্তরিক্ষ বা অরসমূহ, সে সকল যখন ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্ত ব্যাহৃতি দ্বারা 'রূপায়িত' হয়, তখন চক্রের যে বিশেষ ভঙ্গীটি হইয়া থাকে, তাকে বলে শঙ্খাবৃত্তভঙ্গী। সুতরাং তখন চক্রের বৃত্তিতা শঙ্খাবৃত্তবৃত্তিতা (Movement in accordance with spiral pattern) আকার ধারণ করে॥৮৭॥

শঙ্খাবৃত্তের্ধুরং বিদ্ধ্যক্ষরূপামূর্দ্ধগাং পুনঃ।
সৌষুম্নমার্গমিত্যেবং চক্রভিদ্ বিরজা যতঃ॥৮৮॥

শঙ্খাবৃত্তিতে যেটি 'ধুর', সেটিকে 'ঊর্দ্ধগ অক্ষ' (Axis of Ascent) রূপে বুঝিতে হইবে। নিখিল পদার্থে এইটি 'সৌষুম্নমার্গ'। ইহা দ্বারা চক্রাবৃত্তি হইতে শঙ্খাবৃত্তবৃত্তিতে অক্ষাশ্রয়ী ঊর্দ্ধপ্রবাহ সম্ভাবিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার আশ্রয়ে

'চক্রভেদ' হয় এবং তার ফলে শান্তরজাঃ এবং বিরজাঃ হইতে পারা যায়। জড় ও প্রাণের ক্ষেত্রেও 'সৌষুম্নমার্গ' আশ্রয়েই পদার্থের বস্তু এবং শক্তির (matter and momentum-এর) নৈসর্গিক জড়তা (inertia) কাটাইয়া অভ্যুদয় ও বিবর্তন (Evolution and Emergence) সম্ভবপর হইয়া থাকে॥ ৮৮॥

অকারশ্চক্ররূপঃ স্যান্মকারে শঙ্খরূপতা।
উকারেণাক্ষসূত্রেণ চক্রং শঙ্খায়তেঽঞ্জসা॥ ৮৯॥

চক্র শঙ্খাকারে সত্বর রূপায়িত হইবে কিরূপে? প্রণবই হইতেছে তাহার মুখ্য সাধন। প্রণবের 'অ'কারে চক্ররূপতা আছে এবং 'ম'কারে শঙ্খরূপতা আছে; মধ্যে যেটি 'উ'কার সেইটি হইতেছে অক্ষ। এই 'উ'কাররূপ অক্ষের আশ্রয়েই যেটি চক্ররূপ সেটিকে শঙ্খরূপে পরিণত করিতে হইবে॥ ৮৯॥

শঙ্খত্বে নাদতাব্যক্তিঃ শঙ্খোঽপি কমলায়তে।
নাদবিন্দুকলাত্বেন ভূয়স্যা গদয়া গিরা॥ ৯০॥

চক্র যখন শঙ্খায়মান হয়, তখন নাদের অভিব্যক্তি সম্ভব হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রণব অথবা অন্য কোনো বীজমন্ত্রের চক্রাবৃত্তি মাত্র হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত নাদের অনুসন্ধান হয় না। প্রণবের 'অ'কার, 'উ'কার, 'ম'কার—এই মাত্রাত্রয় আবৃত্তি করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ইহাদের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূলাধারস্বরূপ যে নাদ, তিনি আমাদের কৃপা করিতেছেন না। জপাদির ফলে যখন আবৃত্তিচক্র আর চক্র না রহিয়া শঙ্খাকারে ঊর্দ্ধগ অক্ষাশ্রয় লাভ করে, তখন নাদের কৃপা আমরা প্রাপ্ত হই। তখন সংখ্যাজপ শঙ্খাবৃত্ত জপে পরিণত হয়। পুনশ্চ, শঙ্খ আবার গদা এবং পদ্ম—এই দুইভাবেও বিবর্তিত হইয়া থাকে। সেই বিবর্তনের ফলে মন্ত্র নাদ-বিন্দু-কলা এই তিন স্বরূপে অতীতরূপেও নিরতিশয় প্রকাশ প্রাপ্ত হন। কমলরূপে নাদবিন্দুকলার পূর্ণ বিকাশ এবং গদারূপে পরম অব্যক্ত যে পরাবাক্ তাতেই নাদবিন্দুকলার লয় হইয়া থাকে। প্রণবাদি বীজমন্ত্রের সাধনে শ্রীহরি এবং শ্রীগণপতির হস্তে চক্র, শঙ্খ, পদ্ম এবং গদাকে এই রহস্যরূপে আমাদিগকে দেখিতে হইবে॥ ৯০॥

একায়নো দ্বিপক্ষশ্চ ত্রিশিরাস্ত্রিরুতঃ খগঃ।
ত্রিনেত্রশ্চ চতুষ্পাদ্ যশ্চতুর্নাগাশনো বলী॥
হিরণ্যপুচ্ছপঞ্চভ্যঃ পঞ্চগঙ্গাম্বুগোমুখঃ।
ষড়ূর্ম্মিশমনচ্ছন্দাঃ ষড়্যোগৈঃ কৃৎস্নকামধুক্॥
সপ্তধামসু সপ্তান্নো গায়তি মান্ত্রবর্ণিকঃ।
অভ্যারোহয়তীত্যস্মাৎ ক্ষরাদক্ষর উচ্যতে॥ ৯১॥

এইবার এক রহস্যময় খগের (পক্ষীর) কথা বলা হইতেছে। সেই খগেন্দ্র একায়ন, অর্থাৎ, তাঁর গতি এক লক্ষ্যাভিমুখেই। তিনি আবার দ্বিপক্ষ—বাক্ ও প্রাণ, অথবা প্রাণ ও অপান, অথবা শুক্ল ও কৃষ্ণ—এইগুলি তাঁহার দুইটি পক্ষ। তাঁহার তিনটি শির এবং তিনটি 'রুত' বা রব। তিনটি শির হইতেছেঃ নাদ, বিন্দু, কলা (অথবা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ); তিনটি রুত বা রব হইতেঃ বাচিক, উপাংশু, মানস (অথবা, অ, উ; ম)। তিনি ত্রিনেত্র—বহিঃপ্রজ্ঞা (জাগ্রৎ), অন্তঃপ্রজ্ঞা+ঘনপ্রজ্ঞা (মননাদি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি) এবং অনির্বাণপ্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং তুরীয়)। তিনি চতুষ্পাৎ—মাত্রাত্রয় এবং অর্দ্ধমাত্র-অমাত্র, অথবা বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও পরা। তিনি মহাবলী চারিটি 'নাগ'কে ভক্ষণ করেন। চারিটি নাগ—অবরোধ, প্রতিরোধ, বিরোধ ও নিরোধ—এই চারিটি (দেশাদিনিমিত্ত) বাধা। হিরণ্ময় পঞ্চ পুচ্ছ দ্বারা ইনি শোভিত। পূর্বোক্ত পঞ্চ শুদ্ধি ইহার পঞ্চপুচ্ছ (প্রতিষ্ঠা) মনে করিতে পারি। ইনি আপনার গোমুখ (গো=বাক) দ্বারা পূর্বোক্ত সংগ্রহাখ্যাদি পঞ্চগঙ্গাবারি বিশ্বজীবের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের নিমিত্ত সমন্তাৎ প্রবাহিত করেন। ইহার গতিস্থিতি লয়াদির যেটি ছন্দঃ, তদ্দ্বারা অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ এবং তাদের বিপাক—এই ষড়ূর্মি প্রশমন হইয়া থাকে। ক্রিয়া, স্মৃতি, অনুস্মৃতি, ধ্যান, অনুধ্যান এবং (ধ্রুবলম্ভ জনিত) সম্ভাব্য-ভাবন—এই ষড়্যোগের দ্বারা নিখিল ইষ্টকাম দোহন করিতে ইনি সমর্থ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত "লোক" (অথবা বাক্ ও জীব—এই দুইটির অন্তর্ভাবে অন্নাদি সপ্ত "কোষ") ইহার সপ্তধাম। এই সপ্তধামে ইনি সপ্ত "অন্ন" (স্থূল, তনুস্থূল, অণুস্থূল; সূক্ষ্ম, তনুসূক্ষ্ম, অণুসূক্ষ্ম; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা পরম—এই সাতটি) গ্রহণ করেন। ইনি মন্ত্রবর্ণসমূহ দ্বারা "গায়তি" কিনা, উদ্‌গীথরূপে (স্বরাদি সহায়ে) গীত

হইয়া থাকেন। যেহেতু 'ক্ষর' (অসৎ, তমঃ এবং মৃত্যু) হইতে 'অক্ষরে' (সৎ, জ্যোতিঃ, অমৃতে) আরোহণটি ইহার দ্বারা হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত এই রহস্যবিগ্রহ খগ 'অক্ষর' নামে অভিহিত॥ ৯১॥

যোগস্বাপং পুমান্ যঃ প্রলয়জলনিধৌ মায়য়া সেবমানঃ
শেতে সোঽয়ং পদ্মনাভোঽবতি নিখিলসৃজাং বেদবাচাং নিবাসম্।
জাগর্ত্বেষ প্রসন্নঃ প্রভবতু হৃদি বঃ শুদ্ধসত্ত্বোর্জ্জিতৌজা।
ঘোরং মূঢ়ং সপত্নং সপদি নিরসয়ন্ বাগ্‌ভবৈরিধ্যমানঃ॥ ৯২॥

যে আদি পুরুষ আপন অচিন্ত্য মায়াশক্তিতে প্রলয়পয়োধিজলে যোগনিদ্রা আশ্রয় করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি পদ্মনাভিরূপে নিখিল পদার্থের সৃষ্টিবীজ যে দেববাণী, সেই দেববাণীর যিনি নিবাস তাঁহাকে (অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে) রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই শুদ্ধ সত্ত্বোর্জিতবপু উত্তমৌজা নারায়ণ তোমাদের হৃদয়েও (যোগনিদ্রা হইতে) জাগ্রত হউন, এবং 'ঐং'—এই বাগ্‌ভব বীজের দ্বারা সম্যক প্রদীপ্তচৈতন্য হইয়া তোমাদের ঘোর এবং মূঢ় (মধু ও কৈটভ) এই দুইটি যে চিরশত্রু রহিয়াছে, সে দুইটিকে অচিরে নিরসনপূর্বক আপন প্রসন্ন প্রভাব বিস্তার করুন।

কালিন্দীরোধসীশো ললিতসুরগিরাং বেণুগীতৈর্হরির্যঃ
শৈলান্ বিদ্রবয়ং স্তৈঃ প্রকটয়তি পরাং বাচমোঙ্কারযোনিম্।
সম্যকসন্ধানশূরো গময়তি নিধনং রাঘবো যো দশাস্যং
প্রত্যক্‌চৈতন্যমূর্ত্তী বচসি বিহরতামত্র তৌ রামকৃষ্ণৌ॥ ৯৩॥

ললিত সুরলহরীর প্রভু যে হরি কালিন্দীপুলিনে আপন বেণুসঙ্গীতে শৈল-সমূহকেও বিগলিত করেন এবং ওঁঙ্কারের যোনি যে পরাবাক্ সেটিকেও সম্যক প্রকটিত (ও লীলায়িত) করেন; যিনি আবার রঘুপতি রাঘবরূপে সম্যক সন্ধান-নিপুণ শর দ্বারা দশাননকে নিধন করেন, সেই দুই সাক্ষাৎ চৈতন্যমূর্তি—রাম ও কৃষ্ণ আমাদের এই বাক্যে বিহার করিতে থাকুন॥ ৯৩॥

স্ফারাস্যং ব্রহ্মসূক্তং প্রমিতিবুতিরদং সম্যগুদ্গীথশুণ্ডং
দ্বে বিদ্যে যত্র নেত্রে বিশদপরিচয়াপাস্ততামিস্রভালম্।
মন্ত্রং বক্ষশ্চ পার্শ্বৌ যতিততিকুশলৌ দোষ ঋষ্যাদয়শ্চ
মাত্রাদ্যৈস্তে সমাদ্যাঃ সকলমখতনুং নৌমি সিদ্ধ্যৃদ্ধিপাদম্॥৯৪॥

শ্রীগণপতির মূর্তিটি বড়ই রহস্যময়। তাই এখানে প্রথমতঃ তাঁর প্রতিটি অঙ্গের—মস্তক হইতে পাদ পর্যন্ত সকল অঙ্গের তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

শ্রীগণেশ হইলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি প্রবর্তক। তাই তাঁর মুখকমল যেন সাক্ষাৎ প্রকটিত বেদবাণী। 'স্ফার' বা নাদময়ী যে 'ব্রহ্ম' বা শ্রুতি, সেই শ্রুতি বা বেদের 'সূক্ত' বা মন্ত্রই হইতেছে গণপতির 'বক্ত্র', অর্থাৎ তাঁর বদন-কমল যেন বেদমন্ত্রেরই প্রকট মূর্তি।

তারপর, তাঁর 'রদ' বা দন্ত কাহাকে বুঝাইতেছে? 'প্রমিতি' বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞানরূপ যে 'বুতি' বা শব্দ তাহাই তাঁর দন্ত।

আর 'সম্যক্' বা যথাযথভাবে নিষ্পন্ন যে 'উদ্গীথ' বা ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত যে উদ্গান, তাহাই তাঁর শুণ্ড। এই শুণ্ডের দ্বারাই যেন ঊর্ধ্বে উত্তোলনরূপ উদ্গীথক্রিয়াটি সূচিত হইতেছে। তাই তিনি শুণ্ডধারী।

তারপর, তাঁর নয়ন দুটিতে দৃষ্টি দিলে মনে হয় সে দুটি যেন দুটি বিদ্যা অর্থাৎ পরা এবং অপরারূপ উপনিষদুক্ত প্রসিদ্ধ দুটি বিদ্যাই যেন তাঁর দুটি নেত্র। কোনো জ্ঞান বা কোন বিদ্যাই—তা সে জাগতিক জ্ঞানই হোক বা পারমার্থিক জ্ঞানই হোক—যে তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত নয়, তাহাই জানাইবার জন্য যেন তিনি আপন নয়নজ্যোতিতে দুই বিদ্যাকেই প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন।

শ্রীগণেশের ললাটদেশ শুভ্র সমুজ্জ্বল, যদিও তাঁর সমগ্র বদনটি রক্তবর্ণ। ইহা বুঝাইয়া দিতেছে যে পূর্বোক্ত দ্বিবিধ বিদ্যাতেই তাঁর বিশদ বা সম্যক পরিচয় আছে। এই সম্যক পরিচয় বা বিজ্ঞানের অভাবেই নারদ শোকের এবং তমসের পারে যাইতে পারেন নাই, তাই গুরু সনৎকুমারের শরণাগত হইয়াছিলেন, যিনি 'তমসস্পারং দর্শয়তি'। কিন্তু গণেশের সমুজ্জ্বল ললাটই জানাইয়া দিতেছে যে তাঁর এই দ্বিবিধ

বিদ্যাতে শুধু সামান্য জ্ঞানই নাই, বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞানও রহিয়াছে এবং তার ফলেই অর্থাৎ এই বিশদ পরিচয় হেতুই সমস্ত তমিস্রা বা অজ্ঞান অন্ধকার অপগত বা অপাস্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান ভাতিতে ললাটদেশ তাই সমুজ্জ্বল, প্রতিভার ছটায় তাহা ভাস্বর।

তাঁর বক্ষোদেশ বা হৃদয়ই হইতেছে মন্ত্র। শ্রীগণেশের মর্মস্থলটিই হইতেছে মন্ত্র এবং 'যতি' ও 'ততি' অর্থাৎ যন্ত্র ও তন্ত্রে যে কুশলতা, তাই তাঁর দুই পার্শ্বদেশ। সুতরাং মধ্যস্থলে মন্ত্র এবং দুই পার্শ্বে যন্ত্র ও তন্ত্র এইভাবে তিনি মন্ত্র, যন্ত্র ও তন্ত্রের সম্মিলিত মূর্তি।

আর তাঁর 'দোষঃ' কিনা বাহুগুলি, অর্থাৎ চারিটি বাহু হইতেছে—ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগ। মন্ত্র যেমন তাঁর মর্মস্থল, তেমনি সেই মন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগবিধি জানাইবার জন্য যেন তাঁর চারিটি বাহু মন্ত্রের অপরিহার্য চারিটি অঙ্গকে জানাইতেছে।

সেই চারিটি বাহুতে আবার তিনি ধারণ করিয়া আছেন—মাত্রা, পাদ, কলা ও কাষ্ঠা। ছন্দোরূপ হস্তে তাঁর মাত্রা, বিনিয়োগরূপ হস্তে পাদ, ঋষিরূপ হস্তে কলা এবং দেবতারূপ হস্তে কাষ্ঠা। এইরূপে তাঁর চারিটি হস্ত মাত্রাদি দ্বারা 'সমাঢ্য' বা সমৃদ্ধ হইয়াছে।

আর তাঁর সমস্ত তনু বা দেহটিই হইল যজ্ঞময়—তিনি 'সকলমখতনু'। সকল যজ্ঞ অর্থাৎ গীতোক্ত দ্রব্যযজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মযজ্ঞ পর্যন্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞই তাঁর তনুটি নির্মাণ করিয়াছে। তাঁর দেহের সিন্দুরবর্ণ এই যজ্ঞাগ্নির বর্ণ, রক্তবর্ণকেই জানাইয়া দিতেছে।

শ্রীগণেশের চরণযুগল—ঋদ্ধি ও সিদ্ধি। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—সবই তাঁর চরণ দুটিতে আশ্রিত। এমন শ্রীগণেশকে নমস্কার॥ ৯৪॥

ব্যূহং জিঘ্নং ব্যদারীদূতচরিতদতা দন্তিযূথেশতুণ্ডো
ব্যামোহঞ্চ ব্যতহীদ্ ব্যসনপরিকরং তূর্ণমোঙ্কারশুণ্ডঃ।
নাদস্পন্দস্ফুরত্তাহ্বুণরুচিরতনুঃ স্বিন্নবিন্দ্বচ্ছমৌলি
র্মাত্রাক্৯প্তৈঃ স দোর্ভির্জয়তু গণপতি স্তুর্য্যপশ্যদ্দ্বিনেত্রঃ॥ ৯৫॥

গণপতির ঐ রহস্যমূর্তিটি প্রকারান্তরে ভাবনা কর।

মাতঙ্গ-যূথপতি অরণ্যে বিচরণকালে বৃক্ষলতাদি নির্মিত দুর্গম ব্যূহও অবলীলাক্রমে বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হয়; আবার, রণস্থলে শত্রুরচিত জটিল দুর্ভেদ্য ব্যূহও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। সেইরূপ জীবনের অন্তর্বহিঃ নিখিল বাধাবিঘ্ন যৎকালে ব্যূহরচনা করিয়া তার দুশ্ছেদ্য কৌটিল্যপাশে (জিহ্ম) তাকে অবরুদ্ধ করিয়া তার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে, তখন দন্তি-যুথপতির মতই তাঁর (অসীমশৌর্য্যসমন্বিত) বক্ত্র হইতে (এক পরমাদ্ভুত) দন্তবিস্তার করিয়া তিনি সেই ব্যূহ সমূলে বিনষ্ট করেন। (ইতঃপূর্বে তিনি তাহাই করিয়াছিলেন, সুতরাং বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও তাহাই করিবেন—ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। ক্রিয়ায় অতীতকালের প্রয়োগ ইহাই সূচিত করিতেছে। "যদা যদা মহাবাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি"—ইত্যাদি)। আচ্ছা, তাঁর ওই পরমরহস্যময় দন্ত দ্বারা কি বুঝিতে হইবে? বুঝিতে হইবে—ঋতচরিত—ঋজু, সত্য যে আচরণ (বাক্‌কায়মনের) তাহাই। অর্থাৎ, বাগাদি কুটিল (জিহ্ম), অনৃত অধ্ব পরিহারপূর্বক ঋজু ঋত যে অধ্ব তাহা অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় যে শ্রেয়োবীর্যদ্বারা সেইটিই শ্রীগণপতির দন্ত। (দম্=দমন, control; 'ত'কার দ্বারা বুঝাইতেছে অমৃত = অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স। সুতরাং যদ্দ্বারা আমাদের এই working apparatus-টির dis-harmony curvature and function নিয়ন্ত্রিত হইয়া harmonic rectitude and harmonic function-এ রূপান্তরিত হয়, তাহাই হইল দন্ত—rectifying, harmo-nizing Factor), শ্রুতি তাই না সাধনের গোড়াতেই প্রার্থনা করিয়াছেন—"ঋত হইতে সত্য হইতে যেন আমরা ভ্রষ্ট না হই"। সকল সাধনার মূলেই এই ঋতান্বয়, এই সত্যনিষ্ঠা। আচ্ছা, দন্ত কি এক না দুই অথবা বহু? দন্ত একই—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যেমন একই হয়, ঋতান্বয় বা ঋতচরিতও একই হইয়া থাকে। তাতে সংশয়ের 'দোলা' এবং বিকল্পের 'জটলা'—এ দুই-ই থাকে না। A straight, unswerving singleness of purpose and pursuit চাই-ই।

অশুভ বা অন্তরায় মুখ্যতঃ দুই ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়—ব্যূহ ও ব্যামোহ। প্রথমটি স্তব্ধ (static) ভাবে থাকিলেও দুর্ভেদ্য। দ্বিতীয়টি প্রসারী (aggressive) এবং আততায়ী পুরুভুজের (octopus) মত কেবলি তার "বাহু" বিস্তার করে। এটি দুর্নিবার। এর বাহু অন্তহীন এবং সেগুলি সচরাচর বিবিধ (কামজ, ক্রোধজ ইত্যাদি) ব্যসনের আকারে জীবকে শৃঙ্খলিত করে। এই ব্যসন পরিবৃত ব্যামোহ বিদূরিত হইবে

কিরূপে? শ্রীবিনায়ক তাঁর ওঙ্কাররূপী শুণ্ডদ্বারা এই মহোপদ্রবকে অচিরে নিরসন করেন; অর্থাৎ প্রণবাদির শ্রদ্ধাপূর্বক জপই মুখ্য সাধন, কেননা তদ্দ্বারাই এই যন্ত্রের স্পন্দনগত বৈরূপ্য বা প্রতিকূলতা তিরোহিত হইয়া ঋত এবং সত্য ছন্দের সঙ্গে অনুরূপতাদি সাধিত হইয়া থাকে।

তারপর, শ্রীগণেশের দিব্যকলেবরে অরুণরক্তিমরুচিটি কি তা ভাবনা কর। নিঃস্পন্দপরমতত্ত্বে নাদরূপ যে মূলস্পন্দ, তারই যে সমন্তাৎ স্ফূরণ, তাই ঐ দিব্য কলেবরে রক্তিম অঙ্গারাগ। বাচ্য-বাচকময় এই যে চরাচর বিশ্ব, এর জীবনের প্রথম সাড়াটি এই অরুণরক্তিমায়। বিশ্বপ্রাণের 'রস', জীবনের 'রঙ'—পাদপে শীতাপগমে বিপুল প্রাণহিল্লোলে উদ্‌গত নব কিসলয় মঞ্জরীর মতই যে রাঙা! বিশ্বের চিত্রপট বর্ণালিতেও এই রাঙা (red) হইতেই তো বর্ণগ্রামের উত্তরোত্তর উন্মেষ! স্বর-সপ্তকের যেমন ষড়জ (সা)। "আমি এক, মিথুন হইব"—ব্রহ্মবস্তুতে এই আদিম কাম, ঐ রক্তরাগেই না নিজেকে ফুটাইতে চায়! বিশ্বদোলের যে "ফাগ" তাও তো মূলে এই! তন্ত্রে কামকলাবিলাসেও এই! বর্ণের গোড়ায় গিয়া এর খোঁজ লও।

আচ্ছা, গণপতির অঙ্গের সিন্দুরবর্ণ না হয় হইল। কিন্তু তাঁর শুভ্র স্বচ্ছ ললাটদেশে মুক্তার মত স্বেদবিন্দু শোভা পাইতেছে যে! বিশ্বের প্রাণধারায়, জীবন-চাঞ্চল্যে তিনি রহিয়াও (though immanent), এর উর্দ্ধে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ স্বরূপে তিনি বিরাজ করেন। আর, তাঁর সেই নিত্য ক্ষোভহীন (সুতরাং নিঃস্পন্দ) সত্তাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াই তিনি নিখিল স্পন্দাত্মক প্রপঞ্চে "অবগাহন" করিয়াছেন; বর্ণহীন হইয়াও বিশ্ববর্ণালি হইয়াছেন। এই "অঘটনঘটন" হইল তাঁর ললাটের "স্বেদ", এবং সেই অচিন্ত্যঘটনটি বিন্দুরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে, অর্থাৎ তাহা হইতেই বিশ্বের নিখিল স্পন্দ তার "কেন্দ্রীণ" বা নাভি শক্তিটি পাইতেছে—সমষ্টিতে ও ব্যষ্টিতে। বেদ বলেন—"অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি"; তন্ত্র বলেন—"নাদ হইতে বিন্দু, আবার বিন্দু হইতে নাদ";—এ সবই ভাবিয়া দেখ গণপতির শুভ্র ভালদেশে, টলটল ঐ স্বেদ বিন্দুর পানে চাহিয়া।

আবার, গণপতির চারিটি হস্ত হইতেছে মাত্রা চতুষ্টয়—মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা, পূর্ণমাত্রা ও অমাত্রা (অন্যত্র এগুলি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। আর তাঁর দুইটি নেত্র হইতেছে—"পশ্যৎ" আর "তুর্য্য" (পর ও পরম)। প্রথমটির দ্বারা নিখিল তত্ত্ব,

বস্তু এবং সম্বন্ধ "দর্শন" করেন; দ্বিতীয়টির দ্বারা সর্ব ত্রিপুটীর মূলে যে পরমাব্যক্ত সত্তা তাতেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতিরূপে অচ্যুতপ্রতিষ্ঠ রহেন। এই তুরীয় দৃষ্টিও পরা ও পরমা ভাবে দ্বিবিধ (পরে দেখিব)।

এবম্বিধ রহস্যবপুধৃক শ্রীগণপতি আমাদের অশুভ বিনাশের নিমিত্ত জয়যুক্ত হউন॥ ৯৫॥

সম্যক্ সাম্যং সমাসে যদবতি কুশলং কর্ম্মণাং শুণ্ডশৌর্য্যং
বীর্য্যং দন্তস্য যস্মাদ্ হরতি বিষমতাং ব্যাসমন্বেতি যা চ।
আব্রহ্মাকারবৃত্তি প্রভবতি চ যতো ধাম মৌলেঃ প্রসন্নং
বর্তেতে দ্বৌ সমাধা চ নয়নযুগলেঽতঃ সমাবৃত্তিমূর্ত্তিঃ॥ ৯৬॥

এখন এই শ্লোকে শ্রীগণেশের প্রতিটি অঙ্গের ক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।

প্রথমতঃ তাঁর শুণ্ডের শৌর্যের দ্বারা তিনি কি করেন? পূর্বকথিত সমাস-সমতা সম্যক্ ভাবে রক্ষা করেন। এই অনুকূল ধারাটির রক্ষণ বা পোষণ শুণ্ডশৌর্যের দ্বারাই সম্ভব হইয়া থাকে।

তারপর, তাঁর দন্তের বীর্য দ্বারা ব্যাসেতে অর্থাৎ বিচ্ছিন্নভাবের মধ্যে (dissipation, scattering এ) অন্বিত বা যুক্ত হয় যে বিষমতা, (disharmony), তাকে হরণ বা নাশ করেন। শুণ্ডশৌর্যের দ্বারা যেমন সমতার রক্ষণ, তেমনি দন্তবীর্যের দ্বারা বিষমতা হরণ। অনুকূলতার পোষণ ও প্রতিকূলতার বিদূরণ—সাধনা সিদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য এই মুখ্য দুটি ক্রিয়া শ্রীগণেশের এই দুই অঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

শুধু, এই দুটি ক্রিয়াতেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয় না—তিনি তাঁর মৌলিক বা মস্তকের প্রসন্ন ধাম বা জ্যোতিঃপ্রসাদ দ্বারা সাধককে প্রভাবিত করেন, তার সাধনার সরণিকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া রাখেন যে পর্যন্ত তার মধ্যে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদয় না হয়, অর্থাৎ সাধক সিদ্ধির চরম ক্ষেত্রে না পৌঁছান পর্যন্ত তাঁর করুণা-জ্যোতিঃ বিকিরণে কার্পণ্য নাই। ইহাই তাঁর মৌলির বা মস্তকের কাজ।

আর যোগশাস্ত্রে যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাতরূপ দ্বিবিধ সমাধির কথা বর্ণিত

আছে, সেই উভয়বিধ সমাধিই যেন তাঁর নয়নযুগলে স্থান পাইয়াছে, অর্থাৎ তাঁর দুটি নেত্রের মধ্যেই সমাধির দ্বিবিধ ভাব নিহিত আছে। তাই তাঁর নয়ন-প্রসাদে বা দৃষ্টি-প্রসাদেই সাধকেরও দ্বিবিধ সমাধিলাভ সম্ভব হইয়া থাকে।

এইরূপে শ্রীগণেশের সর্ব অবয়বের কার্যগুলি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে ইনি সমাবৃত্তিরই প্রকট মূর্তি॥৯৬॥

[এই সমাবৃত্তিরূপটি লাভ করার জন্য 'গণেশ' এই রহস্য নামটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ। 'গ' কার জিহ্বামূলীয় কবর্গের তৃতীয় বর্ণ—মূলত্রয়ের নিরূপক, অর্থাৎ মূলকে তিন সংখ্যায় লইবার নির্দেশ দিতেছে; যথা রসায়ন শাস্ত্রে H_2SO_4 নির্দেশ দেয় কোন মৌলিককে কত সংখ্যায় লইতে হইবে। মূল তিনটি কি? বাক্, মনঃ এবং প্রাণ; অথবা বিদ্যা, শ্রদ্ধা উপনিষৎ; অথবা অ, উ, ম; ইত্যাদি। 'ণ' কার মূর্দ্ধন্য এবং পঞ্চমবর্ণ। এটি নির্দেশ করে "ঊর্দ্ধলোক" হইতে পাঁচটি-শক্তিধারার (যথা, পঞ্চগঙ্গা) অবতরণ। এবম্প্রকার মূলত্রয়াশ্রয়ে প্রযত্ন উপযুক্ত বীর্যমাত্রা লাভ করিলে উক্ত মূর্দ্ধন্যধারায় তার মিলন ঘটে। 'গ' তৃতীয়বর্ণ, 'ণ' পঞ্চম বর্ণ। উভয়ই "ঘোষবৎ" (calling each other) বটে, কিন্তু সচরাচর "অল্পপ্রাণ" (তাদের আপেক্ষিক 'শক্তিমান' বেশি থাকে না)। এ নিমিত্ত 'গণ'—মাত্র এই রূপে উভয়ের সমর্থ ও সফল মিলনটি ঘটায় না। উভয়ের ব্যাবৃত্তি (hiatus) রহিয়া যায়, সমাবৃত্তি সাধিত হয় না। কিন্তু 'গণেশ' নামে 'ঈকার' দীর্ঘ তালব্যস্বর—গণেশের শুণ্ডশৌর্যের প্রতীক; আর 'শ' কার "মহাপ্রাণ"। সুতরাং 'ঈশ' সংযোগে ব্যাবৃত্তিক্ষেত্রে সমাবৃত্তি সূচিত হইতেছে। প্রত্যেক রহস্য নাম অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এক একটা ফরমূলা।]

বাচা মোঙ্কারগঙ্গা গহনগতিজটাগূঢ়—সপ্তোর্ম্মিভঙ্গা
প্রাণব্যাপারক৯প্তাহ্হিবলয়সহিতং সার্দ্ধমাত্রোত্তমাঙ্গাম্।
বৈরূপাক্ষং বিরূপং পরশুমৃগবরাভীতিভিশ্ছন্দ ঈষ্টে
বৈয়র্থ্যঞ্চ ত্রয়ীদৃগ্ জয়তু পশুপতি র্যোঽষ্টমূর্ত্তিস্ত্বমূর্ত্তঃ॥৯৭॥

অতঃপর শ্রীমহাদেব মূর্তি ভাবনা কর।

মহাদেব তাঁর জটাজালে গঙ্গা ধারণ করিয়াছেন। সকল বাক্যের 'মধু' অথবা

'রস' যে ওঙ্কার, তাঁহাকেই গঙ্গা জানিবে। বাক্যের গতি গহনা, কিনা দুর্জ্ঞেয়া। এই গহনা গতিই হরশিরে জটার কুণ্ডলী। এই জটাগর্ভে বাক্যসার যে প্রণব (ঈশ্বরবাচক নাম), তিনি নিগূঢ় হইয়া তাঁর সাতটি ঊর্মি (জগত্যাদি সপ্ত ছন্দঃ ভূর্ভুবরাদি সপ্ত ব্যাহৃতি, অকারাদি শান্তাতীত অবধি সাতটি "ভূমি", ইত্যাদি) যেন লুকাইয়াছেন। শিবের উত্তমাঙ্গ, কিনা মস্তক অর্দ্ধমাত্রা (সম্পুটিত নাদ-বিন্দু-কলা—পূর্বে এবং পরে ব্যাখ্যাত) দ্বারা বিভূষিত; আবার, সেটি অহিবলয় দ্বারা বেষ্টিত। বাকের অভিব্যক্তিতে যে প্রাণনব্যাপার রহিয়াছে, তাহাই অহিরূপে কল্পিত হইয়াছে জানিবে। "অহ্+ই" এই আকৃতিটি (pattern) বুঝিয়া দেখ। অ = প্রথম স্বরবর্ণ; হ = শেষ ব্যঞ্জনবর্ণ; সুতরাং অহ্ = মাতৃকাবর্ণমালা। ই = গতি। অর্থাৎ, বর্ণমালার গতি, অব্যাকৃতি থেকে ব্যাকৃতি, অভিব্যক্তি ইত্যাদি সূচিত হইতেছে। বিলেশয় অহি কুণ্ডলী পাকাইয়া থাকে, কিন্তু আবার চলেও (তাই সর্প)। প্রাণন-ক্রিয়াটি বীচিরীতিতে (wave pattern-এ) চলে, তাই অহি = ভুজগ। শিব বিরূপাক্ষ, তিনি তাঁর 'বৈরূপাক্ষ' ছন্দের দ্বারা নিখিল বাকের, সুতরাং প্রাণীর, যেটি 'বিরূপ' ছন্দঃ সেটিকে শাসন করেন। পরশু, মৃগ, বর, অভয়—তাঁর চারিটি হস্তে এই চারিটি "উপায়" দ্বারা। পরশু দ্বারা যেটি বিরূপ তাকে অনুরূপ হবার 'আকৃতি' দেন; মৃগ (অন্বেষণ, লক্ষ্যানুবৃত্তি) দ্বারা সেটিকে লক্ষ্যের বা আদর্শের অনুরূপ প্রতিরূপ করিয়া লন; বর দ্বারা তাকে সমরূপ এবং অভয় দ্বারা তাকে একরূপ বা অভিন্নরূপ করেন। (অনুরূপাদি পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) যেটি বিরূপ (heterogeneous) তাতে অক্ষ বা Axis রূপে প্রবিষ্ট হইয়া সেটিকে মন্থন করেন, যার ফলে সেটি অনুরূপাদি (homogeneous) হইয়া থাকে। (বিরূপাক্ষ শব্দের অন্য মানেও আছে।) আর, বাক্‌কে 'সমর্থ' করার নিমিত্ত তার বৈয়র্থ্যকেও পূর্বোক্ত রীতিতে শাসন করেন। বাক্‌কে সার্থক করেন তিনি ত্রয়ীদৃক্‌রূপে—ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুঃরূপে। তিনি ক্ষিত্যাদি অষ্টমূর্তি (যথা, শকুন্তলায় মঙ্গালাচরণে বর্ণিত) হইয়াও কিন্তু অমূর্ত (শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্ঞান মূর্তি)। বাক্ বা প্রণবের দিক দিয়াও এই অষ্টমূর্তি এবং তদনুগত ও তদতীত অমূর্তরূপটি ভাবনা করিতে হইবে। এবম্বিধ অসামান্য রহস্যবপু যে পশুপতি তিনি জয়যুক্ত হৌন!॥ ৯৭ ॥

সোঽঘোরোঽদগ্নিচিদ্ যো মিতি মৃশতি যতঃ সোমসুদ্ বামদেবঃ
সদ্যোজাতো হ্যুবর্ণাৎ স্বরসমুদয়তোঽজায়তোর্জ্জশ্চ সদ্যঃ।
আদাবন্তে চ যৌ তৎ-পুরুষ ইতি হুতৌ হোতৃহব্যে দ্বিবর্ণা
বীশান শ্চেষ্টিকামান্ কতি সিতি সুষুবে সর্বধুক্ চৈকহৌংসঃ॥ ৯৮॥

কৃত্তিবাস, সিতিকণ্ঠ, শূলপাণি, পঞ্চবক্ত্র ইত্যাদি রহস্যে অবগাহন করিও। কিন্তু এস্থলে বিশেষভাবে "হৌংসঃ" এই মহাবীজটি বিশ্লেষণ করিতে যত্ন কর। বীজটির আদি-অন্তে হ্ এবং ঃ। মধ্যে ওঁকার = অ, উ, ম্। তৎপরে স্। চিন্তা কর এই বিশ্বমহাযজ্ঞ। বাক্, প্রাণ, মন, সমষ্টি, ব্যষ্টি—সব কিছু লইয়াই এই যজ্ঞ। এই যজ্ঞে 'অগ্নিচিৎ'—অগ্নির চয়নকারী (Storing and massing of Energy) হইয়াছিলেন 'অৎ', কিনা, স্বরের আদি যে অবর্ণ তাই। এইটি অঘোররূপ। কেননা, মূঢ় এবং ঘোর রূপটি না কাটাইলে উক্ত 'চয়ন' কর্মটি সম্ভব হয় না। তারপর, অন্ত্যস্পর্শবর্ণ যে 'ম'কার, সেটি 'মৃশতি', কিনা, স্পর্শ (মর্ষণ, মর্শনাদি) করিয়া 'সোমসুৎ'—সোমের সবনকারী—হইয়াছিলেন। সোম = নিখিল পদার্থে ওতপ্রোত যে 'রস' তাই। সেটির ক্ষরণ ও সবন হওয়া আবশ্যক যজ্ঞে। এইটি সোমসুৎ বামদেবরূপ। অগ্নি এবং সোম মিলিত হইয়া (Energy + Value) অগ্নীষোম হইলেন বটে, কিন্তু চাই উর্জ্জঃ, অর্থাৎ, অভ্যুদয় শক্তি। স্বর সমুদয়ে যে উবর্ণ, তাহা হইতেই উর্জ্জঃ জাত হইয়াছিল, সদ্যঃ—অবিচ্ছেদে, অব্যবধানেই—জাত হইয়াছিল। এইটি সদ্যোজাতরূপ। এটির অভাবে কর্মটি স্তব্ধ, ব্যাহতাদি হইবে। 'সদ্যঃ' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কর। সদ্যঃ = সদ্ + যঃ = নিরন্তর অবিচ্ছেদে গতিশীল। অথচ, স্বয়ং এটি সৎ = অব্যয়। তারপর, আদি এবং অন্তে যে দুটি বর্ণ (হং, এবং ঃ), সে দুটি যথাক্রমে এই হবনে (হুতৌ) হোতা এবং হব্য—দ্রব্যযজ্ঞ থেকে ব্রহ্মযজ্ঞ পর্যন্ত সব যজ্ঞেই এ দুটিকে অনুসন্ধান কর—বলিয়া ভাবনা কর। এবং দুয়ে মিলিয়া তৎপুরুষরূপ (তৎ = That, পুরুষ = I or you; Object-Subject, ইত্যাদি)। এবম্প্রকার ক্রিয়াকারক সঙ্ঘাতটি মিলিল, কিন্তু ফল? 'কতি', কতই না ইষ্টিকাম, যজ্ঞের ফল, ইনি প্রসব করিয়াছিলেন, 'স্' এই বর্ণরূপে! যজ্ঞফলনিয়ন্তা ইনি ঈশান। সুতরাং এক 'হৌংসঃ' এই মহাবীজরূপ বাক্ই হইল সর্বধুক—সর্বসম্মেলন ও সর্বভাবন ও সর্বসমাপন কর্মে নিরতিশয়কুশলা॥ ৯৮॥

জিঘৃক্ষতি শিশুঃ সোমং যঃ শম্ভোর্মৌলিভূষণম্।
ঔষধমত্তি যঃ সোমং স কিং বেত্তি স ওমিতি॥ ৯৯॥

শিশু হাত বাড়াইয়া আকাশের সোম (চাঁদ)কে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। সে কি জানে যে সোম শম্ভুর মৌলিভূষণ (সোমার্দ্ধধারিণে)? আবার, ওষধিরূপে (ব্রীহি, যব ইত্যাদি) যে সোম ভক্ষণ করে, সে কি জানে যে স্বরূপে সোম = "স ও ম্" ইতি?॥ ৯৯॥

আদিত্যো ব্রহ্ম মূর্ত্তং বিশতি যদখিলং ব্যাপ্য চার্কঃ স্বধাম্না
নাভৌ সংগৃহ্য-চক্রং হ্যরধৃতবলয়ং চাধ্ব ছন্দো বিভর্ত্তি।
সূতে সূর্য্যশ্চ পূষাহ্ বতি চ বৃহদৃতং জক্ষিতীদণ্ড বুদ্রঃ
প্রাণানোম্ প্রাণিনদ্ধ্রীং ঘৃণিরিতি হৃদয়ং সুম্ম একর্ষয়েহর্ঘম্॥ ১০০॥

শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মের দুইটি রূপের কথা—মূর্ত ও অমূর্ত। অদিতিরূপে ব্রহ্ম অমূর্ত, আদিত্যরূপে মূর্ত। অর্থাৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর এই ত্রিবিধরূপে যৎকিঞ্চিৎ অস্তি ও ভাতি, সে সমস্তই আদিত্য। স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম, আবার সূক্ষ্মের মধ্যে পর এইভাবে এই যে অখিল বিশ্ব, ইহাতে আদিত্য প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। আবার অর্করূপে আপন (আধিভৌতিকাদি চতুর্বিধ) তেজঃ এবং মহিমা দ্বারা এ সকলই তিনি ব্যাপিয়া আছেন। পুনশ্চ, (অণু কি মহান্) ভুবনের যে চক্র চলিতেছে, তার নাভিনিষ্ঠ সত্তাশক্তিরূপে (Nuclear Power) তাকে "সংগ্রহ" করিয়া রাখিয়াছেন; স্বয়ং অর (Moments) বিস্তার পূর্বক সেই চক্রের (যেমন একটি এটমের, কিংবা এই সৌরজগতের) যেটি বলয়, নেমি বা পরিধি তাকে (আপন আকৃতিতে বা pattern-এ) ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; আর, সেই ভুবনচক্রের গতিতে (Function-এ) যেটি অধ্ব (Course বা Curve) এবং যেটি ছন্দঃ (Law বা Equation) তাদের "ভরণ" করিতেছেন। মূর্ত ব্রহ্ম আদিত্যের অন্তর্বহিঃ সর্বতঃ এই পঞ্চবৃত্তি ধ্যান কর। আদিত্য বিবস্বান অর্ক, সবিতা, নারায়ণ, গভস্তিমান, হরিদশ্ব (বা সপ্তাশ্ব)—এই কয়টি রহস্য নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর। সব কিছু প্রসব করেন, তাই তিনি সবিতা, সূর্য; পোষণ করেন তাই পূষা।

হংসবতী ঋকে প্রসিদ্ধ "ঋতং বৃহৎ" অর্থাৎ ঋতব্রহ্ম (হংস) রূপে সব কিছু পালন ও রক্ষা করেন। ইনি Cosmic Life Principle পুনশ্চ কালাগ্নিরুদ্ররূপে সমস্ত কিছুই ইনি "ভক্ষণ" করেন। কাল + অগ্নি + রুদ্র এই "সম্পুট"টিও বিশেষভাবে ধ্যান করিবে—ধ্যান করিলে ভুবনচক্রের "নাভি" ভেদ করিয়া কালের অতীততত্ত্বে যাওয়া যায়। ইনি প্রণব (ওঁঙ্কার) রূপে প্রাণসমূহকেও প্রাণন করিয়াছিলেন (প্রাণিনৎ)। "ওঁ হ্রীঁ ঘৃণিঃ"—ইহাই তাঁর (আদিত্যের) 'হৃদয়' (ওঁ রূপে 'হৃৎ', এবং হ্রীঁরূপে 'অয়', কিনা গতি)। এবম্বিধ একর্ষি প্রত্যক্ষ ভগবান আদিত্যনারায়ণকে আমরা অর্ঘসবন (বাক্, মন ও প্রাণের দ্বারা কল্পিত) করিতেছি। আমাদের যেটি অঘ (পাপ্মা, এনঃ মন্যু ইত্যাদি রূপ) সেটিও সূর্যজ্যোতিতে সবন (হবন) এর নিমিত্ত এবং সবনের ফলে রেফযুক্ত (র=অগ্নি) হইয়া 'অর্ঘ' হউক॥ ১০০॥

যা তারা ত্রিপুরাদিদুর্গগহনগ্রন্থীন্ দিদীর্ষত্যসৌ
মন্ত্রাণাঞ্চ জিহীর্ষতে বিষমতাং চৈতন্যমাধিৎসতে।
অর্ভৌকস্ত্বমপাচিকীর্ষতি ততো ভূয়স্ত্বমারিপ্সতে
প্রত্যালীঢ়পদা নিনীষতি পদং বংহিষ্ঠবাচঃ পরম্॥ ১০১॥

এখন এখানে তারাতত্ত্ব বলা হইতেছে। ওই যে মা তারা, তিনি স্বরূপতঃ 'তার' বীজ বা ওঁঙ্কাররূপা। তাঁর বিভিন্ন ক্রিয়া এখানে বর্ণিত হইতেছে। তিনি প্রথমতঃ ত্রিপুরাদি অর্থাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তি, অ-উ-ম মাত্রাত্রয়, বহিঃপ্রজ্ঞ-অন্তঃপ্রজ্ঞ-ঘনপ্রজ্ঞ ইত্যাদি যেসমস্ত ত্রিপুর-দুর্গ, কিনা, দুর্গম ব্যূহ, তাদের যে সকল গহন গ্রন্থি, সে সমস্তকে বিদীর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রসমূহের যে বিষমতা অর্থাৎ রূপ ও ছন্দ ইত্যাদির যে অরিত্ব বা প্রতিকূলতা, বা এক কথায়, ছন্দোনিমিত্ত যে বাধা বা "বিরোধ", তাকে তিনি হরণ করিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে অর্দ্ধমাত্র বা অমাত্ররূপে তিনি মন্ত্রসমূহকে সমর্থভাবে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কেবল মন্ত্রোদ্ধারেই তাঁর কর্ম পরিসমাপ্ত হয় না; তিনি আবার মন্ত্রে "চৈতন্য" আধান করিতে ইচ্ছা করেন এবং ইহার ফলে বস্তুনিমিত্ত যে বাধা বা "নিরোধ" তার নিরসন হয়। এ ছাড়া, তিনি 'অর্ভৌকস্ত্ব', কিনা, অল্পে, ক্ষুদ্রে অবস্থিতি অর্থাৎ স্বল্প

সঙ্কীর্ণ "দেশে" গতি-স্থিতিরূপে যে দেশ নিমিত্ত বাধা বা "অবরোধ" (Staticity, Stagnation), তাকেও অপাকৃত বা দূর করিতে ইচ্ছা করেন। আর, ভগবান সনৎকুমার যেমন নারদকে "ততো ভূয়ঃ" ইত্যাদি ক্রমে শেষে ভূমাতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেইরূপ অল্প হইতে "ততো ভূয়ঃ" ক্রমে তিনি সাধককে ব্রহ্মে লইয়া যাইবার সূচনাটি আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করেন। এক কথায় কালনিমিত্ত বাধা যে "প্রতিরোধ", তাকে অপসারিত করিয়া বিকাশ-প্রকাশ-উল্লাসের পূর্ণতা ঘটাইয়া দেন। পরিশেষে, মা তারাকে দেখি এক বিশেষ ভঙ্গীতে শিববক্ষে পাদবিন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইহার রহস্য কি? তিনি 'প্রত্যালীঢ়পদা', কিনা, অরিচ্ছন্দাদি বিনাশ নিমিত্ত সম্যগ্-বিন্যস্ত মন্ত্রাক্ষরপদা হইয়া বৈখরী বাকের পর—মধ্যমা, পশ্যন্তী ইত্যাদিতে পদকে অর্থাৎ বাক্, মন ও প্রাণ—এ সমস্তের গতিকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, তাঁর পাদের বিশেষ ভঙ্গীটি মন্ত্রের পদগুলিরই একটি বিশিষ্ট রূপকে বা অবস্থানকে সূচিত করিতেছে। মন্ত্রাক্ষরপদগুলি সেইভাবে বিন্যস্ত হইলে তাহা বাকের স্থূল যে বৈখরী রূপ, তাকে পরিত্যাগ করিয়া তার পরমরূপ যে পরা বাক্ তার দিকে ধাবিত হয়—কোথাও মধ্যমা, পশ্যন্তী ইত্যাদি ক্রমে, অথবা কোথাও সাক্ষাৎ অক্রমিকভাবেই।

সুতরাং মা তারা আমাদের গ্রন্থি-বিদারণ, মন্ত্রের বিষমতা-হরণ, চৈতন্য আধান, ক্ষুদ্রত্ব বা অল্পত্ব অপাকরণ, ভূমাভিমুখী গতির সূচন এবং পরিশেষে, বাকের পরম অবস্থায় নয়ন—এই সব কাজগুলিই করিয়া থাকেন ॥ ১০১ ॥

ব্রহ্মাস্মীতি প্রমাণাৎ পদতলদলিতা বিপ্রতীপা রিরংসা
প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম পূর্ণাদিতি পদগমনাচ্ছান্তিকৃন্মন্ত্রবর্ণৈঃ।
আত্মায়ং ব্রহ্ম চেতি শ্রুতিষু নিগমনাৎ তত্ত্বম স্যাদিতত্ত্বং
নাদৈর্মৃগ্যস্তদর্থঃ স্ফুটিতপরিচয়া ছিন্নমস্তাহস্তু গুহ্যা॥ ১০২॥

মায়ের আর একটি রহস্যমূর্তি—ছিন্নমস্তা। এই মূর্তির মধ্যে বেদান্তের প্রসিদ্ধ চারিটি মহাবাক্যের রহস্যই লুকাইয়া আছে।

চারিটি মহাবাক্যের মধ্যে "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ যেটি প্রথম পদ, তদ্দ্বারা তিনি

বিপ্রতীপ রিরংসা সর্বতোভাবে দলিত করিয়াছেন—কেননা, উক্ত নিশ্চয় হইলে কেবল পরমাত্মাতেই পূর্ণ রতি হইয়া থাকে। 'বিপ্রতীপ রিরংসা' মানে, স্বরূপের যাহা বিপ্রতীপ, কিনা, বিপরীত তাতে রিরংসা, কিনা, রমণেচ্ছা। আত্মাই নিরতিশয় প্রিয়, অনাত্মবস্তুতে যে প্রিয়তাধর্ম, সেটি স্বাভাবিক নহে; অথচ অল্প খণ্ডিত, অনাত্মপদার্থেই জীবের রমণেচ্ছা ঘটিতেছে—এইটি তার বিপরীত রিরংসা। ছিন্নমস্তার পদতলে বিপরীত রতাতুর রতিকাম—এইটির প্রতিমূর্তি। এই বিপরীত রতি দূর হয় শুধু এই নিশ্চয় বুদ্ধিতে যে "আমি স্বরূপতঃ আনন্দ ব্রহ্মই, এবং ব্রহ্মেতরও কিছু নাই, সুতরাং আত্মা ছাড়া আর রতি কোথায় হইবে?" ইহাই "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ মহাবাক্যের ফলস্বরূপ। আবার "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" ইত্যাদি যে শান্তিপাঠের মন্ত্রবর্ণসমূহ, তাদের দ্বারা পদের গতিতে অর্থাৎ পদের যাহা লক্ষ্য বৃত্তি, তদ্দ্বারা "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"-এই অপর মহাবাক্যটি আপনার মধ্যেই প্রকাশ করিয়াছেন। কিভাবে? আপন মস্তক আপনি ছেদন করিয়া এবং আপন রুধির আপনি পান করিয়া দেখাইতেছেন যে 'ইহাও পূর্ণ, উহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণকে লইলে পূর্ণই থাকে, পূর্ণ ব্যতীত অপূর্ণ কোথায়?' তারপর "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"—এটিও তিনি প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছেন এইভাবে যে, আপন দিব্য কলেবরের অভ্যন্তরে যে আত্মা 'রুধির' রূপে রহিয়াছে, সেটি অন্তর্বহিঃ সর্বত্রই রহিয়াছে, বস্তুতঃ সেটির হান অথবা উপাদান নাই। শেষে শ্রুতিসকল যেভাবে নিঃসংশয়ে প্রতিপাদিত করিয়াছেন সেইভাবে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যরূপ 'অসি' দ্বারা আপন তত্ত্ব, কিনা ব্রহ্মত্ব, তিনি আপনাতে প্রতিপাদন করিতেছেন; করের অসি এই 'অসি'রই প্রতীক। আপন দেহ 'ত্বং' পদার্থ, আপন উত্তমাঙ্গ 'তৎ' পদার্থ; 'অসি' পদটি এতদুভয়ের ভাগত্যাগলক্ষণা প্রদর্শন করিতেছে। অর্থাৎ, দেহের ধর্মাদি (রূপ, নাম) এবং মুণ্ডের ধর্মাদি উভয় ত্যাগ করতঃ 'রুধির' এই অভিন্ন বস্তু বা সত্তারূপে উভয়ের গ্রহণ হইতেছে। দেহ হইতে যেটি 'নির্গলিত' মুণ্ডে সেটি 'সমর্পিত' এবং 'সমাপ্ত' হইতেছে; রুধিরমিত্যেব সত্যম্—এইটির নিগমন হইতেছে।

সেই গুহ্যাতিগুহ্যা ছিন্নমস্তা আপন স্বরূপ-পরিচয়ে আমাদের বুদ্ধিতে উদ্‌ঘাটিত, উদ্ভাসিত হউন। স্বরূপ পরিচয় সাধনটি কিরূপ? ছিন্নমস্তারূপে ও তাঁতে উদাহৃতরূপে মহাবাক্য চতুষ্টয়ের অর্থ (উপনিষৎ) নাদানুসন্ধান (অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, শান্ত শান্তাতীত) দ্বারাই সাধককে অন্বেষণ করিতে হইবে। [অথবা, 'নাদৈর্মৃগ্যং তদর্থং'—

'তদর্থং' কিনা, তদুদ্দেশ্যে, সেইজন্য নাদাদি দ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে।]।।১০২।।

['ম' হইতেছে স্পর্শবর্ণের অন্তিম বর্ণ। উচ্চারণে 'অ'কারযুক্ত। 'অ' 'ম' এর পরে। 'অ'টিকে 'ম' এর আগে আন। তাতে হইল—'অম'। এই উল্টাইয়া লওয়া হইল—বিপরীত করণ। উভয়ের মধ্যে 'উ'কে বসাও। 'উ'কার = উদানবৃত্তি (Lever Action)। এই বৃত্তি দ্বারা 'অ' ও 'ম' দুয়ের "মন্থন" সাধিত হয়—যথা যজ্ঞে উত্তরাধর অরণির। এই মূল ব্যাপারটিকে বিপরীত রিরংসা বলা হইল। প্রাণের ক্ষেত্রে, অ=প্রাণাপানব্যাপার; ম = সমানব্যান। উ = উদানবৃত্তি। এগুলি কেবল শরীরের বৃত্তি নয়, বিশ্ববৃত্তি। (Cosmic Function)। মনের ক্ষেত্রেও এদের নিজস্ব রূপ আছে। সে যাই হোক, ব্যাপারটি কেবলমাত্র (অ, উ, ম্) এই প্যাটার্ণে (আকৃতিতে) থাকিলে "স্পর্শযোগের" মধ্যেই আবন্ধ থাকিতে হয়। তার মানে, প্রাকৃত সঞ্চারক্ষেত্রে (Spinoza-র 'Natura Naturata' তুলনা কর)। এটাকে অতিক্রম করিতে হইবে। ছিন্নমস্তার কলেবর এবং তাহা হইতে ছিন্ন মুণ্ড = নাদবিন্দু। কিন্তু নাদবিন্দু এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান, 'অন্তরীক্ষ' (hiatus) বজায় থাকা পর্যন্ত "শান্ত" ভাবটি সম্ভাবিত হয় না। নাদে যে 'তত্ত্ব' নির্গলিত, বিন্দুতে সেটি পর্যবসিত—এই সমীকরণটি সর্বথা সাধিত না হওয়া পর্যন্ত 'শান্ত' ভাব নাই। তাই ছিন্নমস্তা আপন বুকের রুধির আপনি "পান" করিয়া শান্ত হইতেছেন। আর, শান্তাতীত? সে তো পরমাব্যক্তভাব, তার প্রতীক কিসে মিলিবে? পরে দেখা যাইবে যে ঐঁ, হ্রীঁ, ক্লীঁ ইত্যাদি যে কোনও বীজের উদ্ধার, চৈতন্য ইত্যাদি ব্যাপারে এই এবং অপরাপর রহস্যমূর্তির সাক্ষাৎ উপযোগ আছে। যেমন আবার, বৈখরীজপ = বিপরীতরতাতুর রতিকাম; দেবী কলেবর = মধ্যমা; মুণ্ড = পশ্যন্তী, রুধিরপান = পরা।]

আব্রহ্মস্তম্বমেতজ্ জিজরিষতি কুতশ্চ্যোতিতুং স্থেষ্ঠমিচ্ছেন্
মাত্রাপাদাং শকাষ্ঠাঽই কলিতরথপদাং লৌল্যমিচ্ছেচ্চ নেমিঃ।
সম্পাতে বিশ্ববীজং হ্যসিতমপি সিতাদ্ ভিদ্যমানত্বমিচ্ছে-
চ্ছূর্পেণাঢ্যাং রথস্থাং বিবিদিষুরধবাং বেদ ধূমাবতীং কঃ॥ ১০৩॥

মায়ের আর একটি রহস্যমূর্তি—ধূমাবতীর তত্ত্ব এখানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ক্ষুদ্র তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত সবই যে জরাকবলিত হইতে চাহিতেছে—কেন এই বিশ্বজরা? যেটি ধ্রুবতম, সেটিও যে ক্ষয়িষ্ণু—কেনই বা এই ধ্রুবের অপায় বা বিনাশ? মাত্রা, পাদ, কলা, কাষ্ঠা—ভুবন-রথের এই চারিটি চরণ বা চক্র; কিন্তু চক্রের নেমি ঘুরিতে ঘুরিতে যে লোল হইতে চাহিতেছে—নিয়তির এই লৌল্যই বা কেন? নিখিল সৃষ্টির বীজ যেখানে একত্র জড়ো হয়, সেখানেও যে যেটি শুক্ল, সেটি অশুক্ল থেকে আলাদাই থাকিতে চায়—কেনই বা এই মৌলিক ভেদ, এই নিগূঢ় নির্বাচন? এ সব রহস্য জানিতে ইচ্ছা করিয়া কে-ই বা জানিল—রথস্থিতা, শূর্পহস্তা, জরালোলা, বিধবা ঐ ধূমাবতীটি কে? অর্থাৎ মায়ের এই মূর্তির মধ্যেই এ সব রহস্যের সঙ্কেত লুকাইয়া আছে। তিনি রথারূঢ়া হইয়া বিশ্বভুবনের এই নিয়ত গতিকেই জানাইয়া দিতেছেন। আবার স্বয়ং জরালোলা হইয়া ইহার নিয়ত জীর্ণতা ও লৌল্যকে বুঝাইতেছেন। আর মায়ের হাতে যে শূর্প বা 'কুলো'; তার দ্বারা তিনিই যে বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিবীজকে ঝাড়াই করিয়া নির্বাচন করতঃ প্রত্যেকটি স্বতন্ত্ররূপে, পৃথকরূপে বজায় রাখিয়াছেন—তাহাই জানাইতেছেন। সুতরাং বিশ্বের বিপরিণাম, তার জরা, লৌল্য, এবং প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য—সৃষ্টির এ সমস্ত রহস্যই ধূমাবতীর মূর্তিতে লুকাইয়া আছে। যতদিন সৃষ্টির এই আবর্তনে আমরা পড়িয়া আছি, ততদিন ইহার মালিকের সন্ধান পাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই মা আমার অধবা, পতিহীনা। আমরা তাঁকে তাই সধবা বেশে দেখিতে পাই না। তাঁর পতি হইবার স্পর্দ্ধাই বা কার আছে! তাঁর সীমন্তে সিন্দুর পরাইবার দুঃসাহসই বা কার হইবে? সেজন্য আমাদের কাছে তিনি চিরদিনই অধবার বেশে আবির্ভূতা!॥ ১০৩॥

নাসৃগ্‌বীজপ্রতীকোঽপ্যজরমনসিজো জীর্য্যতে জীর্য্যমাণে
বিশ্বে গ্রন্থির্হৃদাং বাহশনিশতসুদৃঢ়ো দীর্য্যতে ধ্রৌব্যহানে।
মা ভূৎ কিং লৌল্যলেশো জনিমৃতিসরণৌ সংসৃতেশ্চক্রনেমৌ
মিথ্যোত্থেযুস্বরূপং কিমু চিরমধবে নোত্থচিতং স্যাচ্চিতং বা॥ ১০৪॥

রক্তবীজ যার প্রতীক সেই মনসিজ (কাম), সমগ্র বিশ্ব জীর্যমাণ হইতে থাকিলেও যে জীর্ণ হয় না, পরন্তু অজরই রহিয়া যায় দেখিতেছি। এর উপায় কি মা?

নিখিল ধ্রুব পদার্থের ক্ষয় অপচয় ঘটিলেও হৃদয়ের গ্রন্থিপাশ যে দীর্ণ হয় না, পরন্তু শত বজ্রের মত সুদৃঢ়ই রহিয়া যাইতেছে। এরিরই বা উপায় কি মা? অনাদি ক্লেশসঙ্কুল জন্ম-মরণের পথে সংসার-রথের চক্রনেমি কেবলি তো ঘুরিতেছে, তাতে কি শৈথিল্যের লেশটুকুও লক্ষিত হইবে না? অর্থাৎ এই জন্ম-মরণচক্রের বিরামের কি কোনো চিহ্নই দেখা যাইবে না? মিথ্যার এই অফুরাণ ভেল্কি-পরম্পরার মাঝে যেটি সত্য, যেটি স্বরূপ, সেটি কি, অয়ি অধবে! সংগৃহীত হইবে, না চিরকালই এমনি হারাইয়া থাকিবে অথবা পরিত্যক্ত রহিবে?॥ ১০৪॥

কা শক্তিঃ শক্তিমান্ কঃ কমিতি তদুভয়োর্মেলনাৎ সামরস্যং
কা বাক্ কশ্চার্থ এবং স্বরতদিতরয়ো র্মাতৃকাদ্যর্ণযোগাৎ।
প্রাণাপানৈকতানে বিরমতি চ জবে কাঽজপা চাজপঃ কো
ধ্মাতে কঃক্কেতি হৌংসো ধমতি ন শৃনুয়াদ্ বায়সে কো ধ্বজস্থে॥ ১০৫॥

ধূমাবতীর রথধ্বজে ঐ কাকটি যে কি তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? এক দিকে বিশ্বজরামৃত্যুর আহ্বান, অন্যদিকে জরামৃত্যু হইতে অজর অমর যে অনপায় স্থান তাতে উতরণের আহ্বান—এ দুই-ই যে বায়সের যথাক্রমে "কঃ ক্ব" এবং "হৌংসঃ" রুতিতে সূচিত হইতেছে, তাহা কি শুনিবে না? বিশ্বপ্রাণী শুনিতেছে—"কঃ ক্ব"—কে কোথা আছে এস—এস—রথচক্রতলে পাতিত ও নিষ্পেষিত হও—শূর্পে পড়িয়া বিভক্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া যাও! নিয়তি অনতিক্রম্য! কিন্তু বায়সের মুখে শুধু ঐ রবই শুনিবে? "হৌংসঃ"—এই অমৃত অভয়ের আহ্বানটি শুনিবে না?

এ অভয়ের আহ্বান কি ভাবে শুনিব?

শক্তি হইল কা, শক্তিমান কঃ। এ দুয়ের যদি ভেদদৃষ্টি কর, তবে শক্তি তো চিচ্ছক্তি হইল না; সুতরাং জড়যন্ত্রেই তুমি পাতিত, নিষ্পেষিত হইলে। কিন্তু শক্তি শক্তিমানকে যদি মিলাইয়া "সমরস" কর, তবেই না "কং", কিনা, সুখম্!

এই প্রপঞ্চ বাক্ ও অর্থের সমষ্টি। মূলতঃ এদুটি সংপৃক্তমিথুন। কিন্তু তাদের "ছাড়াছাড়ি" বিশ্বব্যবহারে হইয়াছে দেখিতেছি। তাই না নিরর্থক (আনর্থক্য, বৈয়র্থ্য ইত্যাদি বশতঃ) বাক্ অমৃত, অভয়ের সন্ধান দেয় না! কা হইল বাক্, কঃ হইল

অর্থ। "কাকঃ" এই শব্দে স্বরব্যঞ্জন মাতৃকাবর্ণের আদি (অকার এবং ককার) বর্ণ দুটি যুক্ত হইয়া আছে। যদি স্বর এবং ব্যঞ্জনকে বিযুক্ত করিয়া রাখ তো মৃত্যু, আর যদি যুক্তই রাখ তো অমৃত। যোগে আবার সেই কং—সুখম্। স্বরই বা কি, ব্যঞ্জনই বা কি, মাতৃকাবর্ণই বা কি ভাবিয়া দেখ। বায়সের রবে সেই নির্দেশ রহিয়াছে।

পুনশ্চ' প্রাণীর প্রাণাপান ব্যাপারের একতানতা (সমতা) রক্ষা করিবে, না করিবে না? উক্ত ব্যাপারের যেটি প্রাকৃত বেগ, তার বিরামস্থলেও কি শান্ত, স্বস্থ রহিবে? যদি সমতা রাখিতে পার তো জরা দূরে রহিবে, বিরামস্থলেও যদি "উদাসীন" ("মধ্যে বামন মাসীনং") থাকিতে পার তো, মৃত্যু আসিল না। কা = অজপা; কঃ = অজপঃ। জরা মৃত্যুর এবং তার পারে এই মূলরহস্যটি কাক ডাকিয়া শুনাইতেছে। "হৌংসঃ" এই মহাবীজেই জরামৃত্যুবারিণী ওই ত্রিবিধ "ভাবনা"ই নিহিত। সঃ = শক্তি, হ = শক্তিমান, ওঁ = উভয়ের সামরস্য। ওঁঙ্কারের আদ্য মাত্রা অকার, হকার ব্যঞ্জনের শেষ বর্ণ, এতদুভয়ের সমর্থ-সংযোগ সূচক সঃ। আবার, হংস = স্বাভাবিক প্রাণনক্রিয়া; ওঙ্কারদ্বারা এটি জরামৃত্যুজয়ী॥ ১০৫॥

বর্ণানাং বিশ্বচিত্রে নিলয়বিলয়য়োঃ স্থানমেবেতি কৃষ্ণা
বর্ণৈর্বাহবর্ণনীয়া কতিযতিততিভির্বাপ্যনির্দ্দেশ্যবর্ণা।
বর্ণানাং বা পটেঽস্মিন্ কলনফলনয়োঃ স্থানমেবেতি শুক্লো
যোঽভাস্যত্বেঽপি বর্ণৈঃ পটপটুফলনে ভাসকঃ স্বপ্রকাশঃ॥ ১০৬॥

পরিশেষে, ষোলটি শ্লোকে শ্রীশ্রীকালিকার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যাইতেছে। শ্রীশ্রীকালীর মূর্তিটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণা। তাঁর এই কালোরূপের কি রহস্য, প্রথম তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাইতেছে।

এই নিখিল বিশ্বের যে চিত্রপট, তাহাতে যে অসংখ্য বর্ণ, সেই সমস্ত বর্ণের নিলয় ও বিলয় তাঁহাতেই। তিনি স্বয়ং বর্ণহীনা অথচ সব বর্ণের প্রসূতি, আবার বর্ণ-সমাপিকা, বর্ণের গ্রাসিকা—তাই কি তিনি কালো? বর্ণ, পদ, পাদমাত্রা, ক্রম বা অন্বয় কিছুর দ্বারাই তিনি বর্ণনীয়া নন—এই অবর্ণনীয়া বলিয়াই কি তিনি কালো? বিশ্বের অনন্ত তরঙ্গাভঙ্গ, এই ঊর্মিরাশি এক অগাধ দুরবগাহ মহা-অজানায় ওঠে আর

ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে। তাহাদের এত, যত, কত বলিয়া ইয়ত্তা কে করিবে? এরূপ অনির্দেশ্যা বলিয়াই কি তিনি শ্যামা? আবার, মায়ের পদতলে দেখিতেছি উজ্জ্বল শুভ্ররূপ, একদিকে কালো আবার অপরদিকে ধলো! তিনি বিশ্বচিত্রপটের কলনে ফলনে সব বর্ণের আধার, সর্ববর্ণময়—তাই কি তিনি ধলো? এখন বর্ণশব্দটি ত্রিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়—পট বা রং (colour), পদ (letter), এবং জাতি (caste)। কিন্তু বর্ণশব্দের যে অর্থই গ্রহণ করি না কেন—কোনো অর্থের দ্বারাই তো তিনি প্রকাশিত হন না। তিনি যে আপনায় আপনি প্রকাশ, স্বপ্রকাশ স্বরূপা, আবার সকল কিছুরই প্রকাশক তিনিই, এই বিশ্বচিত্রের ফলনে তাঁর পটুত্বের যে আর জুড়ি নাই॥ ১০৬॥

যে গ্রাহ্যাশ্চিত্রবর্ণা গ্রহণপরিচয়া মানসে বিম্বিতাস্তে
ছায়াচিত্রাণি সাক্ষাদ্ দধতি জহতি কাঃ শক্তয়ঃ কে চ কায়াঃ।
গম্ভীরাগোচরান্ত-স্তিমিরনিবিড়তা যাদিমা সা ক্ষপা চেৎ
স্পন্দৈস্তস্যাঃ প্রবৃত্তৈঃ কিরণবিকিরণৈর্ভাতি ভাসা স্বয়াঽহঃ॥ ১০৭॥

তারপর, এই যে যত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কামনা, বেদনা প্রভৃতি ছায়াচিত্রের মত আসে ও চলিয়া যায় ইহারা কি এই চলচ্চিত্রে তাদের সত্য পরিচয়টি কখনো দেয়? যদি এ সব বস্তুহীন ইন্দ্রজালই হয়, তবে কোন্ যাদুকরী শক্তি—ছবি ও পট, দৃশ্য ও দ্রষ্টা ইত্যাদিরূপে এই ভ্রান্তিকে বিজৃম্ভিত করিয়া অন্তরে বাহিরে এই নিছক ছায়ারূপ খেলা দেখাইতেছে? আর যদি এ ছায়া বস্তুহীন অর্থাৎ অবাস্তব না হয়, যদি ইহার পিছনে সত্যই কোনো কায়া থাকে, তবে সে কায়াই বা কেমন? সেই অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মহাকালী কেমন করিয়াই বা এই সব ছবি তোলেন, পটের উপর সাজাইয়া ধরেন, আবার সরাইয়াও লন? এই রহস্য-ক্রীড়া তিনি লুকাইয়াই খেলেন—তাই কি তিনি কালো? শ্রুতির নাসদীয় সূক্ত ও রাত্রিসূক্ত প্রভৃতিতে যে আদিম অগোচর গম্ভীর অম্ভোরাশির বর্ণনা আছে, যাহার বক্ষোপরি এই বিশ্ববোধ বুদ্বুদের মত ঊর্মিভঙ্গে ফুটিয়া উঠে, সেই গাঢ় তমিস্রাই কি মায়ের আমার নিত্য কালো রাত্রিরূপ? যদি তাই হয়, তবে নিজের সেই অন্ধকারে তিনি নিজের স্পন্দনে বা আলোড়নেই কি আবার আলোর লহরী ফুটাইয়া তুলেন না? তাই স্বরূপতঃ তিনি আলোকে বা আঁধারে সর্বত্রই

সমান প্রকাশময়ী, অনির্বাণ তাঁর আত্মজ্যোতি, তাই তিনি পূর্ণ দিবা বা শ্রুতির সেই 'সকৃৎ দিবা' রূপিণী॥ ১০৭॥

সত্যাস্যং যা পিধায় প্রলয়ঘনরুচিশ্চিদ্‌ঘনেন্দু-প্রকাশং
মায়াঘোরেন্দ্রজালঞ্চ চিকুরপটলৈস্তন্বতী যা করালী।
নানাঽসৃগ্‌বীজকূটং প্রকটিতরসনা জক্ষতী সৃজ্যমানং
তৎসত্যং বাধমুক্তং হৃদয়নভসি নঃ কুর্ব্বতী সা সুহাসা॥ ১০৮॥

মা কালী তাঁর এলায়িত কুন্তলরাশি দশ দিকে সঞ্চালিত করিয়া যেন মায়ার ঘোর ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন ও করালী সাজিয়াছেন। কিন্তু তাঁর এই এলায়িত কেশপাশের যথার্থ রহস্য কি? ইহা দ্বারা যেন তিনি তাঁর যথার্থ সত্য মুখচ্ছবিটি, সেই পরম সুন্দর আননটি ঢাকিয়াছেন অর্থাৎ গোপন করিয়াছেন। তাই তাঁর যথার্থ রূপটি সকলের দৃষ্টির অন্তরালেই রহিয়া যাইতেছে। আবার এই করালীর দেখি লোলজিহ্বা। ঘন কৃষ্ণ কেশপাশের সঙ্গেই এই রক্ত-রসনা যেন মেঘের পাশে বিজলীর মতই শোভা পাইতেছে! যিনি ইন্দ্রজালে শত কোটি রক্তবীজ নিজেই সৃষ্টি করেন, যে রক্তবীজের স্বরূপ হইতেছে দুষ্পুর তৃষ্ণা—যতই মনে হয় এবার বুঝি তৃষ্ণা মিটিল, আবার দেখি সে মাথা গজাইয়া উঠিতেছে!—সেই তিনিই আবার কোপের ছল করিয়া পরম করুণায় নিজ লোলজিহ্বা দ্বারা এই রক্তবীজের 'কূট' বা সমূহ বা 'ঝাড়' কে গ্রাস করেন। নহিলে কি এ নিত্য তরুণায়মান তৃষ্ণার তর্পণ হইত কোনো কালে? তাহা হইলে আমরা পাইলাম যে, তাঁর এলায়িত কেশ পাশ এই ঘোর ইন্দ্রজালের বিস্তার সূচনা করিতেছে এবং লোল রসনা সেই ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট অসংখ্য কামনার নিধন বা সংহারকেই বুঝাইতেছে। এইরূপে তাঁর সৃষ্টি ও সংহারের দুটি সঙ্কেত আমরা ধরিতে পারিলেও তাঁহার যথার্থ স্বরূপটি, সেই পরম রমণীয় মুখচ্ছবিটি কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালেই রহিয়া যাইতেছে। সে মুখখানি কেমন—কালো না ধলো? আমরা নিত্যই এইরূপ দ্বন্দ্ব-সংশয়ের দোলায় দুলিতেছি। এই ধাঁধা, এই দ্বন্দ্ব, এই সংশয় তিনি স্বয়ংই আমাদের মোহমুক্ত হৃদাকাশে পূর্ণরূপে উদিত হইয়া দূর করিয়া দিবেন। তাই বুঝি তাঁর মুখে ঐ মৃদু মৃদু হাস্য!॥ ১০৮॥

নৈঃস্পন্দ্যে স্পন্দ আদ্যশ্চিদমল-গগন-ধ্বান্ত-ঘোরম্বুদঃ কিং
শশ্বন্ মৌনং বিলোড্য ধ্বনিশত-সতত-ধ্মাতনাদস্ততঃ কিম্।
ধ্বান্তধ্বংসায় সান্দ্রা স্ফুরতি চ পরমা চিন্নভশ্চন্দ্রিকা কিং
মান্দ্যং জীমূতমন্দ্রে ভজতি ভবমৃতেস্তুর্য্যনাদস্ততঃ কিম্॥ ১০৯॥

এই যে নির্মল চিদাকাশে কালো ঘনঘটার আবির্ভাব, ইহা কি সেই শান্ত স্পন্দহীন স্বরূপের মধ্যে আদিম স্পন্দনের ঘনীভাবকেই সূচিত করিতেছে? যিনি পূর্ণ তাঁহাতে কেমন করিয়া কামনার উদয় হয়? যিনি নিঃস্পন্দ তাঁহাতে স্পন্দের আবির্ভাব হয় কিরূপে?—এ হেঁয়ালী চিরদিনই দুর্বোধ্য বলিয়াই কি তিনি কালো? সৃষ্টির গোড়াকার যত তত্ত্ব, যত বীজ—সব কিছুরই বর্ষণ তাঁহা হইতে, তাই সেই স্পন্দ কি মহাবৃষ বা বর্ষণকারী মেঘের রূপ ধরিয়াছে? তাই কি মা আমার সেই ঘোর কৃষ্ণ অম্বুদে নিজের প্রতিমাটি গড়িয়াছেন? আবার কোন্ শাশ্বত মৌনকে আলোড়ন করিয়াই বা তিনি মহানাদরূপে প্রকট হইলেন—যে-নাদ শত কোটি ঊর্মি বিস্তার করিয়া এই বাঙ্ময় বিশ্বসৃষ্টি করিল, আবার শেষে সম্বরণ নাদে সব সম্বরণ বা লয় করিল? এই কালো মহামেঘের ঘটা শেষে বিলীন করিয়া তিনি কি পরম চিরপূর্ণা চিদ্গগনচন্দ্রিকারূপে প্রকাশ পান না? তেমনি এই কখনো গাঢ়, কখনো ঘোর যে মেঘমন্দ্র তাহাকে মন্দীভূত করিয়া তিনি কি অবশেষে তাঁর বিশ্বোত্তর অভয়ের ধামে সেই তুর্যনাদ বা তুরীয় নাদ শোনান না—যে-তুরীয় নাদে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—সব কিছুরই অবসান এবং যাহাতে মহাভীতিকর এই পুনঃ পুনঃ 'ভবের' বা সংসরণেরও মরণ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ গতাগতিচক্র থামিয়া যায়। সুতরাং তাঁর এই কালোরূপের পশ্চাতে রহিয়াছে পরম আলো এবং তাঁর এই মহানাদের বিভিন্ন গর্জন-আলোড়নের পিছনেও রহিয়াছে সেই পরম নাদ বা তুরীয় শান্ত প্রপঞ্চোপশম নাদ॥ ১০৯॥

ক্ষিপ্যের্বিশ্বং বিমৃশ্য ত্বদিতরদিব যৎ স্থাপয়েৰ্যৎ স্বভিত্তৌ
তচ্চ স্বাত্মেতি বিদ্যাঃ প্রমিতিপদমিতং বস্তু সংখ্যাপয়েৰ্যৎ।
স্বাত্মৈক্যঞ্চ প্রমেয়া দিকমিব গময়ের্দর্পণাস্যং স্ববিম্বং
সাতুং স্পন্দং নদেস্ত্বং তবকলনকৃতৌ পঞ্চধা নিত্যকালি॥ ১১০॥

হে মাতঃ! নিত্যকালি! তুমি পরম তত্ত্বের সাথে সমরসা, অভিন্না শক্তিস্বরূপিণী। তোমা ছাড়া অন্য কি বা ছিল বা আছে যাহাকে এই বিশ্বকন্দুকরূপে ছুড়িয়া লুফিয়া এই খেলা খেলিতেছ? 'যেন ওটা অন্য কিছু তুমি নও'—এ খেয়ালই বা তোমার কেন? এইরূপে যাকে ছুড়িয়া ফেল, তাকে কি সত্যই একেবারে বাস্তুহারা, সর্বহারা করিয়া নিজের অঙ্ক হইতে একান্তই দূরে ফেল? তাকে কি নিজের ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া রাখ না? এ যেন আসমানে ঘুড়িটি উড়াও কিন্তু সূতাটি রাখো নিজের নাটায়ে। সেই লক্ষ লক্ষ ঘুড়িগুলির মধ্যে যদি একটি কাটে, তবে সেও তো তোমারি ক্রোড়েই ফিরিয়া থাকে। যে ওড়ে সে হয় তো আত্মবিস্মৃত, জানে না কোন্ সূত্রধর তাকে উড়াইতেছে, কিন্তু তুমি তো তাকে ভোলো না! বোধরূপ দর্পণে যাহা কিছু ফোটে, তাদের তুমিই রূপ, মান ইত্যাদি দিয়া থাক। আবার দর্পণ ভাঙ্গিয়া যখন প্রতিবিম্বকে বিম্বে মিলাইয়া লও, তখন আবার তুমি যে এক সেই এক। সব কিছুকে অদ্বয়স্বরূপে টানিয়া লইবে বলিয়া তুমি বহিঃস্পন্দকে সম্বরণ নাদে অবসান করিয়া থাক। তাই নিত্যকালি! ক্ষেপণ, জ্ঞান, সংখ্যান, গমন, ও নাদ—এই পঞ্চরূপে তোমার কলন প্রপঞ্চিত করিয়াছ॥ ১১০॥

ব্যস্তং খড়্গেন বস্তু ক্ষিপসি যদসকৃৎ স্বাত্মনো দেশকাল-
সম্বন্ধাপেক্ষতত্ত্বং জনিমৃতিভয়দং হংসি তচ্চাপি হেয়ম্।
ব্যস্তং মুণ্ডং করাব্জে কলয়সি চ গলে মুণ্ডমালাং সমস্তাং
দৃগ্‌ভাসা বেৎসি দৃশ্যং গিরসি রসনয়া যদ্ বহিঃস্ফারনাদে॥ ১১১॥

আবার মা! তোমার খড়্গেরই বা কি অপূর্ব রহস্য! তুমি ভূমারূপিণী অখণ্ড সামগ্রী—অথচ আপনার খড়্গে তাহাকে ব্যস্ত পরিচ্ছিন্ন বস্তুরূপে বারবার খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। নিজে দুই হব, বহু হব, অগণিত হব—এই সাধেই কি অসিটি ধরিয়াছ? দেশ-কাল, কার্য-কারণ ইত্যাদি নানা সম্বন্ধের জাল ঊর্ণনাভের মত বুনিয়া তুমি কি এই ব্যস্ত খণ্ড বস্তুগুলিকে নিজের মধ্যেই গাঁথিয়া রাখিয়াছ? কী অপূর্ব উপাদেয় তোমার এই বিরচন! সবই তো তোমাময়, তুমিই তো সব! অথচ ভ্রান্তিরূপে সকলকে ভুলাইয়া তুমি নিজেকে জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, পাশ ইত্যাদিরূপ মহাবল দৈত্যরূপেই দেখাইতেছ। মাতৃজ্ঞানে তুমি উপাদেয় থাকিলেও ভ্রান্তিজ্ঞানে যেন হেয় হইলে! আবার

দয়ারূপে এই হেয়রূপ অসুরকে অসি দ্বারা ছিন্ন করিলে! তোমার এ লীলার পার পাওয়া ভার। আবার তোমার করে দেখি একটি ছিন্নমুণ্ড, এদিকে গলায় দেখি বহু ছিন্নমুণ্ডের একত্র সমাবেশে গ্রথিত এক অপরূপ মুণ্ডমালা। তোমার করকমলে একটি ব্যস্ত মুণ্ড, আবার গলায় সমস্তের মালা—এইরূপে ব্যস্ত ও সমস্ত উভয়কেই তুমি ধারণ করিয়া আছ। একহাতে আবার তোমার বর, অপর হাতে অভয়। ওই ব্যস্ত-সমস্তের যেটি সন্ধি বা সাম্যস্থল সেইটিই কি বর? আর ব্যস্ত-সমস্তের অতীত ভূমিই কি অভয়? তাই কি শ্রুতিতে শুনি ওই সন্ধি বা মিথুনেই সব কিছু সমৃদ্ধি ও তৃপ্তি, অভুদ্যয় বা বরলাভ এবং তারও পারে সেই রসতমে পরম অভয়, চরম শান্তি? তুমি মাগো! তাই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স, ভোগ ও মোক্ষ—উভয়ই তোমার দুই করে বিতরণ কর। এ সব রহস্যই তোমার নেত্রজ্যোতিতে তুমি দেখিয়া থাক। অন্য আর কে-ই বা জানে? আর তোমার-জিহ্বা বাহ্যবৎ এই অনাত্মাকে আত্মসাৎ করে, ও শেষে স্ফারনাদে প্রপঞ্চের লয় ঘটিয়া থাকে॥ ১১১॥

স্বাধিষ্ঠানপ্রকাশো বিমৃশতি চ কথং স্বামনন্যাং স্ফুরত্তা
মীশং মায়াং সদাখ্যং পরমশিবপদে কঞ্চুকাংশ্চাপি কস্মাৎ।
নাহং নেদং ন চোভে ন চ ভবতি গিরঃ প্রত্যয়শ্চাপি যত্র
তত্র প্রত্যেতি কালী বিলসতি চ মুদা নিত্যকৈবল্যতত্ত্বা॥ ১১২॥

আবার প্রশ্ন জাগেঃ মা! তোমার স্বাধিষ্ঠান প্রকাশস্বরূপে কেমন করিয়া "তুমি—আমি", "দৃশ্য—দ্রষ্টা", "এটা, ওটা, সেটা"—এই সব বিচিত্র স্ফূর্তির রূপ ফুটাইলে? কিন্তু যেখানে যত কিছু স্ফূর্তি বা প্রকাশ সবই তো তোমারই স্বতঃস্ফূর্তি, তুমিই তো একমাত্র প্রকাশ। তুমি তো স্বয়ং পরমশিবপদ—তবে কেমন করিয়া তাহা হইতে সদাশিব, ঈশ্বর, প্রকৃতি, মায়া প্রভৃতি তত্ত্বের ও কঞ্চুকের তুমি প্রসূতি হইলে? তুমি শুনি নিয়ত কৈবল্যরূপা—নিজের মধ্যে ভেদের কোনো বীজই রাখ নাই। অথবা সংগোপনে "আমি—তুমি" রূপ ভেদের বীজ কি নিজের মধ্যে রাখিয়া দাও নাকি? তোমার অগাধ রহস্যে কোনো বাচ্য-বাচকেরই গতি বা অবকাশ নাই। তবু হে কালি! তুমি নিজের কলনে অনন্ত প্রত্যয় বা বোধরূপে,—তত্ত্ব, বস্তু, সম্বন্ধের বেশে—

নিজেকে দেখাইলে, প্রকাশ করিয়া ধরিলে! চিতি হইয়াও তুমি বিশ্বভুবনের পরিচিতি হইলে। আবার নিজ কৈবল্যস্বরূপে সাক্ষাৎ আনন্দরূপিণী তুমি, শিবাদি তত্ত্বকে লইয়া নিয়ত আনন্দ উল্লাস করিয়া থাক॥ ১১২॥

চৈতন্যে নিষ্ক্রিয়েঽসৌ শিবশিবহৃদি যা প্রৈধতে শক্তিরূপা
সা শক্তিশ্চেতয়িত্রী চিতিরিতি গদিতা তাম্ঋতে চিন্মৃতেব।
যাস্তে তিস্রো লহর্য্যঃ কৃতিরতিমতয়ঃ সচ্চিদানন্দসিন্ধৌ
তাভিঃ সৎ যৎ প্রমেয়ং প্রমিতিরিতি চিদানন্দ উল্লাসরাশিঃ॥ ১১৩॥

আবার নিত্যকৈবল্যেও দেখি তোমার অপরূপ বিচিত্র বিলাস! পদতলে তোমার শবশিব। ও কি শুধু নিষ্ক্রিয় চৈতন্য, নিরঞ্জন অধিষ্ঠান মাত্র? কোনো কোনো মূর্তিতে দেখা যায়, শিব বাহুর উপর ভর দিয়া মাথাটি ঈষৎ তুলিয়া আছেন। এইরূপে বক্রঠামে মাথাটি তুলিয়া তিনি কি তোমার লীলার "সাক্ষী" বা দ্রষ্টাও হন? স্বরূপেতে রমণেচ্ছার দ্বারা তুমি দেখাইয়া দাও যে তুমি বিনা চিৎ শুধু চিৎই থাকে, চিতি হয় না, তোমা বিনা সে মূক, স্তব্ধ আনন্দ মাত্র সেখানে উল্লাস-বিলাস নাই। চৈতন্যের অধিষ্ঠানে শক্তিরূপা তুমি মহোৎসাহে নাচিয়া চল। কে বলে যে সে-শক্তি জড়া, শুধু দৃশ্যা বা ভোগ্যা? সে যে চেতনেরও চেতয়িত্রী বা চৈতন্য সম্পাদন কারিণী। সে যে চিতিরূপা জগদ্ব্যাপিনী ("চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ")। চিতি বিনা চিৎ যে শবশিব, যেন মরার মতন। তুমিই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রেতে তিনটি লহরী তুলিয়া থাক—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া। ইহার ফলে সৎ জ্ঞেয়ের আকারে সত্যরূপ ধরিল, চিতের জ্ঞান-জ্ঞাতৃরূপে চেতনা হইল, আর আনন্দ অনন্ত উল্লাসরাশিরূপে আনন্দী হইল। এইরূপে সচ্চিদানন্দের আত্মপ্রকাশ সার্থক হইল॥ ১১৩॥

আনন্দব্যোমসান্দ্রা ত্বমসি শশিকলা নিষ্কলা যা তুরীয়া
সাদ্যা নৈষ্কল্যনিত্যা কলয়সি চ কলাং শক্তিতত্ত্বাদিরূপাম্।
উন্মেষে পূর্ণিমোমা ধ্রুবনিজনিলয়েঽহ ব্যাকৃতাহ মাস্যমেয়া
ব্যক্তৌ কামাদিমুখ্যাঃ কতিবিধকলনাস্তে কলা অম্ব কালি॥ ১১৪॥

সর্বশ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে আনন্দরূপ আকাশ—যাহা সর্ব-দ্বন্দ্বের উপরমস্থান, যাহার যোগ বিয়োগ নাই, যাহা পূর্ণ ও পরম—সেই আদি আনন্দব্যোমে তুমি কেমন করিয়া অপ্রাকৃত সান্দ্র মনোরম শশিকলারূপে উদয় হইলে? কিরূপে তুমি স্বরূপতঃ নাদবিন্দুকলাতীতা নিষ্কলা তুরীয়া পরা স্বরূপিণী হইয়াও শক্তিকলা আকার ধরিলে, ওই ললাটে শশিকলা ধারণ করিলে? যাহা পূর্ণ ও পরম তাহাতে সামরস্যে অচ্যুত থাকিয়াও তুমি শিবশক্তি-তত্ত্বাদিকলায় কেমন করিয়া দেখা দিলে? এই ইন্দুকলার প্রকাশে কি তোমার পরম অচিন্ত্য ইচ্ছাটিরই আবির্ভাব সূচিত হইতেছে? নিজের দ্বারা কল্পিত এই যে কলা ইহার পূর্ণোদয় হইলে অর্থাৎ কলার সম্পূর্ণতা লাভ হইলে তুমি হও পৌর্ণমাসীরূপিণী উমা, শ্রীবিদ্যা বা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী। আবার তোমার গোপন ধ্রুব আলয়ে তুমি নিত্য অমারূপিণী—যেখানে সমুদিত সমস্ত কলানিচয় বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেখানেও তুমি কি ললাটে শশিকলা ধারণ কর? একদিকে উমা, অপরদিকে অমা—এই দুই হইল পরমের সীমা। এই দুই সীমার মাঝেই "অউম' এই মাত্রাত্রয় লইয়া প্রমুদিত কামাদি কলায় তোমার কত না অসংখ্য কলন, কত না বিচিত্র পরিণাম—কে তাহার সংখ্যান বা গণনা করিবে?॥ ১১৪॥

জ্যোতির্ব্যোম্নি স্বকীয়ে কিরসি নিজকণান্ ভাস্করা যে মহান্তো।
নাদজ্যোতির্বিলোভ্য কলয়সি লহরীঃ কেন্দ্রসান্দ্রাংশ্চ বিন্দূন্।
ধারাধারঃ স কালঃ ক্রমলববিরহী বৈন্দবো যঃ ক্রমেত
ধ্বংসে চোভৌ স্বরূপেঽপ্যনবরগহনে কাল এবাসি কালী॥ ১১৫॥

পূর্বশ্লোকে আমরা আনন্দব্যোম বা আনন্দরূপ আকাশের কথা বলিয়াছি। কিন্তু সে কি শুধু আনন্দব্যোম? সে যে আবার সকল জ্যোতির জ্যোতি। পরম আশ্চর্যময় সেই জ্যোতির্ব্যোমে তোমার জ্যোতি যেন সহস্র কণায় বিচ্ছুরিত হইয়া আন্তর ও বহির্বিশ্বে কত সব মহান ভাস্কররূপে প্রকাশ পাইতেছে! নিজের আনন্দজ্যোতিরূপ এই ব্যোমকে স্পন্দিত করিয়া তুমি আবার হও "নাদ" এবং নাদের লহরী। নাদ হইল অসীম ও বিস্তৃত। সেই অসীম বিতত নাদে আবার তুমি পরম ঘনীভাব সৃষ্টি করিয়া, অর্থাৎ সেই বিস্তৃত নাদকে তার চরম সূক্ষ্ম অবস্থায় লইয়া গিয়া, সঙ্কোচ করিয়া

তুমি ধরো "বিন্দুরূপ"। এই নাদ এবং বিন্দু—এই উভয়ে তখন তুমি পূর্ণ হও। আর এই দুই পূর্ণের মাঝে তুমি "কলা"য় কলায় লীলায়িত হও, নিজেকে বিবর্তিত কর। এই নাদ-বিন্দু উভয়ের লহর উভয়ের পানে ধাবমান, অর্থাৎ একবার বিস্তার, আবার সঙ্কোচ, এবং একবার সঙ্কোচ, আবার বিস্তার—এইরূপে একবার বিস্তার নিজেকে সঙ্কুচিত করিতে চাহিতেছে, আবার সঙ্কোচ নিজেকে বিস্তৃত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। এই যে পরস্পরের মধ্যে গতি বা ধাবন—ইহাই জগৎ। ধাবনেও আবার তোমার দুই ধারা—নাদরূপে নিত্য মহাকাল, ধারার আধাররূপে বর্তমান—তাহা অক্রম বা ক্রমশূন্য (অর্থাৎ (succession বা পারম্পর্য তখনো আসে নাই), এবং ভগ্নাংশবিহীন অর্থাৎ অখণ্ড। আর বৈন্দবরূপে তুমি বিন্দু, বিন্দু হও, ক্রম এবং অংশরূপ ধারণ কর; প্রথমটির প্রতীকরূপে দেখি তোমার পদতলে স্বয়ং মহাকাল, আর দ্বিতীয়তঃ মুণ্ডমালা মেখলায় দেখি তোমার বৈন্দবী মূর্তি। তাই তুমি কালব্রহ্ম কালী॥ ১১৫॥

উদগীর্ণং কিঞ্চ জিহ্বা ত্বরয়তি কবলং কেবলং ব্যাকৃতং কিং
সাধ্বী বাহসৃক্স্ফুরন্তী দশনবররুচিশ্চর্ব্বণে ব্যাহৃতানাম্
(চর্ব্বিতানাম্)।
অগ্নীষোমার্ককঌপ্তাঃ কিমপি তব দৃশো ব্যাবৃতব্যঞ্জনায়
নির্ব্ব্যাপারৈকতত্ত্বা কৃতিবৃতিহৃতিভির্ব্ব্যাপৃতা ব্যাপিতাভিঃ॥ ১১৬॥

অব্যাকৃত তোমা হইতে যাহা কিছু ব্যাকৃত হইয়াছে অর্থাৎ তুমি যত কিছু উদ্গীর্ণ করিয়াছ বা বাহিরে ফেলিয়া দিয়াছ, সেই সমস্ত কিছুকে আবার নিজের কবলে আনিবার জন্যই কি তোমার রসনা ব্যাপৃত রহিয়াছে? তাকে কি আর অন্য কোনো কাজ দাও নাই? আবার তোমার রক্তরাগরঞ্জিত দশনবররুচি, দন্তপংক্তি কি শুধু ব্যাহৃত বা সৃষ্ট বস্তুরই ব্যাহরণে বা চর্বিতেরই চর্বণে নিরত? তোমার আদি ব্যাহৃতিটিই বা কি—যাহাকে তিন বা সাত বা অনন্ত ব্যাহৃতিরূপে প্রকাশ করিলে? ব্যাহৃতির গ্রন্থি-সন্ধি সব কিছু বুঝি তোমার চর্বণে সমীকৃত হয়! তবে কি তোমার দশনের রক্তচ্ছটা—যে ব্যাহৃতি হোমে সব বৈগুণ্যের সমাধান হয়—সেই ব্যাহৃতি হোমের

শিখা? আবার দেখি তুমি ত্রিনয়নী—অর্ক, অগ্নি, সোম—এই তিনটি নয়ন কি তোমার রসনাস্রুবায় যে নিত্য আত্মহোম চলিতেছে তারই তিনজন হোতা? তারা কি শুধু এই কর্মেই ব্রতী? সৃষ্টি, স্থিতি, লয়; নাভি, অর, নেমি—এ সবই কি তোমার এই মহাকর্মের সঙ্কেত?

তুমি তো নির্ব্ব্যাপারৈকতত্ত্বা, পূর্ণব্রহ্মরূপা, তবে অনন্ত ব্যাপারে আবার তুমি ব্যাপৃতই বা রহিয়াছ কেন? কোন্ প্রয়োজনেই বা এত ব্যাকৃতি-ব্যাহৃতি-ব্যাবৃতির ঘটা? এ কি সবই শুধু স্বভাববশেই হইয়া চলিয়াছে? স্বভাববাদীরা তো সেইরূপই বলিয়া থাকেন যে সবই আপনা-আপনি প্রকৃতির বশে হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমরা তো জানি তুমি নিমিত্ত না হইলে স্বভাব ও যে স্ব-অভাব হইয়া পড়ে অর্থাৎ তারও যে অস্তিত্ব থাকে না। তাই তুমিই তো সব কিছুর মূল!॥ ১১৬॥

জিহ্বায়াং বৈখরীবাক্ দতি কিমপি বসেন্ মধ্যমা স্ফোটমধ্যা
পশ্যন্তীঞ্চ ত্রয়ী কিং ব্যবসিতমনুদৃগ্-জ্যোতিষা স্বেন পশ্যেঃ।
সৌষুম্নং মধ্যগা ত্বং প্রবিশসি কুহরং ন্যস্যসি ন্যস্তবর্ণান্
মাত্রা বাহ্যপ্যর্দ্ধমাত্রাহপ্যমিতপররবা নীরবা ত্বং পরাবাক্॥ ১১৭॥

বাকের দিক দিয়া যখন আবার দেখি তখন ভাবি তোমার ব্যক্ত রসনায় কি 'বৈখরী' বাক্‌কে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছ? ['বৈখরী' বাক্ হইল স্থূল স্ফুটবাণী বা ব্যক্ত শব্দ এবং মনে রাখিতে হইবে যে বাচিক, উপাংশু ও মানস এই ত্রিবিধ ব্যবহারই বৈখরীর অন্তর্গত।] আর তোমার ঈষৎ বিস্ফুট দশনপংক্তিতে কি সেই 'মধ্যমা' বাক্‌কে প্রকাশ করিয়াছ, যে 'মধ্যমা' হইতেছে বাহিরের এই স্ফুটবাণী হইতে নিত্য স্ফোটে উত্তরণের সেতুস্বরূপ? অপৌরুষেয় ত্রয়ী বা বেদরূপা যে 'পশ্যন্তী' বাক্—তাকে কি সাক্ষাদনুভবগোচর মন্ত্র এবং মন্ত্রার্থরূপে তুমি নিজের অকৃপণ অকুণ্ঠিত নয়নজ্যোতিতে প্রকাশ করিয়া ধরিয়াছ? বৈখরীরূপ ত্যাগ করিয়া মাতৃকারূপিণী তুমি প্রথম নিগূঢ়া মধ্যমাতনু ধারণ করিয়া সুষুম্নাকুহরে প্রবিষ্ট হইলে এবং তার ফলে চক্রে চক্রে, কমলে কমলে, প্রত্যেকটির বর্ণময় যন্ত্র বিন্যাস করিয়া গেলে! শেষে মহাকুণ্ডলিনীস্বরূপা তুমি, পরতত্ত্ব-সামরস্যের পথে অগ্রসর হইয়া কি নিজের মুদিত যন্ত্র-তন্ত্রকে প্রস্ফুটিত বা 'পশ্যৎ' বা প্রকটরূপে প্রকাশ করিয়া তোল? তুমি কোন্ অভিসারে চলিয়াছ?

পরতত্ত্বে বা পরাবাকের দিকেই চলিয়াছ নাকি? কিন্তু তুমি কি স্বরূপতঃ পরাৎপরা বা পরারও পারে নও? তবু কেন মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা, পূর্ণমাত্রা এবং অমাত্রা এই চতুষ্পাদে, হে পরাবাক্! তুমি নিয়তই চলিয়াছ? এমনি করিয়া কি তুমি নাদ-বিন্দু, জ্যোতি ও আনন্দের বিচ্ছিন্ন ধারাকে বা মুক্তবেণীকে সেই পরম সঙ্গমে গিয়া যুক্ত কর? তাই কি তোমার এ অফুরন্ত অভিসার॥ ১১৭॥

বাগ্‌দোহং ধোক্ষি তারং কলয়সি চ মনূন্ হুংফড়াদীন্ সমার্থান্
বৌষট্ স্বাহা স্বধৈবং কতিবিধমনবস্তে চ বিদ্যাঃ কিয়ত্যঃ।
লক্ষ্মীর্বাণী চ কালী নিজনিজমনুগাঃ স্ব-স্ব-বর্ণৈঃ প্রকাশ্যাঃ
স্বৈঃ স্বৈস্তন্ত্রৈঃ প্রকার্য্যা স্ত্বমসি নিজকৃতৌ কালিকাদ্যা স্বতন্ত্রা॥ ১১৮॥

তুমি আবার নিখিল বাকের সার বাগ্‌দোহরূপ ওঁঙ্কারকে কিসের দ্বারা সেই শান্তাতীত পরাবাক্ হইতে দোহন করিলে? তুমি তো শুধু শান্তা নও, শান্তাতীতা—তাই নিজেকে "তুষ্ণী—নাদ" এই যুগ্মরূপে ব্যক্ত করিয়া বিন্দুকে মন্থন করিলে এবং সেই মন্থন হইতেই অকারাদি সমস্ত কলাবর্ণের উদ্ভব হইয়াছে। তুষ্ণী হইলেন শিব, এবং শিবা হইলেন নাদ—এই উভয়ের মেলনেই বিন্দুর মন্থন ঘটিয়া থাকে, যেমন উত্তর ও অধর অরণির ঘর্ষণে অগ্নির মন্থন হয়। তারপর, তুমি 'হুং' 'ফট্' ইত্যাদি কত না উৎসমুখে শক্তির ফোয়ারা খুলিয়া দাও! মন্ত্রময়ী মহাবিদ্যাই বা কত অসংখ্য তোমার! মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী—সকলকেই তুমি নিজ নিজ মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র দিয়াছ এবং তাহার মধ্য দিয়াই প্রকাশিত ও আকারিত হইয়াছে দৈবীসম্পৎ। তুমি স্বয়ং কোন্ মন্ত্রে, কোন্ যন্ত্রে-তন্ত্রে ধরা দিবে বলিয়া আর সর্বেশ্বরেশ্বরী, স্বচ্ছন্দা, স্বতন্ত্রা রহিলে না? অর্থাৎ তুমি স্বতন্ত্রা হইয়াও আমাদের কাছে ধরা দিবে বলিয়াই নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়া যেন মন্ত্রের পরতন্ত্র হইয়া, মন্ত্রাধীনা হইয়া প্রকাশ পাইলে! তাই অকিঞ্চন প্রপন্নেরও তুমি মা! করুণাবরুণালয়া!॥ ১১৮॥

নো মন্ত্রৈর্মন্ত্রিতং তদ্ যতিততিপটুনী যন্ত্রতন্ত্রে ন তত্র
নো ধ্যানং তচ্চ ধত্তে চিদপি ন তু চিতির্নির্বিকল্পে সমাধৌ।

শান্তাতীতশ্চ শান্তে হর হরদয়িতে চণ্ডমুণ্ডৌ পশূ যৌ
রুন্ধানৌ স্তঃ প্রপিৎসুং স্বয়মিহ বৃণুয়া যদ্ বরেণ্যং শরণ্যে॥ ১১৯॥

কিন্তু তুমি মন্ত্রাধীনা হইলেও, তুমি তো সর্বমন্ত্রেশ্বরী, তবে বল দেখি কোন্ মন্ত্রশূলে নিজেকে "মন্ত্রিত" করিলে? আবার তুমি তো সকলের মূল যন্ত্রী, নিজ মহিমায় ধ্রুবা স্থিতা, তবে তোমার চালক আবার কোন্ সংযমনকুশল যন্ত্রচক্র? নিত্যস্বতন্ত্রা তোমাকে কোন্ তায়নে নিপুণ তন্ত্র পাশাঙ্কুশ ততি-গতি-পদ্ধতি শিখাইবে? তুমি যে নিত্য মুক্তকেশী, তাই বল দেখি কোন্ ধেয়ানেই বা সত্য তোমার "ধারণা" লাভ হয়? কঠশ্রুতিতে যে চরম আহুতিটির কথা বলা আছে—"তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি"—সেই নির্বিকল্প "শান্ত আত্মনি" হবনটি হইলে আবার তুমি বলো "আমি শান্তাতীতা"! সুতরাং তোমার পার বা অবধি কোথায়? তাহা হইলে উপায়ই বা কি? তুমি প্রপন্নার্ত্তিহরা, কিন্তু তবু যে তোমার ওই রাঙা চরণে শরণ নিবে বলিয়া মনের গহনে রাঙা জবা খুঁজিয়া মরে, তার পথে আবার তুমি কণ্টকের শূলরূপ, চণ্ডমুণ্ড মহাপশু রাখিয়া দিয়াছ! তাই সে পশুবৎ মমতাবর্তে, মোহগর্তে ফিরিয়া মরে! সুতরাং হে শরণাগতপালিকে! তুমি নিজে না বরণ করিলে কে তোমার হইতে পারে? এ অকূলে, হে কুলেশ্বরি! তুমি ছাড়া কে কূল দেখাইবে?॥ ১১৯॥

হৃদ্যাদ্যা যা শয়ানা দহরসুবিপুলা মান-মেয়াদ্দবিষ্ঠা
হৃল্লেখা যা তনিষ্ঠা জগদুদয়লয়াবৃত্তি-হেতুর্বরিষ্ঠা।
হৃদ্দেশে যা দ্রঢ়িষ্ঠৈরয়তি চ ভুবনং ত্বাশ্রিতায় ম্রদিষ্ঠা
যোগক্ষেমায় সাহম্বা শময়তু হৃদয়ং গ্রন্থিভেদে পটিষ্ঠা॥ ১২০॥

আদ্যাস্বরূপিণী তুমি নিখিল সৃষ্টির হৃদয়ে (হৃদি) বা কেন্দ্রস্থলে শয়ানা রহিয়াছ। কারণের যে কেন্দ্র (nucleus) কে আশ্রয় করিয়া অণু বা বিরাট সকল কিছু স্পন্দিত হইতেছে, সেটি হইল তার "হৃদি"। এই হৃদি আবার স্থূল বা পীন নয়, শ্রুতি বলেন সেটি 'দহর' অর্থাৎ সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু সেই দহরের মধ্যেও অবস্থিতা তুমি, সুতরাং তদপেক্ষাও সূক্ষ্মা, অণোরণীয়সী। এরূপ সূক্ষ্মতমা হইয়াও আবার তুমি

মহানের অপেক্ষাও মহীয়সী এবং সেইজন্যই যাহা কিছু মান বা মেয়, সব কিছু হইতেই তুমি থাকো দূরতমা! অর্থাৎ কোনো মান-মেয়ই তোমার নাগাল পায় না, এমনই তোমার বিপুলতা, অসীমতা। যা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তার "হৃল্লেখা"—অর্থাৎ মূল শক্তিচিত্র লেখা (Basic Pattern or Power-Picture) রূপে তুমি হইয়াছ তনুতমা। আবার এই বিশাল জগতের উদয়, লয়, ও আবৃত্তির হেতুভূতারূপে তুমি উরুতমা, বিশালতমা! এতটুকু বীজকণিকার মধ্যেও, এমন কি ধূলিকণার মধ্যেও তোমার অত্যাশ্চর্য রূপ প্রকট করিয়া ধরিয়াছ। সেখানেও দেখি একটি স্থির কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য শক্তিপুঞ্জের অবিরাম নর্তন। এই মূল চিত্রটি জগতের প্রত্যেক বস্তুতে—নগণ্য জড় ধূলিকণা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবকণা পর্যন্ত সর্বত্র উদাহৃত হইতেছে। আবার সর্বভূতের হৃদ্দেশেতে তুমি যেন বজ্রহস্তারূপে সকলের চালয়িত্রী হইয়া বসিয়া আছ, শুধু নীরবে বসিয়া নাই। তাই সকলেই তোমার ভয়ে নিজ নিজ কক্ষে, স্ব স্ব ধারায় আবর্তন করিতেছে, কোথাও চ্যুতি ঘটিতেছে না ("ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" ইত্যাদি)। এই 'সেতু' বা নিয়মের বিধারয়িত্রীরূপে তুমি বজ্রের মতই দৃঢ়তমা। কিন্তু তোমাতে যে প্রপন্ন, তোমার যে একান্ত আশ্রিত, তার প্রতি আবার তুমি মৃদুতমা, কুসুমকোমলা! তাই আজ প্রার্থনা: তোমাতেই একান্ত প্রপত্তিযোগের জন্য, তোমাতেই একমাত্র মতিক্ষেমের জন্য এ হৃদয়কে শান্ত করিয়া নাও—কারণ তুমিই যে সমস্ত গ্রন্থিভেদে পটুতমা!॥ ১২০॥

সা কালী নিরুপাধিশুদ্ধনিলয়ে শান্তে নরীনৃত্যতে
কৈবল্যং বিদধাতি নির্গুণতয়া দ্বৈতং মরীমৃজ্যতে।
ব্রহ্মাস্মীত্যববোধ-খড়্গমহসা মিথ্যাজনীন্ প্রত্যয়া-
নান্তে ব্রহ্মণি সর্ব্বমেব দধতি চেচ্ছিদ্যমানা স্বয়ম্॥ ১২১॥

সেই মা কালী নিরুপাধি শুদ্ধ শান্ত চৈতন্য-নিলয়ে, শবশিবহৃদি নিয়তই নাচিতেছেন, যেন কোন্ ভাবমদিরায় বিভোরা! তবে কি তিনি শুধু গুণময়ী, গুণক্ষোভাত্মিকা? না, তা তো নয়। তিনিই যে আবার নিখিল দ্বৈতের লেশ পর্যন্ত বারংবার 'মার্জ্জন' করিয়া সাক্ষাৎ কৈবল্য দান করিয়া থাকেন। তাই কালী

কৈবল্যদায়িনী। সুতরাং তিনি একাধারে গুণাত্মিকা, গুণাশ্রয়া আবার গুণাতীতা। তিনি আবার "ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মস্বরূপই" এই অববোধ বা জ্ঞানরূপ খড়্গের ছটায় মিথ্যা অহমিকা হইতে বিজৃম্ভিত সমস্ত ভবপ্রত্যয়কে নিরসন করেন। "তত্ত্বমসি"—"তুমিই তাই"—তাই আবার অসিচ্ছিন্ন মুণ্ডাস্থিনিচয়কে তো তিনি দূরে ফেলেন না। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—"সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ"—এইভাবে ব্রহ্মময়ী তিনি সকলই আপনাতে ধারণ করেন মুণ্ডমালারূপে। তাই যাহা 'ছিন্ন' তাহাও 'সমাহৃত' হয় তাঁরই অখণ্ড সত্তায়। এইভাবে তিনি একাধারে নির্বিশেষ একতত্ত্বা, আবার অশেষ তত্ত্বের সাক্ষাৎ জননী বা প্রসূতি; তিনি সর্বতত্ত্বময়ী, ভুক্তি-মুক্তি, জ্ঞান-প্রেম সব কিছুর পূর্ণ খনি!।।১২১।।

অথ

জপসূত্রোপক্রমণী

পিহিতাদ্যন্তধারাসু বগাহ্যাধীরমূঢ়য়োঃ।
ভ্রান্তশ্রান্তে তু দৃষ্টী স্তঃ ক্রান্তশান্তে কবৌ মনৌ ॥ ১ ॥

জপের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে জ্ঞানের আবরণ ক্রমশঃ উন্মোচন করতঃ দৃষ্টির ক্রমিক প্রসারণ। আমাদের সাধারণ দৃষ্টি একান্তই বিভ্রান্ত। আমরা জানি না কোথা হইতে আমরা আসিলাম, কোথায় বা চলিয়াছি। তাই সাধারণ জীব যে ধারায় পতিত, তাহার আদি এবং অন্ত উভয়ই অপিহিত বা আবৃত। এই ধারায় পতিত অধীর ও মূঢ় ব্যক্তির দৃষ্টি হয় দ্বিবিধ—ভ্রান্ত ও শ্রান্ত। অধীর যে, তার মধ্যে রজোগুণের আধিক্য হেতু দৃষ্টি হয় ভ্রান্ত এবং মূঢ় যে, তার ভিতর তমোগুণের প্রাবল্য হেতু দৃষ্টি হয় শ্রান্ত। কোনো তত্ত্ববিচার বা ধ্যানে বুদ্ধিকে বা দৃষ্টিকে নিযুক্ত করিতে গেলেই আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে হয় বুদ্ধি তত্ত্বালোক লাভ না করিয়া বৃথা ঘুরিয়া মরে ও ভ্রান্ত জ্ঞানেই আবদ্ধ হইয়া থাকে, কিম্বা তত্ত্বানুসরণে একান্ত অক্ষম হইয়া কিছুদূর যাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয় ও শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। বুদ্ধির মধ্যে এই দ্বিবিধ মল, রজঃ ও তমঃ বা বিক্ষেপ ও আবরণ, থাকার দরুণই সাধারণ দৃষ্টির এই দ্বিবিধ রূপ দেখা দেয় অর্থাৎ ভ্রান্ত ও শ্রান্ত। এই মল যেমন যেমন দূর হইয়া বুদ্ধি ক্রমশঃ নির্মল হইয়া উঠে, তেমন তেমন দৃষ্টিরও প্রসারণ ঘটিতে থাকে। মলিন দৃষ্টির যেমন দ্বিবিধ রূপ, তেমনি এই নির্মল, বিশদ, স্বচ্ছ দৃষ্টিরও আবার দুই রূপ—ক্রান্ত ও শান্ত। ক্রান্ত দৃষ্টি হইল কবির এবং শান্ত দৃষ্টি হইল মুনির। নির্মল দৃষ্টির এই দ্বৈবিধ্যের হেতু হইতেছে সত্ত্বের পরিণামের তারতম্য। সত্ত্বগুণের উদ্রেকেই এই নির্মলতা দেখা দিয়া থাকে, কিন্তু সত্ত্বের মধ্যে আবার দুটি জিনিষ আছে—একটি আনন্দ, অপর প্রকাশ এবং ইহাদের মধ্যে কখনো একটির প্রাধান্য এবং অপরটির গৌণতা দেখা যায়। যখন

আনন্দের প্রাধান্য, তখন উল্লাস, বিলাস ও ব্যাপকতার অন্ত থাকে না। বুদ্ধি তখন অনন্ত বিহার লাভ করে, বিশ্বহ্লাদিনী হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন আনন্দ অপেক্ষা সত্ত্বের প্রকাশ অংশের আধিক্য হয়, তখন এই ব্যাপকতার গৌণতায় দেখা দেয় এক অসীম প্রশান্ত অতলস্পর্শী গভীরতা। তাই একটি দৃষ্টি আনন্দ আকাশকল্প, ও অপর দৃষ্টিটি জ্যোতির্ঘন মহোদধিকল্প; একটি হইতেছে ব্যাপিনী, অপরটি অবগাহিনী। কবির দৃষ্টির কাছে প্রকৃতি বা বিশ্ব, তার সমস্ত রহস্য উন্মুক্ত করিয়া দেয় সত্য, কিন্তু আত্মার রহস্য তখনও অজ্ঞাত থাকে। আত্ম-রহস্য ভেদ করার জন্য তাই চাই মুনির মর্মী শান্ত দৃষ্টি। তখনই জ্ঞানের বা দৃষ্টির যথার্থ পূর্ণতা ঘটিয়া থাকে। ব্যাপকতা ও সূক্ষ্মতা—এই উভয় সীমাতেই যখন বুদ্ধির অকুণ্ঠ গতি হয়, তখনই সে চরিতার্থতা লাভ করে।

সুতরাং এই ভ্রান্ত, শ্রান্ত এবং ক্রান্ত ও শান্ত—এই চতুর্বিধ দৃষ্টির মধ্যে আমরা এক হিসাবে মানব-জ্ঞানের সব কয়টি স্তরেরই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইলাম ॥ ১ ॥

স্থূলং ব্যাপ্নোতি যৎ সূক্ষ্মমন্বয়ব্যতিরেকতঃ।
অনাবরকসংযোগবিয়োগাদ্যপেক্ষকম্ ॥ ২ ॥

পূর্বে আমরা যে দৃষ্টির ক্রমিক স্বচ্ছতা ও বিশুদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম, তাহা বস্তুতঃ দৃষ্টির ক্রমিক সূক্ষ্মাবগাহিতারই পরিচয়। সাধারণ দৃষ্টি স্থূলে বা surface-এই আবদ্ধ থাকে, স্থূলের পিছনে আর সে যাইতে পারে না। কিন্তু যোগজ দৃষ্টি বা কবি ও মুনির দৃষ্টি স্থূলের পিছনে তাহার যে সূক্ষ্ম রূপ, তাহাকে পর্যন্ত সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকে. এই সূক্ষ্মরূপটি সর্বদাই স্থূলরূপকে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়াই বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে প্রশ্ন জাগিতে পারেঃ এই সূক্ষ্ম যে আছে তার প্রমাণ কি? ইহার প্রমাণ হইল অন্বয় ও ব্যতিরেক, অর্থাৎ যেখানেই স্থূল সেখানেই সূক্ষ্ম এবং যেখানে সূক্ষ্ম নাই, সেখানে স্থূলও নাই। তবুও শঙ্কা উঠিতে পারে যে তবে আমরা সর্বদা সূক্ষ্মকে দেখি না কেন? ইহার উত্তর হইতেছে যে অনাবরকের সংযোগ-বিয়োগাদিকে অপেক্ষা করিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ কিছু আবরক থাকার দরুণই সূক্ষ্মের অনুপলব্ধি হয়, আবার অনাবরক অর্থাৎ আবরণের অপাবরকের সংযোগে তার উপলব্ধি হয়। Positiveটি হয় Negation-এর nega-

tion-এ। সংযোগ-বিয়োগাদিতে যে আদিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহার দ্বারা সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতিকে ধরিতে হইবে। ধর, জপ আরম্ভ করিলাম, কিন্তু তার শক্তি সূক্ষ্মরূপে থাকিলেও স্থূলে সক্রিয় হইতেছে না, অর্থাৎ জপের কার্যকারিতা কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না। সে ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সময় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছিলে তার আবরণ ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় পৌঁছিবার পর জপের ফল প্রত্যক্ষ হয়। এই বিশিষ্ট সংখ্যার পরিপূরণে জপের ফলবত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গায়ত্রী প্রভৃতি সর্ববিধ মন্ত্রের পুরশ্চরণাদির বিধান শাস্ত্রে করা হইয়াছে ॥ ২॥

আরম্ভকাদিসূত্রেণ সহিতং ছন্দসা চ যৎ।
জ্ঞানং সূক্ষ্মস্য তজ্জ্ঞানং স্থূলস্য জ্ঞানমুত্তমম্॥৩॥

অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, সূক্ষ্মের পরিজ্ঞান না হইলে স্থূলকেও যথাযথ জানা হয় না। স্থূলের কোন্ জ্ঞানটিকে উত্তম জ্ঞান বলিব? না, আরম্ভকাদি অর্থাৎ পূর্বোক্ত অনাবরক সংযোগ বিয়োগাদিরূপ যে সূত্র অর্থাৎ Principles এবং ছন্দঃ অর্থাৎ যে বিধান অনুসারে পূর্বোক্ত সূত্রগুলি কার্য করে, the law according to which the principle operates—এই উভয়ের সহিত অর্থাৎ সূত্র ও ছন্দঃ সমেত যে সূক্ষ্মের জ্ঞান—তাহাই স্থূলের সম্যক জ্ঞান। তখনই স্থূলকে ঠিক ঠিক জানা হয় ॥৩॥

[দ্রষ্টব্য—জপাদি কর্মে দেশ, কাল, বস্তু এবং ছন্দঃ যেমন আবরক বা প্রতিবন্ধক (negative moment) রূপে থাকিতে পারে, সেইরূপ এ সকল আবার অনাবরক (positive moment or factor) রূপেও থাকিতে পারে। পরে দেখান হইয়াছে যে এই অনাবরণ কর্মটি সমারম্ভ থেকে সুরু হইয়া সমাপন পর্যন্ত সাতটি ধাপে শেষ হইয়া থাকে। প্রতি ধাপেই মান্দ্য (slowing down) ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং মান্দ্য পরিহার পূর্বক লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছিতে গেলে কতকগুলি সূত্র এবং তাদের প্রয়োগের ছন্দঃ অনুবর্তন করিতে হয়। করিতে পারিলে, জপের মন্ত্র এবং তার ভাবনা তাদের স্থূল সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে মুক্তি পাইয়া উদার, বিপুল, সূক্ষ্ম শক্তিরূপে প্রকটিত হইবে। তখন মন্ত্রাদির যথার্থ শাপমুক্তি এবং পাশমুক্তি।]

যতোঽনাবরকং সূত্রং ছন্দশ্চ সূক্ষ্মসংবৃতম্।
সূক্ষ্মজ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানং সূক্ষ্মং জ্ঞেয়ং পরং হ্যতঃ॥ ৪॥

পূর্বোক্ত অনাবরক সূত্র ও ছন্দঃ—এ দুটিই কিন্তু সূক্ষ্মের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। তাই এ দুটিও সূক্ষ্মেরই অন্তর্গত। আর সূক্ষ্ম জ্ঞানকেই "বিজ্ঞান" বা বিশেষ জ্ঞান বলা হয়। স্থূল জ্ঞান সামান্য জ্ঞান মাত্র। অতএব, সূক্ষ্মকেই বিশেষভাবে জানিতে হইবে, তাহাই পরম জ্ঞেয়, কারণ সূক্ষ্মকে জানিলেই স্থূলকেও জানা হইয়া যায়, যেহেতু স্থূলটি সূক্ষ্মেরই অন্তর্ভুক্ত॥ ৪॥

[আশঙ্কা হইতে পারে—বীজের আবরণ ভঙ্গের পক্ষে মৃত্তিকার রস, তাপ, আলোক, বায়ু তো স্থূলই; সত্য, কিন্তু স্থূলরূপেই সে সকল আবরণ ভঙ্গের হেতু হয় না; বীজনিষ্ঠ যে সূক্ষ্ম স্পন্দনাদি তার সমজাতীয় ও সমরূপ হইয়াই তারা আবরণভঙ্গের হেতু হইয়া থাকে। স্থূল কোনো ক্রিয়াদ্বারা "মন্ত্রচৈতন্য" ঘটাইতে গেলেও সে ক্রিয়াজন্য স্পন্দনাদি (১) সূক্ষ্মতার এক নির্দিষ্ট মাত্রায় যাইবে, এবং (২) ছন্দোগত অনুরূপতা পাইবে। নচেৎ, শতচেষ্টাতেও মন্ত্রচৈতন্যের "উপযোগ"টি ঘটিবে না। গুরুশক্তি এবং জাপকের শ্রদ্ধার আধারেই এই উপযোগটি সহজসাধ্য হয়।]

ক্রমানুরোধিনী ধারা পর্য্যবস্যতি যত্র চ।
সর্বেষ্বন্বয়াদ্ ব্রহ্ম তচ্চ ব্যোমেতি পশ্যত॥ ৫॥

এই যে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, তাহা হইতে সূক্ষ্মতর ইত্যাদিরূপ ক্রমানুরোধী ধারা—এর একটা পর্যবসানের ভূমি আছে, যেখানে সূক্ষ্মতা তার চরম কাষ্ঠায় গিয়া পৌঁছায়। এই সূক্ষ্মতার ধারা কেবলই চলিয়াছে, ইহার কোথাও পরিসমাপ্তি বা অবসান নাই—এরূপ বলিলে অনবস্থারূপ দোষ আসিয়া পড়ে। তা ছাড়া, শ্রুতি ও অনুভব দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হয় যে কোথাও একটা পরিসমাপ্তি বা কাষ্ঠা আছে। এই কাষ্ঠা যিনি, সর্বের মধ্যে অন্বিত তিনি ব্রহ্মই, তবে তখন তাঁর বিশেষ সংজ্ঞা—ব্যোম বা আকাশ। (ব্যোম=বি+ওম্। নিখিল বিশেষের উদয়, স্থিতি এবং অবসানের "ভূমি" যেটি,

সেটি নাদ, ওঁ। আবার, ব্যাপ্তি এবং অবধি এই উভয়রূপে "কাশ", প্রকাশ যে আধারে সেটি আকাশ।) অতএব, এই পরোবরীয়ান্ প্রবাহের চরম সীমা হিসাবে, তাঁকে ব্যোমরূপে দেখ॥ ৫॥

[জপের যেটি বাক্, কিনা মন্ত্র, সেটিকেও ক্ষিতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যোম পর্যন্ত এই পঞ্চতত্ত্বরূপে ভাবনা করিবে। যেমন, জপের স্থূল বা প্রকটভাবে উদয়ের স্থান=ক্ষিতি; লয়ের স্থান=অপ্; তৈজস শক্তিরূপে আবির্ভাবের স্থান=তেজঃ; সর্বব্যাপী বিপুল স্পন্দরূপে বিততির স্থান=বায়ু; এবং এই সকলের চরম আধার বা আশ্রয় স্থান=ব্যোম।]

আশ্চর্য্যং যচ্ শুক্লকৃষ্ণ-পক্ষাভ্যাং চ প্রকাশয়ন্।
আবরয়ন্নিদং সর্ব্বং ব্যোমাত্মা তার্ক্ষ্য ঋধ্যতি॥ ৬॥

এখন তার্ক্ষ্য বা গরুড়কে এই ব্যোমাত্মারূপে কল্পনা কর। এঁর আশ্চর্যময় রূপ— দুটি পক্ষ ইনি বিস্তার করিয়াছেন—একটি শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণ। একের দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন, অপরটি দ্বারা আবরণ করিতেছেন। স্থূলভাবে দেখিতে গেলে একটি দিবা, অপরটি রাত্রি। এই দুই পক্ষপুটেই তিনি সমগ্র বিশ্বকে আবৃত করিয়া রহিয়াছেন—("শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে")॥ ৬॥

[ক্ষিতিরূপে জপ বাক্ ও কায়ের প্রতিকূলবৃত্তি আবরণ ও অনুকূলবৃত্তি প্রকাশ করে। সেখানে গরুড়ের কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ দুটি ইহাই। অপরূপে জপ প্রাণ এবং অব্যক্তমন (Subconscious) এর ভূমিতে অনুরূপ কর্মটি করে। তেজোরূপে বাক্, কায়, প্রাণ এবং মন এ চারিটিরই অনুকূল উত্তেজক হয়। বায়ুরূপে এ সবের মূলে যে মহতত্ত্ব (বুদ্ধি) সেটিকেও সহায় করে। আর, ব্যোমরূপে মূলপ্রকৃতিকেও। প্রতিটি স্তরেই দুটি (+,—) পক্ষ রহিয়াছে। এ হেন গরুড়ই শ্রীভগবানের বাহন। বেদে এবং গরুড় পুরাণাদিতে ইনি প্রখ্যাত।]

বীজাদিষু হি সর্বেষু প্রকাশ্যতাঽপ্রকাশ্যতে।
দ্বে শক্তী যুগপৎ স্তশ্চ প্রকাশিকানিরোধিকে।
যদনুপাতবৈষম্যাদ্ ব্যক্তাব্যক্তনিরূপ্যতা॥ ৭॥

কিভাবে ইহা বিশ্বের সর্বত্র অনুস্যূত, তাহা দেখ। বীজাদি সকল পদার্থের ভিতর দুটা জিনিষ—প্রকাশ্যতা ও অপ্রকাশ্যতা—এই উভয়ই রহিয়াছে। বীজটি প্রকাশোন্মুখ হইয়াও কিছু অপ্রকাশ রহিয়া যাইতেছে। আবার অপ্রকাশ থাকিয়াও যেন নিজেকে কিছুটা প্রকাশ করিতেছে। এক হিসাবে, জগতের কোনো বস্তুই সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত বা প্রকাশিতও নয়। এক বিচিত্র আলো-আঁধারের সমাবেশে যেন তাহারা আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, মূলে দুটি শক্তি কাজ করিতেছে—একটি নিরোধিকা বা Veiling, অপর মোচিকা বা Revealing factor, এই আবরণ ও উন্মোচনরূপ শক্তিদ্বয়ই বিশ্বের সর্বত্র ক্রিয়াশীল। এদের যে অনুপাত বৈষম্য বা ratioর তারতম্য, তদনুসারেই সব বস্তুর ব্যক্তাব্যক্ততা নিরূপিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, এই ratioর উপরই নির্ভর করে, বস্তুটি কতটা ব্যক্ত বা কতটা অব্যক্ত। যেখানে মোচিকা শক্তির অনুপাত অধিক সেখানে বস্তুটিকে বলি ব্যক্ত, আবার নিরোধিকা শক্তির অনুপাতাধিক্য ঘটিলে বলি অব্যক্ত॥ ৭॥

[পরে জপশক্তির বা ছন্দের যে সাতটি মান্দ্যের স্থান কথিত হইয়াছে, সে সব স্থানে আসলে হয় কি? মোচিকা এবং রোধিকার যে অনুপাত, সেটি ভগ্নাংশ হয়, অর্থাৎ লব (মোচিকা) চাইতে হর (রোধিকা) বড় হয়। ফলে, জপের শক্তির হ্রাস। যেমন দেহে metabolism-এ অনুপাত বৈরূপ্যে দেহের ক্ষয়। দেহে যেমন জপেও তেমনি ওই অনুপাতটি অনুকূলে পাইতে হয়। তার এক প্রকৃষ্ট সাধন এই—উক্ত মান্দ্যস্থানটিকে (retarding factor) সমিধ্‌রূপে ভাবনা করতঃ অন্তর্জ্যোতিতে সেটিকে ইন্ধন কর। ফলে সেটি অগ্নীন্ধন হইবে। "ওঁ যদিদং ময়িদং সমারম্ভক-দৌর্ব্বল্যরূপং মান্দ্যং তদহং হব্যং কল্পয়ামি, তচ্চ (শ্রীশ্রী ইষ্টদেবতা) পরমজ্যোতিষি জুহোমি ওঁ ভূঃ স্বাহা॥" এইভাবে এক একটি মান্দ্যস্থান এক এক ব্যাহৃতি যোগে পরমজ্যোতিতে হবন কর।]

ভূয়স্ত্বং যন্মোচিকায়াস্তদাবিরিতি দৃশ্যতে।
ভূয়স্ত্বে রোধিকায়া বা তদেব গৃহ্যতে ক্ষপা॥ ৮॥

মোচিকা শক্তির যখন ভূয়স্ত্ব বা আধিক্য তখন বলি আবিঃ (যেমন, আবিস্করোতি, আবির্ভবতি প্রভৃতি শব্দে আবিঃর এই অর্থটা ধরা পড়ে), তেমনি যখন

দেখি রোধিকা বা আবরিকা শক্তির ভূয়স্ত্ব বা আধিক্য, তখন বলি ক্ষপা বা রাত্রি। দিনে যেমন প্রকাশের আধিক্যে সব দেখা যায়, আবার রাত্রে যেন সব ঢাকিয়া যায়—এও সেইরূপ॥ ৮॥

(মোচিকা=মো=ম; রোধিকা=রো=র। ম=সোম, র=অগ্নি। সৃষ্টির সর্বত্র, সুতরাং জপাদিতেও ম : র এই অনুপাতটি চলিতেছে। সোম মাত্রার প্রাধান্যে পোষণ এবং স্নিগ্ধতা; অগ্নিমাত্রার প্রাধান্যে দহন, শোষণ ও রুক্ষতা। এ সমস্ত পরে আলোচিত হইয়াছে। জপকর্মে 'র' এর আধিক্যে শরীরে ও মনে সন্তাপের (জ্বালা, অনিদ্রা, মনের রুক্ষতা ইত্যাদি) লক্ষিত হইতে পারে। তখন সোমের উদ্রেক যাতে হয় তাই করণীয়।)

আবিষ্ট্বং কিঞ্চ রাত্রিত্বং দৃগ্‌ভঙ্গীনয়কল্পিতে।
যা নিশা সর্বভূতানামিত্যাদৌ স্মর্য্যতে যথা॥ ৯॥

এই যে আবিঃ ও রাত্রিরূপা—এ দুটি নির্ভর করিতেছে দৃষ্টিভঙ্গীর উপর; অর্থাৎ কোন্ standpoint হইতে দেখা হইতেছে, তারই উপর ক্ষপাত্ব বা আবিষ্ট্ব অর্থাৎ রাত্রিত্ব বা দিবাত্ব নির্ভর করিতেছে। এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে যাহাকে ক্ষপা বা রাত্রি মনে হয়, অপর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিলে তাহাই আবার আবিঃরূপেও প্রতীত হইতে পারে। তাই গীতাও "যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন যে সর্বভূতের অর্থাৎ সাধারণ প্রাকৃত জনের নিকট যাহা রাত্রি, সংযমী বা যোগী সেখানেও জাগ্রত অর্থাৎ সেটি তাঁর কাছে দিবাতুল্য, আবার সর্বভূতের নিকট যাহা জাগরণের ভূমি বা দিবাস্বরূপ, তাহাই যোগী বা মুনির উন্মীলিত দৃষ্টির কাছে নিশা বা ক্ষপাসদৃশ। সুতরাং দেখা যাইতেছে দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্য অনুসারেই একই বস্তু ক্ষপা বা আবিঃ—এই দুই রূপ ধারণ করিতেছে॥ ৯॥ [জপের বেলা এই দিবা এবং ক্ষপা তত্ত্ব বিশেষভাবে চিন্তনীয়। যেমন, বৈখরী (স্থূল) জপের বিচ্ছেদে যখন মধ্যমা (সূক্ষ্ম) জপ চলে, তখন পূর্বালোচিত "প্রথম পুরুষের" কাছে সেটি "রাত্রি", কিন্তু "মধ্যম পুরুষের" দৃষ্টিতে সেটি "দিবা"। এইরূপ জপাক্ষর ধ্যান এবং জপার্থ ধ্যান সম্বন্ধে একের দিবা অন্যের রাত্রি হইতে পারে। Kinetic ও Potential ভেদ তুলনা কর।]

আবীরাত্রীতি যুগ্মত্বং সর্বমন্বেতি বৃত্তিমৎ।
একেন বাধিতা চান্যেকেনান্যা সাধিতা ভবেৎ॥ ১০॥

সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছে এই আবিঃ ও রাত্রিরূপ যুগ্মত্ব। যদিও দেখা যাইতেছে, ইহারা পরস্পর বিরোধী এবং একের দ্বারা অপরটি বাধিতই হয়, কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে একের দ্বারা অপরটি সাধিতও হয়। যেমন বিরুদ্ধ শক্তির নিরোধের দ্বারা একটি বস্তুর স্বরূপ-আবির্ভাবের সহায়তা হয়। এখানে নিরোধ আবির্ভাবকে সাধনই করিতেছে, বাধন করে নাই। সুতরাং আবিঃ ও রাত্রি কেবল পরস্পর বাধকই নয়, সাধকও বটে॥ ১০॥

(যেমন, জপাক্ষর অথবা জপার্থ ধ্যান করিব, এবং তজ্জনিত জ্যোতীরসে অভিষিঞ্চিত হইব। একতানা বা একাগ্রবৃত্তি না হইলে এই "আবিঃ" রূপটি সম্ভবপর হয় না, কিন্তু তন্নিমিত্ত কি চাই? এর বিরোধী যে তিনটি বৃত্তি (ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ়) তাদের "রাত্রি" কিনা, নিরোধ চাই। শুধু তাই নয়, "নিরোধ" নামে যে পঞ্চমীবৃত্তি, সেটিরও নিরোধ চাই। নচেৎ, জপে ধ্যান অথবা সম্প্রজ্ঞাত ভূমি হইবে না।)

অরিস্পন্দনিবৃত্ত্যা যন্মিত্রস্পন্দপ্রবর্ত্তনম্।
যুগ্মং তত্রানুসন্ধেয়ং জপাদিসর্ব্ব কর্ম্মসু।
ক্ষয়ায়াচ্ছাদ্য রোদ্ধব্যং ছন্দশ্ছাদয়তি শ্রিয়ম্॥ ১১॥

এখন দেখ, জপাদি সকল কর্মের মধ্যে কিভাবে ঐ যুগ্মকে অনুসন্ধান করিবে। জপকর্ম অরিস্পন্দকে বা প্রতিকূল স্পন্দকে (vibrationsকে) নিরোধ করেন রাত্রিরূপে, এবং আবিঃরূপে মিত্রস্পন্দকে প্রকাশ করেন। জপজনিত যে ছন্দঃ তার কাজ হইল আচ্ছাদন ('ছাদনাৎ ছন্দঃ')। এই আচ্ছাদনও দুই ভাবে—এক, ক্ষয়ের জন্য আচ্ছাদন করেন, রোদ্ধব্য যেগুলি অর্থাৎ প্রতিকূল বৃত্তিগুলিকে অভিভূত করেন সমূলে বিনাশের জন্য, এবং শ্রীকে অর্থাৎ অভ্যুদয়ের হেতুভূত যে দৈবীসম্পৎ তাকে রক্ষা করেন বর্মের মত। তাই ছন্দের আচ্ছাদন-ক্রিয়াতেও এই যুগ্মভাব॥ ১১॥

(ছন্দোমাত্রের 'গোপ্তব্য' এবং 'রোদ্ধব্য'—দুইটি দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

অনুনাসিক তালব্য 'ছম্' দ্বারা প্রথমটি এবং হসন্ত দন্ত্য 'দস্' দ্বারা দ্বিতীয়টি সূচিত হয়। প্লুত উচ্চারণ করিয়া প্রাণপ্রযত্ন ব্যাপারটি লক্ষ্য কর। এই দ্বিবিধ মূলবৃত্তি আশ্রয়েই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। জপে কায়িকাদি বিঘ্ন রোধ করতঃ জপক্রিয়াফলটিকে রক্ষা করিতে হয়—"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং।"

যাবদ্ধি বর্দ্ধতে জ্যোতিরুত্তরভূমিকান্বয়াৎ।
তাবদ্ বর্দ্ধেত তামিস্রমধস্তান্ নক্তমাশ্রিতম্॥ ১২॥

এই দুটি যুগ্ম-তত্ত্বের আর একটি বিচিত্র সম্বন্ধ আছে: একের বৃদ্ধিতে আবার অপরের বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে। উত্তরোত্তর ভূমিতে যেমন জ্যোতিঃ বা আবিঃ বর্দ্ধিত হয়, অপর প্রান্তে, অপর pole-এ তেমনি তামিস্র বা অন্ধকার সেই পরিমাণে গাঢ় হইতে থাকে। জপাদি সাধনের ফলে চেতনার বা প্রকাশের দীপ্তি যেমন ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে থাকে, তেমনি অবচেতনে যে সব আসুর প্রতিকূল সংস্কারগুলি সুপ্ত আছে, সেগুলিও যেন প্রবল শক্তিতে মাথা চাড়া দিয়া উঠে ও তাদের অন্ধকারের রাজ্যকে আরো কায়েম করিতে চায় দ্বিগুণ পরাক্রমে। তাই জ্যোতিঃ ও রাত্রির এমন অবিনা-সম্বন্ধ যে একের বৃদ্ধি হইলে অপরটিও আর একদিকে বৃদ্ধি পাইয়া চলে!॥ ১২॥

(আলোক এবং তামিস্র দুয়ে মিশিয়া এক "ধুম্রলোক" সৃষ্টি করিয়াছে। জীবের চলতি ব্যবহার তাতেই। 'আলো' ও 'আঁধারকে' গোড়ায় তফাৎ করিয়া লইতে হইবে। দুটোকেই আলাদা আলাদা 'খাঁটি' ভাবেই পাওয়া আবশ্যক। Elimination-এর আগে isolation.)

নক্তন্দিবমিতি দ্বন্দ্বে যঃ সন্ধিঃ সন্দধীত তম্।
ঋতে ন সন্ধি-সন্ধানাদহোরাত্রসমন্বয়ঃ॥ ১৩॥

এই নক্তন্দিবার বা রাত্রিদিনের যেটি সন্ধি—যেটি অভিব্যক্তও বলা যায় না, অনভিব্যক্তও বলা যায় না—সেই Zero Point বা Neutral Pointকে অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে। কারণ, এই সন্ধি-সন্ধান ব্যতিরেকে অহোরাত্রের সমন্বয় হইবে না, এই দিবা রাত্রির দ্বন্দ্ব মিটিবে না। এই জন্যই মহাত্মা-মহাজনদের

চিরন্তন উপদেশ—“সন্ধিকো পাকড়ো”। আমাদের দৈনন্দিন সন্ধ্যা-বন্দনাদির জন্যও যে সব সন্ধি-কালগুলি প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে নির্দিষ্ট আছে, তাও সন্ধিকে ধরাইবার জন্যই। ঐ ঐ সময়ে প্রকৃতিও স্বভাবতঃ সন্ধিগামিনী হইয়া থাকেন, সেইজন্য সাধক সেই সময়ে সজ্ঞানে প্রকৃতির এই আনুকুল্যকে কাজে লাগাইতে পারিলে সহজেই সন্ধিলাভে ও দ্বন্দ্ব অতিক্রমে সমর্থ হয়। যেমন রাত্রির নিবিড় সুপ্তি-জড়িমা কাটিয়াছে কিন্তু এখনো দিনের কোলাহল-মুখরতা সুরু হয় নাই—এই সন্ধিতে প্রাতঃসন্ধ্যার বিধান। সেইরূপ সারা দিনের কর্মকোলাহল শান্ত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনো সুপ্তির ঘোর তমিস্রায় ডুবিয়া যায় নাই—এই অবস্থায় সায়ং সন্ধ্যার বিধান। এই প্রসঙ্গে মায়ের সন্ধি-পূজার রহস্যও চিন্তনীয় ॥ ১৩ ॥

সমেরুসন্ধিসেতুং যস্ত্রিসূত্রীং ভজতি ক্রিয়াম্।
বৈপ্রতীপ্যেন তস্য স্যান্ নক্তং দিবা হ্যহঃ ক্ষপা ॥ ১৪ ॥

মেরু, সন্ধি ও সেতু—এই ত্রিসূত্রীকে অনুসরণ করিয়া যিনি ভজন করেন বা ক্রিয়াতৎপর হন, তাঁর কাছে বিপরীতক্রমে দিন রাত্রি হয় এবং রাত্রি দিবা হয়, অর্থাৎ তিনি গীতোক্ত সংযমী মুনির অবস্থা প্রাপ্ত হন। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পক্ষে এই তিনটির জ্ঞান বিশেষভাবে অপেক্ষিত। এই তিনটিকে যথার্থভাবে জানিলে তবেই জপাদিকর্মে ঠিক ঠিক অগ্রসর হওয়া যায়, নতুবা সবই বৃথা হইয়া পড়ে। হয়তো জপ করিয়া চলিয়াছি, কিন্তু জানি না মেরু অর্থাৎ “Crisis Phase”, বা Climax কোনটি, যেখানে আসিয়া থামিতে হইবে, কারণ এই ঠিক মত না থামিয়া যদি আরো অগ্রসর হইয়া চলি ও মেরুকে উল্লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে পূর্বের সবখানি চেষ্টাই বৃথা হইয়া পড়িবে, এমন কি অবাঞ্ছিত পরিণামও ঘটিতে পারে। তেমনি সন্ধি বা neutral point কখন আসিয়াছিল, তাকে জানিলাম না, সুতরাং তাকে চাপিয়া ধরা, avail করাও হইল না এবং বৃথা দ্বন্দ্বের আবর্তনেই ঘুরিয়া মরিলাম। ফাঁক পাইয়াও গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইতে পারিলাম না। আবার কখনো ক্রিয়ার প্রান্তভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ ঘটিতেছে না। কোথায় যেন একটা ফাঁক, একটা Chasm রহিয়া যাইতেছে। এপার এবং ওপারের মধ্যে একটা ব্যবধান রহিয়া যাইতেছে। গুরু হয়তো কৃপা করিয়া এই ব্যবধানটি দূর করিয়া দেন মধ্যে একটি সেতু স্থাপন করিয়া।

ঠিক যে সময়টিতে তিনি সেতুটি পাতিয়া দেন, সেই সময়ই সেতুর সুযোগ লইয়া পার হইয়া যাইতে হইবে। তাই সেতুকে না জানিলে এই উত্তরণ সম্ভবই হইবে না। কখন সেতুটি পড়িল সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অতএব, মেরু, সন্ধি ও সেতু—এই তিনটি জপাদিসাধনের সব চেয়ে বড় সঙ্কেত ও এগুলির তত্ত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। আমরা এখন মেরু, সন্ধি ও সেতু সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব ॥ ১৪ ॥

(ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি যে মাটি, জল ইত্যাদি নয় তা দেখিয়াছি। পাঁচটি মূল উপাদান তত্ত্ব। সৃষ্টির সব কিছুতেই পাঁচটির মিশ্রণ—'পঞ্চীকরণ'—হইয়াছে। সুতরাং জপকর্মেও বটে। এখন ধর, ক্ষিতিতত্ত্বে প্রধানভাবে জপ হইতেছে। ফলে কর্মে স্থূলতা, জড়তা, গুরুতার আধিক্য। আয়াসবহুল, অল্পেই ক্লান্তি আনে— mechanical, laborious, fatiguing. এ প্রকার জপকে অপ, তেজঃ প্রভৃতি উপরকার স্তরে উঠিতে গেলে ওই মেরু, সন্ধি, সেতু—এই তিনটি ধরিতেই হয়।)

সুমেরুশ্চ কুমেরুশ্চ মধ্যমেরুরিতি ত্রিধা।
যো জানীতে স জানীতে কলাকাষ্ঠান্বয়ং ধ্রুবম্ ॥ ১৫ ॥

কলার বৃদ্ধির যে ধারা ও কাষ্ঠা তার অন্বয়টি বা যোগটি তিনিই জানেন, যিনি সুমেরু, কুমেরু ও মধ্যমেরু এই ত্রিবিধ ভাবকে জানেন। সব ক্রিয়ার একটা Critical phase আছে, তাহাকেই মেরু বলা যায়। যেমন সূর্য উদয় হইল এবং উঠিতে উঠিতে apexএ, শিখরদেশে মধ্যগগনে পৌঁছিল—এইখানে সে বৃদ্ধির একটা কাষ্ঠায়, Climaxএ গিয়া পৌঁছিল কারণ, ইহার পরেই সে অস্তের দিকে ঢলিয়া পড়িবে। চন্দ্রের বেলাতেও অনুরূপ। শুক্লপক্ষে কলায় কলায় বৃদ্ধি হইতে হইতে পূর্ণিমায় গিয়া Climaxএ পৌঁছে, আবার তারপর হইতেই ক্ষয়ের দিকে গতি সুরু হয়। এইরূপ বিশ্বের সর্বত্র—যেমন মানুষের যৌবনে পূর্ণতা ও তারপরেই ক্ষয়োন্মুখতা ইত্যাদি। এই মেরু বা "Crisis Phase"কে তিনভাবে দেখা যাইতে পারে—Positive, Negative ও Neutral. প্রথমটিকে সুমেরু, দ্বিতীয়টিকে কুমেরু ও তৃতীয়টিকে মধ্যমেরু বলা যাইতে পারে ॥ ১৬ ॥

(কেবল কি এই পৃথিবী—সৃষ্টিতে স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ—অণু কি

মহান—সমস্তই "মেরুত্রয় আকৃতিটি" পাইয়াছে। একটা দোলক দুলিতেছে, হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে, অণুর ভিতরে ইলেকট্রন পাক খাইতেছে, জাগরণের পর নিদ্রা, নিদ্রার পর জাগরণ আসিতেছে—ইত্যাদি সকল দৃষ্টান্তেই ওই মেরুত্রয়রূপটি অনুসন্ধান কর। ধর কোন একদিকে ক্রিয়াটি হইতেছে। সে দিকে একটা 'সীমা' পর্যন্ত ক্রিয়াটি আপনরূপটি বজায় রাখিয়া চলিবে। সীমার পারে হয় থামিয়া যাইবে নয়তো রূপটিই বদলাইবে। তারপর, ক্রিয়াটি অনুলোমে না করিয়া বিলোমে কর। Actionটি reverse করিয়া দাও। সেদিকেও একটা 'মেরু'। আবার, দুইদিকে দুই সীমানার মাঝামাঝি একটা ভূমি আছে—যেমন ম্যাগনেটের বেলা—যেখানে আসিলে ক্রিয়াটিকে অনুলোম—positive বলাও যায় না, বিলোম negative বলাও যায় না।)

প্রাতরাদিবিভেদৈশ্চ বিসর্গব্যঞ্জনস্বরৈঃ।
সন্ধিসূত্রং ত্রিধা বিদ্যুরহোরাত্রবিদো বুধাঃ ॥ ১৬ ॥

তেমনি সন্ধিরও ত্রিবিধ ভেদ—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন। একটি উদয়ের বা উত্থানের সন্ধি, দ্বিতীয় উন্মেষের সন্ধি, তৃতীয় অস্তের বা অবসানের সন্ধি। শক্তিলেখ বা Dynamic Curve মাত্রেরই এটি মৌলিক রূপ। বেদে 'উষস্' এই রহস্যনামটিতে এই মৌলিকরূপ নির্দিষ্ট। যথা—উ = শক্তির উত্থান; ষ=মূর্দ্ধা বা Apex; স্=দন্ত্যবৃত্তিদ্বারা অবসান। তন্মধ্যে প্রাতে উত্থানের প্রাধান্যবশতঃ 'উ' কারের দীর্ঘত্ব। এই উদয়, উন্মেষ ও অস্তকে আবার যথাক্রমে স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গরূপেও দেখা যাইতে পারে। যাঁরা অহোরাত্রবিদ্ জ্ঞানী তাঁরা সন্ধির এই ত্রিবিধ ভাবকেই জানিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রো যন্ত্রঞ্চ তন্ত্রঞ্চ শ্রদ্ধাচ্ছন্দঃ স্বরাশ্চ বৈ।
এতৎ ত্রিতয়বিজ্ঞানাৎ সেতুজ্ঞানং সমাসতঃ ॥ ১৭ ॥

সেতুর জ্ঞানকেও সংক্ষেপতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়—মন্ত্রজ্ঞান, যন্ত্রজ্ঞান ও তন্ত্রজ্ঞান। একটা plane বা স্তর থেকে আর একটা planeএ যাওয়ার সংযোজক হইতেছে এই সেতু। তাই ইহা Nexus Principle বা Link অথবা Lines of Approach. মন্ত্রসেতু হিসাবে প্রণবে 'উ'কারকে দেখা যাইতে পারে; ইহা 'অ'কার ও

'ম'কারের মাঝখানে থাকিয়া উভয়কে সংযুক্ত করিয়া থাকে। তেমনি প্রণবের মাত্রার দিক দিয়া অর্দ্ধমাত্রা হইতেছে এই সেতু। আবার বাকের দিক হইতে দেখিলে সেতু হইতেছে মধ্যমা। সেইরূপ যন্ত্রসেতু হিসাবে, ভূতশুদ্ধি, আপোমার্জন বা আচমনাদিকে দেখা যাইতে পারে। তন্ত্রসেতুর উদাহরণ হিসাবে ন্যাসকে লওয়া যাইতে পারে। মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র—এ তিনকে যেমন, তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা, ছন্দঃ এবং স্বরকে সেতুরূপে আশ্রয় করিবে। শ্রদ্ধারূপ সেতুদ্বারা দুটি জিনিষের মধ্যে একভাবতা ঘটে, ছন্দঃ সেতু ঘটায় একতানতা, আর স্বরসেতু দ্বারা হয় একবৃত্তিতা। নেমিগত যে বিরূপতা সেটি দূর কর স্বরদ্বারা; অরগত বৈষম্য দূর কর ছন্দোদ্বারা; আর, নাভি বা কেন্দ্রগত পার্থক্য দূর কর শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারা। 'হরি' এই তিনটি বর্ণ যথাক্রমে নাভি, অর এবং নেমিকে মূলে অন্বিত ও প্রতিষ্ঠিত করে। মোটকথা মন্ত্রই বলি, যন্ত্রই বলি বা তন্ত্রই বলি, সবের মধ্যেই এই সেতুটিকে বিশেষভাবে চেনা ও চিনিয়া তাকে যথাযথ কাজে লাগান প্রয়োজন। তবেই মন্ত্রাদি ঠিক ঠিক সফল হইবে॥ ১৭॥

ব্যষ্টিসমষ্টিসর্গেঽপি স্থূলে সূক্ষ্মে চ কারণে।
গৃহ্যেতে ক্রমসম্বন্ধৌ নিয়ন্তব্য-নিয়ামকৌ॥ ১৮॥

পূর্বে যেমন সূক্ষ্মতার একটা ক্রমানুরোধিনী ধারার কথা বলা হইয়াছে, তেমনি বিশ্বের মধ্যে আর একটি ধারার পরিচয় পাই, সেটি হইতেছে নিয়ন্তব্য ও নিয়ামকের ধারা। বিশ্বের সর্ব বস্তুর মধ্যে দেখিতে পাই একটা নিয়ন্ত্রণের Principle রহিয়াছে এবং সেই নিয়ন্ত্রণটি যৎকর্তৃক হইতেছে তাকে বলি নিয়ামক এবং যেটি নিয়ন্ত্রিত বা চালিত হইতেছে তাকে বলি নিয়ন্তব্য। ইহারও একটা ক্রম-পরম্পরা বা ধারা রহিয়াছে এবং সেই হিসাবে, এক সম্পর্ক বা relationএ যেটি নিয়ামক, তাহা আবার অন্য relationএ নিয়ন্তব্য হইয়া পড়ে। ধর, এই দেহযন্ত্রটি। এটির নিয়ামক দেখিতেছি প্রাণ। প্রাণই এ যন্ত্রটিকে চালু রাখিয়াছে ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তারপর, অনুসন্ধান করিলে দেখি এই প্রাণের আবার চালক বা নিয়ামক রহিয়াছে সূক্ষ্মতর সামগ্রী, মন ইত্যাদি। এইরূপে আরো অনুসন্ধান চালাইলে আমরা নিয়ামক ও নিয়ন্তব্যের একটা সোপানপরম্পরা যেন দেখিতে পাই। শুধু স্থূলে নয়, সূক্ষ্মে এবং কারণে পর্যন্ত এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি—উভয় সৃষ্টির মধ্যেই আমরা এই ধারার পরিচয় পাই॥ ১৮॥

(জপাদিকর্মে মন্ত্র-যন্ত্রাদির এই নিয়ম্য-নিয়ামক সম্বন্ধটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হয়। একটা মন্ত্র জপিতেছি—জানা আবশ্যক কিসের কিসের অথবা কার কার দ্বারা ক্রিয়াটি 'প্রভাবিত' হইতেছে। বাইরের গবেষণায় যেমনধারা 'field picture')।

প্রত্যেকঞ্চ ত্রিধা জ্ঞেয়ং ক্রিয়াকৃতী চ দৈবতম্।
আদ্যে স্যুস্ত্রীণি রূপাণি তন্ত্রযন্ত্রে মনুঃ পরে॥ ১৯॥

বিশ্বে নিয়ম্য-নিয়ামকের যে ক্রমোন্নত শ্রেণী (ক, খ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, খ, গ এর দ্বারা, ইত্যাদি), তাতে লক্ষ্য করিলে দেখা যাবে যে নিয়ম্য এবং নিয়ামকের প্রত্যেকটি তিনটি রূপ বা আকারে বর্তমান। প্রথমটির, কিনা নিয়ম্যের তিনটি রূপকে সাধারণভাবে বলা যায়—ক্রিয়া (Action), আকৃতি (Pattern) এবং দৈবত (শক্তি বা Power)। যেমন, চোখে দেখিতেছি। দেখা একটি ক্রিয়া। যে বিশেষ ইন্দ্রিয় (organ) দ্বারা যে এক "নিরূপিত" ভাবে দেখিতেছি, সেটা হইল 'আকৃতি'। আর, যে প্রাণ এবং চৈতন্য-শক্তি দ্বারা (চক্ষুরভিমানী 'আদিত্য') দেখিতেছি তাকে বলে 'দৈবত'। আবার ধর, রেডিয়াম-জাতীয় একটা বস্তুর অণু স্বভাবতঃ ফাটিয়া যাইতেছে। এখানে, বিদীর্ণ হওয়াটি ক্রিয়া; অণুর আভ্যন্তরীণ অথবা পারিপার্শ্বিক যে বিন্যাসভঙ্গীর ফলে এটি ঘটিতেছে, সেটি হইল আকৃতি, এবং যে নিরূপিত আকারে (আল্‌ফা, বিটা, গামা রশ্মি ত্রিধারায় বিকিরণপূর্বক) এটি ঘটিতেছে, তাহাও আকৃতি; আর, যে 'রহস্য' শক্তি দ্বারা (বাহ্য তাপ চাপাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই) এটি ঘটিতেছে, তার নাম 'দৈবত'। এইরূপ সর্বত্র। নিয়ম্যের যেমন তিনটি রূপ, নিয়ামকেরও তেমনি তিনটি—তন্ত্র, যন্ত্র এবং মনু (মন্ত্র)। অর্থাৎ ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে যাহা তাকে বলে তন্ত্র; আকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত যেটি করে তাকে বলে যন্ত্র। আর, দৈবত অথবা অন্তর্নিহিত শক্তিকে যেটি নিয়ন্ত্রিত করে তাকে বলে মনু বা মন্ত্র। যে কোন ক্ষেত্রে সমর্থ-ভাবে কোন কিছু করিতে গেলে, ওই তিনটি চাই—কর্মের Correct technique ও formula; ফরমূলাটির সফল প্রয়োগের নিমিত্ত আবশ্যক ক্ষেত্রে (field), করণ (instrument অথবা means) এবং পদ্ধতির (way or method) একটা নির্দিষ্ট, উপযুক্ত আকৃতি (plan and pattern); এবং শেষকালে চাই উপযুক্তভাবে ও পরিমাণে শক্তি-সমূহীকরণ (organisation of forces)। রেডিও-আইসোটোপ কোন কোন বস্তু

(যথা 'হালকা' ইউরেনিয়াম) সম্পর্কে এ তিনটির যোগাযোগ (মারণ ব্যাপারে) করিতে পারিয়া আমরা বানাইয়াছি আণবিক বোমা। জপাদি-সাধনে সমর্থভূমি লাভের নিমিত্ত এই নিয়ম্য-নিয়ামক সূত্রটি বিশেষভাবে ধ্যানযোগ্য। জপ চলিতেছে, কোনও এক 'আকারে' চলিতেছে, কোনও এক 'শক্তিতে' চলিতেছে। কিন্তু সামর্থ্য ও সাফল্যের নিমিত্ত এ তিনকেই 'আপন খোস খেয়ালে' ছাড়িয়া দিলে তো চলে না। এ তিনেরি নিয়ামকগুলিকে অবশ্যই অনুকূলে পাইতে হয় ।। ১৯ ।।

অন্তর্য্যামী তু সর্ব্বেষাং নিয়ামকোত্তমঃ শ্রুতঃ।
যোঽণ্যতে প্রাণ্যতে তস্য প্রাণস্য প্রাণ ঈশিতা ।। ২০ ।।

নিয়ম্য-নিয়ামকের শাখা-প্রশাখার তো গহন ও অসীম বিস্তার! সেইজন্য মূলে যেখান হইতে সর্ব নিয়ন্ত্রণটি হইতেছে, সেখানে আশ্রয় লওয়াই সর্বোত্তম কল্প। "এষোঽন্তর্য্যামী পুরুষঃ" এই বলিয়া শ্রুতি সেই মূলনিয়ন্তার, নিয়ামকোত্তমের নির্দেশ করিয়াছেন। জপাদি সাধনের লক্ষ্য মুখ্যভাবে হইবে তাঁতেই কিসে প্রপন্ন হওয়া যায়। বিশ্বে অণু কি বিরাট যাহা কিছু শুধুই স্পন্দিত হইতেছে (অণ্যতে), অথবা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান-ইচ্ছা-কৃতি সহকারে স্পন্দিত হইতেছে (প্রাণ্যতে), সে সবেরই প্রভু, প্রাণেরও প্রাণ হইতেছেন তিনি ।। ২০ ।।

নিয়ন্তব্যং পৃথক্জ্ঞেয়ং নান্তর্ভাবান্নিয়ামকে।
ন হি যন্ত্র্যাদিবিজ্ঞানাদ্ যন্ত্রাদিজ্ঞানমুহ্যতে।
সূক্ষ্মব্যোমন্যভেদাদ্ধি প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতম্ ।। ২১ ।।

তথাপি যেটি নিয়ন্তব্য (যথা, জপাদির করণ, যন্ত্র) সেটিকে পৃথগভাবে ভাল করিয়া জানিতে হয়, এবং জানিয়াই মূল নিয়ামকের অনুসন্ধানে যত্ন করিতে হয়। যেমন যন্ত্রীকে সাধারণভাবে জানিলেই তার যন্ত্রটিকেও জানা হয় না, তাকে আলাদা করিয়া জানিতে হয়, সেইরূপ। অবশ্য পূর্ণ সমাপত্তি জন্য যে বিজ্ঞান তাতে এই ভেদটি আর রহিবে না; তখন মূলের জ্ঞানেই কাণ্ড-শাখা-প্রশাখাদি সব কিছুরই জ্ঞান। তখন যন্ত্র-যন্ত্রীর জ্ঞান দুইটি বৃত্তের মত পরস্পরের বাহিরে থাকে না। কিন্তু তৎপূর্বে, একের মধ্যে অপরের অন্তর্ভাব কৈ দেখিতেছি না—এভাবেই অনুসন্ধানটি করিতে হয়। বিশ্ব-

চক্রের নেমি এবং অরসমূহ সমস্তই এক প্রাণেই (প্রাণব্রহ্মে) সমর্পিত, এবং সে প্রাণ সব কিছুর নাভিনিষ্ঠ হইয়াও আবার ব্যোমসূক্ষ্মরূপে সর্বব্যাপী। অর্থাৎ, একাধারে সেটি বিন্দু এবং নাদ। এই প্রাণে না পৌঁছান পর্যন্ত যন্ত্রাদিকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণাদিপূর্বক জানার প্রয়োজন আছে॥ ২১॥

তত্র প্রভাবসম্ভাবৌ বিপ্রতিপূর্ব্বকৌ চ যৌ।
ভাবাবন্বাদিভাবশ্চ পঞ্চৈত আসতে ক্রমাঃ॥ ২২॥

নিয়ামকের নিয়মন কর্মটি পঞ্চক্রমে হইয়া থাকে। (এগুলি সবিশেষ পরে আলোচিত হইবে);—প্রভাব, সম্ভাব, বিভাব, প্রতিভাব, অনুভাব॥ ২২॥

ভাস্করে চাপ্যয়স্কান্তে সুবর্ণে মকরধ্বজে।
দধ্যাদিষু চ বীজাণৌ বীণাযন্ত্র উদাহৃতাঃ॥ ২৩॥

প্রভাবরূপ ক্রমটি ভাস্করের উদাহরণে বুঝিতে চেষ্টা কর। অনুভাব যে কি বস্তু তা বুঝিতে চেষ্টা কর লৌহসন্নিধানে অয়স্কান্তের (চুম্বকের) দৃষ্টান্তে। বিভাবকে বুঝ মকরধ্বজ প্রস্তুতিতে সুবর্ণের ক্রিয়ায় (catalytic action)। সম্ভাব, বীজাণু দ্বারা দুগ্ধাদি হইতে দধ্যাদির উৎপত্তি দ্বারা; এবং প্রতিভাব বীণাযন্ত্রে অনুরণনাদি সৃষ্টি দ্বারা। Direct Action, Influence Action, Catalytic Action, Subtle Transformation Action, Resonance Action—এই পাঁচটি॥ ২৩॥

ব্যক্ত, ব্যক্তাব্যক্ত, অব্যক্ত, রূপান্তরে অভিব্যক্ত, প্রতিস্পন্দে উপচিত ব্যক্ত।

অধিভূতং তথাধ্যাত্ম মধিযজ্ঞঞ্চ দৈবতম্।
অধ্যক্ষরং নিয়ন্তৃণাং পঞ্চাধিকৃত্য কর্ত্তৃতাঃ॥ ২৩ক॥

ক্রিয়ার দিক থেকে যেমন পাঁচটি, "অধিকৃত্য কর্ত্তৃতা", কিনা, সেই সেই অধিকারে (Frame of Reference, Situation) কর্তৃতা হিসাবেও নিয়ন্তাকে পঞ্চভাবে দেখিবে। (এগুলি বিশেষভাবে পরে আলোচিত):—অধিভূত, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ, অধিদেব, অধ্যক্ষর। অর্থাৎ, ক্রিয়ার আধার এবং সেই সেই আধারে কর্তৃত্ব (Agency)—এই পাঁচ প্রকারের॥ ২৩ক॥

প্রণবে পঞ্চমাত্রা যা স্তাভিঃ সর্ব্বং নিয়ম্যতে।
পরত্বাচ্চ নিয়ন্তৃণা মোঙ্কারঃ প্রাণ এব চ॥ ২৪॥

জপাদিকর্মের মূলে যে প্রণব, তার পাঁচটি মাত্রাতেই সর্ব দ্রব্য, সর্বগুণ এবং সর্ব কর্ম-নিয়মিত হইতেছে জান। ব্রহ্মবাচক ওঁঙ্কার সকল নিয়ন্তার শ্রেষ্ঠ বিধায় ওঁঙ্কারই পূর্বোক্ত প্রাণ। সুতরাং ওঁঙ্কার (অথবা ঈশ্বরের নাম) আশ্রয় পূর্বক জপ করিলে সর্বনিয়ামক যিনি প্রাণের প্রাণ তাঁকেই আশ্রয় করা হইল॥ ২৪॥

জপাদাবনুসন্ধেয়া পঞ্চৈতে চ নিয়ামকাঃ।
মন্ত্রো গুরুশ্চ দেবশ্চ ক্ষেত্রী ছন্দঃ সমূহতঃ।
গুরোর্যানুগ্রহাখ্যা চা-গ্রহাখ্যা ক্ষেত্রিণো ধৃতিঃ॥ ২৫॥

বিশেষভাবে অর্থাৎ, ঈশ্বরনামের সহযোগিভাবে বিশিষ্ট মন্ত্র, গুরু, দেবতা, জীব (ভগবানের পরাপ্রকৃতি) এবং ছন্দঃ (মধুচ্ছন্দঃ ইত্যাদি)—এই পাঁচটিকে কর্মের নিয়ামকরূপে জানিবে। এ পাঁচটির মধ্যে গুরুশক্তির আশ্রয়ে ভগবানের অনুগ্রহাখ্যা ধারা, এবং জীবপ্রকৃতির ভিতর হইতে আগ্রহাখ্যাধারা (Inspiration and Aspiration) নিঃসৃত হইয়া পরস্পরে মিলিত হয়। এই মিলনের দ্বারাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধটি "ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগ" হইয়া থাকে॥ ২৫॥

সঙ্কুচৎ প্রসরদ্রূপা তার্ত্তীয়া বিশ্ববৃত্তিতা।
নাদবিন্দূ যতঃ কাষ্ঠেহর্দিধিষতি কলা চ যা॥ ২৬॥

পূর্বে আমরা বিশ্বের মধ্যে দুটি বৃত্তির বা principle-এর পরিচয় পাইয়াছি, একটি হইল সূক্ষ্মতার তারতম্যের ধারা এবং তার চরম সীমায় ব্যোমরূপ ব্রহ্ম, এবং দ্বিতীয়, নিয়ন্তব্য-নিয়ামকের ধারা এবং তার চরম সীমায় অন্তর্যামিরূপ ব্রহ্ম। এখন, বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় আর একটি বৃত্তির কথা বলা হইতেছে—এটি হইল সঙ্কোচ-প্রসারের ধারা। বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুটি একদিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া চলিয়াছে, আবার অপর দিকে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। এ দুইয়ের সীমা কোথায়? ধর, একটা

মৃৎপিণ্ড; তাকে চূর্ণ করিলাম, তাহা কতগুলি ধূলিরেণুতে পরিণত হইল। সেই রেণুগুলিকেও ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে যদি চলি তবে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এক সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক শক্তিতে, electronএ গিয়া পৌঁছিব। কিন্তু সেখানেই কি সঙ্কোচের শেষ? তেমনি বিস্তারের বেলাতেও অনুরূপ প্রশ্ন আসে। এ দুই ধারার কাষ্ঠা কোথায়? সঙ্কোচ হইতে হইতে বা প্রসার হইতে হইতে কি কোনো ভূমিতে বিশ্রাম আছে? যদি না থাকে, তাহা হইলে তো অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। তাছাড়া, শ্রুতি এবং অনুভূতি এ দুই-ই একটা বিশ্রান্তি স্থানের নির্দেশ দেয়। সুতরাং নিশ্চয়ই এ দুই ধারার বিশ্রান্তিস্থল কোথাও আছে। সে দুইটি হইতেছে—নাদ ও বিন্দু। বিস্তার বা Expansion-এর পরম ভূমি হইল নাদ এবং সঙ্কোচ বা Condensation-এর চরম ভূমি হইল বিন্দু। আর এই দুইয়ের মাঝে রহিয়াছে কলা—যাহা কেবলি ঋদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছে অর্থাৎ infinite, সকল সীমা ছাড়াইয়া বৃদ্ধি লাভ করিতে চাহিতেছে। নাদ-বিন্দুর মধ্যে একটি রহস্য সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধটির দরুণই কলার অভিব্যক্তি। রহস্যটি হইতেছে এই যে যেই কোনো বস্তু তার সঙ্কোচের চরম সীমায় বা বিন্দুতে গিয়া পৌঁছিতে চাহিতেছে, অমনি তাহার মধ্যে আবার বিপরীতক্রমে বিস্তার লাভ করিবার একটা প্রচেষ্টাও জাগিতেছে; পক্ষান্তরে, প্রসারের বা বিস্তারের চরম কাষ্ঠায় গিয়া পৌঁছানর প্রয়াসের মধ্যে আবার সংকুচিত হইবার প্রেরণাও জাগিতেছে। নাদাভিমুখী প্রয়াসকে যদি 'ধনী' (=ধ) বলা যায়, এবং বিন্দু-অভিমুখীকে যদি বলা যায় 'ঋণী' (=ঋ), তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সৃষ্টির সঙ্কোচ-বিকাশ সকল ব্যাপারেই এ দুয়ের (ধ, ঋ) সহ-অনুপাতটি রহিয়াছে। অর্থাৎ, এদের অনুপাতমানের উপরেই নির্ভর করে কে কতটা সঙ্কুচিত অথবা বিস্তারিত। যেটি সঙ্কোচপ্রাপ্ত সেটি বিস্তারের পানে অগ্রসর হইলে ক্রিয়াটির যে রূপ হয় তাকে বলে 'ঋধ্' (ঋধ্যতি)। আর, ওই ক্রিয়াটির বৈপরীত্য (reversing) হইলে হয়—'ধৃ' (ধৃত হইতেছে) gathered and massed হইতেছে, ইহা বুঝায়। ঋধ্ থেকে ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি; আর ধৃ থেকে ধর্ম (conservation)। একটা যোগ, অপরটি ক্ষেম। যেমন জপে প্রথমটির প্রাধান্য হইলে জপস্পন্দ আপনাকে বিস্তারিত করিয়া এক মহান বিশ্বজপরূপে নিজেকে প্রত্যক্ষ করে; আর দ্বিতীয়টির প্রাধান্যে আপনাকে সূক্ষ্মতর মহাশক্তি-কেন্দ্র (Nucleus) রূপে আবিষ্কার করে। একটা Expansive Aspect, অপরটা Intensive, Concentrated Aspect, জড়ের ক্ষেত্রে যেমন Cosmic Rays এবং Nuclear Energy।

একবার সঙ্কোচের চরম সীমায় পৌঁছিয়া অথবা তার দিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করা, আবার প্রসারের চরম সীমায় পৌঁছিয়া অথবা তার পানে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হওয়া—এই "দোলাটি" বিশ্বে অবিরাম চলিয়াছে। চন্দ্রকলা যেমন প্রসারের চরম সীমায় পূর্ণিমায় পৌঁছিলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার সঙ্কোচের দিকে গতি আরম্ভ হইয়া যায়, এবং সেই গতি বাড়িতে বাড়িতে সঙ্কোচের চরম সীমায় অমাবস্যায় পৌঁছিলে আবার বিপরীত বিস্তারমুখী গতি সুরু হয়। সুতরাং নাদ ও বিন্দুর এই যে মিথুনীভাবেচ্ছা এবং পরস্পরাভিমুখী গতি—তাহার দ্বারাই কলার অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। নাদবিন্দুর পরস্পর মিথুনীভাবেচ্ছার অভিব্যক্তি কামকলা। পরমরাহস্যিক "যোনিলিঙ্গ" ইহার প্রতীক। এতৎপ্রসঙ্গে 'ক্লীঁ' এই বীজটি পরে পরীক্ষিত হইবে। কলা হইতেছে একটা aspect বা partial element, সুতরাং পূর্ণ নয়। তাই সে কেবলি ঋধ্যমান, বৃদ্ধি পাইতে চায়, পূর্ণ হইতে চায়। কলার এই বৃদ্ধি কিন্তু আবার দুইদিকে—সঙ্কোচের দিকে ও প্রসারের দিকে, negative ও positive ভাবে, minus ও plus রূপে। কৃষ্ণপক্ষে সঙ্কোচমুখে কলার বৃদ্ধি, শুক্লপক্ষে বিকাশমুখে কলার বৃদ্ধি॥ ২৬॥

কলানামৃধ্যমানানাং মাত্রা যা জ্যায়সী স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রেতি জানীয়াদ্ সানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥ ২৭॥

কলার যে ঋধ্যমান বা ক্রমবর্দ্ধমান ধারা, তার যেখানে পরাকাষ্ঠা সেইটিকে (বিশেষভাবে) অর্দ্ধমাত্রা বলিয়া জানিবে; তাহা বিশেষরূপে অনুচ্চার্য্যা। অর্থাৎ পূর্বোক্ত সঙ্কোচ ও প্রসার এই উভয় দিকেই বা উভয়মুখেই কলার বৃদ্ধির যেখানে পরিসমাপ্তি—সেই অবধি অর্দ্ধমাত্রার ব্যাপ্তি। সুতরাং উভয় ধারার সমষ্টিতে—অর্দ্ধমাত্রা। একদিকে শেষ Culminating point, শেষ সীমা—নাদ, অপরদিকে বিন্দু—এই দুইটি সীমাকে দুটি পক্ষের মত বিস্তারিত করিয়া অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা॥ ২৭॥

পূর্বে পৃঃ ১২৮এ অর্দ্ধমাত্রা বিষয়ে কিছু বলা হইয়াছে; ভবিষ্যতে আরও আলোচনা হইবে। ধর, মাত্রা=ঊর্ম্মিমান (Wave length)। এর ঋধ্যমানতা (progression) দুইদিকে হয়—এক বিস্তারের দিকে (যেমন, long waves), আর এক

সঙ্কোচের দিকে (যথা, short waves)। দুই দিকে দুই কাষ্ঠা (Limit) আছে। মধ্যে কতিপয় গ্রামে এই ধারাটি হয় ব্যক্তকলা, "উচ্চার্য্যা" বিশেষতঃ। দুইদিকে দুই কাষ্ঠাসহ ধারার এই সমগ্র আকৃতি ও আবেগকে বলে অর্দ্ধমাত্রা।)

অগ্নীষোমীয়তাং চাস্যাঃ সাক্ষাত্ত্বেন প্রকল্পয়।
অগ্নীষোমাবুভৌ মুখ্যে প্রাণে স্ত আজ্যকল্পিতৌ ॥ ২৮ ॥

অর্দ্ধমাত্রার এই দুইটি পক্ষকে আবার অগ্নি ও সোমরূপে কল্পনা কর—নাদকে অগ্নিরূপে এবং বিন্দুকে সোমরূপে। যে কোনো বস্তুর সঙ্কোচ এবং ঘনীভাব করিতে করিতে চরমে গিয়া Essence রূপে, Nuclear Substance রূপে পাই সোমকে—যে-অমৃতবিন্দুর মধ্যে সমগ্র অভিব্যক্তি বা বিকাশের সম্ভাবনাটি বিধৃত রহিয়াছে। আবার বিস্তারের শেষে গিয়া বিশ্বব্যাপী Field Energy বা শক্তিরূপে (অবশ্য কেবল জড় শক্তি নয়) পাই অগ্নিকে—যিনি নাদরূপে সর্বত্র ওতপ্রোত। আবার এই উভয়ই মুখ্যপ্রাণে আজ্যরূপে, আহুতিরূপে কল্পিত। অর্থাৎ এই নাদ এবং বিন্দু, বিস্তার এবং সঙ্কোচ—এই উভয়েরই উত্থান এবং অবসান হয় গিয়া মুখ্যপ্রাণে, প্রাণব্রহ্মে। এই সঙ্কোচ-বিকাশ মুখ্যপ্রাণেরই দুটি মুখ্যকলা, phase মাত্র। সুতরাং ইহাদের তাহাতেই আহুতি দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলেই কৃতার্থতা।।২৮।।

(জপে মুখ্যপ্রাণ অথবা প্রাণব্রহ্মে আহুতি কর্মটি অত্যাবশ্যকীয়। আগ্নেয়মাত্রার আধিক্যবশতঃ চঞ্চলতা ইত্যাদি রজের লক্ষণগুলি দেখা দিলেও বটে, আবার সোমীয় মাত্রার আধিক্যে "শীতাড়ষ্টতা", "মত্ততা" ইত্যাদি তামস লক্ষণগুলি দেখা দিলেও বটে।)

হ্লাদ্যহ্লাদকধারায়া আরসতমবাহিতা।
ধার্য্যধারকধারায়াঃ শেষোঽহদিতৌ চ দৃশ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

যেমন সঙ্কোচ-প্রসারের ধারার শেষ হইল মুখ্যপ্রাণে—তেমনি আবার হ্লাদ্যহ্লাদক ধারার শেষ সীমা বা কাষ্ঠা হইতেছে—রসতম। সেখানে না পৌছান পর্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা নাই, তৃপ্তি নাই। তাই আনন্দের অনুসন্ধানও ততদিন নিরন্তর চলিবে।

আর, ধার্য্য-ধারক ধারা, container & contained-এর যে ধারা—তার limit বা সীমা হইতেছেন—অদিতি। তাই অদিতিকেই দ্যৌ, অদিতিকেই অন্তরিক্ষ, অদিতিকেই মাতা, পিতা ও পুত্র বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন॥ ২৯॥

পঞ্চ বা সপ্ত বা তিস্রো ধারা একত উৎসৃতাঃ।
তদেকং বিদ্ধি বৈ ব্রহ্ম ব্যোমপ্রাণদ্যুপাধিকম্॥ ৩০॥

আমরা এখানে বিশ্বের কয়েকটি ধারার আলোচনা করিলাম। ধারা তিনই হোক বা পাঁচই হোক বা সাতই হোক—মূলে তাহারা এক কেন্দ্র হইতেই নির্গত বা নিঃসৃত হইয়াছে। সেই এক কেন্দ্র বা মূল হইতেছেন ব্রহ্ম—যিনি ব্যোম, প্রাণ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিতে প্রকাশ পাইতেছেন। গীতাও ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন 'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পূরাণী'॥ ৩০॥

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং গতা বিশিষ্যমাণতা।
হানোপাদানরাহিত্যে তচ্চ ব্রহ্ম পরং স্থিতম্॥ ৩১॥

ব্রহ্মকে লাভ করিবার বা ব্রহ্মতত্ত্বকে অধিগত করিবার বেদান্ত-প্রসিদ্ধ রীতি বা methodটি হইতেছে—অধ্যারোপ ও অপবাদ। সমস্ত বস্তুকে প্রথমে ব্রহ্মে আরোপিত করিয়া ব্রহ্মকে সেই সেই উপাধি দ্বারা যুক্ত করিয়া দেখার ধারা হইল অধ্যারোপ। পরে আবার এই সমস্ত উপাধিকে একে একে অপবাদ করিয়া, negate করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব উপাধিনির্মুক্ত করিয়া দেখার ধারা হইল অপবাদ। প্রথমটি অন্বয়মুখে, ইতিরূপে, দ্বিতীয়টি ব্যতিরেকমুখে, নেতিরূপে। এই উভয় ধারা বা method-এর সহ-প্রয়োগেই combined application এর দ্বারাই সমস্ত বিশিষ্যমাণতা বা বিশিষ্ট উপাধিকৃত ভাব দূর হইয়া ব্রহ্ম স্ব-স্বরূপে প্রকাশ পান। এই দুই উপায়-প্রয়োগে কিন্তু ব্রহ্মের কোনো হান বা উপাদান ঘটে না, অর্থাৎ অধ্যারোপের দ্বারা তাঁতে নূতন কিছু যুক্তও হয় না, added হয় না। এবং অপবাদের দ্বারা তাঁহা হইতে কিছু বিযুক্তও হয় না, subtracted হয় না। তাঁর ক্ষতি বৃদ্ধি ইহাতে কিছুই নাই, কারণ তাঁহাতে add বা subtract করার, যোগ বা বিয়োগ করার কিছুই নাই। তিনি হান-উপাদানশূন্য পরম ব্রহ্ম।।৩১।।

সর্ব্বসাহিত্যরাহিত্য-সমেতা জ্ঞানপূর্ণতা॥৩২॥

ব্রহ্মে যেমন হান-উপাদান কিছুই নাই, তিনি স্বয়ং পূর্ণ; স্বতঃ নিত্যপূর্ণ, জ্ঞানের বেলায় কিন্তু সেরূপ নয়। জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে তখনই, যখন সে সাহিত্য ও রাহিত্য এই উভয়ের দ্বারা সমেত বা যুক্ত হয়। অর্থাৎ, জ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে প্রথম সর্ব-উপাধি-সহিত বা উপাধি-সহযোগে ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, আবার সর্ব-উপাধি-রহিত বা উপাধি-নির্মুক্ত ভাবেও জানিতে হইবে। নতুবা জ্ঞানের ত্রুটি থাকিয়া যাইবে, একদেশী দর্শন হইয়া যাইবে, integral vision পূর্ণাঙ্গ দর্শন হইবে না, 'অসংশয়ং সমগ্রং মাম্'কে জানা হইবে না। তাই জ্ঞানের পূর্ণতা-সম্পাদনের জন্য এই অন্বয় ও ব্যতিরেক, সাহিত্য ও রাহিত্য—উভয় মুখেই ব্রহ্মানুসন্ধান চালাইতে হইবে।।৩২।।

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ বুদ্ধিঃ সর্ব্বাবভাসিকা।
মহৎ সূক্ষ্মং পরং যাত্যতঃ স্থিতিস্থাপিকোত্তমা।
তচ্ছুদ্ধিশেষমাপন্নঃ স্বতো বেত্তি হ্যশেষতঃ॥৩৩॥

এখন প্রশ্ন আসে:—এই যে পূর্ণ জ্ঞানের কথা বলা হইল, সেই পূর্ণ জ্ঞানে যাই কি প্রকারে? ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে—বুদ্ধিতে শরণ নাও। কেননা, বুদ্ধিই সর্বাবভাসিকা, সব কিছুর প্রকাশ করিয়া দেয়। সে একদিকে যেমন পরম সূক্ষ্মে প্রবেশ করিতে পারে, তেমনি আবার পরম মহতেও অনায়াসে নিজেকে বিস্তার করিতে পারে। সুতরাং perfectly elastic যদি কিছু থাকে তো সে বুদ্ধি, তাই সে স্থিতিস্থাপিকোত্তমা। তাকে যেরূপ ইচ্ছা mould করা যায়, পরম সূক্ষ্ম বা পরম ব্যাপক যেরূপ ইচ্ছা রূপ লওয়ান যায়। ইহাই অর্থাৎ এই বুদ্ধিই মানুষের বিশেষ সম্পদ। এই একটি কারণই তাকে অন্য প্রাণিবর্গ হইতে পৃথক করিয়াছে এবং ইহার সম্যক অনুশীলনে সে বিশ্বের সমস্ত রহস্য অবগত হইতে পারে এবং পরিশেষে, বিশ্বনাথকেও ধরিতে পারে। আমরা আজ বিজ্ঞানের যা' কিছু চমৎকার দেখিতেছি, সে সবই এই বুদ্ধিরই আবিষ্কার, বুদ্ধিরই বিকাশের ফল। কিন্তু আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে কোনো তত্ত্বই যে প্রতিভাত হয় না—ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর

কিছুই নয়—আমাদের বুদ্ধির অশুদ্ধি। দর্পণ যেমন আবর্জনায় মলিন হইলে তাহাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হয় না, তেমনি অশুদ্ধিতে ভরা যে বুদ্ধি, তাহাতে কোনো তত্ত্বেরই উন্মীলন হয় না। দর্পণ যেমন স্বভাবতঃ স্বচ্ছ, বুদ্ধিও তেমনি স্বরূপতঃ প্রকাশরূপই, কেবল আগন্তুক মালিন্য বশতঃ তার প্রকাশময়তা যেন তিরোহিত হইয়াছে মাত্র। তাই পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে—'প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বম'। এই মালিন্য বা অশুদ্ধি ক্রমশঃ দূর হইয়া যখন শুদ্ধির শেষ সীমায় গিয়া বুদ্ধি পরম নির্মলতা ও স্বচ্ছতা ফিরিয়া পায়, তখন সমস্ত তত্ত্ব স্বতঃই তাতে অশেষরূপে স্ফুরিত হয় বা প্রকাশ পায়। তখন যেন জানিবার জন্য আর প্রয়াসও করিতে হয় না। সেইজন্য সর্বপ্রয়াসে বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা ও তার শরণ লওয়া প্রয়োজন।।৩৩।।

হিমাদ্রিতনুনির্মাতাঽশ্মরেণূন্ কোঽপি চায়য়েৎ।
শিশিরশীকরৈঃ কো বা প্রপূরয়েন্ মহাম্বুধিম্॥৩৪॥

শঙ্কা জাগিতে পারে:—বহির্বিজ্ঞান বা scienceও তো এইরূপে বুদ্ধিতে শরণ লইয়া তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, তবে কি বিজ্ঞানের পথই অনুসরণ করিতে বলা হইতেছে? তাহাতেই কি পরমার্থও লাভ হইবে? না, বিজ্ঞানের পথে পরম তত্ত্ব কোনোদিন মিলিবে না। কারণ, বিজ্ঞান চলিয়াছে খণ্ডের পথে, অল্পের পথে, আর আর্যজ্ঞান চলিয়াছে অখণ্ডের পথে, ভূমার পথে। বিজ্ঞান কেবল বলিতেছে—বাইরের এটা জানো, ওটা জানো, বিশ্লেষণ করিয়া চল; কিন্তু এরূপ জুড়িয়া জুড়িয়া কখনো পরম জ্ঞান লাভ হয় না, খণ্ডের সমষ্টিতে অখণ্ড মিলে না। প্রস্তরের রেণু সঞ্চয় করিয়া কে হিমালয়ের বিরাট বপু তৈয়ারি করিবে? শিশিরকণা সংগ্রহ করিয়া কে-ই বা মহোদধিকে প্রপূরিত করিতে যাইবে? এগুলি যেমন বাতুলের প্রচেষ্টা, তেমনি খণ্ড জুড়িয়া অখণ্ড জ্ঞান লাভের প্রয়াসও একান্ত উপহাসাস্পদ। সেইজন্য প্রজ্ঞানের অপেক্ষায় বিজ্ঞানের এই অপরিহার্য ত্রুটি, কারণ তার methodই inadequate অনুসন্ধান-রীতিই সদোষ ও অসম্পূর্ণ॥৩৪॥

বিশারদাদির্ভিল্লিজ্ঞোঃ কৃৎস্নেষু ক্রমতে চ ধীঃ।
সমাবৃত্তাবিয়াৎ পারং স্বামতীত্য স্বতঃ পরম্॥৩৫॥

তাহা হইলে কোন্ উপায় অনুসরণ করা কর্তব্য? বুদ্ধির মার্জনের পথই আশ্রয়ণীয়। বুদ্ধিরই যে সব বিশারদ, প্রাতিভ, ঋতম্ভরা প্রভৃতি স্তর বা ভূমিগুলি রহিয়াছে, সেগুলিকে ক্রমশঃ বিকশিত করা, ফুটাইয়া তোলা প্রয়োজন। এইরূপে বুদ্ধি অর্থাৎ যে করণ দ্বারা সব কিছু জানিতেছি, তাহা বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে, প্রজ্ঞার সপ্তধা প্রান্তভূমি ফুটিয়া উঠিলে, অনায়াসে কৃৎস্নবিদ হওয়া যায়, সমস্ত বস্তুতে বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইয়া যায়। পূর্বে যে সমাবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সমাবৃত্তিতে গিয়া পৌঁছিলে জানিবার চরম সীমায় অর্থাৎ জ্ঞানের পরম ভূমিতে পৌঁছান যায়। সেখানে আর বিশ্বের কোনো কিছু জানিতে বাকি থাকে না। পরিশেষে, সমাবৃত্তিরও পারে যাইতে পারিলে সেই বিশ্বাতীত নিরঞ্জন, 'যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ' কে জানা যায়। সুতরাং বুদ্ধিকে পর্বে পর্বে ফুটাইয়া তুলিয়া তার চরম বিকাশে পৌঁছান এবং পরিশেষে, তাকেও অতিক্রম করা—ইহাই যথার্থ জ্ঞানলাভের পথ॥৩৫॥

অধ্যারোপাপবাদৌ ত্বয়ি নিগময়তঃ শুদ্ধনৈর্গুণ্যমাত্রং
জন্মাদ্যস্যাদিলিঙ্গৈস্ত্বয়ি চ নিবিশতে জ্ঞানশক্ত্যাদিকার্ৎস্ন্যম্।
সিদ্ধঃ সন্ধানশেষাৎ ত্বয়ি চ মধুরিমা প্রেম্ন আত্যন্তিকোঽপি
কুর্য্যা গোবিন্দনাথাচ্যুতচরণদৃশো নো ধিয়স্ত্বাং প্রপন্নাঃ॥৩৬॥

উপসংহারে, একটি প্রার্থনা দ্বারা বক্তব্য শেষ করা যাইতেছে। হে ভগবন! বেদান্তবিচারের যে প্রসিদ্ধ রীতি—অধ্যারোপ ও অপবাদ, তাহা তোমার শুদ্ধ নির্গুণ, নির্বিশেষ রূপকে প্রতিপাদন করিতেছে। তা করুক। আবার ব্রহ্মসূত্রে 'জন্মদ্যস্য যতঃ' 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ', 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্', 'রচনানুপপত্তের্নানুমানম্' ইত্যাদি নানারূপ লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা তোমার সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব, সর্বান্তর্য্যামিত্ব, জ্ঞানশক্ত্যাদির সমগ্রত্ব ও পরিপূর্ণত্ব দেখাইয়া তুমি যে অশেষকল্যাণগুণাকর ঈশ্বর—তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অর্থাৎ তোমার সগুণরূপ দেখান হইয়াছে। তা হোক। আবার পরম প্রিয়তম বা মধুমত্তমের সন্ধানের অবসানরূপে তোমাতেই নিরতিশয় বা আত্যন্তিক মধুরিমাও সিদ্ধ হইয়াছে, কারণ শ্রুতিতে 'মধু'র সন্ধানে তোমাকেই চরম মধুরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ' ইত্যাদি বলিয়া শ্রেষ্ঠতা বা সর্বাপেক্ষা প্রিয়তা তোমাতেই দেখান হইয়াছে। তাও হোক—অর্থাৎ এ

সরই তোমার নির্গুণ সগুণ বা আনন্দ রূপ—প্রতিপাদিত হউক, কিন্তু তথাপি হে গোবিন্দ! হে নাথ! তোমাতেই একান্ত প্রপত্তিযোগে সমর্পিত আমাদের বুদ্ধিকে তোমার অচ্যুত চরণ অর্থাৎ অক্ষয়, অব্যয় যে পরম পদ তাতেই অনাকুল দৃষ্টিযুক্ত কর। তুমি নিজেই বলিয়াছ—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'; তাই তোমার নির্বিশেষ, সবিশেষ, রসতম প্রভৃতি রূপ শ্রুতি, যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইলেও তোমাতে একান্ত প্রপত্তিযোগ ভিন্ন, শরণাগতি ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ের দ্বারা 'তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং', তোমার সেই পরম পদ অনুভবে আসে না, সাক্ষাৎ অবগত হওয়া যায় না। অতএব তুমিই আমাদের করুণা করিয়া সেই পরম পদের অনুভবভাগী কর ॥৩৬॥

জপসূত্রম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

॥ প্রথমঃ পাদঃ ॥

১। অথ জপসূত্রম্॥

জন্মাদ্যস্য যতো জেন পেন চ প্রণবঃ পরঃ।
তজ্জলানীত্যুপাসীত জপাক্ষরক্রমাদিতি॥ ১॥
যস্য দেবে পরা ভক্তিরিত্যপি পেন গৃহ্যতে।
ভক্ত্যা যয়া হি জায়েত জ্ঞানং জনিনিবর্ত্তকম্॥ ২॥

১। অতঃপর জপসূত্র আরম্ভ হইতেছে॥

'জপ' এই শব্দে 'জ'কার ও 'প'কার, এই দুইটি অক্ষর রহিয়াছে। এই দুইটি অক্ষরের যেটি তাৎপর্য তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বভুবনের জন্মাদি যেখান হইতে হইয়াছে, সেই মূল বীজটিকে 'জ'-এই অক্ষরের দ্বারা জানিতে হইবে, এবং 'প'-এই অক্ষরের দ্বারা পরাবাক্‌রূপ যে প্রণব, তাহাকে জানিতে হইবে। এই প্রণবই জগতে জন্মাদির বীজ। সুতরাং 'জপ'-এই শব্দের দ্বারা প্রণবই লক্ষিত হইতেছে। তারপর শ্রুতি যে বলিয়াছেন— 'তজ্জলানীত্যুপাসীত'—অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সকল কিছু জাত হইতেছে এবং তাঁহাতেই সকল কিছু লীন হইতেছে, অতএব একমাত্র তাঁহাকেই উপাসনাযোগে আশ্রয় কর—এই শ্রুতিবাক্যের মধ্যে 'জ' ও 'প'-এই দুইটি অক্ষর পূর্বাপরক্রমে লইলে 'জপ'-এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং নিখিলের যিনি আশ্রয়, উপাসনাযোগে তাঁকেই আশ্রয় কর, 'জপ' শব্দের এই তাৎপর্যটি আমরা পাইতেছি॥ ১॥

শ্রুতি আবারও বলিয়াছেন—'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ' ইত্যাদি। এই বাক্যের মধ্যে 'প'-এই অক্ষরটি আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। এই 'পরাভক্তি'র দ্বারা

জন্মমৃত্যুনিবর্তক যে জ্ঞান, সেটি জাত হইয়া থাকে। সুতরাং 'জ'-এই অক্ষরটিকেও আমরা প্রসঙ্গাক্রমে পাইতেছি। এ ভাবেও 'জপ'-এই শব্দটিকে বুঝিতে হইবে॥ ২॥

২। জপোঽভ্যারোহবিশেষঃ॥

অসতো মেতি মন্ত্রেণ যোঽভ্যারোহ ইষ্যতে।
ব্যাবৃত্য হি পরাগ্‌বৃত্তীঃ প্রত্যগ্‌বৃত্ত্যা স বৈ জপঃ॥ ৩॥

২। অভ্যারোহবিশেষকে জপ বলে॥

'আমাকে অসৎ হইতে সতে লইয়া চল, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া চল এবং মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল'—অন্তরাত্মার আবেগপ্রসূত এই যে প্রার্থনা এবং প্রার্থনার মন্ত্র, সেইটিকে 'অভ্যারোহ' বলে। 'অভ্যারোহ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—'অভি', কিনা, অভিমুখী, 'আরোহ', কিনা, আরোহণ। সুতরাং 'অভ্যারোহ' শব্দটির মানে—Ascent of the Spirit, চেতনার আরোহণ। কোথা হইতে Ascent বা আরোহণ? আপন কল্পিত, অসত্য, তমঃ এবং মৃত্যুর বন্ধন হইতে। এই অভ্যারোহটি সংঘটিত হইবে কি প্রকারে? যে-বৃত্তি, আমাদিগকে 'সত্য', 'জ্যোতি' এবং 'আনন্দ' হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া রাখে, সেটিকে বলে 'পরাগ্'বৃত্তি; এবং যে-বৃত্তি আমাদিগকে তাহার অভিমুখীন করিয়া দেয়, সেটিকে বলে 'প্রত্যগ্'বৃত্তি। এখন পরাগ্‌বৃত্তিকে নিবারিত করিয়া যেটি প্রত্যগ্‌বৃত্তি প্রবাহিত করিয়া দেয়, তাহার নাম 'জপ'॥ ৩॥

৩। ব্যাবৃত্তেঃ সমাবৃত্তিরূপঃ॥

ঋতং সত্যং মধুচ্ছন্দো হিত্বা বা র্ব্যাজবৃত্তিতা॥
নির্ব্যাজা সা চ নির্বূঢ়া হ ব্যাভিসম্পদ্যতে যয়া॥ ৪॥

৩। ব্যাবৃত্তি হইতে সমাবৃত্তি য়দ্দারা হয়, তাহাই জপ॥

ঋতচ্ছন্দঃ, সত্যচ্ছন্দঃ, এবং মধুচ্ছন্দঃ হইতে যে ভ্রংশ বা চ্যুতি, তাহাকে ব্যাজবৃত্তিতা বলে। সপ্তম সূত্রে এই ব্যাজের লক্ষণ দেওয়া হইবে। এক কথায়, ইহা হইল ছন্দচ্যুতিনিমিত্ত বক্রতা বা বিষমতা (Unharmony Curvature)। এই বক্রতার ফলে ঋত হইতে অনৃতে, সত্য হইতে অসত্যে এবং মধু বা আনন্দ হইতে বিষ বা নিরানন্দে বৃত্তি হইয়া থাকে। এইটি হইল ব্যাবৃত্তি। সমাবৃত্তির রূপটি আমরা

উপোদ্ঘাতে বিশেষভাবে দেখিয়াছি। সমাবৃত্তিতে ব্যাজ অথবা বক্রতা-বিষমতা বিদূরিত হয়, এবং সেটি নির্ব্যূঢ়, কিনা, সর্বথা সংশয়বিহীন হইয়া থাকে। সুতরাং অবক্রতা, অবিষমতা এবং অসন্দিগ্ধতা হইতেছে সমাবৃত্তির রূপ। শ্রুতি যে অভিসম্পন্নতার কথা বলিয়াছেন, সমাবৃত্তির দ্বারা স্বরূপের সঙ্গে সেইপ্রকার অভিসম্পন্ন হইয়া যাইতে পারা যায়। আত্মস্বরূপই হইতেছে পরম সম্পদ; এই পরম সম্পদের অভিতঃ, কিনা, অভিমুখে ("towards") ঋজু, সুষম, নিঃসংশয় যে গতি, তাহাকে সমাবৃত্তি বলে। ঋত, সত্য এবং মধু—এই ত্রিবিধ ছন্দের আশ্রয়ে এই যাত্রা সফল হইতে পারে। লক্ষ্যে সফল গতি হইল সমাবৃত্তি, এবং লক্ষ্যে বিফল, ব্যর্থ গতি অথবা বিপরীত গতি ("away from") হইল ব্যাবৃত্তি। এবংবিধ সমাবৃত্তিরূপই হইল জপ॥ ৪॥ (কারিকায় 'বি' এবং 'অব্যা' লক্ষ্য কর।)

৪। বাধাবিরহবৃত্তিত্বমৃতত্বম্॥

দেশজন্যা কালজন্যা ছন্দোজন্যা চ বস্তুজা।
বাধা চতুর্ব্বিধা জ্ঞেয়াঽবরোধপ্রতিরোধনে॥ ৫॥
বিরোধশ্চ নিরোধশ্চ পণিরহ্যাদয়ঃ শ্রুতৌ।
এভ্যো মুক্তামৃতিং বিদ্যাদেভির্যুক্তাঞ্চ নির্ঋতিম্॥ ৬॥

৪। বাধাবিহীন যে বৃত্তি, সেইটি ঋত॥ (The real as Movement)

দেশনিমিত্ত, কালনিমিত্ত, ছন্দোনিমিত্ত এবং বস্তুনিমিত্ত এই—চতুর্বিধ বাধা আছে জানিবে। ইহাদিগকে যথাক্রমে অবরোধ, প্রতিরোধ, বিরোধ ও নিরোধ বলে। ঋগ্বেদাদিতে বৃত্র, পণিঃ, অহি ইত্যাদি উপাখ্যানে বিশ্বসৃষ্টিতে দেশাদিজন্য এই চতুর্বিধ বাধাই উপলক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। উপাখ্যানগুলি প্রণিধান করিলে প্রতীয়মান হইবে কোন্ কোন্ বাধা কোন্ কোন্ আকারে শ্রুতি আমাদের প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল বাধা হইতে যেটি মুক্ত, তার নাম ঋতি, এবং ইহাদের সঙ্গে যেটি যুক্ত, সেটির নাম নির্ঋতি॥ ৫-৬॥

৫। বাধবিরহবৃত্তিত্বং সত্যত্বম্॥

বিকারশ্চ বিবর্ত্তশ্চ পরিবর্ত্তশ্চ নাস্তিতা।
সদসদ্ভাব ইত্যেবমন্যাথাভাবপঞ্চকম্॥ ৭॥

অবচ্ছেদপরিচ্ছেদৌ বিচ্ছেদশ্চ ততঃ পুনঃ।
উচ্ছেদশ্চ প্রতিচ্ছেদ ইতি বাধেঽপি পঞ্চধা॥ ৮॥
বিকারাদ্যন্যথাভাবা বিচ্ছেদাদিনিমিত্তকাঃ।
তেষামপ্রতিযোগিত্বং সত্যত্বেন ব্যবস্থিতম্॥ ৯॥

৫। বাধবিরহ যে বৃত্তি, তাহাকে বলে সত্য॥ (The Real as Ground or as Persistence)

কোনো বস্তুর স্বরূপের অন্যথাভাব পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে; বিকার, বিবর্ত, পরিবর্ত, নাস্তিতা এবং সদসদ্‌ভাব। বস্তুর অন্যথাভাবরূপ যে বাধ হইয়া থাকে, সে বাধটিকে পাঁচপ্রকার বলিয়া জানিবে: অবচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছেদ, উচ্ছেদ এবং প্রতিচ্ছেদ। এইগুলি যথাস্থানে বিবৃত হইবে (যথা, ৩।১।১৯)। অগ্রে যে বিকারাদি পাঁচপ্রকার অন্যথাভাবের কথা বলা হইল, সেগুলি যথাক্রমে বিচ্ছেদাদি পঞ্চ বাধনিমিত্তই হইয়া থাকে। বিকারাদি এই পাঁচপ্রকার অন্যথাভাবের, সুতরাং বিচ্ছেদাদি পাঁচপ্রকার বাধের, যেটি অপ্রতিযোগী, কিনা, তাদের বিষয়ীভূত নয়, সেইটি সত্য বলিয়া ব্যবস্থিত রহিয়াছে। কাজেই সত্য এমন এক বস্তু, যার সম্বন্ধে বিকার, বিবর্ত পরিবর্তাদি নাই, এবং যেটি অবচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, বিচ্ছেদাদি বাধের দ্বারা বাধিত হয় না॥ ৭-৯॥

[অব = অবধারণে, সুতরাং তত্ত্বতঃ; পরি = পরিতঃ = on the surface, সুতরাং অতত্ত্বতঃ; বি = বিশেষেণ, in regard to a certain aspect or mode, কোনো বিশেষ অবস্থা বা ধর্মসম্পর্কে; উৎ = ঊর্দ্ধং = vertically or longitudinally ছেদ, সুতরাং নিষেধ or negation; প্রতি = তির্যক, horizontally, transversely, ছেদ (cross-section।)]

৬। ব্যাজবিঘ্নবিরহবৃত্তিত্বং ছন্দস্ত্বম্॥

ঋতস্বভাবনিষ্ঠা যা শৃঙ্খলা সুসমঞ্জসা।
তস্যাং স্থিতায়ামৃতিঃ স্যা-দার্জ্জবং হি তথা স্থিতিঃ॥ ১০॥
স্বাভাবিকং হি সত্যস্যানন্ত্যং যজ্ জ্ঞানভাস্বরম্।
আনন্দঘনতানিষ্ঠ-লীলাকৈবল্যমেবচ॥ ১১॥

যদর্ত্তঞ্চ তু সত্যঞ্চাভিষ্বঙ্গিণী পরস্পরম্।
তয়োশ্ছন্দস্ত্বমায়াত্যনধ্যস্তবাধয়োস্তদা॥ ১২॥

৬। ব্যাজ ও বিঘ্ন এতদুভয় বিরহবিশিষ্ট যে বৃত্তি, সেটি ছন্দঃ॥

[ব্যাজ ও বিঘ্ন এ দুটির লক্ষণ পরবর্তী দুইটি সূত্রে নিরূপিত হইয়াছে]

আমরা পরের দুইটি সূত্রে দেখিব যে বাধ ও বাধা নিমিত্ত যে বৈরূপ্য তাহার নাম ব্যাজ এবং বাধ ও বাধা নিমিত্ত যে বৈগুণ্য তাহার নাম বিঘ্ন। ছন্দঃ হইতেছে সেই বস্তু যাহাতে এই বৈরূপ্য এবং বৈগুণ্যের অভাব থাকে। স্থূল সূক্ষ্ম, কারণ—নিখিল বিশ্বের মূলীভূত এই ছন্দঃ। শ্রুতি বহুস্থলে, বহুধা, ছন্দঃ হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি, ইহা কীর্তন করিয়াছেন। ছন্দঃ হইতেই সৃষ্টি, ছন্দতেই বিশ্বের স্থিতি এবং ছন্দতেই লয়। সুতরাং এই বিশ্বের জন্মাদি যাঁহা হইতে হইতেছে, ছন্দঃ সেই ব্রহ্মেরই একটি মৌলিক রূপ। আমরা পূর্বে 'ঋতং' এবং 'সত্যং' এই দুইটি তত্ত্বের পরিচয় পাইয়াছি। জগৎ-কারণের যেটি গতিরূপ, সেইটি হইল ঋত। গতির যেটি ফল বা কার্য তাহাই হইল জগৎ। কিন্তু জগৎ-কারণের জগদভিমুখে এই যে গতি, সেটি কি অন্ধ, উচ্ছৃঙ্খল, অসমঞ্জস গতি? তাহা হইলে তো এই অপরূপ বিশ্বরচনার কোন প্রকার উপপত্তি হয় না। অন্ধ আকস্মিকতা (Blind chance) হইতে এই অপূর্ব মহাশ্চর্য রচনা কোনো ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং অবশ্যই মনে করিতে হইবে যে সুসমঞ্জস এবং সুশৃঙ্খল গতিই হইতেছে ঋতের স্বভাবনিষ্ঠ ধর্ম। এই শৃঙ্খলায় স্থিত হইয়া কোন কিছু ঘটিলে সেই ঘটনাকে আমরা বলিব 'ঋতি', এবং এবংবিধ স্থিতিকে আমরা বলিব 'ঋজু স্থিতি'। বলা বাহুল্য, মূল কারণের দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে দেখিলে বিশ্বের সব কিছুই এই ঋজু ঋতের পন্থা অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। আমাদের অভিজ্ঞতায় যে সকল ভ্রংশ বা চ্যুতি এবং তন্নিমিত্ত বক্রতা বিষমতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেগুলি মূল বাস্তব চিত্রে অবশ্যই নাই। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে মূল বাস্তব চিত্রখানি যেভাবে যতটুকু প্রকাশিত হয়, তার ভিতরেই এই সকল বিষমতাদি দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ণজ্ঞানে অনবদ্য ছন্দোময় এই যে বিশ্ব, সেটি স্বরূপেই বিদ্যমান থাকে। এই বিশ্বমহাসঙ্গীতের মাঝখানে বেসুরা, বেতালা বলিয়া কিছুই নাই। এই বিশ্বের অটন, যিনি ভীষণ ও

ভদ্র সেই মহানটরাজের নটন, হংসরূপী ভগবানের ভুবনরূপে অকুণ্ঠ সঞ্চার। পূর্ণজ্ঞানে বিশ্বের ঋতের পন্থায় নিত্য ঋজু স্থিতি। অপূর্ণজ্ঞানে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি। কোথায়ও বা ছন্দ দেখি, কোথায়ও বা দেখি না। ছন্দগুলিকেও খণ্ডিতভাবে দেখি। খণ্ড ছন্দগুলিকে একটা অখণ্ড ছন্দে সমন্বয় করিতে অপারগ হই। আমাদের বুদ্ধি এই অখণ্ড সমন্বয়ী ছন্দকে নিরন্তর অন্বেষণ করিয়া চলিতেছে। বুদ্ধি লক্ষ্যের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই সে ব্যাজ ও বিঘ্ন, কিনা, বৈরূপ্য ও বৈগুণ্য, কোন না কোন সামঞ্জস্য সূত্র দ্বারা সমাধান করিয়া যাইতেছে। বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের ইহাই গতি।

আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে যে কোনও গতিরূপ দেখিতেছি (যথা সূর্যের চতুর্দিকে কোন গ্রহের গতি) তার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে—উক্ত গতিটির নিরতিশয় যথার্থ রূপটি অথবা স্বরূপটি কি? আমরা চক্ষুদ্বারা এক প্রকার দেখিতেছি, যন্ত্রাদির সাহায্যে হয়তো বা অন্য প্রকার দেখিতেছি। এবংবিধ দেখার তারতম্য রহিয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন করিতে হয়, গতিটির যথার্থতম রূপটি কি? বলা বাহুল্য, একমাত্র অকুণ্ঠিত পূর্ণজ্ঞানে এই যথার্থতম রূপটি প্রতিভাত, অপূর্ণ স্তর মাত্রেই সে রূপটি অল্পবিস্তর আবৃত, কুণ্ঠিত ও বিকৃত। পূর্ণজ্ঞানে গতিটিকে আবার বিচ্ছিন্ন (isolated) ভাবে আছে, ইহা মনে করিতে পারি না। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ইলেকট্রন, প্রোটনের গতি পর্যন্ত সমস্তই একটা অখণ্ড বিরাট গতির মধ্যে মহাছন্দের অচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

আলাদা করিয়া দেখিলে তারা অযথার্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং যেটি ঋত সেটি অনৃত হইয়া পড়ে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে ছন্দের শৃঙ্খলাটি শৃঙ্খল নয়, তন্নিমিত্ত বন্ধনটিও "নাগপাশ" নয়। ছন্দের বন্ধন=ছন্দে নিয়ত অন্বিতত্ব। পুনশ্চ, ঋতের পন্থাকে যে ঋজু পন্থা বলা হইল, সে ঋজুত্ব জ্যামিতিক ঋজুত্ব নহে। সে ঋজুত্ব মানে ছান্দোগ্য বা ছন্দোগত্ব (Conformity or Concordance)। ছন্দের যেটি স্বাভাবিক নিজস্ব রূপ তাহা হইতে একটুখানিও নড়চড় না হইলে পাই এই ঋজুতা। পক্ষান্তরে, বক্রতা মানে জ্যামিতিক বক্রতা Curvature মাত্র নহে, অছন্দোগত্বই হইল বক্রতা (unharmony curvature); এই প্রকার সুষমতা ও বিষমতাও আমাদের বুঝিতে হইবে। জ্যামিতিক তল ক্ষেত্রাদি সম্বন্ধে যে সুষমতা (Symmetry) সেটি মূল

ছন্দোগত্বের একটা বিশিষ্ট নমুনা মাত্র। মূল ছন্দোগত্ব হইতেছে পরম বিশারদী বুদ্ধির স্বীয় বোধরূপতা, এবং সেই বোধই সত্য বিশ্ব।

অতঃপর ভাবিয়া দেখিতে হইবে সত্যের স্বরূপটি কি? গতির দিক দিয়া দেখিলে যেটি ঋত, বস্তুর দিক দিয়া দেখিলে সেইটিই সত্য। আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে যে কোন বস্তুর একটা বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাই। আমাদের ইন্দ্রিয়ের ক্যামেরায় বস্তুর যে ছবিটি পড়িতেছে, মন আপন বিবিধ সংস্কারের দ্রাবকে সেটিকে ফুটাইয়া তুলিয়া (develop করিয়া) আমাদের কাছে উপস্থিত করিতেছে। বস্তুটি স্বরূপে যাহাই হউক না কেন, আমাদের ক্যামেরাগুলি যখন আলাদা আলাদা, এবং দ্রাবকগুলিও যখন এক রকম নয়, তখন অবশ্যই বস্তুর রূপটি আমাদের সকলের কাছে একই রকম হইতে পারে না। বিভিন্ন জীবের তো কথাই নাই। একই বস্তুর বিভিন্ন রকমের ছবি হইলে, কোন্ ছবিটিকে বস্তুর ঠিক অনুরূপ বলিব? বিজ্ঞান অবশ্য বস্তুর প্রকৃত ছবিটি তুলিয়া লইবার জন্য যত্ন করিতেছে। অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ফলে আমাদের চারিধারে এই জড় বিশ্ব ক্রমশঃ তার জড়তা পরিহার পূর্বক শক্তিরূপ ধারণ করিতেছে। বিশ্বশক্তির খেলায় একটা সমন্বয়ী ছন্দের সন্ধানও আমরা পাইতেছি। সেটা সাংখ্যচ্ছন্দঃ—Mathematical Harmony. সুতরাং সত্যের পানেই অগ্রসর হইতেছি, সন্দেহ নাই। কিন্তু চরম সত্যটি এখনও দূরে বলিয়াই মনে হইতেছে। যে সত্যটিকে বর্তমানে আমরা গণিতের সমীকরণ শৃঙ্খলের দ্বারা বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছি, সে শক্তি কি কোন প্রকার প্রাণহীন, চৈতন্যহীন বস্তু? স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি কোন ভাবেই বস্তুর যেটি 'হৃল্লেখা' (Basic Pattern) এবং বস্তুর যেটি 'হৃৎ' অথবা 'আত্মা' (Basic Essence), সে দুইটির কোনটিই আমরা এখন পর্যন্ত ধরিতে পারি নাই। পূর্ণ জ্ঞান বা প্রজ্ঞান ব্যতীত বস্তুর 'হৃৎ' অথবা 'হৃল্লেখা' সম্যক প্রকাশিত হইতে পারে না। সুতরাং ঋতের মতো সত্যও আমাদের বোধের আদর্শ ও লক্ষ্য (End and Ideal) মাত্র। অব্যক্তস্বভাব, নিয়তি, অসৎ বা শূন্য, কাল, যদৃচ্ছা (Chance) অথবা কোনও সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ পুরুষ এবং তদিচ্ছা—এ সকলের কোনো কোনোটাকে জগতের মূলে বসাইয়াছি, কিন্তু জগতের 'হৃৎ' অথবা 'হৃল্লেখা' কি মিলিয়াছে? মিলিয়া থাকিলে কোনটায়?

কিন্তু তথাপি আমাদের এই বোধই হইতেছে সত্যের প্রতিষ্ঠা। সমস্ত কিছুই প্রশ্ন,

সংশয়, বিকল্পাদির বিষয়ীভূত হইতে পারে, কেবল যেটি সাক্ষাদপরোক্ষ বোধ ("ভান") সেইটি বাদে। সেটি নির্ব্যূঢ়রূপে (unconditionally) অস্তি এবং ভাতি। সেইটিই Fact. ইহার নিজের সম্পর্কে সত্যমিথ্যাদি কোন প্রশ্ন নাই।

রজ্জু-সর্পাদি স্থলেও ইহার ভান স্বরূপে (ভাতিতা সম্বন্ধে) কোন সংশয় বা বিকল্প নাই। ভাতিতা হিসাবে ইহাতে অবচ্ছেদ পরিচ্ছেদও নাই—অবশ্য যে বা যে সকল রূপাদি 'ভাত' (presented), তাদের সম্বন্ধে অবচ্ছেদাদি আছেই। সমগ্র, অখণ্ড ভানটি স্বয়ং 'অব্যবহার্য', অনিরুক্ত। এই ভানরূপ বোধের পটভূমিকাতেই বিচিত্র বিশ্ব প্রপঞ্চিত হইতেছে আদি অন্তহীন এক চলচ্চিত্রের মতো। সুতরাং এই বোধের দ্বারাই সত্যকে বুঝিতে হইবে। ভান ও বোধের মধ্যে একটুখানি বিশেষ করিয়া এই বুঝটি বুঝিতে হয়। ভান অনিরুক্ত (Alogical), তাকে বোধ নাম দেই, যখন সেটাকে কোনো না কোনো নিরুক্তির (category) সাহায্যে 'বুদ্ধিগ্রাহ্যমিব' (as it were Logical, Thinkable) করিতে চাই। সত্যেরও এই ভানরূপ এবং এই বোধরূপ। অনিরুক্তের নিরুক্তি করিতে গিয়া স্বরূপ তটস্থাদি ভেদও করিয়া থাকি, বুদ্ধির কোনো কোনো 'সূত্র' আশ্রয় করিয়া। এক কথায় সাক্ষাদপরোক্ষের (Alogical Absolute Fact এর) অন্তিকতমত্ব বা গরিষ্ঠ নৈকটিকত্ব (closest possible approximation) হইল স্বরূপলক্ষণ। নচেৎ, অলক্ষণের লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতা তো নাই।

শ্রুতি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' স্বরূপলক্ষণ করিয়াছেন। অবচ্ছেদ পরিচ্ছেদাদি যাতে নাই, কোনও প্রকার অভাবের বিষয় যেটি নয়, সেইটি অনন্ত। সত্য এবংবিধ অনন্ত জ্ঞান। কেন? 'আমার' যেটি বোধ-ভান (Experience as Fact) সেইটিই ভাতিতা বা প্রকাশমাত্ররূপে এই অনন্ত জ্ঞান নয় কি? সে জ্ঞানের 'বিষয় বিশেষ' (Fact-section, Object-Content) সম্বন্ধে অবচ্ছেদাদি অবশ্য রহিয়াছে কিন্তু নির্বিশেষ অস্তিতা-ভাতিতা-মাত্ররূপে তাতে সে সব নাই। ইহার আদি, মধ্য, অন্তও কল্পনায় আনা যায় না। সমগ্র ও অখণ্ড ভাবে যেটি প্রমাণযোগ্য ও নির্বচনযোগ্য (Thinkable and Predicable) নয়, সেটির অসাকল্য (অংশতঃ, খণ্ডতঃ)—নির্বচন হয় যে বোধের দ্বারা তাকে বলে "প্রমাতা-বোধ" ("Reviewer Fact"). Original View এবং Review-এর এই ভেদটি মনে রাখিতে হইবে। বোধবিশ্ব এবং বিশ্ববোধ এক নয়।

অস্তি ভাতিতা বা সৎ ও প্রকাশমাত্রতারূপে এতে কোনও পরিচ্ছেদ নাই বটে, তবু 'আমার এই বোধ ভানে একটি 'কার্পণ্য' (Intrinsic Limitationality) ও কুণ্ঠা (Strain Potential) রহিয়াছে দেখিতেছি। 'হৃৎ' এবং 'হৃল্লেখা' (ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি) 'আমার' এই অস্তি ভাতিতায় 'অস্তি এবং ভাতি' হইতেছে কৈ? নিশ্চয়ই একটা 'অবগুণ্ঠক' (Veil) রহিয়াছে। এই অবগুণ্ঠকটিও অনির্বচনীয় (Inscrutable)। কেবলমাত্র অবগুণ্ঠক নয়, অবমর্শক (Stress Potential)। এর ফলে আমার বোধ ভান একটা বিশিষ্ট আকার প্রকারের 'বোধ বিশ্ব' (A Universe of Experience with a given reference System) হইতেছে। সে 'বিশ্ব' ঋত ও সত্যস্বরূপের একটা ব্যবহারিক প্রতিচ্ছেদ (Practical Cross-Section). এই প্রতিচ্ছেদ হৃৎ এবং হৃল্লেখা এবং তাদের হৃচ্ছন্দঃ মিলিতেছে না দেখিতেছি। অথচ মিলাইবার প্রয়াসটি রহিয়াছে, তাও দেখিতেছি। যে পন্থায় (বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষদ্ দ্বারা) সেটি মিলে, তাহাই সমাবৃত্তি। পদার্থ বিজ্ঞান ইহার বহিরঙ্গ, অপূর্ণ সাধন, জপ এবং উপাসনা অন্তরঙ্গ সাধন।

সমাবৃত্তি সমাপনে বিশ্বের যেটা 'হৃৎ' বা আত্মা সেটা আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। আনন্দের 'সিন্ধু' (আকাশ বা নাদ) রূপ, ও বিন্দু (ঘন) রূপ। ঘন বা বিন্দুরূপেও সেটি সিন্ধু। বিন্দু রূপেও স্বরূপতঃ যেটি অমেয়—সেটি মেয় হয় না, কেবলমাত্র সম্ভাব্য-নিখিল-ক্রিয়োৎপত্তি-সামর্থ্যোর্জিত হয়। বিন্দুরূপেও দেশ-কাল-কারণতাজন্য 'নিরুক্তি' নাই। বিন্দু স্বয়ং 'নিষ্কল', কিন্তু অনন্ত কলনবৃত্তিতা, কিনা, কলার সম্ভাব্য-সম্ভাবন-সামর্থ্যরূপ। ঘনরূপতাই নিখিল অভিব্যক্তির মূলীভূত বীজরূপতা (হ্রীঁ)। এটি পরম ও অবম—এই দ্বিবিধ কেন্দ্রাশ্রয়িণী, যেটি 'নৈষ্কল্য' তার 'সাকল্য' দৃষ্টিতে। যাতে কলা—(Aspect বা Partial) নাই সেটি নৈষ্কল্য, কলন বৃত্তিতায় তাতে কলা ফুটিলে, সেটি হয় সাকল্য। পরম-কেন্দ্রাশ্রয়িনী আনন্দঘনরূপতাই পরমেশ্বরের (ওঁঙ্কারের) "বহু স্যাম প্রজায়েয়" এই সৃষ্টিবীজ "কাম" (ক্লীঁ)। অবম কেন্দ্রে "বিন্দু" অবগুণ্ঠক অবমর্শক দ্বারা অবচ্ছিন্ন। পরমেশ্বরের লীলা কৈবল্য (শ্রীঁ, ঐঁ) (Pure Unfettered Action or Play) অবম সকল কেন্দ্রে 'কৈবল্য' লক্ষণটি হারাইয়া "লীলা" স্বরূপটিও লুকাইয়াছে। অথচ, কোথাও (এমন কি জড় পরমাণুতেও) একান্তভাবে সেটি বাধিত হয় নাই। সর্বত্রই চতুষ্পাৎ সত্য অনুপ্রবিষ্ট।

সুতরাং সত্যের দৃষ্টিতে বিশ্বের 'হৃৎ' যেমন আনন্দ, 'হৃল্লেখা' তেমনি লীলাকৈবল্য প্রসূত, আবার প্রকারতা বিশিষ্ট আনন্দের উল্লাস এবং বিলাস। পরের কোনও কোনও সূত্রে—আনন্দের উল্লসিত্ব বিলসিত্ব এবং অলসিত্বের অবস্থাগুলি বিবৃত হইবে। 'ম'='আমি'র কোনও অনিরূপিত কিন্তু নিরূপণযোগ্য সংস্থা; তার অব (Sub = নীচে) হইল 'অবম'; আর 'পর' (Super বা Supra = উর্দ্ধে) হইল 'পরম'।

অতএব 'সত্য' বলিতে (১) অনন্ত অকুণ্ঠ জ্ঞান, (২) অপরিসীম, অপরিমেয় আনন্দ, (৩) আনন্দের বিন্দুঘনরূপতা এবং (৪) লীলা কৈবল্য, সুতরাং (৫) অনিরুক্ত-নিষ্কলের নিরুক্ত-সকলরূপে (কলাবিশিষ্ট) অভিব্যক্তি—এই কয়টি পাইতেছি। এ অভিব্যক্তি 'অতাত্ত্বিক' অর্থাৎ দেশ কালাদি দ্বারা তত্ত্বতঃ 'অন্তরিত' (Interjected, Projectred) হইয়া অনিরুক্ত-নিষ্কল নিরুক্ত-সকল হয় না। একটি অবোধবগাহ্য (কিনা, অবুদ্ধিগ্রাহ্য = Alogical) রূপ, অপরটি বোধবগাহ্য (কিনা, বুদ্ধিগ্রাহ্য = logical) রূপ।

শ্রুতি "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ"—অর্থাৎ ঋত এবং সত্যকে (দুইটি 'চ'কার দ্বারা) পরস্পর অভিষ্বঙ্গিভাবে বলিয়াছেন। ৯ সূত্রের কারিকায় এই অভিষ্বঙ্গ আলোচিত হইয়াছে এবং আসঙ্গ (ব্যাসঙ্গ), অনুষ্বঙ্গ, প্রতিষ্বঙ্গ, ইত্যাদি রূপও প্রদর্শিত হইয়াছে। 'স্বঞ্জ' ধাতু আলিঙ্গান অর্থে। ফলে ঋত ও সত্য অন্যোন্যাসঙ্গি ('inter-locked') হয়। অর্থাৎ ঋত শুধু ঋজু, সুযমশৃঙ্খলা মাত্র ('Law') থাকে না, সেটি হয় অনন্ত জ্ঞান-আনন্দ-লীলা-কৈবল্যের নিজ অভিব্যক্তিরূপ—('Own absolute manifestation), আর সত্যও তখন অনন্তজ্ঞানাদিলক্ষণ বস্তু মাত্র নয়, (একটা Absolute Conscious Subsistence মাত্র নয়); কিন্তু সেটি হয় একটা 'অমান-মানদা' পরম স্বতঃস্ফূর্ত (Self-determined) ধারা (as Self-determined Pro-cess measureless in itself but evolving measure)। এই প্রকার ঋত ও সত্যের পরস্পরের "অভিতঃ" যে স্বজমানতা, তাহাই হইল স্বভাবছন্দঃ, বা স্বচ্ছন্দঃ, হৃচ্ছন্দঃ। বাধা ও বাধদ্বারা স্বভাবতঃ অনধ্যস্ত, অনাক্রান্ত ঋত ও সত্যের পরস্পর অভিষ্বঙ্গজনক ও তজ্জন্য যে স্বচ্ছন্দঃ তার সম্বন্ধে ব্যাজ বিঘ্ন অনবকাশ। কিন্তু অবম দৃষ্টিতে স্বজমানতাটি (অর্থাৎ সত্যের আপন ঋত এবং ঋতের আপন সত্য, এই

অবিনাভাবটি) "অভিতঃ" (কিনা, ঠিক congruent, in complete correspondence) না হইলে "হৃচ্ছন্দঃ" অবগুণ্ঠিতাদি হইয়াও পড়ে, তার ফলে 'বিশ্ব জাড্য' (অচেতন জড়রূপতা) 'বিশ্ব তাড্য' (blind cosmic determinism) ইত্যাদি অহৃচ্ছন্দঃ (যাহা হইতে অরিচ্ছন্দ) এবং বৈরূপ্য, বৈগুণ্যাদি আক্ষেপিত হয়।

[জপসূত্রে ৪।১।১৬ সূত্রে প্রকৃতিচ্ছন্দঃ আকৃতিচ্ছন্দঃ প্রকৃতি-বিকৃতিচ্ছন্দঃ এবং বিকৃতিচ্ছন্দঃ—এই প্রকার ছন্দের চাতুর্বিধ্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ১৭ সূত্রে স্বভাব-বিভাবাদি ভেদে পঞ্চবিধতা, এবং, ১৮, ১৯ সূত্রে সপ্তবিধতাও কথিত হইয়াছে; ২১-২৫ সূত্রে জগত্যাদি সপ্তচ্ছন্দের রাহস্যিক লক্ষণ, এবং অন্য অন্য স্থলে মধুচ্ছন্দাদির প্রসঙ্গ রহিয়াছে] ১০।১১।১২॥

৭। বাধবাধাজন্যবৈরূপ্যং ব্যাজঃ॥

ভ্রংশাপভ্রংশবিভ্রংশা ইতি ব্যাজো ভবেত্ত্রিধা।
চ্যুত্যপহ্নুতি-বিচ্যুতি-সংজ্ঞাভিরুচ্যতেঽপি সঃ॥ ১৩॥
ভ্রংশেন ব্যভিচারিত্বং সামান্যতঃ প্রসজ্যতে।
অপেন চাপনীতত্বং বৈপরীত্যং পুনর্বিনা॥ ১৪॥
সাকল্যেনাংশতোবাপি দ্বিধা ব্যাপ্তির্ভবেত্ত্রিষু॥ ১৫॥
ভ্রংশঃ সাংসিদ্ধিকো জ্ঞেয়ঃ প্রমাণৈরুপপাদিতঃ।
সাংকল্পিকস্তু সংকল্পাদ্ বৈকল্পিকো বিকল্পবান্।
আভাসিকশ্চ জানীহ্যাকস্মিক ইতি পঞ্চধা॥ ১৬॥

৭। বাধ ও বাধা নিমিত্ত যে বৈরূপ্য তার নাম ব্যাজ॥

[ব্যাজ = Unharmony Curvature]

পূর্ব সূত্রের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি যে ঋত ও সত্য পরস্পরের অন্বিত না হইলে অন্ধ জগৎ, বন্ধ জগৎ ইত্যাকার জগতের যথার্থরূপ সম্বন্ধে বৈরূপ্য উপস্থিত হয়। কেবল তাহাই নহে, দ্বৈধ বা দ্বৈত জগতের আশঙ্কা ঘটিয়া থাকে। বিশ্ব একরূপ না হইয়া দ্বিরূপ অথবা বহুরূপ হইয়া পড়ে। ইহাকে Dual অথবা Plural Universe বলা যাইতে পারে। যথা, এই বিশ্ব ঠিক ছন্দোবন্ধভাবে

চলিতেছে অথবা ইহার কোথাও ছন্দের অভাব আছে? Nature কি Law এবং Chance-এর mixture? যে-শক্তিদ্বারা জগৎ চালিত হইতেছে, সেই শক্তি কি দেবশক্তি, না অসুরশক্তি, না উভয়ই? জগতের মূলে এই যে দ্বন্দ্ব, সেটি কি মৈত্র দ্বন্দ্ব (Concordant Duality) অথবা বৈর দ্বন্দ্ব (Discordant Duality)? এই ভাবের নানা আশঙ্কা উদিত হইয়া থাকে। ঋত এবং সত্যের যে পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ, আমাদের বিশ্ববোধে সেটির ভ্রংশাদি লক্ষিত হইলেই এই সকল প্রকার আশঙ্কার সম্ভাবনা উত্থিত হইয়া থাকে। যে ভ্রংশাদির ফলে যথার্থরূপে বিরূপতা দেখা দেয়, তাহাকেই বলে ব্যাজ। 'আবিঃ'র যেটি 'বি' অর্থাৎ ঋত এবং সত্যের বিশ্বতোমুখতা, অর্থাৎ বিশ্বাকারে আবির্ভাব, সেটিকে আবৃত করিয়া অন্য আকারে অথবা রূপে যেটি জাত হয়, তাকে বলে ব্যাজ—বি + আ + জ। ঋত এবং সত্য দৃষ্টিতে যেটি রজ্জু, সেটি ব্যাজ-দৃষ্টিতে সর্পরূপে দেখা দিতেছে। পূর্বে ৪ ও ৫ সূত্রে যে বাধ ও বাধার কথা বলা হইয়াছে, তাদের নিমিত্তই এবংপ্রকার আবরণ ও বিক্ষেপটি ঘটিয়া থাকে। ভ্রংশ, অপভ্রংশ এবং বিভ্রংশ অথবা চ্যুতি, অপহ্নুতি এবং বিচ্যুতি এই তিন প্রকার ব্যাজ (Unharmony Curvature) আমাদের বিবেচনা করিতে হয়। এর মধ্যে 'ভ্রংশ' এইটির দ্বারা সামান্য ভাবে ব্যভিচারিত্ব (Departure, Deviation, Exception) বুঝিতে হইবে; 'অপভ্রংশ' এটির দ্বারা যথার্থ রূপটি অপনীত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে (Negation or Elimination); 'বিভ্রংশ' ইহার দ্বারা বৈপরীত্য (Contrary or Contradictory) বুঝিতে হইবে। এই ত্রিবিধ স্থলেই প্রশ্ন উঠিতে পারে—যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হইল তার ব্যাপ্তি কতটা? যথার্থ রূপটি কি সমগ্র ভাবে অথবা আংশিক ভাবে ব্যভিচার প্রাপ্ত হইল? ভ্রংশ বা চ্যুতি সম্বন্ধে এবংপ্রকার সাকল্য ব্যাপ্তি এবং অংশতো ব্যাপ্তি সর্বক্ষেত্রেই বিচারযোগ্য। অন্যভাবে দেখিতে গেলে ভ্রংশ বা চ্যুতি হইতেছে পাঁচ প্রকার—সাংসিদ্ধিক, সাংকল্পিক, বৈকল্পিক, আভাসিক এবং আকস্মিক।

আমাদের ব্যবহারিক (সুতরাং আপেক্ষিক, নির্ব্যূঢ় নয়) প্রমাণ দ্বারা যে ভ্রংশ অথবা চ্যুতি উপপাদিত (কিনা, সিদ্ধ) তাকে সাংসিদ্ধিক বলে। যেমন, 'স্থান' বা Space এর বক্রতা; আলোকাদি বিকিরণের যুগপৎ, রেণুরূপ এবং ঊর্মিরূপ; অণুর

অভ্যন্তরে ঋণাত্মক তড়িদণু (Electron) এর গতি স্থিতির 'অনিয়ততা' (Indeterminacy); রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের অণুসমূহের মধ্যে 'অদৃষ্টবশতঃ' (যেন লটারি করিয়া) কতকগুলির বিকিরণ, অপরগুলির নিশ্চেষ্টতা; ইলেক্ট্রনের কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে 'লম্ফ'; আলোকরশ্মি বেগের এবং শক্তিকণিকার মানের (Quantumএর) 'অক্ষরতা' (constancy); ইত্যাদি। প্রাণিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং অপরাপর ক্ষেত্রেও এই প্রকার 'ব্যাজ'এর দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে ও মিলিতেছে। পূর্বেকার প্রমাণ সিদ্ধ অনেক কিছুই বর্তমানে নাকচ হইয়া গিয়াছে; বর্তমানে যেগুলি 'সিদ্ধ' তারা অথবা তাদের কোনো কোনওটি, ভবিষ্যতে অসিদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে। পূর্ণজ্ঞানে যেটি নির্ব্যূঢ় প্রমাণ, তার পরিভাষা 'বেদ'। নির্ব্যূঢ় প্রমাণে যেটি সিদ্ধ, তার অসিদ্ধ হবার আশঙ্কা নাই। সেটি আর 'ব্যাজ' নয় তখন। তখন বাধ-বাধা-বিরহবিশিষ্ট 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' সেটি। তখন ভ্রংশ বা চ্যুতি তত্ত্বতঃ নয়। ছন্দঃ সেস্থলে স্বরূপেই অচল-প্রতিষ্ঠ। আমরাও ব্যবহারিক জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে ছন্দের আপাত-ভ্রংশগুলি বৃহত্তর ছন্দের দ্বারা সারিয়া লইতে চেষ্টিত আছি—যথা কোন জ্যোতিষ্কের গতিবর্ত্মের অতর্কিত চ্যুতি বা বক্রতা। লক্ষ্য এবং আদর্শ হইল—'ঋতং বৃহৎ' ও 'সত্যং মহৎ'।

সাংকল্পিক—সংকল্প বা ইচ্ছাদ্বারা যে ভ্রংশ বা চ্যুতিটি ঘটিয়া থাকে। পরীক্ষাস্থলে এটি হইতে পারে। যেমন, একটা লাটিম বেশ ঘুরিতেছে, তাকে আঙ্গুল দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া দেখিলাম—কি হয়; 'ইন্দ্রশত্রু' এই মন্ত্র যে 'স্বরে' উচ্চারণ করিতেছি, স্বর বদলাইয়া দেখিলাম, তাতে শক্তির বা ফলের কি ব্যতিক্রম হয় না হয়, ইত্যাদি। তা ছাড়া ইহাতে বিবেচ্য—জীবের ইচ্ছার ফলে জীবের যেটি যন্ত্র (যথা Brain) তার নিজস্ব গতিচ্ছন্দে কোনও পরিবর্তন (শক্তির মান অথবা দিক সম্বন্ধে) ঘটিতেছে কি না। যদি ঘটে তবে সেটি কি সত্যই ব্যাজ, না বৃহত্তর ঋতেরই সেটি অনুগত? সুতরাং সাংকল্পিকস্থলেও ঋতের আনুগত্য অথবা তার অভাব হইল বিচার্য বিষয়। বৈকল্পিক—যাতে বিকল্প,—সুতরাং প্রশ্ন ও সংশয় আছে। যেমন, বিবৃদ্ধিশীল (বিবর্দ্ধিষু) বিশ্ব (Expanding Universe) কি প্রমাণিত না প্রতীয়মান মাত্র? কোনও জপক্রিয়ার ফলে ঠিক যেটি শিষ্ট-সম্মত ফলশ্রুতি আছে, তার ব্যতিক্রম দেখিলাম। এই ব্যতিক্রম কি সত্যই ঘটিল অথবা ঘটে নাই এবং ঘটিলে, সেটি সত্যই ব্যতিক্রম কিনা? সুতরাং বৈকল্পিকস্থলে এই দ্বিবিধ সংশয় এবং দ্বিবিধ প্রশ্নই প্রাসঙ্গিক।

আভাসিক,—যে ভ্রংশ বা ব্যতিক্রম আভাস মাত্র। ভ্রান্তি বা প্রমাদবশতঃ, 'অনুক্রমে'ও ব্যতিক্রম বুদ্ধি ঘটিতেছে। যেমন, জলে অর্দ্ধনিমজ্জিত এক ঋজু দণ্ড বক্র দেখায়। উদয় বা অস্তের সময় (বিশেষ সমুদ্রবক্ষ হইতে) সূর্যকে বড় দেখায়। ব্যাজ কথাটার এক মানে ভাণ, কপট, ছল,—এ স্থলেও প্রশ্ন দ্বিবিধ—সত্যই ভ্রান্তি হইয়াছে কিনা,—হইয়া থাকিলে, কিরূপে হইল এবং যথার্থ রূপটি কি? (Correction of Apparent Error)। আকস্মিক—আমাদের ব্যবহারিক বিশ্ববোধে 'সম্ভাব্যতা' (Probability) বলিয়া এক 'বস্তু' রহিয়াছে; ব্যষ্টিভাবে (individually) প্রতিটি ঘটনা (event) ইহার 'নিয়মে' (by laws of probability) ঘটিতেছে মনে হয়; সমষ্টি ভাবে (on the average) সেটি 'নিশ্চিত' (certain) দেখিতে পাইলেও—দৃষ্টান্তরূপে Kinetic Theory of Gases চিন্তা কর। আমরা যেটিকে নিরূপিত অথবা নিরূপণীয় বিশ্ব ভাবিতেছি, সেটি কি মূলতঃ (basically) সম্ভাব্যজগৎ (Statistical Universe) মাত্র? যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে—সম্ভাব্যতা কি উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ খেয়াল? কোনও কিছুই ঠিক-না-থাকা থেকেই সব কিছু ঠিক হইতেছে? Primordial Night কি Original Chaos ? Prinmordial Creativity-র মূল কি Primordial Lawlessness ? না, তা তো নয়। সম্ভাব্যতা (Probability Function) স্ব-নিয়মেই (অর্থাৎ আপন নিয়মানুবর্তী হইয়াই) অবশ্য বিশ্বের আদি, মধ্য এবং অন্তের ঘটনাপুঞ্জকে "ঢালা-উবুর" করিতেছে। একান্ত উদ্ভট, আকস্মিক কিছুই ঘটিতেছে না। সংখ্যাবিজ্ঞানের মূলসূত্র এবং সমীকরণগুলি সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে অনবকাশ নহে। সম্ভাব্যতার ঊর্মিভঙ্গিমা ("Probability Waves") কোনও ঘটনার সম্ভাব্যতার মাত্রা নিরূপণে অবশ্য আলোচ্য ও বিবেচ্য। বায়ুতরঙ্গের বেলা যেমনধারা বায়ুকণাপুঞ্জের স্থানিক ঘনতা এবং স্থানিক বিরলতা দেখিতে পাওয়া যায়; সম্ভাব্য তরঙ্গেরও তেমনি ধারা কোথাও গাঢ়তা কোথাও বিরলতা কল্পিত হইতে পারে। কোনও ঘটনা যদি গাঢ় অংশে থাকে তবে সেটার ঘটিবার সম্ভাবনা না ঘটিবার চাইতে অনেক বেশী; ঘনতার কেন্দ্রে অথবা কেন্দ্রসান্নিধ্যে থাকিলে সেটি এক প্রকার নিশ্চিতই। সম্ভাব্যতার যেটি পূর্ণাঙ্গচিত্র (complete curve) সেটি অবশ্য পূর্ণজ্ঞানেই ব্যবস্থিত। আমাদের চলতিজ্ঞানের আকস্মিক (accidental), বিজ্ঞানের সম্ভাবিত (probable), প্রজ্ঞানের নিশ্চিত বা নিশ্চিতপ্রায় (certain or almost so)—সবই এই চিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া

যাচাই করিতে হইবে। চলতি জ্ঞানের যেটি ব্যাজ, সেটি বিজ্ঞান শোধন করিয়া দেয়; বিজ্ঞানের ব্যাজ শোধন করে প্রজ্ঞান এবং পূর্ণজ্ঞান॥ ১৩।১৪॥১৫।১৬॥

৮। বাধ বাধাজন্যবৈগুণ্যং বিঘ্নঃ॥

উরূর্জ্জিতোজ্জ্বলোৎকর্ষে সীমা যত্র নিরূপিতা।
বৈগুণ্যহানিঃ সিধ্যেত তত্রৈব বিঘ্নবাধনম্॥ ১৭॥
গুণাৎ সংজায়তে বিঘ্নশ্চলচপলচঞ্চলাৎ।
স্তব্ধাস্তমিতধর্ম্মাচ্চ গুণাৎ স্তিমিততাভৃতঃ॥ ১৮॥
উর্ব্বাদীনাং চলাদীনাং স্তব্ধাদীনাঞ্চ সঙ্করাৎ।
বৈগুণ্যং বহুধা জাতং বিঘ্নৌঘ শ্চাপি তজ্জনিঃ॥ ১৯॥
উপমর্দ্দশ্চাপমর্দ্দো বিমর্দ্দশ্চাপি বিক্রিয়াঃ।
পরস্পরানুপাতিত্বে গুণানামসমঞ্জসাঃ॥ ২০॥
অনুপাতঃ স বিজ্ঞেয়ো নির্ব্বিঘ্নশ্চ সমঞ্জসঃ।
উর্ব্বাদীনাং সমুৎকর্ষে য এব সংহতক্রিয়ঃ॥ ২১॥
দৈশিকঃ কালিকশ্চাপি বাস্তবচ্ছান্দসৌ পুনঃ।
ইতি বিঘ্নানাং চত্বারো ব্যুহাবাপ্যাসতে গণাঃ॥ ২২॥
যন্ত্রেণ দৈশিকং বিঘ্নং মন্ত্রেণ কালিকং তথা।
তন্ত্রেণ ছান্দসং নশ্যেদন্ত্রেণ বাস্তবঞ্চ যৎ॥ ২৩॥
যন্ত্রং তন্ত্রঞ্চ বুধ্যস্ব বিদ্যারূপং বিশেষতঃ।
শ্রদ্ধারূপং হি মন্ত্রঞ্চ চান্ত্রমুপনিষদ্ধি যা॥ ২৪॥
ত্রিবেণীসঙ্গমে তাসাং কিংবা প্রণবরূপিণি।
স বিঘ্নপারিপারীণঃ স্নাতনিষ্ণাত এব যঃ॥ ২৫॥
ধনুর্যন্ত্রমিষুর্মন্ত্রং তন্ত্রং সন্ধানপাটবম্।
যদন্তঃস্থং পুনশ্চান্ত্রে তল্লক্ষ্যং পরমুচ্যতে॥ ২৬॥
ত্রিপুরং নিপুরং হিত্বা নাদনূপুরনিক্বণ-।
নিঃশ্রয়ণীং সমারুহ্য নিঃশ্রেয়স-পদং ব্রজ॥ ২৭॥

৮। বাধ ও বাধা নিমিত্ত বৈগুণ্যকে বলে বিঘ্ন॥

[বিঘ্ন = Unharmony Complex]

এ দেশের শাস্ত্রে তিনটি গুণের কথা আছে—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। এর মধ্যে সত্ত্বের লক্ষণ দেওয়া হয়—ইহা প্রখ্যা অথবা প্রকাশধর্মী। নৈসর্গিক সকল বস্তুতেই এই তিন গুণের অনুপাত রহিয়াছে। সে অনুপাতটি স্থির নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল। কোনও পদার্থের সত্ত্বগুণের অনুপাতটি বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, সেটির ব্যাপ্তি বাড়ে। সেটি উর্জিত হয় এবং সেটির উজ্জ্বলতা বা প্রকাশধর্ম বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে পদার্থটির যথার্থরূপে অভিব্যক্তি বা প্রকাশের পথে যে সকল অন্তরায় ছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে বিদূরিত হইতেছে। এইটিকে বলে পদার্থের গুণের বা ধর্মের উৎকর্ষ। কিন্তু প্রশ্ন উঠে এবংপ্রকার উৎকর্ষের সীমা কোথায়? অর্থাৎ, কতটা উৎকর্ষ হইলে আমরা বলিতে পারি যে বস্তুটির যথার্থরূপ প্রকাশ এইবার হইল? যেখানে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা বা শেষ সীমা সেইখানে বৈগুণ্য একান্তভাবে তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং সেখানেই বিঘ্নরূপ অন্তরায় সর্বথা বাধিত হইয়াছে॥ ১৭॥

কিন্তু সত্ত্বগুণ তো একা নাই। সঙ্গে রজোগুণ রহিয়াছে; তার ধর্ম হইতেছে প্রবৃত্তি। রজোগুণ চল, চপল, চঞ্চল স্বভাব। ইহা হইতে ঘোরবৃত্তি বিঘ্ন বা অন্তরায়, সুতরাং বৈগুণ্য ঘটিয়া থাকে। এ দুটি ছাড়া জড়স্বভাব তমোগুণ রহিয়াছে; এই তমোগুণের দ্বারা বস্তু স্তব্ধ, স্তিমিত এবং অস্তমিত এই ত্রিবিধ মূঢ়বৃত্তি বৈগুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৮॥

উরুস্বভাব, চলস্বভাব এবং গুরুস্বভাব এই ত্রিবিধ গুণের পরস্পর মিশ্রণ এবং সে সকলের অনুপাত-বৈচিত্র্যের ফলে বৈগুণ্য বহু প্রকারের এবং তজ্জন্য বিঘ্নরাশিও বহু আকারের সমুদ্ভূত হইয়া থাকে॥ ১৯॥

গুণত্রয়ের পরস্পর মিশ্রণে অসমঞ্জসতা (Disharmony) থাকিলে সঙ্ঘাত ফলে বিক্রিয়া দেখা দেয়। গুণ সকলের পরস্পর অনুপাতে যদি সমঞ্জসতা (Harmony) রক্ষিত হয় তবে অবশ্য সঙ্ঘাতফলে বিক্রিয়া দেখা দেয় না। কোন্ অনুপাতটি সমঞ্জস, কোন্‌টি বা নয়—সেটি অবশ্য ঋত এবং সত্যের আলোকসূত্র (Leading Light)

সাহায্যেই যথাসম্ভব নিরূপণ করিতে হইবে। স্বচ্ছ এবং প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্বগুণের পোষণ এবং প্রভুত্ব হইতে থাকিলে এই অত্যাবশ্যক আলোকসূত্রটি সহজে আমাদের করায়ত্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রজঃ এবং তমঃ এই দুইএর প্রাধান্য থাকিলে চাঞ্চল্য এবং মালিন্যবশতঃ সে আলোকসূত্রটি আমরা একরূপ হারাইয়াই বসি। অসমঞ্জস অনুপাতের ফলে যে বিক্রিয়াগুলি উপস্থিত হয়, সেগুলি উপমর্দ, অপমর্দ এবং বিমর্দ এইভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। 'উপ' কিনা, সমীপে স্থিতিবশতঃ যে মর্দ; 'অপ' কিনা অপনীত করিয়া বা সরাইয়া যে মর্দ; এবং 'বি', কিনা, বিরুদ্ধ বা বিপরীত করিয়া যে মর্দ॥ ২০॥

['চল' = নিয়তগতি (Continuous) দিগ্‌দেশ-কাল-বস্তু-ছন্দঃ সম্পর্কে; 'চপল' = অনিয়তগতি (Discontinuous); 'চঞ্চল' = পূর্বোক্ত দুটির মিশ্রণবশতঃ অব্যবস্থিত (Uncertain)। ঘোরবৃত্তি এই প্রকারে ত্রিবিধ—Continuous Function, Discontinuous Function, Erratic Function হইলেও শেষোক্ত দুইটিতে ঘোররূপতার প্রাবল্য। 'চল' এটি মৌলিক (Basic)। ইহার 'আধারেই' অপর দুটি সম্ভাবিত হইতে পারে। সুতরাং এটিকে 'শূন্য' করিলে ঘোর যেটি সেটি 'অঘোর' হয়। এই শূন্যের সাধন হইল জপকর্ম এবং যোগের সাধন। 'মহানাদ' এবং 'মহাবিন্দু'—এই দুইটিই শূন্যতার সীমা।

'স্তব্ধ' = বেগবান অথচ প্রতিহত (Arrested, Repressed or Suppressed Momentum); 'স্তিমিত' = অপক্ষীয়মাণ বেগ (Reduced Momentum); 'অস্তমিত' = প্রক্ষীণবেগ (Resolved Momentum)। বহির্বিশ্বে 'জড়শক্তি'র অবস্থিতি-পরিস্থিতিতে, প্রাণের ও মনের সর্ববিধ ব্যাপারে (আবেগ-সংস্কারাদির পরস্পর সংঘাতে) এই ত্রিবিধ 'মূঢ়বৃত্তি' নিয়ত উদাহৃত হইতেছে। দিগ্‌দেশ-কাল-বস্তু-ছন্দঃ এগুলি সবই এই মূঢ়বৃত্তি দ্বারা 'আক্রান্ত' অথবা 'আক্রম্য'। তিন প্রকারের মধ্যে 'স্তব্ধ' হইল মৌলিক। ইহার শূন্যীকরণ হয় পূর্ণ প্রতিপক্ষভাবন দ্বারা। 'ভাবন' মানে 'ভাবনা' মাত্র নয়, (৪।১।৩০), উদ্ভাবন = actual creation। প্রতিপক্ষ = প্রতিযোগী = counter-action।] (এ সবের সবিস্তার বিশ্লেষণ পরে আছে।)

উরু, ঊর্জিত (উ+উর্জিত), এবং উজ্জ্বল—প্রণবের 'উ'কার মাত্রা দ্বারা উপলক্ষিত, এই তিনটি গুণের সমুৎকর্ষ হইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে পদার্থের

যথার্থ স্বরূপ খ্যাতি হইতেছে। ইহাকে বলে প্রখ্যা। এইটি সত্ত্বগুণের পরিণাম। কিন্তু এই পরিণামটি হইতে হইলে রজঃ এবং তমোগুণের সহযোগিতা থাকা চাই। রজঃ হইতেছে চল অর্থাৎ প্রবৃত্তিধর্মী। এটি না থাকিলে প্রকৃতির সকল ব্যাপারই অচল হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এটি সঙ্গে না থাকিলে সত্ত্বগুণের প্রখ্যারূপ পরিণামটিও সম্ভবে না। পুনশ্চ তমোগুণও সঙ্গে থাকা চাই। তমোগুণের ধর্ম হইতেছে স্থিতি। কাজেই এ গুণটির একান্ত অভাব হইলে কোনো কিছুই স্থির হইয়া দাঁড়াইবে না, বিরোধী প্রতিপক্ষকে বাধা দিবে না। অতএব দেখিতেছি যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য স্থলেও সেটির অনুগত ভাবে অপর দুটি গুণও বিদ্যমান থাকা চাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে—অনুগত হওয়া অথবা সহকারী হওয়া বলিলে কি বুঝিব? তিনটি গুণের পারস্পরিক যে অনুপাত, সেই অনুপাত একটি বিশেষ সামঞ্জস্যরূপ ধারণ করিলে তবে গুণগুলি 'সংহতক্রিয়' হয়। সুতরাং তার ফলে, উরু, ঊর্জিত এবং উজ্জ্বল এই ত্রিবিধ ধর্মের নির্বিঘ্নে সমুৎকর্ষ ঘটিতে পারে। গুণত্রয়ের অনুপাতে অসমঞ্জসতা নিবন্ধন, যদি তারা ঠিক এই উদ্দেশ্যে সংহতক্রিয় না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে পরিণামটি বিঘ্নসঙ্কুল রহিয়াছে॥ ২১ ॥

[দুইটি দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। রাসায়নিক সংযোগের ক্ষেত্রে এই অনুপাত নিয়মটি বিশেষভাবে সামর্থ্যযুক্ত দেখিতে পাই। দুটি বা তিনটি বা ততোধিক অণুর যে অনুপাতে মিলনে যে অভীষ্ট বস্তু বা ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়, সে অনুপাতের ব্যতিক্রমে সেটি হয় না, এমন কি, তার বিপরীতও হইতে পারে। সংখ্যা এবং অনুপাতই বস্তুর স্বরূপ, গুণ এবং ক্রিয়ার নিয়ামক। মধু এবং ঘৃত কোনও এক প্রকার মিশ্রণে বিষক্রিয় হইতে পারে, অন্য প্রকার মিশ্রণে মেধ্য। শরীরের পাচক রসগুলি যে অনুপাতে নিঃসৃত এবং মিলিত হইলে পরিপাক ক্রিয়ার পক্ষে অনুকূল, অন্য অনুপাতে সেগুলি প্রতিকূল হইতে পারে। বিশ্বের ঘটনাগুলি অবশ্য একটা 'ঋত' অনুসারেই ঘটিতেছে। প্রাকৃতিক যে সকল রেডিয়াম জাতীয় বস্তু তাদের তেজোবিকিরণ (অণু বিশীর্ণ হবার ফলে) নিয়ত ঘটিতেছে, তার ফলে প্রকৃতিতে নূতন প্রকার পদার্থের উদ্ভব হইতেছে, এবং নিয়ত অপক্ষীয়মাণ যে তাপ তারও সমতারক্ষার চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে হইতেছে; এবং এই প্রকার সমতারক্ষার ফলে ধরিত্রীর জীবন একটা নির্দিষ্ট ধারায় অগ্রগতিলাভের সুযোগ পাইতেছে। রেডিয়ামের তেজোবিকিরণ

স্বতঃস্ফূর্ত এবং নিয়ত হইলেও "ভীষণ বিপ্লবী" নয়। প্রকৃতির গতিচ্ছন্দঃ তদ্দ্বারা রক্ষিতই হইতেছে। কোনও কোনও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে (যেমন সূর্য) অণুসমূহের উগ্র বিপ্লবী কাণ্ডও সম্ভবতঃ ঘটিতেছে, কিন্তু তার ফলে ("কসমিক রে" ইত্যাদির বিকিরণে) বিরাট বিশ্বে শক্তি সামঞ্জস্য (Balance of Power) ক্ষুণ্ণ না হইয়া রক্ষিতই হইতেছে। অবশ্য এসব মৃদু অথবা উগ্র বিধান থাকা সত্ত্বেও সম্ভবতঃ বিশ্বের "জরা" আসিতেছে (Entropy or "Universal running down") সেটা ঋতের অনুবর্তনেই। কিন্তু আমরা যখন ইউরেনিয়াম ("লঘু সংস্করণ") অথবা অপর কোনও রেডিয়াম জাতীয় পদার্থের কেন্দ্রীণসত্তাশক্তিটিকে প্রচণ্ড অভিঘাতে চূর্ণ করিয়া ("by fission") তার বিপুল ঘনীভূত শক্তিকে মুক্ত করিতে যাই, তখন (যেমন এটম বোমার ক্ষেত্রে) একটা সর্বধ্বংসী প্রলয় তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়া বসি কেন? কেন্দ্রীণ সত্তায় (নিউক্লিয়াসে) ঐ বিপুল শক্তি রহিয়াছে 'স্তব্ধ' হইয়া। এটি তমোগুণের কাজ। কোনও কোনও রেডিয়াম অণুর একটা নির্দিষ্ট বেগে ও ছন্দে স্বতোবিকিরণ—এটা রজের কাজ। প্রকৃতিতে এ দুয়ের অনুপাত সুসমঞ্জসভাবে রক্ষিত হইতেছে উক্ত ছন্দঃ দ্বারা। উক্ত ছন্দঃ প্রকৃতির বিধানে যে সত্ত্বগুণের প্রভুত্ব, সেই সত্ত্বগুণের দেওয়া। সেই ছন্দের শাসনে প্রকৃতিতে কেন্দ্রীণসত্তাশক্তির আয়-ব্যয়ের অনুকূল অনুপাত রক্ষিত হইতেছে। আমরা 'ফিশন' দ্বারা আণবিক শক্তির বিপুল ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া এই ছন্দের শাসন বর্তমানে লঙ্ঘন করিতেছি। শক্তির 'অবষ্টম্ভক' যে তমোগুণ তাকে প্রবল প্রচণ্ড রজের দ্বারা একেবারেই চূর্ণ করিতেছি। পক্ষান্তরে, সে ঘোর রুদ্রশক্তিকে অঘোর শান্ত করিয়া আত্মবশে আনার কোনও কৌশল (সত্ত্বের সূত্র) এখনও মিলে নাই। হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতিও এই দৃষ্টিতে বিবেচ্য।

প্রাণের ক্ষেত্রে নানা প্রকার 'সিন্‌থেটিক্ পয়জেন' এবং ব্যাকটিরিয়া তাদের স্বভাবস্বচ্ছন্দতার কক্ষচ্যুত করিয়া ব্যাপক সৃষ্টিতে আমাদের মারণকর্মে বিনিয়োগ করিতেছি। প্রকৃতিতে তাদের বিকাশ-প্রবৃত্তি-স্থিতির একটা বিশ্বানুগ ছন্দঃ রহিয়াছে (যেমন, পেনিসিলিন প্রভৃতি এণ্টিবাওটিক ভেষজে)। সেটি আমরা ভাঙ্গিতেছি।

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমূদ্ভবঃ"—কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। আমাদের প্রকৃতিতে এদের সত্যই একটা স্থান ও প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ছন্দের (অর্থাৎ সত্ত্বের) শাসনেই রহিয়াছে। তাদের গতি, স্থিতি এবং পরিবর্তনের

রেখাচিত্রটি (curve) ওই নিয়মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই। নিয়ন্ত্রিত হইলে তারা বৈরী নয়, মিত্র। অন্যথা 'মহাশন' হইলে 'মহাপাপ্মা', সুতরাং ঘোর বৈরী।

অতএব পূর্বে যে ঋত-সত্য-ছন্দের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তাহার শাসনের অনুবর্তনই হইল **মুখ্যভাবে** গুণত্রয়ের 'অনুকূল' অনুপাত, অনুপাত-সমতা। এ সমতা সংখ্যা বা পরিমাণের সমতা নয়। এ ছাড়া যে-কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনুপাতের অনুকূলতা অথবা প্রতিকূলতা যদি বিচার করি, তবে সেটা হয় 'গৌণ'। যেমন ইন্দ্রকে সংহার করা তো স্বভাবের অনুবর্তন নয়। তথাপি কেহ সেই উদ্দেশ্যেই 'ইন্দ্রশত্রু' ইত্যাদি মন্ত্রে হবন করিতে থাকিল। এ ক্ষেত্রে তার কার্যসিদ্ধি হইবে, যদি ওই মন্ত্রাদির স্বরাদিগত 'সমতা'টি (appropriateness) রক্ষিত হয় তবেই। নচেৎ উল্টা উৎপত্তি। সুতরাং 'সংহতক্রিয়' মানে শুধু একযোগে কাজ করা নয়, ব্যূহরূপে (as organised according to plan) কাজ করা। ব্যূহ বলিলে কোনটি তার কেন্দ্রে, কোনগুলি পৃষ্ঠে পার্শ্বে ইত্যাদি ভাবে শক্তি সংস্থান ও বিন্যাসের একটা নিরূপিত রূপ (definite picture) বুঝিতেই হয়।

বিঘ্নসমূহকে আবার সমষ্টির দিক দিয়া তিন ভাবে বলা যাইতে পারে—ওঘ, গণ এবং ব্যূহ। 'ওঘ' অর্থে সাধারণ ভাবে সমষ্টি; 'গণ' অর্থে দলবদ্ধভাবে সমষ্টি, এবং 'ব্যূহ' অর্থে ব্যূহবদ্ধভাবে (কোন কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া কোন এক কৌশলে) সমষ্টি। অন্যভাবে দেখিতে গেলে বিঘ্ন চারি প্রকার—দৈশিক, কালিক, ছান্দস এবং বাস্তব। এই সকল প্রকার বিঘ্নকে জড়াইয়া যেটি হয়, সেটিকে এক কথায় বলা যায়—বিঘ্ন সন্দোহ॥ ২২॥

যন্ত্রের দ্বারা দৈশিক বিঘ্ন নাশ করিবে, মন্ত্রের দ্বারা কালিক বিঘ্ন, তন্ত্রের দ্বারা ছান্দস বিঘ্ন এবং অস্ত্রের দ্বারা বাস্তব বিঘ্ন নাশ করিবে॥ ২৩॥

যন্ত্র এবং তন্ত্রকে বিশেষভাবে বিদ্যারূপ বলিয়া জান, মন্ত্রকে শ্রদ্ধারূপ এবং অস্ত্রকে উপনিষদ্‌রূপ বলিয়া জান॥ ২৪॥

এই বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষদ্‌রূপ ত্রিবেণী-সঙ্গমে অথবা এই তিনের প্রতিনিধি প্রণবে যিনি স্নান করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন, তিনি বিঘ্নপারাবার গোষ্পদের ন্যায় পার হইতে পারগ বা ক্ষম॥ ২৫॥

যন্ত্র হইতেছে ধনুঃ, মন্ত্র, শর, তন্ত্র, সন্ধানপটুতা, এবং অস্ত্রে, কিনা,

একেবারে অন্তস্তলে যে বস্তুটি রহিয়াছেন সেই বস্তুটিকেই পরম লক্ষ্য বলিয়া জানিবে॥ ২৬॥

সত্ত্বাদি গুণত্রয়রূপ অথবা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়রূপ যে ত্রিপুর, সেটিকে পরিহার কর, অর্থাৎ তাতে তাদাত্ম্য বুদ্ধি রাখিও না। নিপুর, অর্থাৎ অবয়ববিশিষ্ট যে লিঙ্গশরীর তাকেও ঐভাবে পরিহার কর। নাদ-নূপুর-নিক্কণ-মুখরিত যে সাধনের সোপান শ্রেণী সেই সোপান সমারোহণ পূর্বক নিঃশ্রেয়স পদ লাভ কর॥ ২৭॥

৯। ব্যাজবিধ্বস্য ছদ্মত্বম।

আদাবৃতঞ্চ সত্যঞ্চ তপসোঽধ্যজায়ত।
ঋতেন ত্বনভিষ্বক্তং সত্যং ন স্পন্দিতুং ক্ষমম্॥ ২৮॥
স্পন্দাভাবে ন চাবিষ্ট্বং ব্যোমত্বাদিজনিঃ পুনঃ।
অসঙ্গো তু বিনা সঙ্গাং স্পন্দঃ প্রসজ্যতে কুতঃ॥ ২৯॥
স আসঙ্গো হি কামো যঃ সূক্ত আথর্ব্বণে শ্রুতঃ।
আসঙ্গো সত্যভিষ্বঙ্গা শ্চানুষঙ্গাজনিস্তু যঃ।
দ্বৈতং সম্পুটিতং যস্মিন্ দ্বে বীজে চণকে যথা॥ ৩০॥
শক্যনির্ব্বচনং দ্বৈত মভিষ্বঙ্গো ন বৈ ত খা।
মায়াবীজমিমং বিদ্ধি হরৌ স্তো যত্র গর্ভিতৌ॥ ৩১॥
নিঃস্পন্দঃ খনিভো হশ্চ সম্পন্দো রোহি বহ্নিবৎ।
ঈকারেণ সমীক্ষেতে নাদবিন্দুবিলক্ষণৌ॥ ৩২॥
আদাবসঙ্গামদ্বৈত মবাঙ্‌মনসগোচরম্।
বহুস্যামিতি কামে ত্বসঙ্গাস্যাসঙ্গাতাগতিঃ॥ ৩৩॥
কামবীজ মেবাসঙ্গাং লীলাবীজবিকল্পকম্।
বিদ্ধি তস্মাদভিষ্বঙ্গা স্ততোঽনুষ্বঙ্গা ইষ্যতে॥ ৩৪॥
অসঙ্গো তু ন বেধোঽস্তি নাপ্যাসঙ্গো স্ফুটক্রিয়ঃ।
অভিষ্বঙ্গো হি বেধস্য প্রাপ্তাবকাশতা ভবেৎ॥ ৩৫॥
আসঙ্গো জায়ত আবির্দ্বন্দ্বস্থত্বং ততোঽপি চ।
দ্বন্দ্বারনিরোধিকা রাত্রি র্যা সর্ব্বাম্নায়-গোপিতা॥ ৩৬॥

উদারবৃত্তিতাং প্রাপ্য চৈকেনান্যন্ নিরুধ্যতে।
স্বেতররোধভেদাচ্চ রোধিকাপি ভবেদ্দ্বিধা॥৩৭॥
ব্রহ্মাস্মীতি বৃণদ্ধীমান্ বোধঃ শোকাদিবিভ্রমান্।
চরমবৃত্তিতাকারো রুন্ধে স্বমপি যঃ সকৃৎ॥৩৮॥
রোধপ্রসক্তিরাসঙ্গাদ্ বোধোঽভিষ্বঙ্গতঃ পুনঃ।
রোধো বোধায়তে ক্বাপি বেধো যাতি বিবিক্ততাম্॥৩৯॥
ব্যাজবিদ্ধত্বমাপন্নে ছন্দো ভ্রশ্যতি বক্রগম্।
রোধবেধক্ষমং স্যাত্তু ধৃতবজ্রতনুচ্ছদম্॥৪০॥
বেধমূষিকমন্বিয্যোরগশ্চলতি বক্রগঃ।
অহিঞ্চ বাধতে বর্হী স্কন্দশ্ছন্দোগ-বাহনঃ॥৪১॥

৯। ব্যাজ দ্বারা যেটি বিশ্ব তাহাকে বলে ছদ্ম।

[Hypothetical and uncertain Harmony)

ব্যাজের লক্ষণ পূর্বে করা হইয়াছে। এখন বুঝিতে হইবে তাহার দ্বারা বিদ্ধ হওয়া মানে কি? বেদ বলিতেছেন আদিতে তপস্যা হইতে ঋত এবং সত্য জাত হইলেন। বেদ ঋত এবং সত্যের উল্লেখ করিতে গিয়া দুইবার 'চ'-কারের প্রয়োগ করিলেন। এই প্রকার প্রয়োগের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ঋত এবং সত্য পরস্পরের সঙ্গে কোন এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে যেন আবদ্ধ হইতেছেন। শিব ও শক্তি যেমন পরস্পরের আলিঙ্গানপাশে বদ্ধ, ঋত এবং সত্যও তেমনিধারা। অথচ পরস্পরের এই সঙ্গটিকে ধারণায় আনা যায় না এবং ভাষাতেও প্রকাশ করা যায় না। বন্ধন বা আলিঙ্গান যেটি আসলে বুঝার নয় সেটিকে কোন গতিকে কোন সঙ্কেতের দ্বারা বুঝার একটা বিফল প্রয়াস মাত্র। যে মহা রহস্য আমাদের বুদ্ধি ও বাক্যের পরপারে রহিয়াছে সেটিকে বুদ্ধি ও বাক্যের ব্যবহারের গণ্ডীতে কোন না কোন ফিকিরে আনিতে চাই; অথচ ঠিক আনিতে পারিও না। এই প্রয়াস করিতে যাইয়া কতকগুলি লক্ষণ, নিরুক্তি, প্রতীক এবং সঙ্কেতের আশ্রয় লইতে হয়। এখন দুইটি 'চ'-কার প্রয়োগ করিয়া বেদ ঋত ও সত্যের মধ্যে যে পারস্পরিক সঙ্গের কথা আমাদের বলিলেন সেটিকেও কোনও এক প্রতীক বা সঙ্কেতের সাহায্যেই আমাদের ধারণা করিতে হয়। আদিম বস্তু 'ন

রেমে' অথবা 'ভয়ঞ্চকার'—তিনি সুখ পাইলেন না অথবা যেন ভীত হইলেন—সুতরাং তিনি অদ্বিতীয় এক হইয়াও মিথুন হইতে ইচ্ছা করিলেন। ইহা দ্বারা যেটি অসঙ্গ তাহাতে সঙ্গের ইচ্ছা হইল, ইহাই আমাদের মনে করিতে হয়। কিন্তু অসঙ্গ হইতে সঙ্গ যে কি প্রকারে আসিতে পারে তার কোন নিরুক্তি আমরা দিতে অপারগ। কেন না, সঙ্গ দেখা দিবার পরই বুদ্ধির ব্যাপার আরম্ভ হইতে পারে, তার পূর্বে নয়। ঋত এবং সত্যের এই অনিরুক্ত সঙ্গটিকে আমরা "অভিষ্বঙ্গ" নাম দিয়াছি। এই অভিষ্বঙ্গটি যতক্ষণ পর্যন্ত না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত যেটি সত্য তাতে স্পন্দ অথবা স্পন্দনের সম্ভাবনা হয় না। আনন্দলহরী-স্তব যেরূপ বলিয়াছেন যে শক্তি বিনা শিব একটুও নড়িতে চড়িতে অক্ষম, সেইরূপ ঋতের অভিষ্বঙ্গ বিনা সত্যের কোনরূপ স্পন্দ সম্ভব হইতে পারে না॥ ২৮॥

স্পন্দ বলিতে কি বুঝিব? স্থূলে যেটিকে স্পন্দন (vibration) রূপে দেখিতেছি, সেটি এবং সৃষ্টির গোড়াকার এই স্পন্দ এক বস্তু নয়। বাইরের স্পন্দনের বেলায় দেশ, কাল ও নিমিত্তের অপেক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু যে মূল স্পন্দনের কথা হইতেছে তাতে সে অপেক্ষা নাই। সত্য যখন ঋতের সংসর্গে স্পন্দিত হইল, তখন দেশই বা কোথায়, কালই বা কোথায়, নিমিত্তই বা কোথায়? অথচ সঙ্গ বলিতে কিসের বা কাহার সঙ্গ—এ জিজ্ঞাসা করিতেই হয়। সেই অপরটি কি? এক অদ্বিতীয় আত্মা ছাড়া অপর যখন আর কিছুই নাই, তখন মনে করিতে হইবে যে সেই এক আত্মাই আপনাকে যেন 'পর' করিয়া দেখিতেছেন। আমাদের অনুভবের দৃষ্টান্তে বুঝিতে গেলে যেন এই ভাবে বলিতে হয়—আমার যেটি সমগ্র বোধ সেইটিকে 'আমি' বলিয়া মনে করিতেছি। পরক্ষণেই 'আমি'র সাক্ষিস্বরূপ 'আমি' হইয়া আমার বোধ বিষয়গুলিকে দৃশ্য (obejct) রূপে, সুতরাং 'আমি নয়' এই ভাবে দেখিতেছি। এ স্থলে এক অখণ্ড 'আমি' যেন নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া একজন দ্রষ্টা বা সাক্ষী 'আমি' হইতেছে এবং অপর 'আমি'টাকে যেন দৃশ্য করিয়া, পর করিয়া দেখিতেছে। এইটি 'আমি'র আপনাকে 'বলি'। ইহাই আদি যজ্ঞ। এই প্রকার 'আত্ম' এবং 'পর'—এই দ্বৈত আশ্রয় করিয়াই বিশ্বের মূল সঙ্গ এবং স্পন্দ সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গ মানে এবংপ্রকার দ্বৈতলেশ। 'লেশ' বলা হইতেছে এই জন্য যে এখন পর্যন্তও 'অহং'এবং'ইদং' পরস্পরের সঙ্গে যেন আলিঙ্গিত হইয়া রহিয়াছে,

যেমনধারা চানার বীজের মধ্যে তার দুইটি দানা একই আবরণে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত থাকে। এ প্রকার দ্বৈত সমানাধিকরণ; ব্যধিকরণ নয়। এই প্রকার সঙ্গ অথবা দ্বৈতলেশ দেখা দিলেই স্পন্দের সম্ভাবনাটি ঘটিয়া থাকে, অন্যথা নহে। পুনশ্চ, যতক্ষণ স্পন্দ না ঘটিতেছে ততক্ষণ আদিম বস্তুর যেটি 'আবিঃ', কিনা বিশ্বতোমুখ অভিব্যক্তি সেটি সম্ভবে না, সুতরাং ব্যোম, বায়ু ইত্যাকার আবির্ভাবগুলিও সম্ভবপর হয় না॥ ২৯॥

কোন অনির্বচনীয় কারণে বা রীতিতে অসঙ্গ হইতে সঙ্গ না হয় হইল, কিন্তু যে "অভিষ্বঙ্গ" সম্বন্ধের কথা আমরা বলিতেছি, সেটি কি সঙ্গের একেবারে আদিম অবস্থা? না, তাহা নয়। ইহার পূর্বে 'আসঙ্গ' বলিয়া আর এক অবস্থা আছে মনে করিতে হইবে। সুষুপ্তি অথবা গাঢ় মূর্চ্ছায় অজ্ঞানের ভান হইয়া থাকে। সুষুপ্তিতে সুখেরও ভান হইয়া থাকে। কিন্তু সুষুপ্তির অবস্থা—যার ভান এবং যেটির ভান, সেই দুইটি এরূপ ভাবে জড়াইয়া থাকে যে দুটিকে দুইটি বলিয়া ভানই হয় না। এমন কি চৈতন্য তৎকালে নিজেকে সাক্ষী এবং সাক্ষি-ভাস্য এই ভাবে দুই করিয়া দেখে না। আমাদের জাগ্রৎ অবস্থাতেও এইরূপ। যেমন, সম্মুখে একটা বৃক্ষ দেখিতেছি। যতক্ষণ তদ্গত হইয়া দেখিতেছি ততক্ষণ বৃক্ষটি আমার জ্ঞেয় এবং আমি তার জ্ঞাতা এই ভাবে অনুভবটির বিভাগ করি না। তখন ঐ বৃক্ষটিই অনুভব। যখন অনুভবটি সম্বন্ধে মনন করি (অর্থাৎ সে সম্বন্ধে কোন judgment হয়) অথবা সে সম্বন্ধে যখন কিছু বলিতে যাই (discourse) তখন অবশ্য জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানকে আলাদা করিয়া ভাবিতে এবং বলিতে হয়। পুনশ্চ, সূর্যে তাহার তেজ এবং অগ্নিতে তাহার দাহিকা শক্তি কি ভাবে রহিয়াছে—ভাবিয়া দেখ। এসব স্থলেও বলিতে গেলে "সূর্যের তেজ" অথবা "অগ্নির দাহিকা শক্তি" এইভাবে পৃথক করিয়া বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা পৃথক কোথায় ও কিভাবে? এই সব দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা বুঝিতে পারি যে চানার মধ্যে তার দুইটি বীজের একত্র অবস্থানের চাইতেও আরো সূক্ষ্মতর এক প্রকার সঙ্গ আছে। সেই প্রকার সঙ্গকে আমরা 'আসঙ্গ' নাম দিতেছি। এই 'আসঙ্গে' কি দ্বৈত আছে অথবা নাই এই প্রশ্নের 'হাঁ' অথবা 'না' কোন উত্তরই দেওয়া যায় না। অদ্বৈত এবং দ্বৈতের একটা অব্যক্ত সন্ধির মতো যেন এটা। সন্ধিরেখার একদিকে দ্বৈত মোটেই নাই, অপরদিকে দ্বৈত দেখা দিতেছে। মাঝখানে

এ অবস্থাটিও অবাঙ্মনসগোচর। সন্ধিরেখাটি বা কোথায় টানিতেছি? দেশে? না। কালে? না। বস্তুতে? না। সম্বন্ধে? না, তাও না। কেননা, যেটি সকল সম্বন্ধাতীত (Alogical Absolute), সেটি সম্বন্ধভাক হইতেছেন, সম্বন্ধে 'অবগাহন' করিতেছেন (Logical হইতেছেন), এই পরমাশ্চর্য রেখাটি পার হইয়াই। 'আ' এই উপসর্গ, সঙ্গে মর্যাদা এবং অভিবিধি এ দুইএরই ইঙ্গিত করিতেছে। এই অবধি অথবা এইখান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বৈতের এবং সম্বন্ধের উৎপত্তি হইতেছে, এই একটা ইঙ্গিত। এবং এখান হইতে যাহা কিছু জন্মাদি হইতেছে সে সমস্তই ব্যাপিয়া দ্বৈত সম্বন্ধ রহিয়াছে, এইটি অপর ইঙ্গিত। অথর্ব বেদের কামসূক্তে যে বস্তু 'কাম' এই নামে উক্ত হইয়াছেন, তিনি সৃষ্টির আদিভূত এই আসঙ্গা।

'সোঽকাময়ত' এই বলিয়া শ্রুতি অসঙ্গা ব্রহ্মে এই আসঙ্গোর প্রসঙ্গাই করিতে চাহিয়াছেন। এটি অচিন্ত্যভেদাভেদের অচিন্ত্য মূল। এই আসঙ্গোর এক রূপ ব্যাসঙ্গা। এই ব্যাসঙ্গা অবস্থায় আত্মা নিজেই নিজের সঙ্গা পাইয়া যেন জাগরূক হয়। জাগরূক হইয়া যেন নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করে—এই তো আমি একাই রহিয়াছি, অপর কেহ বা কিছু তো নাই। এস্থলে আত্মাই স্বয়ং সাক্ষী এবং স্বয়ং সাক্ষি-ভাস্য। 'ব্যাসঙ্গা' এই কথাটির আদিতে যে 'বি' রহিয়াছে, সেটি 'আবিঃ'র 'বি' তো বটেই, তাছাড়া সেটি বিবিক্তলক্ষণে যে 'বি' তাই। বিবিক্তলক্ষণ মানে যেটি আপনাকে বিবিক্ত, কিনা, স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতেছে, অন্য কিছুর সহিত কারক সম্বন্ধ জড়াইয়া দেখিতেছে না। ব্যাসঙ্গোর এই পরিভাষা স্মরণযোগ্য।

তারপর আসঙ্গা হইতে 'অভিষ্বঙ্গা', যার কথা আমরা আগে আলোচনা করিয়াছি, ইহাতে চণকের বীজের দুইটি দানার মত দ্বৈত সম্পুটিতভাবে বিদ্যমান থাকে। এই 'অভিষ্বঙ্গা' হইতে আবার 'অনুষ্বঙ্গা' এবং 'প্রতিষ্বঙ্গা' আসিয়া থাকে। এদের কথা পরে আলোচিত হইবে॥ ৩০॥

দ্বৈত পরিস্ফুট হইলে নির্বচনযোগ্য হয়, অন্যথা হয় না। অভিষ্বঙ্গো দ্বৈত পরিস্ফুট নহে। সুতরাং অভিষ্বঙ্গা নির্বচনের অযোগ্য, অনির্বচনীয়। ইহাকে মায়া বীজ 'হ্রীঁ' বলিয়া জান্—যে বীজে হকার এবং 'র'কার গর্ভিত হইয়া আছে॥ ৩১॥

স্পন্দহীন আকাশের মত 'হ'কার, সম্পন্দ বহ্নির মত 'র'কার। এই 'হ'কার এবং 'র'কার নাদ এবং বিন্দু দ্বারা বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়া 'ঈ'কারের দ্বারা এই

বিশ্ব-প্রপঞ্চকে সম্যক্‌রূপে ঈক্ষণ করিতেছে। অর্থাৎ 'হ'কারের সঙ্গে নাদ-শক্তি এবং 'র'কারের সহিত বিন্দু-শক্তি সংযুক্ত হইয়া যেটি নিস্পন্দ সেটিকে সম্পন্দ করিয়া তোলে এবং তাহারই ফলে বিশ্বসৃষ্টিরূপ যে ঈক্ষণ সেটি সম্ভাবিত হইয়া থাকে॥৩২॥

বলা বাহুল্য যে মূলে অসঙ্গা অদ্বৈত, যেটি অবাঙ্‌মনসগোচর। তাহাতে অনির্বচনীয় রূপেই আবার 'বহু হইব' এই প্রকার কাম উদিত হইয়া থাকে—যে কাম 'আসঙ্গা' এই নামে অভিহিত হইতেছে॥৩৩॥

এই 'আসঙ্গা' হইতেছে কাম বীজ 'ক্লীঁ'। এই কামকে আবার লীলারূপে দেখিলে আমরা আর দুইটি বীজ পাই, "শ্রীঁ" এবং "ঐঁ"। লীলার অভিব্যক্তির দুইটি দিক—একটি হইতেছে অনন্ত জ্ঞানৈশ্বর্য, অপরটি হইতেছে অপূর্ব রচনা-সৌষ্ঠব। প্রথমটি মহাসরস্বতী, অপরটি মহালক্ষ্মী। "আসঙ্গা" হইতে "অভিষ্বঙ্গা" এবং "অভিষ্বঙ্গা" হইতে "অনুষ্বঙ্গা" এবং "প্রতিষ্বঙ্গা" হয়, ইহা জানিবে। যে স্থানে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধটি গাঢ় এবং পরস্পরের অনুগত, সে স্থলে 'অনুষ্বঙ্গা' বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর যে স্থলে পরস্পরের সম্বন্ধ গাঢ় হইয়াও পরস্পরের প্রতিযোগিতা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে, সে স্থলে 'প্রতিষ্বঙ্গা'। অনেক স্থলে 'অনুষ্বঙ্গা' এবং 'প্রতিষ্বঙ্গা' যুগপৎ বিদ্যমান থাকে। যেমন শিষ্য গুরুর সমীপে যখন কোন মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে, তখন সেই মন্ত্রে শিষ্যে আগ্রহশক্তি এবং গুরুর অনুগ্রহশক্তি অনুষ্বঙ্গা সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শিষ্যের নিজের ভিতরে যে সমস্ত বিরোধী সংস্কার রহিয়াছে, সেগুলির শক্তি সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতাও (reaction) সৃষ্টি করিতে থাকে। এইগুলি বন্ধন-সংস্কার, অনাদি ও প্রবল। এগুলিরও ক্রিয়া করিবার একটা নিজস্ব ছন্দঃ আছে। সে ছন্দঃ হইতেছে সাধন সম্বন্ধে বিষচ্ছন্দ ও অরিচ্ছন্দ। শিষ্যের সাধনশক্তির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ গাঢ়, অথচ সেটি অনুগত, অনুকূল নহে; এই প্রকার সম্বন্ধকে 'প্রতিষ্বঙ্গা' বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত 'অনুষ্বঙ্গা'টি বলবান হইলে এ প্রতিষ্বঙ্গা-নিমিত্ত যে বাধা বা অন্তরায় উপস্থিত হয়, সেটি অশুভের নিমিত্ত না হইয়া শুভের নিমিত্তই হইয়া থাকে। অর্থাৎ বন্ধন-সংস্কারগুলির বেগ হইতে যে বাধা উপস্থিত হয়, সে বাধা দূর করিবার নিমিত্ত শিষ্যের আগ্রহ বা সাধনশক্তি আরো উদ্দীপিত হইয়া ওঠে এবং সেটি যে পরিমাণে উদ্দীপিত হইয়া ওঠে, সেই পরিমাণে গুরুর

অনুগ্রহশক্তিও সজাগ হইয়া তার সহায় এবং সুহৃৎ হইয়া থাকে। এই হেতু 'প্রতিম্বঙ্গা' মাত্রেই অশুভ নয়, পরিপন্থী নয়॥৩৪॥

লক্ষ্য কর যে আসঙ্গের যেটি 'স' তাতে 'ব' ফলা নাই 'অভিম্বঙ্গা' ইত্যাদিতে 'স'কারে 'ব'ফলা রহিয়াছে। এই 'ব'টিকে বুঝিতে চেষ্টা কর। 'সঃ' বলিলে সে বুঝায় কিন্তু 'স্ব' বলিলে নিজেকে বুঝায়। প্রথমটিতে সেটিকে আমরা অনেকের ভিতর একটা মাত্র করিয়া দেখিতেছি, তাকে বিশেষভাবে বা গভীরভাবে তলাইয়া দেখিতেছি না, তার যেটি নিজস্ব বা স্বভাব সেটি সম্বন্ধে আমরা তৎকালে উদাসীন। কিন্তু যখন 'স্ব' বলিলাম, তখন তার নিজস্ব বা স্বভাবই আমাদের অভিনিবেশের বিষয়ীভূত হইল। এইভাবে 'অয়ং' এবং 'স্বয়ং' এই কথা দুইটিকেও ভাবিয়া দেখ। 'আহা' বলিলে একটা বিস্ময় প্রকাশ করি মাত্র, কিন্তু 'স্বাহা' বলিলে প্রাণের সেই মুখ্য ব্যাপারটি বুঝায় যদ্দ্বারা এই বিশ্বযজ্ঞে সর্ববিধ আহুতি অর্পিত হইতেছে। প্রণবের মধ্যে যে 'উ'কার রহিয়াছে, তাঁর সঙ্কোচনে 'ব'কার, সম্প্রসারণে সেটি আবার 'উ'কার। 'ব'কারের দ্বারা এই সঙ্কোচন বৃত্তি সূচিত হয়। আসঙ্গে 'ব'কার নাই, সুতরাং তাতে কোনওরূপ সঙ্কোচন বৃত্তি এখনও দেখা দেয় নাই। অভিম্বঙ্গাদিতে 'ব'কার আছে, কাজেই এসব ক্ষেত্রে সঙ্কোচনও কোনো না কোনো আকারে ঘটিতেছে। সঙ্কোচনের ফলে যেটি অসীম তাতে সীমা বা গণ্ডী দেখা দেয়। সুতরাং অখণ্ড ব্যাপক বৃত্তির স্থলে অবচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন বৃত্তি দেখা দিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনও সত্তা অথবা শক্তি অখণ্ড ব্যাপক বৃত্তিতে রহিয়াছে, ততক্ষণ সেটি আর কিছুকে বিদ্ধ করে না, অথবা অপর কিছুর দ্বারা সেটি বিদ্ধও হয় না। ততক্ষণ সেটি অমৃত ও বজ্র। অসঙ্গ অবস্থায় বেধ ঐকান্তিক নাই। 'আসঙ্গা' অবস্থায় বেধের নৈকটিক সম্ভাবনা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেটি এখন পর্যন্ত বাস্তববৃত্তিতায় স্ফুটক্রিয় হয় নাই। অভিম্বঙ্গে বেধ প্রাপ্তাবকাশ হয়, অর্থাৎ তখন আর বেধ বা বিদ্ধ হওয়া অথবা বিদ্ধ করার সম্ভাবনা মাত্র নয়॥৩৫॥

['বেধ' কি বস্তু'? 'পাপ্মা বিদ্ধ' 'অসুরবিদ্ধ' ইত্যাদিতে যে বেধ লক্ষিত হইতেছে, সেটি আসলে কি? দুইটি বস্তুর, ধর, ক ও খ এর, পরস্পর নিকট সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। তার ফলে ক'এর সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং ধর্ম যেন 'খ'এর মধ্যে আপনাদের 'প্রবিষ্ট' করিয়া দিতেছে। ক এবং খ দুটি 'বৃত্ত' যেন কেবল স্পর্শমাত্র

না করিয়া পরস্পরকে ছেদ করিতেছে। ফলে, 'ক'এর সত্তাদির 'খ'তে সংক্রমণ এবং 'খ'এর সত্তাদির 'ক'তে সংক্রমণ হইতেছে। বিপরীত তাড়িতপূর্ণ দুটি মেঘে তড়িতের আদান-প্রদান হইল, তারপর তারা যেন অংশতঃ অথবা সর্বতোভাবে মিলিয়া এক হইয়া গেল। রাসায়নিক সংযোগাদির স্থলেও অণুগুলির (এমন কি, তাদেরও সূক্ষ্মতর উপাদানগুলির) এই ভাবে পরস্পরের পুরাতন 'ব্যূহভেদ' এবং নূতন 'ব্যূহরচনা' ব্যাপারটি ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই। তাছাড়া 'রাসায়নিক চাপ' (Osmotic Pressure) বলিয়া একটা ব্যাপারও লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাণীর রাজ্যেও এইপ্রকার নূতন ব্যূহসৃষ্টি ব্যাপারটি অহরহঃই ঘটিতেছে। পুংবীজ এবং স্ত্রীবীজের সম্মিলনে যে প্রজনন হয় তা তো এই বেধেরই ব্যাপার। মানস ক্ষেত্রে এই বেধের দৃষ্টান্ত সহজেই মিলিবে। স্পষ্ট চেতনাতেও যেমন, মগ্ন বা অবচেতনাতেও তেমনি বেধ (Interference, penetration ইত্যাদিরূপে) নিয়তই ঘটিতেছে। সত্ত্বের কাজ হইল ভাব ও সংস্কারগুলিকে (শুদ্ধ ও মলিন উভয়ই) পরস্পর হইতে আলাদা করিয়া 'শুদ্ধ' ভাবে উপস্থিত করা, রজঃ তাহাদিগকে (বক্রগতিতে) পরস্পরের 'ঘাত' এবং 'প্রতিঘাত' দেওয়ানোতে প্রবৃত্তি দেয়। ফলে, বেধ এবং পরস্পরের গ্রন্থি বা 'গাঁঠ' সৃষ্টি হইয়া থাকে। তমঃ সে গাঁঠগুলি আড়ষ্ট করিয়া রাখে, খুলিতে দেয় না।

দুইটি বৃত্তের সাদৃশ্য লইয়া বেধকেও আমরা চারি ভাগে ভাগ করিতে পারিঃ—(১) স্পর্শবেধ (touching), (২) অবচ্ছেদবেধ (intersecting), (৩) তাদাত্ম্যবেধ (coinciding), এবং (৪) গর্ভিত বা অন্তর্ভাববেধ (falling within)। সর্বক্ষেত্রেই এদের দৃষ্টান্ত মিলিবে। যেমন, ওঙ্কারের ধ্বনি শুনিতেছি। অন্য কোনো শব্দ হয় (১) তাকে স্পর্শমাত্র করিয়া যাইতেছে, নয়তো (২) সে ধ্বনি ছেদ করিতেছে, কিংবা (৩) সেই ধ্বনিতেই মিলিত হইয়া এক হইয়া যাইতেছে, অথবা (৪) সেই ধ্বনির গর্ভেই যেন স্থান পাইতেছে। শব্দাদির মূলে যে ঊর্মিভঙ্গী (wave pattern), সেটিরও চতুর্বিধ অবস্থা ঘটিতে পারে। পুনশ্চ, অভিষ্বঙ্গের বেলা যেমন, এ স্থলেও তেমনি 'অনুবেধ' ও 'প্রতিবেধ' আমরা ভাবিতে পারি। যে বেধের ফলে 'ক' ও 'খ'-এর সত্তাদির পারস্পরিক 'সমৃদ্ধি' (summation and progression) হয়, তাকে 'অনুবেধ' বলিব, আর যার ফলে, পরস্পরের 'কুণ্ঠা ও কার্পণ্য' (detraction and distortion) ঘটে, তাকে 'প্রতিবেধ' বলিব। অনুষ্বঙ্গ এবং প্রতিষ্বঙ্গের বেলা যেমন,

এস্থলেও তেমনি অনুবেধ মাত্রই শ্রেয়স্কর এবং প্রতিবেধ মাত্রই বিপরীত—এটি মনে করিলে ভুল হইবে। যেমন ধর—মন্ত্র জপ। বৃক্ষলতাদির মতো মন্ত্রেরও শৈশব, তারুণ্য এবং জরা সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক নিয়মেই উপস্থিত হইয়া থাকে। 'শিশু' মন্ত্রের একটা স্বাভাবিক দৌর্বল্য এবং কুণ্ঠা। সাধনের দ্বারা তার (দৌর্বল্যের) বিবৃদ্ধি হইলে শিশু শুধু শিশু রহিবে না, 'মরিয়া' যাইবে। অতএব সাধনের ফলে মন্ত্রের শৈশব-দৌর্বল্যের 'প্রতিবেধ' হওয়াই আবশ্যক, অনুবেধ নহে। মন্ত্রের 'জরা' আসিতেছে বুঝিলেও প্রতিবেধ। পরে, কোনও কোনও সূত্রে তল, লম্ব এবং বেধ এই তিনটি আমাদের সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে।]

অসঙ্গো আসঙ্গা দেখা দিলে পর বিশ্বতোমুখ যে আবিঃ সেটি দেখা দেয়। কিন্তু যেহেতু আবিঃ বিশ্বতোমুখ এবং বিশ্বও দ্বৈত ব্যতীত সম্ভবে না, সেই হেতু আবিঃ দেখা দিলেই তার সঙ্গো সঙ্গো একটি দ্বন্দ্বভাব (Polarity Principle) দেখা দিয়া থাকে। রহস্য ভাষায়, এটি 'মিথুন' অথবা যুগ্ম। এই যুগ্ম তত্ত্বের (Polarity) ফলে 'আবিঃ' আর কেবল 'আবিঃ' রহে না, সেটি হয় 'আবিঃ' এবং 'রাত্রি'। 'আবিঃ' হইতেছে প্রকাশরূপ এবং 'রাত্রি' হইল নিরোধরূপ। এই নিরোধিকা রাত্রি বেদাদিতে গোপিতা (গুপ্তা) হইয়াছেন॥ ৩৬॥

বিশ্বে এই বিকাশ এবং নিরোধশক্তি পরস্পরের অপেক্ষা করিয়া ক্রিয়া করিতেছে। বিকাশশক্তির ফলে যেটির উদারবৃত্তি হইতেছে, নিরোধশক্তির দ্বারা সেটির আবার সংকোচাদিও ঘটিতেছে। একান্তভাবে উদারবৃত্তির কোন কিছুই হইতেছে না, পক্ষান্তরে, কোনো কিছুই আবার বিশ্বে একান্তভাবে নিরুদ্ধ হইয়া নাই। দেশ সম্বন্ধে, কাল সম্বন্ধে এবং নিমিত্ত সম্বন্ধে এই বিকাশ নিরোধের যে অনুপাত তদ্দ্বারাই বিশ্বের এবং বিশ্বান্তর্গত যাবতীয় বস্তুর অবস্থিতি, পরিস্থিতি নিরূপিত হইতেছে। প্রকাশিকা যেমনধারা আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে তেমন আবার অপরকেও প্রকাশ করিতে পারে, নিরোধিকাও তেমনিধারা আপনাকে নিরোধ করিতে পারে অথবা অপরকেও নিরোধ করিতে পারে। সুতরাং এটিও স্বনিরোধিকা অথবা অন্য-নিরোধিকা এই ভাবে দ্বিবিধ॥ ৩৭॥

একটা দৃষ্টান্ত লও। যখন "ব্রহ্মাস্মি" এই বোধটি হয়, তখন সেই বোধ শোকাদি বিভ্রম সমূহকে একান্তভাবে রোধ করিয়া থাকে; আবার যেহেতু এই বোধটি চরম বৃত্তি সুতরাং সেটি উৎপন্ন হইয়াই নিজেকেও রোধ করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত 'আমি ব্রহ্মই'

এই বৃত্তিটি রহিয়াছে অথবা এবংবিধ অন্য কোনও বৃত্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ আমার ব্রহ্মস্বরূপতা হয় নাই। একান্তভাবে সকল বৃত্তির নিরোধ বা শূন্যতা না হইলে "ব্রহ্মৈব ভবতি" এই পরম প্রাপ্তিটি ঘটে না। "আমি ব্রহ্ম" এইটিকে ব্রহ্মাকারা চরমবৃত্তি বলা হয়, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম এটি নয়। অগ্নি যেমন ইন্ধনকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া নিজেও নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, তেমনিধারা এই ব্রহ্মাকারা চরম বৃত্তিটি নিঃশেষে ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয়—এই চারিটি ভবেন্ধন নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং অস্তমিত হয়। নদী যেমন নদীনাথের সন্ধানে ছুটিয়াছে, ঋজু কুটিল নানা পথ ধরিয়া। যখন সাগরসঙ্গমে আসিয়া নদী উপস্থিত হয় তখন সে সকল বাঁধন হারাইয়া সাগরের উদ্দেশ্যে যেন বলে—"এই তো মহান! তুমিই যে আমি আর আমিই যে তুমি, আমাদের ভেদ কোথায়!" এখনও কিন্তু নদী সাগরের মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে হারাইয়া ফেলে নাই। সে অসীম অগাধ গাম্ভীর্যের ভিতরে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলে তখন আর কোনো বৃত্তিই থাকে না, কোনও ভাষাও থাকে না।।৩৮।।

আসঙ্গ হইতে রোধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় এবং অভিষঙ্গ হইতে বেধ আসিয়া থাকে। রোধ এবং বেধ উভয়ই যে দুই প্রকার তাহা আমরা দেখিয়াছি। একপ্রকারকে বলা যায় স্ব-প্রতিযোগিক। এস্থলে রোধ অথবা বেধ নিজেই নিজেকে প্রতিযোগী অথবা বিষয় করিয়া থাকে, অর্থাৎ রোধ আপনাকেই রুদ্ধ করে এবং বেধ আপনাকেই বিদ্ধ করে। অপর প্রকারটি হইতেছে ইতর-প্রতিযোগিক। এস্থলে রোধ অথবা বেধ অন্য কোনো বস্তুকে বিষয় করে। যেমনধারা মেঘের দ্বারা সূর্যের রশ্মি রোধ হইল অথবা শরের দ্বারা কোনো লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। রোধ এবং বেধে এ দ্বিবিধ বৃত্তি আছে বলিয়া কোথাও কোথাও রোধও বেধের হেতু হইয়া থাকে এবং বেধের দ্বারাও বিবেক এবং কৈবল্য সম্ভাবিত হইতে পারে। প্রথমটির দৃষ্টান্ত আমরা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান নাশের স্থলে দেখিয়াছি। দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই। যেমন সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতির ধর্ম সুখ দুঃখ ইত্যাদি পুরুষে অধ্যস্ত হওয়ার ফলে পুরুষ আপনাকেই সুখী দুঃখী এই প্রকার মনে করিতেছে। আবার পুরুষের চৈতন্য প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়া জড় যেটি দৃশ্য সেটিকে যেন দ্রষ্টার মতন চেতন করিয়া দেখাইতেছে। আমাদের লক্ষণ অনুসারে প্রকৃতি পুরুষের এবংবিধ সংযোগকে বেধ বলিতে হয়। সমাধি প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা এই বেধ যদি আপনাকেই বিদ্ধ করিতে

কিংবা নির্মূল করিতে সমর্থ হয়, তবে তার ফলে বিবেক খ্যাতি হইয়া থাকে এবং সেটি হইলে প্রকৃতি-বিবিক্ত-পুরুষ-সাক্ষাৎকার রূপ কৈবল্য হইয়া থাকে। পুনশ্চ, ভক্তি সিদ্ধান্তে এই বেধের দৃষ্টান্ত বিশেষ ভাবেতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং বহিরঙ্গা শক্তি। বহিরঙ্গা শক্তি হইতে প্রাকৃত অথবা মায়িক। অন্তরঙ্গা শক্তি অপ্রাকৃত এবং নির্মায়িক। জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। তটস্থা বলিয়া জীবে তার স্বরূপগত অপ্রাকৃত, নির্মায়িক সত্তা প্রাকৃত ও মায়িক ধর্মের দ্বারা যেন আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। জীব তার অমায়িক শুদ্ধ চিন্ময় সত্তা মায়ার কবলে যেন হারাইয়া আপনাকে এই প্রাকৃত জড় বিশ্বের সামিল মনে করিতেছে। এইটি হইল মায়িক ও প্রাকৃতের দ্বারা যেটি অমায়িক ও অপ্রাকৃত সেটির 'বেধ'। এই বেধ হইতেই জীবের ভগবদ্‌বৈমুখ্য, ভব-বন্ধন-নিমিত্ত ক্লেশ। এই বেধই তাহাকে এক অনাদি অনন্ত প্রাকৃত ধারার মধ্যে পাতিত করিয়া রাখিয়াছে। তার উদ্ধারের উপায়, এই বেধকেই আবার বিদ্ধ করা। পুনশ্চ, প্রণব ধনুঃ, আত্মা শর ইত্যাদি শ্রুতির প্রসিদ্ধ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মেই লক্ষ্য বেধ করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম তো বেধের বস্তু নন, তবে সেটিকে লক্ষ্য করিয়া শরদ্বারা কিরূপে বিদ্ধ করিব? বলা বাহুল্য, ব্রহ্ম স্বয়ং বেধযোগ্য না হইলেও তাঁর যেটি অচিন্ত্য মায়াশক্তি যদ্দ্বারা "ত্বং" পদার্থের এবং "তৎ" পদার্থের ভেদ কল্পিত হইতেছে, সেটি, কিনা ভেদটি, অবশ্যই বেধযোগ্য বটে। আত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও "ত্বং" পদার্থরূপে আপনাকে অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান ইত্যাদি মনে করিতেছে এবং ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি। ব্রহ্মের বেলায় তার এইরূপ মনে করাটি অবশ্য তার আপন কল্পনা নয়। শুদ্ধ, অক্ষর ব্রহ্ম আপনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমানরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন; এটি যদি কল্পনাই হয় তা হইলেও সেটি জীবের কল্পনা নয়, ব্রহ্মেরই স্ব-কল্পনা। 'দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্তঞ্চামূর্তঞ্চ'। এই কল্পনার দ্বারা শুদ্ধ ব্রহ্ম আপন ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়াও যেন লুকাইয়াছেন। যেমন আবার ভক্তি সিদ্ধান্তে ভগবত্তার যেটি স্বরূপ মাধুর্য সেটি ঐশ্বর্যের ভিতরে লুক্কায়িত থাকে। "রসো বৈ সঃ" এই পরম অনুভূতির দ্বারা ঐশ্বর্যের ভিতরে মাধুর্যকে পাইতে এবং আস্বাদন করিতে হয়। রসানুগ সাধন দ্বারাই এটি সম্ভবপর। সুতরাং ব্রহ্মের অথবা "তৎ" পদার্থের এবংবিধ এক অনির্বচনীয় 'বেধ' রহিয়াছে। জীবের পক্ষে তার স্বরূপের বেধ হইতেছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান জন্য। ব্রহ্ম অথবা

ভগবত্তার সঙ্গে জীবের যেটি প্রকৃত সম্বন্ধ তার অভান হইতেছে এই অজ্ঞান নিবন্ধন। এই বেধটিকে বিদ্ধ করিতে হইবে—সেইটি হইল "ত্বং" পদার্থের শোধন। আবার ব্রহ্মের যেটি আপন 'আবরণ' (যেমন অন্তরঙ্গ রসাশ্রিত সাধনেও বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য) সেটিকেও বেধ করিতে হইবে—ইহাই হইল "তৎ" পদার্থের শোধন। এই দ্বিবিধ শোধন হইলে বেধ আপনিই বিদ্ধ হইয়া যায় এবং "আত্মা" রূপ শর "প্রণব" রূপ ধনুঃ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যটিকে বেধ করে, এবং তাহাতেই তন্ময় হইয়া যায়॥৩৯॥

ছন্দঃ যদি ব্যাজ দ্বারা বিদ্ধ হয় তবে সেটি ঋজুগতি না হইয়া বক্রগতি হইয়া থাকে। ব্যাজের এবং বিঘ্নের দ্বারা বিদ্ধ না হইলে ছন্দঃ হয় বজ্রসত্ত্ব, বজ্রায়ুধ এবং বজ্রবর্ম। সুতরাং সে ছন্দকে (যেমন কিরাত-বেশী পশুপতিকে) অন্য কিছু বেধ করিতে পারে না, অথচ সে স্বয়ং রোধজন্য সকল বাধা বেধ করিতে সমর্থ হয়॥৪০॥

বেধরূপ মুষিককে অন্বেষণ করিয়া একটি সর্প বক্রগতিতে চলিতেছে। একটি বর্হী, কিনা, ময়ূর, সর্পটিকে বাধা দিতেছে। দেব সেনাপতি স্কন্দ এই ছন্দোগ ময়ূরটিকে আপনার বাহন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে কোনরূপ অশুভ-বেধ দূরীকরণের জন্য আমরা যে উপায় অবলম্বন করি, সে উপায় যদি ঋজু না হইয়া বক্র হয় তবে সেটি হেয় বেধটি অপেক্ষাও গুরুতর অশুভের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। যেমনধারা মূষিককে বধ করিয়া সর্প যদি মূষিকের গর্তে বাস করিতে থাকে তবে সেটা আরো ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য দেখিতে হইবে যাহাতে অশুভ নিবৃত্তির উপায়টি নিজে বৃহত্তর অশুভের সম্ভাবনা না ঘটায়। যদি ব্যাজবিদ্ধ হইয়া অবলম্বিত উপায়টি বক্র এবং কুটিল হইয়া পড়ে অর্থাৎ ব্যাজ-ব্যাল উপস্থিত হয়, তবে সেটিকে পরিহার অথবা সংশোধন করিবার উপায় কি? বলা বাহুল্য ছন্দকে আশ্রয় করাই হইল সেই উপায়। ছন্দের প্রতীক হইল বর্হী, যার বর্হকে নিখিল ছন্দের পরম মধুরিমা মূর্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আপন চূড়ায় বাঁধিয়াছেন। এই বর্হী হইতেছে ছন্দোগ, কিনা, ছন্দই ইহার গতি, ছন্দ-ছড়া হইয়া ইহার গতি হয় না। সুরসেনাপতি স্কন্দ এই ছন্দোগটিকেই আপন বাহন করিয়াছেন এই জন্য যে সুরের দ্বারা অ-সুরের জয়টি ছন্দের সাহায্যেই হওয়া সম্ভবে। জীবের মন বিষয়বিদ্ধ, সুতরাং 'রসো বৈ সঃ' যে

ভগবান তাঁতে বিমুখ। ভগবানের স্মরণ, নামকীর্তনাদি (জপ) হইল এই বেধ নিরাকরণের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু অবলম্বিত উপায়টি যদি ব্যাজ (কিনা, কৈতব কাপট্য কৌটিল্য) দ্বারা বিদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যাজ-ব্যাল হয় তবে সেটি বহী না হইয়া উরগ (অর্থাৎ বিষয়-বিষের বর্দ্ধক) হইতে পারে। বিষয়াসক্তির বেধ নিরাকরণের প্রকৃষ্ট উপায় ঋজু এবং নির্মল ভগবদাসক্তি—ভগবানে রুচি, রতি, প্রীতি, প্রেম। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-লালসারূপ কামকেও জয় করার প্রকৃষ্ট উপায় সেটিকে 'ভস্ম' করার চেষ্টা করা (Elimination) নহে, কিন্তু যিনি স্বয়ং 'মন্মথ-মন্মথ' তদীয় কামে 'বিবর্তিত' (with the 'sign' completely changed) করিয়া নেওয়া (Sublimation)। তথাপি কোনও প্রতীক (যথা প্রাকৃত নাগর অথবা পরকীয়াভাব ইত্যাদি) আশ্রয়ে এই 'পাঁচের পিঠে শূন্য' দেওয়ার সাধনটি করিতে যাইয়া ব্যাজ-ব্যাল বিদ্ধ হইয়া মহাপরাধে নিপতিত হবার ভয় খুবই আছে। অতএব সাধু সাবধান॥ ৪১॥

১০। বিঘ্নবিদ্ধস্য ছদিত্বম্॥

দৈশিকাদি-বিঘ্নজালৈরাচ্ছাদয়তি ছন্দসম্।
চলতা-স্তব্ধতা-ভেদাজ্জায়েতে তে ছদিশ্ছদী॥ ৪২॥

১০। বিঘ্নের দ্বারা বিদ্ধ হইলে, সেটি হয় ছদি। (Harmony as Veiler)।

বিঘ্নের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে দৈশিকাদি ভেদে চারি প্রকার বিঘ্ন আছে। এই সকল বিঘ্নজালের দ্বারা ছন্দের যেটি স্বরূপ সেটি যদি আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে তবে সেটি ছন্দঃ আর থাকে না, সেটি হয় ছদি। "ছদ্" ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন। সুতরাং ছদি হইল আচ্ছাদিত ছন্দঃ। আচ্ছাদনে যদি রজোগুণের প্রাধান্য থাকে তবে সেটি হয় চল স্বভাব এবং তখন তাহাকে বলে ছদিঃ (Dynamic Veiler)। আর যদি আচ্ছাদনে তমোগুণের প্রাধান্য থাকে তবে সেটি স্তব্ধ স্বভাব। এরূপ হইলে তাহার নাম হয় বিসর্গবিহীন ছদি (Static Veiler)। একটি ক্ষিপ্ত, অপরটি পঙ্গু। এই উভয়কেই (অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য) বর্জন করিয়া সত্ত্বপ্রধান যে ছন্দঃ—যে ছন্দঃ ধীর অথচ উদাত্ত, উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ রমণীয়, ঋজু অথচ উদার, নিরপেক্ষ অথচ দক্ষ, সেইটিকে সমাশ্রয় কর॥ ৪২॥

১১। ওজোরাহিত্যে ছন্দত্বম॥

ব্যাজবিঘ্নবিহীনস্য সাংসিদ্ধিকং হি ছন্দসঃ।
ওজস্বিত্বং বজ্রসত্ত্বং বাধাবেধক্ষমং মহৎ॥ ৪৩॥
শ্রেয়সে প্রেয়সে ছন্দঃ প্রেয়সেঽন্যস্তু কেবলম্।
স্বৈরচ্ছন্দঃ পরচ্ছন্দঃ স্বচ্ছন্দ ইতি স পুনঃ॥ ৪৪॥
প্রণবপুটিতং বীজ মোজস্বত্তরতাং ব্রজেৎ॥ ৪৫॥

১১। ছন্দঃ যদি ওজোরহিত হয়, অর্থাৎ ওজস্বী না হয়, তবে সেটি হয় (বিসর্গ বিহীন) ছন্দ। (Harmony as Pleasure.)

ব্যাল অথবা সর্প হইল ব্যাজ এবং আখু বা মূষিক হইল বিঘ্ন। সারা প্রকৃতির এলাকা ব্যাপিয়া এটি খনন করিতেছে বলিয়া এই মূষিকের নাম আখু (আ+খন্+ডু)। এই ব্যাল এবং আখুকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে যে ছন্দঃ তাহাতে স্বাভাবিক ওজস্বিতা ধর্ম বিদ্যমান থাকে এবং সেটি মহৎ বজ্রসত্ত্ব হয়, তন্নিবন্ধন সর্ববিধ বাধা বেধক্ষম সেটি হইয়া থাকে।। ৪৩।।

এইরূপ যে ছন্দঃ সেটি শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এতদুভয়ই দোহন করিতে সমর্থ; পক্ষান্তরে বিসর্গবিহীন ওজোরহিত যে ছন্দ সেটি কেবল প্রেয়ের নিমিত্তই (agreeable) হইয়া থাকে। এই দ্বিতীয় প্রকারের যে ছন্দ সেটি ত্রিবিধ—স্বৈরচ্ছন্দ, পরচ্ছন্দ এবং স্বচ্ছন্দ। অন্য কোন ব্যাপক বা বৃহত্তর ছন্দের শাসন না মানিয়া যে ছন্দ উচ্ছৃঙ্খল গতি হয়, তাহাকে বলে স্বৈরচ্ছন্দ। ফলে নিয়মানুগতার অভাব হয়। অপরের দ্বারা বাধ্য যে ছন্দ, সুতরাং যে ছন্দে আনন্দ এবং লীলার কোন লেশ নাই, তাকে বলে পরচ্ছন্দ। ফলে, স্বচ্ছন্দানুগতার অভাব হয়। স্বৈরগতি না হইয়া অথবা অপরের দ্বারা বাধ্য না হইয়া যে ছন্দটি স্বভাবে থাকে অথচ আপনার ওজস্বিতা হারাইয়া ফেলে, তাহাকে বলে স্বচ্ছন্দ। ফলে, বলিষ্ঠছন্দানুগতার অভাব হয়। এক্ষেত্রে যথার্থ যেটি ছন্দঃ তাহার আকৃতির ভ্রংশ অথবা বিকার হয় নাই বটে, কিন্তু সেটি যেন জড়তা প্রাপ্ত হইয়া আড়ষ্টবৎ হইয়াছে, কাজেই প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি বলে "আমি স্বচ্ছন্দে আছি"। এ স্থলে "স্বচ্ছন্দ" কথাটায় বুঝিতে হইবে যে বিশেষ কোন ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাট সে ব্যক্তির তৎকালে নাই। কিন্তু যথার্থ স্ব বা আত্মার ছন্দঃ হইলে সেটি আর

'নির্জীব ঢোঁড়া সাপের' মতন একটা কিছু হইতে পারে না। কূপমণ্ডূকের স্বচ্ছন্দবৃত্তি রসায়ন হয় না। আত্মা যেরূপ বলহীনের দ্বারা লভ্য হয়েন না, তদ্রূপ আত্মার যেটি নিজস্ব ছন্দঃ সেটিও কখনও বলহীন হয় না। সে ছন্দে যে ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনি হন স্বরাট, আত্মরাট। কোন বীজ মন্ত্রের আশ্রয়ে জপাদি সাধন করিতে গিয়া ওজোবিহীন ছন্দ এবং তার এই তিনটি রূপই আমাদের পরিহার করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। স্বৈরচ্ছন্দে কিংবা পরচ্ছন্দে জপ হইলে সে জপ অক্ষেমঙ্কর, এমন কি ভয়ঙ্করও হইয়া থাকে; জপটি স্বচ্ছন্দে চলিতেছে এটি মনে করিয়াও আবার নিশ্চিন্ত হওয়া চলে না। দেখিতে হইবে সেখানে ছন্দটি ওজস্বী অথবা ওজোবিহীন, তার নিজের বীর্য বা 'রোখ্'টি সে বজায় রাখিয়াছে, অথবা রাখে নাই। যে বীজে বীর্য রহিয়াছে সে বীজের দ্বারা মহাশৈলোৎপাটনও সম্ভব হইতে পারে। লঙ্কাধীশ দশাননের বীর্য ছিল, তাই সে সাক্ষাৎ কৈলাসও উৎপাটন করিতে চাহিয়াছিল। জপ তার ওজোগুণ হারাইতেছে বুঝিলেই ওঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, যেহেতু ওঙ্কারই প্রাণরূপে এই বিশ্বভুবন সজীব করিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বে যাহা কিছু স্পন্দিত হইতেছে তাহা প্রাণ স্পন্দনের ফলেই। এজন্য আদিতে এবং অন্তে প্রণব পুটিত করিয়া কোন বীজের অথবা মন্ত্রের জপ হইলে তখন তার ওজস্বিতা ব্যক্ত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যথা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইত্যাদি সপ্ত-ব্যাহৃতি জপে যদি প্রণবপুটিত হয়, তবে সে জপ প্রাণবান হইয়া আমাদের এই ব্যাজ-বিঘ্ন-বিদ্ধ সঙ্কীর্ণ ত্রিপুটি বা ত্রিপুর হইতে মুক্ত করিয়া সপ্ত মহাব্যাহৃতির যে অকুণ্ঠ অক্লিষ্ট, বিরাট অনুভূতি তাতে উপনীত করিয়া দিতে পারে॥ ৪৪-৪৫॥

১২। উর্জ্জোরাহিত্যে বন্ধত্বম্॥

উর্জ্জস্বতা হি ধর্ম্মেণ সর্ব্বং বৃদ্ধি-বিকাশভাক্।
সাধিষ্ঠমপি তদ্ধীনং ছন্দোঽপি বন্ধনায়তে॥ ৪৬॥

১২। উর্জ্জোরহিত হইলে ছন্দঃ হয় বন্ধ॥ (Enchaining Enslaving Harmony)

উর্জ্জস্বতা এই ধর্মটি আছে বলিয়াই সকল পদার্থের বিশেষরূপে বৃদ্ধি এবং বিকাশ হইয়া থাকে, সে ধর্মটি না থাকিলে হয় না। উর্দ্ধগ যে রজঃ, তাহাই হইতেছে উর্জ্জঃ। চলস্বভাব রজোগুণ যখনই নিম্নাভিমুখ না হইয়া উর্দ্ধাভিমুখ হয়, তখন সেটি হয় উর্জ্জঃ।

তখন সেটি প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের সাধক হইয়া থাকে, বাধক হয় না। এই উর্জ্জের অভাব হইলে শ্রেষ্ঠ ছন্দও বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। কল্পবৃক্ষেরও একটা বীজ যদি আমরা রোপণ করি, কিন্তু সে বীজে যদি উর্জ্জের অভাব ঘটে, তবে সেটি কল্পবীজই রহিয়া যাইবে, তাহা হইতে বাস্তব অঙ্কুরোদ্‌গমাদি হইবে না। উর্জ্জঃ হইতেছে—বারাহী শক্তি, যে শক্তিদ্বারা অবনত অথবা নিমজ্জিত সত্তা উন্নীত এবং উত্তোলিত হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা পদার্থের Energy Level উপচিত, বর্দ্ধিত হয়। কোন একটি বীজ হইতে যখন অঙ্কুর, প্ররোহ এবং পাদপের উৎপত্তি হয়, তখন আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই কোন্ এক রহস্য শক্তি যেন পাদপের অবয়বের উপাদান সমূহ এবং রস-ধারা মৃত্তিকা হইতে উর্দ্ধে বহন করিয়া দিতেছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত দিকেই। এই রহস্য শক্তি—উর্জ্জঃ। অভিজ্ঞ আচার্যের নিকট কোন বিশেষ সাধনের সাধিষ্ঠ বিদ্যা পাইলাম এবং তার উপনিষৎও শুনিলাম। কিন্তু যদি শ্রদ্ধাবীর্যের অভাব আমার থাকে, তবে দেখিব পূর্বোক্ত উর্জ্জের অভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং সে বিদ্যা আমার অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের উপায় না হইয়া প্রকারান্তরে বন্ধনেরই কারণ হইতেছে। শ্রদ্ধাবীর্যহীন সাধন—এইভাবে একটা বন্ধন-সংস্কার শৃঙ্খলে পরিণত হইতে পারে। কোন না কোন প্রকার সাধনের প্যাঁচানো বাঁধনে, কোন না কোন 'বিদ্যা' অথবা 'অনুষ্ঠানে'র 'ঘানিগাছে' বদ্ধ অনেকেই আমরা আজীবন ঘুরিয়াই মরিতেছি। এই প্রকার বিদ্যা, বীর্য অথবা রস অথবা অমৃত লাভের হেতু হয় না॥ ৪৬॥

১৩। বর্চ্চোরাহিত্যে তস্যান্ধ্যম্॥

আদাবন্তেচ মধ্যে চ কৃৎস্না সংপৃক্তশৃঙ্খলা।
ক্রান্তদৃষ্ট্যা যতো দৃষ্টা তচ্ছন্দো জায়তে কবিঃ॥ ৪৭॥
ঋতস্যাধ্বনি পান্থো যঃ পাথেয়দীপবর্জ্জিতঃ।
অন্ধং তমো বিশত্যেব ছন্দঃশৃঙ্খলচালিতঃ॥ ৪৮॥

১৩। বর্চ্চোরহিত হইলে ছন্দ হয় অন্ধ॥ (Harmony as Brute Blind Law)

পুরাণে অন্ধকাসুরের উপাখ্যান আছে। এই অসুরের প্রাদুর্ভাব হইলে "জগদান্ধ্যং প্রসজ্যেত"—এই জগৎই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেরূপ হইলে

বিশ্বে দ্রষ্টা, দৃশ্য বা দর্শন বলিয়া কিছু থাকে না। মহাদেব এই দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত মহাদেবের এক নাম 'অন্ধকারি'। মহাদেবের ত্রিশূলে প্রণবের তিনটি মাত্রায় এই ত্রিবিধ দৃক্‌শক্তির সন্নিবেশ রহিয়াছে। পুরাণে ইহাও কথিত হইয়াছে যে অন্ধকাসুরের একটি তনয়, তার নাম 'আবি'। লক্ষ্য কর যে এই আবি বিসর্গবিহীন আবিঃ, সুতরাং সে আবিতে জ্যোতিঃ, ওজঃ এবং বর্চ্চের অভাব। এখন বিচার করিয়া দেখ, বিশ্বে যে ছন্দঃ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, এই বিশ্বই যে ছন্দের ব্যক্ত বিগ্রহ, সে ছন্দঃ কিরূপ? সেটি কি অন্ধ না চক্ষুষ্মান্? চক্ষুষ্মান্ হইলে সেটি নিজেকেও দেখিতে পায় এবং নিজের অভিব্যক্ত যে বিশ্ব তাকেও সে দেখিতে পায়। যদি সেটি অন্ধ হয় তবে সে এই উভয় সম্বন্ধেই অন্ধ। কোন কোন মতে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের মতে, এই বিশ্ব ছন্দের অভিব্যক্তি এবং ছন্দের দ্বারা শাসিত বটে, কিন্তু সে ছন্দ অন্ধ, সে আপনাকেও দেখে না, আর এই অপরূপ বিশ্বকেও দেখে না। তার অভিব্যক্ত এই বিশ্বে যেখানে একটুখানি চৈতন্যের আলো ফুটিয়াছে সেইখানেই সেই আলোর সাহায্যে সে নিজে প্রকাশিত হইতেছে এবং তার অপরূপ রচনাটিও প্রকাশিত হইতেছে। যেখানে মস্তকমণিপ্রভাপ্রবর্তিত সে দীপটি নাই অথবা যেখানে সে দীপের আলো পৌঁছায় না, সেখানে অন্ধতমিস্রা ছাড়া আর কিছুই বিদ্যমান নাই। একটা জড় পরমাণুর ভিতরে যে অপূর্ব ছন্দ বিরাজ করিতেছে অথবা এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে যে ছন্দের সুসমঞ্জস শাসন দেখা যাইতেছে, সেটি দেখিতেছে কে? আবার ধর যে কোন এক প্রাণীদেহের অপূর্ব গঠন এবং গতিকৌশল! মানুষ ছাড়া এই গঠন এবং গতিকৌশলের বেত্তা এবং বোদ্ধা অপর কেহ কি আছে? পাদপ কি নিজেই জানে কি বিচিত্র ছন্দে তার বিকাশ ও পরিণতিটি ঘটিতেছে? জড়বিজ্ঞান এ প্রশ্নসমূহের "হাঁ" উত্তর দিতে এখন পর্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে—অভিব্যক্তির কোন এক বিশেষ স্তরে উঠিয়াই বিশ্বছন্দঃ যেন আলোর মুখ দেখিতে পায়, আত্মসংবিৎ লাভ করে। সুতরাং এই দৃষ্টিতে জগতের আধাররূপে এবং প্রশাসনরূপে যে মহাছন্দঃ রহিয়াছে, সেটি চেতনছন্দঃ নয়, আনন্দছন্দঃও সেটি নয়, প্রাণচ্ছন্দঃও নয়। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনের মধ্যে সতের সন্ধান সেটি দেয় অথবা দিতে চায় বটে, কিন্তু চিৎ এবং আনন্দের সন্ধান সেটি দেয় না। চিৎ এবং আনন্দের সন্ধান দেয় না বলিয়া সেটি ছন্দঃ হইয়াও একটা বিরাট জড়শৃঙ্খল মাত্র।

এইরূপ ছন্দকে অন্ধকাসুরের তনয় বিসর্গবিহীন 'আবি' বলিলে চলে। কেননা, প্রাণ, চৈতন্য এবং আনন্দ মূলে রহিলেই সর্বত্র 'জ্যোতিঃ,' ওজঃ এবং বর্চঃ সম্ভাবিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। সূর্যের বা বহ্নির জ্যোতিঃ আছে আমরা ভাবি বটে, কিন্তু সে জ্যোতিঃ তাদের আপন জ্যোতিঃ নয়। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"—চৈতন্য ব্যতীত জ্যোতিঃ অথবা প্রকাশ কথাটাই নিরর্থক।

পক্ষান্তরে যে ছন্দ ক্রান্তদর্শী সে ছন্দ কবি। এই বিশ্বের আদি, মধ্য এবং অন্তে পরস্পর-সুষম সম্পর্কে যে অপূর্ব ঘটক-ঘটিত-ঘটনা শৃঙ্খলাটি রহিয়াছে দেখিতেছি, সেইটিকে সমগ্রভাবে দেখিতে পায় যে, তাকে বলে ক্রান্তদর্শী। সকল ভূত পদার্থই অব্যক্তাদি এবং অব্যক্তনিধন, কেবলমাত্র ব্যক্ত-মধ্য। জন্ম এবং মৃত্যুর যবনিকা সরাইয়া কোন কিছুরই সমগ্র চিত্রটি আমরা দেখিতে পাই না; যেটুকু দেখিতে পাই সেটুকুও আংশিক, খণ্ডিত, কুণ্ঠিত-গুণ্ঠিতভাবে। এরূপ দর্শনকে ক্রান্তদর্শন বলে না। যে ছন্দঃ কবি তার দর্শনে এবংপ্রকার কুণ্ঠা এবং কার্পণ্য নাই।

সুতরাং ছন্দকে দুই ভাবে দেখিতে পারি। আবি ও কবি। যদি আবির আশ্রয় করিয়া চলি তবে ঋতের সাধনে চলিতে গিয়া আমরা পথের প্রদীপ সাথে তো লইলাম না, সুতরাং অন্ধকাসুরের তনয় যে 'আবি' তার বজ্রনিগড়ে বন্ধ হইয়া অমরমী-অদরদী-যন্ত্রতাড়িত হইয়া ঘোর তমিস্রার মাঝারেই পতিত হইতে চলিলাম॥ ৪৭-৪৮॥

১৪। তেজোরাহিত্যে মান্দ্যম্॥

সমারম্ভক-দৌর্ব্বল্যাৎ সমবায়-বিলম্বনাৎ।
সহায়সমূহাভাবাদ্ বৈলক্ষ্যস্য ব্যপাশ্রয়াৎ॥ ৪৯॥
প্রতিবন্ধকবাহুল্যাৎ প্রতিরোধস্য ত্বপাটবাৎ।
তেজোমান্দ্যঞ্চ কল্প্যেত সমাপকপরাভবাৎ॥ ৫০॥

১৪। তেজোরহিত ছন্দকে বলে মন্দ॥ (ছন্দোমান্দ্য—Insufficient, Ineffectual Harmony)

ছন্দের মান্দ্য, কিনা, মন্দ হওয়ার কারণগুলি অতঃপর নিরূপিত হইতেছে। ক্রিয়ামাত্রেরই কতকগুলি হেতুর অপেক্ষা থাকে। অন্য হেতুগুলি রহিয়াছে কিন্তু যে হেতুটি না রহিলে ক্রিয়াটির আরম্ভ হয় না, সেই হেতুটিকে আরম্ভক হেতু বলা যায়।

ক্রিয়োৎপত্তির পূর্বে যে বাধা বা প্রতিবন্ধক থাকে সেটির নিবৃত্তি হয় এই সমারম্ভকের দ্বারা। যেমন একটি কাঁচের পাত্রে দুইটি গ্যাস কোনও নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত রহিয়াছে, কিন্তু তাদের রাসায়নিক মিশ্রণটি ঘটিতেছে না। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে সে মিশ্রণটি ঘটিতে পারে বটে কিন্তু যে পরিমাণ শক্তি প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক সে পরিমাণে যদি প্রযুক্ত না হয় তবে মিশ্রণটি ঘটিবে না। এ স্থলে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ রাসায়নিক মিশ্রণের আরম্ভক বটে কিন্তু তার দৌর্বল্য নিবন্ধন মিশ্রণটি ঘটিতে পারিল না। জপাদি সাধনের বেলায় সাধকের শ্রদ্ধা বা আগ্রহশক্তি হইল সমারম্ভক হেতু। এটির দৌর্বল্য ঘটিলে, অর্থাৎ শ্রদ্ধা-বীর্য, ভাব-ভক্তি না আসিলে, জপাদি ক্রিয়া তার অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে না। অতএব দেখিতেছি যে ছন্দের মান্দ্যের একটি কারণ হইল **সমারম্ভক দৌর্বল্য**।

দ্বিতীয় কারণ হইল সমবায় বিলম্বন। সমারম্ভক হেতুটি বিদ্যমান আছে বটে কিন্তু অপরাপর হেতুগুলির সমবায় বা সমাযোগ ঘটে নাই বা ঘটিতে বিলম্ব হইতেছে। যেমন পূর্বোক্ত রাসায়নিক দৃষ্টান্তে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ উপযুক্ত ভাবেই ঘটিতেছে, কিন্তু যাদের উপর সে শক্তির প্রয়োগ হইবে সেগুলি যথানুরূপভাবে সমবেত হইয়া নাই। এই ক্ষেত্রে অভীষ্ট মিশ্রণটি ঘটিবে না। সাধনের বেলাতেও সাধকের আগ্রহের প্রাবল্য সত্ত্বেও যদি বিদ্যা এবং উপনিষৎ (রহস্য বিদ্যা) উপযুক্তভাবে উপস্থিত না থাকে অথবা সেরূপ উপস্থিতিতে যদি বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে অভীষ্ট ফলটি মিলিবে না। অতএব সমবায় বিলম্বন হইল ছন্দের মান্দ্যের দ্বিতীয় কারণ।

প্রত্যেক ক্রিয়ায় সাক্ষাৎ কারণগুলি ব্যতীত কতগুলি সহকারি কারণও বিদ্যমান থাকে, যেমনধারা বীজের বিকাশে আলোক বাতাস এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা (**environmental conditions**)। জপাদি সাধনে সাক্ষাৎ কারণ সাধকের আপন বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ এবং ভগবানের অনুগ্রহশক্তি—যেটি গুরুশক্তিরূপে শিষ্যের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। কিন্তু এই সাক্ষাৎ কারণগুলি ব্যতীতও অপর কতকগুলি সহকারি কারণেরও অপেক্ষা থাকে—যথা দেশকালাদির অনুকূলতা,—সংশয়স্থলে ইতিকর্তব্যনিরূপণের নিমিত্ত উপযুক্ত সঙ্গ এবং উপদেশ লাভ, ইত্যাদি। এই সহায়ক হেতুগুলি যদি যথেষ্টভাবে বিদ্যমান না থাকে অথবা তাদের যেটি "সমূহ" সেটির অভাব ঘটে, তাহা হইলে ছন্দের মান্দ্য ঘটিবে। "সমূহ" এই কথাটি কেবলমাত্র সমষ্টি

অর্থে গ্রহণ করিলে হইবে না। 'সম্' কিনা, সম্যক্ এবং সজ্ঞাতভাবে যে "উহ" কিনা, চেষ্টা তাহাকে বলে 'সমূহ'। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রে শুনিতে পাই—"সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্" ইত্যাদি। এ স্থলে 'সম্' এই উপসর্গের প্রয়োগ করিয়া শ্রুতি কেবলমাত্র মিশ্রণ অথবা মিলিত হওয়ার কথাই বলে নাই, কিন্তু কোনও মহান লক্ষ্যের উদ্দেশে আমাদের বাক্য, মন, এবং ক্রিয়াদিকে ছন্দোবন্ধ এবং সংহতভাবে শক্তিমান করিয়া তোলার কথাই বলিয়াছেন। সেরূপভাবে শক্তিমান হইলে তাহারা হয় 'সমর্থ' এবং যে পারস্পরিক ব্যবস্থা অথবা বিন্যাসের ফলে সেই ফলটি লাভ হয় তাহাকে বলে "সমূহ"। বিজ্ঞানের একটা দৃষ্টান্ত লও। প্রাণে যেটি মূল বস্তু বা উপাদান তার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রোটোপ্ল্যাজম—Protoplasm। রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই পদার্থটির মূল উপাদানগুলি এবং তাদের মিশ্রণের অনুপাত আমরা জানিতে পারিয়াছি বটে, কিন্তু যে রহস্য মিশ্রণ অথবা "সমূহের" ফলে সেগুলি প্রাণশক্তির আধার, বাহন এবং যন্ত্র হইয়া থাকে, সেই 'সমূহ'টিকে আমরা এখনও ঠিক ধরিতে পারি নাই। ধরিতে পারিলে কৃত্রিম উপায়ে পরীক্ষাগারেও সজীব প্রোটোপ্ল্যাজমের সৃষ্টি হইতে পারিত। জপাদি সাধনেও এই "সমূহের" অভাব আংশিক অথবা একান্তভাবে ঘটিতে পারে। মন্ত্রের যেগুলি অক্ষর এবং তাদের যেটি মিলন সেটি এই "সমূহ" স্বরূপে পৌঁছায় না বলিয়াই মন্ত্র সজীব হইয়া উঠে না—যথার্থ মন্ত্রোদ্ধার এবং মন্ত্রচৈতন্য হয় না। "সমূহ" হইলে তবে হয় "সমর্থ"। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সমূহ হইল সুরছন্দাদির ঠিক ঠিক লয়। সুতরাং মন্ত্রাদির সাধন 'সমূহ' সাধন। শ্রদ্ধাবীর্য দ্বারা অনুগ্রহ শক্তির প্রসাদ লাভ করতঃ জপাদির এই 'সমূহ' সাধনটি করিতে হয়। কেবলমাত্র আপন চেষ্টাতেই এটা হবার নয়; আগ্রহশক্তি এবং অনুগ্রহশক্তির পূর্ণ সহযোগেই এটা সম্ভাবিত হইয়া থাকে। "সমূহ" যদি স্তব্ধ হয় তবে হয় ব্যূহ এবং যদি ব্যাহত হইয়া পড়ে তবে তার ফল হয় ব্যামোহ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে ছন্দের মান্দ্যের তৃতীয় কারণ হইতেছে এবংবিধ সমূহের অভাব, স্তব্ধ ব্যূহ অথবা ব্যামোহ। অতএব জপাদি সাধনে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে হয় যাহাতে সাধনটি কোনও স্তব্ধব্যূহে (static habit or complexএ) আবদ্ধ না হয় অথবা কোন ব্যামোহ (morbid functioning or activisationএ) পতিত না হয়। এইরূপ হইতে থাকিলে 'সমূহ'তে—ফিরিবার উপায় আশ্রয় করিতে হয়।

চতুর্থ কারণ—বৈলক্ষ্য ব্যপাশ্রয়। যেটি লক্ষ্য অথবা অভীষ্ট তাহা হইতে ন্যূন, এবং সেটি লাভের যেটি ঋজু ঋত পন্থা তাহাতে আশ্রিত নয়, তাহা হইতে বিচ্যুত, বক্রগ এবং বক্রতাজনক যে লক্ষ্য তাহাকে বলে বৈলক্ষ্য। যেমন অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে যাইয়া তন্নিকটস্থ কোনও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে অগ্রে অভিনিবেশ করিলে বৈলক্ষ্য ঘটিল না; অন্ধকারে মণিপ্রভায় মণিভ্রমে ধাবিত হইলেও বৈলক্ষ্য ঘটিল না; কিন্তু অন্যরূপ করিলে বৈলক্ষ্য ঘটিতে পারে। জপাদি সাধনে যেটি মুখ্য লক্ষ্য সেটির অনুসরণে 'পথিমধ্যে' কোন কোন লাভ বা প্রাপ্তি ঘটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন ন্যূন, অবান্তর প্রাপ্তি যদি পরমপ্রাপ্তির পথভ্রষ্ট করিয়া দিতে যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে বৈলক্ষ্য আসিতেছে। কোনও প্রবল প্রারব্ধবশতঃও বৈলক্ষ্য আসিতে পারে—যথা তপস্যায় ভোগেচ্ছা। সমূহের অভাবে যেমনধারা স্তব্ধব্যূহ এবং ব্যামোহ, লক্ষ্যের ব্যতিক্রমেও সেরূপ দ্বিবিধ বৈলক্ষ্য—একটি মূঢ় বৈলক্ষ্য, অপরটি ঘোর বৈলক্ষ্য। মধু ও কৈটভ। বৈলক্ষ্য ব্যপাশ্রয় বর্জনীয়।

পঞ্চম কারণ—প্রতিবন্ধকবাহুল্য—সমারম্ভক হেতুটি গোড়ায় প্রতিবন্ধক দূর করিয়া ক্রিয়াটি চালু করিয়া দেয় বটে, কিন্তু প্রতিবন্ধক 'পদে পদে' উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ ক্রিয়ার যেটি গতিরেখা (curve) সেটিকে প্রতিবন্ধকপরম্পরা 'চূর্ণ' (blasting the rocks of resistance) করিয়াই চলিতে হয়। প্রতিবন্ধকও নানাবিধ—(যথা, ব্যাজ-বিঘ্ন, অবরোধ, প্রতিরোধ ইত্যাদি)। যদি প্রতিবন্ধকের বাহুল্য ঘটে তবে বাস্তব গতিবেগ (momentum) কমিয়া থাকে। যদি এই বাস্তব বেগটি না বাড়াইতে পারা যায় তবে মান্দ্য (slowing down) আসিবেই।

ষষ্ঠ কারণ—প্রতিরোধের অপাটব। প্রতিবন্ধকপরম্পরা যেরূপ আসিতেছে তাদের প্রতিরোধ ঠিক সেই ভাবে না হইলে প্রতিবন্ধকের 'গোড়া' ও 'শেষ' রহিয়া যায় এবং এই প্রতিবন্ধকের সংস্কার এবং অবশেষগুলি সম্মিলিতভাবে একটি প্রবল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে। প্রতিবন্ধকগুলিরও পরস্পর মিলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে একটা প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিবার 'প্রবণতা' আছে। এই প্রবণতা হইতেই হয় রাক্ষসদের, অসুরদের ও দৈত্যদের ব্যূহ অথবা দুর্গ। এই ব্যূহ বা দুর্গ যাহাতে নির্মিত না হইতে পারে সেদিকে পূর্বাপর দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়, কেননা, সেটি নির্মিত হইলে তাকে ভেদ করা অনেক সময়ে সুর বা দেবপক্ষের অসাধ্য বা দুঃসাধ্য হইয়া

উঠে। এইজন্য প্রতিবন্ধক দূরীকরণের নিমিত্ত আমাদের যেটি প্রতিরোধ, সেটিকেও সঙ্ঘবন্ধ, কিনা, পূর্বোক্ত লক্ষণ মত—'সমূহ' করিয়া লইতে হইবে। প্রতিরোধের 'সমূহ' দ্বারাই প্রতিবন্ধকের ব্যূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিরোধগুলির এবংবিধ 'সমূহতা'কে (strategic dispositionকে) বলে পাটব। এইটির অভাব হইলে প্রতিবন্ধকের উপচয় নিবন্ধন সাধকের তেজোমান্দ্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

সপ্তম কারণ—সমাপকের পরাভব। ক্রিয়ামাত্রের যেমন আরম্ভক আছে তেমনি তার আবার সমাপক আছে। এই সমাপক দ্বারা ক্রিয়ার সমাপ্তি এবং চরিতার্থতা ঘটে। কিন্তু এই সমাপকটি যদি কোন কারণে পরাভূত হইয়া যায় তবে ক্রিয়াটি শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াও শেষরক্ষা করিতে পারে না। যেমন সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধাবীর্যাদি সহকারে প্রায় শেষ সোপানের কাছাকাছি যাইয়া উপনীত হইলাম, কিন্তু যদি সেখানে দম্ভ বা অভিমান আসিয়া পাইয়া বসে, সুতরাং সাধকের আগ্রহশক্তির এবং ভগবানের অনুগ্রহশক্তির পরিপূর্ণ সম্মিলনটি ঘটিতে না দেয়, তবে সেই সাধনের যেটি সমাপক, সেটির পরাভব ঘটিল। সাধনের চরম ভূমিকাগুলিতে অহমিকার বীজ কোন প্রকারে অঙ্কুরিত হইলে মহান অনর্থটি ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। সে ক্ষেত্রে "সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—আত্মার এই পূর্ণাহুতিটি আর তাঁহাতে সমর্পিত হইতে পারিল না। সাধন পরিপক্ক হইতে হইতে আবার কাঁচিয়া গেল। মান্দ্যের এইটি শেষ কারণ॥ ৪৯-৫০॥

১৫। তেজীয়স্ত্বে পুনরিশ্বত্বম্॥

সমারম্ভকমারভ্য সপ্ত স্থানানি তেজসে।
সমিধ্রূপাণি কল্পধ্বং যানি জাড্যায় চাসতে॥ ৫১॥
সপ্তব্যাহৃতিভিস্তানি সমিধ্যন্তে হি বর্হিষি।
সপ্তার্চ্চিষো ভবেয়ুস্তেঽগ্নয়শ্ছন্দাংসি সপ্ত বা॥ ৫২॥
সমারম্ভকভূতং ভূঃ সমবায়করং ভুবঃ।
সুবঃ সমূহমূলঞ্চ মহতি লক্ষ্যতা মহঃ॥ ৫৩॥
সর্ব্বজনি-নিধানত্বাজ্জনো নিষ্প্রতিবন্ধকঃ।
তেজসোঽভীদ্ধতায়াশ্চ প্রতিরোধশূরং তপঃ॥ ৫৪॥

সত্যং সমাপনস্থানং সত্যে নাস্তি পরাভবঃ।
ভূরাদিভিরতো ধীর জুহুধি সমিধঃ ক্রমাৎ॥ ৫৫॥
সমারম্ভং জগত্যা চ সমবায়মনুষ্টুভা।
ত্রিষ্টুভা চ সমুহঞ্চ পঙ্‌ক্ত্যা সংলক্ষ্যমেব যৎ॥ ৫৬॥
বৃহত্যাঃ ব্যাজবিঘ্নত্ব মুষ্ণিগভীদ্ধতেজসে।
গায়ত্র্যা চ সমাবৃত্ত্যা কল্পয়স্ব সমাপনম্॥ ৫৭॥

১৫। তেজের বিবৃদ্ধি হইলে ছন্দঃ হয় ইদ্ধ। ("Kindled Fire or Flame")

সমারম্ভক দৌর্বল্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপক পরাভব পর্যন্ত পূর্বোক্ত এই সাতটি হইতেছে জাড্য অথবা মান্দ্যের স্থান। এই সাতটি স্থানে ছন্দের যেটি শক্তি তার অপচয় ঘটে। কিন্তু শক্তি বা তেজের উপচয় সাধিত হইবে কি উপায়ে? নিজের মধ্যে যিনি প্রাণব্রহ্মরূপে রহিয়াছেন তাঁহাকে 'বর্হি'—অগ্নিরূপ ভাবনা কর। 'ব্রহ্ম' এবং 'বর্হিঃ' একই 'বৃহ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'বৃহ' ধাতুর আদিতে 'ব কার' বিন্দু এবং অন্তে 'হকার' মহাপ্রাণরূপ নাদ, এবং মধ্যে 'ঋকার' হইতেছে 'ঋতম্'। নাদ বিন্দু মিথুন এবং অভিন্নরূপে 'সত্যম্'। ব্রহ্মে এই ঋতম্ এবং সত্যম্ এক অখণ্ড অভিন্ন আধাররূপে বর্তমান; কিন্তু বর্হিঃতে ঋকার 'ইদ্ধ' (ইকার বিশিষ্ট) হইয়াছে এবং বিসর্গকে (বিশেষভাবে সর্গবৃত্তিকে) আশ্রয় করিয়াছে। এই নিমিত্ত বর্হিঃ হইলেন প্রাণব্রহ্ম। শ্রুতির রহস্যবাণীতে অগ্নি। ক্রিয়া কারক ফল রূপে ইনি 'যজ্ঞ'। যজ্ঞ শব্দের 'য' (বায়ুবীজ) হইল গতি অথবা ক্রিয়া; 'জ' (জনিবীজ—'জন্মাদ্যস্য যতঃ') হইল কারক অর্থাৎ যার সঙ্গে ক্রিয়ার অন্বয় আছে; আর 'ন' (দান) 'জ' কার যোগে 'ঞ' হইয়া হয় 'মখদ' অর্থাৎ, মখ, কিনা, যজ্ঞ যাহা দান করিয়া থাকে; অতএব ফলই বুঝাইল।

প্রাণকে অগ্নিভাবনা করিয়া তাতে অগ্নিহোত্র হবন কর। এ হবনে সমিধরূপে কল্পনা কর ঐ সপ্তবিধ—মান্দ্য, জাড্যের স্থান বা আশ্রয়কে। অর্থাৎ মান্দ্য বা জড়তার ঐ সাতটি রূপকেই সপ্তসমিধ্ ভাবনা কর। সপ্তসমিধকে যথাক্রমে ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি প্রণব পুটিত সপ্তব্যাহৃতি যোগে হবন করিলে তাহা আর মান্দ্য বা জাড্যের স্থান থাকে না, তারা 'সমিদ্ধ' কিনা, সম্যক্‌রূপে ইদ্ধ হইয়া উঠে। সম্ × ইন্‌ধ্ ধাতু

× ক্বিপ্ = সমিধ্ বটে, কিন্তু সে অবস্থায় সমিন্ধ, কিনা উদ্দীপিত হবার সম্ভাবনা মাত্র তাতে বিদ্যমান, বস্তুতঃ সমিন্ধ হইয়া সেটি নাই, প্রতিবন্ধক বর্তমান রহিয়াছে। সপ্তব্যাহৃতিতে যে সপ্তপ্রকার তেজঃ (পরে নিরূপিত হইয়াছে), বিদ্যমান, সেগুলি প্রণব সহযোগে 'ব্রহ্মভাবতা' (সুতরাং অবাধিত, অকুণ্ঠিত সত্যপ্রকাশ) লাভ করে, সুতরাং তারা মান্দ্যের সমিধ্ ও ব্রহ্মবর্চ্চোদ্বারা সমিন্ধ করিতে সমর্থ হয়। অতএব প্রাণাত্মার যে শাশ্বত সন্দীপন জ্যোতিঃ (Unkindled Flame) তাহাতেই আহুতি দাও এই জড় সমিধ্। ফলে তাহাও উদ্দীপিত হইবে (kindled Flame)। এই প্রকার আন্তর অগ্নিতে হবনই হইল সব কিছুকে অগ্নীন্ধন এবং অগ্নিবীর্য করিবার উপায়। উপক্রমণীর ৭ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় হবনমন্ত্রের রূপ দেখান হইয়াছে। সেরূপ হইলে ঐ সপ্ত সমিধ হয় সপ্তার্চ্চিঃ—"Seven Flames or Seven-fold Flame." সপ্ত অগ্নি, সপ্তার্চ্চি এবং সপ্তছন্দঃ—এই তিনরূপে প্রাণযাগের ক্রিয়া-কারক-ফলস্বরূপত্ব ভাবনা কর। কারিকার শ্লোকে কোন্ ব্যাহৃতি এবং কোন্ ছন্দের সঙ্গে কোন্ মান্দ্য বা জাড্যরূপ সমিধের বিশেষ উপযোগ সেটি প্রদর্শিত হইয়াছে। 'ভূঃ' এটি মূলতঃ সমারম্ভের সূচক—"হও" এই অনুজ্ঞাটি উহাতে নিহিত। 'ভুবঃ' এটি সমবায় সূচক—যেটি অব্যক্ত (Unmanifest) এবং যেটি অভিব্যক্ত সে-দুটির মাঝে সেতুরূপ ইহা; ইহাকে আশ্রয় করিয়াই অভিব্যক্তির অবকাশ প্রাপ্তি ঘটে। 'সুব':—হইতেছে পূর্বব্যাখ্যাত সমূহের মূল। 'মহঃ' হইল মহৎ, মহত্তর, মহত্তম প্রকাশ-বিকাশের অভিমুখে প্রবণতার সূচক। 'জনঃ'=যাহা হইতে সমস্ত জাত হইতেছে, তাহা হইতে নিঃসৃত যে মূল আবেগ (Original Urge), কাজেই ইহা নিষ্প্রতিবন্ধকতার সূচক। 'তপঃ'=অভীদ্ধতেজের প্রকর্ষভূমি, সুতরাং সর্ব-ব্যাজবিঘ্ন প্রতিরোধে 'শূর'। শেষে 'সত্যম্'=সর্ববিধ প্রকর্ষের (Ascending Process) সমাপনস্থান, সুতরাং সত্যে আর পরাভব নাই। অতএব হে বীর সাধক, ভূরাদি ব্যাহৃতি যোগে ক্রমান্বয়ে হবন কর। হবন কালে তাদের এই রহস্যসঙ্কেত অবশ্য স্মরণীয়। পরে বিশেষ বিশেষ সূত্রে ব্যাহৃতিসপ্তক সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এইভাবে, সমারম্ভে জগতী, সমবায়ে অনুষ্টুপ, সমূহে ত্রিষ্টুপ্, সংলক্ষ্যে পঙ্‌ক্তি, অব্যাজবিঘ্নত্বহেতু বৃহতী, অভীদ্ধতেজের নিমিত্ত উষ্ণিক্, এবং সমাপনের নিমিত্ত সমাবৃত্তিমূর্তি গায়ত্রী ছন্দঃকে ভাবনা কর।

এগুলিও এই গ্রন্থে যথাস্থানে সূত্রিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত প্রাণহোমটি ক্রিয়াঙ্গারূপে প্রদর্শিত হইল বটে কিন্তু ভাবাঙ্গ এবং জ্ঞানাঙ্গ রূপেও প্রদর্শিত হইতে পারে। ভাব ও জ্ঞানেরও সাতটি মান্দ্যের স্থান আছে এবং সেগুলিকেও পূর্বোক্ত ক্রমে সমিধ্ কল্পনা করিয়া শ্রদ্ধা নিষ্ঠা রুচ্যাদি এবং শুভেচ্ছা বিচারণা তনুমানসাদি সহকৃত সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা শুদ্ধভাব এবং শুদ্ধ জ্ঞানাগ্নিতে হবন করিতে হইবে। যথা, শ্রদ্ধাহানিস্থলে—"ওঁ যদিদং ময়ি অশ্রদ্দধানত্বরূপং মান্দ্যং তদহং হব্যং কল্পয়ামি, তচ্চ শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষ ইতি—(শ্রীশ্রীইষ্টদেবতা) শ্রদ্ধারূপোপলক্ষিত-পরম-জ্যোতিষি জুহোমি—'যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥—ওঁ ভূঃ স্বাহা।" ॥৫১-৫৭॥

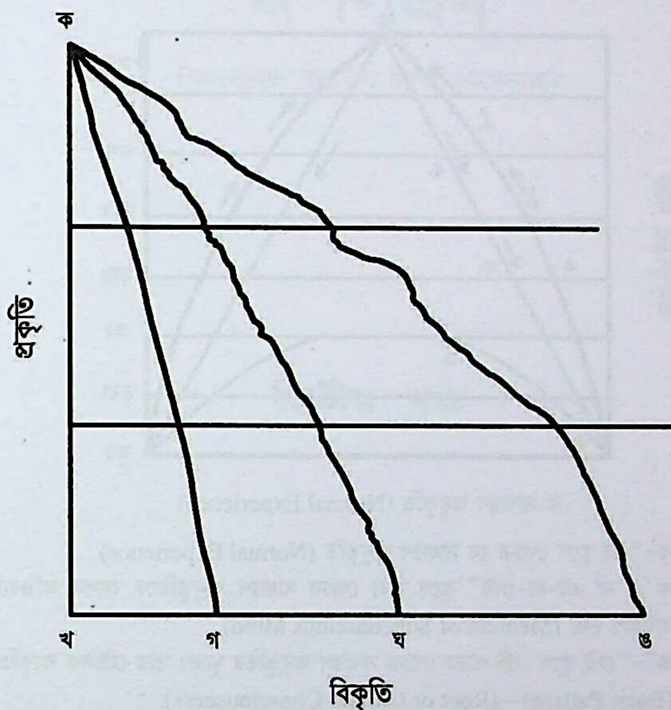
ইতি জপসূত্রে

প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে পঞ্চদশসূত্রম্।

সমাপ্তোঽয়ং খণ্ডঃ॥

পরিশিষ্ট

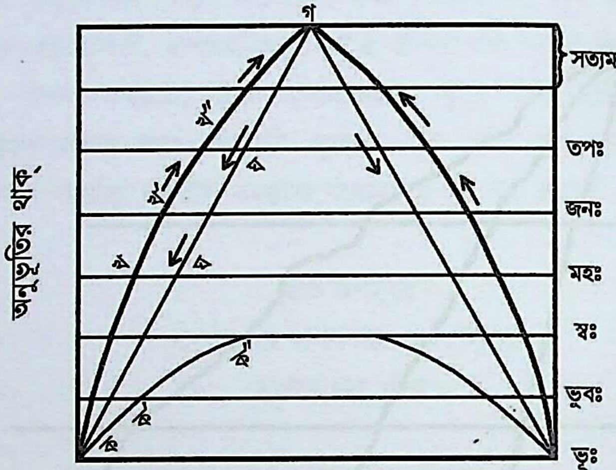
চিত্র নং-১



দ্রষ্টব্যঃ— 'কখ' প্রকৃতি নির্দেশক সরল রেখা।
'কগ' রেখার বিকৃতিলেশ নিমিত্ত অল্প বক্রতা আসিয়াছে।
'কঘ', 'কঙ' ইত্যাদিতে বিকৃতির আধিক্য, সুতরাং বক্রতা কুটিলতারও আধিক্য।

পরিশিষ্ট

চিত্র নং-২



ক সাধারণ অনুভূতি (Normal Experience)

দ্রষ্টব্য:— ক= "এই রূপে গোচর যে সাধারণ অনুভূতি (Normal Experience)

ক´= "না এই-না-সেই" রূপে যাহা গোচর সাধারণ অনুভূতিকে আপন অভিব্যক্তির অবকাশ দেয় (Medium of Subconscious Mind)

ক˝= "সেই রূপে যেটি থাকে গোচর সাধারণ অনুভূতির মূলে; তার মৌলিক আকৃতিরূপ (Basic Pattern)—(Root or Ground Consciousness)

খ=গোচর সাধারণ অনুভূতির 'অতিগ' যেটি হইয়া থাকে, অথচ তার সঙ্গে আনুরূপ্য রক্ষা করে (Yogik Experience which transcends the habitual limitations of normalcy, yet generally *conforms* to its objects)

খ´='খ' এর 'জনি' রূপ (Yogic Experience which goes to the root of things and can, therefore, *inform* its material)

খ˝=সমৃদ্ধ এবং সমর্থ শক্তিরূপে (তপঃ)—(Yogic Experience which as Power can *transform* and create)

গ=সত্যম্=The Highest Altitude or Plane of Experience

ঘ=ঋজুরেখায় 'গ' এর নিম্নতলগুলিতে 'অবতরণ' (Descent of the Highest Dynamic Experience on the planes below)

জপসূত্রম্

(বঙ্গাভাষয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদেনসহ)

দ্বিতীয় খণ্ড

নিবেদন

শ্রীভগবানের অসীম কৃপায় 'জপসূত্রম্' গ্রন্থের ২য় খণ্ড অবশেষে প্রকাশিত হইল। এই অভিনব গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মুদ্রণের ফলে সুধী ও সাধক সমাজে যে সাড়া জাগিয়াছে, যে বিস্ময়বিমিশ্র কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা পরম আশান্বিত হইয়াছি এই ভাবিয়া যে ভারতবর্ষ এই সংশয়সমাকুল যুগেও তার প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি, সাধনরাজ্যের গহন সম্পদের প্রতি একান্ত উদাসীন হয় নাই। শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গ দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য দীর্ঘকাল সাগ্রহে অপেক্ষমাণ—ইহাও আমরা জানি এবং আমাদের আন্তরিক তৎপরতা সত্ত্বেও এই খণ্ডের প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটিয়া গেল বলিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত। পূজ্যপাদ স্বামিজীর দৃষ্টিক্ষীণতার দরুণই বিশেষতঃ গ্রন্থের প্রগতি ব্যাহত হইয়াছে, তবু তাঁর আশ্চর্য দিব্যপ্রতিভা এ সমস্ত বাধাবিঘ্নের আবরণ বিদীর্ণ করিয়াও আপন ভাস্বর ছটা বিকীর্ণ করিয়া চলিয়াছে, ইহাই পরম সৌভাগ্য।

এই দ্বিতীয় খণ্ডে মূল গ্রন্থের সূত্র খুব অল্পই স্থান পাইয়াছে এবং সে হিসাবে অনেকে নিরাশ হইতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় বহু কারিকা ও তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। এ খণ্ডটিকে প্রধানতঃ "ব্যাহৃতি খণ্ড"ই বলা চলে, কারণ ব্যাহৃতি সম্বন্ধেই বিশদ আলোচনায় ইহার প্রায় সমগ্র অংশ নিয়োজিত হইয়াছে। বিশ্ব-বীণাটি এই সপ্তগ্রাম, সপ্তসুরেই বাঁধা, আপন জীবন-বীণার তারে জপরূপ মহা সাধন দ্বারা এই সপ্তধামের প্রজ্ঞাবিশাল ও ভক্তিরসাল ভূমিগুলির ক্রম-উন্মীলনই সাধকের লক্ষ্য। তাই ব্যাহৃতির স্থান জপসাধনায় এত বিশিষ্ট ও ব্যাপক। আশা করা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনায় জপের প্রকৃতি ও সাধন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট একটা ছবি পাঠকবর্গের মনে ফুটিয়া উঠিবে। পূজ্যপাদ স্বামিজীর লেখার মধ্যে বিজ্ঞানের দুরূহ আলোচনার গুরুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে এক শ্রেণীর পাঠকবর্গ মাঝে মাঝে কথঞ্চিৎ শ্রান্ত বোধ করিলেও প্রায়ই আবার ভাব-মধুর এবং রসনিবিড় স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়াকুঞ্জে জুড়াইবার স্থানও পাইবেন—এ আশ্বাস আমরা দিতে পারি। দ্বিতীয়

খণ্ডের প্রকাশের মধ্যে একজনের অপ্রকাশ আমাদের আজ গভীর বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছে। এই গ্রন্থের মূল প্রেরণা তিনিই পূজ্যপাদ স্বামিজীর অন্তরে প্রথম সঞ্চারিত করেন। এক ধ্যান-মৌন নিবিড় সন্ধ্যার সান্দ্র লগ্নে শ্রীবালানন্দ আশ্রমের পুণ্য পরিবেশে আপন নিভৃত সাধনকক্ষে বসিয়া পুণ্যশ্লোক শুক্লসন্ন্যাসী ৺প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় পূজ্যপাদ স্বামিজীর সঙ্গো মানসজপের অগাধ রহস্য সম্বন্ধে আলোচনায় মগ্ন হন। সেদিন মাহেন্দ্রক্ষণে যে শুভপ্রেরণা রূপ বীজটি স্বামিজীর প্রতিভাদীপ্ত হৃদয়ে সঙ্কল্পরূপে আত্মসম্বিৎ লাভ করিল, সেটি কিছুকাল পরেই 'জপসূত্রম্' রূপ মহাবনস্পতির আশ্চর্য অভিব্যক্তিতে সকলকে বিস্মিত ও পুলকিত করিয়া দিল। আজ এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশের পূর্বেই তিনি তনুত্যাগ করিয়া অপ্রকট হইলেন—এ খেদ পূজ্যপাদ স্বামিজীর হৃদয়ে গভীরভাবে বাজিতেছে। তিনি যে কি আগ্রহ দিয়া ও কতটা সাক্ষাৎ অনুভূতি সহকারে এই 'জপসূত্রে'র আলোচনা ও আস্বাদন করিতেন, তা যাঁরা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন তাঁরাই প্রত্যক্ষ জানেন। তাই কেবল মনে খেদ জাগিতেছে—আর কাহার জন্যই বা এ রসের পশরা সাজাইয়া পরিবেশনের আয়োজন! সে আস্বাদয়িতা আজ কোথায়? এই গ্রন্থের শেষ কয়টি শ্লোক পর্যন্ত তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় তিনি সাগ্রহে শুনিয়া গিয়াছেন। শেষ যখন তাঁর স্বামিজীর সঙ্গো সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বলেন—"ভগবান একটি বড় কাজের ভার ন্যস্ত করেছেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এটি যেন নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়।" তাঁর এই অমোঘ শুভেচ্ছা আমাদের গ্রন্থ সমাপ্তির পথে অক্ষয় পাথেয় হইয়া থাকিবে।

প্রথম খণ্ডের আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশের বহু সুধী ও মনীষিবৃন্দ ইহার সম্বন্ধে নানা গভীর তথ্যপূর্ণ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন। সর্বাগ্রেই এ প্রসঙ্গো উল্লেখ করিতে হয় বিবুধাগ্রগণ্য পূজনীয় আচার্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের কথা। তিনি প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া এতই উল্লসিত হইয়াছেন যে শুধু একটি নাতিদীর্ঘ সুচিন্তিত সমালোচনা লিখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভবিষ্যতে ইহার আরও বিশদ আলোচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। সংস্কৃত ভাষার একনিষ্ঠ সেবক, সুরসিক, শাস্ত্রমর্মজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সুনিপুণ বিশ্লেষণপূর্ণ আলোচনা আমাদের মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি প্রকাশকদের যেসব কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে

বলিয়াছেন, আমরা ভবিষ্যতে সে সব বিষয়ে তৎপর হইব। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকারের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ আলোচনাও আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ইহাদের সকলের নিকটই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই খণ্ডের (খ) পরিশিষ্টে প্রকাশিত 'হংস' সম্বন্ধে সুচিন্তিত সারগর্ভ নিবন্ধটি আমাদের পাঠাইয়া নীরব জ্ঞানসাধক শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের অনুগৃহীত করিয়াছেন। সেজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রথমখণ্ডে অনবধানতাবশতঃ যেমন কিছু ভুলভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডও তাহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। এখানে কয়েকটি মারাত্মক ভ্রমের সংশোধিত পাঠ দেওয়া যাইতেছে।*

পরবর্তী খণ্ডগুলি যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশিত করার জন্য আমরা যত্নবান থাকিব। বলা বাহুল্য, সুধী ও সহৃদয় পাঠকবর্গের আগ্রহও এপক্ষে আমাদের উৎসাহ দান করিবে।

সর্বশেষে ভুল ভ্রান্তির প্রসঙ্গ করিতে বসিয়া শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রসিদ্ধ নারায়ণী স্তবে "ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা" দেবীর এই ভ্রান্তিরূপটিকে স্বামিজী কয়েকটি কারিকায় যেভাবে ধ্যান করিয়াছেন সেটি সুধী পাঠকবৃন্দকে এস্থলে জানাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

ত্বদ্‌ভ্রান্তির্মম মূঢ়স্য মাতুর্মদ্‌ ভ্রান্তিরীদৃশী
প্রত্যক্তয়া জগদ্‌ভ্রান্তিঃ পাশভ্রান্তিঃ স্মিতেক্ষণাৎ॥
জপভ্রান্তি র্ধ্বনিস্ফোটে জ্যোতিষি ভ্রান্তিরস্য চ।
জ্যোতির্ভ্রান্তী রসৈ কস্মিন্‌ দ্বৈতভ্রান্তী রসে সমে॥

---

*পৃঃ ৭—৬-এর শ্লোকে শেষ লাইনে 'কথং বাধ্যে'র পর 'লভ্যং' বসাইতে হইবে।

পৃঃ ৮২—৩৭ শ্লোকে প্রথম লাইনে 'ক্বচিদপি'র 'কিং' শব্দটি ভুলক্রমে বসিয়াছে, উহা বাদ যাইবে।

পৃঃ ৯৯—১৩ লাইনে 'মন্বয়েস' স্থলে 'সমন্বয়ে' হইবে।

পৃঃ ১১১—৫৮ শ্লোকে প্রথম চরণে 'মনস্তুস্তাব-দুন্ধার কর্ম' 'স্তু'টি বাদ পড়িবে।

পৃঃ ২২১ 'Integral' স্থলে Interval হইবে।

পৃঃ ২২৬ অষ্ট লাইনে 'এই' স্থলে 'সেই' হইবে।

ভ্রান্তিভ্রান্তির্মহাশ্চর্য্যে তুষ্ণীম্ভাবে পরেস্থিতা।
নবধা ভ্রান্তিরূপা যা নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

মাগো আমি তোমার মূঢ় সন্তান তাই তোমায় আমি এমন ভাবে ভুলিয়া আছি কিন্তু তুমিও আবার আমাকে কেন যে এমন করিয়া ভুলিয়া আছ, (ত্বদ্‌ভ্রান্তিঃ) তাও ত বুঝি না (মদ্‌ভ্রান্তিরীদৃশী)।

যদি সৌভাগ্যোদয় বশতঃ আমার এই বহির্মুখ চিত্ত অন্তর্মুখীন হইয়া যায়, তবে আমার এই জগতেরও ভ্রান্তি হইয়া থাকে; আর মাগো যদি তুমি একটিবার সহাস্য নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তবে আমার সর্ববিধ বন্ধনের এবং তন্নিমিত্ত মহাভয়েরও ভ্রান্তি হইয়া যায় (জগদ্‌ভ্রান্তিঃ, পাশভ্রান্তিঃ) তারপর জপ করিতে করিতে নাদের সন্ধান পাইলে (ধ্বনিস্ফোটে), জপের ভ্রান্তি হইয়া যায় (জপভ্রান্তিঃ) তারপর নাদের ভিতর হইতে জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিলে নাদেরও ভ্রান্তি হইয়া যায় (নাদভ্রান্তিঃ) জ্যোতিঃ আবার রসরূপে নিজেকে ঘনীভূত করিলে জ্যোতিরও ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে (জ্যোতির্ভ্রান্তিঃ) পুনশ্চ সেই রস যখন শ্রুতি প্রসিদ্ধ 'একরস' এবং 'সমরস' হইয়া দাড়ায়, তখন হয় দ্বৈতভ্রান্তি। আর শেষকালে যে মহাশ্চর্য পরম তুষ্ণীম্ভাব—সেখানে যাইলে ভ্রান্তিরও ভ্রান্তি হইয়া পরম উপরম রইয়া যায় (ভ্রান্তি-ভ্রান্তিঃ) এবম্বিধ নবধা ভ্রান্তিরূপে মাগো তুমি সংস্থিতা রহিয়াছ; অতএব আমি পুনপুনঃ আমার সেই নবধা ভ্রান্তিরূপিণী জননীকে প্রণাম করিতেছি। ইতি

শ্রীপঞ্চমী—
১৩৫৮

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
(অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ)

জপসূত্রম্

ভুরাদি ব্যাহৃতি, ছন্দঃ এবং সাধন (তত্ত্ব ও চর্যা) সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কারিকাসহ সাধারণ আলোচনা

(১)

জপসূত্রের প্রথমখণ্ডে যে কয়েকটি সূত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, তার পরে সন্নিবেশিত হইবে প্রথম যে সাতটি সূত্র—সেগুলি সপ্ত ব্যাহৃতির লক্ষণ সূত্র। ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি ব্যাহৃতি গায়ত্র্যাদি জপে, যাগহোমাদি অনুষ্ঠানে সর্বদাই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এগুলি কি অর্থহীন, অথবা যদৃচ্ছাকল্পিতার্থ কতকগুলি শব্দ মাত্র? প্রাচীন আর্যবিজ্ঞান এদের মুখ্য স্থানেই বসাইয়াছেন। পুরাণাদি ভাসা ভাসা পড়িয়া এগুলিকে সাতটি 'লোক' এর নাম বলিয়া ধারণা হয়। সেসব লোকের কিছু কিছু বর্ণনাও যে না পাই তা নয়। কিন্তু তাই বলিয়া, কিংবা সেই কারণে যে ভূরাদি ব্যাহৃতি গায়ত্রী প্রভৃতি মন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তা ত' মনে হয় না। শব্দ, অর্থ, প্রত্যয়—তিন দিক দিয়াই ব্যাহৃতির নিশ্চয়ই এক গভীর রহস্য ব্যঞ্জনা আছে। ভূরাদি নিশ্চয়ই মন্ত্রশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলির অন্যতম। শ্রুতি, আগম, পুরাণ স্থানে স্থানে আভাষে ইঙ্গিতে সে কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই যেন, তাঁদের রহস্যমণিমঞ্জুষা সর্বসমক্ষে অবারিত উন্মোচিত করেন নাই। না করার সঙ্গত হেতু ছিল। রহস্য সংবাদের নিমিত্ত আরণ্যক, উপনিষৎ, আগম, গুরুবক্ত্র এবং আত্মপ্রত্যয়—এর কাছেই তাঁরা বায়না দিতেন। যাঁরা সংবাদ লইতেন, তাঁরাও গুহ্য বলিয়া সে সংবাদ যত্রতত্র ভাঙ্গিতে চাহিতেন না।

সাধারণ শ্রদ্দধানতার পটভূমি অতীতে ও বর্তমানে

তারপর, তত্ত্ব (থিওরি) বিষয়ে কথঞ্চিৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও প্রয়োগ বা চর্যা (প্রাক্‌টিস) দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভের পথ রুদ্ধ ছিল না। অবশ্য, 'উপনিষৎ' রহস্যবিৎ না হইলে পূর্ণ ও পরম ফল লাভ হয় না। শ্রুতি, স্মৃতি আগম একবাক্যে

সে কথা বলিয়াছেন। তথাপি, যথাসম্ভব শ্রদ্ধা ভাব এবং কুশল প্রয়োগবিদ্যা (টেকনিক) আশ্রয় করিয়াই অধ্যাত্মজীবনের 'পরীক্ষাগারে' লাগিয়া যাওয়া অসম্ভব হইত না। ভূয়িষ্ঠ স্থলেই তাহাই হইত। বর্তমান যুগে ভূতবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে। পরীক্ষার মূলে যে যুক্তি বা থিওরি, সেটা কতিপয় অভিজ্ঞ পুরুষই অবগত আছেন। বাকি যারা কাজে নামিতেছে, তারা এই বিশ্বাসে নামিতেছে যে, মূলে যুক্তি অবশ্যই রহিয়াছে; এবং অপরে 'হাতে কলমে' পরীক্ষাটি যথাযথভাবে করিয়া ফল পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। এক কথায়, বর্তমানে বহির্বিজ্ঞান (থিওরি, একস্‌পেরিমেন্ট, এপ্লিকেশন সবতাতেই) একটা সাধারণ 'শ্রদ্দধানতা' (শ্রদ্ধানুকূল মনোভাব)—আপনার পক্ষে অনুকূল একটা আন্তর 'আবহাওয়া' সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। সে নৈমিষারণ্যের যুগে অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে এইপ্রকার এক শ্রদ্দধানতার বাহালী আবহাওয়া ছিল। কেবল সে যুগে নয়, পরবর্তী যুগেও সেটা বিলুপ্ত হয় নাই। এখন কৃত্রিম বারিবর্ষণ আমরা এ যুগের 'বিদ্যায়' শ্রদ্দধানা হইয়া করিতে চেষ্টা করিতেছি; সে যুগে, করিতাম তখনকার বিদ্যায় (যাগাদিতে) শ্রদ্দধানা হইয়া। অপরাপর অনেক কিছু সম্বন্ধেও এই কথা।

বর্তমান শ্রদ্ধা সঙ্কট

কিন্তু, অধ্যাত্মসাধন ও সিদ্ধি-বিষয়িণী সে শ্রদ্দধানতা বর্তমানে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই বটে কিন্তু বিপ্লুত, বিদ্রুত (confused, confounded) হইয়াছে সন্দেহ নেই। একদিকে অবিশ্বাস, অশ্রদ্দধানতা, বিবুদ্ধানতা অন্যদিকে 'অন্ধ বিশ্বাস' (তামসশ্রদ্ধা) এবং 'যান্ত্রিক', 'গতানুগতিক' আনুষ্ঠানিকতা—এই দুয়ের মাঝে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' দশা অনেকেরি ঘটিতেছি। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং'—কাজেই, যাঁরা সাধনপথে চলিতে একান্তই ইচ্ছুক, তাঁদের গতি কি?—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'? কিন্তু 'মহাজন'টিকে তো 'চিনিয়া বাছিয়া' লইবেন এই সাধারণ 'অভাজন'! কাজেই, সঙ্কট সহজ হইতেছে কৈ? তারপর, মহাজন যদি বা ভাগ্যে মিলিল, তিনি যে ভাব-বিশ্বাস-নিষ্ঠার 'গুরুদক্ষিণা' (তাঁতে এবং তাঁর দেওয়া সাধনে) 'দাবী' করেন, তা শুনিয়া তো আমাদের মত 'কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাব'দের সেই একলব্যের গুরুদক্ষিণার কথাই মনে উদিত হয়। ঐ ভাব দক্ষিণাটিরই তো অভাব! ভাব-ভক্তি-বিশ্বাস খাঁটি খাঁটি

মেলে কোথায়, কতটুকু? একদিকে 'বিদ্যা', অপরদিকে 'উপনিষৎ'—এই দুইকে 'ফাঁকি দিবার' মতলবেই না অনেক সময় 'অহেতুক ভাবের' ভূমিকা গ্রহণ করি! 'নিষ্কৈতব নিষ্কিঞ্চন' ভাব ভাবের পরাকাষ্ঠাতেই সহজ। দীর্ঘকাল সৎকারাসেবিত সাধনৈরন্তর্য্যদ্বারা এই সহজ ভাবটিতে স্থিত হইতে যত্ন করিতে হয়, বিরাম বা ভঙ্গা দিয়া এ ভাবে সহজ স্বচ্ছন্দ স্থিতিটি সম্ভবে না। কাজেই, কেহই—কোন শাস্ত্র বা মহাজনই 'হাত না বাড়াতেই গগনের গোটা চাঁদ, হাতে ধরিয়া দেবার ভরসা দেন নাই! সুতরাং উপযুক্ত 'কার্যকরী' বিদ্যা এবং যথাসম্ভব রহস্যোপদেশ ও সিদ্ধান্তশ্রবণের আবশ্যকতা না মানিয়া চলিতেছে কৈ?

সাধনায় 'অব্যর্থ মুষ্টিযোগ'

প্রথম খণ্ডের একাধিক স্থলে ইহা বিবেচিত হইয়াছে—অধ্যাত্ম সাধনের যে সকল শাস্ত্রমহাজনজুষ্ট পর পর ভূমি, সে সকল অধিগমের নিমিত্ত কোনও 'সহজ মুষ্টিযোগ' আছে অথবা থাকিতে পারে কিনা। বেদমার্গ কলিতে সর্বথা সাধ্যাশ্রয় না বলিয়া তন্ত্রোক্ত সাধন অনুকল্পে বা বিকল্পে বিহিত হইল। কিন্তু যাঁরা তন্ত্রতত্ত্ব, বিধি, আম্নায়, চর্যাদি অনুশীলন করিয়াছেন, অথবা সাক্ষাদ্‌ভাবে আগমাচারাচরিত পন্থাঃ এবং পারগ পান্থবর্গের সন্ধান লইয়াছেন, তাঁরা কেহই বলিবেন না যে—তন্ত্র কলিতে জীবের ভুক্তি মুক্তির নিমিত্ত 'সহজ মুষ্টিযোগ' বাতলাইয়াছেন। জীবের মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব এবং সেই প্রয়োজনাকূল সম্বন্ধতত্ত্ব ঠিকই আছে। যুগটা 'ঘোরকলি' বলিয়া সেটাকে কুত্রাপি খাট' বা 'সস্তা' করা হয় নাই। তবে 'অধিকার' অন্যরূপ হইয়াছে যুগাদির পরিবর্তনবশতঃ। সুতরাং অধিকার বর্তমানে সচরাচর যেরূপ, 'বিষয়'টাও বর্তমানে তদনুরূপ ও তদুপযোগী করিয়া উপস্থিত করিয়াছেন আগমাদি শাস্ত্র এবং তদনুশীলক আচার্যবর্গ। 'বিষয়' বলিতে 'বিদ্যা' (সাধন প্রণালী, চর্যা ইত্যাদি) ও বুঝিতে হইবে। শ্রীনারদাদি ভক্তিসূত্র প্রবর্তক যাঁরা, শ্রীভাগবতাদি যেসব শাস্ত্র 'নবধাভক্তি সাধনের' ও উত্তম ভাগবতাদির লক্ষণ খ্যাপন করিয়াছেন যাঁরা, তাঁরা কেহই 'উপেয়' এবং 'উপায়'কে 'জলের দরে' বিকান নাই! 'রসিক'ও 'ভাবুক'কে আলাদা পঙ্‌ক্তিতে বসাইয়া নয়, এক পঙ্‌ক্তিতেই 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' যে ভাগবতামৃত সেটি পরিবেশন করিয়াছেন। পরবর্তীকালে যাঁরা ভাগবত ধর্মকে জীবনে

মূর্ত করার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁরাও ‘নিরপরাধ’ হইয়াই সে পরমধর্ম জীবকে আচরিতে বলিয়াছেন। কাজেই, ‘অপরার’ অধঃ যাতে না হয়, সে উপায়টি তো সর্বপ্রযত্নে করিতেই হইবে। যে ব্যক্তি ‘পশুঘ্ন’ নয়, সেই ব্যক্তিরই ‘পশুপাঙ্গাজ-চরণাম্বুজ’ সেবার অধিকার। নিম্নের দুটি কারিকা ভাবনা করতঃ পরবর্তী সুদীর্ঘ ভূরাদিব্যাহৃতি আলোচনার ‘গহনে’ প্রবিষ্ট হইতে সাহসী হও।

মন্ত্রেশাস্যাৎ পরমকৃপয়োচ্চারিতং সিদ্ধমন্ত্রং
শ্রীবিদ্যায়া নিজমবিতথং শক্তিযন্ত্রং ত্বদর্থম্।
তন্ত্রেশী তে গহনকুশলাং তন্ত্রভাসং বিধত্তে
শৃঙ্গে বীজং পয়সি লিখনং দীপ আধ্যে তথাপি॥১
শ্রদ্ধাবীর্য্যং ধৃতিবলমৃতে লভ্যতে নায়মাত্মা
ত্যক্ত্বা ত্যাগং প্রবচনতপোযাগমেধাদিভির্বা।
স্বাত্মানং তে কৃপণমবরং কিং বৃণীতাত্মবর্য্যো
নোত্তিষ্ঠেশ্চেদ্ বরমনুভবং কে বরা দাতুমাপ্যাঃ॥২

সিদ্ধমন্ত্রাদিরও ভাব ও অধিকারানুরূপ উপযোগ

মন্ত্র কোথায় মিলিবে চিন্তা করিতেছ? কিন্তু সাক্ষাৎ মহামন্ত্রেশ্বর যিনি, তিনি (শ্রীজগদ্গুরু এবং মদ্গুরু এই দুইরূপেই) স্বমুখোচ্চারিত সিদ্ধমন্ত্র (প্রণবাদি) অশেষ করুণা প্রকাশ পূর্বক তোমায় শোনাইতেছেন যে! তুমি ‘বধির’ সাজিয়া আছ, তাই সে মন্ত্র শুনিতেছ না ভাবিয়া কদাচিৎ কাতরও হইতেছ! অর্থাৎ, মন্ত্র, মন্ত্রদাতা এবং মন্ত্রদান—এ তিনই আসলে নিত্য; কেবল, সে সম্বন্ধে তোমার ‘সচেতন সংযোগ’টিই ব্যভিচারী, এই আছে এই নাই। আচ্ছা, মন্ত্র না হয় মিলিল। কিন্তু সর্বশক্তির আধার ও আকৃতিরূপ যে যন্ত্র, সেটি? যন্ত্রাশয়েই তো জপধ্যান হোমাদি কৃত্য তোমায় করিতে হইবে! শ্রীবিদ্যারূপিণী স্বয়ং ত্রিপুরাসুন্দরী তোমার নিমিত্ত (ত্বদর্থং) শক্তিযন্ত্র মধ্যে সর্বোত্তম সর্বভাবন যে যন্ত্র (অর্থাৎ শ্রীযন্ত্রাদি) সেটি নিজেই অবিকলভাবে (নিজং অবিতথং) অঙ্কন করিয়াই রাখিয়াছেন যে! কিন্তু সে যন্ত্রের স্বচ্ছন্দে ও স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠার ঠাঁইটি তুমি কিছুতেই দিতেছ না যে! যন্ত্র তো পূর্ণ-সাঙ্গ, অনবদ্য, কিন্তু সে

সাঙ্গোর অঙ্গীকার তোমার হইতেছে কৈ? তারপর, তন্ত্র অথবা প্রয়োগ ও চর্যার সমর্থ সরণি। কর্মের গতি অতীব গহনা। এ গহনে—সংশয় সঙ্কটাদিস্থলে—কেই বা পথের আলোটি অপ্রকম্প করে তুলিয়া ধরিবে? কিন্তু তার জন্যই বা ভাবনা কিসের? স্বয়ং তন্ত্রেশী ভুবনেশ্বরী—স্বহস্তেই তন্ত্রদীপটি নিত্যই তুলিয়া ধরিয়া আছেন। সর্বাবস্থাতেই অনির্বাণ তার স্থির জ্যোতিঃ, সকল গহন সঙ্কটেই কুশল দিশারিণী তার বিমল ছটা (গহনকুশলাং তন্ত্রভাসং বিধত্তে)। কিন্তু তুমি যদি 'অন্ধ' সাজিয়া থাক, চোখের পাতায় ভাঁজের পর ভাঁজ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়াই রাখ, তবে সে দীপই বা তোমার কি কাজে লাগিবে বল? তাই—মহানাম বা বীজ পেয়েও সেটি যদি 'শৃঙ্গো'—গো-মহিষাদির শৃঙ্গের মতো অস্থির মানসে, অথবা শৈল শৃঙ্গের মতো বারিবিন্দুহীন পাষাণ বক্ষে ধারণ কর, তবে কি হইবে বল? ও বীজ অবশ্য নষ্ট হবার নয়, কিন্তু তোমার যে অপেক্ষা-প্রতীক্ষা ধাতে সয় না! কাজেই, 'অপরাধের' বোঝা দিয়া সেটিকে 'অধঃ' করিয়া রাখিতে তোমার যত্নের যে অন্ত থাকে না! তারপর, বাহ্যপূজাদিতে, এবং হৃদয়াদি স্থানে জপধ্যানের নিমিত্ত যে সর্বভাবন শক্তি যন্ত্র তোমার মিলিয়াছে, সে যন্ত্রটি তুমি অঙ্কন করিলে কোথায়? জলে?—পয়সি লিখনম্! আর, চলার পথে ঐ তন্ত্রদীপ কোথায়ই বা জ্বালাইলে? আন্ধ্যে—আপন তামস সংস্কার কল্পিত, আপন জন্ম-জন্মান্তর অভ্যস্ত আন্তর দৃষ্টিহীনতায়?

'ন লভ্যঃ' এবং 'তেন লভ্যঃ' শ্রুতিদ্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ

উপায়? 'যে একের কৃপা বিনে সব ছারেখারে গেল'—সেই একের কৃপা আত্মকৃপা, সম্বল করা চাই-ই। কর্তব্যে নির্বেদ, 'কশ্মল', কল্মষ উপস্থিত হইয়াছিল অর্জুনের মতো বীর সাধকেরও। ক্লৈব্য পরিহার করতঃ, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য ত্যাগ করতঃ 'উঠিয়া পড়িবার' উপদেশ তাই গোড়াতেই শ্রীভগবানের মুখে। তারপর না যত তত্ত্বকথা, বিভূতি বিশ্বরূপ ইত্যাদি! তাই না শ্রুতি বলিতেছেন—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। শ্রদ্ধাবল এবং ধৃতিবল—অন্ততঃ এই দুই আকারে বলের সম্বল নিজের ভিতরে মেলা চাই অথবা মেলান চাই। এ বলের উৎস অভিমান তো নয়ই। বরং খাঁটি নিরভিমান না হইলে এ বল মিলে না। 'তুমি আছ, তোমার নামটি আছে', 'তুমি সত্য, তোমার নাম সত্য'—এ বিশ্বাস-নির্ভরতা থেকে বঞ্চিত রাখিয়াছে ঐ

প্রচ্ছন্ন অভিমানটি তোমার ভিতর। 'বিধ্যেনমিহ বৈরিণং'—ঐ ঘরের মূলনাশা শত্রুটিকে তার যত গোপন আড্ডা থেকে টানিয়া বাহির করিতে হইবেই। তারপর শ্রুতির অন্য মন্ত্র ভাবনা কর—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' ইত্যাদি। প্রবচন, তপঃ, যাগ, মেধা— এ সবই জুটাইয়াছ বটে, কিন্তু 'ত্যাগ'কেই যদি ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাক তো আত্মাকে লাভ করিবে না। ফলাভিসন্ধান ত্যাগ থেকে চিদচিদ্‌গ্রন্থিরূপ যে 'অহং' তাকে ত্যাগ পর্যন্ত সবই এ 'যজ্ঞে' পরপর আহুতি কল্পিত হইবে, তবে না! তোমার আপন 'আত্মা' যদি কৃপণ, 'অবর'ভাবেই শ্রদ্ধাহীনতায় এবং ত্যাগকাতরতায় নিপাতিত থাকে, তবে বল—সেই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'আত্মবর্য্য' (পরমবরেণ্য প্রত্যগাত্মা, পরমাত্মা) তোমায় বরণ করেন কি প্রকারে? তিনি তো তোমায় বরণ করিতে অতন্দ্রিত 'উৎসুক'! কিন্তু তুমি যে সে 'চিরশরণ'কে বরণ কিছুতেই করিবে না, মহামরণকেই বরণ করিবে—রোখ ধরিয়া রহিয়াছ! কাজেই 'যমবৈধ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'—শ্রুতির এই অযাচিত করুণারাশির পরশটুকুও ক্রমাগত পাশাইয়াই চলিতেছ! শেষে, শ্রুতি যে বলিয়াছেন—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'—এ মন্ত্রের অন্তিমভাগ ('প্রাপ্য বরান্ নিবোধত') তোমার বুঝি এখনি চাই, অর্থাৎ, শ্রীশুকদেবের মতো ব্রহ্মবিৎ পুরুষ চাই যিনি তোমায় ভাগবত মহাবাক্যাদি শোনাইয়া এই দণ্ডেই ব্রহ্মশাপমুক্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। কিন্তু মন্ত্রের আদিম ভাগটি সম্বন্ধে কি বলিতেছ?—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'? এখানে তো 'বায়না' তোমার নিজের উপরেই আসিতেছে মনে হয়, নয় কি? এই জন্য কারিকায় বলা হইল—'নোত্তিষ্ঠেচ্চেদ্ বরমনুভবং কে বরা দাতুমাপ্যাঃ'—তুমি যদি নাই ওঠ, নাই জাগ, তবে 'নিবোধ' (নিঃসংশয় বোধ) রূপ শ্রেষ্ঠ অনুভবটি তোমার মিলাইবার নিমিত্ত, কোন্ সাক্ষাৎ অনুভবী পুরুষ তোমার মিলিবে? যদি স্থির জানই যে তিনি স্বয়ং না উঠাইলে কে ওঠে, না জাগাইলে কে জাগে, তবে তুমি তো ওই ধ্রুব বিশ্বাসে উঠিয়া জাগিয়া বসিয়াই আছ! তোমার পরের ভাবনা কিসের?

জপে ক্রিয়া, নিষ্ঠা, ভাব এদের অঙ্গাঙ্গিভাব

জপকর্মে ক্রিয়া, নিষ্ঠা, ভাব প্রভৃতি কেমন ধারা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে এবং পরস্পরের উপকারক হইয়া থাকে, এটি স্মরণ রাখিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে জপ চালাইবার অনুকূল নিম্নের কারিকাপঞ্চক পঠন ও চিন্তন করিবে:—

জপাদ্ বারংবারং যদি রসনয়া স্বাদু ন সকৃন্
ন তন্ নাম্নি স্ত্যানং চিদমলরসে কা বিরসতা।
অধস্তাদ্ ধত্তে চেৎ প্রকৃতিরপরাহন্তর্মলকরী
কথং স্বাদ্বী শুক্লা তব নিরপরাধা জপকৃতিঃ॥৩
জপৈরেবাস্তাং মে বিধুনিতমিদানীং জপরজ
স্তদভ্যাসাদেবানবসরমলং চিত্তমুকুরম্।
তথাপ্যারাধ্যারাধনবিগুণতা সম্ভবতি চেৎ
কিমারাধ্যে নাস্তাং মম নিরপরাধা জপরতিঃ॥৪
জপাভ্যাসে নিষ্ঠা ধৃতিসহকৃতাহস্তুপ্রথমতো
যথা যাগে বহ্নে ররণিমথনাপেক্ষভবনম্।
ততো রুচ্যাদীনাং জপবিষয়িণী বৃত্তিরুদিতা
প্রকর্ষা ন্নিষ্ঠায়া ধৃতিরতিমতীনা মুপচয়ঃ॥৫
কথং নিষ্ঠাভাবে ভজতি ভজনং তদ্‌বিরহিণী
কথং বা সাধিষ্ঠা ফলতি লতিকা ভাবমুকুলা।
কথং বন্ধ্যা ভাবে জনয়তি রতিং বা দুহিতরং
কথং বান্ধ্যে দুহিতুরমৃতং চিৎসুরভিতঃ॥৬
জপেনালং চেৎ ক্ব প্রণবজপ আদৌ কমলজে
নিসর্গো বাগ্‌দোহাৎপ্রণবনিলয় স্তারবিলয়ঃ।
জপাদ্ বৈয়র্থ্যং চেদ্ ধ্রুবমুপদিশেৎ কিং মনুবর
মথো ব্যাসং বাষ্টাদশমিততনুং নারদঋষিঃ॥৭

অপরাধ নিমিত্ত নামের জাড্যাভাস

যদি বল, রসনা তো বার বারই নাম জপ করিতেছে, তবু যে নাম 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে' তার আস্বাদ একটিবারও (ন সকৃৎ) তার ভাগ্যে ঘটিতেছে না! ইহা নামেরই স্ত্যান, জাড্য (শৌক্ষ্য, আলস্য, বৈরস্য) বশতঃ ভাবিয়াছ না কি? কিন্তু প্রণবাদি নাম সাক্ষাৎ চিদমলরস বস্তু, তাতে বিরসতা কিরূপ সম্ভাবিত হইবে বল? কাজেই, বিরসতার মূল অন্যত্র, এবং সেটি হইতেছে তোমার আপন 'অপরাধ'। এই 'অপরাধ'

সাধারণভাবে বুঝিলে চলিবে না। শ্রীভগবান গীতায় যে 'অষ্টধা অপরা প্রকৃতি'র কথা বলিয়াছেন—পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সেই অপরা প্রকৃতির অধস্তাৎ—অধীন হইয়া থাকাই (ধূনন) জীবের মূল অপরাধ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এ তিন ঐ পাঁচভূতের বশ হইয়া তাদেরি 'বেগার' খাটিয়া মরিতেছে! নাম ও নামীর সেবাই যে আমার স্বাভাবিক ধর্ম কর্ম, এ বোধ কোথায়? কাজেই, 'জীবভূতা সনাতনী' শ্রীভগবানের 'পরাপ্রকৃতি' অস্তমিত, তিরোহিত-প্রায় হইয়াই রহিয়াছে যে! অপরা প্রকৃতি স্বভাবতঃই 'অন্তর্মলকরী'—সমস্ত কিছুই ভিতরে ভিতরে মলিন করিয়া দেয় এবং সমল-বিরস করিয়া রাখে। বিশেষভাবে—'অন্তঃ' বলিতে অন্তঃকরণ,—মন, বুদ্ধি, অহংকারকেই বুঝিতে হইবে। অন্তরের সমলতা সততই 'ভূত সেবায়' উপচীয়মান হইতেছে। কাজেই, মন-রসনার বিরসতা ক্রমেই বাড়িতেছে বৈ কমিতেছে না। পিত্তাধিক্যে মুখে মিছরির টুকরাই কি মিষ্টি লাগে? কাজেই, বল দেখি—কেমন করিয়া তোমার জপকর্মটি স্বাদু ও উজ্জ্বল (স্বাদ্বী শুক্লা) হইবে? 'নিরপরাধ'—আন্তরনির্মলতায় স্থিত—না হওয়া পর্যন্ত তো সেটি সম্পূর্ণ ঘটিবার নয়!

জপরজঃ স্থলে জপরতি আবশ্যক

যদি বল, জপকর্মে আমার এই অপরাধজনিত রজঃ (বৈরূপ্য, বৈগুণ্য) জপের দ্বারাই এখন বিধুনিত হউক (ইদানিং আস্তাং); এবং নিরন্তর জপের অভ্যাসেই আমার চিত্তমুকুর (অন্তঃকরণ) এমন শুদ্ধির অবস্থায় আসুক যাতে সে আর কোন মতেই মলকে স্পর্শ করার ও সঞ্চিত হবার অবসরটি না দেয় (অনবসরমলং আস্তাং) অর্থাৎ, জপরজঃ বিধুনিত করার নিমিত্ত—নিরপরাধ জপকর্ম সাধনের নিমিত্ত—স্বয়ং জপই একান্ত অবলম্বন। কথা ঠিক। জপের আপন শক্তির এবং জপের স্বাভাবিক ক্রিয়া তো সেই লক্ষ্যে, সেই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। জপ সৌষ্ঠবে সেই লক্ষ্যের প্রকৃষ্ট সাধন, এবং জপসামর্থ্যে সেই উদ্দেশ্যের সম্যক সিদ্ধি। অরিস্পন্দ সমূহের নিরাকরণ পূর্বক মিত্র স্পন্দসমূহের প্রবর্তন ঘটাইয়া জপ উক্ত সাধনের চরিতার্থতা আনিয়া দিয়া থাকে। অধিকার উত্তম বা অধিমাত্র হইলে 'কেবল' জপাশ্রয়েই সর্বাভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। জপ স্বয়ংই 'মধ্যমার সেতু' পার করাইয়া পশ্যন্তী এবং পরাভূমিতে লইয়া যাইবে। ভাব বল, শক্তি বল, জ্ঞান বল, উপর নীচ কোনও দরওজাই অবারিত হইতে

বাকি থাকিবে না। ঠিক কথা। কিন্তু (তথাপি) কার্যতঃ সর্বক্ষেত্রে এই অবাধিত, অবারিত শুভোদয়, মহোদয়টি হইতে দেখি না যে! ব্যাজ (বৈরূপ্য) ও বিঘ্ন (বৈগুণ্য) পদে পদে দেখা দিয়া জপকর্মের গতিটিকে কেবলমাত্র বিষম কৃচ্ছ্রোদয় করে এমন নয়; পূর্বোক্ত 'অপরাধের' বোঝাটি আরও যেন ক্লেদ-ক্লেশ-গুরু করিয়া দিতেছে এমনও মনে হয়। কর্মের গতি গহনা, কাজেই তার গতিরেখাটি পূরা দেখিতে পাই না বলিয়াই ঐ রকম বিভ্রম ও দৌর্মনস্য ঘটিতে পারে বটে; কিন্তু বাস্তবপক্ষেও, অল্প-বিস্তর ব্যাঘাত (retardation and refraction) যে ঘটিতেছে, এও ঠিক। মিত্রস্পন্দগুলো অরিস্পন্দের 'জট' কাটাইয়া আপনাদিগকে স্বচ্ছন্দ ক্রিয়াশীল করিতে পারিতেছে না। সুতরাং আমার যেটি আরাধ্য (নাম, নামী, নামদাতা), তার আরাধনে বিগুণতা (অপকর্ষ) কোন না কোন প্রকারে সম্ভাবিত হইতেছে। আর, যদি তাই হয় (সম্ভবতি চেৎ), তবে কি করিব? কোন্ উপায়ে আমার আরাধ্যে, ভজনীয় বস্তুতে, নিরপরাধা জপরতি হয়—ইহাই আমার সাধ্য-সাধনা, ধ্যান-জ্ঞান, আশা-আকুতির বস্তু হইবে না কি? 'রাধ্' মানে আরাধনা; এতে অপকর্ষ, অপমর্দ, অপহ্নব হইল 'অপরাধ'। ভজনে যাতে রতি উৎপন্ন হয় এবং সেটি বর্দ্ধিত হয়, সেইটি সাধিয়াই এই অপকর্ষটি কাটাইয়া উঠিতে হইবে। তার নিমিত্ত জপের সঙ্গে পঞ্চ শুদ্ধি, সাধুসঙ্গাদি উপায়ও আশ্রয় করিতে হয়। লক্ষ্য—কিসে জপরজঃ স্থলে জপরতি হইবে।

দ্বিবিধ রজঃ

রজের দ্বারাই রজের শোধন করিতে হয়। যেমন, দর্পণাদির মল ক্ষালনে চূর্ণাদি, জলের নির্মলীকরণে ফটকিরিচূর্ণ ইত্যাদি। শ্রীগুরুপাদপঙ্কজরজঃ যে একাধারে পঞ্চশুদ্ধি বিধায়ক তা তো আগেই বলা হইয়াছে। রজঃ দুই প্রকারের—অপরাধোত্থিত রজঃ এবং উত্থিতাপরাধ রজঃ। প্রথমটি, অপরাধজন্য এবং তারির একটা অঙ্গ, দূষণ; দ্বিতীয়টি অপরাধ থেকে উত্থানের উপায়, করণ, ভূষণ। প্রথমটি, প্রকটিতাধঃকোলাহলের, দ্বিতীয়টি প্রশমিতাধঃকোলাহলের ভূমির দ্যোতক। যেমন আগুনের বেলা ধূম ও ভস্ম। অত্যুত্তম বা অধিমাত্র অধিকারস্থলে নিরপরাধা জপরতি স্বতঃসিদ্ধা। তথাপি রতির অঙ্কুরোন্মেষেই উত্তম ভজন আরম্ভ। উত্তম জ্ঞানীর মহাবাক্য শ্রবণমাত্র অথবা জপমাত্রই সাক্ষাৎকার হইবে বটে, তথাপি 'জীবন্মুক্ত' ভাবে অচলপ্রতিষ্ঠ রহিতে মনন-

নিদিধ্যাসনাদির উপযোগ যে একান্তই নেই এমন নয়। লব্ধসমাধির পক্ষেও সহজ সমাধি লক্ষ্য হইতে পারে। ফল কথা, উত্তমাধিকার স্থলে, এমন কি উত্তমভূমি অধিগত হবার স্থলেও, কোথায় যে 'নিরপরাধ রজঃ' ঠিক ছুটি পাইবে তা বলা কঠিন। ভক্তেরা তো ব্রজেও রজঃ সানুরাগেই রাখিয়াছেন। নীচের অধিকারে, 'কেবল' জপই করি, আর 'সহিত' (সহকৃত, তদনুকূল অন্য সাধন যথা নবধাভক্তি সাধনে) ভাবেই করি, রজের দ্বারাই রজের প্রতীকার ও সৎকার করিতে হয়। অর্থাৎ, মিত্রস্পন্দের ও ছন্দের দ্বারা অরিস্পন্দ ও ছন্দের। মৃদু ও মধ্য অধিকারে তাই-যে নিষ্ঠা জপাদি কর্মে দুর্বল ও শিথিল, সেটি প্রথমতঃ 'ধৃতি সহকৃতা' করিতে হয়, কর্ম ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, সেটিকে ধরিয়া থাকিতে হয় ('লগা রহো ভাই')। তৎকাল ধৃতিই মুখ্যসাধন। যেমন, যে যাগকারী তাকে আবশ্যক অগ্নি মন্থনের নিমিত্ত অরণি অনলস হইয়া ঘর্ষণ করিয়াই চলিতে হয়। সেবায় অগ্নি তুষ্ট হইয়া প্রকট হইবেনই—এই বিশ্বাস রাখিতে হয় ('বনত বনত বন যাই')। যাতে ধৃতি ও বিশ্বাস এ দুয়েরি বল বৃদ্ধি পায় সেটি (অনলস জপাভ্যাস দ্বারা এবং আনুষ্ঠানিক অপরাপর সাধন দ্বারা) করিতে হয়। অর্থাৎ, নিষ্ঠাকে দৃঢ় করিলে ধৃতিসহকৃতা ক্রিয়াদি দ্বারা; ধৃতিকে বর্দ্ধিত করিলে শ্রদ্ধাদি দ্বারা; আবার, নিষ্ঠা প্রবল হইলে ধৃতি ও শ্রদ্ধার বলাধান। সাধন ব্যাপারে এই নিয়মটি কার্যকরী মনে রাখিবে:— পারস্পরিকভাবিত্বং সংহত্যক্রিয়মাণতা। সাপেক্ষত্বং তদঙ্গত্বং সাহিত্যমিতি পঞ্চধা॥ ৮ এ কারিকাটির ব্যাখ্যা পরের শ্লোকে মিলিবে। এখানে শুধু এইটুকু লক্ষ্য কর— কিভাবে ধৃতি, শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা (নিয়মে স্থিতি) পরস্পরকে সাহায্য করিয়া বর্দ্ধিত করে। এ তিনের পুষ্টি উপযুক্ত মাত্রা লাভ করিলে (যথা, কৃষিকর্মে পারিপার্শ্বিক বীজ ও ক্ষেত্র) জপাদি বিষয়ে রুচি, রতি প্রভৃতির বৃত্তি উদিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্‌গম হয়)। তার ফলে, নিষ্ঠার প্রকর্ষ (প্রকৃষ্টরূপে উৎকর্ষ) ঘটে, এবং সেটি হইলে ধৃতি, রতি, মতি এ তিনেরি সমৃদ্ধি (উপচয়) পরিলক্ষিত হয়। এ স্থলে পারস্পরিকভাবিত্ব প্রভৃতি পাঁচটিকেই উদাহৃত হইতে দেখি। যথা পরের শ্লোকে—

ভজনাঙ্গ সমূহের পরস্পর অপেক্ষা

তারপর ভাবিয়া দেখ—নিষ্ঠার অভাব থাকিলে ভজনই বা আপনাকে ভজন (সেবা) করে কি করিয়া? এতদদ্বারা নিষ্ঠা ও ভজনের 'সাহিত্য' এবং 'সাপেক্ষত্ব' এ দুই-ই

বলা হইল। সাপেক্ষত্ব বিশেষ করিয়া দেখাইবার নিমিত্ত বলা হইতেছে—ভজন বাদ দিয়া শুধুই নিষ্ঠা বিশেষ কাজের হয় না, দৃঢ়া ও সাধ্বী হয় না (তদ্‌বিরহিণী কথং বা সাধিষ্ঠ্য)। কাজেই, ভজনের সঙ্গে নিষ্ঠার পরিণয় ঘটাইয়াই চলিতে হইবে; ভজনবিরহিণী নিষ্ঠা সাধিষ্ঠা হয় না। তদনন্তর, এ দুয়ের 'সংহত্যক্রিয়মাণতা'—দুয়ে মিলিয়া কি করে—সেটি চিন্তা কর। তোমার এত সাধের যে আশা-লতিকা, সেটিকে ফলবতী করে। কি তার ফল? বিজ্ঞানভাতি এবং ভজনরসমাধুরী। একেবারে, সঙ্গে সঙ্গেই, সেটি হইয়া থাকে? না, আগে লতিকায় মুকুলমঞ্জরী দেখা দেয়। কেমন সে মুকুল? ভাবমুকুলা—ভাবের মুকুল তোমার সাধনবল্লরীতে উদ্‌গত হইয়া থাকে। এর দ্বারা 'তদঙ্গত্ব' রূপ লক্ষণটি বলা হইল। লতিকার দৃষ্টান্ত বুঝিলে, এইবার অন্যভাবে ভাবনা কর। নিষ্ঠাসহকারে ভজনের ফলে তোমার 'ভাব' দেখা দিল—ভাবের উৎসের মুখ খুলিয়া গেল। এতদিন যেন তোমার ভজনকুটীরে একলাটি মালা-হাতে ছিলে, এইবার তোমার ঘরের 'ঘরণী' মিলিল, ভাবের দুলালী। কিন্তু তাতেই কি তোমার সাধ পুরিল? না, তা তো পূরে নাই। একটি 'মেয়ের' মুখ দেখিবার বাসনা! মেয়ে?—হ্যাঁ, তার নাম রতি (রতিং বা দুহিতরং)। তোমার ভাবদুলারী ঘরণীটি বন্ধ্যা (বাঁজা), কেবলি ভাব-বিলাসিনী হইলে তো দুহিতার রাতুল মুখটি দেখিতে পাইবে না! আচ্ছা, মেয়ে না হয় হইল—তোমার ভজন রতি জন্মিল। সাধ মিটিল এইবার? না, যদি 'কানা' রাতুল মেয়েই ভাগ্যে মেলে তবে দুহিতার সেই আসল কাজটি (দোহন) কিরূপে করিবে বল (দুহ্যাঃ)। দোহন? কার দোহন? 'চিৎ' নাম্নী তোমার এক চিরদুঘা সুরভি আছে, তাকেই তো দোহন করিতে হইবে। কিসের জন্য? চিদানন্দ—জ্যোতীরস—রূপ অমৃতের নিমিত্ত (অমৃতং চিৎসুরভিতঃ) কিন্তু দুহিতা অন্ধ হইলে চিৎসুরভির দোহন তো তার দ্বারা সম্ভব হইবে না। কেননা, যেটিকে দোহন করিবে, সেটি সাক্ষাৎ 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' চিদবস্তু; এবং যাহা দোহন করিবে, তাও একাধারে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও রস (পরমোজ্জ্বল রসবস্তু)। কাজেই, ভাবে বন্ধ্যাত্ব এবং রতিতে আন্ধ্য—এ দুইএর কোনটি হইলে চলিবে না। এর দ্বারা 'পারস্পরিকভাবিত্ব' লক্ষণটি বুঝিয়া দাও। ভাব ও রতি এ দুয়ের পরস্পর জন্য-জনক সম্পর্ক আছে; জ্যোতিঃ এবং রসেরও তাই। ভাবরস উন্মুখ হইলে রতি, আবার রতি প্রগাঢ় হইলে ভাব; ইত্যাদি।

জপের একান্ত আবশ্যকতা—উদাহরণ

যদি বল, নিষ্ঠাসহকারে ভজন না হয় আবশ্যক হইল, কিন্তু জপের কি এমন আবশ্যকতা? (জপেনালং চেৎ)। জপের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, এবং আধারের বৈরূপ্য বিদুরিত করতঃ জপ যেভাবে আনুরূপ্যাদি ঘটাইয়া দেয়, তাতে জপ অনাবশ্যক এ শঙ্কা কোন মতেই ওঠা উচিত নয়। তথাপি, যদি বল—জপে কাজ কি আছে, তাঁকে প্রার্থনা করি, তাঁতে 'ধেয়ান ধরি', আচ্ছা, তবু বলিবে কি—স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও সৃষ্টির আদিতে (আদৌ) প্রণবাদি সমর্থবীজ কেনই বা জপ করিতে হইয়াছিল? সমর্থ-শব্দপ্রভবই তো সৃষ্টি এবং স্বয়ং প্রজাপতিকেও মধুকৈটভ ভয়মুক্ত হবার নিমিত্ত বিশেষতঃ অর্দ্ধমাত্রারূপিণী যোগনিদ্রাকে জপে প্রসন্ন করিয়াই প্রণবাদির নিরতিশয় সৃষ্টিসামর্থ্য জাগরিত, উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। স্তবে, না, জপে? তুমি আমি স্তবরূপেই পাইতেছি বটে কিন্তু আসলে ওটি জপ। অক্ষমালায় জপ? হ্যাঁ, 'অক্ষ' বা Axis সাহায্যে প্রসুপ্ত মাতৃকা (অক্ষরমালা) মন্থন করতঃ মাতৃকাশক্তির পূর্ণ উদ্ধার এবং চৈতন্যসম্পাদনরূপ কর্ম। মহাকুণ্ডলীর জাগৃতি সাধন। একে জপই বলে। তারপর, 'বাগ্‌দোহ' (প্রণবাদি বাকের সারনিষ্কর্ষ) হইতে নিসর্গ, তার মূলেই কেবল যে জপ, এমন নয়; শাশ্বতিক প্রণবাদি জপের আধারেই নিসর্গ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (প্রণবনিলয়ঃ)। অর্থাৎ, নিসর্গ এবং তদন্তর্গত প্রতিটি বস্তু আপন আপন বীজমন্ত্রের দ্বারাই বিধৃত, পালিত ও চালিত হইতেছে। অপরাপ্রকৃতিতে অনুস্যূত ইহাও তো শ্রীভগবানের পরাপ্রকৃতির এক বিশিষ্ট রূপ। 'জীবভূতা সনাতনী'টি বীজভূতা সনাতনীও বটে, এবং তাই না 'যয়েদং' ধার্য্যতে জগৎ'! আচ্ছা, নিসর্গের লয়? তাও জপের বিলোম সীমা ভূমিতে, যথা—'হংসঃ' যদি অনুলোম জপে নিসর্গসৃষ্টি বোঝায় তো 'সোঽহম্' জপে নিসর্গের বিলয় (ভূতশুদ্ধি চিন্তা কর)। আচ্ছা, মূলের ব্যাপারে এই মৌলিক জপ না হয় ঘটিল, কিন্তু অস্মদাদির ক্ষেত্রে? ব্যষ্টির 'স্থলেও ঐ সমষ্টির নৈসর্গিক সূত্রই চলিতেছে। দেখ, বালক ধ্রুবের মত অমন অধিকারীর নিমিত্তও দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র (মনুবরং) উপদেশের এবং তার ঐকান্তিক জপের প্রয়োজন হইল। ধ্রুবের ভাব বিশ্বাসাদি কিসের অভাব ছিল বল? কাজেই, 'জপাদ্ বৈয়র্থ্যংচেৎ'—এ শঙ্কা তুলিও না।

যে দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে উক্ত মহামন্ত্র উপদেশ করিলেন, তাঁর নিজের নিমিত্তও মন্ত্রজপ কি আবশ্যক হয় নাই? (ভাগবতে শ্রীনারদ-ব্যাস সংবাদটি দেখ।) আবার, বেদব্যাস নারদের (শুধু মুখের কথায় কি?) 'পরামর্শে' ভাগবত রচিলেন। অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকী, পরমাদ্ভুত এক সামগ্রী! রীতিমত ধ্যান করিয়া তবে লীলাদি প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল। শুধু 'শোনা গল্প', রিপোর্ট কি অমনধারা হৃৎকর্ণরসায়ন গলিত অমৃত ফল হয়? আচ্ছা, প্রসঙ্গাক্রমে, ব্যাসদেবেরে 'অষ্টাদশ' সংখ্যাটিতে এত 'মমতা' কেন বলিতে পার? মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব, গীতা অষ্টাদশ অধ্যায় ইত্যাদি। শ্রীনারদ কি ব্যাসদেবে 'এমনই' শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন ভাগবতরচনায়? কোনও 'গোপন' মন্ত্রদীক্ষা দেননি তো, এবং সেই মন্ত্রে জপধ্যান উপদেশ করেননি তো, শ্রীভগবানের সর্বোত্তম, ঐশ্বর্য-মাধুর্যময়ী লীলা প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত? সে সংবাদটি অবশ্য 'প্রকাশ' নেই; তবু, সে মন্ত্রটি অষ্টাদশাক্ষরী কোনও মন্ত্র (যথা, গোপীজনবল্লভমন্ত্র) নয় কি? মূল রহস্য যাই-হৌক, এটা ঠিক যে জপ সকল ঋদ্ধি-সিদ্ধির, ভুক্তি-মুক্তি, এমন কি ভক্তিরও মূলে। এ হেন জপে কাজ কি বলিয়া শঙ্কা তুলিবে কেন?

জপের পরিপূর্ণতার ভূমি

জপাদির লক্ষ্যবস্তু (অর্থাৎ জপাদির দ্বারা যেটি সাধ্য), সেটিকে তো কোনমতেই খাট' করিয়া লইলে চলিবে না। জপকে এক 'নিম্নভূমির' সাধন (এমন কি, সাধনের মধ্যে 'অধম') মনে করা সর্বথা অনুচিত। এই ভূমিকায় ছন্দের পাঁচটি পাদ সবিস্তার প্রদর্শিত হইবে। শেষ দুটি পাদ—মহাসমন্বয়ী এবং পরমসমন্বয়ী—অধিগত না হওয়া পর্যন্ত জপের চরিতার্থতা নেই, এবং ওই দুই সর্বোত্তমভূমি অধিগমের পক্ষে মুখ্য সাধন জপ। এটি নীচের কারিকায় স্মরণ করিবে:—

যথা সুপ্তঃ ষড়্জাদিরুতিরভসান্নাদ উদিতো
যথা ভাঃ শুক্লৈকা সতি শবলবর্ণালিমিলনে।
যথালাপো বীণাহৃপহতসুরতন্ত্রীপরিকৃতৌ
যথা খে বাক্‌চিত্রে বিলয়মিত আস্তাং তব তথা ॥৯

সবিশেষভাবের পরিপূর্ণতা যেখানে এবং অশেষ বিশেষের উপশম যেখানে—সে দুটিই হে জাপক! তোমার 'গন্তব্য' বলিয়া জানিও। একদিকে জীবনের নিখিল সম্ভাবনার চরিতার্থরূপ যে মহাসমন্বয়ী ছন্দঃ সেটি তোমায় সাধিয়া পাইতে হইবে; আবার, অন্যদিকে, সেটির পরমাধাররূপে এবং সেটিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া যে পরমাব্যক্ত শুদ্ধ নিরঞ্জন সত্তা রহিয়াছে, সেটিও তোমার আত্মপ্রত্যয়গোচর হইবে। তাই কারিকায় বলা হইল—তোমার ভিতর নাদব্রহ্ম সে 'সুপ্তমিব' রহিয়াছেন; জপে তাঁকে 'ডাকিয়া তোল'। যেমন ধারা ষড়্‌জঋষভাদি সপ্ত-স্বর এবং তত্তদনুগত শ্রুতির আগ্রহে (রভসাৎ) ঘুমন্ত নাদ জাগিয়া উঠিয়া পরমবিস্ময় ভৈরবাদি রাগমূর্তিতে নিজেকে লীলায়িত করেন, তোমাকে ভূরাদি সপ্ত ব্যাহৃতি এবং গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দঃ দ্বারা তাহাই করিতে হইবে। স্বয়ং বিশ্বনাথের ঋত এবং সত্য বিশ্বরূপ যে মহা সঙ্গীত, তোমার আপন জীবনসঙ্গীতটিকেও তারির সমন্বয়েই সাধিতে হইবে। একে বলে মহাসমন্বয়ী ছন্দের সাধনা। স্বভাবের স্ব-ভাবটিকে মিলাইতে হইবে। তারপর দেখ, অশেষবিচিত্রিত (শবল) যে বর্ণালি, তাদের পরস্পর মিলনে (সতি মিলনে) কি হয়? একমাত্র শুভ্র আলোক—এক শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্যোতিঃ (ভাঃ শুক্লৈকা)। তোমার জীবনের এবং বিশ্বভুবনের অশেষ বিচিত্র বর্ণালি বিশিষ্ট ছবিটিকে ওই পরম শুক্ল জ্যোতিতে না মেলান পর্যন্ত তোমার জপের ছুটি নেই। লক্ষ্য তো মিলিল, কিন্তু উপায়? এ সাধনবীণার তন্ত্রীগুলো যে এলাইয়া বেসুরা হইয়া পড়িয়া আছে (অপহত-সুরতন্ত্রী)! মহারাগ আলাপন কিরূপে সম্ভব হইবে? সুরতন্ত্রীর পরিকর্ম (পরিকৃতি)—'সুরে বাঁধা' কর্মটি সযত্নে করিয়া লইতে হইবে। তাতে আয়াসও বিস্তর, ব্যথাবেদনাও প্রচুর। তবু সেটি করিতেই হইবে। জপই তার সাধন। সুরে বাঁধা যন্ত্রে মহাবিস্ময় সুর বাজাইলে। জীবনের পটভূমিকায় অপরূপ মনোহারী ছবিটিও আঁকিলে। কিন্তু মহাকাশে (খে) যেমন ধারা অপূর্ব বাণী এবং অপরূপ চিত্র দু-ই মিলাইয়া যায়—শুদ্ধ নিরঞ্জন সত্তায় সমস্ত কিছুর অবসান হইয়া যায়—(বাক্‌চিত্রে বিলয়মিতঃ), তোমারও তদ্রূপ হৌক! (আস্তাং তব তথা)। অর্থাৎ, সবিশেষ-নির্বিশেষ, মহান এবং পরম—এই দুইদিক দিয়াই ('দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে') তোমার সাধনচরিতার্থতা লাভ হৌক।

জপসূত্রম্

(২)

সপ্তব্যাহৃতির মূল আকৃতি ও রহস্য ব্যঞ্জনা

সপ্ত ব্যাহৃতির মূল আকৃতি এবং সে সমূহের রহস্য ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অতঃপর আলোচনা হইতেছে। প্রথম ব্যাহৃতির ব্যাখ্যায় আমরা এটা লক্ষ্য করি যে 'ভ'কার 'প'বর্গের চতুর্থ বর্ণ, সুতরাং, মহাপ্রাণ। তৃতীয় বর্ণ 'ব'কারে যেটি অল্পপ্রাণ সেটি 'ভ'কারে মহাপ্রাণতা লাভ করে। জগতের মূল বস্তুটিকে উপাদান অথবা অধিষ্ঠানরূপে দেখিলে সেটিকে বলা যায় চিৎ অথবা চৈতন্য। কিন্তু জগতের সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত সেই উপাদান বা অধিষ্ঠান মাত্র তাহাই থাকিলে চলে না, সেটিকে আমাদের নিমিত্ত-রূপেও পাইতে অথবা ভাবিতে হয়। মূল উপাদান বস্তুর এবংবিধ নিমিত্তরূপে যে আবির্ভাব, সেটিকে কেবল চিৎ না বলিয়া 'চিৎ-শক্তি' বলাই সঙ্গত। চিৎ-শক্তিরূপে চিৎ কেবল যে প্রকাশমাত্র এমন নহে, পরন্তু সেটি নিজেকে 'অহং' 'ইদং' ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ভাবে ঈক্ষণ করিতেও সমর্থ। শুদ্ধ প্রকাশরূপে যে নিত্য-স্ফুটীভাব তার সঙ্গে এবম্প্রকার বিশেষ বিশেষ ঈক্ষণ পূর্বক যে স্ফুটী-ভাব তার বৈলক্ষণ্য মনে রাখিতে হইবে। এইটি মনে না রাখিয়াই কেহ কেহ শ্রুতি এবং অনুভবসিদ্ধ যে নির্গুণ নির্বিশেষ প্রকাশরূপতা সেটিকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। পক্ষান্তরে চৈতন্যের এই যে বিশেষ বিশেষ ঈক্ষণ পূর্বক প্রকাশ সেটিকেও নস্যাৎ করিয়া দিবার উপায় নাই। এই ঈক্ষণটিও শ্রুতি এবং অনুভব উভয়থা সিদ্ধ। নিখিল শব্দ অর্থ এবং প্রত্যয়ের সমষ্টিরূপ এই যে বিশ্ব, ইহার আবির্ভাবের জন্য মূলে কোনও এক নিমিত্তের অপেক্ষা অবশ্যই রহিয়াছে। সেই নিমিত্তটিকে শ্রুতি ঈক্ষণ, কাম, তপঃ, সঙ্কল্প ইত্যাকার কতকগুলি রহস্য শব্দ দ্বারা আমাদিগকে বলিতে চাহিয়াছেন। এই নিমিত্তটিকে আবার অনিমিত্তক নিমিত্ত বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নিমিত্তের আবার নিমিত্ত আছে, তার আবার নিমিত্ত আছে, এইভাবে নিমিত্তপরম্পরা কল্পনা করিতে যাইলে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং মূল উপাদানের এইরূপ নিমিত্তরূপে আবির্ভাব কোন প্রকার

নিমিত্তপরম্পরা দ্বারা বুঝা যায় না। যদি যাইত তবে সেটি মূল হইত না। যদি এটির নাম 'মায়া' দেওয়া হয় তবে সে মায়াকে অবশ্যই অনির্বচনীয়া বলিতে হইবে। যদি 'প্রকৃতি' নাম দেয়া যায় তবে সে প্রকৃতিকে 'অমূলম্ মূলম্' বলিতে হইবে, যদি 'শক্তি' নাম দেওয়া যায় তবে সে শক্তিকে অবশ্যই অচিন্ত্যা শক্তি বলিতে হইবে। বিশ্বব্যবহারে সকল প্রকার লক্ষণ, হেতু, নিমিত্ত ইত্যাদির মূলে যে মহারহস্যটি রহিয়াছে তার নিজের সম্বন্ধে কোনরূপ লক্ষণাদি চালাইতে গেলে চলে না। যদি চলিত তবে সেটি আর মূল হইত না; তার পিছনেও আবার মূলের সন্ধান চলিত। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয়পাদের গোড়াতেই মায়া এবং মহামায়া সম্বন্ধে সূত্র আছে এবং তাতে বিস্তারিত কারিকাও দেওয়া হইয়াছে। মহামায়া সূত্রের আলোচনা স্থলে আমরা চিৎ এবং চিৎশক্তি এতদুভয়ের সম্পর্কটি বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। দর্শনশাস্ত্ররসিক পাঠক জপসূত্রকারের পূর্বাশ্রমরচিত ইংরাজিভাষায় Mahamaya এবং Vedanta Philosophy নামক গ্রন্থদুটি এতৎপ্রসঙ্গে পড়িয়া দেখিতে পারেন।

মূলের সম্পর্কে প্রাণের স্থান—অবর্ণ

বিশ্ব ব্যাপারে ঈরিতা বা প্রেরয়িতারূপে চিৎশক্তির যে আবির্ভাব সেটি প্রাণ এই আখ্যায় শ্রুতি এবং অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। জপসূত্রেও উপোদ্ঘাতে এবং অন্যত্র প্রাণ সেই ভাবেই লক্ষিত হইয়াছেন। চিৎশক্তির প্রাণরূপে বিশ্বব্যাপারে প্রযুক্ত হইলে তার আধার ও অনুক্রমরূপে যে মূল-স্বরবৃত্তি প্রাপ্ত হন, সেটি হইল সকল স্বরের আদি এবং সকল ব্যঞ্জনের আশ্রয় যে 'অ'কার তাহাই। অর্থাৎ চৈতন্যে অথবা প্রাণে শব্দরূপে স্ফুটীভাবের অনুক্রম এবং আধার এর দুই হইল 'অ' বর্ণ। সঙ্গীতের স্বর সপ্তকের যেমনধারা ষড়্জ বা সা। এজন্য উপোদ্ঘাতে মহাদেবের অঘোরাদি পঞ্চমূর্তির রহস্য নিরূপক শ্লোকে 'অ' বর্ণকে এই বিশ্বরূপ মহাযজ্ঞের 'অগ্নিচিৎ' কিনা অগ্নির চয়নকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই অগ্নিচয়ন কর্মটিতেই বিশ্বমহাযজ্ঞের আরম্ভ এবং এই কর্মটি বিশ্বমহাযজ্ঞের আধার। তৎপরে 'অ' বর্ণকে আশ্রয় করিয়া নিখিল স্বরব্যঞ্জনের স্ফুটীভাব বা প্রকাশ হইতে থাক। এই স্ফুটীভাবের চিত্রে প্রাণকে আমরা যেন ঊর্মিভঙ্গে রূপায়িত হইতে দেখি। কোথাও প্রাণ নিজেকে হ্রস্ব বা স্বল্প করিতেছেন। কোথাও বা আবার নিজেকে দীর্ঘ এবং মহান

করিয়া দেখাইতেছেন। কোথাও তিনি অঘোষ, আবার কোথাও তিনি ঘোষবান্। শব্দের এবম্প্রকার অভিব্যক্তির চিত্রে কোন্ স্থানে আমরা প্রাণকে সর্বোত্তম উর্জ্জিতরূপে দেখিতে পাই? ঊর্মিরাশি তো উঠিতেছে, পড়িতেছে, কোথাও সেগুলি হ্রস্ব, কোথাও বা সেগুলি দীর্ঘ, আবার কোথাও সেগুলি উচ্চ, আবার কোথাও সেগুলি অনুচ্চ বা অবচ।

মহাপ্রাণবর বা 'প্রাণেশ' 'হ' বর্ণ

এখন প্রশ্ন হইতেছে কোন্ শব্দাভিব্যক্তিতে পৌঁছিয়া প্রাণ সামর্থ্যে এবং ছন্দে কাষ্ঠা বা সীমা লাভ করে? সেই শব্দটি হইল মাতৃকাবর্ণমালার যেটি শেষ বর্ণ সেই 'হ' কার। 'অ' কার এবং 'হ' কার এতদুভয়েই কণ্ঠ প্রযত্ন দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ, তথাপি 'হ' কারকেই মুখ্যভাবে মহাপ্রাণ বর্ণ মনে করিতে হইবে। এই জন্য কারিকায় 'হ' কারকে বলা হইয়াছে 'মহাপ্রাণবর'। এই 'হ' কারের অনুগ্রহ না পাইলে কোন বর্ণই যেন মহাপ্রাণ হবার ভাগ্য লাভ করে না। 'ক' কারাদি পাঁচটি বর্গে যথাক্রমে ঘ, ঝ, ঢ, ধ এবং ভ এই পাঁচটি চতুর্থবর্ণ 'হ' কারের অনুগ্রহভাগী হইয়াছে, সেই কারণে ইহারা মহাপ্রাণ। শক্তির যে মূলবীজ 'হ্রীঁ' এবং যজ্ঞের আহুতি মন্ত্র 'স্বাহা' এতদুভয়ের মধ্যে 'হ' কার কেন্দ্রস্থলে রহিয়া মহাপ্রাণতার যে কাষ্ঠা বা সীমার কথা বলা হইল সেইটির সূচনা করিতেছে। জপাদি যে কর্ম্মেই শক্তির বিশেষভাবে উদ্বোধন আবশ্যক হয়, সেখানেই মহাপ্রাণশ্রেষ্ঠ এই 'হ' বর্ণটিকে আশ্রয় করিতেই হয়। যথা, কুণ্ডলিনীর জাগরণে 'হুং' এই বীজ অথবা 'হংসঃ সোঽহম্' ইত্যাদি।

'অনুগ্রহ' এবং 'উর্জ্জঃ'

'ভূঃ' এই শব্দে 'ভ' কার 'প' বর্গের চতুর্থ বর্ণরূপে মহাপ্রাণবর যে 'হ' কার তার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে অনুগ্রহ আবার উর্জ্জঃশক্তিরূপে নিজেকে প্রকট না করা পর্যন্ত বিশ্ব-মহাযজ্ঞের যেটি সম্ভাবনা বা সূচনা সেটি নিজেকে 'অয়ং' বা 'এই'রূপে দেখাইতে পারে না। এই উর্জ্জঃশক্তিকে আমরা অন্যত্র বারাহী শক্তি বলিয়াছি। যাহা কিছু শুধু সম্ভাবনা অথবা বীজ অথবা সংস্কাররূপে রহিয়াছে, সেটিকে আপন উর্দ্ধগশক্তিতে উত্তোলন পূর্বক সাক্ষাৎ প্রকটরূপতা দিয়া থাকেন এই

বারাহীশক্তি। একটা ক্ষুদ্র বীজের ভিতরে বিশাল মহীরুহের সম্ভাবনা ও সংস্কার অবশ্যই নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু সে সম্ভাবনাটি যে কোন্ অতলে ডুবিয়া রহিয়াছে তার পাত্তা মিলিতেছে না। এই নিমিত্ত সেটিকে একটা ক্ষুদ্র বীজ কণিকারূপেই দেখিতেছি। এই বীজকণিকা এবং তার চরম পরিণতি যে মহামহীরুহ এ দুয়ের মধ্যে অনেকগুলি স্তরের—অবস্থা ও সংস্থার ব্যবধান। কোন এক ঊর্দ্ধগ শক্তি পর পর এই সমস্ত অবরোধক স্তর সরাইয়া বীজশক্তিটিকে তুলিয়া না ধরিলে সেটি যেন নিমজ্জিত, অলসিত, তিরোহিত হইয়াই রহে। বারাহীশক্তি বীজের সত্তা শক্তিটিকে আপন 'দংষ্ট্রা' দ্বারা উত্তোলিত করিয়া সেটিকে পরিপূর্ণ বিকাশের অভিমুখে চালিত করিয়া দেন; বিশ্বের সর্বত্রই এই ব্যাপারটি ঘটিতেছে। জড়, প্রাণ, মন সর্বত্র। জপ বৈখরী ভাবেই আরম্ভ হয়, কিন্তু পশ্যন্তী এবং পরাভূমির জ্যোতিঃ এবং আনন্দরাশিরূপে এবং তদুভয়ের অখণ্ড সামরস্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত জপের পরিপূর্ণ সার্থকতা নাই। বর্তমানে যে জপ কতিপয় অক্ষররূপে অথবা একটা কল্পিত অর্থরূপে নিজেকে জানিতেছে, সে জপ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজেকে এক পরমজ্যোতিঃ এবং রসের উপলব্ধিতে সাক্ষাদ্ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ জপ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের ওই বীজ কণিকার মত কেবল একটা 'সচল' সম্ভাবনা বা সংস্কার মাত্রই রহিয়া যাইতেছে। যেটি সচল সেটি আবার অচলের মতও হয়। জপের বেলাতেও ঊর্জ্জঃশক্তি বা বারাহীশক্তি দ্বারা তার সম্ভাবনাটিকে পরিপূর্ণ বাস্তবরূপে পাইতে হয়। মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান—সেটিকে আমরা আগে 'মধ্যমার সেতু' বা 'সুড়ঙ্গ' বলিয়াছি।

ঊর্জ্জঃশক্তির পথে সেতু ও গ্রন্থি

সেতু পার হইয়া পশ্যন্তীর সীমানায় পৌঁছিলেই ছুটি নাই। সেখানেও কতকগুলি অবরোধক স্তর (Veiling and faulting strata) ঠেলিয়া পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। কেননা পশ্যন্তীর প্রথম সোপানগুলিতে সাধকের আপন কল্পনা বা অন্যবিধ সংস্কারের জের কিছু কিছু রহিয়া যায়, সুতরাং যে দর্শন শ্রবণাদি তার হইতে থাকে, সেগুলিকে ঠিক যথার্থ এবং পরিপূর্ণ সত্য অনুভূতি মনে করা নিরাপদ নহে। পশ্যন্তী গ্রামে উঠিয়াও সাতটি পরদা বা সোপানে আমায় খাঁটি ঋত-সত্য ছন্দে আরূঢ় হইতে হয়। সৎ ও চিৎ বস্তুর জগদ্রূপে আবীরূপ এবং রাত্রিরূপের

কথা আলোচিত হইয়াছে। আবীরূপে সব কিছুই অস্তি ও ভাতি, এমন কি নাস্তি ও 'অস্তি' এবং অভান বা অজ্ঞানও ভান বা ভাতি। কিন্তু রাত্রিরূপে সৎ ও চিৎ সদসৎ ও চিদচিৎ এই যুগ্ম ও মিশ্ররূপ ধরিয়াছে। জগৎপ্রত্যয় তাই ব্যক্তাব্যক্ত এবং চিজ্জড় এই দ্বৈধরূপে প্রত্যয়। আর 'প্রিয়ং' বা আনন্দ তো প্রায়শঃ অস্মদাদির পরিচয়ে অবগুণ্ঠিত। অন্তর্বহিঃ বিশ্বে কোথাও কদাচিৎ এক এক টুকরো সুরে ও ছন্দে, এক ঝলক ভাবে ও ব্যঞ্জনায়, সেই মধুমত্তমের একটুখানি—'পরশ', একটা 'ছোঁয়াচ' অথবা 'দোলা' যেন মিলে! যে আত্মা 'প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ'—সেই আত্মাও নিরতিশয় সুখরূপে নয়, পরন্তু নিরতিশয় দুঃখরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে, নৈরাত্ম্যীকরণ এবং তৎসাধন নির্বাণই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপেও ভাবিত হইয়াছে। যদ্দ্বারা আনন্দের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়, সেটিকে এই গ্রন্থে 'মধুচ্ছন্দঃ' বলা হইয়াছে। বেদে মধুমতী ঋক উল্লসিত বিলসিত আনন্দবস্তুর এই মধুচ্ছন্দঃটির অপূর্ব রূপায়ণ করিয়াছেন।

তত্ত্ববস্তু—চরম সেতুর পারে ও এ-পারে

যে সচ্চিদানন্দ সাক্ষাদপরোক্ষ রূপ, তার এবম্বিধ অসাক্ষাৎ পরোক্ষ ভাবটি (পূর্বোক্তভাবে) আসিল যে নিমিত্তকে পুরোভাগে রাখিয়া—যে নিমিত্তের পুরস্কারে সাক্ষাদপরোক্ষ 'অন্তিকতম' বস্তুটিও যেন দূরতম, 'তিরস্কৃতমিব' হইলেন, অস্মদাদির প্রত্যয়ে সে নিমিত্তটিকে কেহ কোনও দিন তো বুঝিল না! 'কুতইয়ং বিসৃষ্টিঃ' বলিয়া সেটিকে চিরদিনই চিরনিরুত্তর প্রশ্নের বস্তু করিয়াই রাখিল! আর, 'অসৎ' এবং 'অচিৎ' রূপেও সেই মূলবস্তু চিরদিনই এক অতি দুরবগাহ অগাধ রহস্য হইয়াছেন। সে মহারহস্যটি সর্ববিশেষণগ্রাসি 'গম্ভীরাম্ভঃ' রাশির সঙ্গেও তুলনা করিতে যাইয়াও যেন মানবের গভীরতম রহস্যানুভূতিটিও কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে। বিশ্বে এই 'গুহাহিত,' 'গহ্বরেষ্ঠ' ভাবটি আসিল কি প্রকারে? বিশ্বের সত্তা (আপন আকৃতি, শক্তি এবং ছন্দে) সকল অতলদিশারীর হার-মানা এক 'অতলের তলে' এমন করিয়া লুকাইতে গেলেন কেন? একটা জড়রেণু, একটা বীজ, মনের একটা ইচ্ছা বা ভাব বা বেদনা পরীক্ষা করিয়া দেখ। কত না কি যেন এক বিপুলকে লুকাইয়া নিজেকে এতটুকু, একরত্তি করিয়া দেখাইতেছে সেটি! মাতৃজঠরে এতটুকু, এক ক্ষুদ্র জীবকোষে

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী! একটা এটমে এক মহাশক্তি-ঘনরূপে সুবিপুল ব্রহ্মাণ্ড! এইটি মহাশ্চর্য পারক্ষ্য রূপ, অল্পের মধ্যে ভূমার 'গূঢ়বাধনম্'। এই অজানার পারোক্ষ্য, এই অপরিচয়ের গম্ভীরবাধতা এবং নিগূঢ়রূপতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিশ্বে সর্বত্র এক প্রয়াসও বিদ্যমান। কেননা স্বভাব ও স্বরূপ 'ঋণী' (negative) হইলেই তাকে স্বভাবেই সে ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। তাকে positive-এ ফিরিয়া আসিতে হয়। ক্রিয়া মাত্রেই তাই তুল্যবল প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষা রাখে। বস্তু মাত্রেই স্থিতি-স্থাপকতা, elasticity. অধ্যাত্ম সাধনে এই নৈসর্গিক প্রয়াসটি বিদ্যা, শ্রদ্ধা, উপনিষৎ সহকারে সুষ্ঠুভাবে চালাইতে হয়। স্থূল যান্ত্রিক আয়াসবহুল জপকেও সেই কর্মটি করিতে হয়। অর্থাৎ, যেটি গোড়ায় negative এবং sub-potential মাত্র, সেটিকে reverse করিয়া উত্তরোত্তর positive, high-potential ও kinetic করিতে হয়। যেটি sub-potential সেটির high-potential করণই 'কুণ্ডলিনীর' জাগৃতি। সর্বক্ষেত্রেই। 'ই' এবং 'উ' বর্ণদ্বয় এই কর্মে সাধিষ্ঠ।

প্রথম ব্যাহৃতি—'ভূঃ'
এর মূল শক্তি-আকৃতি এবং ব্যঞ্জনাকৃতি

এখন, সৃষ্টির সর্বত্র, এবং অধ্যাত্ম সাধনে বিশেষ ভাবে, যেটি—যে 'সমর্থসহগটি' (potent co-efficient) ঐ বিপরীত করণটি (reversing) করিয়া গূঢ়, পরোক্ষ, বাধিত negative ও sub-potential (অপিহিত ও অভিভূত) 'গ্রাম' সমূহকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া দেয়; শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয়ের অধোগ মগ্ন, স্তব্ধ বৃত্তিকে ঊর্দ্ধগ অভিব্যক্ত, ভাসমান করিয়া তোলে, সেইটিকে জানিবে প্রথম ব্যাহৃতি 'ভূঃ'। Potential field-এর অতল গভীরতা থেকে এই উর্জ্জঃশক্তি শব্দার্থাদিকে 'অয়ং' বা 'এই যে' রূপে গোচরতায় হাজির করিয়া দেয়। সব কিছুই এই প্রথম ব্যাহৃতির অনুগ্রহে নেপথ্যের যত অন্তরাল সে সব ঠেলিয়া প্রেক্ষামঞ্চের পাদদীপমালার ছটায় আসিয়া উপনীত হইতেছে; সব কিছু potential kinetic হইতেছে; নিমজ্জিত উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে, অলসিত উল্লসিত হইতেছে। গোচরতা—"এই যে"—রূপে আবেদনের নিমিত্ত যে requisite energy level (উপযুক্ত শক্তিমান) সেটি লাভ করিতেছে যে ব্যাহৃতি দ্বারা, সেটি 'ভূঃ' বলিয়া জান।

ব্যাহৃতির ত্রিমাত্রায়—'ভ', 'উ' এবং 'র্'—বিশ্লেষণ রহস্য

সুতরাং 'ভূঃ' কে বিশ্লেষণ করিয়া যে তিনটি কলা (elements) পাইলাম, তাদের মধ্যেই পূর্বোক্ত আকৃতিটি (pattern) দেওয়া থাকা আবশ্যক। ভ কার, উ কার, এবং র কার। মহাপ্রাণবর 'হ' কার দ্বারা উচ্ছুন (surcharged) যে 'ব' কার বীজ বা সংস্কার বা সম্ভাবনা মাত্র—(sub-potential), সেটি উর্জ্জঃশক্তি (উকার) দ্বারা ঊর্দ্ধগা বা লম্বগা হইতেছে। শুধু তাই নয়। সে লম্বগা বৃত্তি মূর্দ্ধগা হইয়া (apex reach করিয়া) কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে 'র'কারে। 'র'কার অগ্নি, তেজঃ অথবা ভর্গঃ। এইখানে পৌঁছিয়া লম্বগাবৃত্তি (vertical ascent) পারোক্ষ্য ও নিগূঢ়তার পাশটি দগ্ধ করিয়া নিজেকে 'অয়ং'—'এই যে আমি বিদ্যমান' রূপে দেখাইতেছে। বীজ বলিতেছে—এই দেখ আমি পাদপ; অভ্যারোহী জপ বলিতেছে—এই যে আমি সত্য, আমি জ্যোতিঃ, আমি অমৃত। 'ওঁ ভূঃ স্বাহা' রূপ আদিম আহুতির ইহাই পরম ফল জানিবে।

সকল সৃষ্টির প্রসবব্যথায় এই আদিম ব্যাহৃতি ধাত্রী

সৃষ্টির যেখানে যত গভীর প্রসব ব্যথা সেটি ভূঃ এই আদিম ব্যাহৃতিকে ধাত্রীরূপে পাইয়াই প্রত্যক্ষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসিয়া 'ভূমিষ্ঠ' হয়। যেখানে যত প্রকাশকুণ্ঠ মূকবেদনা সেটি কুণ্ঠাহীন এই আদিম ভাষা-দিশারী ব্যাহৃতি সহায় করিয়াই বাণী, সুরে ও ছন্দে মুখর হইয়া উঠে। 'অয়ং' বা 'এই যে' রূপে প্রকাশের প্রেক্ষালোকে রহিয়া কে বুঝিবে সুদূরের সেই শুধু সম্ভাবনালেশটিকে কত না গম্ভীরবাধতার পাষাণস্তর-পরম্পরা ঠেলিয়া বাস্তবের সজাগ আলোয়, জীবন্ত বাতাসে আসিতে হইয়াছে। নদী যখন তার তল আর তট হারাইয়া নদীনাথে আসিয়া মহোচ্ছ্বাসে মিলিত হয়, তখন কারই বা মনে পড়ে নিভৃত তুঙ্গ-গিরি-কন্দর-কারায় তার তুষার নির্ঝরের মৃদুল মঞ্জুল সচকিত স্বপ্ন-ভঙ্গটি! ইহাই না কংস কারাগারে মাহ ভাদরে সংগোপনে স্বয়ং ব্রজসুন্দরের সেই শাশ্বত জনমলাভ কাহিনী, যে কাহিনী ঐ নিভৃতবল্লরীবৃন্তের নগণ্য পুষ্পকলিকাটিও এই ফুটি ফুটি করিয়া সরমে শুনাইয়া গেল! তাই এই আদিম ব্যাহৃতিকে সর্বত্র সর্বতোভাবে অনুসন্ধান ও অনুধাবন করিতে হইবে।

প্রাণ ও বর্ণ 'রসায়ন' (Chemistry of Pranic and Somatic Function)

অন্তঃ এবং বহিঃ প্রকৃতিতে মগ্ন স্তব্ধভাব (potential, subpotential) সূচনা করার জন্য 'আধমর্ণ্য', আর ব্যক্ত, উদারভাব (kinetic) সূচনা করার নিমিত্ত 'ঔত্তমর্ণ্য' এই দুই পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হউক, এক বিশেষ উদ্দেশ্যে। পূর্বোক্ত বর্ণের আদিতে যেটি অবর্ণ, সেটি পরের শব্দের 'ঔ' বর্ণে রূপিত হইতেছে যে বর্ণ দ্বারা, সেটি হইল 'ও' বর্ণ। আবার অ+উ=ও। অর্থাৎ একটি থেকে অপরটি হইতে গেলে দুইটি পর্বে বা ধাপে উদ্‌বর্তন (uplifting) হওয়া আবশ্যক। 'অ' 'উ' সহযোগে 'ও' হইতেছে। আবার অবর্ণ সেই উদ্ভূত 'ও' সহকারে 'ঔ' হইতেছে। প্রথমতঃ মগ্ন বা স্তব্ধতার নিজের মধ্যেই একটা প্রকাশ বিকাশের সম্বেগ (urge বা elan) দেখা দেওয়া চাই। এইটিকে আমরা মহাপ্রাণবর হকারের অনুগ্রহরূপে পাইয়াছি 'ভ'কারের বিশ্লেষণে। এইটি স্বগতোদ্‌গমপ্রবণতা—spontaneous Upsurging or Swelling. উচ্ছূনতা নামটিও দেওয়া হইয়াছে। বহির্বিশ্বে রেডিয়াম জাতীয় পদার্থে এই সম্বেগটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অধ্যাত্ম সাধনায় এটি আগ্রহ, আকুতি, আত্মকৃপা ইত্যাদি। এটি যে অহেতুক অথবা আকস্মিক নয়, তা মনে করার হেতু আছে। কিন্তু হেতুটি যাহাই হউক, সেটি কাজ করিতেছে নেপথ্যে মগ্নের মাঝে থাকিয়াই। শুভ প্রারব্ধ ইত্যাদি নাম দিলেও আকস্মিকের আকারে প্রায়শঃ দেখা দিয়া থাকে। পূর্ণজ্ঞানের যেটি আকৃতিলেখ বা চিত্রপট, তাতে আকস্মিক যদি বা 'নস্যাৎ' হইয়াও যায়, তথাপি অস্মদাদির বিবর্দ্ধিষু জ্ঞানে (progressive apprehension এবং appreciation-এ) আকস্মিকটি নিরূপিতের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়াই চলিয়াছে মনে হয়। বরং বিশ্বটা গোড়ার দিকে Statistical Universe হবার দিকেই ঝুঁকিতেছে, এও মনে হয়। মগ্নের ভিতর নেপথ্যে যোগ্যতার জোরেই হউক, আর লটারি খেলিয়াই হউক, ঐ স্বগত সম্বেগটির ঋতছন্দঃটিও প্রকট হইতে থাকে। অর্থাৎ, প্রণবাক্ষরত্রয়ের 'অ' ও 'উ' মিলিয়া 'ও' হইয়া থাকেন। বর্ণদ্বয়ের সমর্থ সন্ধি ও 'রসায়ন' ঘটায় ঋতচ্ছন্দঃ। এই মিলনটি যে সব কিছুতেই অত্যাবশ্যক তা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি।

উক্ত 'রসায়ন'টি ঋতানুগ অথবা 'ঋতায়ন' হইবে কিরূপে?

গণিতের ভাষায় এইটি Differentiation. এর দ্বারা সব কিছুই নেপথ্যে (যেভাবেই হউক) তার আপন true rate of variation or change (ঋতায়ন) ঠিক করিয়া লয়। ব্যাজ ও বিঘ্ননিমিত্ত ব্যাস-বিষমতার মধ্য হইতে এর ফলে ঋতচ্ছন্দের অভ্যুত্থান হয়। শক্তি বা Energy আগেকার বিজ্ঞানে (অর্থাৎ গ্যালিলিও নিউটনের প্রবর্তিত বিজ্ঞানে) একটা যৌগিক সামগ্রী (derived function) ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি মৌলিকের (Primaryর) স্থান পাইয়াছে। আগে Energy ছিল mass, space and time–এর সম্পাত সম্ভুত সামগ্রী। ওই তিনটিকে আবার গতি নিরপেক্ষ (independent of motion or observer, independent of any conventional frame of reference) নিব্যূঢ়ভাবে (as absolute) ভাবনা করার বাতিকও ছিল সে যুগে। বর্তমানে সে বাতিক প্রায় বাতিল হইয়াছে। Mass and Energy এক নির্দিষ্ট সমীকরণ দ্বারা অন্বিতও হইয়াছে। সুতরাং, একের অন্যরূপ বিবর্তিত বা পরিণত হবার বাধা নাই। বস্তুতঃ হইতেছেও।

Energy ও Mass : এ দুয়ের সম্পর্কে 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' কি ভাবে আধার

শুধু কি হিলিয়াম এটমের সংগঠনে কিছুটা ঐরূপ বিবর্তন লক্ষিত হইয়াছে? Mass আপনাকে যৎকালে radiant energy বা quanta রূপে দেখাইল তখন ওই ব্যাপারের মূল আকৃতিটি আমরা পাই 'ভূঃ'—এই ব্যাহৃতিতে। পুনশ্চ quanta যৎকালে নিজেকে materialize করিল, আপনাকে mass রূপে দেখাইল, তখন পাই 'স্বঃ' এই ব্যাহৃতিকে। এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান তো আছে। সেই ব্যবধানের নিরূপক হয় 'ভুবঃ'। বলা বাহুল্য, উভয়স্থলেই গতি এবং স্থিতির যেটি ঋতচ্ছন্দঃ ও সত্যচ্ছন্দঃ সেটির অভ্যুত্থানের (emergence-এর) অপেক্ষা রহিয়াছে। গতির জানা দরকার ঠিক কি রীতিতে আমি চলিব, আর স্থিতিরও জানা দরকার ঠিক কি রূপে বা ভঙ্গীতে আমি থাকিব। গতি, স্থিতি এবং এতদুভয়ের নিরূপক ছন্দঃ (law or equaiton) এই তিনকে একসঙ্গে দেখিলে বলা যায় 'আকৃতি' (pattern)। এটি পরে জপসূত্রে বিশেষ সূত্র দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে।

স্থিতিরূপ ও গতিরূপ এবং উভয়ের নিয়ামক সূত্র—ব্যাহৃতিত্রয়ের ভাষায়

ধর, স্থিতিরূপে (as rest) যে বস্তুমান (mass) তাকে যদি বলা যায় m_0 এবং গতিরূপে যদি সেটি m, তবে এ দুয়ের সম্বন্ধ নিরূপক একটি সূত্র কিছুদিন আগেই Einstein-এর কাছ থেকে আমরা পাইয়াছি। আগেকার বিজ্ঞানের ব্যক্ত শক্তির আকৃতি (formula) আজকালকার এই নূতন সূত্রের এক সঙ্কীর্ণ সংস্করণ মাত্র। যদি আপাততঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া লই যে m_0 কে বলিব 'স্বঃ' আর m কে বলিব 'ভূঃ', তবে এ দুয়ের সম্বন্ধ ঘটক সূত্রটিকে (equation-টিকে) বলিতে হয় 'ভুবঃ'। প্রকারান্তরে, 'ভূঃ'কে যদি বলা হয় 'আকৃতি', তবে 'স্বঃ' কে বলা যায় 'প্রকৃতি' এবং 'ভুবঃ' কে 'প্রত্যয়'। এগুলি পরে আলোচ্য।

শক্তির দিঙ্মান (directedness) স্বীকারে 'ভূঃ' এবং 'স্বঃ' অস্বীকারে 'ভুবঃ'

বলা বাহুল্য, এই 'ভুবঃ'টি কেবলমাত্র (abstract) ব্যবধান নয়। 'এটা' আর 'ওটা' এ দুয়ের প্রমিতিভেদমাত্র (logical or apprehensional distinction) নয়। ইহা উভয়ের আকৃতি নিরূপক একটা মাধ্যমিক সূত্র, সংস্থা বা সেতু; ইহা প্রমেয়গত ভেদ—intrinsic relation. 'শক্তি' শব্দ মৌলিক অর্থে লইলে এই সেতুও হইতেছে, সম্বন্ধ এবং ক্রিয়া নিরূপক শক্তি বিশেষ (a dynamic interval or 'nexus')। 'এটা' অথবা 'ওটা' (অয়ং বা অসৌ) রূপে শক্তি নিজেকে যেন দিঙ্মান বিশিষ্ট (vector) করিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু সেতুরূপে সেটি দিঙ্মান স্বীকার করে নাই (অর্থাৎ scalar)। ভুবঃ—মধ্যস্থ, উদাসীন। একথাগুলিও পরে অপেক্ষাকৃত বিশদ হইতে পারে।

মেঘোদয়ের দৃষ্টান্ত

বেশ নির্মল আকাশ। হঠাৎ তাতে এক টুকরো. মেঘ দেখা দিল। ঝড়ও হইতে লাগিল। বৃষ্টি কি হবে, না হবে না? মেঘখণ্ড ছিল নেপথ্যে অদৃশ্য জলীয় বাষ্পাকারে। 'এই' হয়ে দেখা দিতে, তাকে একটা গতির এবং পরিণতির ঋতচ্ছন্দঃ

মানতেই হয়েছে। অদৃশ্য জলীয় বাষ্পের রেণুগুলি আকাশে ঐ স্থানবিশেষে জমাট হইয়া মেঘরূপে দৃশ্য হইল তাদের গতি এবং পরিণতির একটা 'খোলা রাস্তা' পাইয়াই, যে রাস্তাটি এতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধই ছিল। মেঘ এতক্ষণ তাই নেপথ্যেই ছিল। আমরা দেখিয়াছি যে খোলারাস্তা পাইতে গেলে ব্যাজ এবং বিঘ্ন (unharmonic curvature, unharmonic configuration)—বৈরূপ্য এবং বৈগুণ্য এ দুটিকে সরাইতেই হয়। প্রকৃতির সর্বপ্রকার সমর্থ ক্রিয়া (তন্ত্র) এবং অভীষ্ট সিদ্ধির পথে এই দুইটি বাধা বিদ্যমান। ঋতচ্ছন্দঃ মানে বাধা সরাইয়া সোজা খোলা রাস্তাটি মিলানো। বৈরূপ্য এবং বৈগুণ্যেরও নিজ নিজ ছন্দঃ (law) আছে। বৈরূপ্যের ছন্দঃটি বলিতেছে "অদৃশ্য হয়ে নেপথ্যেই আছ, বেশ তাই থাক না কেন? কাজ কি মর্ত্যলোকের নজরে পড়ে!" বৈগুণ্য বলে—"জমাট যদিই বা হবে, কাজ কি অমন ঘেঁষা-ঘেঁষি করে। অসীম নীলিমার ময়দান, ছুটে বেড়াও না কেন? নীচে যাও, ওপরে ওঠ। জলের কণাটি হয়ে দানা বাঁধতে তোমাদের কয় মিলিয়ানকে দানার শেকল পায়ে পরে পঙ্গু হতে হবে তা জান? তার চাইতে Clausius, Maxwell-এর Kinetic theory of gases-এর এলাকায় ছুটাছুটি, ধাক্কাধাক্কি করাই কি সুবিধের নয় বাপু?" ছন্দের ভাষা চলতি কথায় তরজমা করিয়া করিয়া দিতেছি। সে ভাষা কিন্তু আসলে গণিতের বড় বড় সমীকরণের বাঁধা বোল। আগেকার হিসাবে মলিকিউল পর্যন্ত 'পার্টিকল'কে লইলেই একরূপ কাজ চলিত। কিন্তু বর্তমানে? যাই হোক, ব্যাজ ও বিঘ্নের কথা শুনিতে গেলে মেঘই যে হয় না! মেঘ হবার পক্ষে এ ছন্দঃ অরিচ্ছন্দঃ। কিন্তু অনুকূল ছন্দঃও দেখা দেয়। তার ভাষাটাও গাণিতিক! চাপ এবং শৈত্য, এক কথায় Thermodynamics-এর এক বিরাট পর্ব, এই জীমূত যজ্ঞে বিদগ্ধ কুশল উপোদ্‌ঘাত হইতে চায়। বাষ্পের ঘনীভাব (condensation) সহজে কি হয়? অতি বালখিল্য এক জলবিন্দু, কিন্তু তার উদ্‌ভবে—'জন্মে'ও বিরাট পর্ব, মরণে, 'শ্রাদ্ধে' তো বটেই! একটি জলকণাও বলে আমি মূলের সঙ্গে মিল রাখিয়াই জন্মিব অর্থাৎ, আমারও দস্তুর-মত নাভি, অর এবং নেমির ব্যবস্থা রহিবে। একটা নাভি (nucleus) জুটাইয়া দাও, তবে দানা বাঁধিব, নচেৎ, কদাপি নহে। সুতরাং অভীষ্ট মেঘোদয় ও বারিবর্ষণের পক্ষে অনৃতায়নের স্থলে ঠিক ঋতায়নটি মেলা চাই।

ঠিক অভীষ্ট ঋতায়নটি হইতে গেলে অরিচ্ছন্দঃ ও মিত্রচ্ছন্দের মধ্যে অব্যবস্থা অবাঞ্ছনীয়

অরিচ্ছন্দঃ এবং মিত্রচ্ছন্দের মাঝে অব্যবস্থা (stalemate) থাকিলে তো চলিবে না। মূলে সব যদি স্পন্দেরি ব্যাপার হয়, তবে সে স্পন্দকে একটা সুব্যবস্থিত রীতিতে বা আকৃতিতে আসিতেই হইবে, যদি আমাকে প্রথমে মেঘোদয়টি পাইতেই হয়, আর সে মেঘকেও ঘনীভূত করিয়া অভীষ্টবারিবর্ষণটিও পাইতে হয়। আগে যজ্ঞের মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা এই পর্জ্জন্য সৃষ্টি ঘটানর প্রয়াস হইত শোনা যায়। এখন ভূত-বিজ্ঞানের যন্ত্র-তন্ত্র সাহায্যেও সেটি ঘটিতে পারে অথবা পারিবে। প্রকৃতিতে স্বভাবতঃই ঘটিতেছে। ঐ এক মূল-হেতুটিকে আশ্রয় করিয়াই ঘটিতেছে, স্পন্দ-সমূহকে মিত্র-ছন্দে অন্বিত করিয়া। অন্বয়ের ফলে ব্যাজ-বিঘ্ন দূর হইয়া ঠিক ঠিক খোলা রাস্তাটি মিলিলে ক্রিয়া সমর্থ (তন্ত্র) হইল এবং সিদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হইল।

পুনশ্চ, গতিবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত লইয়া অভীষ্ট ঋতায়ন বুঝা যায়

ধর 'ক' হইতে চায় 'খ'। কিন্তু 'ক' 'গ' এবং 'খ' এই দুয়ের বিরোধী টানে পড়িয়াছে। যদি 'গ' ও 'খ' এর কৌণিক অবস্থিতি এবং পরস্পরের অনুপাতটি এমন হয় যে, একটা সমান্তরিক ক্ষেত্রের ঠিক কর্ণটি ধরিয়াই "(ক)" আপন অভীষ্ট 'খ' এ যাইতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে কার্যকর ঋতচ্ছন্দঃটি মিলিয়াছে বলিতে হইবে। অন্যথা হইলে মিলে নাই। এখান হইতে একটা রকেট একশ মাইল দূরে কোনও লক্ষ্যে ফেলিব। রকেট একটা parabolaর আকৃতিতে ছুটিতে চায়। এটি অবশ্য তার নৈসর্গিক ঋতচ্ছন্দঃ। কিন্তু কার্যতঃ সমস্যা দাঁড়ায় এই—আমাদের যেটি লক্ষ্য (target), তদনুকূলে, অর্থাৎ, তদ্‌বেধসমর্থ ঐ ঋতচ্ছন্দঃটি কি রূপে মিলাইব? তন্নিমিত্ত পদার্থ বিজ্ঞান ও গতি বিজ্ঞানের অপরাপর সুত্রের সহায়তা পাইতে হয়। সে সূত্র সমূহের কতকগুলি বর্তমানস্থলে আমার সপক্ষে, অপর কতকগুলি বিপক্ষে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দিয়া রকেটটি যাইবে, সুতরাং, রকেটের গতিবর্ত্মে অবস্থিত বায়ুমণ্ডলের ঘনতা এবং বেগ অবশ্যই হিসাবে ধরিতে হইবে। পৃথিবীর অক্ষে আবর্তন ইত্যাদি অনেক কিছুই। সাধারণ রকেটের পরিবর্তে আলোক, তাড়িতরশ্মি রকেট রূপে কল্পিত অথবা ব্যবহৃত (যথা, সেই

প্রসিদ্ধ মর্লি নিকলসন পরীক্ষায়) হইলেও সেই ঈথার স্বীকারের যুগে দেখিতে হইত 'ঈথারের' বাধা (drag) নিবন্ধন উক্ত রকেটের গতাগতিতে যৎকিঞ্চিৎ বৈষম্য লক্ষিত হইল কিনা। অধ্যাত্ম সাধনের পরীক্ষা স্থলেও এই যুক্তি।

(৩)

অধিভুত অধ্যাত্মাদি সর্ববিধ সাধনেই অভীষ্ট ঋতায়নের নিমিত্ত ছন্দঃ কে অনুকূলতায় পাবার ক্রম।—প্রথমে পরিণয়ী

[অতঃপর প্রসঙ্গক্রমে ছন্দের উত্তরোত্তর পাঁচটি পর্বের আলোচনা আরব্ধ হইতেছে]

ঋতছন্দের পরাকাষ্ঠায় 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এই 'উরুক্রম'টি পূর্বে কথিত হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, এই উরুক্রমে পাঁচটি ক্রম বা পর্ব। প্রথমতঃ, ঋতচ্ছন্দের যে রূপটি আবশ্যক হয়, তাকে বলা যায় পরিণয়ী ছন্দঃ। যেমন, পূর্বোক্ত এক দৃষ্টান্তে—'গ' 'ঘ' এই দুই বিরোধী গতি-সংস্কারের পরিণয়ে (composition-এ) 'ক' এর মিলিয়া গেল তার অভীষ্ট 'খ' তে যাইবার এক নির্দিষ্ট ঋজুপন্থা (ঋতায়ন) (diagonal of the parallelogram)। এইভাবে সাধকের মধ্যে পরাগ্‌বৃত্তি এবং প্রত্যগ্‌বৃত্তি, ঐ দুইয়ের পরিণয়টি আদৌ সাধিত হওয়া আবশ্যক। বৈখরী জপেও (হ্রীঁ, ক্রীঁ ইত্যাদি বীজাশ্রয়ে) বীজের অগ্নি বা তৈজস মাত্রা-('র') এবং সোম মাত্রা-(ঁ) এ দুয়ের পরিণয়টি হওয়া চাই। নতুবা, অনুপাতবৈষম্যে ব্যাজবিঘ্নের অনভীপ্সিত লক্ষণগুলি দেখা দিয়া অনৃতায়ন ঘটিবে।

দ্বিতীয়—অন্বয়ী।—শ্রদ্ধা ও শ্রদ্দধানতা।—বিরোধ ও বিরুদ্ধানতার অভিভব

তারপর অন্বয়ী ছন্দঃ হইল দ্বিতীয় রূপ। পূর্বোক্ত পরিণয়ের সৌষ্ঠবে (harmony ধারা) এই রূপটি মিলিয়া থাকে। তখন পূর্বোক্ত 'গ' 'ঘ' এর দ্বন্দ্বভাব (mutual repug-nance) আর নাই, অথবা থাকিলেও সেটি মগ্ন ও নিয়ন্ত্রিত। অধ্যাত্ম সাধনের ক্ষেত্রে এই সৌষ্ঠব এবং তজ্জন্য ঋতান্বয়টি আসিলে, সমগ্র সাধনযন্ত্রের যে একতানতা লক্ষিত হয়, তাকে বলে শ্রদ্ধা। বাহিরের ব্যাপারেও এটি accordance factor. মূলতঃ এটি স্পন্দগত; অর্থাৎ 'ক' এবং 'খ' এর মৌলিক স্পন্দগত অনুপাতসৌষ্ঠব।

এই সৌষ্ঠব প্রায়শঃ ভগ্নাংশাদি বর্জন করে। জপের এটি হইল লক্ষ্য এবং সমর্থ জপের এটি হইল ফল। দুয়ের মধ্যে 'খ' কে (ধর, গুরু-শক্তিকে) যদি আদর্শ (Standard) মনে করা যায়, তবে সে আদর্শের বা আকৃতির 'ছন্দোগ' হওয়াই এই মৌলিক শ্রদ্ধার সাধন।

তৃতীয়—সমন্বয়ী। 'আত্মবৈর'—Inner discord and contradiction—নিরসন

তারপর তৃতীয় সমন্বয়ী ছন্দঃ। এইটি দ্বারা শ্রদ্ধার পূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে। ধর—বৈখরীজপে যেমনভাবে শ্রীগুরু কোনও ধ্বনি (যথা প্রণব) আমায় শোনাইলেন, আমি সেই ভাবে সেটি সাধিতে লাগিলাম। গানে যেমন স্বর, বাজনায় যেমন বোল। অনুপাত সৌষ্ঠবে আসিলে আমার উচ্চারিত ধ্বনিটি 'অন্বয়ী' (congruent) হইল। তখন, ধ্বনি-সম্বন্ধিনী যে শ্রদ্ধা (accordance) সেটি হইল—বলা যায়। কিন্তু একা ধ্বনিই ত শেষ নয়। আমার সমগ্র যন্ত্রে (কোষপঞ্চকে) সেই শ্রদ্দধানতা (attuning) টি পরিব্যাপ্ত হওয়া চাই। (একদেশী, গণ্ডীগর্ভ, বিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন অন্বয়ে কাজ আগাইবে না।) ফলে, অন্তরতম ভাবের ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া যাওয়া চাই; অন্তিকতম জ্যোতির্ধামের আলোর ঝরণাধারায় আমার নিত্য অবগাহনটি হওয়া চাই। আমার সমগ্র সত্তাটিই এইবার ঐক্যতান যুক্ত হইয়াছে। অন্বয়ী পর্বে যুঞ্জান, সমন্বয়ীতে যুক্ত। এতে আসিয়া আমার মৎসম্বন্ধিনী কুণ্ঠা বিদূরিত হইল। I need no longer be afraid of myself। নিজের মধ্যে এই সমন্বয়ী ঋতচ্ছন্দঃটি না মেলা পর্যন্ত নিজের সম্বন্ধে ভয় কাটে না। ততক্ষণ 'আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' এই স্বয়ং ভগবৎ প্রদর্শিত আত্মবৈর সম্ভাবনাটি বিদ্যমান থাকে। ততক্ষণ সাধকের কত সাধের, কত সাধনের সুধাসিন্ধু মধ্যেও কোন্ এক বৈরি-জিহ্বার ভয়াল সর্বনাশী বিস্তার সময় সময় প্রকটিত হইতে দেখা যায়। অবগুণ অবচেতনা বা lower vital প্রভৃতির দৌরাত্ম্য। যে যন্ত্রে বাজাইব তার নীচের গোড়ার পরদাগুলোই 'সুরে' বাঁধা নাই, হয়তো অসুরেই বাঁধা। কাজেই সেখানে দৈবাৎ অতর্কিত পরশটি লাগিল কি, বিবাদী বেয়াড়া সুরের উপদ্রবী বিদ্রাবী 'ঝনৎকার'! সে উপদ্রবী ঝনৎকারে সুরের দরদী মরমী ঝঙ্কারটি মাটি হবার উপক্রম হয়। অনুভূতি ও আস্বাদের অন্তঃপুরে গিয়েই কি আমি নিশ্চিন্ত! সেখানেও তো

অজানা আঁধার চোরাকুঠুরীর অভাব নেই! আত্মার বিরাম ও আরামের আস্তরণ তলেও যত সব গোপন মাইন পাতা! ফিউজগুলোরও অতিগোপন, অতিকুটিল সঞ্চার! তাই সতর্ক স্থির সাধককে দেখিতে হয়, তার আসনের তলটিতেই কাল সাপের গর্ত নেই তো! তাই বীর সাধককে দেখিতে হয় তার আপন দুর্গেই ছদ্মশত্রু সুড়ঙ্গ কাটে নাই তো! তাই, আবার ধীর সাধককে দেখিতে হয় তার অমন নিরালা ধ্যানকুটীটি আসলে জতুগৃহ নয় তো! ভয় 'ভোল' ফিরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলেই যে! এই প্রসঙ্গে কারিকার এই শ্লোকটি জপ ভাবনা করিও—

যদি বিলমধিশেতে ব্যাল আশঙ্কসেঽত্র
কতি কিতবচরা বা বৈরিণোঽমুত্র সন্তি।
জতুগৃহমিবগেহং মন্যসে বাপি তর্হি
জপ সপদি নবার্ণৈর্বৈরিজিহ্বাং দধানাম্।। ১০

মহাবীজ সম্পুট দ্বারা সমন্বয়ী ছন্দঃ প্রকটন এবং পুরত্রয়ে মহাত্রাসমূল উৎপাটন

সুধাব্ধির মধ্য হইতেও গুপ্ত-বৈরী যৎকালে তার জিহ্বা বিস্তার করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন ধৃত-মুদগর-বৈরি-জিহ্বাং অপরূপা কান্তভীমা মাতৃমূর্তিটি ধ্যান করিবে এবং প্রসিদ্ধ নবাক্ষর মন্ত্রটি জপ করিবে। ঐ সঙ্গে যে তিনটি মহাবীজ (ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ) এক বিশেষ ভঙ্গীতে দেওয়া আছে তারা যথাক্রমে উক্ত ব্যালভয়, ব্যাজভয়, এবং ব্যূহভয় বিদূরিত করিবে। ফলে, সাধকের উত্তরোত্তর তিনটি ভূমি অধিগত হয়—স্থির, বীর, ধীর। কারিকায় 'অত্র', 'অমুত্র' এবং 'গেহে'—এই তিনটি পদের রহস্যও ভাবনা করিও। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিনটি স্থলেই মহাত্রাস মূলটি উৎপাটিত হওয়া চাই; নহিলে তোমার মন্দির চূড়ায় উদ্‌গত বটের ডাল-পালাগুলোই শুধু ঝুরিয়া দিয়া কি করিবে? অতন্দ্রিত হইয়া সমন্বয়ী ছন্দের সন্ধানকর। ব্যবহার ক্ষেত্রেও সকল সিদ্ধি সাফল্যের মূলে এই সমন্বয়ী সন্ধানটি। সে যুগে Clerk Maxwell আলোক আর তড়িতের সমন্বয়ী ছন্দঃটিকে ধরিলেন কয়টি সমীকরণ সূত্র দ্বারা। ফলে, বেতার বার্তাবহ, দৃশ্যবহ ইত্যাদি। বর্তমানে Albert Einstein Mass এবং Energyর

সমীকরণ করিয়াও তো ছুটি পান নাই, আরও সমন্বয়ী সূত্র খুঁজিতে হইতেছে। সন্ত্রস্ত মানকেও খুঁজিতে হইতেছে—Unified Field Physics-এর "বাহিরেই" বিশেষ ভাবে খুঁজিতে হইতেছে। কেননা, সব কিছুরও যেটা 'আত্মা', যেটা 'হৃৎ', যেটি মূল, সেইটাই যে এযাবৎ ঐ সব 'ভৌতিক' সমীকরণ সমন্বয়ে বাদ পড়িয়া আসিতেছে!

স্বল্পসমন্বয়ীতে পূর্ণস্বস্তি নেই—স্বস্ত্যয়ন শেষ হয় না

ধর, সমন্বয়ী ছন্দঃ মিলিল। কোন কিছুর ধর, এই আমার সত্তার সবটাতে সুর, ছন্দঃ আসিল। বাস, কাজ ফতে? না, তা তো নয়। অণু মহান একি সুরে বাঁধা, রেণু বিরাটের একি ছন্দঃ—এই উপলব্ধিতে এক বিপুল বিশ্ব ঐকতানে নিজের বাঁধা যন্ত্রটিকে বাজাইতে না পারা পর্যন্ত অব্যাহতি নেই! কোনও একদেশে (closed realm, restricted field-এ) সমন্বয় ঘটাইলেই সেটি সম্যক হয় না। অর্জুনকে তৎপূর্বে তাই না বিশ্বরূপ দেখাইতে হইয়াছিল! বিশ্বরূপটা যদি সত্যই একটা 'বেয়াড়া' বিকট রূপ হইত, ছন্দঃ আর শৃঙ্খলা তাতে যদি তোমার আমার কল্পিত আরোপ মাত্র হইত, তবে সে বিশ্বে কোন্ প্রাণীর সত্যকার ভয় কাটিত, জ্যোতিঃ এবং রসের সত্যকার ধ্রুব ধামটি মিলিত অথবা মিলিবার ভরসা রহিত?

আত্মরূপ ও বিশ্বরূপ

ভাসা ভাসা দেখিলে তো এই ভূমিকম্প বন্যা মহামারী ত্রস্ত ভূমণ্ডলটা চাইতে, এমন কি, হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথ্বীটা চাইতেও, আমার নিজের ভিতরটা বেশী উদ্দণ্ড বেয়াড়া! ওখানে ধরিবার বুঝিবার তবু কোন না কোন সূত্র হাতের মুঠায় আসে। কিন্তু এখানে? আসামের ভূমিকম্পটা যদি বা Volcanic না হয় তো Tectonic ব্যাখ্যা শুনিয়া কিছুটা না হয় বুঝিলাম। কিন্তু নিজের দৈনন্দিন সংস্কার ভূমির দোলন কম্পন, উৎপাত উপদ্রবগুলো? ফ্রয়েড, জুঙ্গা, এড্লার প্রমুখেরা তারও নিখুঁত ছবি তুলে দেখিয়েছেন? কই? সময় সময় এমনও মনে হয় আরও যেন শাঁস-ভূষির তাল গোল পাকিয়েছেন! তবে কি যোগের সংযম সত্য? কিন্তু তারই বা পরখ করে দেখতে এগুচ্ছে কে? শুধু কথায় 'এটা' নয় 'ওটা', 'ওটা' নয় 'সেটা'! বাচারম্ভণ মাত্র! তবু এটা ঠিক যে ভিতরে সত্য, জ্যোতিঃ, অমৃত এবং তাতে নিয়ে যাবার অভ্যারোহী

ছন্দটি আছেই। অধ্যাত্ম সাধন, জপাদিতো সেই জন্যই! নিজেকে ভাসা ভাসা দেখাটা যদি ভ্রান্তিই হয়, তবে বিশ্বটাকে ভাসা ভাসা দেখাটাই বা কি ঠিক দেখা বলিবে? যদি বল স্বয়ং বিজ্ঞানই তো Law-এর গোড়ায় Chance-কে বসাইতেছে! বটে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তত্ত্বতঃ Chaosই হইতেছে Cosmosএর আধার ও অধিষ্ঠান; আগেকারটা reality (তত্ত্ব), পরেরটা appearance (অধ্যাস)! না, তা নয়। নিউটনের আধার শোধন সম্প্রসারণ করিয়া এই শতকে আইনস্টাইন প্রমুখেরা যে আধার আবিষ্কার করিয়াছেন তাতে (Statistics, Indeterminacy ইত্যাদি প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও) সমন্বয়ী ছন্দের জয় জয় কার দেখিতেছি, পরাজয় তো নহেই। প্রাণবিজ্ঞানাদি ক্ষেত্রেও তাই। অবশ্য আরও আগাইতে হইবে। প্রাণের প্রাণ এবং চেতনার চেতয়িতা বাদ দেওয়া বিশ্ব সত্যকার সজীব বিশ্বের কঙ্কালটি মাত্র, এটি মনে রাখিতে হইবে। প্রাণ (শ্রুতির ব্যঞ্জনায়) বাদ দিয়া বিশ্বে একটা নির্ভরযোগ্য Evolvant, Emergent Principleই মিলিবে না, যদ্বারা সেই 'মারাত্মক' Second Law of Thermodynamicsও এবং Entropyর কবলের মাঝেও বিশ্বটা আপনাকে বিকাশ এবং পূর্ণতার পথে আশ্বস্ত তীর্থ যাত্রীরূপে প্রত্যক্ষ করিবে।

ব্যস্ত সমাধানে সত্য সমাধান হবার নয়। 'অনিরাকরণমস্তু' সূত্র

কোনও ব্যস্ত (isolated) সমাধান সমাধানই নয়। "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণংমেহস্তু।" গোড়া হইতে চরম পর্যন্ত সকল সমাধানেই এই সূত্র অনুসরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ এখানে যেটি সমন্বয়ী, সেটিকে সমন্বয়ীভাবে অন্যত্র, সর্বত্র পাইতে হইবে। জপ ক্রিয়া দ্বারা এখানে যে মূল স্পন্দগত বৈরূপ্য বিদূরিত হইতেছে, সে মূল স্পন্দ এবং যেটি তার ঋত, সেটি কেবলমাত্র এখানেই সাবকাশ (relevant, applicable) নয়, সেটি বিশ্বানুগ (Cosmic, Universal) হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ রেণুটিকেও বিরাটেরই ছন্দের 'প্রতিরূপ' ভাবে পাইতে হইবে। তাই জপের মূল তত্ত্বগুলি, এমন কি, অক্ষর বর্ণ প্রভৃতিও সেই দৃষ্টিতেই আলোচিত হইতেছে। এইজন্য পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত এসব আমাদের আলোচনা ক্ষেত্রে একান্ত বাহ্য নয়। ইংরাজিতে যাকে synthetic, integral approach বলে সেইটাই জপাদি স্থলেও 'ঋতস্য পন্থাঃ'।

চতুর্থ-মহাসমন্বয়ী। এই তুরীয়টি ব্যতীত সঙ্কটত্রয় হইতে ত্রাণ নেই। পাশসঙ্কট, গ্রন্থিসঙ্কট, গুণসঙ্কট। 'দুর্গা' 'মা দুর্গা' বীজদ্বয়ে সঙ্কটমোচনী শক্তি

ইহাকে বলে—মহাসমন্বয়ী ছন্দঃ।
এইবার নীচের এই কারিকাটি ভাবনা কর—

যদি বিলপসি বন্ধো যুপপাশেয়ু দীন
প্রভবসি ন চ বৈরগ্রন্থিভেদায় বীর।
তরিতুমপি গুণাখ্যাং দিব্যমায়াং ন দিব্য
ক্ষম ইহ জপ মন্ত্রং রক্ষণী নাম দুর্গে॥১১

—দীন (পশু), বীর এবং দিব্য তন্ত্রোক্ত এই তিন ভাবকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত রক্ষণী মন্ত্র (ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা) জপ ধ্যানের বিধি হইতেছে। যথাক্রমে পাশসঙ্কট, গ্রন্থিসঙ্কট ও গুণসঙ্কট কাটাইবার নিমিত্ত। বিশ্বগত যে মৌলিক ছন্দঃ (Basic Harmony), সেটির সঙ্গে নিজগত মৌলিক ছন্দের মৈত্রীটি সংসাধিত না হইলে উক্ত ত্রিবিধ সঙ্কট দেখা দিয়া থাকে। স্থানান্তরে দেখিব যে 'দুর্গ' বা 'দুর্গম' এই শব্দটি হইতেছে ঐ সঙ্কটত্রয়ের আকৃতি বা ফরমূলা। এ সঙ্কটত্রয় (গুণ+গ্রন্থি+পাশ) আবার শুধু স্তব্ধভাবেই (static complex-এ) বিদ্যমান নেই; ঘূর্ণীর মতো অথবা চল্‌তি চাক্কির মতো নিরন্তর ঘূর্ণায়মান। পাদে মাত্রায়, কলায়, কাষ্ঠায় এর চতুঃসূত্রী বিশ্লেষণ চাই। এর বাস্তব বেগ (momentum) কাটাইবার (resolve করার) উপায় 'দুর্গ' শব্দের অন্তে 'আ' অক্ষরের সংযোগ। ফলে 'দুর্গা'। অথবা 'দুর্গম'কে ছিন্নমস্তা পাদপীঠ রীতিতে বিপ্রতীপ করিয়া লইয়া 'মা দুর্গা'। ছিন্নমস্তা ভঙ্গীটিতে সর্বাংশেই ধ্যান দিও। 'সব উলট দেও' এই রীতির কথাই এখানে বিশেষ করিয়া বলিতেছি। যথা, 'হংসঃ সোঽহম্ স্বাহা'। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে—'ওঁ জুংযঃ সোজুং ওঁ' ইত্যাদি। আগের কারিকায় উদ্দিষ্ট নবার্ণ মন্ত্রেও এই রীতিটি উদাহৃত।

ছন্দের নিঃশ্রয়ণী (সোপানাবলী) আশ্রয় করতঃ সমন্বয়ীতেই থামিলে চলে না কেন? ছন্দের এই তুরীয়ভূমি কেন আবশ্যক হয়?

স্থূল, সূক্ষ্ম, বাহ্য আন্তর সর্বক্ষেত্রে মহাসমন্বয়ী ছন্দঃটিকে আর্ষ দৃষ্টিতে মিলাইবার প্রয়াসেই এই 'জপসূত্রমের' অবতারণা। সে ছন্দঃটি না মেলা পর্যন্ত জপ বা অন্য কোনও আধ্যাত্মিক প্রয়াসের নির্ভরযোগ্য পূর্ণ আধারটাই মিলিবার নয়। সাধককে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেই হয়—আমার এবং বিশ্বের মূলে কি উক্তরূপ ছন্দঃ (Basic Harmony) বিদ্যমান অথবা উহার অভাব (Basic Disharmony) বিদ্যমান? সে যুগে পদার্থ বিজ্ঞানের গতি যখন এটমেই এবং তাদের ঘাত-প্রতিঘাত জন্য শক্তি ব্যষ্টি ও সমষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও 'পাশার চালেই' এই অপূর্ব বিশ্বরচনা কৌশলের একটা উপপত্তি দেবার চেষ্টা কেহ কেহ করিয়াছেন। কেহ বা বিদ্রূপও করিয়াছেন—এ যেন এক ঝুড়ি ছাপাখানার সীসার হরফ লইয়া যথাখুসি ঢালা উবুড় করিতে করিতে সেক্ষপীয়রের মহানাটক হ্যামলেট (compose) রচিয়া ফেলা! কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কাল নিরবধি, পৃথ্বীও বিপুলা; Calculus of Probability-র দরাজ হিসাবে ওটা অসম্ভব তো নয়। বর্তমানে এটম্ ভাঙ্গিয়াছে; প্রকাশ্যে যতটা না হৌক চোরাবাজারে শক্তি এবং বস্তুমানের 'লেনদেন' ও খাসা চলিতেছে। তাতে বরং মৌলিক হিসাবের সুরাহাই হইয়াছে দেখিতেছি। গোড়াকার হিসাবটা Statistician-এর আমলে আসিতেছে বটে, কিন্তু সেখানেও তো জবর হিসাবের লম্বা চওড়া আঁকের খাতাগুলোই দেখিতেছি। এই সে দিনও জিন্‌স অর্দ্ধ ডজন টাইপ-রাইটারের সামনে সিকি ডজন কপিদম্পতি বসাইয়া তাদের কাছে একটা সনেট প্রসব করিয়া দেবার বায়না দিলেন! একটা সনেট কেন, এই বিরাট সৃষ্টিসৌষ্ঠবটাই ও ভাবেই যদি হইয়া থাকে তো, তাতে গোড়ায় হিসাব অথবা তার সম্ভাবনাটাই বান-চাল হইয়া গেল এমন মনে করার হেতু উপস্থিত হয় নাই।

বিশ্ব এবং ব্যষ্টির সম্পর্ক তিন প্রকারের হইতে পারে। তার মধ্যে কোন্‌টি অভ্যুদয়ের পক্ষে আবশ্যক? বিশ্বের গুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত, লুণ্ঠিত রূপত্রয়

এখানে আর এ প্রসঙ্গ অনুসরণ করিব না। পরবর্তী বিশ্লেষণে মূলের কাঠামো

অনেকটা ফুটিয়া উঠিতে পারে। বিশ্বের সঙ্গো আমার সম্পর্ক অরি, মিত্র, উদাসীন এই তিন প্রকারের হওয়ার মধ্যে প্রথম এবং শেষেরটি বাদ দিয়া 'মধ্যমটি' আমাকে পাইতে হয়। জ্ঞানে ও আস্বাদনে ও ব্যবহারে ঠিক সে ভাবে প্রতীয়মান না হইলেও, সাধ্য সাধনায় তাই আমায় করিয়া লইতে হয়। যেটি আসলে যা নয়, তাই তাকে করিয়া লইবার সাধনা হইলে, এ সাধনা বোধহয় অসাধ্যের সাধনাই হইত। এমন কি, বিশ্বটা 'নাই'—এভাবে সেটাকে 'ন স্যাৎ' (eliminate, negate) করিয়াও যদি নিজেকে সত্যভাবে পাইতে হয়, তবু এটা ঠিক যে সেই 'নেতি' করণ (negating process) এর নিমিত্তও, যে চলিয়া গেল বা যাইবে, তার সহযোগ আবশ্যক হয়। এ ব্যাপারটাও এক তরফা মনে করিলে ভুল হবে। A Hostile Universe অথবা একটা Neutral Universe ও তার 'খপ্পর' থেকে আমায় ছুটি দিতে গেলে, তাকে আমার Ally (মিত্র) ভাবেই সেটি করিতে হয়। এবং সেটি সে করে, তার এবং আমার দুয়েরি মূলে এক মহাসমন্বয়ী ছন্দঃ আছে এই কারণেই। এবং এই অধিকারেই অর্থাৎ, মূলে আমরা দুয়ে হরি-হর—তাই আমি যখন তাকে বলি 'হরি' (ইচ্ছামত eliminate অথবা sublimate করি), তখন সেও খাসা লক্ষ্মী ছেলেটির মতো বলে 'হর'। এমন 'হরি হরাত্মা' সে-আর-আমি নৈলে কি আখেরের কারবার চলিত?

মূলে যে আনন্দ এবং লীলাকৈবল্যম্' তাতে উপনীত হবার 'সেতু'টি কোথায় কি ভাবে মিলিবে?

আমরা জপসূত্রমে আনন্দকেই সব কিছুর 'হৃৎ' (innermost core, essence) রূপে দেখিয়াছি। আনন্দের যেটি স্বীয় ঋতম্ তাকে বলে লীলা। শুদ্ধ আনন্দে লীলাও শুদ্ধ, কেবল বা স্বরূপ লীলা। বিশ্বের বিকাশের মূলে যে লীলাকৈবল্যম্ সেটি কারবারী বিশ্বে আসিয়া তিরোহিত হয় নাই বটে, কিন্তু কুণ্ঠিত, গুণ্ঠিত এবং লুণ্ঠিত এই তিনটি ব্যাজ রূপ (বৈরূপ্য) ধারণ করিয়াছে। Statistical Universe এর গুণ্ঠিতরূপ, Neutral Universe কুণ্ঠিত রূপ, Hostile Universe (Brute Universe) এর লুণ্ঠিত রূপ। প্রথম খণ্ডে ছন্দের লক্ষণে এই 'ব্যভিচার'গুলি কিছুটা আলোচিত হইয়াছে। দেশ, কাল, বস্তু এবং ছন্দঃ এই চারিটিরই গবেষণায় বর্তমান যুগ এক রহস্যময় দিকচক্রবালের সম্মুখীন হইতেছে মনে হয়। আর কিছু অগ্রসর হইলেই অভিনব এক

দিক্‌বলয় দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হইবে, ইহাও মনে হয়। বর্তমানের আকস্মিকতা (Chance) এবং অনিশ্চিততা (Indeterminacy) যতদূর পৌঁছিয়াছে, তার পর কি—ততঃ কিম? ওই লীলাকৈবল্যধামেই কি তার শেষ গন্তব্য নয়? ভরসা এই যে সমন্বয়ী ছন্দই এ যাবৎ তার পথের দিশারী হইয়াছে। যদৃচ্ছা, নিয়তি ইত্যাদি কথা তো এখন আর স্রেফ আন্দাজি অথবা খেয়ালি কথা মাত্র নয়। সবকিছুর মূলে সংখ্যা বিজ্ঞানের কুলিশকঠোর ছন্দঃটি রহিয়াছে। এবং বাস্তব পরীক্ষায় তার 'নির্ম্মম' (impartial) বিনিয়োগটিও হইতেছে; কাজেই আরও আগাইয়া প্রাণ, সম্বিৎ, বিজ্ঞান এবং আনন্দের মহাসমন্বয়ী ছন্দোমহিমার দ্বারে উপনীত হবার সেতুটিও সত্বর মিলিয়া যাওয়াই সম্ভব। বর্তমানযুগদিশারী একটা রহস্যময় তমসার সীমানায় আসিয়া যে রক্তরাগের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছেন, সে রক্তরাগ কি ঘনায়মান গোধূলির শ্রান্ত মলিন অস্তরাগ, না নবারুণোদয়ের শান্ত বরেণ্য কনকরুচির রক্তিমচ্ছটা?

আকস্মিক ও অনিশ্চিতের মাঝেও মূলে 'বাছাই'টি চাই-ই, নচেৎ, সৃষ্টির উপপত্তি হয় না। ঐ মূল বাছাইটি 'ব্যাহৃতি'

সেতুর সন্ধান দেয় ওই আদিম ব্যাহৃতি ভূঃ। পাশার চালে অথবা ছাপাখানার টাইপের ঝুড়ি 'ঢালাউবুড়' করিয়া এই বিশ্বটা রচিত হওয়া অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু সে ব্যাপারে অপর একটি মূল ছন্দঃ ক্রমাগত হাত দিতেছে যে! সে করে কি? প্রায় অগুণতি সম্ভাবনার মধ্যে সে কোন কোনটিকে বাছিয়া লয়; বলে—"ও সবই সম্ভব হতে পারে বটে কিন্তু তার ভেতর এই এইটিই কারবারে চালু হলো, বাকিগুলো হিসেবের মধ্যেই চুপচাপ 'খাতাবন্ধী' থেকে যাও।" এই যে সব কিছু মৌলিক আর যৌগিক ব্যাপারে 'ঝেড়ে বেছে নেয়া' এটি হল 'ব্যাহৃতি', যার আদিম রূপটি 'ভূঃ'।

ধুমাবতীর শূর্পটির পরিচয়। মীনাদি পঞ্চশক্তিতে ব্যাহৃতিরূপতা

শ্রীশ্রীধূমাবতীর হস্তে এই ব্যাহৃতি হইয়াছে শূর্প-কুলো। পদার্থ বিজ্ঞানের মূল হিসাবগুলো পরীক্ষা কর; সে সবেরই ভিতর থেকে ওই শূর্পটিকে বাছাই করিতে দিতেই হয়—কে বা কারা 'বাহাল' হবার টিকিট বা ছাড়পত্র পাবে, কারাই বা সেটা পাবে না। সকলেই তো ছাড়পত্র পায় না দেখিতেছি। পাইলে বিশ্ব ব্যবহারটাই চলে না। বাছাই বা ব্যাহৃতি

চাই-ই। সে যুগে ম্যাকস্ওয়েল Kinetic Theory of Gases-এর গবেষণা প্রসঙ্গে এক Sorting Demon (বাছাইকারী ভূতের) কল্পনা করিয়াছিলেন। কোনও এক lucky hit-এ বিশ্বটা যদিই বা রচিত হইয়া গেল ধরা যায় তবু এর স্থিতি, পোষণ ও বিকাশের নিমিত্ত ব্যাহৃতি অথবা ধূমাবতীর হাতের ঐ কুলোটিকে অস্বীকার করার উপায় আছে কি? চাপ, তাপ, পোটেনসিয়াল্ ইত্যাদি শক্তির স্তর (level) গুলির তরতমতা বজায় থাকা চাই; এদের কিন্তু একীকরণ (Equilibrium) এর দিকে একটা নিরন্তর প্রবণতা রহিয়াছে। মোট কথা মীনশক্তি (পূর্বালোচিত) সব কিছুই 'সলিল'রূপে প্রায় একাকার করিতেছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে কৌর্ম (সংগ্রহ পূর্বক ধারণ) শক্তি, বারাহী শক্তি (levelling up), নারসিংহী শক্তি এবং বামনশক্তি। বিশ্ব ব্যাপারে এই শক্তিরূপে মূল পঞ্চাবতার আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে আবার করিব। 'সলিল' রূপটি একাকার প্রায় বলা হইল, কেননা তখনও বীজ সংরক্ষণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ, তখনও অব্যক্ত ভূমিতে 'বাছাই' বা ব্যাহৃতি আছে। Primary Potential fieldটাও আসলে Differential field. কোন না কোন প্রকার Basic Differential Equaiton সেখানেও নিরবকাশ নয়।

ব্যাহৃতি এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন

বিগত শতকে ডারউইন প্রাণিজাতি সমূহের উদ্বর্তনে (Evolution-এ) প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর বিশেষ বায়না দেবার পথ থেকে ব্যাহৃতি বা বাছাই ব্যাপারটাকে "The master Key to the interpretation of Nature"—প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের সেরা চাবিকাটি মনে করা হইয়াছে, এবং বিজ্ঞানের সদর অন্দর সকল প্রকোষ্ঠেই সে চাবিকাটির সুনিপুণ ব্যবহারও হইতে দেখা গিয়াছে। ব্যাহৃতি=বি (বিবিচ্য)+আহৃতি (আহরণ)।

কিন্তু বাছাই কর্মটি তো অনিদান, অহেতুক হয় না।
'ভূ' (হওয়া) ধাতুর নানা রূপের মধ্যে একটা
'অব্যয়' রূপ মিলে কিসে? ইহাই সমস্যা

বাছাই তো অনিদান (মিছামিছি) হবার কথা নয়। কেন, কিসের জন্য বাছাই? এ

প্রশ্নটা তলায় তলায় থাকেই। সুতরাং, তার জন্য এমন একটা কিছুর দরকার হইয়া পড়ে, যেটাকে আমাদের আঁকের হিসাবে এ পর্যন্ত আমোল দিতে হয় নাই। লোহার গুঁড়া চুম্বকের কাছে যাবে। একটা নির্দিষ্ট পথেই যাবে। মাঝে যদি একটা বাধা রাখ, সেখানে যেয়ে আটকে পড়বে। সেখানে সে নিরুপায়। কিন্তু একদলা শর্করার সন্ধানে একটা পিপীলিকা হয়তো সোজাই চলিয়াছে। পথে একটা বাধা রাখ। পিপীলিকা সেথায় আসিয়া কিছুক্ষণ থমকিয়া রহিবে বটে, কিন্তু বাধাটাকে লঙ্ঘন করিয়া তার নূতন পথটিও সে অচিরে বাছিয়া লইবে। নানাদিকে নানা সম্ভবের (possibilities, alternatives) মধ্যে একটাকে আপন কাজে বাছিয়া লয়—এটা প্রাণের ব্যাপারে একটা বিশেষ ধর্ম। দুটা পয়সা লইয়া উপরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেখিতেছি, তাদের কোন্ দিকটা (head or tail) এক সঙ্গে কতবার উপর দিক হইতেছে। অল্প কয়েকবার ছুড়িয়া ফেলিয়া তাদের একসঙ্গে হবার কোনও নিয়ম পাইলাম না; বহুবারে কিন্তু পাইব। অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট অনুপাত পাবার পথেই চলিতেছি এটি লক্ষ্য করিব। কিন্তু যদি চাই প্রতিবারেই ঐ পিঠ দুটো একসঙ্গে পাব, অথবা প্রতি তিন তিন বারে, কি পাঁচ বারে, কি সাত সাত বারে, তবে ঐ পয়সা দুটাকে পড়ার সময় তাদের পিঠ বেছে নেবার একটা মরজি ও মঞ্জুরি আমায় দিতে হবে। এক কথায় তাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঠিক লোহার গুঁড়োর মত আর তারা নয়, তারা যেন এখন শর্করান্বেষী পিপীলিকা। ভূ ধাতুর অশেষ রূপের মধ্যে 'ন ব্যেতি' কিনা অব্যয়, ধ্রুব, নিরূপিত একটা রূপ বাহির হওয়া চাই। পিপীলিকা শর্করা রেণুটি পাইবেই। এটি ধ্রুব, লক্ষ্য হিসাবে। সোজা রাস্তায় হয়ত ভালই। পথের নানান্ হেরফের নানা কারণে ঘটিলেও, সে তার মধ্য থেকে অভীষ্ট পথটি বাছিয়া লইবেই। চুম্বকের কাছে লোহার গুঁড়ার গতিপথটা 'সোজা'ই বটে, অর্থাৎ ব্যবস্থিত; কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছিবে কি না পৌঁছিবে সেটা ব্যবস্থিত নয়। পথে একটা পিস বোর্ড খাড়া করিয়া রাখিয়া তুমি তাদিগকে লক্ষ্যে না যাইতে দিতে পার। জলের ভিতরে বুদ্‌বুদ্ ভাসিয়া উঠিয়া উপরের বাতাসে মিশিবে; জলে ডুব সাঁতার কাটিতেছে, এখন একটা ব্যাংও তাই করিবে। এমতস্থলে দুয়ের ব্যবহার লক্ষ্য কর। লক্ষ্যটা ঠিক রাখিয়া পথ বাছিয়া নেয়া এইটি সজীবতার লক্ষণ।

ভূ ধাতুর অব্যয়রূপ 'ভূঃ' ব্যাহৃতির প্রথম কর্ম—অনিয়তবৎ প্রতীতের মধ্যে 'নিয়ত' কোন সূত্র আবিষ্কার করা, কেননা, সে সূত্র না মিলিলে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না

ভূ ধাতুর অশেষ রূপের ভিতর 'ভূঃ' এই অব্যয়টিকে ব্যাহৃতির কর্মটি করিতে গেলে অসাধারণ কুশলী হইয়াই সেটি করিতে হয়। ক্রিয়ার রূপগুলি তো কেবলি 'ব্যেতি', শুধু তাই নয়; অনেক ক্ষেত্রেই সে ক্ষর ভাবটি সাতিশয় চপল (whimsically variable); অন্ততঃ সেইরূপ মনে হয়। ব্যাহৃতির প্রথম দফা কর্ম হইবে—এই চপলবৎ প্রতীয়মান ক্রিয়াটির মধ্যেও একটা 'সূত্র' আবিষ্কার করা। অনিয়ত পরিণতির স্থলে Differentiate করিয়া যেমন ধারা true rate of variaiton (ঋতায়ন) বাহির করিতে হয় তেমনি। না করিতে পারিলে সে গতিটির একটা নির্ভরযোগ্য 'বর্ত্মলেখ' (curve or picture) আমাদের হাতে আসে না; এবং তা না আসিলে, তার নিয়ন্ত্রণও সাধ্যায়ত্ত হয় না। নিয়ন্ত্রণের আগে নিমন্ত্রণ অর্থাৎ, তার নিজের 'কোটে' গিয়া তাকে দেখিয়া আসা এবং 'পায়ের ধুলো' দিতে বলিয়া আসা। মধুকৈটভ লড়াইএ তুষ্ট হইয়া নিজেরাই 'বর' দিবে যে আমরা তোমার বধ্য হইব। নচেৎ, তাদের মার নেই। কোন একান্ত অজানা অচেনারই মার নাই।

একটা দৃষ্টান্ত—জ্যামিতিক

ধর, একটা বহুভুজ ক্ষেত্র বলিতেছে আমি বৃত্ত হইব। তার ভুজ সংখ্যা সে বাড়াইতে অথবা কমাইতে লাগিল। বাড়া কমাটাও ধর অনিয়ত। এমতস্থলে অশেষ বাড়া কমার মধ্যে হঠাৎ বৃত্ত হবার মত অতি বাড়টা হওয়া অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু সে যেন অশেষকে সরাসরি শেষ করার প্রতিজ্ঞা! যদি ব্যাহৃতি এ কর্মটি সম্পাদনের ভার লয়, তবে আদৌ তাকে কি পাইতে হইবে? এই বহুভুজের ভুজসঙ্কোচ-বিস্তারের একটা 'লেখ' (Graph) অঙ্কন করিয়া ফেলিতে হইবে। তারপর? কমার দিকে ঝোঁকগুলো ছাটাই ('মা ভূঃ') করিয়া বাড়ার দিকে ঝোঁকটা বাছিয়া লইতে হইবে। তারপর, নিজের অভীষ্ট কয়টি ধাপে যাতে চরম বাড়টি ঘটিয়া সে বৃত্তই বনিয়া যায়, সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ক্রিয়া ও ব্যাপার মাত্রের একটা 'মর্মী কেন্দ্র' আছে। সেটা না-পাওয়া পর্যন্ত তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না

ক্রিয়া চপলই হোক আর অচপলই হোক, তার একটা নির্ঘাত, 'মর্মী' স্থান আছে, যেখানে সে তার ঋতটিকে অনিয়ততা, অনিশ্চয়তার আড়ালে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখে—রূপকথার রাক্ষুসীদের প্রাণ যেমন ধারা অথৈ জলের তলে সংগোপনে কৌটার ভিতর রহিত। প্রথম সেইটাকে বাহির করিতে পারা চাই। তত্ত্ব এবং তথ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের এত জারিজুরি এই কারণে যে ইহা আপাত-অনিশ্চয়-অনিয়ত-বৃত্তিতার মাঝে নিশ্চয়ের সূত্র বাহির করার এক কুশলী টেকনিক (Calculus) অনেকদিন হইল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। শুধু আবিষ্কার নয়, তৎপুরস্কার অদ্ভুত সৃষ্টিকুশলও হইয়াছে।

হৃদ্রোগের দৃষ্টান্ত

ধর, কারুর বুকের ব্যায়রাম। বুকের স্পন্দন পরীক্ষায় দেখা গেল—সেটি (un-rhythmic, irregular)। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বলিবেন—শুধু ২/১ মিনিট ষ্টেথিস্‌কোপ লাগাইয়া অবস্থাটা ঠিক পাওয়া যাবে না—Electro-cardiograph চাই। বক্ষোযন্ত্রের এবং সে যন্ত্রের ক্রিয়ার একটা 'প্রতিকৃতি' সামনে পাওয়া চাই। তদ্দৃষ্টে সে যন্ত্রের ক্রিয়ার কোন্ দিকে কি ভাবে প্রবণতা (trend), সেটি শুধু সাধারণ ভাবে নয়, সঠিকভাবে জানিতে পারা গেল। অর্থাৎ, আপাতদৃষ্টিতে যেটি অনিয়ত, তার মধ্যেও একটা নিয়ামক সূত্র বাহির হইল; 'index,' 'clue', 'ratio' মিলিল। তখন সেটিকে ধরিয়া treatment. গণস্বাস্থ্য; জনশিক্ষা, অর্থনৈতিক সংস্থা সব কিছু ব্যাপারেই বৈজ্ঞানিক উপায় হইল—আদৌ গতিস্থিতির হ্রাসবৃদ্ধির একটা নির্ভরযোগ্য 'আলেখ্য' মেলান।

জপের দৃষ্টান্ত। 'ঋতায়ন'টি কিরূপে মিলাইবে?

ধর, আমার জপ অভ্যারোহ জপ হইবে। তা হবার উপায় কি? বর্তমানে যে জপ চলিতেছে, সে জপ তো 'চল, চপল, চঞ্চল'। কখনও কথঞ্চিৎ স্থির, কখনও বেজায় অস্থির, কখনও গর্তের ব্যাঙ, কখনও গাছের মর্কট; কখনও বেশ সতেজ, কখনও

মরার মতো; কখনও একটুখানি আলোক-পুলক মিলে, কখনও একেবারে 'যান্ত্রিক,' নাক কান মলে মালা ঘুরিয়ে মরাই সার। এই নিতান্ত অনিয়ত, 'অবাধ্য' জপক্রিয়াটিকে লইয়া করিব কি? দুত্তোর বলিয়া হাতের মালা ছুড়িয়া ফেলিব কি? আগের দৃষ্টান্তে যেটী আবশ্যক হইয়াছিল—একটা electro-cardiograph তোলা—এস্থলেও সেটী আবশ্যক। অর্থাৎ, আমার জপকর্মের গতিস্থিতির একটা ফলাও নক্সা মেলা চাই। নিজ জপকর্মটিকে আদ্যন্ত সাবধানে অথচ উদাসীনভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং অভিজ্ঞ পুরুষের দ্বারা তার একটা graphও আঁকাইয়া পরীক্ষা করাইতে হইবে। 'সাবধান উদাসী'টি হইয়া লক্ষ্য করিতে হইবে যাতে ক্রিয়াটির আপন রূপটি তাতে ব্যাহত না হয়। যথাসম্ভব detachedly, objectively. জপকর্মটি সাঙ্গ হবার পরে, তার এক 'বিশ্বস্ত বিবরণী' নেবার চেষ্টা করাই গোড়ায় ভাল। পরে ঐ উদাসী সাক্ষী অথবা দ্রষ্টাটিকেও ভিতরে ক্রমশঃ ক্যামেরা-হাতে হাজির দেখিব। 'অনশ্নন্ অভিচাকশীতি'রূপে যে একান্ত উদাসীন সাক্ষিপুরুষটি আমার এই 'পিপ্পল পাদপ'টির 'শিরডালে' রহিয়াছেন, তিনি আবশ্যক মত তাঁর কোনও না কোনও 'ডেপুটি' দ্বারা ঐ পূর্বোক্ত উদাসীনের কর্মটি করাইয়া লন। ডেপুটিটি দেখি কিন্তু স্বয়ং 'তটস্থ' অর্থাৎ, কতক ভোক্তা, কতক দ্রষ্টা। তবে ভোক্তার ভাগটা যত কম হয় ততই ভাল। যাই হোক, এই ডেপুটি দ্বারাই কোনমতে কাজ চালাইতে হইবে তো! ধর, ছবি তুলিয়া দেখা গেল—জপক্রিয়াতে অস্থিরতার 'ছাপ'টাই বেশী—মনে রুক্ষতা, চাঞ্চল্য; শরীরে বায়ু, জ্বালা, অনিদ্রা ইত্যাদি। কখন, কি ভাবে, কতটা বেশী—একদিকে তমঃ, অপর দিকে সত্ত্ব—এ দুয়ের স্পর্শ-পরিচয়ের সাথে এই রাজসিক লক্ষণগুলোর অনুপাতটা ঠিক কি—এটা যথাসম্ভব খাঁটি করিয়া পাইতে হয়। অর্থাৎ, একটা inside, outside graph. এইবার সেটি অভিজ্ঞ পুরুষের কাছে পেশ কর। তিনি তদ্দৃষ্টে প্রশ্ন করিলেন—কোন্ বীজ কি ভাবে জপ করা হয় গো? (অপরাপর প্রশ্নের মধ্যে অবশ্য এই একটি।) বলিলাম—হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ। 'র' কার বা অগ্নিমাত্রার উপর জোর দিয়াই আমি জপ করি, তাও বলিলাম। তিনি ব্যবস্থা দিলেন—সোমমাত্রায় (ঁ) জোর দাও। জোর দেবার মাত্রাদিও তিনি দেখাইলেন। আর বলিলেন মাস খানেক বাদে আবার তাঁর কাছে রিপোর্ট দাখিল করিতে। কাজেই, এ দৃষ্টান্তেও দেখিতেছি—আগে আহৃতি পশ্চাৎ ব্যাহৃতি; আগে নিমন্ত্রণ, পরে নিয়ন্ত্রণ। যাচিয়া সাধিয়া সব কিছুকে আগে

'আপন কোঠে' আনিয়া ফেলিতে হয়। আপন বলে, আমার এই 'মামুলি' জপকর্মটিকে অভ্যারোহ জপ করিব সাধ হইয়াছিল, না? সে যে সাগর সেঁচিয়া মাণিক আহরণের মতো বড়ো সাধনের ধন! শ্রীশ্রীবদরী-নারায়ণের যাত্রী তুমি, কোন গতিকে রেলে বাসে লছমণ ঝোলায় আসিয়াই দুর্গম চড়াই উতরাই এর পানে চাহিয়া গা এলাইয়া দিবে? এই কারিকাটি ভাবিয়া দেখ—

অপি বিরলকষায়ে বিশ্ববৈরস্যজাড্যং
বদ ক উরুকষায়ো ভাসমৃচ্ছেদ্রসালাম্।
ভব মৃদিতকষায়ো মধ্বৃচা দোগ্ধু কামো
মধু-মিলিত-সবিত্রা ধুক্ষ্ব রোচিশ্চ ভর্গঃ।। ১২

'ঋতস্য পন্থায়' জপকে অভ্যারোহী করিতে হইলে 'কষায়' তনূকরণ কর—পঞ্চক্রমে

কষায় (ধাতুর 'অপ্রসাদ') বিরল (কিনা তনু) হইলেও এই অপরূপ বিশ্ব বিরস ও জড়বৎ বোধ হইয়া থাকে। তা যদি হয় তো বল, উরু (বিপুল) কষায় কোন্ জন (বিশ্বে ওতপ্রোত) সেই রসাল জ্যোতিতে প্রবেশ করিবে? ('অগম্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্')। যদি মধ্বৃচা, অর্থাৎ মধুমতী ঋকের মন্ত্রবর্ণ সমূহ দ্বারা এই সমুদয়েই 'মাধ্বীধারা' দোহন করিতে ইচ্ছুক হও ('দুহানা অমৃতস্য ধারাম্') তবে সর্বপ্রকারে এই যত্ন কর—কিসে 'মৃদিতকষায়' হইতে পার। তদনন্তর যদি মধুমতী এবং সাবিত্রী এই দুইটিকে মিলাইয়া লইতে পার (যেমন ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক করিয়া দেখাইয়াছেন), তাহা হইলে 'রোচিঃ' এবং 'ভর্গঃ' এই দুইকেই সম্মিলিত ভাবে দোহন কর। রোচির রোচনা এবং ভর্গের দ্যোতনা সম্মিলিত হউক। প্রেষ্ঠ (মধুমত্তম) এবং বরিষ্ঠ (বরেণ্য) এক হইয়া যাউক! উরুকষায়, তনুকষায়, অণুকষায় মৃদিত কষায়, নিষ্কষায় বা নির্গলিত (eliminated or sublimated) কষায়—উত্তরোত্তর ধাতুগত কষায় জারণ মারণ শোধনের ক্রমগুলি অতিক্রম না করিয়া আমার এই মামুলি জপকর্মটি 'এক লাফেই' অভ্যারোহী জপ হয় কি প্রকারে বল দেখি?

কষায়ের ব্যক্ত রূপ 'আময়'। সেটি নিবারণের জন্যও আহূতি ও ব্যাহূতি

বাহ্য আন্তর, সমষ্টি ব্যষ্টি, সর্ব্ববিধ 'আময়' হইতে যেটি শাশ্বত 'পদং অনাময়ম্' তাতে উতরণের উপায় উক্তরূপ আহূতি ও ব্যাহূতি। পুনশ্চ ভাবনা কর—

তুদতি যদি বিকারো হ্যাময়াজ্জায়মানো
ব্রজ নিবসতি বৈদ্যো যত্র ছান্দোগ্যশর্ম্মা।
স যদি বিচিনুতে তে ছন্দসাং মৈত্রভাঞ্জি
ভুজগমিব স বৈরং শাস্তি কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি ঘৃষ্টম্।। ১৩

আন্তর আময় থেকে জায়মান যে বিকার (বৈরূপ্য) সেটি যদি তোমায় কষ্ট দেয় (তুদতি), ইহা নিশ্চিত (হি) বুঝিতে পার (অল্প স্বল্প, ক্ষণিক উপসর্গে বিশেষ উদ্বিগ্ন বা worried না হওয়াই ভাল), তবে কি করিবে? যেখানে বৈদ্যের নিবাস সেখানে যাও। বৈদ্যের যে কোথা নিবাস তার তল্লাসও আগে কতক পাইয়াছি। বৈদ্যের নামটি—ছান্দোগ্যশর্মা। এঁর বিশেষ পরিচয় আলাপে ও আচারেই মিলিবে। গোড়ায় তেমন করিয়া যদি বা না চিনিতে পার তো, জানিয়া রাখ—ইনিই সর্বশ্রুতি-শিরোরত্ন-সমুদ্ভাসিত-মূর্তি সাক্ষাৎ বেদান্তাম্বুজ-ভাস্কর শ্রীগুরু। ছান্দোগ্য (ছন্দোগ) এবং শর্মন্ এই শব্দ দুটিতে ধ্যান লাগাইও। তিনি কি করেন? তোমার এই বিকার অথবা বৈরূপ্য সৃষ্টি করিয়াছে যে সমস্ত পরস্পর সংঘর্ষী (বিবাদী) ছন্দের জটলা, তাদের মধ্য হইতে মৈত্রভাক্ (অনুকূল; helpful, friendly) ছন্দঃগুলিকে তিনি বাছিয়া দেন (বিচিনুতে); ফলে, তারা জটলা হইতে মুক্ত হয় এবং তদ্দ্বারা তিনি যেটি বৈর, কিনা বৈরূপ্যজনক প্রতিকূলভাব, সেটিকে শাসন ও দমন করেন (শাস্তি)। কেমন ধারা? যেমন সাক্ষাৎ ছন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণের চরণ দ্বারা ঘৃষ্টফণ কালীয়ভুজগ শাসিত হইয়াছিল। ভুজগ=বক্রগ, মনে রাখিও।

(৪)

কষায় ও আময় আরও বিশিষ্টরূপে-স্মর বা কাম।
তৎপ্রতিষেধার্থ স্মরপঞ্চকম্

কষায় ও আময়রূপে যেটিকে জানিলে সেটিকে আরও বিস্পষ্ট রূপে জান—স্মর, কাম। এবং এই পাঁচটি কারিকা (স্মরণপঞ্চক) ভাবনা কর—

স্মরবিদহনদগ্ধো ন স্মরেৎ কিং ত্রিনেত্রং
স্মরগরলবিশীর্ণো ন স্মরেন্ নীলকণ্ঠম্।
স্মরখরশরবিদ্ধো ন স্মরেৎ কিং কিরাতং
স্মরবিমথিতচিত্তো ন স্মরেন্ মন্মথেশম্॥
স্মরবিদহনশান্ত্যায়র্কমধ্যস্থিতাব্জং
স্মরবিশরণশান্ত্যৈ পুণ্ডরীকাক্ষলাস্যম্।
স্মরবিধুবনশান্ত্যা অচ্যুতাধোক্ষজৌকঃ
স্মরবিমথনশান্ত্যৈ মন্মথং মন্মথস্য॥
স্মর ভয়মুরু জেতুং চণ্ডিকাধ্যানমন্ত্রে
স্মর তনুবিততৌ বা রক্তবীজস্য হন্ত্রীম্।
স্মর দিত-নিজমস্তাং চাত্মনো বৈপ্রতীপ্যে
স্মরনিচয়-নিবৃত্ত্যৈ সুন্দরীসৌম্যকান্তিম্॥
স্মরগররিপু গায়ৎ কামদেবস্য মন্ত্রং
স্মরমখচিরতৃপ্ত্যৈ হূয়তাং কামসূক্তৈঃ।
স্মর রজসি বিশালে বাগ্ ভবণ্ডাপি তারং
স্মর রজসি বিধূতে জ্যোতিরস্মীতি শুক্রম॥
স্মর মনসিজলেশং শান্ত আত্মন্যপাস্তং
স্মর বিরসবিপাকে যো রসো বৈ স ভূমা।
স্মর বিরহিতসঙ্গো ব্রহ্মণি স্যাদসঙ্গঃ
স্মর বিধুনিতশোকে সর্ব্বমেবেদমাত্মা॥ ১৪-১৮

হে স্মরদহনদগ্ধ! তুমি শিবমন্ত্রী, তোমার কি স্মরণ করা উচিত নয় সেই ত্রিনেত্র মহাদেবকে যিনি তাঁর পরম ভাস্বর ভালবহ্নি দ্বারা দুর্নিবার মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন? হে স্মরগরল-বিশীর্ণ-সত্ত্ব! তুমি কি স্মরণ করিবে না সেই সোমার্দ্ধধারী নীলকণ্ঠকে যিনি সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত কালকূট অবলীলাক্রমে স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ পূর্বক দেবতাদিগকে অমৃতভাগী করিয়াছিলেন? হে কন্দর্পখর-শরবিদ্ধ! তুমি কি স্মরণ করিবে না সেই কিরাতবেশী মহাদেবকে যাঁর অঙ্গ অর্জুনকার্মুক নিক্ষিপ্ত কোন সায়কই বিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই? হে স্মরবিমথিতচিত্ত! তুমি কি স্মরণ করিবে না তাঁকে যিনি স্বয়ং উন্মনীযোগস্থ রহিয়া মন্মথেরও নাথ, প্রভু, স্বামী?।। ১৪

তুমি বিষ্ণুমন্ত্রী? আচ্ছা—তবে এইরূপ ভাবনা কর। স্মরবিদহনজ্বালা শান্তির নিমিত্ত প্রদীপ্ত অর্কমণ্ডলের মধ্যস্থিত যে অব্জ (পদ্ম), সেই পরমস্নিগ্ধ-পেলব কমল স্মরণ কর, অর্থাৎ সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী সরসিজাসন নারায়ণ মূর্তি স্মরণ কর। আর স্মরগরলের দ্বারা যে নিরন্তর বিশীর্ণ হইতেছ, তার শান্তির নিমিত্ত, পুণ্ডরীকাক্ষ যে শ্রীহরি তার লাস্য, কিনা, বেণুবাদন এবং নূপুরশিঞ্জন সহকারে যে অপরূপ সঞ্জীবন বিমোহন নৃত্য (যেমন কালীয় নাগের বিস্তারিত ফণোপরি), সেটি স্মরণ কর। কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া জর্জর হইয়াছ এবং কম্পমান হইতেছ; এর শান্তির নিমিত্ত যিনি অচ্যুত, যিনি অধোক্ষজ, তাঁর যেটি ওকঃ, কিনা, অব্যয়, অনপায় ধাম সেটি স্মরণ কর। আর, স্মর যে তোমাকে প্রতিনিয়ত বিমথিত করিতেছে, তার শান্তির নিমিত্ত, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথ (মদনমোহন) যিনি তাঁকে স্মরণ কর। ১৫॥

তুমি শাক্তমন্ত্রী? স্মরজনিত যে (উরু) বিপুল ভয় সেটিকে জয় করার নিমিত্ত সুধাব্ধিমধ্যস্থিতা ধৃতমুদ্‌গরবৈরিজিহ্বা শ্রীশ্রীচণ্ডিকাকে ধ্যান কর এবং তাঁর মন্ত্র (নবার্ণাদি) জপ কর। আর, স্মর যদি উরুরূপে প্রকটিত না হইয়াও তনু (সূক্ষ্ম) রূপে ভয়াল বিস্তার লাভ করে এবং রক্তবীজের মতো ক্রমবর্দ্ধমান হয়, তবে রক্তবীজের হন্ত্রী প্রকটিতরসনা সেই কালিকাদেবীকে ধ্যানজপ কর। তোমার আত্মরতি বিপ্রতীপ, কিনা বিপরীত হইয়া, অনাত্ম বস্তুতে কাম জন্মাইতেছে বুঝিলে, যিনি 'দিতনিজমস্তা'—আপন মস্তক আপনি ছিন্ন করিয়া যিনি আপন রুধির আপনি পান করিতেছেন—সেই ছিন্নমস্তাকে স্মরণ কর। আর, স্মরজনিত নিখিল উপদ্রব নিবৃত্তির নিমিত্ত স্মরণ কর শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী অথবা শ্রীশ্রীদুর্গার চিদ্‌গগনচন্দ্রিকোপমা সৌম্যকান্তি। ১৬॥

পুনশ্চ, তুমি যে মন্ত্রী হও—স্মরগর (বিষ) তোমার 'দুরাসদ বৈরী' রূপে প্রকটিত হইয়াছে, কিন্তু এ রিপুরও তো রিপু আছে, antidote আছে, এটি স্মরণ কর। সেটি (অর্থাৎ; এ বিষের পক্ষে যেটি অমৃত) কি? সেটি হইতেছে কামদেবের (শ্রীকৃষ্ণের) 'গায়ৎ-মন্ত্র' কিনা, গায়ত্রী। সেটি ধ্যানজপ কর। আর এই যে কামযজ্ঞে অফুরাণ আহুতি দিতেছ, অথচ তর্পণটি কস্মিন কালেও হইতেছে না, তার জন্য কি উপায় করিবে? অথর্ববেদোক্ত প্রসিদ্ধ কামসূক্ত দ্বারা অন্তর্হবন কর, তাহা হইলে চির তর্পণ হইবে; কেন না, উক্ত সূক্ত সাক্ষাদ্ ব্রহ্মাববোধক। যদি তোমার দশা রজোবিশাল হয়, তবে বাগভব (ঐঁ) এবং তার (ওঁঙ্কার) বিশেষভাবে ধ্যান সহকারে জপকর্মে সমাশ্রয় কর। আর যখন, রজঃ বিধূত (অপসারিতপ্রায়) হইয়াছে দেখিবে তখন 'অহং জ্যোতিরস্মি শুক্রম্' এই পরম নিরঞ্জনী অনুভূতিতে স্থিতিলাভ করিতে যত্ন কর। ইহাই সত্যকার বিরজা হোম জানিবে। ১৭॥

ভাবিয়া দেখ—মনসিজ (কাম) 'শান্ত আত্মনি' আপন লেশ (জের) টুকু না রাখিয়াই অপাস্ত হইয়া যায় না কি? ইহাও মনে রাখ কামজনিত যত কিছু তোমার বিরস বিপাক (পরিণাম), তাদের চিহ্ন মাত্র কোথায় রহিবে যখন 'যো বৈ রসঃ স ভূমা'—এই সীমাহীন অগাধ রস সিন্ধুতে তোমার চির অতৃপ্ত রসলিপ্সু 'বিন্দু'টির সমর্পণ এবং সমাপ্তি হইয়া যাইবে! এই পরম সাধনার উপায় রূপে গীতার সেই 'আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠম্' ভাবটিও পূর্বে আশ্রয় করিবে।

অনিত্য সঙ্গের বিরহ বেদনায় বিধুর তুমি কি ভুলিবে যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ তো অসঙ্গাই, অর্থাৎ, অনিত্য অনাত্ম সম্পর্ক রহিত?

আর অবাস্তব যে অনাত্মপ্রিয়, তদ্দ্বারা বিধুনিত (পরিত্যক্ত) হইয়া তুমি শোক করিতেছ, কিন্তু তুমি যে ভুলিয়াছ—'আত্মৈবেদং সর্বম্'? আত্মা সব কিছুতে রহিয়াছেন এবং সব কিছু হইয়াছেন বলিয়াই না সব কিছুতে প্রিয়তাধর্ম এবং রসাস্বাদ আসিয়াছে! কিন্তু আত্মার সঙ্গে সত্যকার সংযোগ বিয়োগ তো হয় না; আত্মার হান উপাদানও নাই। কাজেই, নিরতিশয় প্রেষ্ঠরূপ তুমি তো স্বমহিমায় বহাল আছই। সুতরাং শোক কিসের? 'তরতি শোকমাত্মবিৎ'। এতদুদ্দেশ্যে নিত্য ঊর্দ্ধরেতাঃ শ্রীসনৎকুমার নারদাদি জ্ঞানভক্ত্যাদিসম্প্রদায়প্রবর্তক গুরুবর্গকে আদিতে স্মরণ করিও। ১৮॥

স্মরপঞ্চকের অন্তর্হবনে ছন্দঃ পঞ্চক কি ভাবে উদাহৃত? বিচয়ীকরণ এবং নিচয়ীকরণ—analytic isolation and synthetic sublimation

আমরা ঋতচ্ছন্দের যে পাঁচটি পর্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই পঞ্চ পর্বই পূর্ব কথিত 'স্মরপঞ্চকে' উদাহৃত হইয়াছে, এটি লক্ষ্য করিও। চতুর্থ শ্লোক মহাসমন্বয়ী এবং অন্তিম শ্লোক পরমসমন্বয়ী রূপটি বিশেষভাবে অনুধাবন করার মতো। প্রথম শ্লোক তিনটিতে পরিণয়ী, অন্বয়ী এবং সমন্বয়ীরূপ, যথাক্রমে নয় কিন্তু মিলিত ভাবে, অভীপ্সিত হইয়াছে। আরও লক্ষ্য করার বস্তু এই যে, প্রথম তিনটি শ্লোকে (শিব বিষ্ণু শক্তি মন্ত্রের) প্রত্যেকটিতে প্রথম তিন পাদে 'স্মর' এর 'বিচয়ীকরণ' (Differentiation) এবং চতুর্থপাদে 'নিচয়ীকরণ' (Integration), এবং তৎ তৎ অবস্থায় সেটির বর্জন মার্জন শোধন-বোধন এর উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধনার অগ্রে বিচয়ীকরণটি আবশ্যক—যতটা সূক্ষ্মভাবে সম্ভব—analytic separation এবং isolationটি হওয়া চাই। অরিমিত্র সব তালগোল পাকাইয়া রহিলেই মুস্কিল। তারপর আবশ্যক—শোধন-বোধন (purification and sublimation)। স্মর বা কাম একটা 'elemental passion'। শুধু passion নয়, function; শুধু আবার ঐ নয়, primal energy. ব্রহ্ম স্বয়ং 'অকাময়ত'। 'ন বৈ স রেমে'। মূলে এই শক্তি—আদ্যাশক্তিরই এক অযোনিজা মূর্তি। একে নাশ করা যায় না। করিবেই বা কে? কামরূপ প্রথম স্পন্দ ব্রহ্মাকাশে উদিত হয়, আবার তাতেই লয় হয়। মহাদেবকেও ভস্মীভূত কামকে আবার জীয়াইতে হইয়াছিল। নহিলে যে সৃষ্টিটাই অচল হয়। সুতরাং এই আদ্যাশক্তির 'বোধনের' ঘটটিই সাধককে সর্ব প্রযত্নে সাজাইতে হইবে।

Repression বা ভিতরে জটপাকান'। তা থেকে মুক্তি। সম্পূর্ণ মুক্তি—'অভীঃ' কিরূপে মিলিবে?

শুধু কামের repression এ fixation (ভিতরে ভিতরে 'জট পাকানো') সম্ভব হয়, যার ফলে, জীবনে যখন তখন কেবলই ভয়—এই কখন বা ভিতর থেকে অতর্কিত 'fission'টি ঘটিয়া সব ওলট্‌পালট্ করিয়া দেয়! Fissionটা violent (উরু, উগ্র) যদিও বা না হয়, slow insidious (তনু সূক্ষ্ম) হইতে তো বাধা নেই! আর, তাতেই

বিপদ বেশী। এই গুলি স্মর পঞ্চকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিও। বিশেষ বিচার পূর্বক ধীরভাবে উপায় আশ্রয় করিও। ভূতত্ত্ববিৎকে অগ্ন্যুৎপাত, ভূকম্পনাদির নিদানে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাগাইতে হয়, তোমাকেও তাই করিতে হইবে। কেন না, তোমারও সমগ্রসত্তার কেন্দ্র ঘিরিয়া রহিয়াছে ঐ রিরংসা বা কামরূপী Primal Energy. তার উপর চাপও পড়িয়াছে অনেক কিছুর; কিন্তু সেটি তথাপি উদ্দাম, প্রমাথী, বলবান। তোমার আন্তর স্বরগুলিতেও সৌষম্য সৌষ্ঠবের নিতান্ত অভাব; 'fault'এর একান্ত প্রাচুর্য। কাজেই, ভিতরকার নিরুদ্ধ শক্তিরাশি 'চাপসমন্বয়' এবং 'তাপসমন্বয়' কর্মটিতে, সমন্বয়ী ঋতচ্ছন্দঃ দূরে থাকুক, পরিণয়ী ও অন্বয়ী ঋতচ্ছন্দঃটি সব সময় খুঁজিয়া পায় না। সমাজ, নীতি, ধর্মের অনুশাসনের দ্বারা যখন তখন অন্তর্বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনাটাকে সঙ্কোচ করার চেষ্টা হইয়া থাকে বটে, বিপ্লবী শক্তি রাশিকে যথাসম্ভব অল্প প্রমাথী হবার নিমিত্ত এক একটা 'বৈধমার্গ'-ও দেখাইয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু নিস্তার সব সময়ে, বিশেষতঃ সঙ্কট সময়ে, মিলে কি! উপায়? মিত্র ও ঋতচ্ছন্দঃটিকে পঞ্চ পর্বেই অধিরোহণ বা অভ্যারোহটি শেষ করিতে হইবে। দুই এক সোপান উঠিয়া থামিলে চলিবে না। তাতে প্রমাথী প্রতিক্রিয়ার ভয় আছে।

(৫)

যোনি পঞ্চকে ছন্দঃ পঞ্চকের সর্বথা সমর্পণ

এইবার স্মরতর্পণের পীঠস্বরূপ যে 'যোনি' সেটিকে এইভাবে ভাবনা কর ঃ—

অপি নিখিলসৃজাং যাঽযোনিজা ব্রহ্মযোনিঃ
প্রভুরপি সহসাং যো যামৃতে স্পন্দতে ন।
স্বয়মিহ রমণো বা যামৃতে নৈব রেমে
প্রণম রতিকলাদ্যে চাম্বিকাং গুহ্যযোনী॥১৯

স্বয়ং অযোনিজা (কারণ রহিতা) ব্রহ্মযোনি তিনি, অর্থাৎ ব্রহ্মই বিশ্বযোনি রূপে তিনি, এবং ব্রহ্মের বাঙ্ময়রূপে যে বেদ, তারও যোনি তিনি; সুতরাং বাকরূপে অথবা প্রজাপত্যাদি রূপে যারা নিখিলের সাবিত্রী ও সবিতা তাদেরও যোনি তিনি। ইহা বলাতে তাঁর 'আদ্যা' এবং 'অম্বা' এই দুইটি রূপই বলা হইল। 'সহসাং' কিনা নিখিল বল

এবং শক্তির, যিনি প্রভু, স্বামী, তিনিও তাঁকে ছাড়িয়া (তদ্ব্যতীত) একটু নড়িতে চড়িতেও তো পারেন না। (তাঁতে স্পন্দরূপে জগদ্‌যোনিত্বের সম্ভাবনাই হয় না) অথচ, মনে হয় যেন তিনিই তো সব করিতেছেন! তাঁর অসীম, অকুণ্ঠিত 'জ্ঞানবল ক্রিয়ার' পশ্চাতে তাঁর স্বভাব (স্বো ভাবঃ) টি আছেই। এই জন্য শ্রুতি 'স্বাভাবিকী' শব্দটি ওখানে বসাইয়াছেন। অথচ, এই স্বভাবটি অচিন্ত্য, অলক্ষণ, নির্বচনের যোগ্য নয়। অতএব গুহ্য। ইহা বলাতে এক সঙ্গে 'গুহ্যা' এবং 'যোনি' এই দুইটি রূপ পাইলাম। শেষকালে, এই বিশ্বভুবনের স্বয়ং 'রমণ' যিনি, তিনিও তাঁকে ছাড়িয়া 'নৈব রেমে'। এটিও বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখ। এবলাতে কাম (রতি) কলা এবং আদ্যাকলা এই দুই অভিব্যক্তি (Aspect) মিলিল। সুতরাং আদ্যাকলা, অম্বাকলা, গুহ্যকলা, যোনি বা প্রকৃতি কলা এবং কামকলা—এই পঞ্চমহাকলারূপিণী 'যোনিপীঠ'কে প্রণাম কর, এবং স্মরগরজয়ী যে পরমসমন্বয়ী ছন্দঃ তাতে অধিরূঢ় হইয়া পরমজ্যোতীরস-বিশ্রান্তি লাভ কর।

ব্রহ্মলিঙ্গ পঞ্চপাৎ—আকাশ বা বিয়ৎ লিঙ্গ, অব্যক্ত বা স্পন্দলিঙ্গ, তৈজসলিঙ্গ, সলিললিঙ্গ এবং পার্থিবলিঙ্গ

আকাশন্তল্লিঙ্গাদ্ যা শ্রুতিষু নিগমিতা কীদৃশী লিঙ্গতা সা
যস্মিঁল্লিঙ্গানি জোষং জহতি নিজভবান্ কীদৃশং তদ্ হ্যলিঙ্গাম্।
ক্ষ্মামূর্তং বাপ্যমূর্তং জিগমিষতি গবাং রেতসা চাত্মগৌরী
মিঙ্কারাদ্ গন্তৃলক্ষ্যে লয়মপিচ গতিং পঞ্চপাদ্ ব্রহ্মলিঙ্গাম্ ॥২০

যোনিতত্ত্বকে আদ্যাদি পঞ্চকলারূপে ভাবনা করতঃ লিঙ্গতত্ত্বকেও অনুরূপ ভাবনা কর। এই যুগ্মভাবনা দ্বারাই কাম বা স্মরের যে 'নিচয়ীকরণ' (integral transformation or sublimation) এর কথা আগে বলা হইয়াছে, সেটি সুসাধ্য হইবে। স্বল্প, পরিচ্ছিন্ন, 'ভাসমান', 'প্লবমান' দৃষ্টিতেই তো পূর্বোক্ত সঙ্কটত্রয়! এর স্থলে ব্রহ্মদৃষ্টি, সর্বানুস্যূত, সর্বভাবন দৃষ্টি আনিতে পারিলেই সত্যকার সঙ্কটত্রাণ। স্বল্প অনাত্ম পরিচয়ে ও কৃপণকুণ্ঠিত প্রয়োগে যেটি 'বিষ', যেটি 'ভয়', যেটি 'বন্ধন', অসীম অকুণ্ঠ তাদাত্ম্য অনুভবে তাহাই অমৃত অভয়, মুক্তি! এইবার উপরের

কারিকাটিতে ধ্যান লাগাও। ব্রহ্মলিঙ্গাং পঞ্চপাৎ—অর্থাৎ, সর্বথা লিঙ্গারহিত যে ব্রহ্মবস্তু, সেটি নিজেই 'লিঙ্গা' হইয়াছে এবং সে লিঙ্গাও আবার 'পঞ্চপাদ' হইয়াছে। 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ'—এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা যে ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'আকাশ' (= 'আ', সমন্তাৎ, 'কাশতে') নিরূপিত হইয়াছে, সেটি তো 'পরোবরীয়ানের' কাষ্ঠা ও গতিরূপে সাক্ষাৎ অলিঙ্গা ব্রহ্মই। তবে সেটি 'আকাশ' রূপেই (সমন্তাৎ ব্যাপ্তি, বিশ্বাবীরূপেই) যেন প্রথম লিঙ্গাতা স্বীকার করিল। কিন্তু কে বিচারে বিশ্লেষণে নিরূপণ করিবে এই অলিঙ্গের লিঙ্গাতাটি কিরূপ (কীদৃশী)? তার পর, সেই আদিম লিঙ্গাকাশে যে আদিম স্পন্দ বা গতিরূপ লিঙ্গতা, সেটিকে অব্যক্ত বা প্রধান আখ্যা দিতে পার। এটি নিত্যপরিণামী (সদৃশভাবেই হৌক আর বিসদৃশভাবেই হৌক)। এই অব্যক্তনামা দ্বিতীয় লিঙ্গাটিকে বায়বলিঙ্গাও বলিতে পার। তারপর, তৈজস বা আগ্নেয় লিঙ্গা। 'জিগমিষতি গবাং রেতসা চাত্মগৌরীং'। 'গো' শব্দে এ স্থলে বাক্। বাক্সমূহের যাহা রেতঃ (ওজঃ বা সার), সেটি হইল স্বয়ং নাদ। ইহা নিখিল বাকে (এবং তাদের অর্থ ও প্রত্যয়েও) রেতঃ বা বিন্দুশক্তিরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 'আত্মগৌরী'—আপন বীজাধানের যোনি যে বাক, তাতে। 'গৌরী' এক রাহস্যিক শব্দসঙ্কেত। গৌঃ+ঈ=গৌরী। 'গো' শব্দে (গীঃ) স্ত্রী, কিনা, বীজাধানযোনি এই ব্যঞ্জনা বুঝিতে হইবে। 'ঈ' কারের বিশেষ 'আকৃতি'ও চিন্তনীয়। শিবলিঙ্গে 'গৌরীপট্ট' তত্ত্ব বুঝিতে যত্ন কর। ধর, প্রণব। অ, উ, ম এই তিন মাত্রায় স্বয়ং নাদ বিন্দুরূপে (অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রারূপ) অনুগ্রহ না করিলে 'ক লা', কিনা কলনের পূর্ণতাটি ঘটে না। অ, উ, ম রূপে কলা=অংশকলা। পাঁচটিকে লইয়া পূর্ণকলা। তারপর, কলাতীত। শেষ দুটি লিঙ্গা—সলিল, অন্তঃ বা লীন প্রাণ লিঙ্গা এবং ক্ষ্মা অথবা পার্থিব (অন্ন-অন্নাদ) লিঙ্গা। 'লিঙ্গা' এই নামটি বিশ্লেষণ করতঃ এ দুয়ের সন্ধান হইতেছে। 'ল'=ক্ষ্মাবীজও বটে, আবার 'গন্তা' (ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিও) বটে। 'ল' ও 'গ' এর সংযোজক সহগ কি? 'ইং' কার। এটি বিশেষভাবে প্রাণনের আকৃতি। সুতরাং এক মুখ্য প্রাণেরি এই দ্বিবিধ লিঙ্গাত্ব। একদিকে লক্ষ্য (বিষয়, অন্ন) ও তাদের লয় রূপ, অন্যদিকে গন্তা ও গতিরূপ। এ তত্ত্বগুলি পরে আরও বিশদ হইতে পারে।

(৬)

কষায়, আময় ও আশয় (যোনিলিঙ্গ)—এই তিন স্থলে ছন্দের ক্রম দেখাইয়া, এইবার আচারে প্রয়োগটি প্রদর্শিত হইতেছে. প্রথম—পরিণয়।—

'দক্ষিণ' আচার

মিথুনপরিণয়ী যো দক্ষিণাচারমেতি
স মিথুনমনুগচ্ছন্ বৈপরীত্যেন বামঃ।
স ভবতি যদি কৌলো দ্বন্দ্বমন্বিত্য সম্যগ্
বদ মিথুনমতীত্যা দ্বৈতশান্তঃ কিমাখ্যঃ ॥২১
স শুভপরিণয়ী যঃ সুষ্ঠু যুঙ্ক্তে বিযুক্তে
কৃতিরতিমতিবৃত্তে দক্ষিণো জাপকঃ সঃ।
অরিরপি যদি মিত্রং কৌশলেনাস্য বামঃ
স যদি বদ কিমাখ্যঃ কৌশলণ্ণোৎতিতীর্ষুঃ ॥২২

ধর, দুয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইতেছে। তথাপি বিরোধটি একান্ত নয়; সে স্থলে যদি তাদের বিরোধের মধ্যেও কোনও আংশিক মিলের সূত্র এবং ছন্দঃ আবিষ্কার করিয়া তাদের পরিণয় এবং মিথুনীভাবটি ঘটান যায়, তবে অভীষ্টসিদ্ধির একটা পথ মিলিয়া যায়। এইভাবে বিরোধের আংশিক পরিহার পূর্বক দুটিকে এক লক্ষ্যাভিমুখী এবং সহক্রিয় করার পদ্ধতিকে দক্ষিণাচার বলা হউক ('Rightist Way')। এটি সাধারণ লক্ষণ—কেবল তান্ত্রিক সাধন বিশেষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। ধর, দুটি শক্তি বিরোধী এবং এরা পরস্পরের বিপরীত দিক হইতে ক্রিয়া করিতেছে। এস্থলে উক্ত পরিণয়টি ঘটান দুর্ঘট। একটিকে অপরটির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অভিভব করা ছাড়া উপায় দেখা যায় না। কিন্তু ধর তারা পরস্পরের সাথে একটা 'কৌণিক সম্বন্ধ' রাখিয়া ক্রিয়া করিতেছে,—যথা অপ্রসর এক নদী বক্ষে নৌকা চালাইতে মাস্তুলে গুণ বাঁধিয়া দুই পারেই দুইজন টানিয়া যাইতেছে। এ স্থলে শক্তিদ্বয়ের 'পরিণয়' সম্ভব হয় এবং নৌকাটিও মাঝামাঝি এক পথ ধরিয়া চলিতে পারে। ধর,

আবার, জপের সময় জপাক্ষরে মন দিবে কি ইষ্টমূর্তি ধ্যানে—এবম্বিধ বৈকল্পিকী বৃত্তি হইতেছে—ফলে মনঃসংযোগ না হইয়া oscillation (চঞ্চলতা) ঘটিতেছে। কি করিবে? কোনটাকেই একেবারে 'বাদ' দিতে চাহিতেছ না, অথবা পারিতেছ না। এমত স্থলে 'পরিণয়' ঘটাইতে হইবে। জপকর্মের প্রারম্ভে যেমন 'ন্যাস' দ্বারা জাপক আপন যন্ত্রটাই ইষ্টমন্ত্রময় ভাবনা করেন, তেমনি জপকালেও ইষ্টমূর্তিকেও ইষ্টমন্ত্রময়ী ভাবনা করুন না কেন! অবশ্য বৈখরী জপে এটি ভাবনাই হয়, 'ভাবন' হয় না, অর্থাৎ নাম-নামীর অভেদটি একান্তভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় না। তথাপি ভাবনাই সই! এখানে ভাবনার উপক্রম-অনুক্রমটি মাত্র দেখান হইল। ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা এটি উরুক্রম হইতে হইতে পরিপূর্ণ ভাবন রূপটি পরিগ্রহ করে। ইহা আমরা ক্রমশঃ দেখিব। শুধু কি ঐ একটাই 'দোলা'! জপকে শ্বাসকর্মের সঙ্গে মিলাইব কি প্রকারে, জপবীজের অগ্নিমাত্রা ও সোমমাত্রা দুটিকেই 'তুষ্ট' রাখিয়া চলিব কি প্রকারে— ইত্যাকার অশেষ দোলায় দুলিতে হয় যে! ভিতরে সংস্কার ভূমি (Potential Field) উত্থিত দোলার তো অন্ত নাই! এজন্য আবশ্যক পরিণয় সংঘটন—যেমন ধারা বহুলাংশে বিভিন্ন ও বিরোধী পুংস্ত্রী প্রকৃতির। এসকল স্থলেই যাদের পারস্পরিক সঙ্ঘাত (co-incidence) হইয়াছে, তাদের 'সঙ্ঘাত কোণ' (angle of incidence) বদলাইয়া তাদিগকে, অর্থাৎ তাদের 'সঙ্ঘাত ফল' (resultant) টাকে 'অভীষ্ট' ('to-ward' or as desired) করিয়া লইতে হয়। 'কোণ'=বিরোধাভাবাভাবেও কথঞ্চিৎ সংযোগাদি সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা।

'বাম' শব্দের মুখ্যব্যঞ্জনা। 'তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষগ্ বারয়তে রুজম্'

কিন্তু যদি তাদের পারস্পরিক কোণ এতটাই পরিবর্তিত করিয়া লইতে পার, যাতে তাদের 'মোড়' একেবারেই ঘুরিয়া যায়, ফলে, অরি অথবা প্রতিকূলও মিত্র বা অনুকূল হইয়া পড়ে, ফলে, 'বিষ'ও কার্যতঃ 'অমৃতের' ন্যায় কাজ করিতে লাগে, তবে সেই 'বৈপরীত্য' করণটিকে 'বাম' আখ্যা দিবে। যথা, কুইনিন্ জরঘ্ন বটে, কিন্তু তার অপক্রিয়াও প্রচুর। অন্য অন্য ভেষজ সহযোগে তার অপক্রিয়াগুলি যথাসম্ভব ঠেকাইয়া সেটিকে জ্বরে ব্যবহার করিলে। এটি পরিণয়—'দক্ষিণাচার'। কিন্তু ষ্ট্রিক্‌নিন

অথবা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ অল্পমাত্রাতেও তীব্র বিষ। কিন্তু মাত্রার অণুকরণাদি (যেমন হোমিওপ্যাথিতে) করিয়া তাকে সাক্ষাৎ সঞ্জীবনী সুধা করিয়া লইলে। মন্ত্র-তন্ত্রাদি দ্বারা একান্ত প্রতিকূল (যেমন কামক্রোধাদি সংস্কার) কে অনুকূল করিয়া লইবার কৌশলটি আয়ত্ত করা সহজে সকলের পক্ষে হয় না।—এজন্য, এটি (অর্থাৎ 'বামাচার'টি) সর্বক্ষেত্রেই বীরের সাধন। প্রবল প্রতিপক্ষ ভাবনাদি দ্বারা বিপক্ষটিরও সপক্ষীকরণ। দৃষ্টান্ত সকল ক্ষেত্রেই মিলিবে। বাহ্যব্যবহার ক্ষেত্রে রসায়ন বিজ্ঞান হামেশা এই 'অঘটনঘটনে' ব্যাপৃত আছে দেখিতেছি। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান Synthetic Poison এবং Anti-biotic দের কথা চিন্তা কর। এ সকলি 'বামাচার'। 'Leftist Way' বলা উচিত হইবে কি? অথবা Reversionist বলিবে? সমাজ, অর্থনীতি, ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ 'আচার' প্রযুক্ত হইয়াছে—দক্ষিণাচারীরা 'অনাচার' বলিয়া চীৎকার করিলেও হইয়াছে।

(৭)

পরিণয়ী ও অন্বয়ীর সম্বন্ধ—'ভুবনাকৃতি' ও 'তল' দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা

পরিণয়ী আর অন্বয়ী এ দুয়ের ভেদ প্রকারান্তরে চিন্তা করিও। সৃষ্টির সকল সামগ্রীতেই একটা 'ভুবনাকৃতি' (Cosmic Pattern) নিহিত আছে। অণু ও বিরাট, ভাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে তাই আকৃতি-প্রকৃতি-গত মিল থাকাই উচিত। এ তত্ত্ব জপসূত্রমে বিশদ করার চেষ্টা হইয়াছে। এখন দেখ—ভুবনের সঙ্গে 'চতুর্দ্দশ' এই সংখ্যাটি আর্য বিজ্ঞানে সংযুক্ত হইয়াছে। এ সংখ্যার একটা দ্যোতনা এই যে—যে কোনও সামগ্রী (বাহ্য অথবা আন্তর) লও না কেন, তাতে স্থূল ব্যক্তভাবে না হৌক, সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে চোদ্দটি 'স্তর' (planes) বিন্যস্ত রহিয়াছে। সাধারণ-ভাবে তাদের 'তল' এই আখ্যা দিতে পার, এবং জপসূত্রমে তাই দেওয়া হইয়াছে। এই তলগুলিতে আবার ঊর্দ্ধ এবং অধঃ এই পার্থক্যটি কোনও সূত্রে বা নিয়মে (principle অথবা reference) যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তবে 'উপরে' সাতটি এবং 'নীচে' সাতটি তল আমরা পাই। উপরের তলগুলিকে 'তল' না বলিয়া 'লোক' বলিতেও পার। তাতে উপর নীচ স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। মোটামুটি ভাবে, উপরের লোকগুলিকে উন্মেষ বিকাশের (un-

folding) ভূমি বলিতে পার, এবং নীচেরগুলিকে সঙ্কোচ মমতার (enfolding) ভূমি। Emergence এবং Submergence শব্দ দুটি এটি বুঝাইতে মন্দ নয়। এখন বিচার করিয়া দেখ, কোনও এক নির্দিষ্ট তল বা ভূমিতে 'ক' আর 'খ' পরস্পর অরি সম্বন্ধ পাতাইয়াছে। যেমন যে সাধক কামবশ্য তার পক্ষে কাম। একই 'তলে' সাধক এবং তার বিষয় অবস্থিত। যথাসম্ভব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া পরিণয়ী ছন্দঃটি আদায় করিতে হয়। নিগ্রহ তো 'নিতরাং গ্রহঃ' হইয়া উঠে না, তাই 'বাঁধ ভাঙিবার' আশঙ্কাটিও পদে পদে। তথাপি 'তল', সুতরাং সমগ্র কার্যকোণটি (reactive angle) না বদলাইয়া যাওয়া পর্যন্ত এতেই, বৈধমার্গেই, নিষ্ঠাসহকারে যত্নশীল থাকিতে হয়। যে গুণের দ্বারা এই পরিণয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাকে 'দক্ষতা' বল। যে ব্যক্তি দক্ষ, তাকে দক্ষিণ এবং তার আচারটিকে দক্ষিণাচার বলিতে পার। অবশ্য, এ সংজ্ঞাগুলি বর্তমান স্থলে মোটামুটিভাবেই দেওয়া হইতেছে। জপসূত্রমে 'দক্ষ', 'দক্ষিণ', 'বাম' প্রভৃতির লক্ষণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তল হইতে তলান্তরে গতিতে রূপান্তরীকরণ। ব্যাহৃতিত্রয়ের স্ব স্ব 'ব্যাহরণ'। বিশ্বের ছন্দঃ ও বিশ্বনাথের ছন্দঃ

কোন এক নির্দিষ্ট 'তলে' যেটি প্রতিকূল অথবা অরি ('বিষ'), তলান্তরে (with respect to another frame of reference), সেটি তা নাও হইতে পারে। এমন কি, সেটি অনুকূল, মিত্র ('অমৃত') ও হইতে পারে। সব কিছুর মধ্যে সব কিছু (অন্ততঃ পক্ষে তাদের আকৃতি এবং সম্ভাবনা) সম্পুটিত রহিয়াছে—এটি মনে করার যুক্তি যদি থাকে তো, 'বিষ' এবং 'অমৃত'ও সব কিছুতে সম্পুটিত আছে। দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্রমন্থনের মূলতত্ত্বটি এইখানে। সকল বর্ণের সর্বাভিব্যঞ্জিকা শক্তি স্বীকৃত না হইয়াছে এমন নয়। কোন্ স্থলে কোন বর্ণ ঠিক কোন্ আকৃতি প্রভৃতি অভিব্যক্ত করিবে, সেটি মুখ্যতঃ নির্ভর করে আশয়+আগ্রহ+আহৃতি এই ত্রিপুটীর বিশেষ আকৃতির উপর। অর্থাৎ স্বঃ+ভুবঃ+ভূঃ এই ব্যাহৃতি ত্রয়ের উপর। 'সেই' রূপে ওখানে সমস্ত কিছুই শয়ান রহিয়াছে (আশেরতে); কিন্তু 'এই'রূপে তো সব কিছুর আহরণটি ঘটিতেছে না। অর্থাৎ, 'ভূঃ' অথবা 'এই যে' রূপে এক বিশেষ আকার-প্রকারেই সেটি আহৃত হইতেছে। কেন? মাঝখানে 'একটা কিছু' (যেটাকে 'অই'ও বলা যায়

না, 'এই'ও বলা যায় না) উভয়ের মধ্যে এক 'সবিশেষ সংস্থাসংঘটক' (medium of effectual relevancy) রূপে কর্মে বাহাল রহিয়াছে। সেটিকে আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নাম দিতে পার। ইহা সব কিছুতে অনুপ্রবিষ্ট, সব কিছুর সংস্থাসংস্থাপক 'ভুবঃ'। যেমন ধর, গণিতে General Equation of the Second Degree-ইহার অন্তর্গত terms গুলির এক এক বিশিষ্ট সম্পর্ক ধরিয়া আমরা বলিতে পারি—ইহা কি বুঝাইবে—Circle, না Ellipse, না Parabola, Hyperbola ইত্যাদি। আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষাটি দেখিতে হইবে। সাধকের আগ্রহের উপর তাই না এতটা জোর দিতে হয়। অণু কি বিরাট সবাকার ভাণ্ডারেই তো দরাজ ব্যবস্থা! তুমি তার কার্যতঃ আদায় করিবে কতটা—তোমার সম্বন্ধে তার effectual availability কতটা—ইহাই না প্রশ্ন! সাগরে তো জলের মাপাজোকা নেই; কিন্তু তার কাজে লাগাতে পার কতটা? ঘটি ভরেই সে জল নিতে পার বটে, কিন্তু পাবে এতটুকু, আর তাও নোন্তা! শাওন মেঘের বারিধারায় পেতে চাও? পাবে প্রচুর, স্নিগ্ধ, স্বাদু। যদি আশ না মেটে তাতেও নদী হয়ে ছুটে যাও—ঋজুকুটিল যেমনটি জোটে বর্ত্ম ধরে—সেই নদীনাথে গিয়ে মিলতে, মিশতে, এক হয়ে যেতে! ও সাগরের ঘটিভরা জলই হয়তো একটু নোন্তা লাগতে পারে, কিন্তু স্বয়ং সে সাগর তো 'লবণাম্বুরাশি' নয়, সুধাব্ধি—অগাধ, অক্ষোভ, অপরিসীম!

(৮)

বাহ্যতিহোমের মূল তাৎপর্য ব্যহৃতির অত্যদ্ভুত 'বাছাই'

সুতরাং অন্বয়ী ছন্দের (এবং উদার অর্থে, বামাচারের) লক্ষ্য হইবে, যেটি আপাততঃ প্রতিকূলধর্মী এবং বিষক্রিয়, সেটিকে কৌশলবলে বিপরীত করা—উলটাইয়া পালটাইয়া লওয়া, যার ফলে তার নিগূঢ়, প্রসুপ্ত অনুকূল শক্তিটি উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সেটিকে 'অমৃতায়মান' করিতে পারে। কোনও এক স্তরে 'ক' এর সাথে 'খ' এর বিরোধ আর সংঘর্ষ দেখা যাইতেছে এই নিমিত্ত যে তত্তদ্দেশকাল-ধর্মাদির যে সম্বন্ধ ও সংস্থা, সেটি 'অদৃষ্ট' দ্বারা এক নির্দিষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে। "এই" রূপে নিয়ামক ব্যাহৃতিটিকে বল 'ভূঃ'। 'খ' উক্ত স্তরে, অর্থাৎ তত্তৎ-দেশকাল-ধর্মাদির সংস্থায় ও সম্বন্ধে, 'ক' সম্পর্কে 'বিষ'। এটি 'ক' এবং 'খ' এর উক্ত স্তরে পারস্পরিক অদৃষ্ট-নিমিত্ত হইয়া থাকে। উক্ত স্তরে রহিয়া তাদের 'পরিণয়' ঘটান

সম্ভবপর হইতে পারে সন্দেহ নাই, এবং তাহাই সচরাচর সাধ্য। কিন্তু 'অন্বয়'? 'খ' তার প্রতিকূলতা ভুলিয়া অনুগত মিত্র হইবে কিরূপে? অহিনকুল তাদের স্বভাববৈর ভুলিবে কি করিয়া? উলট দেও—কৌশলে 'খ' কে তার 'পিঠ' পালটাইয়া দাও। কোথায় তার নিগূঢ় তলে তোমার মিত্রটি অমৃতভাণ্ড হস্তে করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাকে ডাকিয়া অভিমুখীন, সম্মুখীন করিয়া লও। সমর্থ-ব্যাহৃতি মন্ত্রে আবাহন কর। ইহাই না ব্যাহৃতি হোমের তাৎপর্য! কর্মটি সবিশেষকুশলী ও বিপশ্চিৎ হইয়া করিতে হয়। অবশ্য, ব্যাহৃতি স্বয়ংই মহাকুশলিনী ও পরম বিপশ্চিৎ; তাই না শ্রীশ্রীধূমাবতীর হস্তেই প্রকৃতির সকল স্তরেই বাছাই কর্মটি ন্যস্ত! তবু তোমারও সহযোগিতার অপেক্ষা কিছু আছে বৈকি! যেমন, দশলাখ ডাইলিউশনের এক ফোঁটা ওষুধ দিয়া হোমিওপ্যাথ তোমার ব্যাধিটি দুর করিবেন। তাঁর আপন অভিজ্ঞতার বাছাইটি চাই বৈকি। কিন্তু ঐ সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ভেষজের যেটি নিগূঢ়-নিপুণ বাছাই কর্ম (স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে এবং সম্ভবতঃ পারিপার্শ্বিকেও) তার হিসাব রাখিবে কে? সেটি নিশ্চয়ই কোনও মহাকুশলী পরম বিপশ্চিতের বাছাই। হয়তো তাতে সংখ্যাবিজ্ঞানের কত না জটিলতম সমীকরণের সমাধান হইয়া গিয়াছে। তুমি না হয় 'আলো-আঁধারে' কোন গতিকে তোমার তীরটি ছুঁড়িয়া দিলে; কিন্তু তীর গিয়া বিন্ধ করিল কি এবং কি ভাবে? বিশ্বের কোন 'বাস্তব' বস্তুকে পূরাপূরি চিনিবার, কোন 'বাস্তব' ঘটনাকে সমগ্রভাবে বুঝিবার মতো সামর্থ্য আমাদের চলতি জ্ঞানে কেন, অতি-অগ্রসর বিজ্ঞানেও নাই। থাকিলে তো ব্রহ্মজ্ঞ, সর্বজ্ঞই হইতাম! ঐ ধূলিরেণুটি তো নগণ্য নয়; উহার হিসাব লইতেছে যে 'মাপকাঠি' সেইটাই নগণ্য! সুতরাং, কোন মন্ত্র-তন্ত্র-যন্ত্রটির নির্বাচনে এবং প্রয়োগে তুমি স্বয়ং যতই বিদগ্ধ কুশলী নিজেকে ভাব না কেন, সে মন্ত্র-তন্ত্র-যন্ত্র যে কর্মটি করে এবং যে ভাবে করে, সেটি পরমাদ্ভুত! যেমন দেখিলে হোমিওপ্যাথের ঐ একটা কণা ওষুধে! তুমি চলিতে চাহিতেছ এবং বুঝিতে চাহিতেছ আপন বুদ্ধিতে, কিন্তু বিশ্বের ঐ রেণুটিও যে চলিতেছে বিশ্বনাথের বুদ্ধিতে! তুমি ছন্দের পরিণয়, বড় জোর অন্বয়টি করিতে পারিয়াই ভাবিলে অনেক কিছু পারিলাম, কিন্তু মহাসমন্বয়ী ছন্দঃ ব্যতীত বিশ্বের যে ক্বচিৎ পাটি বাড়াইবার উপায় নাই! আর, যিনি স্বয়ং বিশ্বনাথ, তিনি যে (ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ) ছন্দের রূপ, সেটি তো পরম সমন্বয়ী। অর্থাৎ, বিশ্বকে সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়াও সেটি 'অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্'! কোটি কোটি অতীত অনাগত বর্তমান

বিশ্ব যে পরমবিস্ময়টিকে 'একাংশে', হয়তো বা একটি 'কলায়', উদাহৃত করিতেছে! সেটি কিন্তু 'পরম' হইয়াও 'সমন্বয়ী'। স্বয়ং মাত্র কেবল ব্যতিরেকী হইয়া সৃষ্টিতে এই অপূর্ব মহাসমন্বয়টি ঘটান কি রূপে? সুতরাং কেবলমাত্র শুদ্ধ, সৎ, চিৎ আনন্দরূপেই যে তিনি এই সৃষ্টিতে 'অন্বিত' এমন নয়, পরমসমন্বয়ী, মহাসমন্বয়ী (ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ) ছন্দোরূপেও তিনি বিশ্বে ওতপ্রোত।

প্রণবাদির ছন্দঃ। সে ছন্দের অমানযোগ্য 'মাত্রা'

প্রণবাদি বাক্, মহানাম এবং ভূরাদি মহাব্যাহৃতি ঐ পরম মহাসমন্বয়ী ছন্দেরি নিরতিশয় সমর্থরূপ। কাজেই, ওঁদের আকৃতি, শক্তি এবং কার্যকারিতার হিসাব লইবেই বা কে, ইয়ত্তা করিবেই বা কে? নামের ব্রহ্মাণ্ড পাটন শক্তি শ্রবণ করিয়া তাই আমরা বিস্মিত হই মাত্র! তুমি যথাসাধ্য কুশলী বিপশ্চিৎ (অর্থাৎ বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎসহায়) হইয়া 'ওঁ ভূঃ' এই মন্ত্রে হবনটি কর। মন্ত্র স্বয়ং যে শক্তিতে, যেটি সম্পন্ন করিবেন, সেটি তোমার যত বড় মাপকাঠিই হৌক না কেন তার দ্বারা মানযোগ্য নয় জানিও। তোমার নদীনালা গভীরতা মাপা বাঁশের 'চারা'টি লইয়া সাগরের অতল তলের তল্লাস করিবে না কি?

স্বচ্ছন্দঃ ও বিশ্বচ্ছন্দঃ

তবে উপায়? নিজেকেই তলাইয়া দেখিতে আরম্ভ কর। সেইখানেই পরিণয়ী থেকে সুরু করিয়া পরমসমন্বয়ী পর্যন্ত সকল ছন্দেরি 'পরদা' ও 'গ্রাম'গুলো বাঁধা আছে। ঐ মহাযন্ত্রের 'উপর' 'নীচে' সকল পরদায় পরমকুশলী স্পর্শে যে মহাঝঙ্কারটি ধ্বনিত হইবে, দেখিবে বিশ্বভুবনও মূলতঃ সেই মহাঝঙ্কারেই ঝঙ্কার দিয়া যাইতেছে। সেইটাকে উপোদ্‌ঘাতে 'মূলস্পন্দ' বলা হইয়াছে। এর সাথে বৈরূপ্য নিমিত্তই যত না ব্যাজ; এবং যেটি তার স্বরস, নিজগুণ, তা থেকে বৈগুণ্য নিমিত্তই যত না বিঘ্ন! অনুরূপাদি ক্রমে বৈরূপ্য কাটাইয়া সারূপ্য-ঐকরূপ্যে স্থিতিই সর্ববিধ সাধনের উদ্দেশ্য। এর ফলে ভিতর বাহির, তুমি ও বিশ্ব, আমলে ও মূলে, মৌলিক সত্তায় ও ছন্দে, মিলিয়া অভিন্ন হইয়া যাইবে। ছন্দের এবম্বিধ অন্তর্বহিঃ সর্বত্র মহাপরমসমন্বয়ী 'আকৃতি' প্রদর্শনের নিমিত্ত 'স্বে মহিম্নি' বিরাজমান ভূরাদি ব্যাহৃতি-সপ্তক।

'বাম' এর আসল নাম ('অউম্') এবং আসল কাম

আচ্ছা, পরিণয়ীর পর অন্বয়ী। সেখানে তো বিরূপকেও অনুরূপ করার কৌশলটি মেলে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি যে—কোন বিরূপ একান্তই সমগ্রভাবে বিরূপ নয়; কোন্ 'তলে' কি ভাবে, কতখানি, সেটি বিরূপ—এইটি কার্যতঃ বিচার করিয়া লইতে হয় পরিণয়িস্থলে। কোন্ 'তলে', ঠিক কোন্ দেশকাল-ধর্মাদি সম্বন্ধে ও সংস্থায় (ensemble-এ) সেটি যে আবার অনুরূপও হইতে পারে, তার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিলে—অন্বয়ী। এটিকে 'বাম' নাম দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু বাম = Left নয়, Reverse ইহা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের কারবারী 'রেটিনা'তে সমস্ত কিছুর ছাপ উল্টাইয়া পড়িতেছে আমরা সেই উল্টাকেই 'সোজা' বলিয়া চালাইতেছি। কিন্তু উল্টাকে উল্টাইয়া লইলে তবে তো সোজা! 'বাম' এই কর্মটি করে; তাই বামের মুখ্য মানে সুন্দর, শোভন। 'বাম' এবং 'অউম' ধ্বনিগত এই প্যাটার্ন দুটিও পরীক্ষা করিও। কিন্তু বাম না হয় হইল, কিন্তু কাম কি মিটিল, ধাম কি মিলিল? তা তো হয় না দেখি। উল্টা উল্টাইয়া সোজা হইল, কিন্তু সেও আবার উল্টাইতে চায় যে! সোজা তো 'সহজ' বস্তু নন দেখি। বিরূপ তার পিঠ অথবা মোড় ফিরাইয়া অনুরূপ, অনুগত হইল, কিন্তু সাক্ষাৎ 'বিরূপাক্ষ' হইল কি? পিঠ ফিরাইয়াও তার যেটি 'কৌণিক সংস্কার' ('angular velocity, momentum), সেটি ত ছাড়ে নাই। কাজেই আবারও 'বেঁকিয়া বসিল'! হামেশাই তো এই প্রকার—'বিধি যদি হবি বাম' এবং 'উল্টা বুঝলি রাম' এর সম্মুখীন হইতে হয় সাধককে।

ঐ আসল 'কাম'টি করাইবার নিমিত্ত অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুবটিকে কোন গতিকে মেলান চাই। জপের দৃষ্টান্তে—সমীকরণ। শ্বাস ও জপ

তবে উপায়? উপায়—কর্মটিকে শুধু এক কৌশলে (Formula-তে) ফেলিতে পারিলেই হইল না। তার একটা নির্ভরযোগ্য 'লেখ' (Curve, Picture) মেলা চাই। অর্থাৎ, Equation. যেটা ধ্রুব (Constant, C) তার সঙ্গে অধ্রুব, পরিণামীগুলোর একটা নিয়ামক সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধটি ঠিক ভাবে জানিলে ঐ যে 'কৌণিক সংস্কার' এর কথা আগে বলিতেছিলাম, সেটা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্তে আসিল। সমন্বয়ী ছন্দঃ এই অত্যাবশ্যক

সমীকরণ এবং তার 'লেখ'টি ছকিয়া দেয়। ধর জপ করিতেছ। কিন্তু তোমার শ্বাস প্রশ্বাসটি তার 'তাল' রাখিয়া চলিতেছে না; জপ কালেই সঙ্কল্প পূর্বক অথবা তৎপূর্বে প্রাণায়ামাদি করিয়া তাদের প্রথমে পরিণয়, পরে অন্বয়টিও সাধিলে। কিন্তু শ্বাস ক্রিয়ার নিয়ামক হেতু তোমার সঙ্কল্প মাত্র নয়, শুধু তোমার প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া-বিশেষও নয়; তার হেতুপুঞ্জ সচরাচর, স্বভাবতঃ অন্যত্র। সুতরাং তুমি কৌশলে তাকে ফরমুলায় পুরিলেও, তার নিজস্ব 'কৌণিক সংস্কারটি' যাবে কোথায়? সুতরাং আরও এক পদ আগাইতে হইবে—সমীকরণ কর্মটি সাধিতে হইবে। গীতা এটিকে লক্ষ্য করিয়াই 'প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা' বলিয়াছেন। শ্বাস ক্রিয়ার নিয়ামকগুলি শারীর এবং মানস এই দুই প্রকারেরই—Psycho-somatic, এ দুটিও পরস্পরের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত আহারাদি পঞ্চশুদ্ধি ('পঞ্চগব্য'), আসন—প্রাণায়াম—ন্যাস, এবং সর্বোপরি, নির্দোষ সমতা বিধায়িকা বীজাক্ষরঝরীমুখা শ্রীগুরুশক্তিধারায় সর্বতোভাবে অবগাহন—মুখ্যতঃ এই কয় উপায় দ্বারাই শ্বাস এবং জপের অভীষ্ট সমতাটি রক্ষা করিতে হইবে। জপের একট নিজস্ব ছন্দঃ আছে, অথবা থাকা উচিত। এমন কি, প্রণবাদি একাক্ষরী মন্ত্রেরও। সংহত বর্ণসমূহের, অগ্নীষোমীয় মাত্রা ইত্যাদি অনেক কিছুর 'সৌষ্ঠব' রক্ষিত হয় সেই ছন্দঃটি আশ্রয় করিয়া। বাক্, প্রাণ এবং মন এ তিনেরও প্রযত্ন-সৌষ্ঠব তাতে আবশ্যক। পক্ষান্তরে শ্বাসক্রিয়ায় সচরাচর বিশেষ কোন সৌষ্ঠব থাকে না। যদিও বা কখন কখন থাকে (যথা গাঢ় নিদ্রাকালে), সেটি হয়তো জপের ছন্দের সঙ্গে ঠিক সমঞ্জস (compatible) নয়। সুতরাং আমায় সাধন করিয়া মিলাইতে হয় এমন একটা সমীকরণ সূত্র যার ভিতর শ্বাস ও জপ উভয়ই স্ব স্ব ছন্দঃটি বর্জন না করিয়াই পরস্পরের সঙ্গে অন্বিত হইয়াছে। শুধুই তাই নয়, সেই বৃহত্তর ছন্দে উভয়েরি 'সমৃদ্ধি' (অধিকতর সৌষ্ঠব এবং পুষ্টি) হইতেছে। শ্বাসকে সহায় পাইলে বৈখরী জপ সহজে মধ্যমার সেতুটি ধরবার সুযোগ পায়; আবার, জপকে সহায় পাইলে শ্বাস যথার্থরূপে 'অজপা' আকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৯)

সমন্বয়ীরও পরে মহাসমন্বয়ী। 'বৈরাজ' রূপ ও ছন্দের অনুবর্তন

জপ লইয়া সমন্বয়ীর একটুখানি নমুনা দেখাইলাম মাত্র। এটি কিন্তু সার্বভৌম, ইহা মনে রাখিতে হইবে। সাধারণ ব্যবহারে, সাধনায়, বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে—সর্বত্র এটি

অনুসরণীয়। কিন্তু উহাতেই নিস্তার নাই—সমন্বয়ীটিকে 'মহা' এবং 'পরম' এই দুইভাবে না পাওয়া পর্যন্ত। কোন ব্যষ্টি, ব্যস্ত, ভগ্ন, ব্যূঢ়, আপেক্ষিক সমাধানেই ধ্রুব নির্ব্যূঢ় সমাধানটি হয় না। একটা ছোট বীজ। তার বিকাশের নিজস্ব এক ছন্দঃ আছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার একটা 'অন্বয়' হবার অপেক্ষাটি থাকেই। বিরাট বা মহান একটা বিপুল ঐক্যতান (Divine Orchestra বা Cosmic Symphony) এর সঙ্গে তুলনীয়। তোমার আপন যন্ত্রের সুর ও ছন্দঃ তার সাথে অন্বয়ী হইবে, ব্যতিরেকী হইবে না। হইলে চলিবে না। কেন না, ক্রিয়া-কারক-ফল, অথবা ক্রিয়া-আকৃতি-শক্তি—সব দিক দিয়াই তুমি বিরাটেরই অংশ, বিরাটের অঙ্গীভূত। বিরাট দেহের একটা অবয়ব। অবয়বেরও নিজস্ব একটা ছন্দঃ (যেমন হৃৎপিণ্ড বা যকৃতের) থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু অবয়বীর ছন্দে সেটি অন্বিত, গ্রথিত। বিরাট স্বরূপতঃ প্রাণহীন, চেতনাহীন 'জড়' নয়; তুমি নিজে যেটি তারই বৈরাজ রূপ—অর্থাৎ, বিরাট প্রাণ এবং চেতনার সংস্থা। শ্রুতি তাই না বিশ্ব-বিরাট, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ-ঈশ্বর এগুলি যুগ্ম করিয়া, অবিনাভাব সম্বন্ধেই দেখিয়াছেন। অবশ্য, তোমার নিজের বেলাতে যেমন, বিরাটের বেলাতেও তেমনি, স্বভাব ছন্দঃটি অনেক কিছু 'ব্যাজের' পরদায় ঢাকা পড়িয়াছে—শ্রুতির ভাষায় 'অপিহিত' হইয়াছে। যেটি ঋজু-সুষম সেটি বক্র-বিষমও হইয়াছে। তোমারও যেমন, বিরাটেরও তেমনি 'মুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত ঈষিকা' বিচয়ন করার অপেক্ষা রহিয়াছে। আকৃতি, শক্তি, ক্রিয়া এবং এ তিনের ছন্দঃ—বিরাটেই বা যথার্থতঃ কি—এ জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধানের অপেক্ষা রহিয়াছে। অর্থাৎ, সেই 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এর খোঁজ। 'ঋতং বৃহৎ' এবং 'সত্যং মহৎ'—এই যুগ্ম অথচ অভিন্ন লক্ষ্যের পানেই না শ্রুতির অকম্প-অঙ্গুলি নির্দেশ। 'Live according to Nature'—Stoic-দের এ সূত্র ঠিকই, তবে 'Nature' কে মুখোসে, মেক-আপে চিনিলে চলিবে না, স্বরূপে চিনিতে হইবে।

বৈরাজ ছন্দের স্বভাব-মৈত্র (intrinsic alliance)

বিরাটের সুহৃদ্রূপ

বিরাট তো তোমার বৈরী নয়, আসলে (অর্থাৎ ঠিকভাবে চিনিলে এবং সম্পর্কটি পাতাইয়া লইলে) তোমার 'সুহৃৎ' তোমার 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' (যা চক্রবৃদ্ধি হারেই সুদ

দেয়), তোমার কারবারে 'জামিন', তোমার জীবনের 'বীমা'—এটি তত্ত্বতঃ এবং কার্যতঃ বুঝিয়া লইতে হইবে। যত বড়ই জলাশয় হৌক না কেন, সাগর তার সুহৃৎ না হইলে, সাগর তার সরবরাহ (মেঘের বর্ষণাদিরূপে) বন্ধ করিলে, তার শুকাইয়া মরিতে কতক্ষণ! নিজের পাঞ্চভৌতিক এই দেহটাকে যেমন বিরাট আকাশ, বাতাস ইত্যাদির 'সামিল' করিয়াই ভাবিতে হয়, নিজের প্রাণ, চেতনাদিকেও সেইরূপ ভাবনা করা উচিত। বিরাটের বাহিরের কাঠামোতে হয়তো সে সবের সাড়া নেই। কিন্তু ভূস্তরের মতো সে কাঠামোরও 'গভীর গবেষণা' (prospecting, boring, ইত্যাদি) প্রয়োজন আছে। বাহিরের কাঠামোটা আমার জপাদি অধ্যাত্ম-সাধনার সম্বন্ধে উদাসীন বা অরি বোধ হইলেই বা কি? বিরাটের সুহৃদ্রূপ এবং মিত্র ছন্দঃটি আমার পক্ষে যে ভাবেই হৌক মেলান আবশ্যক। কল্পনা বা অধ্যাস মাত্র করিয়া সেটি মিলাইলে চলিবে না। কল্পনা বা অধ্যাস বলিয়া বিরাটকে সরাসরি উড়াইবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না। আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণ অথবা প্রাণ ব্রহ্মই; সুতরাং আমার জপ, জপের মন্ত্র এবং তার ছন্দঃ সমগ্র বিশ্বেরি—এই মহাসমন্বয়ী অনুভূতিতে পৌঁছিয়া তবে না চরিতার্থ বোধটি হইবে! আমার কর্মটি বিশ্বের সম্বন্ধে বাহ্য, রবাহুত, আগন্তুক নয়; তার সম্বন্ধে সেটি অন্তরঙ্গ, আন্তর, আত্মীয়—এইভাবে আমার কর্মটির জন্য একটা cosmic endorsement, assurance, acceptance, আমায় মিলাইতেই হয়। প্রণবাদি মন্ত্র, তাদের ছন্দঃ, দেবতা, বিনিয়োগ—এ সমস্তই বিরাটের মানে (on cosmic scale) যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই ঋষি। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে"। নাম, মন্ত্র, ছন্দঃ সম্বন্ধেও ঐ কথা। বেদে যাঁরা 'মধু বাতা' ইত্যাদি মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁরা তো এইভাবেই করিয়াছিলেন; মধু ছন্দঃটি তাই কারুর নিজস্ব 'ঘরাও' ছন্দঃ হয় নাই। বিশ্বভুবনেরই ওতপ্রোত নিগূঢ় ছন্দঃ ঐটি। বেদেও তাই, পুরাণেও তাই। এ মহাসমন্বয়ী স্বারাজ্য সিদ্ধিকে বেমালুম ডিঙাইয়া একদম 'পরমে' যাবার হাল-বাহালী 'পাকদণ্ডীটি' খুলিল কবে হইতে?

'মহা' ও 'পরমের' সেতু। মহাসমন্বয়ী ছন্দে চেতয়িতা, নির্বাহয়িতা, সংবর্ধয়িতা এবং প্রপূরিয়াতা কি কি তত্ত্ব?

'পাকদণ্ডী' অবশ্য মেলান চাই-ই—অর্থাৎ পরমসমন্বয়ী ছন্দঃ। এটির সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলার নেই। 'মহা' যাইয়া কি ভাবে 'পরমে' মিলাইয়া যায়, তা তো

বিশেষভাবে বলার বস্তুও নয়। যে ছন্দঃটি দ্বারা আপন কুশল ছন্দঃটির সঙ্গে বিরাটের কুশল ছন্দের 'পরস্পরং চেতয়ন্তঃ ভাবয়ন্তঃ বর্দ্ধয়ন্তঃ' সম্পর্কটি পুরাপুরি পাতান' যায়, সেই ছন্দের কথাই বলিলাম। এ ছন্দের চেতয়িত্রী শ্রীগুরুশক্তি, নির্বাহয়িতা বিশ্বেদেবাঃ (অধ্যাত্মদেবাঃও বটে), আর এ ছন্দের পূরয়িতা সাক্ষাৎ ছন্দোরূপী ব্রহ্ম। 'আমাকেই' সর্বারম্ভ থেকে সর্বসমাধা পর্যন্ত সবই করিয়া ফেলিতে হইবে—এ ভাবিয়া চিন্তিত বা হতাশ হইও না। যে 'আমি' গোষ্পদে আরম্ভ করিল, সেই আমিই সাগরে সমাধা করে না। 'আমি'-টাই বদলাইয়া যায়। মহাবাক্যের 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র যেটা 'অহং' সেটা 'অহং'ই নয়; হইলে, মহাবাক্যটি 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' হইত! তোমার প্রয়োজন—শ্রদ্ধাভক্তিনিষ্ঠাসহকারে শ্রীগুরুশক্তিকে, শ্রীগুরুদত্ত নামকে, উপযোগী বিদ্যা (বিধি) এবং উন্মেষিত উপনিষৎ (তত্ত্ব এবং সিদ্ধান্ত দৃষ্টি) কে সমাশ্রয়। তোমার পূর্ণ আগ্রহই এতে চাই। ওতে ঢিল অথবা গোঁজামিল দিলে হবে না। অতঃপর পরিণয়-অন্বয়াদি যে সব ছন্দোরূপ পর পর আবির্ভূত হইবে, সে সমস্তই ছন্দোব্রহ্মের স্বশক্তিতে, স্বমহিমাতেই হইবে। কল্পবীজ-কণিকাটির যত্ন করিতে হয়, কিন্তু তাকে ছন্দঃ শিখাইতে হয় না। কেবল, দেখিও যেন তুমি আপনাকে একটা বিবাদী বিসম্বাদী 'ঝামেলা'র মতো যত্রতত্র সে ছন্দের মহা-নির্বাহণ-পরিপূরণে শেলবৎ প্রবিষ্ট করিতে ব্যস্ত না হও। সমর্পণযোগে অনাকুল-প্রতিষ্ঠ হইতেই যত্ন কর।

(১০)

সকলকুশলমূলং শ্রীগুরুশ্চেতয়েচ্চেন্
নিপুণমপি চ বিশ্বে নির্জরা বাহয়েয়ুঃ।
কথমিহ যদি ছন্দো ব্রহ্মণা পূর্যমাণং
ক্রতুফলমমৃতং তে ভাব-কার্পণ্যদোষঃ॥২৩

ভাবাদির কার্পণ্যদোষ পরিহার কিভাবে করিবে? ক্রতুর পারে যে অক্রতুবীতশোক স্থান, তথায় যাইবে কি প্রকারে?

তুমি ক্রতু (পূজা, জপ, হোম ইত্যাদি) অনুষ্ঠান করিতে চাও। কিন্তু তন্নিমিত্ত যে ভাব আশ্রয় করা আবশ্যক, তাতে এত 'কার্পণ্যদোষ' হইতেছে কেন? তোমার জপ হোমাদিতে তুমি প্রাণ ও চেতনার সাড়া পাও না বলিতেছ, কিন্তু তুমি জান নাকি যে

নিখিল কুশলের যিনি মূল সেই শ্রীগুরুই স্বয়ং তোমার ক্রতুর চেতয়িতা? তুমি তাঁতেই যুক্ত হও, তিনিই 'অচেতন'কেও চেতন করিয়া তুলিবেন। তারপর, সেই শ্রীগুরুই জরামরণরহিত 'বিশ্বেদেবাঃ'রূপে তোমার আরব্ধ কর্মের (ক্রতুর) নির্বাহয়িতা (নিপুণং বাহয়েয়ুঃ)। সুতরাং আরব্ধ ক্রতুটি কিরূপে সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হইবে, সে নিমিত্তও তোমার ভাবনা নেই। তুমি শুধু আগ্রহপূর্বক তাতে এবং তাঁ'তে যুক্ত রও। শেষ, তোমার ক্রতুসমাপনফলরূপ যে অমৃত, তার নিমিত্তই বা তোমার ভাবনা কেন? যিনি স্বয়ং ছন্দোরূপী ব্রহ্ম তিনিই (অর্থাৎ শ্রীগুরুশক্তিই পরমসমন্বয়ী ছন্দোরূপে) তোমার ক্রতুটির সংবর্দ্ধয়িতা এবং প্রপূরয়িতা রহিয়াছেন, সুতরাং তিনিই ক্রতুটিকে ভরণপূরণ করিয়া ক্রতুর পারে যে 'অক্রতু বীতশোক' অমৃত, অভয় স্থান তথায় লইয়া যাইবেন। তুমি তদ্ ভাবপরায়ণ হও, ভাবকৃপণ হইবে কেন?

বিধুনয়তি কপাটাদর্গলং বজ্রসারাদ্
গময়তি গহনাং যদ্ দ্বারমল্লাংশ্চ নিদ্রাম্।
ব্রজসরিত উরূর্ম্মীর্দারয় ল্লীলয়ৈব
মুরসিধৃতমুদেতি ব্রহ্ম ছন্দোগবেশম্ ॥২৪

সেই পরমচ্ছন্দোগবেশ ব্রহ্মগোপালটিকে ভুলিয়া গেলে? যে ছন্দোদুলালের অচিন্ত্য অঘটনঘটন কুহকে, অশ্মনির্মিত যে কংসকারাগার, তার যেটি বজ্রসার কপাট, সেটি মুহূর্তেই নিরর্গল হইয়া যায়; শুধু তাই নয়—কারাদ্বারে যে সমস্ত রক্ষী মহামল্ল নিশিদিন সজাগ পাহারায় আছে, তারাও যে গহন বিমোহন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঢুলিয়া পড়ে; শুধু আবার তাও নয়—ব্রজসরিৎ যে কালিন্দী, সেও 'ভরাভাদরে' তার উত্তাল ঊর্ম্মিরাশি যেন অবহেলে বিদারিত হইয়া যাইতে দেয় পারের পথটি দেখাইবার নিমিত্ত; সেই ছন্দোঘনমূর্তি চিদ্গগন-পূর্ণশশী বসুদেবের বুকে শয়ান হইয়াই উদিত হইতেছেন বটে, কিন্তু তিনি যে পরমছন্দোগবেশী ব্রহ্ম, ইহা ভুলিও না। বদ্ধার্গল বজ্রসারকপাটবিশিষ্ট কংসের ঐ অশ্মকারা তোমার ভিতরে ভাবনা কর। বসুদেব শ্রীভগবানের অনুগ্রহরূপ, শ্রীগুরুমূর্তি; দেবকী তোমার আপন আগ্রহশক্তি। উভয়ের 'পরিণয়ে' যিনি জন্মিলেন, তিনি স্বয়ং ছন্দোদুলালবেশী ব্রহ্ম। ইনিই আবার নন্দদুলাল, তিনি আপন ব্রহ্মস্বরূপের দ্বারাই 'ছন্দঃ' আর 'নন্দে'র এই অভেদটি ঘটাইয়া লন।

তোমার অন্ধকারাকক্ষে যিনি 'ভূমিষ্ঠ' হইলেন, শ্রীগুরু নিজেই তাঁকে বুকে করিয়া সকল ব্যামোহ এবং গণ্ডীর পারে রাখিয়া আসিবেন। কাজেই, তোমার ভাবিবার কি আছে! তবে, হ্যাঁ, ঐ দ্বারমল্ল অসুরদের সঙ্গে ভিড়িয়া 'ভাঙের' নেশায় ভুলিও না। কিংবা তোমার ভাবকালিন্দীর তটে, কেবলই উর্ম্মিভঙ্গী দেখিয়া ভুলিয়া থাকিও না। এপারের 'ভাঙের নেশা' আর মধ্যিখানের 'ভাবের নেশা' এ দুই-ই কাটাইয়া তবে-না ব্রজের ভাবরসমাধুরী!

স ঘটয়তি ঘটে তে বোধনং ব্রহ্মসূক্তৈ
র্যদি মৃগপতি-পৃষ্ঠ-ন্যস্তপাদাজ-দেব্যাঃ।
কিমপি সিতরুচিঃ শ্রীঃ স্কন্দহেরম্বসিংহা
দধতি ন রিপুবাধাবাধনায় স্বশক্তীঃ ॥২৫

তিনি (শ্রীগুরুদেব) তোমার এই মঙ্গলঘটে ব্রহ্মসূক্ত (দেবীসূক্ত, রাত্রিসূক্ত ইত্যাদি অর্থাৎ সমস্ত বীজমন্ত্র) দ্বারা যদি সেই মৃগেন্দ্রোপরি-ন্যস্ত-রাতুলচরণ-যুগলা দেবীর বোধনটি ঘটাইয়া দেন, তবে বল—সে বোধনের দ্বারা উদ্‌বোধিত হইয়া বাণী, লক্ষ্মী, কার্তিকেয়, গণেশ সিংহাদি কোন্ দেবতাই না রিপুভয় নিমিত্ত তোমার মহাবাধাটি বাধনের উদ্দেশ্যে স্ব স্ব শক্তি ধারণ করিবেন? অর্থাৎ, মূলবোধনটি সর্বাগ্রে নিষ্ঠাপূর্বক হইলে কাণ্ড শাখা প্রশাখাদির 'বোধন' বীজের স্বশক্তিতে, স্বচ্ছন্দেই হইবে। সে জন্য ভাবিতে হইবে না। কাণ্ডশাখাদিরও নিজ নিজ শক্তি ও ছন্দঃ বিহিত আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সমস্তই বিভিন্ন, বিচিত্র হইয়াও ঐ মূলেতেই অন্বিত, অনুগত। মূলের (দেবীর) ছন্দের দ্বারাই কাণ্ডাদির ছন্দের পরিণয়, অন্বয়, সমন্বয় এই তিনটিই ঘটিয়া থাকে; এবং সেই মূলকে স্বয়ং মহাসমন্বয়ী এবং পরম সমন্বয়ী জানিবে।

মূল স্বয়ং সাধিষ্ঠ হইলেও ছন্দোমঞ্জরী রূপেই মূলের পরিপূর্ণতা। সুতরাং মূলটিকে মধুচ্ছন্দাঃ রূপেই সমাশ্রয় করিতে হইবে

মূলই যখন স্বয়ং সাধিষ্ঠ-স্বচ্ছন্দ, তখন মূলকে চাপিয়া ধরিলেই তো হইল, মূলের অত সব ছন্দোমাহাত্ম্য জানিয়া শুনিয়া কি হইবে? অর্থাৎ, কর্মেই যখন অধিকার,

তখন 'চোখমুখ বুজিয়া' কর্মই করিয়া যাই না কেন? যা কিছু করার তা তো কর্ম স্বয়ংই করিবে। কর্মই প্রভু—'কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ' কথাটা কতক ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কর্মটিকে যদি উপাস্তি বা উপাসনারূপে পাইতে হয়, তবে তার সঙ্গে জ্ঞান (কর্মটি কেন, কিভাবে প্রেয়ঃ এবং শ্রেয়ঃ, এক কথায় যেটি ইষ্ট তার সম্বন্ধে সমর্থসাধনতা এই কর্মে আছে এই জ্ঞান) 'মিথুন' ভাবে থাকা চাই। যে কর্মটি করিতেছি, অন্ততঃপক্ষে তাতে আমার যিনি ইষ্ট, প্রিয় তাঁর সেবা হইবে, তুষ্টি হইবে—এ জ্ঞানটি মিলিত না থাকিলে, কর্মে 'রসবোধ' হয় না, 'ভাব' আসে না। ক্রিয়া এবং জ্ঞানের 'মৈথুনে'ই ভাবরূপা উপাস্তির তনুটি গঠিত হইয়া থাকে। দেবী তো ভ্রূকুটি অথবা হুঙ্কারেই মহিষাসুরদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ, তবে এত বিভূতি, এত লীলাবৈভব বিস্তার কেন? তাঁর মধুচ্ছন্দাঃ পরিপূর্ণ রূপটি দেখানর আবশ্যকতা হয় বলিয়াই দেখান। মহাবাক্য, মহানাম, মহামন্ত্র তো স্বমহিমায় আছেনই, তবু তাঁকে বহুধা খ্যাপন করিয়াও বেদতন্ত্র পুরাণাদি যেন পরিতৃপ্ত হইতেছেন না। অতশত করার পরও আবার শ্রীনারদ আসিয়া বেদব্যাসকে ভাগবত রচিবার প্রেরণা দিতেছেন! ভাগবতেও দুটি একটি বা চারিটি শ্লোকেই তো বলার কিছু বাকি রহিল না মনে হয়, তবে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক কেন? ভাগবতামৃত ('স্বাদু পদে পদে') স্বয়ং আস্বাদ করিয়া আর এ 'কেন' সম্বন্ধে সংশয় বা জিজ্ঞাসা জাগে না। তখন বরং মনে হয়—হায়! এখানেই শেষ!

(১১)

অপি ফলতি কৃতিশ্চেন্ মূঢ়বিশ্বাসমূলা
সকৃদবরফলাং তাং কর্মধীর্বেত্থনৈব।
ন জলদরসসিক্তা ভাতি নৈবার্কভাসা
চির-পরমফলা সা কীদৃশী কল্পবল্লী ॥২৬

কৃতি অবরফলা ও সকৃৎফলা হইলে চলিবে না। কিসে সেটি পরম-চির-ফলা হয় তার যত্ন করিতে হইবে

মূঢ় (অন্ধ) বিশ্বাসমূল তোমার যে কৃতি (কর্ম) লতাটি রোপণ করিলে, তাতে যদি অভীষ্ট ফল কিঞ্চিৎ ফলেও, তবু জানিও যে সে ফল 'অবর' (নিকৃষ্ট—'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম' গীতা বলিয়াছেন) এবং সকৃৎ—ঐ একবারই কোনো গতিকে ফলিল,

আবারও যে ফলিবে এবং উৎকৃষ্টরূপে ফলিবে, তার কোনো নিশ্চয় নাই। কিন্তু ধী, কিনা, বুদ্ধি কর্ম্মের 'চাক্কি'তে ঘুরিতে থাকে, 'যান্ত্রিক'-ভাবে কর্ম করিতেই ব্যাপৃত থাকে, তাই 'কর্ম্মধী'র পক্ষে আপন কর্মলতিকাটিকে ভালমতে জানাই সম্ভবপর হয় না (ভাগবতে হংসগীতায় স্বয়ং ব্রহ্মারও 'কর্ম্মধী' হওয়া বশতঃ বুদ্ধি অবিশারদী, অপারগা হবার কথা চিন্তা কর)। তোমার লতাটিকে আবার সেই রবীন্দ্রনাথের 'নিবিড় সরস বরষা'য় অথবা পদাবলীর সেই 'জিনি ভাদর রসবাদরে' সিক্ত হইতেও দিলে না, ভানুর আদীপিত-দিগন্তর দীপ্তিতে আলোকিত পুলকিত হইতেও দিলে না! অর্থাৎ, সেটিকে ভাবরসে বিরহিণী এবং বিজ্ঞানভাতিতে বঞ্চিতা করিয়াই রাখিলে! অথচ, পরম নিত্য যেটি ফল—যেটি বিজ্ঞানভাতি এবং ভজনরস মাধুরীর সাধিষ্ঠ সামরস্য বিনা সম্ভবে না—সেটি তুমি তোমার ঐ অবরা কৃতি লতাটিতেও ফলাইতে চাও! কিন্তু বল দেখি, সেই পরম-চিরফলা কল্পবল্লীটি বস্তুতঃ কীদৃশী?

ইষ্টে পরম নিবিষ্টতা যদি সেই পরম ফলটি হয়, তবু সেটিকে বুঝিয়া দেখ। প্রথম—ভক্তরসিকের

ব্যাহৃতির আলোচনা গণিতের আলোচনার মতোই দুরূহ এবং নীরস মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা যখন মূলতঃ ছন্দেরই আলোচনা, তখন অন্ততঃ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আসিয়া ইহার সরল ও সরস হইতেও বাধা নাই। ইষ্টে পরম নিবিষ্টতাই অবশ্য সাধনার শেষ লক্ষ্য। এটি নিঃসংশয়ে হইয়া যাইলে, নিখিল ছন্দের, সুতরাং ব্যাহৃতিরও, চরিতার্থতা ঘটিতে আর বাকি নাই বুঝিতে হইবে। রসপিপাসু ভক্তের আবিষ্টতা এই কারিকাটিতে দেখিবে কি?

সজতি সপদি ভৃঙ্গাস্তস্য পাদারবিন্দে
বিশতি নখময়ূখৈরুজ্জ্বলাং মাধুরীং বা।
সরতি পরিমলেঽপি প্রায়শো দিক্ষু দিক্ষু
কিমটতি মধুপোঽজ্ঞাৎ কিং মৃষাগুঞ্জিতং বা॥২৭

ভক্তরসিক ভ্রমরের আর তো দেরি সহিতেছে না, সে এই মুহূর্তেই (সপদি) তার (ইষ্টের) চরণসরোজে সংলগ্ন হইল যে (সজতি)। শুধুই কি সংলগ্ন? তাঁর পদনখরের কমনীয় ছটায় সমুজ্জল যে আন্তর নিগূঢ় মাধুরী (অর্থাৎ উজ্জ্বল রস গাঢ়তা) তাতেও বুঝি প্রবিষ্ট হইল (বিশতি বা)। সে পদ্মের সুরভি পরিমল তো বাহিরেও দিকে দিকে যখন তখন (প্রায়শঃ) ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই সুরভিপবনে আকৃষ্ট হইয়াই ভ্রমর পদ্ম সন্নিধানে ধাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সে আজ পদ্মের স্বরস রসে আবিষ্ট মধুপ যে, সে এখন তো পদ্মের নিবিড় মাধুরী ছাড়িয়া হাওয়ার সাথে এদিক ওদিক ধাইয়া বেড়াইবে না, কিংবা মিথ্যা (মৃষা) গুঞ্জন করিয়াও বেড়াইবে না। শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্ঞানে যে পরমাবিষ্টতা তাও এই কারিকাটিতে ভাবনা কর:—

শ্রবণকুহরশঙ্খধ্মাতবাক্যৈ র্মহদ্ভি
রনলস রসনায়াস্ত্যাগতো বাপি ভাগাৎ।
বহিরপি ঘনমন্তর্নোভয়ং মন্যমানে
কিমখিলমুপশাম্যেৎ স্যাচ্ শিবাদ্বৈত-তুষ্ণীম্॥২৮

জ্ঞানবিচার পথে লক্ষ্য শিবাদ্বৈততুষ্ণীম্

তোমার শ্রবণকুহররূপ শঙ্খবিবরে 'তত্ত্বমসি', 'অয়ঁমাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্য চতুষ্টয় তো ধ্মাত হইয়াছে, এবং অনলস রসনাও সেই সব মহাবাক্য বিচারে ভাগত্যাগ-লক্ষণাদি প্রসঙ্গে ব্যাপৃত রহিয়াছে দেখিতেছি; আবার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'ন বহিঃপ্রজ্ঞং নান্তঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন ঘনপ্রজ্ঞং' ইত্যাকার যে 'নেতি নেতি' বিচার বিবেচন, তাতেও তোমায় নিষ্ঠাপূর্বক মননশীলই দেখিতেছি; কিন্তু এত করিয়াও, বলিবে কি—নিখিল প্রপঞ্চোপশমে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' রূপে যে পরমতুষ্ণীম্ভাব তাতেই কি তুমি চিরবিশ্রান্ত হইলে? আত্মাতেই কি তোমার পরমনিবিষ্টতা ঘটিল?

তারপর সাংখ্যযোগীর কথাও চিন্তা কর:—

কিমধিগতসমাধিঃ সাস্মিতানন্দ-সেতু
মতিতরিতুমশক্তো যাসি কৈবল্যপারম্।

কিমপি বিজয়তে বা ধর্ম্মবৃট্ প্রান্তভূমৌ
যদি দৃশমিব দৃশ্যং নো জয়েঃ শুদ্ধিসাম্যে॥২৯
(অপি সুতনুসবীজং ধর্ম্মমেঘৈঃ সুপুষ্টং
কথমিব দৃশি দৃশ্যে তে ভবেচ্ছুদ্ধিসাম্যম্॥)

(১২)

সাংখ্যযোগীর পরম লক্ষ্য—সমাধিভাবনাদি স্থলেও কোথায় কোথায় 'ব্যাসকূট' উপস্থিত হইতে পারে

সমাধি তো তোমার অধিগত হইয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু সম্প্রজ্ঞাতের প্রান্তে 'সানন্দ' এবং 'সাস্মিত' নামে যে সেতু রহিয়াছে, সে সেতু উত্তীর্ণ হইতে যদি অপারগ হও, অর্থাৎ আনন্দ এবং অস্মিতার যে অপূর্ব গাঢ়ত্ব এবং মহত্ত্বের কথা ব্যাসভাষ্যাদি কীর্তন করিয়াছেন, অথচ যেটি সাপেক্ষতারহিত পরমভূমিও নয়, তাতেই যদি আবিষ্ট রহিয়াই যাও, আর আগাইতে না চাও বা না পার, তবে বল দেখি কৈবল্যরূপ পারটিতে—পারম্যে—কেমন করিয়া উপনীত হইবে? আবার প্রান্তভূমিতে তোমার 'ক্ষেত্র'টি 'সুতনু সবীজ', অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম অথবা ক্ষীণ সংস্কারগর্ভিত হইয়াছে বটে, কিন্তু 'ধর্ম্মমেঘাদি' সমাধি যে তনু সংস্কারভূমিটিকে একান্তভাবে নির্বীজ করিয়া দিবে অথবা সংস্কার আরও সুপুষ্টই করিবে, তাও কি চিন্তা করিয়াছ? 'অপি', 'কিমপি' পদের দ্বারা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসাটি করা হইতেছে। আচ্ছা, ঐ প্রান্তভূমিতে 'ধর্ম্মবৃট্' (ধর্মবর্ষণকারী সমাধি মেঘটি) যদি অন্তরায়ের বীজ অথবা মূল অপনোদনে বিজয়ী না হয়, অর্থাৎ, তাকেও ছাড়িয়া যদি পরবৈরাগ্যকে সহায় করিতে হয়, তবে বল দেখি—'দৃক্' অথবা পুরুষেও যেমনটি, 'দৃশ্য' অথবা প্রকৃতিতেও তেমনি 'শুদ্ধি' সাধনে জয়ী হইবে কিরূপে? 'দৃশি-দৃশ্যের' এ 'শুদ্ধিসাম্য'টি যতক্ষণ অবিজিত, ততক্ষণ তোমার কিসের, কীদৃশই বা বিজয়? সানন্দে-সাস্মিতে এক বিপুল-নিবিড় আবিষ্টতা মিলিয়াছিল বটে, কিন্তু সেটি তো 'নির্ব্যূঢ় পরম' নয়; ধর্মমেঘাদি সমাধি বর্ষণে ব্যুত্থানের উদারাদি সংস্কারগুলি ভাসিয়া যাইল বটে, কিন্তু যেগুলি 'সুতনু', সেগুলি? ঐ মেঘোদয়টি আবারও হইবে, তাহা হইতে কল্যাণ-বর্ষণটিও আবার হইবে—এই সংস্কার, এই 'আবেগ'টি কোথায় যায়? ঐ আবেগ, ঐ অপেক্ষাটি

তখনও রহিয়া যায়। আবেগ, অপেক্ষা যতক্ষণ রহিয়াছে, যে কোনও আবিষ্টতার 'ঘোর' ভাঙার সম্ভাবনাটিও ততক্ষণ বিদ্যমান। 'দৃশি-দৃশ্যে' শুদ্ধিসাম্যটি না হওয়া পর্যন্ত ঐ 'ভাঙ্গন' থেকে অব্যাহতি নেই। সুতরাং পরমাবিষ্টতাও নেই। 'দৃশিমাত্র' রূপ যে পুরুষ তার 'শুদ্ধি' অথবা 'স্বরূপেঽবস্থানং' সহজেই ধারণা করা যায় বটে, কিন্তু দৃশ্যের?

ইহার উত্তর—দৃশ্য অথবা দৃশ্যমূল যে প্রকৃতি, সেটিকে ব্রহ্মের অথবা সচ্চিদ্-বস্তুরই 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'রূপে না দেখিতে পারা পর্যন্ত তার 'শুদ্ধি' 'সম' পর্যায়ে আসিল না। অর্থাৎ, ব্যাহৃতি-আশ্রয়ে ছন্দের যে সোপান পরম্পরা অধিরোহণ করিয়া আমরা চলিয়াছি, তার শেষ পদবীতে, কিনা পরমসমন্বয়ীতে, না পৌঁছান পর্যন্ত 'দৃশ্য' কিছুতেই বলিবে না যে আমি একান্তভাবে 'খাঁটি' হইয়াছি—'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' হইয়াছি। আর, সেটি না বলা পর্যন্ত তার কাছ থেকে রেহাইও নেই। কেবল 'বর্জ্জননীতিতে' (by pure dismissal) দৃশ্যকে বাদ দেওয়া যায় না। দিতে চেষ্টা করিলে তাকে কোনও এক 'চাপ' (under pressure) রাখিতেই হয়, কাজেই চাপ ঠেলিবার এক সংবেগ ('potnetial') ও রহিয়াই যায়। তাকে সরাসরি 'অধ্যাস', 'মিথ্যা' ইত্যাদি বলিয়া উড়াইতে গেলেও সে উড়িয়া যায় না; বিচারে (logically) উড়িলেও কার্যতঃ উড়িয়া যায় না; সমাধিতে 'গা-ঢাকা' দিলেও বেমালুম রহিয়া যায়। পরবৈরাগ্যে তার বীজ মারিবে বটে, কিন্তু বৈরাগ্যও 'পর' হইবে না, মনন বিচারাদিও 'পরিনিষ্ঠিত' হইবে না, উক্ত শুদ্ধিসাম্য ব্যতিরেকে। অর্থাৎ, দৃশ্যকে যদি মিথ্যাই বল, তবে সে বলা 'কাজের বলা' হইবে দৃশ্যকে ঐ পরমসমন্বয়ী ছন্দে লইয়া যাইতে পারিলেই। দৃশ্য বলে—আমায় 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপে সর্বাগ্রে জান, তারপর, ঐ 'চ'কার দুটি মিথ্যা বলিয়া, 'অধিকন্তু' বলিয়া যদি উড়াইয়া দাও তো দিও, আপত্তি করিব না। নচেৎ, ঋত, সত্য মিথ্যা—এ আত্মঘাতী উক্তিতে আমি কান দিতেছি না। বেদ, তন্ত্র, পুরাণ, ঋষি, মহাজন সকলেই 'দৃশ্যমার্জ্জনে' কি সাংঘাতিক শ্রমই না করিয়াছেন, দেখিলে অবাক হইতে হয়। 'মার্জ্জন' মানে সরাসরি 'ধুইয়া মুছিয়া ফেলা' নয়। আগে তাকে 'ধৌত' হবার মতো করিয়া তবে তো ধৌত করণ। 'দুর্ব্বল' অধিকারীও আপনাকে ধুইয়া ধুইয়া না 'সবল' করিবেন! ব্যাহৃতিচ্ছন্দে ধৌত হইতে হইতে দৃশ্য অন্তে যাইয়া

যেখানে দাঁড়ায়, সেখানে ঐ 'চ'কার দুটি ছাড়া ধুইবার আর শেষ থাকে কি? যোগবাশিষ্ঠাদিতেও 'তলাইয়া' ধ্যান লাগাইও।

দৃক্ ও দৃশি বিবেচন। ভঙ্গুরতা-ভয় কতদূর অবধি? কি ভাবে তার অবসান?

অথবা, দৃক্, (দৃশ্—কর্তৃবাচ্যে), দৃশি (করণ বাচ্যে) এবং দৃশ্য—এই ভাবে গোটা অনুভূতি (Experience) কে বিশ্লেষণ করিয়া লও। প্রথমটি তো ধর স্বরূপে শুদ্ধ আছেনই। কিন্তু তুমি (মুমুক্ষু সাধক) সেটিতেই 'অবস্থিত' তো নেই। তুমি জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্তা ইত্যাদি রূপে জ্ঞেয়, ভোগ্য, কার্য এদের সঙ্গো ব্যবহারে লিপ্ত আছ। তুমি যে ভাব-ভক্তি, ধ্যান-সমাধি, শ্রবণমননাদি করিতেছ, সেটিও প্রথমটির (দৃকের) ভাগে পড়ে না। সেটি দৃশি-দৃশ্যের অন্যোন্য অপেক্ষার কুক্ষিতেই নিক্ষিপ্ত। সে কুক্ষি কাটাইয়া বাহির হইবে কিরূপে? উত্তর—দুয়ের শুদ্ধিসাম্য ছাড়া উপায়ান্তর নাই। অর্থাৎ জ্ঞাতা-ভোক্তাদি রূপে যে তুমি, আর জ্ঞেয় ভোগ্যাদি রূপে যে 'সে', এই দুয়েরই যেটি 'হৃৎ', যেটি 'আত্মা' (Innermost Core & Essence) সেইখানে পৌঁছিয়া তাদের সর্বথা সমীকরণটি ঘটাইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। একটি বটকণিকাকেও 'ভিন্ধি' (ভাঙিয়া দেখ) করিয়া দেখিতে হইবে যে তোমার যেটি আপন 'হৃৎ' সেটি ঐ বীজকণিকারও হৃৎ। 'তৎ' পদার্থকে শুধু সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এক বস্তু ভাবিলেই হইবে না। ঐ কণিকাটির ভিতরেও সেই সর্বকে সর্বভূতাধিবাসরূপে পাইতে হইবে। এর জন্য 'তোমাকে'ও তার 'সুহৃৎ' হইতে হইবে। তোমাতে ও তাতে এই পরম সৌহার্দটি ঘটায় বা দেখায় যে ছন্দঃ তাকে বলে পরম সমন্বয়ী। সাধনমাত্রেরই উদ্দেশ্য এই ছন্দে ধাপে-ধাপে উপনীত হওয়া। তোমাতে ও তাতে 'শুদ্ধিসাম্য' (পদার্থ শোধন পরাকাষ্ঠা) বস্তুতঃ ঘটিলে আর বৈষম্য আশঙ্কা নেই, কাজেই কোনও ক্ষোভ আশঙ্কাও নাই। ছন্দোমাত্রেরই উদ্দেশ্য সমীকরণ সন্দেহ নাই। পরিণয়ী হইতে সুরু। ক্রমে ক্রমে এই সমীকরণটিকে 'নির্দ্দোষ' এবং 'নির্ব্যূঢ়' করিয়া চলিতে হয়। 'নির্দ্দোষ সম' ব্রহ্মে এর অবসান। তার আগে পর্যন্ত 'difference of potential' (সম্ভাব্য বিষমতা) এবং 'subject-to-conditionality' (সাপেক্ষত্ব) থাকেই। কাজেই, ক্ষোভের আশঙ্কাও থাকে।

(১৩)

'অয়ং' খ্যাতি থেকে 'অস্তি' খ্যাতি পর্যন্ত সপ্ত-ব্যাহৃতির অভ্যারোহণ সমাপ্তিতে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এই দুই 'চ' কার মুক্ত 'ঋতং সত্যম্'

'অয়ং' থেকে সুরু করিয়া 'অস্তি' পর্যন্ত যে সপ্তখ্যাতি সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা উদ্দিষ্ট হইয়াছে, ধাপের পর ধাপ বাহিয়া চরম খ্যাতিটি পর্যন্ত না যাওয়া পর্যন্ত 'ঋতং'—যেটি ঠিক ঠিক চলিতেছে, এবং 'সত্যং'—যেটি ঠিক ঠিক রহিয়াছে, এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান (hiatus) টা তিরোহিত হয় না, এবং সে দুটি দুইটি 'চ' কার দ্বারা মিলিতও হয় না। যতক্ষণ 'চলিতেছে' এই অনুভব, ততক্ষণ এই জিজ্ঞাসা রহেই—চলার মূলে কি আছে, আধার রূপেই বা কি, লক্ষ্য বা পরায়ণরূপেই বা কি আছে? এই মহাপ্রশ্নটি আপনার সমাধান আপনি করিতে করিতে চলিয়াছে 'অয়ং' প্রভৃতি ঐ সপ্তখ্যাতি বা সপ্তব্যাহৃতির সোপান আশ্রয় করিয়া। 'এই যে' বলিয়া সত্য প্রথম সাড়াটি দেয়, কিন্তু সাড়া দিয়াই 'ঐ' (অগোচর) এর ভিতরে সেটি লুকায়; তখন দুইএর মাঝে এক অন্তরীক্ষ (hiatus) অনুভব হয়—'না এই, না 'ঐ' রূপে। একটা inner stress এর মতো। আমার অনুভূতিটাকে 'এই' আর 'সেই' দুইটা 'পোলে' strain (রূপিত) করিয়া দুইমাঝে একটা উদাসীন ভূমি (neutral zone) রূপে এটি বিদ্যমান। চিন্তা করিয়া দেখ—নয় কিনা। তারপর, 'এই আর ঐ' দুইকে জড়াইয়া এক বৃহত্তর, মহত্তর অনুভূতি। তারপর, সকল প্রত্যয়ের জনি বা নিদান বা Root ভাবে তাকে ডাকি কি বলিয়া? 'অসি'—তুমি বিপুল, তুমি মহান, তুমি কারণ, তুমি 'আছ'। তারপর—'অস্মি'—আমিই 'আছি'—'মহান আত্মা' রূপে তোমাকেও ক্রোড়ে ধরিয়া আমি 'আছি'—আমিই 'তপসা চীয়মান' হইয়া সবই হইয়াছি এবং হইতেছি। কিন্তু এখানেই শেষ? না। 'অস্তি'—'তুমি' বলি আর 'আমি' বলি, আর 'সে' বলি, মূলে, আধারে এবং অন্তে এক নিঃসন্দিগ্ধ, নির্ব্যূঢ় 'অস্তি'। ঋতের বিশ্রান্তি এই সত্যেই। এইবার এই কারিকাটি ভাবনা কর:—

প্রথমময়মিতীদ্ধা সপ্তজিহ্বে শিখা যাঃ
নুভয়মিতি চ চাসৌ দ্বে শিখে ইধ্যমানে।

উভয়মপি মহদ্ যচ্চাসি চাস্মীতি চাস্তি
ত্বমহমিতি সদেকঞ্চাসুহোতা জুহোতি॥৩০

ব্রহ্মযজ্ঞে সপ্ত-শিখা ঐ সপ্তখ্যাতি। সপ্তব্যাহৃতি ঐ সপ্তশিখায় আহুতির স্বাভাবিক নাম বা মন্ত্র

সাতটি জিহ্বাবিশিষ্ট পরমাশ্চর্য এক অগ্নি। প্রথমে, 'অয়ং' বা 'এই' রূপে এই অগ্নির একটি শিখা 'ইন্ধ' হয়; তৎপরে, 'অসৌ' (ঐ) এবং 'অনুভয় (অর্থাৎ 'না-এই-না-ঐ')—এই শিখাদ্বয় 'ইধ্যমান' হইয়া থাকে। তদনন্তর 'উভয়ং মহৎ' (অর্থাৎ 'এই এবং ঐ' দুইই মহত্তর রূপে) সেটি দীপ্ত হইয়া থাকে। শেষকালে, 'অসি', 'অস্মি' এবং 'অস্তি' এই তিন প্রত্যয়ের সংস্থাস্বরূপ যে 'ত্বং', 'অহং' এবং 'সদেকং' (কিনা, সত্যং) সেই তিনটি শিখা ক্রমে সমিদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম স্বয়ংই হোতৃরূপে এই সাতটি শিখায় বিশ্বভুবন আহুতি দিতেছেন। ব্যাহৃতি সপ্তকই তাঁর হবনমন্ত্র। সুতরাং, আন্তর বাহ্য তোমার সর্ববিধ হবনে সরহস্য এই ব্যাহৃতি সপ্তককে আশ্রয় করতঃ তোমার যজ্ঞের চরমফল যে 'অমৃত' সেটি, লাভ করিতে হইবে।

ব্যাহৃতির আধাররূপছন্দের পাঁচটি পর্বের সংক্ষিপ্ত সংকলন। 'মহা' ও 'পরমের' সীমানা

মন্ত্রশাস্ত্রে ব্যাহৃতি আলোচনা মৌলিক আলোচনা। এই নিমিত্ত আলোচনার আধার প্রস্তুতিতে ছন্দঃকে মুখ্যস্থানে বসাইয়া আমরা ব্যাহৃতিকে বুঝিতে যত্ন করিতেছি। ছন্দের যে পঞ্চবিধা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, নিম্নের কারিকায় তাদের সার সঙ্কলন মিলিবে—

পরিণয়তি যদেকং ছন্দসী দ্বন্দ্বভাজী
অনুগময়তি কিঞ্চিচ্চাংশতোঽন্যস্য মৈত্রম্।
তদপি ভবতি সম্যক্ সর্বতো ব্যাপ্য কিঞ্চিদ্
বৃহদ্ তমনুযাতং স্যান্ মহচ্চেৎ ততঃ কিম্॥৩১

প্রথম, পরস্পর দ্বন্দ্ব লক্ষিত হইতেছে এমন দুটি ছন্দঃকে যে ছন্দঃ (দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও) পরস্পরের 'সহগ' করিয়া লয়, তাকে পরিণয়ি ছন্দঃ বলিয়া জানিবে (দৃষ্টান্ত ইতঃপূর্বে

দেওয়া হইয়াছে)। এস্থলে 'compositin of forces' মাত্র ঘটে। কিন্তু 'মৈত্র'—reconciliation? সেটি ঘটায় অন্বয়ি ছন্দঃ। কি ভাবে? দুয়ের মধ্যে 'অংশতঃ' অন্বয় বা মিলটি দেখাইয়া অথবা ঘটাইয়া। এটি দ্বিতীয়। যদি শুধু অংশতঃ নয়, সর্বতঃ—পূরাপূরি অন্বয় বা মিলটি ঘটান যায়, তবে তৃতীয়—সমন্বয়ি। কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দেশকালাদির সংস্থায় শুধু সমন্বয়টি না ঘটিয়া 'বিশ্বসংস্থায়' (Cosmic Frame of Reference) সমন্বয়টি যদি ঘটে, তবে চতুর্থ—মহাসমন্বয়ি। এর ফলে বিশ্বে যেটি 'ঋতং বৃহৎ'রূপে অনুপ্রবিষ্ট এবং সমুদাহৃত, ততদূর 'পর্য্যাপ্তি' সম্ভাবিত হইয়া থাকে। সর্ববিধ সাধনেই এটি যথাসম্ভব নির্বাধে হইতে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এইখানেই 'ইতি শেষঃ'? তা তো নয়। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে—'ততঃ কিম্'? সেটি—অর্থাৎ এখানে যেটি প্রশ্নের বিষয়মাত্র—পরমান্বয়ি। সেটিকে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' বলিব, না আর কিছু বলিব, অথবা সেটি আসলে বলার বস্তুই নয়? কেননা, বিশ্বে ওতপ্রোতে যে 'ঋত বৃহৎ' সেটি সেই পরমের একটি 'পাদ' রূপেই প্রতীত হইতেছে—কিন্তু 'অমৃতং দিবি'?

(১৪)

সাধন ও ব্যবহার ক্ষেত্রে ঐ পাঁচটির কতদূর কি ভাবে প্রয়োগ সম্ভাবিত হয়? সামান্য ও বিশেষ রূপ। দৃষ্টান্ত

আমাদের চলতি ব্যবহারে, এমন কি সাধনভজনেও সচরাচর ছন্দের ঐ পাঁচটি ধাপের মধ্যে 'কায়ক্লেশে' প্রথম দুটিতে (পরিণয়ি, অন্বয়ি—সহগ, সহিত) 'পা' বাড়াইতে পারি। কিন্তু সমর্থ 'ভূ র্ভুবঃ স্বঃ' এই তিন আদি ব্যাহৃতিরূপা গুরু শক্তির অথবা বিশ্বকল্যাণ শক্তির 'প্রকট' অনুগ্রহ না মেলা পর্যন্ত তৃতীয় সোপানে (অর্থাৎ, সমন্বয়ে) পৌঁছিতে অপারগ হই। আমাদের ব্যবহার ক্ষেত্রে অথবা সাধনক্ষেত্রে কোনও সমাধানই সম্যক হয়না, সমীচীন হয় না। তৎপরে মহাসমন্বয়রূপ মহোদয়টি সুরু হয়—'মহঃ', এই সমর্থ ব্যাহৃতিকে আশ্রয় করতঃ। 'একলাফে' এটি হয় না, হবার নয়ও। 'অসি', 'অস্মি', 'অস্তি'—এইভাবে ত্রিধা উক্ত মহোদয়টি ঘটিয়া থাকে। সত্যে আসিয়া 'মহা'র শেষ, এবং সেই শেষের সঙ্গে সঙ্গেই 'পরমে'র আরম্ভ। ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গাবারি যমুনাবারির মতো এই 'মহা'র এবং 'পরমে'র মিলনকে তফাৎ করিয়া দেখা যায় না।

'সমর্থ' কথাটা দুইবার ব্যবহার করিলাম। কেননা, সাধনদ্বারা উদয়, অভ্যুদয়,

মহোদয় ঘটাইতে গেলে ব্যহৃতির মাত্র 'সামান্যরূপতায়' কুলায় না, সেটিকে এক 'বিশেষরূপতায়' তুলিয়া ধরিতে হয়। ধর, বহির্বিশ্বে তাড়িতচৌম্বক শক্তি, তাপ ইত্যাদি তো 'সামান্য' ভাবে আছেই, কিন্তু 'কাজে লাগিবার মতো' করিয়া সে সব শক্তি পাইতে গেলে সামান্যরূপেই তো কুলায় না, কৌশলবিশেষ দ্বারা বিশেষরূপে পাইতে হয়। কৌশলটিরও আবার তিন রূপ—শক্তি, আকৃতি, ক্রিয়া। তিনটি প্রশ্নের উত্তর হয় ঐ তিনের দ্বারা। প্রথম—কি শক্তিদ্বারা ঐ সামান্য শক্তিকে (ধর, কেন্দ্রীণ তাড়িত শক্তিকে) আমি 'অভীষ্টরূপে'—মাত্রায়, পরিমাণে ইত্যাদিতে—পাইব? দ্বিতীয়—উদয়টিকে ঠিক কি ভাবে আকারিত করিয়া পাইব? তৃতীয়—ঠিক কি ভাবে প্রয়োগ অথবা ক্রিয়াদ্বারা পাইব? এই তিনটি যথাক্রমে মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র। সুতরাং, কৌশল হইল উক্ত 'ত্রয়ী'। প্রত্যেকটিকে এবং তিনেরই পারস্পরিক অনুপাতটিকে একটা নির্দিষ্ট 'কাষ্ঠায়' (limit-এ) না আনিতে পারিলে কৌশলটি তো সিদ্ধ হয় না। সুতরাং কৌশলটিকে উপযুক্ত 'কাষ্ঠামান' পর্যন্ত লইয়া যায় যে মন্ত্রাদি তাকে বলে 'সমর্থ'। ধর, জলকে বরফ করিবে। এস্থলে ঐ 'ত্রয়ী'কে সহজেই ধরিতে পারিবে। যতটা শৈত্য (32°F) প্রয়োগে জল বরফ হইবে, সেই শৈত্যই হইল সমর্থ; ইত্যাদি। বৈখরী জপকে মধ্যমায়, আবার সেটিকে 'মধ্যমার সেতু' পার করাইয়া পশ্যন্তীতে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত মন্ত্রাদিকে তত্তদুদ্দেশ্যে অবশ্যই 'সমর্থ' হইতে হয়। ব্যাহৃতি বিশ্বতঃক্রিয় বটে, কিন্তু মন্ত্র-যন্ত্র-তন্ত্ররূপে ত্রিধা সেটিকে 'ব্যাহরণ' (special accentuation) করিয়া লইতে হয়। মনে রাখিতে হইবে যে—'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিটিরই উক্ত ত্রিধা ব্যাহরণ আছে। অর্থাৎ, ব্যাহৃতিটি একাধারে মন্ত্র, যন্ত্র এবং তন্ত্র। Potency—Potential (field)—Power (what does work)—এ তিনই উহাতে সম্মিলিত। অথবা, বলিতে পার—Force Field-Function. ব্যাহৃতির 'ব্রাহ্মীতনু' এবং 'যজ্ঞবারাহীতনু' রহস্য নিম্নের কারিকাটিতে ভাবনা করিও:—

অভজদণু-তনুং বো ব্রহ্মরূপাং নিগূঢ়াং
ত্রিভুবনমখক৯প্ত্যৈ ব্যাহরংস্তাং হকারঃ।
অরণিরভবদূত শ্চোর্জ্জিতা মন্থভূতাৎ
স্বরহবিরভিষেকে রাদদীপ্যগ্নিজায়া।।৩২

(১৫)

‘ভূঃ’—এই আদি ব্যাহৃতির ‘ব’ কারাদি বর্ণের মূল ব্যঞ্জনা

‘ভূঃ’ এর অন্তর্গত ‘ব’ কার কিরূপ ‘তনু’ ধারণ করিয়াছিলেন? ‘অণু’, কিনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, নিগূঢ়া, ব্রহ্মরূপা যে তনু তাহাই তিনি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন (অভজৎ)। অন্তর্বহিঃ সর্ববিধ সৃষ্টির আদিতে আধাররূপে, উপাদানরূপে যে অখণ্ড, বিপুল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তাশক্তি, সেইটিকে ‘ব’ বলিয়া জান। সেই অব্যক্ত আধারে (বেদীতে) ত্রিভুবন সৃষ্টিরূপ যে যজ্ঞ (মখ), সেটি যাতে কল্পিত হইতে পারে তন্নিমিত্ত (ক্৯প্ত্যৈ) কি আবশ্যক হয়? নাদ বা মহাপ্রাণশক্তির বাকরূপী যে ‘হ’কার তদ্দ্বারা সেটির ‘ব্যাহরণ’ (বিশেষভাবে এবং বিশেষ বিশেষ ‘কেন্দ্র’ আশ্রয়ে ‘আহৃতি’ অথবা আহরণ) হওয়া আবশ্যক কেননা, তা না হইলে কেই বা হোতা, কি-ই বা সমিধ্ কি-ই বা হব্য এবং হবিঃ প্রভৃতি হইবে? ঋগ্‌বেদাদি তাই না প্রশ্ন করিয়াছেন—‘কিংস্বিদ্‌বনম্’ ইত্যাদি। কোন্ সেই আদিম ‘বন’ যাহা হইতে আদি মখকৃৎ প্রজাপতি তাঁর আদি সমিধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন? সে Primordial Creativity-র মূল উপাদানটি কি ছিল? দেশ? কাল? সম্বন্ধ? অপর কিছু? কে তার উত্তর দিবে? বেদ তাই ‘কিংস্বিদ্‌বনম্’ বলিলেন, এস্থলে কারিকায় সেটিকে ‘ব’ এই বর্ণ বলা হইল। আচ্ছা, ‘হ’ যখন ‘ব’ কে ‘ব্যাহরৎ’, তখন তিনি হইলেন ‘ভ’ রূপে আদি সমিধ্। কিন্তু সেই সমিধ্ শুধু বহ্নিগর্ভ হইয়া থাকিলেই তো চলিবে না—তাঁকে ‘অগ্নীন্ধন’ অরণিরূপে ঊর্জ্জিতা, ঊর্জ্জস্বতী হইতে হইবে। কেমন করিয়া তিনি ঊর্জ্জস্বতী হইয়াছিলেন জান? ‘উতঃ মন্থভূতাৎ’— মন্থন দণ্ডরূপ যে ‘উ’ বর্ণ তদ্দ্বারা মথিত হইয়া তিনি ঊর্জ্জস্বতী হইয়াছিলেণ অরণী। ‘ভূ’-তো মিলিল। কিন্তু এখনো তো ‘বহ্নিজায়া’ (স্বাহা) অরণীকে ‘সমিদ্ধা’, সম্যক্ উদ্দীপিতা করেন নাই, যাতে বিশ্বভুবন যাগে হবিঃ অভিষেক কর্মটি (অর্থাৎ হবন) নিষ্পাদিত হইবে। বহ্নিবীজ ‘র’ তাঁকে হবনের নিমিত্ত দীপিতা করিয়াছিলেন (অদীপি)। হবিঃদ্বারা হবনটি হইবে, কিন্তু কিরূপ সে হবিঃ? স্বর, কিনা স্বগত ছন্দঃ সহকৃত সে রুতি (স্ব+রু) তাই বাগ্‌ভব, বাচানুষ্ঠিত বিশ্বযাগে হবিঃরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন।

ভূরাদির অন্তর্গত বর্ণ যদৃচ্ছাকল্পিত নয়। কোন রাগের স্বরময়ী মূর্তি তুলনীয়। স্বরাবয়ব ও স্বরাবয়বীর সম্বন্ধ। পশ্যন্তীগ্রামে 'দর্শন' কীদৃশ ?

মালিনী ছন্দে পরিবেশিত কয়েকটি কারিকায় ছন্দের পরিণয়্যাদি পঞ্চরূপের কথা এবং ব্যাহৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে রহস্য বিবৃত হইল। শেষের কারিকাটিতে বিশেষভাবে 'ভূঃ' আবির্ভুত হইয়াছেন। তদীয় 'ব' কারাদি 'অঙ্গ' বা অবয়বগুলিকে 'যদৃচ্ছাকল্পিত' (arbitrary and conventional) ভাবিলে ভুল মনে করা হইবে। অর্থাৎ, ঐ বর্ণগুলি যথেচ্ছকল্পিত 'সঙ্কেত' মাত্র নয়—যথা গণিতে x, y, z ইত্যাদি symbols। ধর, কোনও রাগের এক স্বরলিপি (notation)। লিখিত স্বরলিপি দৃষ্টে ছন্দের বিন্যাসটি কথঞ্চিৎ প্রতিভাত হইতে পারে বটে, কিন্তু রাগের যেটি সুরময়ী মূর্তি? সেটি তো লেখায় বা রেখায় দেখান যায় না; সেটিকে ষড়্জাদি স্বরেই দেখাইতে হয়। প্রণব, বীজমন্ত্রগুলি, ব্যাহৃতি—এ সমস্তই মৌলিক স্বরাবয়বের অবয়বী। অবয়বগুলির পরস্পরের সাথে এবং অবয়বীর সাথে 'প্রাণিক' ('organic') সম্বন্ধ, যেমন মুখ্যপ্রাণের সাথে প্রাণাপানাদির (জপসূত্রম্-এ পরে সবিশেষ ব্যাখ্যাত)। তবে, ও সকলের কি 'লেখরূপ'টি নাই? তাও আছে। জপের পশ্যন্তী গ্রামে উঠিয়া ব্যাহৃতি প্রভৃতির শুধু যথার্থ (সমর্থ) শব্দরূপটি নয়, পরন্তু তাদের লেখরূপ'টিও সাক্ষাদ্ গোচরীভূত হইয়া থাকে। তখন 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'। কিন্তু আমরা আগেও বলিয়াছি, পরেও বিশেষভাবে দেখিব যে, পশ্যন্তীতে 'পা দেওয়া মাত্র' সত্যের এবং ঋতের 'ষোল আনা'ই অবারিত উন্মোচিত হইয়া যায় না। সেখানেও নতুন করিয়া, নবীন ভঙ্গিমায় ও ব্যঞ্জনায়, সেই খ্যাতিসপ্তক সাধিতে হয়, ছন্দঃ পঞ্চকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। অর্থাৎ, পশ্যন্তী ক্লাসে প্রোমোশন পাইয়াও 'ভূঃ' থেকে 'সত্যম্' পর্যন্ত সবই নতুন আকারে আয়ত্ত অধিগত করিতে হয়; সেখানেও পরিণয়ি থেকে সুরু করিয়া পরম-সমন্বয়ি পর্যন্ত সকল ছন্দেই বুদ্ধিকে বিশারদী হইতে হয়। এই জন্য, যে ব্যক্তি জপাদি সাধনে নামিয়া 'কোনও ফাঁকে' এক আধবার মধ্যমার সেতুর ও-পারের সীমানায় উঁকি ঝুঁকি মারিয়া আসিল, কিছু কিঞ্চিৎ 'আলোক পুলকে'র, 'রূপরসের' আমেজও লইয়া ফিরিল, তাকেই তমসার পারে সমুত্তীর্ণ 'আদিত্যবর্ণং পুরুষং মহান্তং'-এ অনাকুল-দৃষ্টি মহাপুরুষ মনে করার কারণ নেই। ছান্দোগ্যে নারদ-সনৎকুমার

সংবাদটি আবারও লও। বরং দস্তুরমতো ছাড়পত্র (প্রোমোশন) ব্যতিরেকে সীমান্তে উঁকিঝুঁকি মারায়, বিভ্রম এবং বিপদ দুটিরই আশঙ্কা বেশী।

অতঃপর এই কারিকা তিনটির অর্থ অনুধাবন কর:—

প্রাণপ্রযুক্তচিচ্ছক্তেরূর্জিতা স্ফুটবৃত্তিতা।
লম্বগা চাপি মূর্ধন্যা ভূরয়ং প্রত্যয়স্ততঃ॥
অরণী দ্বে ভকারে যে উকারান্ মন্থনং তয়োঃ॥
অয়মিত্যধ্বরস্যাস্য রকারাদগ্নিদীপনম্॥
প্রণবস্যা'ম'য়োর্মধ্যে চোকারঃ হ্রস্বমাত্রকঃ।
বায়ুব্রহ্মণ ঈক্ষায়া 'যঃ' সন্নজায়তোর্জ্জিতঃ॥৩৩-৩৫

(১৬)

চিৎ ও চিচ্ছক্তি। প্রকাশ ও বিমর্শ

ইতঃপূর্বে শেষ যে কারিকাটি ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তার ব্যাখ্যায় এস্থলের প্রথম কারিকাটিরও মূল কথাটি বলা হইয়াছে। সেখানে যেটিকে 'ব্রহ্মরূপাং নিগূঢ়াং অণুতনুং' বলা হইয়াছিল, এখানে সেটি স্বরূপতঃ বলা হইতেছে—চিচ্ছক্তি। শুদ্ধ চিৎ সম্পর্কে ব্যাকৃত (স্ফুট উন্মীলিত বৃত্তি), অব্যাকৃত (অস্ফুট নিমীলিত বৃত্তি) এ সকল ভেদের প্রসজ্যতা (relevancy) নেই; কেননা, চিৎ বা চৈতন্য প্রকাশরূপই। শৈবাগমাদি যে 'প্রকাশ-বিমর্শ'রূপ দ্বৈধটি (polarisation) কল্পনা করেন, সেটি সম্ভাবিত হয় চিৎকে চিচ্ছক্তিরূপে দেখিলেই। আচ্ছা, ধর চিচ্ছক্তি আপন 'বিমর্শ' (পরে সবিশেষ ব্যাখ্যাত) দ্বারা আপনাকে সৃষ্টির মূলীভূত উপাদান সামগ্রী (primordial cosmic material as a whole) করিয়া লইলেন। এইটি সেই আগেকার অণুসূক্ষ্মা নিগূঢ়া ব্রাহ্মীতনু। এখন ইহাতে স্ফুটবৃত্তিতারূপ উন্মীলনটি আবশ্যক। যেমন, সুষুপ্তির পর জাগরণ। সমাধির পর ব্যুত্থান। এই ব্যাপারের জন্য যে মূল নিমিত্তটি (Basic factor) আবশ্যক করে, তাকে 'প্রাণ' (অথবা 'নাদ') আখ্যা দাও। তাতে মিলিল—'প্রাণপ্রযুক্ত চিচ্ছক্তি'। এর মানে চিচ্ছক্তি স্বয়ংই নিখিলের উপাদান এবং নিমিত্ত হইলেন।

'বিমর্শ' এই শব্দাকৃতির মৌলিক বিশ্লেষণ

['বিমর্শ' কথাটারও তাই সঙ্কেত। 'বি', কিনা, 'ব'এর দ্বারা উপলক্ষিত যে ব্রহ্মের মূলোপাদান-সামগ্রীরূপতা, তাহাতে—'মর্শ'—নিমিত্তোদ্‌ভাবন-পূর্বক সৃষ্ট্যাদিরূপে বৃত্তিমত্ত্ব। ধর, সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে চিত্তের যে সম্পূর্ণ 'মগ্নভাব', সেইটি 'বি'; আর যে নিমিত্তসহকারে ঐ মগ্নভাব থেকে পুনশ্চ ভাসমান, ক্রিয়মাণ ভাবটি উদ্ভূত হইয়া জাগৃতি ঘটায়, সেটিকে বলে 'মর্শ'। বীজ হইতে অঙ্কুরের দৃষ্টান্ত লও। বীজমন্ত্র লইয়াও এটি বুঝিতে যত্ন কর। 'মর্শ' এই শব্দসঙ্কেত (phonetic formula) ও এই নির্দেশ দেয়। অন্ত্যস্পর্শবর্ণ যে 'ম' তদ্‌দ্বারা সূচিত হয় সেই 'তল' যেখানে স্পর্শ, কিনা স্ফুটবৃত্তি (manifest function) যাইয়া অস্ফুটে (un-manifest-এ) লীন হইতেছে; নিমীলনের স্থান। এই নিমিত্ত মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতি প্রণবের 'ম'কারকে সুষুপ্তির স্থানরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। তারপর, 'ঋ' বা 'র' মূর্দ্ধন্য। 'শ' তালব্য। এ দুয়ের দ্যোতনাও স্পষ্ট। যেটি নিমীলিত সেটিকে উন্মীলনের নিমিত্ত কোনও ঊর্দ্ধতম এবং সাধিষ্ঠ (Highest, Supreme) 'ধাম' হইতে 'মূল প্রচোদনা' (Original Urge-টি) আসা একান্ত আবশ্যক। সেটি ঈক্ষণাদি যাই বল না কেন। ব্রহ্মবস্তুর তাপসী তনু এটি। ইহা দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত, নিমীলিত সেটি উন্মেষের নিমিত্ত যেন জাগিয়া ওঠে, ফুলিয়া ওঠে—'চীয়তে'। কেবল একটিবার সৃষ্টির গোড়ায় নয়, নিখিল বিকাশের মুখেই এই 'মূর্দ্ধন্যধাম'টি ('র' = অগ্নি) অতন্দ্রিত সজাগ এবং সক্রিয়। আমরা ব্যক্তমধ্যমাত্রদর্শী, তাই ভাবি—কমল ফুটিল ঐ দিবাকরকরে। কিন্তু দিবাকর ফুটিতেছে—দেদীপ্যমান হইতেছে কার করে? সবিতার আদি বরেণ্য ভর্গঃ পর্যন্ত যাইতেই হইবে। সেটিকে ধীমহি—ধ্যান করিতেই হইবে। কেননা, মূল প্রচোদয়িতা সেই ভর্গঃই, অপর কিছু নয়। মাঝখানে কিছু মনে করিলে, শিকলের মাঝখানের একটা আংঠা চাপিয়া ধরিলাম মাত্র। শেষ পর্যন্ত, তাঁরই প্রেরণা, ইচ্ছা অথবা লীলা কৈবল্য এই রকমের একটা কিছু বলা ছাড়া উপায় নেই। শেষকালে, 'শ'। এটিতে কি বুঝায়? কোনও ('ক') (appropriate) কেন্দ্রগীকরণ কুশল তলে (যথা, Concave mirror দ্বারা আলোক, তাপ, ধ্বনি প্রভৃতির তরঙ্গ) 'মূর্দ্ধন্যধাম সন্ততি' (Descending 'Cloud' of charge radiation)-টিকে 'কেন্দ্রীণ' (nuclear), 'ধারা' (canalized) ইত্যাদিরূপে পাইতে হয়। এটিও সার্বভৌম বিধান, ব্যভিচার নেই। তালু ('তল' শব্দটার

সঙ্গে এর 'অন্বয়'টি কর), প্রাণপ্রযত্ন দ্বারা 'অভিহিত' (acted upon) হইয়া তদীয় প্রতিক্রিয়া (reaction)-টি উক্ত আকৃতিতে (pattern-এ) করিয়া থাকে। সুতরাং তালুকে তলাইয়া বোঝ। ওষ্ঠ, দন্তাদিকে আগেই আমরা বুঝিতে যত্ন করিয়াছি। ভবিষ্যতে আরও বিশেষভাবে। 'বিমর্শ' শব্দের একটা মৌলিক বিশ্লেষণ এখানে মিলিল।]

(১৭)

মূর্দ্ধন্যা ও লম্বগা বৃত্তি। উভয়ের অপেক্ষা

তারপর, ঐ কারিকাটিতে 'লম্বগা' পদটি রহিয়াছে। মূর্দ্ধন্যাই তো তালব্যকে লইয়া কাজ হাঁসিল করিবেন; তবে আবার এটি কেন? এটিও চাই। মেঘের বিদ্যুৎ মাটিতে পড়িবে, কিন্তু মাটির বিদ্যুৎকে তার পানে ঠেলিয়া উঠিতে হয়। এটিও সার্বভৌম বিধান। তোমার ওপর কোন রূপ 'সমর্থ' ক্রিয়া হইতে গেলেই তোমারও 'প্রস্তুতি' বলিয়া একটা অবস্থায় থাকা চাই অথবা আসা চাই। 'অনুগ্রহের' ঠিক সাড়াটি মিলাইতে 'আগ্রহ' চাই; দীক্ষার নিমিত্ত শ্রদ্ধা চাই। ঐ প্রস্তুতিটিকে 'প্রবণতা' (proneness) বলিতেও পার। বীজ পুঁতিলেই তো গাছ হয় না। তারও 'নাভি' থেকে একটা আবেগ বা সংবেগ কোনো-না-কোনো আকারে উত্থিত হওয়া চাই, এবং সেটি পূর্বকথিত মূর্দ্ধন্যধামের ধারায় মিলিত হওয়া চাই। 'পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ'। গঙ্গাজী তো হরজটাজাল থেকে অবতরণ করিবেন, কিন্তু ভগীরথকে তপস্যাটি করিতে হইবে। শঙ্খবাদন পূর্বক আগে আগে চলিতেও হইবে। জড়ে, প্রাণে সর্বত্র এই নিয়ম। আচ্ছা, ভগীরথের তপস্যাটি ঐ-যে মূর্দ্ধন্যধামনিঃসৃত ধারা, তার 'বাহিরে', 'অতিরিক্ত' অপর একটা কিছু? অর্থাৎ, ব্রহ্মের যেটি তপঃ, আর যেটি ভগীরথের, সে দুয়ের সম্বন্ধটা কি? সরাসরি উত্তর দেওয়া—এক, অথবা দুই, অথবা 'মাঝামাঝি' (দ্বৈতাদ্বৈত)—সহজ হইবে না; এখানে তার চেষ্টাও করিব না। ভবিষ্যতে একটা হদিস মিলিতে পারে। বস্তুতঃ যাই হোক, ব্যবহারতঃ 'দুই' করিয়াই দেখিতে হইতেছে। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানে বিপুল 'কসমিক রেজ'গুলিকে এটম্-নিষ্ঠ এনার্‌জির সঙ্গে ঠিক কোন্ সম্পর্কে জুড়িব তা বুঝিতে না পারিয়াও তাদের আলাদাভাবেই হিসাব লইতেছি এবং কাজে খাটাইতেছি। এই নজিরে 'মূর্দ্ধন্য' এবং লম্বগ'কে আলাদা করিয়াই দেখান হইতেছে। এতৎপ্রসঙ্গে নীচের এই কারিকাটি ভাবনা কর:—

স্বয়ং যে ব্যক্তি অবর (কাপর্ণ্যদোষাদি দ্বারা উপহত স্বভাব) সে ব্যক্তি কি আত্মা কর্তৃক 'বৃত' হয়? 'নিষ্কৈতব অকিঞ্চন' কে অবর মনে করিও না

জটাজালান্তঃস্থা ন বহতি ভুবীহত্রিপথগা
বিনা শঙ্খধ্মাতং সগরকুলচূড়ামণিমুখাৎ।
দুহানা ক্ষ্মা নো চেদ্ গগনতড়িতঃ কুত্র কুলিশী
দিবোঽপাং মুক্ত্যৈ বা ক্বচিদবরমাত্মা ন বৃণুতে॥৩৬

গঙ্গাজী তো ত্রিপথগা, কিন্তু হরজটাজালাবগুণ্ঠিতা হইয়া তিনি এই ভূতলে তো বহমানা হইবেন না, যতক্ষণ না (কৃত কৃচ্ছ্র তপাঃ) সগরকুলতিলক ভগীরথ শংখধ্বনি করিয়া তাঁকে (পরমাগ্রহে) আবাহন না করিতেছেন। আবার, ক্ষ্মা (পৃথ্বী) যতক্ষণ না গগনাবলম্বী জলদপটলের তড়িৎরাশি স্বয়ং না দোহন (আকর্ষণ) করিতেছেন, ততক্ষণ কোথায় থাকেন বুন্ধপর্জ্জন্য-বারিকে (দিবঃ অপাং) মুক্তিদাতা সেই কুলিশ (বজ্র)-ধারী দেবতা? সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং 'অবর' (কার্পণ্যদোষাদি দ্বারা উপহত স্বভাব, কাজেই পরম শ্রেয়োরূপ বরের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত এবং সাধনতৎপর নয়) তাকে (সেই শ্রুতি প্রসিদ্ধ) আত্মা কুত্রাপি বরণ করেন না ('যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ')। দৃষ্টান্ত পুনশ্চ—

(১৮)

স্থিতে পারাবারে সুবিপুলমহিম্নি ক্বচিদপি কিং
মরৌ কশ্চিৎ তৃষ্ণা-বিধুর-মৃতি-ভাগ্যং ন ভজতি।
ন চেদ্ ভানুঃ সিন্ধুং প্রতপতিময়ূখৈর্জলমুচো
ন বা সিঞ্চন্ত্যম্বু প্রসরতি সরিৎ কিং ঝরমুখাৎ॥৩৭
কৃপাসিন্ধোর্নাপো গুরুরবিমৃতে যন্তি জলদং
ত্রয়ীসন্দোহাঢ্যং ন সরতি ঝরী বাঙ্মৃতগিরাম্।
পিপাসার্ত্তাঃ কে বা ভবমরুমৃষাবারিমৃগণাং
বিহায়াসেবেরন্ ন চির-করুণা-স্নিগ্ধ-শমথম্॥৩৮

শ্রীগুরুর মাধ্যমিকতা—ইহা ব্যতীত সেই পরম বস্তুটির সঙ্গে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ স্থাপিত হবার নয়

মহাবারিধি কোথাও না কোথাও আপন বিপুল মহিমায় অবশ্যই বিরাজমান রহিয়াছে; তথাপি কেহ কি মরুমাঝারে নিদারুণ তৃষ্ণাকাতর মৃত্যু ভাগ্যই ভজনা করিতেছে না? (আবার কেহ বা দৈবাৎ সিন্ধুতটে উপনীত হইয়াও ভাগ্যদোষে সেটির অপেয় লবণাম্বুরাশি রূপেই পরিচয় পায়—as Blind, Brute Cosmic Destiny.) দিবাকর যদি ঐ সিন্ধু বারিরাশি তাপিত এবং আকৃষ্ট করতঃ স্বাদুসলিলগর্ভা মেঘমালা সৃষ্টি না করে, এবং সেই জলদজাল যদি ধরণীতলে স্নিগ্ধ বারিধারা বর্ষণ না করে, তবে কেমন করিয়া বল—গিরিনির্ঝর মুখে মধুর তোয়া সরিৎ-ই বা তৃষ্ণাদি সন্তাপ দূরীকরণে ছুটিয়া আসিতে পারে?

এইবার দৃষ্টান্ত থেকে দার্ষ্টান্তিকে যাইতে যত্ন কর। বিশ্বজনীন কৃপাসিন্ধু (শ্রীভগবানের অনুগ্রহশক্তি) তো সমন্তাৎ ব্যাপ্ত আছেনই; কিন্তু অস্মদাদির বৈমুখ্যবশতঃ সেটি প্রায়শঃ শুধু যে অগোচর এমন নয়, বিপরীত ভাবেও গোচর। সেই অসীম কৃপারাশি স্বয়ংই ঘনীভূত, কেন্দ্রগ হইয়া 'গুরুরবি'রূপে সমুদিত হয়েন। তখনই মহাসমুদ্রের অনবগাহ বারিরাশি মেঘরূপতা প্রাপ্ত হয় (জলদং যন্তি)। কিরূপ সে জলদ? নিখিল কর্ম-উপাসনা-জ্ঞানকাণ্ডের 'সুরভিরূপা' যে ত্রয়ী (বেদ), তাঁর যেটি 'সন্দোহ'—সম্যক সারবস্তু, তদ্‌দ্বারা 'আঢ্য', কিনা, সমৃদ্ধ জলদরূপতা প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ তখনই সে মেঘ হইতে জীবের চতুর্বর্গাদি বর্ষণ সম্ভাবিত হইয়া থাকে, তৎপূর্বে নয়। আর, সেটি না হইলে অমৃত-অভয়বাণীর যে 'ঝরী' (নির্ঝর), সেটিও (শ্রীমুখে) উৎসারিত হয় না। সকলেই তো পিপাসাকাতর এই ভবমরুভূমেই মিথ্যা মরীচিকার পাছেই ধাবমান (ভবমরুমৃষাবারি—তারই মৃগণা, কিনা অন্বেষণে, ব্যস্ত), কিন্তু এই নিদারুণ মৃষাবারিমৃগণা পরিহার করতঃ (বিহায়) কারাই বা চাহিবে না সর্বতোভাবে সেবা করিতে (আসেবেরন্) সেই (শ্রীগুরুর) চিরকরুণাস্নিগ্ধ শান্তিধাম? ('শমথ' = শান্তি = বাশিষ্ঠে কথিত 'অন্তঃশীতলতা')। করুণা শব্দের পূর্বে 'চির'টিকেও ভালমতে চিনিও।

শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধন সরণি। ষট্‌সম্পত্তি

'মূর্দ্ধন্যা' এবং 'লম্বগা' দুয়ে যে 'হাতে হাতমিলানো' চাই, এই তথ্যটি নিবেদনের জন্যই ওপরের ঐ কয়টি কারিকা। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার বিচারে আচার্যবর্গের কেহ কেহ শমদমাদি ষট্ সম্পত্তির কথাও বলিয়াছেন। ঐগুলি সাধন চতুষ্টয়ের অন্তর্গত। এ সবের সাহায্যে ঐ লম্বগা এবং মূর্দ্ধন্যার 'হাতে হাত মিলাইয়া' লইতে হয়।

বহির্দ্বারি দ্বৌ যৌ ব্যবসিতধিয়ৌস্তঃ প্রহরিণৌ
বিজিজ্ঞাসস্ব কিং কুশলমভিতস্তৌ শমদমৌ।
ততঃশ্রদ্ধাবিদ্যে উপনিষদিনিষ্ঠা মতিমতাং
ধ্রুবং বেদান্তান্তঃ সমধিগমনং বো বিদধতু॥৩৯

বাহির দুয়ারে যে দুটি স্থিরবুদ্ধি প্রহরী রাখিয়াছ, তারা শম আর দম। পুরে প্রবেশের আগে তাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা কর—চারিদিকে সব কুশল তো? 'কিং কুশল মভিতঃ'। তারা দুজনে বাইরের সব উপদ্রব ঠেকাইয়া রাখিতে পারিয়াছে তো? 'ততঃ'—তাদিগকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসার পর—বিদ্যা, শ্রদ্ধা আর উপনিষৎ (তাহাতে নিষ্ঠা) নাম্নী তিনজন অন্তঃপুর প্রহরিণীকে প্রসন্ন করিবে (এঁদেরি নামান্তর শ্রদ্ধা, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান)। তাঁরা তিনজনে প্রসন্ন হইলে তোমরা 'মতিমান্' হইবে। মতিমান্ না হইলে তো সর্বশ্রুতিশিখা যে বেদান্ত—যে বেদান্ত তোমাদের স্বরূপাববোধক মহাবাক্য শোনাইবেন—তিনি তাঁর 'অন্তঃ' কিনা অভ্যন্তর ভাগে, নিগূঢ় লক্ষ্যার্থে, তোমাদের 'সমাধিগমন' (শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনপূর্বক সাক্ষাৎকার, অথবা উত্তমাধিকার স্থলে, শ্রবণ মাত্রেই সাক্ষাৎকার) হইতে দিবেন না। অতএব, শমদম সুরক্ষিত 'কুশল', 'ভদ্র' হইয়াই ব্রহ্মান্তঃ পুর দ্বারে উপনীত হও; সেখানে শ্রদ্ধা, বিদ্যা, উপনিষদের উপাসনাপূর্বক বিরজাঃ মতিমান্ হও; এবং ঐ তিনজন অন্তঃপুর দ্বার রক্ষী (সন্ধি সমন্বয়পূর্বক) তোমাদের নিঃসংশয় (ধ্রুবং) 'বেদান্তান্তঃ সমাধিগম' এর উপায় সুষ্ঠুরূপে বিধান করুন (বিদধতু)।

ষট্ সমুচ্চয়

যাবৎ জপাদিসাধন 'উপাসনা কাণ্ডে' বর্তমান ততক্ষণ উক্ত ষট্‌সম্পত্তি বলিয়া কেন,

ষট্ সমুচ্চয়াদিও আবশ্যক। 'সমুচ্চয়' মানে কোনও একের দ্বারা অপরের সম্যক 'উচ্চয়' (heightening of efficacy, 'cumulative effect') সংসাধন। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের, ভাবের দ্বারা ভাবের, জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের—এই তিনটি সদৃশ সমুচ্চয় ব্যতীতও ঐ তিনের আবার পরস্পর তিনটি অন্যোন্য সমুচ্চয়ও আছে। (শারীরকাদির জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় বিচার অবশ্য উপাসনা স্তরে প্রযোজ্য নয়।) ভূরাদি ব্যাহৃতি সপ্তক প্রত্যেকে এবং সম্মিলিতরূপে সংবাদী, সমুচ্চয়ী, সমন্বয়ী (ঋগ্‌বেদের সেই প্রসিদ্ধ 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' ইত্যাদির 'বীজ'রূপে অনুবাদ rendering). এ কথাগুলি ক্রমে ভালো করিয়া বুঝা যাইবে। যজ্ঞরূপেও এই ত্রিবেণীকে সমাশ্রয় কর।

যাগায়াননলী বনেচরগৃহাৎ কোঽগ্নীন্ধনং চায়য়েন্
নো চিন্বন্ সমিধো বনাৎ কিমনলী যজ্ঞাগ্নিমুদ্দীপয়েৎ।
কাষ্ঠে সত্যনলে চিতেঽপি হবিষা হব্যং চেদাহুতং
যত্নেনালমত স্ত্রিবেণিমিহি ভো ইজ্যং বিভর্ত্তুং ত্রিভিঃ ॥৪০

সমুচ্চয়ের নির্দেশ যাগানুষ্ঠানের দৃষ্টান্তে। সমিধ্,
অগ্নি, হবিঃ—এই ত্রিপুটী

যে ব্যক্তি যাগানুষ্ঠান করিবে, তার যদি অগ্নি না থাকে, অথবা সে অগ্নি চয়ন করিতে অসমর্থ হয় (অননলী), বনচরসঙ্কুল কান্তার হইতে (রাশি রাশি) অগ্নির ইন্ধন (কাষ্ঠ) আহরণ করাইতে প্রবৃত্ত হইবে কেন? আবার যে ব্যক্তির অগ্নি মিলিয়াছে (অনলী), সে যদি বন হইতে যথেষ্ট সমিধ্ আহরণে অপারগ হয় তবে, সেই বা তার যজ্ঞাগ্নি সম্যক্ উদ্দীপিত করিবে কি প্রকারে? পুনশ্চ, কাষ্ঠও রহিয়াছে (সতি), অগ্নিও মিলিয়াছে (চিতে), তথাপি হবনীয় সামগ্রী আহুতি দিবার নিমিত্ত আবশ্যক হবিঃ যদি না থাকে, তবে তো সকল যত্নই নিষ্ফল (যত্নেনালং) হইয়া পড়ে। সুতরাং (অতঃ), হে ইষ্টিকাম! (ভোঃ) 'ত্রিবেণিমিহি'—ত্রিবেণি তীর্থে যাও। কেন যাইবে? তোমার ইজ্য, কিনা, যাগ, ঐ তিনের দ্বারা 'ভরণ' করার স্থান ঐ ত্রিবেণী তীর্থ (ইজ্যং বিভর্ত্তুং ত্রিভিঃ)। সে তীর্থে সমিধ্ অগ্নি এবং হবিঃ—এ তিনই একত্র সমাহৃত। ঐ ত্রিবেণীকে ত্র্যক্ষর (প্রণব এবং প্রণবের ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্রা এই তিন ভূমি), বিদ্যা-শ্রদ্ধা-উপনিষৎ, যোগ-ভক্তি-জ্ঞান ইত্যাদি অভীষ্টরূপে ভাবনা

করিও। ধর, রাশি রাশি 'কর্ম' করিয়া যাইতেছ, কিন্তু ভাব ভক্তিরূপ হবিঃ আর নির্মল ঔপনিষদ জ্ঞানরূপ অগ্নি যদি না থাকে তো কর্মের অসহনীয় 'বোঝাই' বাড়িয়া চলিল। পক্ষান্তরে, ভাবকে এবং জ্ঞানকে নিষ্কাম কর্মযোগে শুদ্ধ আধারেই ধারণ এবং ভরণ করিতে হইবে। ভূরাদি ব্যাহৃতিতে ঐ ত্রিবেণী বিরাজমানা জানিও।

'ভূঃ' ব্যাহৃতির বর্ণ ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট

লম্বগার এক বিশিষ্ট রূপ ব্যষ্টি কুণ্ডলিনীর উত্থান এবং মূর্দ্ধন্যার সমষ্টি অথবা মহাকুণ্ডলিনীর অবতরণ। এ দুয়ে মিলাইতে হয়। না মেলা পর্যন্ত মাধ্যমিক 'বিষ্ণু গ্রন্থি'টির উন্মোচনটি হবার নয়। এ প্রসঙ্গও পরে বিস্তারিত হইয়াছে। অনুষ্টুপে পূর্বোক্ত তিনটি কারিকার প্রথমটির অর্থ পরিস্ফুট হইলঃ—"চিচ্ছক্তি প্রাণ প্রযুক্তা হইয়া ব+হ = ভ্ রূপ ধরিলেন; 'উ' বর্ণ দ্বারা 'লম্বগা' হইলেন, এবং 'র' 'মূর্দ্ধন্যা'তে সম্মিলিত হইয়া 'ভূঃ'—এইরূপে আপনাকে ব্যাহরণ করিলেন। এই ব্যাহরণের ফলে 'অয়ং' এই প্রথম খ্যাতি (প্রত্যয়) টি সম্ভাবিত হইল।"

(১৯)

জপযজ্ঞ কিভাবে ভাবনা করিবে? প্রণবজপের দৃষ্টান্ত। অর্দ্ধমাত্রা হবিঃ

প্রণব সাধনায় যে তিনটি (অবম, মধ্যম বা সেতু এবং পরম) 'পর্ব', সেই তিনটিকে, অর্থাৎ ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা এবং অমাত্রা, এই তিনকে মিলাইয়া 'জপযজ্ঞ' নিম্নোক্তরূপে ভাবনা করঃ—

জপং স্ত্রিস্ত্রোমাত্রাঃ প্রণবজপযজ্ঞেষু সমিধো
মনোবাক্যপ্রাণাটবিচয়নাৎ কাম মবহঃ।
ন চেদর্দ্ধামাত্রাহ্ ভবদপি হবিস্তে কিমকরো
রমাত্রং তচ্ছান্তং জিগমিষুরনাজ্যাহুতভুজা॥৪১

প্রণবজপযজ্ঞকারী তুমি তো অ, উ, ম্ এই তিনমাত্রা বহুশঃ জপ করিয়া বাক্, প্রাণ এবং মনের গহনাটবী (অব্যক্ত স্পন্দ বা সংস্কারভূমি) হইতে বাছিয়া বাছিয়া

(চয়নাৎ) যথেষ্ট (কামং) সমিধ্ (জপসংস্কার রাশি) বহিয়া আনিয়াছিলে (অবহঃ)। কিন্তু (ভুলিয়াছ কি) তোমার পরম গম্যধামটি কি এবং কোথায়? সেটি তো এই অমাত্রম্-মাত্রাতীত, যেটিকে শ্রুতি এবং আত্মপ্রত্যয় 'শান্তং শিবমদ্বৈতং প্রপঞ্চোপশমম্' রূপেই জানিয়াছেন? সেই ধামে গমনেচ্ছু (জিগমিষু) তুমি (তোমার যজ্ঞ সমাপনের নিমিত্ত) কিই বা করিয়াছিলে (কিমকরোঃ), যদি না সম্পুটিত নাদবিন্দুরূপা (বিশেষতঃ অনুচ্চার্যা) স্বয়ং অর্দ্ধমাত্রা (তোমার সেই যজ্ঞে) হবিঃ রূপে আপনাকে কল্পিত করিয়া থাকেন (অভবদপি হবিঃ); অর্থাৎ অর্দ্ধমাত্রা স্বয়ং যদি সন্ধি ও সেতুরূপা হইয়া, একদিকে তোমার সংগৃহীত সমিধ্‌রাশি (ক্রিয়াদি সংস্কার বাক্ প্রাণ এবং মন এ তিন হইতেই সংগৃহীত) এবং তোমার সঞ্চিত অগ্নি (অধীতবিদ্যা, পরোক্ষজ্ঞান, ইত্যাদি) আর অপরদিকে যজ্ঞশেষামৃতরূপ যে শান্ত স্বরস আত্মার অপরোক্ষানুভূতি— এ দুটিকে সম্যক্ যোজনা না করিয়া দেন? সুতরাং, অর্দ্ধমাত্রা রূপ হবিঃ অলব্ধ বা অলভ্য হইলে, কেবল ত্রিমাত্রের সমিধ্‌রাশি লইয়া আজ্যহীন অগ্নিতে হবন করিয়া (অনাজ্যাহুতভুজা) 'অমাত্র' রূপ সেই পরমভূমি তো কোনোক্রমে লাভ হইবে না! ভাবরসের দিক দিয়াও জপযজ্ঞের ভাবনা অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

আদিব্যাহৃতি ভূঃ (অয়ং প্রত্যয়) রূপে সৃষ্টিযজ্ঞ ভাবনা

আদ্যিব্যাহৃতি 'ভূঃ' রূপে সৃষ্টিযজ্ঞটিকে এইরূপে ভাবনা করঃ—

বনং কিং স্বিৎ তস্যৈ ভুবনরচনায়ৈ মখকৃতে
কিমাধারা ধত্তে সমিধ ইহ বেদিঃ প্রথমতঃ।
কুতো বা যজ্ঞীয়ারণিমিথুনমথোঽস্ত্যনলচিদ্
হবির্বা হব্যং বাঽয়মিতি মিতিভৃদ্ ভূরিতি বিনা॥৪২

ঋগ্‌বেদাদি যেন সংশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—সে কোন্ বন, যেটি আদি মখকারীর নিমিত্ত (মখকৃতে) কল্পিত হইয়াছিল? কেন হইয়াছিল? তিনি তাহা হইতে তাঁর যজ্ঞের সমিধ্ আহরণ করিবেন বলিয়া। কেনই বা সে যজ্ঞ? সেই আদিম ভুবন রচনার নিমিত্ত। আচ্ছা, সমিধ মিলিল, কিন্তু বেদি কোন্ আধারে কল্পিত হইবে? ভুবনের যেটি আধারবেদি তাতে ভুবনযাগের উপকরণ সমিধ্‌সমূহ না হয় রহিল; কিন্তু

সে আধারবেদিটি স্বয়ং রহিবে কোন্ আধারে? (অনবস্থা বলিতে তো চলিবে না, আধার, নিদানে একটা তো চাই-ই!) তৎপরে, যজ্ঞীয় অরণিমিথুন মন্থন কর্মটি করিয়া অগ্নিচয়নও তো করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অগ্নিচয়নকারী সে মন্থনদণ্ড (মন্থ) কোথায় আছে জান? [অর্থাৎ, গোড়ায় যে মিথুনীভাব—Primordial polarisation—সেটিকে মন্থন (co-evolving) এর নিমিত্ত কোনও এক 'সমর্থ উপায়' অবশ্যই কল্পিত হইয়াছিল, কিন্তু সেটি রহিয়াছে কোথায়? অথবা আসে কোথা হইতে?] শুধুই কি তাই? মূল হবিঃ এবং হব্যই বা রহিয়াছে কোথায়? আসিতেছেই বা কোথা হইতে? এ সকল কয়টি জিজ্ঞাসার এক সঙ্গে উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয়, 'অয়ং' এই প্রত্যয়ের বীজভূত যে 'ভূঃ' নামক অব্যয় আদিম ব্যাহৃতি, সেটি বিনা ঐ সকল কিছুই সম্ভাবিত হয় নাই। কোনও অব্যক্ত, অব্যাকৃত সত্তাশক্তি যতক্ষণ আপনাকে 'এই যে' বলিয়া হাজির না করিতেছে, ততক্ষণ (উপাদান হইয়াও) কার্যতঃ সেটি 'উপকরণ' (বন এবং সমিধ্) হয় না; 'এই যে' রূপে প্রতিভাত না হওয়া পর্যন্ত 'অধিষ্ঠান' ও ঠিক 'আধার'টি হয় না; আবার 'এই যে' রূপে প্রকট কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত কোনও সম্ভাব্যতাই (Potentiality) ব্যক্ত, সমর্থ 'উপায়' (means, instrument) হয় না; আবার পরিশেষে, হবিঃ এবং হব্য (প্রাণ ও প্রাণীয়, নাদ ও ধ্বনি, Energy and Mass, Power and Pursuit, ইত্যাদি)—এভাবে উদ্ভূত (evolved) হইতে গেলেও চাই—'এই যে'। সুতরাং, দেখিতেছি যে 'অয়ং' বা 'এই যে' রূপে আবির্ভাব এবং 'মিতি'ই (measure, manifestation) সমস্ত কিছু বিশিষ্ট উদ্ভবের আদিতে। এইটিকে 'ভূঃ' বলিয়া জানিবে। এবম্প্রকার মৌলিকত্ব নিবন্ধন 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতি গায়ত্রী জপাদি সর্ববিধ যজ্ঞে মূলে স্থান পাইয়াছেন।

'মূর্ধন্যা' ও 'লম্বগা' কারিকার মর্ম্মার্থ

এইবার আগেকার সেই দুটি ছোট কারিকার মর্মার্থ সম্ভবতঃ সুখবোধ্য হইবে:—ওষ্ঠ্যবর্ণ যে ভকার, সেটি উত্তর এবং অধর ওষ্ঠদ্বয়ে যেন অরণিমিথুনরূপ হইল। (যথা 'ধন' এবং 'ঋণ' রূপদ্বয় ধারণ।) 'লম্বগ' যে উ বর্ণ সেটি অরণিদ্বয়ের মন্থনদণ্ডরূপে কল্পিত হইল (বলাবাহুল্য, এ কল্পনা তোমার আমার নহে।) তার ফলে, 'র'কার রূপে অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া 'অয়ংরূপ অধ্বর যজ্ঞটিকে বিস্তারিত করিল।

'অয়ম্' বর্ণপুট কিরূপে আসিল?

গোড়ায় তো নাদব্রহ্ম প্রণব। তা হইলে এই 'অয়ং' কি? প্রণবের অ, উ, ম, তিনমাত্রার মধ্যে মধ্যমাত্রা যে 'উ', সেটি 'য়' এই আকারে বিবর্তিত হইল। কেন? ব্রহ্মের বায়ুরূপ 'ঈক্ষণে'র ফলে বায়ুবীজ যে 'য' কার, সেটি 'উ'কার স্থলে প্রবিষ্ট হইল। ফলে, 'অউম্' হইল 'অয়ম্'। সুতরাং 'অয়ম্' শব্দটিও রাহস্যিক, এটিকে 'ইদং' শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনমাত্র ভাবিও না। ব্রহ্মের বায়ুরূপ এবং সেরূপে 'ঈক্ষণ'—এ দুটিও বুঝিতে যত্ন কর॥ [প্রথম খণ্ডে উপোদ্‌ঘাতের তৃতীয় শ্লোকটি এবং তার ব্যাখ্যাটি পুনরায় দেখ।]

ব্রহ্মের অক্ষররূপে (হযরাদি) ঈক্ষণ

ব্রহ্মের এইরূপ 'অক্ষর'রূপে ঈক্ষণটি নিম্নোক্ত কারিকায় ভাবনা কর:—

ব্রহ্মত্বং বিয়দঃ শ্রুতে র্নিগমনাদ্ যুক্তেশ্চ ভূতেক্ষণা
দীক্ষাণং হ্যনিলে হুতাশপয়সোর্মহ্যাং কিমান্ধ্যং গতম্।
নাদোঽভূদ্ হযরাদিকাক্ষরবৃষশ্চাক্ষিপ্ত বীজং গবি
বাচং কামদুঘামদুগ্ধ সুরসাং যাগং চিকীর্ষুস্ততঃ ॥৪৩

শ্রুতিসমূহে বিয়ৎ (আকাশ) এর ব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্র এবং তদ্‌ভাষ্যাদিতে যুক্তিদ্বারা উপপাদিতও হইয়াছে। 'ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন', কেবলমাত্র ইহাই যে শ্রুত হইয়াছে এমন নয়। ব্রহ্মের ঈক্ষণের ফলে যাহা জাত হইল (ভূত), সেটিও আবার ঈক্ষণ করিতেছেন—এরূপও কথিত হইতেছে। কাজেই (ভূতেক্ষণাৎ) ঈক্ষণাদ্বারা সূচিত যে ব্রহ্মত্ব সেটি বিয়দাদি সৃষ্টি পরম্পরায় আসিয়াও বাধিত হইতেছে না। কিন্তু প্রশ্ন হয় ব্রহ্মের এই ঈক্ষণ আকাশ, বায়ু, তেজঃ এবং অপ (হুতাশপয়সোঃ)—এ সকলে অবাধিত রহিল বটে, কিন্তু শেষ যে পৃথিবী (মহী), তাতে পৌঁছিয়া সেটি কি 'অন্ধ' হইয়া গেল? অর্থাৎ, পৃথ্বীরূপেও ব্রহ্মের আর ঈক্ষণ নেই? ইহার উত্তর ব্রহ্মের ঐ ঈক্ষণ (জপসূত্রে পূর্বে এবং পরে ব্যাখ্যাত) নিয়ত। ঈক্ষণের বস্তু, ছন্দঃ এবং আকৃতি বিভিন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সামান্যরূপে ঈক্ষণটি সমষ্টি-ব্যষ্টি নিখিল বিশ্বব্যাপারের মূল এবং আধারভাবে রহিয়াছেই। বীজ থেকে

অঙ্কুরটি হইবে—এখানেও সেই ঈক্ষণ। আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়াছি যে ওঁঙ্কাররূপে, মাত্রাপাদকলাকাষ্ঠা এই চারিটি 'পর্বে' একটি বীজেরও বিকাশ ঘটিতেছে। বিকাশটিকে সম্যক্ বুঝিতে গেলে ঐ চারিটি পর্বে (co-ordinates) বিশ্লেষণ করিয়াই বুঝিতে হয়। আচ্ছা, ঈক্ষণোপাধিক ব্রহ্মত্ব এই কর্ম (যোগ) এর নিমিত্ত নাদ হইলেন (অভূৎ)। কিরূপ সে নাদ? হ, য, ব, র, ল—মুখ্যতঃ এই পাঁচ 'অক্ষর' সব কিছুতে, সুতরাং বাক্যে—বাক্‌রূপা গাভীতে (গবি)—রেতঃ অথবা বীজরূপে নিষেকের নিমিত্ত বৃষস্বরূপ (হযরাদিকাক্ষর বৃষঃ)। নাদ বৃষরূপে কি করিলেন? বাক্‌রূপা যে গো, তাতে (উক্ত হকারাদি) বীজ প্রক্ষেপ করিলেন (অক্ষিপ্ত বীজং)। তার ফলে, বাক্ কামদুঘা সুরসা হইলেন। অতঃপর যাগটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় (যাগং চিকীর্ষুঃ) সেই গাভীকে দোহন করিলেন (অদুগ্ধ)।

বিয়দাদি এবং সে সকলের বীজ সর্বত্র অনুস্যূত

রহস্যভাষায় রচিত এই কারিকাটির মর্ম অনুধাবন করিতে যত্ন কর। বিয়দাদি ঐ পাঁচটি তত্ত্ব প্রত্যেকেই ব্রহ্মের ঈক্ষণেরই বিশেষ বিশেষ রূপ। হযরাদি উহাদের 'স্বাভাবিক শব্দ' বা বীজ। বিয়দাদি মূল উপাদানরূপে সৃষ্টির সর্বত্র (বাহ্য এবং আন্তর) অনুপ্রবিষ্ট; তাদের বীজসমূহও তদ্রূপ বাকে এবং বাঙ্ময় প্রপঞ্চে অনুস্যূত। ফলে, প্রত্যেক বাকেই (ব্যক্ত বা অব্যক্ত আকারে) ঐ বীজ পঞ্চকের উপাদান এবং নিমিত্ত (material & agency) উভয়রূপেই সত্তা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। যে মন্ত্রই জপ কর, সেটিকে আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বে এবং হকারাদি শব্দাবয়বে বিশ্লেষণপূর্বক জানিতে হইবে। জপটি কোন্ তত্ত্বপ্রধান এবং কোন্ বীজাক্ষরপ্রধানরূপে হইতেছে, সেটি জানা আবশ্যক। এক এক তত্ত্বের প্রাধান্যে লক্ষণাদি এক এক প্রকার হইয়া থাকে।

বীজমন্ত্রে উদাহরণ

'হংসঃ', 'হৌংসঃ' 'হৌং', 'হুং', 'হূং'—ইত্যাদিতে 'হ'কে সাক্ষাৎ আধারভাবে পাই বটে, তত্রাপি জপকর্মে আকাশ তত্ত্বেরই যে প্রাধান্য, এমন নাও হইতে পারে। যেমন, H এবং O জলের উপাদান বটে, কিন্তু দুয়েরি ধর্ম উক্ত সংযোগে যেন তিরোহিতই হইয়াছে; নূতন কতকগুলি ধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে। কাজেই, হকারাদি কোনও মন্ত্র

'অয়ম্' বর্ণপুট কিরূপে আসিল?

গোড়ায় তো নাদব্রহ্ম প্রণব। তা হইলে এই 'অয়ং' কি? প্রণবের অ, উ, ম, তিনমাত্রার মধ্যে মধ্যমাত্রা যে 'উ', সেটি 'য়' এই আকারে বিবর্তিত হইল। কেন? ব্রহ্মের বায়ুরূপ 'ঈক্ষণে'র ফলে বায়ুবীজ যে 'য' কার, সেটি 'উ'কার স্থলে প্রবিষ্ট হইল। ফলে, 'অউম্' হইল 'অয়ম্'। সুতরাং 'অয়ম্' শব্দটিও রাহস্যিক, এটিকে 'ইদং' শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনমাত্র ভাবিও না। ব্রহ্মের বায়ুরূপ এবং সেরূপে 'ঈক্ষণ'—এ দুটিও বুঝিতে যত্ন কর॥ [প্রথম খণ্ডে উপোদ্‌ঘাতের তৃতীয় শ্লোকটি এবং তার ব্যাখ্যাটি পুনরায় দেখ।]

ব্রহ্মের অক্ষররূপে (হযরাদি) ঈক্ষণ

ব্রহ্মের এইরূপ 'অক্ষর'রূপে ঈক্ষণটি নিম্নোক্ত কারিকায় ভাবনা কর:—

ব্রহ্মত্বং বিয়দঃ শ্রুতে র্নিগমনাদ্ যুক্তেশ্চ ভূতেক্ষণা
দীক্ষাণং হ্যনিলে হুতাশপয়সোর্মহ্যাং কিমান্ধ্যং গতম্।
নাদোঽভূদ্ হযরাদিকাক্ষরবৃষশ্চাক্ষিপ্ত বীজং গবি
বাচং কামদুঘামদুগ্ধ সুরসাং যাগং চিকীর্ষুস্ততঃ॥৪৩

শ্রুতিসমূহে বিয়ৎ (আকাশ) এর ব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মসূত্র এবং তদ্‌ভাষ্যাদিতে যুক্তিদ্বারা উপপাদিতও হইয়াছে। 'ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন', কেবলমাত্র ইহাই যে শ্রুত হইয়াছে এমন নয়। ব্রহ্মের ঈক্ষণের ফলে যাহা জাত হইল (ভূত), সেটিও আবার ঈক্ষণ করিতেছেন—এরূপও কথিত হইতেছে। কাজেই (ভূতেক্ষণাৎ) ঈক্ষণাদ্বারা সূচিত যে ব্রহ্মত্ব সেটি বিয়দাদি সৃষ্টি পরম্পরায় আসিয়াও বাধিত হইতেছে না। কিন্তু প্রশ্ন হয় ব্রহ্মের এই ঈক্ষণ আকাশ, বায়ু, তেজঃ এবং অপ (হুতাশপয়সোঃ)—এ সকলে অবাধিত রহিল বটে, কিন্তু শেষ যে পৃথিবী (মহী), তাতে পৌঁছিয়া সেটি কি 'অন্ধ' হইয়া গেল? অর্থাৎ, পৃথ্বীরূপেও ব্রহ্মের আর ঈক্ষণ নেই? ইহার উত্তর ব্রহ্মের ঐ ঈক্ষণ (জপসূত্রে পূর্বে এবং পরে ব্যাখ্যাত) নিয়ত। ঈক্ষণের বস্তু, ছন্দঃ এবং আকৃতি বিভিন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু সামান্যরূপে ঈক্ষণটি সমষ্টি-ব্যষ্টি নিখিল বিশ্বব্যাপারের মূল এবং আধারভাবে রহিয়াছেই। বীজ থেকে

অঙ্কুরটি হইবে—এখানেও সেই ঈক্ষণ। আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়াছি যে ওঁঙ্কাররূপে, মাত্রাপাদকলাকাষ্ঠা এই চারিটি 'পর্বে' একটি বীজেরও বিকাশ ঘটিতেছে। বিকাশটিকে সম্যক্ বুঝিতে গেলে ঐ চারিটি পর্বে (co-ordinates) বিশ্লেষণ করিয়াই বুঝিতে হয়। আচ্ছা, ঈক্ষণোপাধিক ব্রহ্মত্ব এই কর্ম (যোগ) এর নিমিত্ত নাদ হইলেন (অভূৎ)। কিরূপ সে নাদ? হ, য, ব, র, ল—মুখ্যতঃ এই পাঁচ 'অক্ষর' সব কিছুতে, সুতরাং বাক্যে—বাক্‌রূপা গাভীতে (গবি)—রেতঃ অথবা বীজরূপে নিষেকের নিমিত্ত বৃষস্বরূপ (হযরাদিকাক্ষর বৃষঃ)। নাদ বৃষরূপে কি করিলেন? বাক্‌রূপা যে গো, তাতে (উক্ত হকারাদি) বীজ প্রক্ষেপ করিলেন (অক্ষিপ্ত বীজং)। তার ফলে, বাক্ কামদুঘা সুরসা হইলেন। অতঃপর যাগটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় (যাগং চিকীর্ষুঃ) সেই গাভীকে দোহন করিলেন (অদুগ্ধ)।

বিয়দাদি এবং সে সকলের বীজ সর্বত্র অনুস্যূত

রহস্যভাষায় রচিত এই কারিকাটির মর্ম অনুধাবন করিতে যত্ন কর। বিয়দাদি ঐ পাঁচটি তত্ত্ব প্রত্যেকেই ব্রহ্মের ঈক্ষণেরই বিশেষ বিশেষ রূপ। হযরাদি উহাদের 'স্বাভাবিক শব্দ' বা বীজ। বিয়দাদি মূল উপাদানরূপে সৃষ্টির সর্বত্র (বাহ্য এবং আন্তর) অনুপ্রবিষ্ট; তাদের বীজসমূহও তদ্রূপ বাকে এবং বাঙ্ময় প্রপঞ্চে অনুস্যূত। ফলে, প্রত্যেক বাকেই (ব্যক্ত বা অব্যক্ত আকারে) ঐ বীজ পঞ্চকের উপাদান এবং নিমিত্ত (material & agency) উভয়রূপেই সত্তা রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। যে মন্ত্রই জপ কর, সেটিকে আকাশাদি পঞ্চতত্ত্বে এবং হকারাদি শব্দাবয়বে বিশ্লেষণপূর্বক জানিতে হইবে। জপটি কোন্ তত্ত্বপ্রধান এবং কোন্ বীজাক্ষরপ্রধানরূপে হইতেছে, সেটি জানা আবশ্যক। এক এক তত্ত্বের প্রাধান্যে লক্ষণাদি এক এক প্রকার হইয়া থাকে।

বীজমন্ত্রে উদাহরণ

'হংসঃ', 'হৌংসঃ' 'হৌং', 'হুং', 'হূং'—ইত্যাদিতে 'হ'কে সাক্ষাৎ আধারভাবে পাই বটে, তত্রাপি জপকর্মে আকাশ তত্ত্বেরই যে প্রাধান্য, এমন নাও হইতে পারে। যেমন, H এবং O জলের উপাদান বটে, কিন্তু দুয়েরি ধর্ম উক্ত সংযোগে যেন তিরোহিতই হইয়াছে; নূতন কতকগুলি ধর্ম আবির্ভূত হইয়াছে। কাজেই, হকারাদি কোনও মন্ত্র

পাইলেই সেটি 'আকাশ ধর্মী' ইহা মনে করা চলিবে না। অবয়বী তার অবয়ব সমূহের গুণ বা ধর্ম কেবল সোজাসুজি 'সমষ্টি' করিয়া লয় না। কাজেই 'হংস' মন্ত্রের জাপক হয়তো বা ক্ষিতিতত্ত্বেই রহিয়াছেন। উপযুক্ত ছন্দঃ (মাত্রাদি পরিমাণ, অনুপাত ইত্যাদি) সহকারে সেটিকে ক্রমশঃ উপরের তত্ত্বে ('উদ্ধার এবং চেতনা') তুলিয়া লইতে হইবে। এইরূপ হ্রীঁ বা হ্রৌঁ বীজে 'র' রহিয়াছে দেখিয়াই সরাসরি তাদের 'অগ্নিপ্রধান' বলিলে চলিবে না। ছন্দোবিন্যাসের ভঙ্গীবিশেষে তারা অগ্নিপ্রধান হইবে। এ আলোচনার অনুসরণ বর্তমানে আর করিব না। লক্ষ্য কর যে, প্রণবের 'অউম্' এর মধ্যে 'হ' বা 'য' প্রবিষ্ট হইয়া কেমন ভাবে 'অহম্' বা 'অয়ম্' এই দুইটি বিশিষ্ট 'শাব্দিক আকৃতি' (Functional Pattern) সৃষ্টি করিল। 'হংস' এর মধ্যে প্রণব স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া হইলেন 'হৌংসঃ'। সংযোগের ন্যায় বিয়োগও আছে। যেমন 'হংস' মন্ত্রে 'হ' কার লয় হইয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধমাত্রায় (পূর্বে এবং পরে ব্যাখ্যাত) পর্যবসান প্রাপ্ত হয়। তারপর? ঐ সেতুটির সমাশ্রয়ে পরম অব্যক্ত। 'সোঽহম্' তার 'স' এবং 'হ' ত্যাগ করতঃ 'ওম্' হইয়া যায়। 'গোবিন্দ' 'হরিবোল' ইত্যাদি জপও পরমের বাচক সেই ওঁকারেই লইয়া যায়। পরিণয়ি অন্বয়ি ইত্যাদিক্রমে ছন্দঃই এটি ঘটাইয়া দেয়।

ছন্দের বিরচনী তনু

ছন্দঃ তো পরমেরই 'বিরচনী তনু' (Creative Vehicle & Embodiment)। জপসূত্রের একটা লক্ষণ—'ছন্দো ব্যাকরণং প্রাণানাম্'। ভাব এবং জ্ঞান (উপযুক্ত আকারে) ঐ বিরচন কর্মটি, ঐ প্রাণের ব্যাকরণটি, সৌষ্ঠবের সহিত চালাইয়া লয়। অর্থাৎ, জপাদি ক্রিয়াকে যুগপৎ নামগ, অধ্বগ এবং ধামগ করিয়া লয়। বর্তমান যুগে মেসিনের দ্বারা ব্রেণের নিজস্ব কাজটিও করার প্রয়াস হইয়াছে; কিন্তু অভ্যারোহী জপকর্মের সৌষ্ঠব মেসিনে তৈয়ারি হইবে না; কাজেই, ভাব ও জ্ঞানকে চাপিয়াই ধর। এখন বিবেচনা কর—ভূঃ এই আদিম ব্যাহৃতিতে 'ব, হ, র' এই তিন ব্যক্তভাবে প্রবিষ্ট, আর 'য, ল' এ দুই অব্যক্তভাবে নিহিত আছে। 'ল', লুকাইয়াছে 'র' এর আড়ালে, আর 'য' (ই ঈ অ) 'ঊ' এর আড়ালে। এই 'আড়াল'টিকে ধরিতে হইবে। 'র' 'ল' এর অভেদ কি শুধুই খেয়াল বশতঃ? আর—'ঊ'কে হ্রস্ব না লইয়া দীর্ঘ লইতে যাইয়া 'য' এর ধ্বনি সন্নিবিষ্ট 'ঈ'কে আশ্রয় করিতে হয়। না করিলে 'ভূঃ'তে

যে লম্বগা বৃত্তিটি (Vertical Component) আবশ্যক, সেটি আসে না। 'উ', 'ঊ' দুই-ই ওষ্ঠ্য বর্ণ,—তাতে সামতালিকী বেধ (horizontal cum depth component) বৃত্তির প্রাধান্য। এতে একটা স্পষ্টতঃ 'লম্বগ সহগ' উদ্ভূত হইতে গেলে (তালব্য) 'ঈ'এর 'অনুগ্রহ' আবশ্যক হয়। 'উ' এবং 'ঊ' দুটি উচ্চারণ করতঃ প্রাণিক বৃত্তির 'গতিমুখ' চিত্রটি (Vector graph) মনশ্চক্ষে দেখিতে যত্ন কর। [গণিতে 'Vector triangle' ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে স্মরণ কর] স্বরবর্ণের মধ্যে অ, ই, উ এই ত্রিপুটী মৌলিক (primary)। এদের মুখ্যতঃ যথাক্রমে তল, লম্ব এবং বেধ এই ত্রিমুখী বৃত্তি। হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত—ত্রিবিধ মাত্রায় ঐ ঐ বৃত্তির উন্মেষ সাধিত হইয়া থাকে। ধর প্রণবে যে উকার। ইহার হ্রস্বমাত্রিক উচ্চারণে বেধবৃত্তি (depth action) আরব্ধ হয় মাত্র; দীর্ঘমাত্রায় উহা বর্দ্ধিত হয় এবং উহার সঙ্গে লম্ববৃত্তি (ascent action) সংযুক্ত হয়; প্লুতমাত্রায় তল, লম্ব, বেধ তিনদিকেই বৃত্তির বিবৃদ্ধি ঘটে। তখন, বারাহী শক্তির 'মহাচক্র' এবং 'দংষ্ট্রা' উভয়ই মন্ত্রের মধ্যে নিহিত 'বসু'কে সমুদ্ধৃত করিতে প্রবৃত্ত হয়।

গতিমুখের সন্ধানী জপ, মাত্রার আলয় এবং মাত্রার লয় কোন্ স্থলে?

শুধু জপ করিয়া গেলেই কি হয়? উক্ত গতিমুখের সন্ধানী হইয়াই জপ করিতে হয়। ভগীরথ তো আপনমনে দিব্য শঙ্খ বাজাইয়া জাহ্নবীকে 'পথ দেখাইয়া' লইয়া যাইতেছেন; কিন্তু পথ ভুলাইবার উপদ্রবও প্রচুর বর্তমান! তাই মুসাফির হুঁসিয়ার! নিম্নের কারিকাটি চিন্তা করিয়া দেখ:—

হংসোহংস ইতি ধ্বনিং ধমসি কিং নাদং ন শুশ্রূষসে
নাদং ত্র্যক্ষরকং সদা নদসি কিং বিন্দুং ন জিজ্ঞাসসে।
বিন্দোর্ব্যাহরণে ক্ষমো ন সরণিং পারায় সুস্মূর্ষসে
পারং বাপি দিদৃক্ষসে যদি কথং মাত্রালয়ং মিৎসসে।।৪৪

তুমি তো অহর্নিশ নাসাবিবররূপ শঙ্খে 'হংস হংস' ধ্বনিটি করিয়া চলিয়াছ (অজপা জপ), অথবা সজ্ঞানে মন্ত্ররূপেই উহা জপিতেছ; কিন্তু বল দেখি—ঐ

হংসের গতিমুখটি যে কোন্ দিকে তার কি সন্ধান লইয়াছ? ঐ ধ্বনিতে যে নাদ 'সন্নিবিষ্ট' রহিয়াছেন—ভাগীরথমুখে প্রণব শঙ্খধ্বনি—সেটিকে শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ? 'হংসের' 'হ' এবং 'স' দুই-ই তাতে লীন হইতে চলে যে! আবার, তুমি নাদ সাধক, 'অ', 'উ, 'ম্' এই ত্র্যক্ষর তো সদাই ধ্বনিয়া যাইতেছ; কিন্তু যে সূক্ষ্ম চরম ঘনীভাবে এই তোমার অভিব্যক্ত নাদের পর্যবসান (আবার, সেই উদাত্ত শঙ্খনাদের কথাই চিন্তা কর), সেটি কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? পুনশ্চ, সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দুকেও ব্যাহরণে (বিশেষভাবে আহরণে) তুমি ধর সমর্থ হইলে; কিন্তু বিন্দুর চরমতাও তো সেই অব্যক্ত পরমতা নয়, অর্থাৎ, বিন্দুর পারেও যে যাইতে হইবে, এটি কি স্মরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? ধর, তাও স্মরণ করিয়াছ। তথাপি, সত্য সত্যই সেই 'চরমের পার'টিই যদি দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে, বল দেখি—সেই 'মাত্রা লয়' স্থানেরও আবার পরিমাণাদি লইবার ইচ্ছা করিতেছ কেন? যেখানে সকল মাত্রা লয় হইয়া যায় অথবা যেটি সকল মাত্রার 'আলয়'—অধিষ্ঠান, সেটি তো 'অমাত্রম্'—অনিরুক্ত, অলক্ষণ, অব্যবহার্য। সুতরাং 'অমেয়'। সেখানেও তোমার 'মাপকাঠি' চালাইতে ইচ্ছা কর কেন? বাক্ বা বুদ্ধির বিজৃম্ভিত যে সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চ, তাদের উপশম স্থান সেটি; সেখানে প্রমাণ প্রমেয়াদি ব্যবহার সবই তো শান্ত হইয়া যায়। অতএব হে সুধী জাপক! স্বাভাবিক অজপা 'হংস' হইতে আরম্ভ করতঃ এই শেষ পর্যন্ত চলিতে চলিতে 'গতিমুখ' (বিস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ) গুলি দেখিয়া চলিও। এবং সাবধানেই চলিও। [পরে 'অদ্বৈতদ্বৈতাদশকম্' প্রকরণে 'প্রণবধনুঃ' (শ্রুতিপ্রসিদ্ধ)তে পর পর উকারাদি এই ভাবে 'জ্যা' আরোপ করতঃ নাদাদি পর পর লক্ষ্য বেধের প্রসঙ্গ আছে; আবার, 'নাদানুসন্ধানাষ্টকম্' প্রকরণে 'অবর সন্ধি' এবং 'বর সন্ধি' প্রভৃতি উত্তরণের প্রসঙ্গ আছে। এ সবই ঠিক ঠিক গতিমুখের নির্দেশ দেয়]

(২০)

ব্যষ্টিজপ ও বৈরাজজপ

জপটি তোমার শুধু ব্যষ্টি জপ হইলেই কি হইল? তাকে যে 'বৈরাজ' জপরূপেও পাইতে হইবে। না পাওয়া পর্যন্ত তো তোমার ছন্দের শেষ দুটি সোপানে অধিরূঢ় হওয়া ঘটিবে না। নীচেকার ঢালু, শেওলাধরা সোপানে স্থির হইয়া দাঁড়াবারও যো নেই।

ধর, উত্তরাখণ্ডে অলকানন্দার তটে তুমি সমাসীন। অন্তর্হবন করিতেছ—'ওঁ ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে। কিন্তু এ মন্ত্রঝঙ্কার এই তোমার নিজের 'বাঁধা' যন্ত্রটিতেই বাজিয়া যাইবে? বহির্বিশ্বেও যে ঐ মহাব্যহৃতি হোম অবিরাম চলিতেছে, সেই বিরাটের ঝঙ্কারে তোমার আপন ঝঙ্কারটি সর্বথা না মিশিয়া যাওয়া পর্যন্ত, ভাব কি তোমার ছন্দঃসাধনার চরিতার্থতাটি হইবে?

বৈরাজ সবন বা হবন কিরূপ আধারে কিভাবে করিবে

এইবার এই কারিকাটি ভাবনা কর:—

ওমিত্যেব নদচ্ছ্রুতং কিমপিতে ব্যোমাক্ষরং শাশ্বতং
তুষ্ণীং ব্যাহরণং চ ভূধরবরাদূর্জ্জস্বরাদ্ ভূরিতি।
স্বাহেতি স্বরিতৈঃ সদা সুরধুনী তুঙ্গাদ্রিসানুস্রুবা
বৈরাজং সবনং স্বরৈর্বিতনুতে কিন্তে শ্রুতং বাধ্বরে।।৪৫

অক্ষরাত্মা ব্যোম শাশ্বত নাদের আধাররূপে যে ওঁকার বিস্তার করিয়াছেন—যে আধারে নিখিল বাকপ্রপঞ্চের উদয়, স্থিতি এবং অবসান—হে অন্তর্হোমকৃৎ! তুমি কি সেই ব্যোমরূপী ওম্ শুনিতেছ? 'ওমের ব্যোম'—সুতরাং ব্যোমরূপে ওম্‌টিকে না শুনিলে, তোমার শ্রুতি রহিল খণ্ডিতা, স্বল্পা, ব্যাহতা। অথচ চাই তোমার—'দিবীব শ্রুতিরাততা'। তারপর, মূর্তিমান ঊর্জোরাশিরূপ ঐ যে 'ভূধরবর' নগাধিরাজ হিমালয়, তাঁর যেটি তুষ্ণীং, কিনা মৌন ব্যাহরণ, 'ভূঃ' এই ব্যাহৃতিটি দ্বারা সেই মৌন ব্যাহরণই বা কি তুমি শুনিলে? আবার, স্বয়ং স্বর্ণদী তুঙ্গাগিরি সানুস্রুবায় 'স্বাহা'—এই ওজস্বতী বাক্ স্বরিত (প্লুত) স্বরে উচ্চারণ করতঃ মহতো মহীয়ান্ বিরাটের যে অনির্বাণ হবন কর্মটি করিতেছেন, সেই অবিশ্রান্ত অব্যয়ৌজাঃ 'স্বাহা' ধ্বনি তুমিও তোমার আপন হোমে শুনিলে?

শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে দৃষ্টান্ত

পরে দেখা যাইবে যে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর শেষ স্তুতিতে যে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রভৃতি নারায়ণী শক্তি বন্দিতা হইয়াছেন, তাঁদের প্রত্যেকটিই বৈরাজজপের

রহস্যসঙ্কেত নির্দেশ দিতেছেন। যথা—'হংসযুক্ত বিমান' = বিশ্বভুবনে যাহা কিছু প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হইতেছে ('অণ্যতে প্রাণ্যতে') সেই 'অজপা'স্পন্দনে ব্রহ্মাণী (সাবিত্রী অথবা প্রণব) প্রতিষ্ঠিত বটে, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে; তাঁকে 'বিমানস্থা' (বিশিষ্ট মানে বা মাত্রায়, অর্থাৎ জপে) অধিরূঢ় করিতে হইবে। করিলে (অর্থাৎ মানটি সমর্থ হয় তো) তিনি 'কৌশাম্ভঃক্ষরিকা' হইবেন—যাতে অসুরের তেজোহানি এবং সুরের তেজোবৃদ্ধি ঘটে। কু = বেদ; বেদে যেটি শয়ন করে তাই 'কুশ'। বেদের রহস্য বা উপনিষৎ। সেটি সুরের পক্ষে অমৃত। কিন্তু অতি গম্ভীর এবং বিন্দুরূপ বলিয়া 'কৌশাম্ভঃ'। বীজমন্ত্রাদি এর রূপ। এটিকে জপক্রিয়ারূপ বিমানস্থা হইয়া 'ক্ষরণ' (dynamic) করিতেছেন যে শক্তি তাঁকে নমস্কার।

'ওঁ ভূঃ স্বাহা' প্রভৃতি তিনটি মহাহবনের তত্ত্ব ও ভাবের আধার। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিবিধ ঈক্ষণাদি

এই প্রকারে আপন 'সুরচ্ছন্দঃ' বৈরাজের 'সুরচ্ছন্দে' বাঁধিতে পারিলেই কি ছুটি? ইহাতেই কি মহাসমন্বয়টি পূর্ণ হইবে? না, তা হইবে না। এই নিমিত্ত নিম্নের কারিকাদুটির মর্মার্থ অনুধাবন কর:—

ভূঃ স্বাহেতি কৃতং স্ববিশ্বসবনং বৈরাজহোমানলে
প্রাপ্তং তৈজসহৃদ্ হিরণ্যরজসি স্বাহেতি পশ্চাদ্ভুবঃ।
স্বঃ স্বাহেতি সুতং যতোঽস্য জননং প্রাজ্ঞঞ্চ তত্রেশ্বরে
নো চেৎ সূক্ষ্মমপি স্বকারণমৃতে হব্যং ন সম্যঙ্‌মহৎ॥
ঈক্ষস্ব ত্রিবিধং ত্রিধা জুহুধি বা ভুঙ্‌ক্ষ্বাপি ভোগ্যং ত্রিধা
ভূরীক্ষং প্রথমং তথা ভুবরথো পশ্য স্বরীক্ষং ততঃ।
ত্রৈবিধ্যেন হুতৌ বহির্ঘনমথো কল্পস্ব চান্তর্হবি
রন্নঞ্চ ত্রিবিধং হ্যশান তদপি ব্রহ্মাক্ষরং পারগম্॥৪৬-৪৭

'ভূঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে তো তোমার যেটি 'স্ববিশ্ব' (জাগ্রদভিমানী ব্যষ্টিচৈতন্য— individual 'waking' consciousness), সেটির 'সবন' কিনা হবন করিলে বৈরাজ হোমানলে—বিরাট জাগ্রৎ চেতনায়। অর্থাৎ, তোমার যেটি স্থূল বোধবিশ্ব সেটিকে

আহুতি দিলে বিরাট বোধবিশ্বে; ব্যষ্টিস্থূলের অন্বয়ি ছন্দঃ সমষ্টিস্থূলের সমন্বয়ি ছন্দে (Cosmic Harmony-তে) মিলিয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, উপরে না ভাসিয়া গভীরে নামিয়া যাইলে তুমি। তোমার যেটি সূক্ষ্ম তৈজস (প্রাণ এবং অন্তঃকরণ) সত্তা সেটিকেও হবিঃরূপে কল্পনা করিয়া (তৈজসহুৎ) হিরণ্যগর্ভাখ্য মহাসূক্ষ্মসত্তার অগ্নিতে, মহাপ্রাণে হবন করিলে, 'ভুবঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে। কিন্তু স্থূল ও সূক্ষ্ম এ দুয়ের হবন করিয়াও যদি 'স্বঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে মহাকারণরূপ পরমেশ্বরে ব্যষ্টিকারণরূপ তোমার নিজের হবনটি, অর্থাৎ মহাপ্রজ্ঞে তোমার ঘনপ্রজ্ঞের হবন, শেষ না কর, তবে তোমার কল্পিত হব্য তো কদাপি সম্যক্ মহৎ হইবে না—তোমার অন্বয়ি ছন্দঃ মহাসমন্বয়ি ছন্দে তো মিলিয়া যাইবে না; সুতরাং স্থূল ও সূক্ষ্মের সাধনায় যত্নশীল তোমার ঈশ্বরে সর্বসমর্পণ ব্যতিরেকে কদাপি মহাকারণ-পদবীতে প্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠা হইবে না।

বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থিপরম্পরা সমাধানের দৃষ্টান্ত

বৈজ্ঞানিক, তোমারও ঐটি ব্যতিরেকে ব্যষ্টি সমষ্টি কোন কিছুরই মূল কারণ অবধি গতি নাই জানিও। তুমি স্থূলের গ্রন্থি খুলিতে গিয়া সূক্ষ্মের গ্রন্থিটি খুলিতেছ; সেটি খুলিতে গিয়া আরও সূক্ষ্মের গ্রন্থিটিও। কিন্তু গ্রন্থি তো শেষ পর্যন্ত সহজ হইতেছে না, জটিলই হইতেছে মনে হয়। মূলগ্রন্থি—সেই মহাকারণ গ্রন্থিটি সর্বত্রই তোমায় এড়াইয়া যাইতেছে।

তিন ভাবে ঈক্ষণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ। হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইকার

তিনভাবে ঈক্ষণ কর; তিনভাবে হবন কর; তিনভাবে ভোগ্য (যজ্ঞফলটি) ভোগও কর। জ্ঞান, কর্ম এবং ভাব (ইচ্ছা)—এ তিনের প্রত্যেকটিই তিনভাবে কল্পিত হউক। 'অয়ং' বা এই রূপে জ্ঞান—যেটির 'ব্যক্ত' (manifest) নাম দিতেছ; 'অসৌ' বা সেই রূপে জ্ঞান যেটির 'অব্যক্ত' (unmanifest) নাম দিতেছ; এবং এ দুয়ের—'এই' এবং 'সেই' এর মধ্যে ব্যবধান এবং সন্ধিসেতু যে জ্ঞান, যেটিকে 'এই'ও বল না 'সেই'ও বল না, অথচ, যেটি মধ্যস্থ হইয়া ক্রমাগত 'এই'কে 'সেই'তে লইয়া যাইতেছে, আবার 'সেই'-কে (নেপথ্যটিকে) 'এই' রূপে হাজির করিতেছে—সেটিকে

যে ঠিক কি নামে ডাকিবে তা জান না। মধ্যস্থ এই 'অনামী' বোধটিকে বেদাদি 'অন্তরীক্ষ' বলিয়াছেন। ঈকারটিকে প্রয়োজনমত হ্রস্বও করিয়াছেন দেখি। [উর্দ্ধগ লম্ববৃত্তি (vertical ascent—ভূঃ থেকে স্বঃ) বুঝাইতে দীর্ঘ এবং বিপরীতমুখীটি বুঝাইতে হ্রস্ব ইকার জানিও। উদাহরণ স্বরূপ—পৃথিবী থেকে তাড়িত শলাকা উঠিয়া যদি মেঘে প্রবিষ্ট হয় তো ঐ দীর্ঘ ঈ; আর মেঘ থেকে পৃথিবীতে আসিলে হ্রস্ব ইকার। পুনশ্চ, তোমার ব্যষ্টি কুণ্ডলিনীর 'হৃদ্দেশ' পর্যন্ত উত্থানে (ascent-এ) দীর্ঘস্বরটি, আর 'ঊর্দ্ধলোক' হইতে (স্বঃ) তোমার হৃদ্দেশে মহাকুণ্ডলিনীর অবতরণে (descent-এ) হ্রস্বস্বরটি ব্যাপৃত। হৃদ্দেশে স্বরের আদিম এবং সকল ব্যঞ্জনের আশ্রয় 'অ'-কার সামান্যাধাররূপে অবশ্যই বিদ্যমান। নিম্ন হইতে এবং ঊর্দ্ধ হইতে 'ঈ' এবং 'ই' এই দুটি ঐ স্থলে (হৃদ্দেশে) মিলিত হইল। ফলে, হৃদ্দেশের অভ্যন্তরে যে 'হৃদয়' এবং তারও অভ্যন্তরে যে 'হৃৎ', তাতে পরশ লাগিল, সাড়া জাগিল ('heart opening')। আর কি হইল? আধাররূপ অবর্ণে ঐ দুই ইকার 'প্রবিষ্ট' হইল। মানে ই-ঈ অন্তরে যাইয়া অবর্ণকে পুরতঃ—যেন সামনে আনিয়া রাখিল। ফলে, যেটা ছিল 'আধার' অথবা আস্তরণ সেটি হইল 'আবরণ'। সকল ব্যঞ্জনবর্ণেই তো এই 'বিপরীত করণটি' আবশ্যক হয়। ক্, খ্ ইত্যাদি সকল ব্যঞ্জনই মাতৃকার আদিবর্ণ অকারের 'জঠরে' প্রথমে বীজরূপে প্রবিষ্ট হয়, তারপর সেই মূল মাতৃকাগর্ভ থেকে অবর্ণকেই আবার 'উল্বন' (আবরণ—placenta) রূপে পাইয়া স্ফুট বৈখরীবাক্‌রূপে ভূমিষ্ঠ হয়। 'ক' বর্ণটিকে উচ্চারণ করতঃ প্রাণের 'লেখ' (graph)টি প্রণিধান কর, তা হইলে এই বিপরীত করণে—ছিন্নমস্তারীতিটি কতক বুঝিবে। আচ্ছা, তারপর? (ই+ঈ)+অ='য' (ই-অ) হইল। এটি বায়ুব্রহ্মের বীজ। হৃদ্দেশ এই বীজের 'স্থান' বটে, কিন্তু উপরিউক্ত রীতিতে মূল এবং মূর্দ্ধা দুই স্থান হইতে দুই 'তাড়িত প্রবাহের' মিলন ঘটাইয়া সে বীজটির সমর্থ 'উদ্ধার' কর্মটি করিতে হইবে।]

মাহেশ্বরী—'মহাবৃষভ'

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীচণ্ডীর মাহেশ্বরী মূর্তিটিকে বাক্‌রূপে ভাবনা কর। ত্রিশূল = অ, উ, ম এই ত্রিমাত্রা মনে কর। মাঝে 'উ'কার উদগ্র, উদ্যত। চন্দ্র = চন্দ্রবিন্দু = নাদবিন্দু (অর্দ্ধমাত্রা)। অহি = স্বরব্যঞ্জন নিখিল বর্ণমালার (অ—হ) ক ল ন করেন যে শক্তি

(ই) = কলাশক্তি। সুতরাং, ত্রিশূল-চন্দ্রাহিধরে = প্রণবের প্রথম ত্রিমাত্রা + নাদবিন্দু + কলা। বলা বাহুল্য, এস্থলে কলা বলিতে মূল কলনশক্তি সূচিত হইতেছে। 'অহি' এর রূপ। পূর্বে এক স্থলে 'অহি' প্রাণন ব্যাপার নির্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে (যথা, মহাদেবের ধ্যানে)। এ দুয়ে বিরোধ নেই। এইবার, মহাবৃষভবাহিনি। 'বৃষভ' শব্দের ব্যঞ্জনা বিচিত্র এবং গভীর। বেদাদিতে প্রসিদ্ধও বটে। এখানে এইভাবে ভাবনা কর—উ + ঋষভ = বৃষভ। অর্থাৎ, 'উ' এই স্বর (ঋ+ষ+ভ) এই আকৃতি (pattern) পাইয়া 'মহান' হইল, এবং সেইভাবে তাহা ওঁকাররূপিণী বাকের 'বাহন' হইল। অর্থাৎ, 'উ'কারকে উক্তরূপে 'মহান' না পাইলে প্রণব পূর্ণপ্রসারী (dynamic) হন না; ঋষভ স্বরসপ্তকে দ্বিতীয়। এ আকৃতির বিশ্লেষণ পরে মিলিবে। ভগবানের এক অবতারও বটে। (যথা ভাগবতে।)

ভূরীক্ষ বিশ্লেষণ

ঐ ত্রিবিধ ঈক্ষণ বা ঈক্ষাকে 'ভূরীক্ষ' 'অন্তরীক্ষ' (বা ভুবরীক্ষ) এবং 'স্বরীক্ষ' এই তিন রহস্য নাম দাও। (তিন স্থলেই 'ঈ' কার হ্রস্বও হইতে পারে।) বলা বাহুল্য, ঐ নামত্রয় তিনটি 'ফরমূলা'। যেমন, 'ভূরীক্ষ' = ব্+হ্+উ+র্+ঈ+ক্+ষ+অ। শেষের অকারটি তো সকল ব্যঞ্জনের উচ্চারণেই আবশ্যক। ওটিকে বাদ দিলে, সপ্তাবয়ব এই আকৃতিটি মিলিল। এই সপ্তাবয়ব আকৃতিটির পূর্ণ বিশ্লেষণ এস্থলে হইবে না। তবে, লক্ষ্য কর যে (ব্+হ্)—এই অংশে যেটি sub-potential সেটি high potential হইতেছে—'অল্পপ্রাণ' 'মহাপ্রাণ' হইতেছে। মধ্যে (র্+ঈ)—এই অংশটি বিশেষভাবে ঊর্জ্জঃশক্তিটি সূচিত করিতেছে, এবং সেই ঊর্জ্জঃ শক্তির যেটি ঊর্দ্ধগ লম্ববৃত্তি (vertical component) সেইটি ('ঈ' বর্ণ)। আর, (ক+ষ) অংশটি সূচনা করিতেছে কতিপয় Kinetic Energy Level—ব্যক্ত শক্তির একটা আরোহীক্রম বা 'গ্রাম'। তিন ভাবে ঈক্ষণ হইল। তারপর, তিনভাবে সবন বা হবন। এই হবনের তিনটি রূপ (বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞ—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ-ভেদে) পূর্বেই দেখান হইয়াছে। এই ত্রিধা হবনটি অন্য অন্য তিন প্রকারেও প্রয়োজনানুরূপ ভাবনা করিতে পার। [যথা প্রাণ ও অপানকে পরস্পরে; উভয়কে সমানে; তিনটিকেই আবার ব্যানে। উদানকে ('Lever Principle'টিকে) এই হবনে স্রুবের মত ব্যবহার করতঃ সেটিকেও পূর্ণাহুতি দাও আর

চারিটির সঙ্গে মূখ্যপ্রাণে—অপঞ্চীকৃত মহাপ্রাণে। আবার, মূলাধার স্বাধিষ্ঠানকে হবন কর নাভিতে মণিপুরে; ঐ তিনকে হবন কর হৃদয়ে অনাহতে; এবং অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এ তিনের হবন কর সহস্রারে। পুনশ্চ, সূর্যকে (পিঙ্গালা) হবন কর চন্দ্রমায় (ইড়ায়); উভয়কে হবন কর সূক্ষ্মাগ্নিতে (সুষুন্নায়); এবং এ তিনেরি হবন কর 'পরম বিদ্যুতি' (জ্যোতিষি)। আগমাদি শাস্ত্রে 'ত্রিসবন' নানারূপেই কথিত হইয়াছে। জপসূত্রমের পরিভাষায় 'বহিঃ', 'অন্তঃ' এবং 'ঘন' এই ত্রিবিধ মূল সবন জানিবে।]

ত্রিধা সবন ও ত্রিধা অদন

ত্রিসবন অনুষ্ঠান করতঃ ত্রিবিধ অন্নও ভোগ কর (অশান)। কি সেই তিন অন্ন? শুক্র, অশুক্র, মিশ্র—এই প্রকার সাধারণ ভেদ কথিত হইয়া থাকে। পরের কারিকায় অন্ন সূক্ষ্মভাবে কল্পিত হইয়াছে দেখিও। যদি 'আপো বৈ অন্নম্' এই ভাবে ভোগ্য অন্নসমূহকে অপের মধ্যেই সূক্ষ্ম বা বীজভাবে কল্পিত দেখ (যেমন আর্যপ্রজ্ঞান এবং বর্তমান বিজ্ঞানও প্রকারান্তরে দেখিয়াছেন), তবে বৈদিক সন্ধ্যার মার্জনমন্ত্রে 'ঊর্জ্জে দধাতন', 'মহেরণায় চক্ষসে' এবং 'শিবতমো রসঃ' এই তিনটিকে পর পর উৎকৃষ্ট 'অন্ন' রূপে ভাবনা করিতে পার। বৃহদারণ্যকাদি যে 'সপ্তান্নে'র কথা বলিয়াছেন, সেগুলি 'পাংক্ত' কর্মের সঙ্গে মন্বয়েস গ্রথিত। এই গ্রন্থে যথাস্থলে তাহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে।

ত্রিধার পারে—পরমে। আহৃতি ও আহুতি

আচ্ছা, কোন না কোন ভাবে ত্রিধা ঈক্ষণ, ত্রিধা সবন, ত্রিধা অশন বা অদনটি না হয় সম্পন্ন হইল। ঈক্ষণাদির যথোপযুক্ত ত্রিবৃৎকরণে ব্যাহৃতিত্রয়ের অধ্যক্ষতাও আমরা না হয় দেখিলাম। কিন্তু যেটি তিনেরও 'পার', সেই পরমে অক্ষর ব্রহ্মে যাইব কিরূপে যদি না ঐ তিনকে 'একে' এবং এককে আবার 'অদ্বয়ে' ('একমেবাদ্বিতীয়ম্' —এই বাক্যের প্রতিটি পদের লক্ষ্যার্থ ভাবনা কর) মিলাইতে পারি? উক্ত ব্যাহৃতিত্রয় প্রণবেরই (ব্রহ্মাক্ষরের) বিশেষ বিশেষ 'আহৃতি'। সুতরাং, যার আহৃতি সেই প্রণব বা ব্রহ্মাক্ষরেই ঐ তিনের আহুতি সমাপন পূর্বক আমায় 'পারগ' হইতে হইবে। জপ (গায়ত্রী) আরম্ভ করিলাম—'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এই ভাবে, সমাপন করিলাম 'ভূর্ভুবঃ সুবরোম্' এই ভাবে। প্রণব থেকেই 'আহৃতি', আবার প্রণবেই 'আহুতি'। এই শব্দ

দুটির কেবল মাত্র শব্দালঙ্কারই লক্ষ্য করিও না; 'ঋ' এবং 'উ' এই দুটি ব্যঞ্জনা বুঝিতেও যত্ন কর। শেষ কারিকাটির ব্যাখ্যান এইখানে শেষ।

[ধর, প্রাণরূপী ধনুঃ। এর দ্বারা কোন লক্ষ্যবেধ করিবে। 'আ' স্বরে জ্যা-রোপিত হইল; 'হৃ' দ্বারা জ্যা আকর্ষণ করিলে; 'তি' শর বা তীর। এই প্রক্রিয়াটি হইল আহৃতি। 'উ' স্বর দ্বারা আকৃষ্ট জ্যা লক্ষ্যাভিমুখে উৎসৃষ্ট করিলে (relax the string)। প্রথমটিতে কৌর্মশক্তি, দ্বিতীয়ে বারাহী।]

ব্রহ্মাক্ষরের সংখ্যামান স্বীকার

ব্রহ্মাক্ষরের তিন, পাঁচ, সাত ইত্যাদি 'মান' স্বীকার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কারিকাটি চিন্তা কর:—

তিস্রোঽস্যাত্রিবিধং মখায় সবনং তন্বন্তি মাত্রাস্ততঃ
পাদা পঞ্চ সুতং প্রমেয় মখিলং কুর্ব্বন্তি পঞ্চীকৃতম্।
স্বস্মিন্ সপ্তকলাং সপ্তানলমুখৈরন্নানি সপ্তাশিতুং
কাষ্ঠাং স্বীকুরুতে হ্যমানি তদপি ব্রহ্মাক্ষরং মানদম্॥৪৮

ব্রহ্মাক্ষর নিখিলের মানদ হইয়াও স্বয়ং স্বরূপতঃ 'অমানি' মানরহিত। 'অক্ষর ব্রহ্ম' নাদ অথবা প্রণবরূপে হইলেন 'ব্রহ্মাক্ষর'। এই ব্রহ্মাক্ষররূপ হইয়া, এই যে বিশ্বভুবনরূপ মখ, কিনা যজ্ঞ, তার 'মানদ'—মানদাতা—হইলেন। অর্থাৎ, বিশ্বভুবনে সব কিছুই তার আপন 'মান' (পরিমাণ, সংখ্যাদি) লাভ করিল। ব্রহ্মাক্ষররূপ প্রণব স্বয়ং মাত্রা, পাদ, কলা এবং কাষ্ঠা—এ চতুর্ব্যূহ মান স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই না বিশ্বভুবনের সবতাতে ঐ চারিটি অন্বিত, অনুস্যূত হইয়াছে। এই বিশ্ব মহীরুহের বীজেই ঐ চতুর্ব্যূহরূপতা প্রবিষ্ট বলিয়াই না, এর কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, পল্লব-মুকুলাদি সব কিছুতে দেখি মাত্রা, পাদ, কলা, কাষ্ঠা! অণু থেকে বিরাট পর্যন্ত কোথাও এর ব্যভিচার নেই।

অণু ও বিরাটে

একটা অণুকেও ডাকিয়া শুধাইতে হয় তুমি কোন্ মাত্রায় স্থিত এবং চলিত? আগেকার শতকে এর একটা নিঃসংশয় জবাব মিলিত, অন্ততঃ তাই মনে করা হইত।

বর্তমানে, অণু আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয়ে ফেলিয়াছে। যদি সে তার স্থিতির (position-এর) সঠিক মাত্রাটি বলে তো, গতির (motion এর) সঠিক হিসাবটি দিতে 'গাঁই গুঁই' করে; আবার, গতি বাৎলায় তো স্থিতি বাৎলায় না। হাইজেনবার্গের 'অনিশ্চয়বাদ' (Indeterminacy) 'গোড়ায় গোল' বাধাইতে বসিয়াছে। বিরাটের বেলাতেও অনুরূপ সমস্যা। বিরাটও আপন মান ঠিক রাখেন কৈ? মান বাড়াবার দিকেই ঝোঁক! ('Expanding Universe')। কিন্তু 'অতিদর্পে হতা লঙ্কা'—অতি-বাড়টি হলে চুপসে এতটুকু হয়ে যেতেই বা কতক্ষণ! একটা বুদ্‌বুদ্ যেমনধারা বাড়তে বাড়তে ফেটে যায়! শুধু বিরাট বপুটির মান নয়, বিরাটের কারবারী শক্তিই (sum-total energy) কি 'স্থাণু' (constant)? তারপর— অণুকে শুধাইতে হয়, তুমি আছ কত পাদে? সে বলে—একটা নাভি, একটা নেমি এবং দুয়ের মধ্যে অর, এই তিনটি পাদ তো আমার চাই-ই। একটা ক্ষুদ্র জীবকোষ অণুবীক্ষণের তলে যাইয়া তাই বলে। অন্তঃকরণও তাই বলে। প্রাজ্ঞ-তৈজস-বিশ্ব ইত্যাদি। স্থূলে বিরাটেও এর ব্যভিচার হবে কি? Nebulae Sprial Pattern ধরিয়াও বলে— এই দেখ, আমার নাভিটি হইয়াছে অক্ষ! আর, নেমি এবং অর—ঐ দেখ কেমন নাগরদোলায় মজাসে ওঠা-নামা করিতেছে। তারপর, বিরাটই বা কি অণুই বা কি, বাহিরই বা কি, ভিতরই বা কি, ভাবই বা কি, ভাষাই বা কি, সুরই বা কি, ছন্দই বা কি—প্রত্যেকে বলে—এই দেখ আমি 'সকল'—আমার কলা' (part, element, aspect) রহিয়াছে, এবং চাঁদের মত আমারও কলার বাড়তি কমতিও আছে! অন্যে পরে কা কথা—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটা অণুরও দস্তুরমত কলার কারবারটি আছে! সকলই 'কলা'ই দেখাইতেছে, আপনাকে, স্বরূপকে গোপন করিয়া! স্বরূপে যেটি নিষ্কল, অলিঙ্গ, তাতে কোনও না কোনও গতিকে কলা বা লিঙ্গের উদ্ভব হয় বলিয়াই না এই ভবের কারবারটা চলিতেছে! তারপর, 'কাষ্ঠা' বা সীমা (Limit) বলিয়া একটা জিনিষও সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান। মাত্রা, পাদ, কলা—এরা কেউই যখন স্থাণু (constant) নয়, পরিণামী (variable), তখন ঐ কাষ্ঠা বা লিমিটের কথা তো উঠিবেই! মাত্রাদি প্রত্যেকেই বলিবে—আমার ব্যাপ্তি, আমার গতি, আমার পরিণতি কোন্ অবধি?

[এইবার 'বৃষভ' এই আকৃতিতে মাত্রাদি চতুষ্টয়কে দর্শন কর। উ=মাত্রা। ঋ=পাদ। ষ=কাষ্ঠা। ভ=কলা। মানে দাঁড়াইতেছে—উকার (বারাহী) মাত্রা সহকৃত

হইয়া বাক্ 'ঋচ্ছতি' (পদ্যতে) মূর্দ্ধন্যমহাপ্রাণ (যকার) কাষ্ঠা অবধি, এবং বাকের এবম্বিধ মূর্দ্ধন্যধাম অবধি গতির ফলে নিখিল অব্যক্ত কলা (ব) সম্যক ব্যক্ত হইয়া (মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্যবর্ণ) 'ভ' রূপে ভবতি ও বিভাতি।]

ব্রহ্মাক্ষরে মাত্রাদি চতুর্ব্যূহ

ব্রহ্মাক্ষর এই চতুর্ব্যূহরূপ ধারণ করতঃ বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট। প্রত্যেকটিতে (মাত্রাদিতে) আবার কয়টি বিশেষ সংখ্যা (তিন, পাঁচ, সাত, দুই, এক) প্রবিষ্ট হইয়া যাগটি বিস্তার করিয়াছে এবং করিতেছে জানিবে। সবনরূপ ক্রিয়াতে (প্রমাণে) তিনটি মাত্রা (Three-level functioning)—যথা, যাগে (১) সমিধ্‌সংগ্রহ, (২) অগ্নিচয়ন, (৩) ওঁ ভূঃস্বাহাদি মন্ত্রে হবন; বিচারে লিঙ্গাপরামর্শ, ব্যাপ্তিগ্রহ, নিগমন; ইত্যাদি। যে নিখিল প্রমেয় এই সবনে 'সুত' হইতেছে, সে সকলেই পাঁচটি পাদ (five dimensioned structure)—যার ফলে, মহাভূতাদির পঞ্চীকরণটি ঘটিয়াছে। যথা—বিয়দাদি পঞ্চ মহাভূত এবং তাদের হযরাদি বর্ণ; পঞ্চপ্রাণ; কোষপঞ্চক; ইত্যাদি। যেটি হোতা, অত্তা বা প্রমাতা তার উপর এসবের প্রতিক্রিয়া (reactions) রূপ যে অন্ন, সেটি সপ্তসংখ্যক। কং=সুখম্। এটি ব্রহ্মেরই স্বরূপ। এটি নিজেকে অত্তা এবং অন্নরূপে সপ্তধা 'কলন' করেন। ফলে, কঃ, কং, কেন, কস্মৈ, কস্মাৎ, কস্য, কস্মিন্—এই সপ্তবিধ কলায় (aspects) মূলতঃ ব্যাকরণটি ঘটিয়া থাকে। এ সাতটির বিষয়ী অত্তা, বিষয় অন্ন। এ সাতের সম্যক্ বিশ্লেষণ ভবিষ্যতে হইবে। এখানে লক্ষ্য কর যে, ঐ সাতটি প্রত্যেকে ঐ সপ্তকলায় ব্যাকৃত হইয়া তবে তার যেটি আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা সেটি মিটায়। ইহারা পরস্পরাপেক্ষী।

কারকে অন্ন ও অত্তা

কারকের লক্ষণ করা হয় যার ক্রিয়াতে অন্বয় আছে। ষষ্ঠীকে বাদ দিয়া ছয়টি কারক সাধারণতঃ ব্যাকরণে ধরা হয়। আমরা কেবল অন্বয়ের কথা বলিতেছি না, আকাঙ্ক্ষা অথবা অপেক্ষার কথা বলিতেছি। কাজেই 'কস্য'টিকে বাদ দিতেছি না। ঐ সপ্তকের কেহই 'একেশ্বর' অত্তা বা অন্ন হয় না। ধর, রামো দুগ্ধং পিবতি। এখানে, ভাসাভাসা দেখিলে, রাম=কঃ (অত্তা), আর, দুগ্ধং=কং (অন্ন)। কিন্তু তলাইয়া দেখিলে,

রামের মধ্যে শুধু অত্তা নয়, অন্নও বিদ্যমান; এবং দুগ্ধমের মধ্যে শুধু অন্ন নয়, অত্তাও বিদ্যমান। রাম সত্য সত্য 'অদন' করিল কাকে? নিজেরি মধ্যে উদ্ভূত (excited or induced) কতকগুলি 'অন্তরোদন' (objects of inner consumption 'মাত্রাস্পর্শঃ') তার অন্ন হইয়া থাকে সাক্ষাদ্ভাবে। তদুদ্দেশ্যে কতকগুলি আন্তর সংস্কারকেও 'ব্যঞ্জন' বা 'উপসেচন' রূপে গ্রহণ করিতে হয়। কাজেই, বলিতে হয়, অত্তা (অন্নাদ) যেন 'নিজেরি কিছুটা' অন্নভাবে অদন করেন। ঐতরেয় উপনিষদে সৃষ্টির উপাখ্যানটা এতৎ প্রসঙ্গে স্মরণ কর। প্রজাপতি আপনাকেই 'অন্ন' করিয়া বিলাইয়া দিতেছেন। বৃহদারণ্যকেও আসলে তাই। দুগ্ধমেরও অনুরূপ বিশ্লেষণে, তার মধ্যে শুধু অন্ন নয়, অত্তাকে মিলিবে। দুগ্ধের সত্তাটি পরীক্ষা কর। সেটি আসলে কি? সেই আসল সত্তাটি বলিতেছে—আমি রাম কর্তৃক পীত হইয়াই আপনাকে 'ভোগ' করিব। পুং-স্ত্রী-মিথুনে যে অন্ন-অন্নাদের অন্যোন্যতাটি স্পষ্ট, সেটি সর্বত্রই অনুস্যূত জানিবে। অদন—অত্তা—অন্ন—একই ত্রিভুজের তিনটি বাহুর মতই নয়; তা হইলে তাদিগকে তিনটি পাদ বলা চলিত। কিন্তু ঐ তিনটি একই ত্রিপার্শ্ব কাঁচের তিনটি পাশের মত। একই পদার্থকে তিন দিক দিয়া তিন ভাবে দেখা। এইজন্য, 'কলা'। এ প্রসঙ্গের সবিশেষ অনুসরণ পশ্চাৎ যথাস্থলে হইবে। 'কলা' বলিলে বাড়া-কমার প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। চাঁদ তো গোটা আছেই, কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে কোন্ পর্যবেক্ষকের সম্পর্কে কোন্ 'সূত্রে' রহিয়াছে, অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের আবর্তন আর নিজের আবর্তনের কোন্ সংস্থায় অবস্থিত আছে, তার উপর নির্ভর করে, তাকে কত কলায় ফুটিতে দেখিব অথবা না দেখিব।

কলা—কাষ্ঠা (পরা ও অপরা)। অপরা থেকে পরায় কিরূপে যাইবে?

কলায় ফুটিলেই কাষ্ঠা বা সীমার কথাও আসে। কলা কতটা ফুটিয়া তবে পূর্ণ হইবে? প্রকৃতিতে এই 'ফোটার' অবধি বা সীমা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রূপে ব্যবস্থিত আছে। কিন্তু সকল বিশেষকে জড়াইয়া প্রকৃতির একটা পূর্ণ উন্মেষ বা বিকাশ, অথবা কোন এক বিশেষের, তার বিকাশের সাধারণ গণ্ডীর পারেও, পরিপূর্ণ বিকাশের কোনও কাষ্ঠা আছে কিনা ইহাও বিবেচ্য। যদি থাকে তো কাষ্ঠাকে অপরা

এবং পরা এই দুই করিয়া ভাবিতে হয়। যাই হোক, কলাকে অন্নভাবে সপ্তধা যেমন দেখিলাম, তার কাষ্ঠায় পরিণতির দিক দিয়াও সেটিকে 'সপ্তভূমিকা' ভাবিতে পারি। —An ascending series of values. যে কোন 'অন্ন' সপ্তভূমিকায় তার পরিপূর্ণতায় বা কাষ্ঠায় পৌঁছিবে। ধর, জপরূপ অন্ন। এর অপরা কাষ্ঠা মধ্যমায়; পরাবরা কাষ্ঠা পশ্যন্তীতে; পরাকাষ্ঠা পরায়। প্রথম কাষ্ঠায় সাতটি ভূমি—বাচিকজপ, উপাংশুজপ, মানসজপ, তনুমানস জপ, পূর্বসেতুসন্ধিজপ, সেতুজপ, উত্তরসেতুসন্ধি জপ। এ সকল স্থলে জপরূপ অন্নের রূপটি বিভিন্ন ও বিচিত্র হইতে থাকে। তনুমানসে আসিয়া নাদ (অনাহত ধ্বনিরূপে) অভিব্যক্ত হয়; পূর্বসেতু সন্ধিস্থলে 'বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃকণ' (scintillation and radiation), সেতুতে 'বিতত জ্যোতিঃ', এবং উত্তর সন্ধিতে 'মিথুনীভূত নাদজ্যোতিঃ'—এই তিনভাবে নাদাভ্যন্তরঃজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিতে থাকে। উত্তর সন্ধির পারে 'অতিমানস' পশ্যন্তীর ধাম (Realms of Super-consciousness)। সে স্থলে 'নমস্' বিবর্তিত হয় 'মনস্' এইরূপে; সেস্থলে 'মন্' ধাতু থেকে মনঃ নয়, 'ম্না' ধাতু (যথা, আম্নায়) থেকে মনঃ। এই মনঃটি ফোটা না পর্যন্ত পশ্যন্তীর 'দরশ'টি মিলে না। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে Psychic Opening।

[শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে কৌমারীশক্তির (অনঘা) ধ্যান, তাতে দেখি—'ময়ূরকুক্কুটবৃতে'। এই রাহস্যিক শব্দের নানা ব্যঞ্জনার মধ্যে একটি মুখ্য ব্যঞ্জনা এই—'ময়ূর'=কেকারব=সা, এবং কুক্কুট=নি; সুতরাং এর দ্বারা নাদের সপ্তস্বরে অভিব্যক্তি মিলিল। প্রণবাদি (যাদের মাঝে গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ নিপুটিত) উক্ত সপ্তস্বরে 'উদ্গীথ' বা 'উদ্গান' হইলে যথার্থ 'ছন্দোগ' হইয়া 'অনঘ' হইয়া থাকে। প্রতি মন্ত্রকেই উদ্গানের আকৃতিতে সাধিতে হয়। যথা—নাম সঙ্কীর্তন এবং 'আজান'।]

জপের যাত্রাপথে দৃষ্টান্ত

ধর, জপে বসিয়া কোনও এক অতর্কিত 'ফিকিরে' অথবা 'তদ্বিরে' মধ্যমার সুড়ঙ্গটি পার হইয়া আচম্বিতে পশ্যন্তীর সীমানায় আসিয়া পড়িলাম। কোনও না কোনও দিব্য শ্রবণ, দর্শন, ভাব-পুলকাদিও হইল। কিন্তু প্রশ্ন আসে কোন্ কলায়? কেন না, পশ্যন্তীতে 'পা দিলেই' তো চিদ্গগনের সেই গোটা চন্দ্রমাটি হাতের মুঠোয় মিলিয়া গেল না। লছমণ পেরুলাম, আর বদ্রিনাথ, বদ্রিনারায়ণে! ক্ষুরের ধারের মতো

'নিশিত' যে পথটিকে ক্রান্তদর্শী কবিরা বলিয়াছেন, সেই ক্ষুরধার নিশিত পন্থায় এই সবে পা দিলাম মাত্র! যার দিব্য গন্ধ, দিব্য শ্রবণাদি কিছু কিছু ভাগ্যে মিলিল, তার শ্রদ্ধা বাড়িল; কাজেই, দুর্গম চড়াই উতরাই ভাঙার মতো বুকের কলিজা এবং সঙ্কট পন্থায় পদক্ষেপে দৃঢ়তা তার মিলিল। পশ্যন্তী অফুরান জ্যোতিঃ আর রসে ভরা 'ততঃ পরঃ ততো বরীয়ান্'রূপে সাজান ঊর্দ্ধ এক অভিনব-প্রসারী লোক। স্থির, বীর, ধীর হয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যেতেই হবে। এখানেও নূতন 'ঠাটে' ছন্দের সেই পাঁচটি পর্বই (পরিণয়ি থেকে পরম সমন্বয়ি) সাধতে হবে। সাধতে পারল না বলেই না একা যুধিষ্ঠির বাদে আর সব কয় পাণ্ডবের পথিমধ্যে পতন! যুধিষ্ঠিরই একা স্থির, কেননা, ঋতে, সত্যে, ছন্দে তিনি স্থির। ছন্দের কোনও নকল বা ভেজাল (ছদ্ম) লইয়াই তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই! এইজন্য, অরি-মিত্র ছন্দের 'যুধি', কিনা সমরেও, তিনি স্থির। স্বয়ং পার্থসারথির সখা পার্থেরও পা টলিল; কেন? তিনিও যে 'ছন্দঃ'কে 'ছদ্ম' রূপের উপরে সর্বথা, সর্বকালে একান্তভাবে তুলিয়া লন নাই!

ক্ষুরধার পথিমধ্যে জীবের ত্রিবিধ ভঙ্গুরতা—উরু, তনু, অণু

জীবের ভিতরে 'ভঙ্গুরতা' তিন আকারে থাকে—উরু, তনু, অণু। অভিমানী দুর্যোধনের উরু ভঙ্গুর। অর্জুনের ভঙ্গুরটা কোথায় কি ভাবে গুপ্ত ছিল? অমন বজ্রসার সত্ত্ব—স্বয়ং যোগেশ্বর স্বহস্তে যেটির যোগ্য যোজনা করিলেন—তার ভিতরেও ভঙ্গুরতা!

(২১)

ভঙ্গুরপঞ্চকম্

নিপতিত উরুভঙ্গাদ্ ভঙ্গুরো ধার্তরাষ্ট্রো
বিদরতি তনুসন্ধির্ভঙ্গুরো জারসন্ধঃ।
বিশতি চ শিশুপালো ভঙ্গুরাণুর্মহান্তং
ত্রিদিবসরণিযাতো ভঙ্গুরশ্চাপি পার্থঃ॥

বসুদেবসুতমন্ত্রী ভঙ্গুরঃ কিং ধ্রুবো বা
কিমগলিতকষায়ো ভঙ্গুরো নারদো বা।
গমিতবদরিকঃ কিং ভঙ্গুরশ্চোদ্ধবো বা
বরিতজনকতীর্থো ভঙ্গুরো জাতবিদ্বান্॥

অধিগতমনুসেতুর্ভঙ্গুরঃ সিদ্ধমন্ত্রী
জহদজহদিতি দ্বে ভঙ্গুরঃ কিং বিচারী।
স্ফুরিতপুলকহর্ষো ভঙ্গুরো ভক্তভাবঃ
সমধিগতসমাধির্ভঙ্গুরো ব্যুত্থিতঃ কিম্॥

প্রভবতি কিমু ছন্দো ভঙ্গুরং বামৃতায়
প্রভবতি কিমু বাক্যং ভঙ্গুরং বাক্ষরায়।
প্রবিশতি কিমু চেতো ভঙ্গুরং বাপ্যচিন্ত্যং
প্রসরতি কিমু দীপো ভঙ্গুরো যত্র ভানুঃ॥

জপ জপ ন হি যাবদ্ ভঙ্গুরং যাত্যমাত্রং
কুরু কুরু ন হি যাবদ্ ভঙ্গুরং যাতি শান্তম্
ভজ ভজ ন হি যাবদ্ ভঙ্গুরাদ্ ভীতিভঙ্গো
মন মন ন হি যাবদ্ ভঙ্গুরাসঙ্গিসঙ্গঃ॥৪৯-৫৩

উরু, তনু এবং অণু এই ত্রিবিধ ভঙ্গুরতার দৃষ্টান্ত। ব্যক্তভাবে অশ্মসার তুল্য দেহধারী ধার্তরাষ্ট্র (দুর্যোধন), তার একটি অঙ্গে (উরুতে) ভঙ্গুর ছিল; তাই ভীমের গদাঘাতে সে নিপতিত হইল। দুর্য্যোধনের যেটি উরু, সেটি তারই দেহের একটি অঙ্গ মাত্র নয়; এটি জীবমাত্রের যেটি উরু, কিনা স্থূল ভঙ্গুরতা, তার প্রতীক। উরু—উদ্ধত, উদগ্র—বিশেষতঃ অভিমান। এটিকে অঙ্গভঙ্গুরতা বলিতে পার। তারপর দেখ, জরাসন্ধও মল্লযুদ্ধে অজেয়। কিন্তু তার ভঙ্গুরতাটি ছিল কোথায়? না, তনুসন্ধিতে। এ ভঙ্গুরতা বাহিরে ব্যক্ত নয়—তনুসন্ধিগত, কাজেই তনু। এখানে ভঙ্গুরতা ছিল বলিয়া তনু সন্ধি বিদীর্ণ হইয়া তাকে ধ্বংস করিল। এর নাম সন্ধিভঙ্গুরতাও দিতে পার। তোমার ক্রিয়াকর্মের, জপাদির অঙ্গগুলো বেশ

মজবুত, কিন্তু সন্ধিতে, কিনা পরস্পরের গাঁথুনিতে গলদ আছে। সুতরাং ক্রমাগতঃ 'জরাসন্ধ বধ' হইতেছে। অন্ধি সন্ধি সামলাও। আর, যেটি তোমার পক্ষে বৈরী, তাকে সন্ধিতে পাকড়া করিয়াই চিরিয়া ফেলিবে। দুর্যোধনের বেলা শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীগুরু) আপনার উরু চাপড়াইয়া ভঙ্গুর স্থানটি বাতলাইলেন। জরাসন্ধের বেলা অন্য সঙ্কেত—'সন্ধিকো পাকড়ো!' তারপর, শিশুপালবধে কি হইল? এখানে 'অণুভঙ্গুরতা', কাজেই ভীমের গদা টদার কর্ম নয়! স্বয়ং চক্রী বধ করিলেন। অণুভঙ্গুর শিশুপালের 'অণু'টি সেই মহানেই প্রবিষ্ট হইল। কেন না, অণুর (সূক্ষ্মতম বা কারণের) লয় পর অথবা পরমেই হইতে হইবে। এটিকে পূর্বোক্তক্রমে মর্মভঙ্গুরতা বলিতে পার। সর্বসৃষ্টিতে এটি ভঙ্গুরতার বীজ। ঐ ত্রিবিধ ভঙ্গুরতার (বৈরক্ষেত্রে) নিমিত্ত তিনটি মন্ত্র—বষট্, বৌষট্, স্বাহা। পুনশ্চ, স্বর্গারোহণপথে যাত্রী স্বয়ং পার্থও ভঙ্গুর হইলেন দেখি। তাঁরই বা ভঙ্গুরতা কোথায় ছিল, সেটি ভাবিয়া দেখিয়াছ? গীতায় তিনি 'ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য' কাটাইলেন; কিন্তু সূক্ষ্মতম যে 'হৃদ্‌দৌর্বল্য' সেটি? বুকের যন্ত্রটা সতেজ হইল, অর্থাৎ উরুদোষ কাটিল; বুকের নাড়ী (nerves) গুলোও চাঙ্গা হইল, অর্থাৎ তনুদোষটিও সারিল; কিন্তু যে নাড়ীচক্র (nerve centre) এতদুভয়কেই control করে, সেখানে দৌর্বল্য লুকাইয়া রহিল কি?

উক্ত ত্রিবিধ ভঙ্গুরতার দৃষ্টান্ত। প্রচ্ছন্নভাবে। প্রচ্ছন্ন প্রকট হয় অতর্কিতভাবে

শ্রীনারদের কাছ থেকে বালক ধ্রুব বাসুদেব মন্ত্রলাভ করতঃ জপধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের সাক্ষাৎও মিলিল। অন্তে তাঁর জন্য এক ধ্রুবলোকও বরাদ্দ হইল। কিন্তু নগদ বিদায়টি মাগিতেছেন কি? সেই ভঙ্গুর—উরুভঙ্গুর বস্তু! স্বয়ং নারদ দাসীপুত্ররূপে ইহলোকে আসিয়া গুরুমুখে চতুর্ব্যূহ মন্ত্রটি পাইলেন; জপধ্যান করিতেও কসুর হইল না। ভগবান দেখা দিয়াও উধাও হইতেছেন এই বলিয়া—'অবিপক কষায়াণাং সুদুর্দ্দশোঽহং কুযোগিনাম্।' সর্বনাশ! নারদও 'কুযোগী', তাঁরও 'অবিপক্ক কষায়'! এই কষায়টি কিন্তু 'তনু' আবার দেখ—শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং সুহৃৎ যে উদ্ধব, তাঁকেও ভগবান পাঠাইলেন বদরী আশ্রমে সাধনের জন্য! তাঁর যেটি ভঙ্গুরতা, সেটি কোথায় ছিল? 'তনু' আর 'অণু' এ দুয়ের মাঝামাঝি এক জায়গায়।

সেটি বুঝিতে যত্ন কর। শেষকালে দেখ, যিনি জাতমাত্রেই বিদ্বান, সেই সর্বভূতে সমদর্শী শ্রীশুকদেবও ব্রহ্মজ্ঞ জনককে 'তীর্থ' কিনা, গুরুরূপে বরণ করিতেছেন! তাঁতেও ভঙ্গুরতা! মিথিলায় একদিন আগুন লাগিয়া তাঁর সেই 'অণুভঙ্গুরতা'টিকে 'উরু' করিয়া দেখাইল।

[শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বৈষ্ণবীশক্তির ধ্যানে 'শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ' এই আয়ুধচতুষ্টয় ভাবিয়া দেখ। শঙ্খ=ধ্বনিশ্রবণ ও উচ্চারণ; চক্র=আবৃত্তি বা অভ্যাস (ব্যাহরণ); গদা=বূঢ় অন্তরায় নিরাকরণ; শার্ঙ্গ=ধনুঃ—যে প্রণবাদি মন্ত্রের ধনুতে উপযুক্ত জ্যারোপণকরতঃ আপন আত্মাকে শর কল্পনাপূর্বক ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যবেধের কথা শ্রুতি বলিতেছেন।]

জপী, বিচারী ও যোগীতে ভঙ্গুরতা

তুমি সিদ্ধমন্ত্রী, তবু দেখিতেছি মন্ত্রের সেতুভাগে (যথা, প্রণবে অর্দ্ধমাত্রা) উপনীত হইয়াও যে ভঙ্গুর রহিয়াছ! তা কি জান? সেতুর এধারে উরুভঙ্গুর, এধার আর সেতুর সন্ধিতে তনুভঙ্গুর, ওধার আর সেতুর মাঝে অণুভঙ্গুর। সেতুটি পেরুলে আর ভঙ্গুরতা নেই। তুমি বিচারী, মহাকাব্য (তত্ত্বমস্যাদি) লইয়া, ওতে 'জহৎ অজহৎ' এই দুই-ই অংশ রহিয়াছে, এইভাবে ভাগত্যাগ লক্ষণাবিচারে নিমগ্ন আছ; কিন্তু বিচারী হইয়াও তো তুমি ভঙ্গুর, তা কি ভুলিয়াছ? তুমি ভক্ত, তোমার ভক্তিভাব পুলকহর্ষাদি 'সাত্ত্বিকবিকারে' স্ফুরিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এভাবও যে ভঙ্গুর! তুমি যোগী, সমাধি তোমার সমধিগত হইয়াছে, কিন্তু সমাধিও তো ভঙ্গুর, তা থেকে ব্যুত্থান আছে। ব্যুত্থিত অবস্থায় যেটি আসলে ভঙ্গুর রহিল অথবা রহিল না, তাও কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? শেষোক্ত তিন স্থলেও উরু প্রভৃতি তিন ভঙ্গুরতা লক্ষ্য কর। বারাহীশক্তিতে 'গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে'—মহাচক্র ও দংষ্ট্রা এ দুই হইতেছে মন্ত্রাদির ছন্দঃকে ভঙ্গুরতা থেকে উত্তোলনের সঙ্কেত। 'উগ্র' দ্বারা প্রণবের মধ্যমাত্রা উকার বিশেষতঃ গ্রহণীয়। 'দংষ্ট্রা' শব্দে উকার জ্যার টঙ্কারটিও ধ্বনিত হইতেছে।

ভঙ্গুর যে ছন্দঃ (যথা, ঐতরেয়োপাখ্যানে গায়ত্রী বাদে অন্য অন্য ছন্দঃ), সেটি কি সাক্ষাৎ অমৃতদোহনে সমর্থ? যে বাক্য নিজেই ভঙ্গুর কম্পমান, সে কি সেই উদয়াস্তহীন সর্বভাসক ভানু (চিদাদিত্য) যেখানে নিত্য প্রকাশমান, সেখান পর্যন্ত প্রসার লাভ করিতে সমর্থ?

জপাদির অবসানভূমি

সুতরাং, তোমার জপ করিয়াই যাও যে পর্যন্ত না জপ সেই অমাত্র বা মাত্রাতীতে পর্য্যবসিত হয়। তাকে জোরপূর্বক মাঝপথেই 'বধ' করিও না। তোমার ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান করিয়াই চল যে পর্যন্ত না ক্রিয়া যাইয়া নৈষ্কর্ম শান্তে লীন হয়। ক্রিয়াটিকেও একটু আগাইতে না আগাইতে খোঁড়া করিয়া ফেলিও না। তোমার ভজন চালাইয়াই যাও, যে পর্যন্ত না নিখিল ভঙ্গুরের ভীতিটি নিজেই ভাঙিয়া যাইতেছে এক পরম জ্যোতীরস আস্বাদনে। একটুখানি ভাবের মৌতাত হইল, আর তাতেই বুঁদ হইয়া পড়িয়া রহিও না। আর, জ্ঞানী তুমি, তোমার স্মরণ মননাদিও করিয়া চল সেই পর্যন্ত, যেখানে সকল ভঙ্গুরের অসঙ্গী, কিনা সঙ্গাহীন, যে প্রপঞ্চোপশম, অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব, কেবল তারই সঙ্গালাভটি অর্থাৎ তাতেই স্থিতিটি ঘটিতে পারে। ভাগত্যাগ-লক্ষণাদি বিচারে লক্ষ্যার্থের শুদ্ধিটি যেই হইল মনে করিলে, অমনি—'বাস্ কেল্লা ফতে' বলিয়া মল্লের বাহ্বাস্ফোটে এবং আস্ফালনে প্রবৃত্ত হইও না। আবশ্যক—সেই পরম জ্যোতীরসের সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং আস্বাদন! কুস্তীর আখড়ায় কর্মবাদীকে, উপাসনাপন্থীকে বিস্তর মারাত্মক 'যুযুৎসু'র প্যাঁচে হয়তো তুমি কাৎ করিয়াছ; কিন্তু মনে রেখ—কুস্তির আখড়ায় যাই হোক, আখেরে তাদের সাথে একান্ত অন্তরঙ্গ কোলাকুলিটি না হওয়া পর্যন্ত, তোমার ঐ পালোয়ানের ল্যাঙট্ খসাইয়া একান্ত নিরাবরণ যে 'পারমহংস্য' অপরোক্ষানুভূতি, তাতে যাইয়া চির-সোয়াস্তির হাঁফটি ছাড়ার যো নাই!

[আগে যে 'উ'কাররূপে উদ্ধারণ বা উত্তোলন শক্তির পরিচয় মিলিয়াছে, সে শক্তির কার্য ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু এবং ব্যোম এই পঞ্চ পর্বে শেষ করিতে হইবে। বারাহী, নারসিংহী, ঐন্দ্রী, শিবদূতী এবং চামুণ্ডা এ মূর্তিপঞ্চকের এদিকেও রহস্যব্যঞ্জনা বুঝিতে হইবে। পরে এগুলি আলোচিত হইবে। জপাদিতে কোন্ তত্ত্বের প্রাধান্য দেখিতে হয়।]

ভঙ্গুর-ভঙ্গের ভঙ্গী অনুকূলে না প্রতিকূলে?

যেটি ভঙ্গুর সেটি ভাঙিবে তো অবশ্যই, কিন্তু ভাঙিবার আগে যদি হিড়িম্বাতনয় ঘটোৎকচের মতো 'কুরুকুল চেপেই', অর্থাৎ বৈরধ্বংস করিয়াই ভাঙিত, তবে বরং ভরসার কথাই ছিল। কিন্তু ভাঙে প্রায়ই আপন ঘরটি ভাঙিয়া—কালবৈশাখীর ঝড়ে

গৃহস্থের আঙ্গিনায় তালবৃক্ষের মত। তাই যেটা ভঙ্গুর তাকে ভাঙার সময় ঐ ঘটোৎকচী কায়দাটা শেখানো চাই। অর্থাৎ, সে মিত্র কি বৈরী এটি বাছিয়া তবে ভাঙিবে। কাজেই, ভঙ্গুরকেও ব্যাহৃতি শেখান চাই। নইলে নীচের এই কারিকার দশাটি তোমার হইতে পারে:—

অয়ি কুরঙ্গ ভুজঙ্গসমাকুলং
চল চিরায় বিহায় লতালয়ম্
বৃকনখেষু পতংশ্চ পলায়সে (পলায়িতঃ)
কিমু বনাগ্নিমুখেষু নিপাত্যসে॥ (নিপাতিতঃ)॥৫৪

এক ভঙ্গুর হইতে পলায়িত অন্য ভঙ্গুরে নিপাতিত।

পারমহংস্যভূমি

অয়ি আর্তজীবরূপী কুরঙ্গ! তুমি তো তোমার লতাবিতানে (অর্থাৎ গৃহে) সুখেই ছিলে; কিন্তু তোমার সুখের লতালয়টি কালসর্পসমাকুল দেখিতেছ তুমি। তাই যদি দেখ তো—চল, ওকে চির বিদায় দিয়া চল। কোথায় যাইবে? গহনবনে? সেখানেও যে সাক্ষাৎ কৃতান্তের দোসর বৃকের নখরে পতিত হইলে! সংসার থেকে ভয় পেয়ে লেঙ্‌টি চিম্‌টে নিয়ে বনে চলে এসেই বুঝি ভয় এড়াবে ভেবেছিলে? বনেও যে বাঘ! সে বাঘ যে কি চিজ তা ভেবে দেখ। কিন্তু তোমার বরাত ভাল, তুমি বাঘের নখরে পড়েও গুরুকৃপায় পালিয়ে আসতে পেরেছ। কিন্তু পালিয়েই বা যাচ্ছ কোথায়? কালদাবাগ্নির মুখে আবার ঝাঁপ দিতে নিশ্চয়ই নয়! গৃহে সর্পভয়, বনে ব্যাঘ্রভয়, প্রব্রজ্যাতেও কালাদাবাগ্নি ভয়! পরিব্রাজক হইয়াও দেখিতেছি—সেই শালা ভঙ্গুরটা কাছা চেপে ধরে সঙ্গেই আছে; সুতরাং ভয় তো কাটে নাই! আর সব ভয় যদি বা কাটিল, কালভয় তো কাটিল না! গৃহে, বনে ঐ কালভয়টা ভোল ফিরাইয়া ছিল! কিন্তু এখন? মহিষগলঘন্টাঘনরবাৎ 'নিরালম্বো লম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্'! পারমহংস্যভূমি ঠিক ঠিক অধিগত না হওয়া পর্যন্ত এই 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ' রূপটি তিনি অতিবৃদ্ধের কাছেও সম্বরণ করেন না; কাজেই ঐকান্তিক 'অভীঃ' ভাবটি সহজ হয় না।

অতঃপর ব্যাহৃতিত্রয় যে কিভাবে জাপকের জপযজ্ঞে ক্রমশঃ নাদজ্যোতিঃ

প্রভৃতির স্ফুরণ ঘটাইয়া সমর্থ মন্ত্রোদ্ধার এবং মন্ত্রচৈতন্যের সাধক হইয়া থাকে, সেটির সম্যক্ অনুশীলনার্থ নিম্নোক্ত কারিকাষ্টক ভাবনা কর:—

(২২)

॥ নাদোরুক্রমাষ্টকম্॥

জপকৃদপি যদত্তি স্বং জ্বপং হ্যন্নরূপং
তদশিতমিহ ধত্তে সপ্তধাত্বং কলাভিঃ।
ন নদতি তনুনাদে বাচিকাদীনি নাদে
নদতি চ চতুরস্রং জ্যোতিরন্নং রসালম্॥
ধমতি চ তনুশঙ্খং শাশ্বত ব্যোমনাদে
স্ফুরিতমবরসন্ধৌ জ্যোতিরংশুস্ফুলিঙ্গোঃ।
কণমিহ যদি সেতুং প্রাপ্য পশ্যেরজস্রং
বদ বৃতবরসন্ধিশ্চেক্ষসে কিং ততো বা॥
সেতোঃ পারে নিপততি মনো মন্যমানং পরাঞ্চি
ত্যক্ত্বা তন্বীং ভজতি তদণুং প্রোজ্জ্বলাং যোনিমগ্র্যাম্।
যদ্‌ভূমিষ্ঠং তদপি চ মনো মৈথুনান্ নাদভাসোঃ
পশ্যন্তীং তৎস্বরসকুশলজ্যোতিষা কো ন পশ্যেৎ॥
যাবৎ সেতুং ন তরতি মনুস্তুস্তাবদুদ্ধারকর্ম
বারাহী তাং ভুবমিবজলাদুদ্ধরেন্ মন্ত্রশক্তিম্।
তীর্ত্বা সন্ধী ত্ববরবরয়ো র্নারসিংহী-প্রভাবান্
নাদজ্যোতির্মিথুনমনসোরুক্রমেণার্ণসংবিৎ॥
ক্রাম্যেন্নোচেদণুসরণিতঃ ক্রান্তদর্শী পুমান্ স
চৈতন্যং কি ভবতি মহতোঽপ্যুদ্ধৃতস্যাক্ষরস্য।
পশ্যন্ত্যাং যৎ ত্রিতয়মিলনং নাদসদ্‌ভাবভাসাং
তত্তীর্থানাং সুপথভজতাং মন্ত্রচৈতন্যসিদ্ধিঃ॥
আসেতোর্যোঽক্ষরতনুভৃতাঽনাহতো গীয়মান
শ্চক্রে সোঽপি প্রথমসবনং মন্ত্রচৈতন্যযাগে।

চক্রাতে গীর্দ্বিবিধ সবনং ভাবদোহশ্চ সেতৌ
পারে প্রত্যক্ ত্রিবিধসবনং চক্রিরে ভূর্ভুব স্বঃ॥
স্ফূর্তোনাদঃ স্ফুরতি যদি চিৎ স্থূলমন্ত্রাক্ষরেষু
মূর্ত্তোভাবঃ ক্ষরতি যদি চিন্ নাদমধ্যস্থমাধ্বীঃ।
জোষং জ্ঞানং মৃশতি যদি চিজ্ জ্যোতিষে নাদভাবৌ
জ্যোতিঃ পারং চলতি যদি চিজ্ জ্যোতিষাং জ্যোতিরেতি॥
ন্যসৈর্ন্যস্তস্তদরণিচয়ো জাপযাগায় বেদৌ
প্রাণায়ামৈরনলমথনে ব্যাপ্রিয়েত ক্রতুজ্ঞঃ।
বারাহী সা তদুপরি নয়ে ন্নিম্নগং ভূতশুদ্ধৌ
মানসেজ্যং বহতি হবিষা হ্যাহুতং তদ্‌বরেণ্যম্॥৫৫-৬২

পুনশ্চ ব্যাহৃতিযজ্ঞ। 'পর্জ্জন্য' শব্দের ব্যঞ্জনা

'যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ'—এই বাক্যে 'অন্নসম্ভব' হইতেছে 'ভূঃ', 'পর্জ্জন্য' হইতেছে 'স্বঃ' আর—'যজ্ঞ' স্বয়ং 'ভুবঃ'। পৃ অথবা পৃ+জন্ এই ধাতু মিথুনে উৎপন্ন পৃজন্ অথবা পৃজন্=যাহা শ্রেয়ের এবং প্রেয়ের পূরক ও জনক। এর ভাব 'পর্জ্জন্য'। এটিকে শুধু সাধারণ মেঘ অথবা বৃষ্টি মনে করিও না। প্রেয়ঃ অথবা অভীষ্ট সমর্থ এবং পূর্ণভাবে বর্ষণকারী যাহা কিছু পরোক্ষে ('সেই'ভাবে) অবস্থিত, তারি সাধারণ সংজ্ঞা 'পর্জ্জন্য'। পর্জ্জন্যে যে শ্রেয়ঃ প্রেয়ঃ পরোক্ষে, সম্ভাবনা মাত্ররূপে রহিয়াছে, 'অন্ন' রূপে সেটি প্রত্যক্ষ হয়, গোচর হয়। তখন সেটি আর 'সেই' নয়, তখন সেটি 'এই' (সুতরাং 'ভূঃ')। যজ্ঞকর্মটি কোনও অতর্কিত শক্তিবিন্যাস ('অপূর্ব') সংঘটিত করিয়া 'সেই' কে 'এই' করিয়া দিতেছে। ঐ উপযুক্ত শক্তিসংস্থাটিকে (requisite field of energy-কে) 'এই' ও বলা চলে না, 'সেই' ও বলা চলে না; তার নিজস্ব (intrinsic) কোনও 'দিক' (directedness) নাই। এটি 'ভুবঃ'।

জপযজ্ঞে কিভাবে 'যজ্ঞামৃতফলভুক্' হইবে?

এখন দেখ জপযজ্ঞে জপকৃৎ আপন যে জপকে (স্বং জপং—অব্যয়স্বঃ, এখানে অন্নরূপে উপস্থিত হইয়া আর অব্যয় নাই; সেটি 'ব্যেতি'; কাজেই 'স্বং জপং' হইতে

প্রস্তুত) অন্নরূপে অদন করিয়া থাকেন, সে অন্নও (পূর্বোক্ত রীতিতে) সপ্তকলাপ্রসজ্যতাবশতঃ সপ্তধা হইয়া থাকে। তার মধ্যে প্রথম তিনপ্রকারের অন্নপ্রাপ্তি ঘটে বাচিক, উপাংশু এবং মানসজপে (অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ বৈখরীজপে), যতক্ষণ না ঐ ত্রিবিধজপে সূক্ষ্ম নাদের স্ফুরণটি না হইতেছে (ন নদতি তনুনাদে)। অর্থাৎ সূক্ষ্মনাদের অনুগ্রহের পূর্বাবস্থায় ঐ বাচিকাদি ত্রিবিধ অন্নের যে অদন, সেইটিকে এখানে (ইহ) লক্ষ্য করা হইল বুঝিতে হইবে। কিন্তু তৎপরে অর্থাৎ, নাদ অভিব্যক্ত হইলে পর (নাদে নদতি চ), যে অন্ন অদনের নিমিত্ত মিলে, সে অন্ন সত্যই জ্যোতিষ্মৎ এবং রসাল, এবং যেহেতু জ্যোতীরূপে উপস্থিত সেই অন্ন 'চতুরস্রং', কিনা চারিটি 'কোণ' এবং 'অর' বিশিষ্ট, সেহেতু নাম অথবা নাদানুগ্রহের পর রসাল জ্যোতীরূপে উপনীত অন্নেরও চারিটি 'কলা' আছে জানিবে।

সেতুর অবর ও বর সন্ধি। 'তনুমানস' কাহাকে বলে? তনুমানস অনুভূতির কোন স্তর পর্যন্ত লইয়া যায়?

মহানাম অথবা নাদ তো ব্যোমবৎ সর্বত্রগ এবং শাশ্বতিক। কিন্তু আমার জপক্রিয়ায় তাঁর অনুগ্রহ তো সচরাচর অনুভবে আসে না। অনুভবে আনিতে গেলে 'তনুশঙ্খে', কিনা, তনুমানসে—পরিক্ষীণরজস্তমঃ সূক্ষ্মক্রমাবগাহি মনে—সে 'ধ্বনি'টি শুনিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইতে হয়। তদ্‌বিমুখীনতা বশতঃই যত না স্থূলতা আর জড়তা জানিবে। আচ্ছা, তন্মুখীন সন্ধানটি সুরু হইল মনে কর। হইলে প্রথমে যে 'অন্ন' উপস্থিত হয়, সেটি জ্যোতিষ্মৎ বটে—সেটি আর জড়, মলিন অন্নও রহে না বটে—কিন্তু তখনও দেখি সে অন্নে 'আলোককণা'ই বিচ্ছুরিত হইতেছে যেন কত কুণ্ঠায় সঙ্কোচে! আলোকরাশি সকল বাঁধন ভাঙা তো নয়! জপ একটা অনিশ্চয়ের তমসার মাঝে যাত্রা করিয়াছে। তমসার পারে 'আদিত্যবর্ণ' যে মহান জ্যোতিঃ তার কোন নিদর্শনই মিলিতেছে না। সহসা দেখি—তমসার বুক চিরিয়া সচকিতে জ্যোতির কণা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। শুধুই কি অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিরই কণা? সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুতপূর্ব সুর ও ছন্দের এক ঝলক ঝঙ্কার, অনাস্বাদিতপূর্ব ভাবপুলকের একটু আধটু পরশ-শিহরণ! এই 'বিচ্ছুরিত কণবিভাব' ভাবটি ঘটে কখন? যখন জপ তনুমানসের হাত ধরিয়া 'অবরসন্ধি' স্থলে উপনীত হয় তখন। বৈখরী আর মধ্যমার সংযোজক সন্ধিটিকে 'অবর' এবং মধ্যমা এবং পশ্যন্তীর সংযোজক সন্ধিকে

'বরসন্ধি' বলিয়া জানিবে। পরে 'ভূঃ সন্ধি' ও 'স্বঃ সন্ধি' এ সংজ্ঞা করা হইয়াছে। আচ্ছা, সেতুর এপারের সন্ধিতে যদি 'কণ' রূপে এবং স্বয়ং সেতুতে উপনীত হইয়া 'অজস্র'রূপে পূর্বোক্ত জ্যোতিশ্ছন্দাদির অনুভবটি তোমার ঘটিয়া থাকে তবে বল দেখি—বরসন্ধি এবং তদুত্তর ভূমিতে (ততোবা) কিভাবে তাদের অনুভবটি হইবে? 'কণ' এবং 'অজস্র' এই শব্দদুটিতে ধ্যান দিও। 'অজস্র' অবস্থাতে 'কণ' ভাবটি যায় নাই; তবে কণসমূহের যেন কুণ্ঠা এবং কার্পণ্য দূর হইয়াছে; যেন, এক রুদ্ধ ঝরণাধারার মুখটি সহসা খুলিয়া গিয়াছে; তুমি চাপা দিতে চাহিলেও সে আর রুদ্ধ হইতে চায় না। Effort and Exertion এর কৃচ্ছ্রবাহিতার এবং অনিয়ততার বদলে Inspiration and Spontaneity-র এক অনায়াসনিয়ততা অবস্থাটি তোমার মিলিয়াছে। তৃষ্ণার্ত হইয়া ফল্গুর শুষ্ক বালুরাশি একটুখানি সরাইয়া তখনকার মত পিপাসা শান্তির একটুখানি জল পাইলে; কিন্তু বালির গর্ত ভরাট হইতে কতক্ষণ! গর্তের জলটুকু নষ্ট হইতেই বা কতক্ষণ! কিন্তু যদি কোনমতে বালুর তলে একটা 'ফোয়ারা' ফোটাইতে পার, তবে তার ওপর বিশ ঝুড়ি বালি চাপা দিলেও সে কি শুকিয়ে মরবে? এই অবস্থাটিকে 'অজস্র' বলা হইল। কণের পর অজস্র। প্রসাদ অগ্রে 'কণিকামাত্র' পশ্চাৎ 'ভূরিশঃ'; কিনা, ঢালাও। তখন 'ব্যাঘ্রঝম্পনে'ও নিস্তার নেই! তখনও হয়তো সংসারের খুঁটোয় আমার 'ভজন নাও'টি ঘাটেই বাঁধা! কাজেই বিপন্ন হয়ে ডাকি—দোহাই দেবতা! আমার এই যে ছটাকে খোলের নাও, এতে এক জাহাজের সওদা চাপিয়ে একে ঘাটেই ভরাডুবি করো না। খুঁটোটি খাসা লক্ষ্মী ছেলেটির মত খসাও দিকিন! তেমন গরজ বুঝলে ছটাকে খোলটাই বা জাহাজী খোল হতে কতক্ষণ! যাই হৌক, অজস্রের পরও আরও দুই প্রকারের 'জ্যোতী-রসাল' অন্ন আছে। কাজেই, আগের তিন, আর এই চার—সর্বসমেত সাত। শেষের দুটির নাম 'প্রোজ্জ্বল' এবং পরমোজ্জ্বল', যদি দাও, তবে এই চারের প্রথম দুটিকে 'কণোজ্জ্বল', 'কামোজ্জ্বল', বলিতে পার। রস (সুর) এবং বাণীর (ছন্দের) দিক দিয়াও এ সকলের স্বতন্ত্র নাম হইবে।

"নাদাভ্যন্তরং জ্যোতি র্জ্যোতিরভ্যন্তরমনঃ"

আচ্ছা, তনুমানস না হয় পথের দিশারী হইয়া সেতুটির 'বরসন্ধি' পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল। ফলে, নাদ, ভাব এবং 'ভাস' (জ্যোতিঃ) এ তিনেরই, কেবল কণরূপে নয় পরন্তু

অজস্ররূপেও আমার অনুভবে মিলিয়াছে। কিন্তু 'পরা' যদি বা নিতান্ত পরের কথা হয়, সেতুর পারের কথা তো পশ্যন্তী! সে দেশে ঐ আগেকার দিশারীই (গাইড) কি পথ দেখাইবে? না। এখানে আসিয়া আগেকার ঐ মনের (তনুমানসের) পতন ঘটে। সে মন সূক্ষ্ম বটে, তথাপি 'পরাঞ্চি'র বাতিক, বহির্মুখী হবার ঝোঁক সে কাটায় নাই। পরাক্-প্রবণ যে মন সে পশ্যন্তীর সীমানায় আসিয়া ঢোকার ছাড়পত্র পাইবে না। কেননা, এইবার সত্যকার 'অন্তর্দৃষ্টি' (Inner Vision) এর এলাকা আরম্ভ হইতেছে। বহির্দৃষ্টির বেগটুকু (momentum) এখানে কাটাইতেই হইবে। বহির্দৃষ্টির 'সংস্কার' (inertia) গুলো কিন্তু তখনও সহজে সঙ্গ ছাড়ে না। এইজন্য পশ্যন্তীর প্রথম কয়পাদে 'কম্‌লী নাহি ছোড়তা' দশাটি কাটে না দেখিতে পাই। সাচ্চার সঙ্গো ঝুটা, ভূয়াও কিছু কিছু বেমালুম মিশিয়া যায়। কাজেই, ব্যাহৃতি সাথে সাথে রাখিতেই হয়—বাছাই-এর নিমিত্ত। সেতু পার হইয়া পরাক্প্রবণ মনটি তনুত্যাগ করিল বটে, কিন্তু তার 'সঙ্কোচ শরীরটা' আরও কিছুদূর সঙ্গো সঙ্গো চলিল। তা সে চলুক। কিন্তু আগেকার মনের পতনের পরই অভিনব এক মন 'ভূমিষ্ঠ'ও হইল। (নাদাভ্যন্তরংজ্যোতি র্জ্যোতিরভ্যন্তরং মনঃ')। এ মন জাত হবার নিমিত্ত ভজনা করে যে 'যোনি', সে যোনি কেমন? অণু, অগ্র্যা, প্রোজ্জ্বলা। 'অণু' বলিতে সূক্ষ্মতার শেষ সীমা পর্যন্ত লইয়া যাইতে সমর্থ; 'অগ্র্যা' বলিতে 'অগ্রে' কিনা পুরোভাগে রহিয়া যেটি চলিতে এবং চালাইতে (lead দিতে) যোগ্যতা রাখে, সেটিকে বুঝিবে। অর্থাৎ, যেটি কোনও প্রকার সঙ্গীন সন্ধানেই পিছাইয়া পড়ে না। যেটির 'ধার' (অগ্র) কোন নিগূঢ় স্থানে আঘাতেই 'ভোঁতা' হয় না। আর, 'প্রোজ্জ্বলা' বলিতে অজস্রেরও উত্তর যে উজ্জ্বলতার প্রকর্ষ ভূমি—যেখানে জ্যোতিঃ শুধু চাক্ষুষ জ্যোতিঃ (Perceptual brightness) নয়, শুধু মানস জ্যোতিঃ (Conceptual lucidity) ও নয়, কিন্তু সত্যকার আন্তরজ্যোতিঃ বা বিজ্ঞানভাতি (Inner Illumination)—সেইটি বুঝিবে। এটি না বুঝিলে পশ্যন্তীর 'দর্শন'টিকে ঠিক বুঝা যাইবে না। আমরা দেখিব যে এই প্রোজ্জ্বলে আসিয়াও আবার 'সপ্তলোক'। সত্যে শেষ। (জপসূত্রে 'সত্যং', 'সত্যমিতি', 'সৎ' এবং 'তৎ'—এই চারি প্রকারে চারিটি সূত্রে দেখা হইয়াছে সত্য বস্তুকে)। আচ্ছা, 'যোনি'র সংবাদ লইলাম। নূতন জাতকটির নামকরণ কি হইবে? 'মন'ই বল। নাদ ও ভাস (স্ত্রীলিঙ্গা), এই দুয়ের মৈথুনে এটি জাত।। অর্থাৎ, নাদ এবং জ্যোতিঃ এ দুয়ের সম্মিলিত বপু থেকে এই মন জাত। অণু-

মানস, অতিমানস—এসব নামও আবশ্যক মত চলিতে পারে। এখন, পশ্যন্তীর যে সব অভিনব, অপরূপ জ্যোতির্ধাম (Realms of higher and brighter experience), সেগুলি, এই নবজাতক মনটির 'স্বরসকুশল দীপচ্ছটায়' কার না দেখা উচিত বল? এই নূতন আলোর দিশারী আপন রসে এবং আপন কৌশলে সমস্ত কিছুই সরস ও কুশলরূপে দেখাইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। সুতরাং, একে ছাড়িও না।

মন ও মনু পরস্পরের সহগ। ঋন্ধমান, সমৃন্ধমান, সমর্থমান—এই তিন মানে সত্যকার পশ্যন্তীর ভূমিতে অধিরোহণ

মনের সঙ্গো যাত্রীটি কে? মনু, কিনা তোমার জপ্যমন্ত্র। মন্ত্রের অগ্রে 'উদ্ধার', পশ্চাৎ 'চৈতন্য' সম্পাদন করিতে হইবে তো? উদ্ধারটি, ঐ সেতু পার হবার আগেই সারিতে হইবে। সেতুপার না হওয়া পর্যন্তই উদ্ধার কর্মটি চলে। উদ্ধরণশক্তি হইতেছে বারাহী, সৃষ্টির সর্বত্র। তুমি মনুকে মনের সঙ্গো দিয়া সেতুটি পার করাইতেছ। বারাহী সঙ্গো সঙ্গো মন্ত্রশক্তিকে নিম্নতল হইতে ক্রমে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া লইতেছেন। মন্ত্রের 'শক্তিমান' (Energy Level or Value) না বাড়িলে তো কোন কিছুই হয় না। বৈখরীজপে মন্ত্রশক্তি মুখ্যতঃ 'সমষ্টিমানে' (অর্থাৎ arithmetic summation ভাবে) বাড়ে। তাই সংখ্যা রাখিয়া জপ, পুরশ্চরণ। এই সমষ্টি মানটিকে ক্রমশঃ ঋদ্ধমান, সমৃদ্ধমান করার জন্য মন্ত্রের মধ্যে যিনি 'অর্দ্ধমাত্রা' রহিয়াছেন, তাঁর জাগৃতি ঘটাইতে হয়—যেমন মধুকৈটভভয়ভীত ব্রহ্মাকে যোগনিদ্রার স্তবে করিতে হইয়াছিল। ঋদ্ধমান হইলে 'অবরসন্ধি', এবং 'সমৃদ্ধমান' হইলে 'বরসন্ধি'টিও পার হইবে। তারপর 'সমর্থমান' হইয়া পশ্যন্তীতে প্রবেশ। ধর, একটা একটা পয়সা জমিয়ে একটি টাকা করিলে তারপর, তাকে এমন কারবারে খাটাইলে যাতে সে টাকাটি আপনাকে দুনো, তিনগুণ, চারগুণ করতে পারে। এমনি করে ধর ১০০ টাকা হল। তখন আবার তাকে এমন এক কর্মে লাগালে যাতে সে আপনাকে বর্গ, ঘন ইত্যাদি করে নিতে পারে, অর্থাৎ ১০০ হয় ১০,০০০ ইত্যাদি। বিজ্ঞানে Molar Energy, Molecular Energy, Atomic Energy এর সঙ্গোও তুলনা করিতে পার। বারাহী তো শক্তিমান ক্রমশঃ উত্তোলিত করিয়া চলিতেছেন; কিন্তু সেতুর উক্ত দুইটি সন্ধি উত্তীর্ণ হইতে নারসিংহীরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। কেননা, সন্ধি মানেই যাদের কোন

কোন ভাবে 'বিগ্রহ' আছে (অর্থাৎ 'সংগ্রহ' নেই), তাদের মিলন (সংগ্রহ) ঘটান। যত বৈর বিগ্রহ চূর্ণ করিতে সাক্ষাৎ কালান্তক বজ্রাধিক নখস্পর্শ ঐ নৃসিংহশক্তি। বারাহী এবং নারসিংহী দুয়ে তো মন্ত্রোদ্ধার কর্মটি সমাধা করিলেন। কিন্তু 'সংবিৎ'—মন্ত্রচৈতন্য? সেটি ঘটান উরুক্রম। কে তিনি? তিনি হইলেন নাদজ্যোতির্মিথুনতনু সেই অণু (বামন) মন, যাঁর কথা আগে বলা হইয়াছে।

আচ্ছা, বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি যাঁরা মন্ত্রোদ্ধারে ব্যাপৃতা হইবেন, তাঁরাই বা দেখা দেন কোথা হইতে? নিষ্ঠাসহকারে জপযজ্ঞটি করিয়া যাওয়া চাই। তাহা হইলে মন্ত্র, গুরু এবং ইষ্ট এই 'ত্রিমূর্ত্তি'ই যথা সময়ে ঐ ঐ শক্তিরূপে প্রকট হইবেন। তবে, তাঁর 'প্রাকট্য' তোমার 'নৈকট্যে'র অপেক্ষা করিতেছে এটি মনে রাখিয়া চলিবে। মন্ত্রাদি যেখানটায় আসিয়া তোমার উদ্ধারের ভার লইবেন, অন্ততঃ সেইখান পর্যন্ত— 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।'

মন্ত্রের শক্তিরূপে জাগরণ এবং সংবিৎরূপে জাগরণ। উদ্ধৃত মন্ত্র এবং উদ্বুদ্ধ মন্ত্র

সেই কবি ক্রান্তদর্শী স্বয়ং যদি সেই অণু (অতি সূক্ষ্ম, ক্ষুরের ধারের মত নিশিত) পন্থায় না গমন করেন তোমার পুরোভাগে, তবে পূর্ব পূর্ব ভূমিতে 'উদ্ধৃত' মহাশক্তিধর মন্ত্রাক্ষরেরও 'চৈতন্য'টি তো ঘটে না! অর্থাৎ, মন্ত্রাক্ষরের মহাশক্তিরূপে জাগরণ আর পূর্ণ মন্ত্রসংবিৎরূপে জাগরণ একই বস্তু নয় জানিও। উদ্ধৃতশক্তি আবার 'উদ্বুদ্ধ'ও হওয়া চাই। শুধু 'উত্তিষ্ঠত' এবং 'জাগ্রত' হইলেই হয় না, 'নিবোধত' হওয়াও চাই। শক্তি নিজেকে শুধু শক্তিরূপে নয়, শুধু ভাবরূপেও নয়, বোধি বা বিজ্ঞানরূপেও নিজেকে উপলব্ধি (realize) করিবে। এই অত্যাবশ্যক পরিণতিটির নিমিত্ত ভিতরে ক্রান্তদর্শী কবি কোনও এক পুরুষের সঙ্গ মেলা চাই। বর্তমানে আণব বিজ্ঞানে মন্ত্রোদ্ধার কুশলতায় মহাশক্তির জাগৃতি ঘটিয়াছে। মন্ত্রচৈতন্য বিধানে যে পুরুষটি (Scientific Theory) ব্যাপৃত আছেন, তিনি কি ক্রান্তদর্শী কবি? তা তো ননই। বরং তিনি একটি চোখেই দেখেন, অপরটি তাঁর অন্ধ। তিনি বাহিরের বিজ্ঞানে বিদগ্ধকুশলী, কিন্তু আন্তর বিজ্ঞানে, প্রজ্ঞানে? অন্ধ বলিলেও চলে।

সুতরাং দেখিতেছি যে মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্যের মাঝে এক দুস্তর ব্যবধান

রহিয়াছে। মন্ত্রের সাধনার যেখান হইতে একটুখানি জ্যোতির স্পর্শ মিলে সেইখান হইতেই মন্ত্রচৈতন্যের সূচনা হইল বলা যায় বটে, কিন্তু মন্ত্রচৈতন্যসিদ্ধি অনেক দূরের কথা। মধ্যমা সেতুটি পার হইবার পর আমরা পশ্যন্তীর সীমানায় আসিয়া উপনীত হই। এখানে নাদ, ভাব এবং ভাস (জ্যোতি) এই তিন ধারার মিলন ঘটিয়া যে ত্রিবেণী-তীর্থ রচনা করিয়াছেন, সেই তীর্থটিকেই বরণ করিয়া যে সাধক কুপথ বিপথ বর্জনপূর্বক সুপথ ধরিয়াই অগ্রসর হন, তাঁহার ভাগ্যেই মন্ত্রচৈতন্যসিদ্ধি ঘটিবে ইহা নিশ্চিত জানিও।

মন্ত্রযাগের ত্রিবিধ হবন। এই তিনটি হবন পরপর কিসের দ্বারা নির্বাহিত হইয়া থাকে? নাদ, ভাব, জ্যোতি—ভূর্ভুবস্বঃ

যে পর্যন্ত না সেতুতে উপনীত হইতেছি সে পর্যন্ত মন্ত্রচৈতন্যরূপ যাগে আমার প্রথম হবনটা মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হয়। এই প্রথম হবনটি কেই বা কাহার দ্বারা করিয়া থাকেন? অক্ষর তনুধারী যে মন্ত্র (যথা প্রণব) তিনি অনাহত ধ্বনি গান করিয়া সেই অনাহত নাদের দ্বারাই প্রথম হবনটি নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ মন্ত্রাক্ষর নিষ্ঠাপূর্বক জপ করিয়া যাইতেছি, কিন্তু সে অক্ষরের মধ্য হইতে অনাহত ধ্বনিরূপে নাদ এখন স্ফুরিত হইতেছেন না; এখন নাদানুগ্রহটি হয় নাই, সুতরাং মন্ত্রচৈতন্য যাগে আমার যেটি প্রথম হবন, সেটি এখন প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু অক্ষরতনুভৃৎ মন্ত্র যে মুহূর্তে অনাহত সুরটি ধরিলেন, সেই মুহূর্তেই আমার প্রথম হবনের সময় ও সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেতুতে উপনীত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রথম হবনটিই আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া থাকে। তারপর যেই সেতুতে গিয়া উপনীত হইলাম তখন মন্ত্রচৈতন্য যাগে দুই প্রকার হবনের নিমিত্ত আমাকে প্রস্তুত হইতে হয়। এই দুইপ্রকারের মধ্যে এক প্রকার হবন স্বয়ং বাক্ই নির্বাহ করিয়া থাকেন, আর অপরটি নির্বাহ করেন ভাব, যিনি বাকের সাররূপে নির্গলিত হইয়াছেন (ভাবদোহ, ভাবরূপদোহ)। অর্থাৎ বৈখরী-জপের অন্তে মধ্যমার সেতুতে উপনীত হইয়া মন্ত্রচৈতন্যের নিমিত্ত যে দুটিকে আমাদের মুখ্যভাবে সমাশ্রয় করিতে হয়, সেদুটি হইতেছে বাক্রূপী নাদ এবং বাক্যের সার অথবা রস যে ভাব সেই ভাবদোহ। সেতুর পারে যখন পশ্যন্তী অথবা প্রত্যক্চৈতন্যের ভূমিতে যাইয়া উপনীত হই, তখন আমাকে তৃতীয় হবনটিও সারিয়া ফেলিতে হয়। এখানে এই শেষ তিন প্রকারের

হবনের নির্বাহয়িতা কাহারা? নাদ, ভাব এবং জ্যোতি এই ত্রিপুটী সম্মিলিত ভাবে এই চরম হবনটি সমাধা করিয়া থাকে। এই ত্রিপুটীর নামান্তর রহস্যভাষায় ভূর্ভুবস্বঃ। অর্থাৎ বাক্‌রূপী নাদ ভূঃ স্থানীয়, ভাব ভুবঃ স্থানীয় এবং জ্যোতি স্বঃ স্থানীয়। এই ভাবে জপযজ্ঞে পূর্ণাহুতিটি সাঙ্গা না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রচৈতন্যের পূর্ণতা সাধিত হয় না। সুতরাং মন্ত্রোদ্ধারের মত মন্ত্রচৈতন্যও একটি ক্রমবর্দ্ধমান উন্নয়ন কর্ম। মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্য হইবার পর জপ আরম্ভ হইবে, এটি মনে করা বিসদৃশ। নিষ্ঠাপূর্বক জপকর্মটি যদি সৌষ্ঠবের সহিত চলিতে থাকে, তবে তার আপন ঋতচ্ছন্দের দ্বারাই এই অত্যাবশ্যক মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্য সংঘটন করিতে সে সমর্থ হইবে। এস্থলে 'নিষ্ঠা' বলিতে জপনিষ্ঠা, গুরুনিষ্ঠা, এবং ইষ্টনিষ্ঠা এই তিনটিই বুঝিতে হইবে; এবং 'সৌষ্ঠব' বলিতে বিদ্যা, শ্রদ্ধা এবং উপনিষৎ এই তিনের ত্রিবেণীসঙ্গামটি বুঝিতে হইবে।

মন্ত্রযাগে বেদি, সমিধ্ এবং অগ্নিমন্থন কিভাবে ভাবনা করিতে হইবে? ন্যাস, ভূতশুধ্যাদি প্রক্রিয়ার তাৎপর্য।

জপকারীর যন্ত্রের Antipathy ও Sympathy.

তৎপরে জপযাগটি প্রকারান্তরে ভাবনা কর। যাগানুষ্ঠানের নিমিত্ত বেদির প্রয়োজন হয়। তোমার এই দেহকেই বেদিরূপে ভাবনা কর। অঙ্গান্যাস, করন্যাস প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা এই বেদির উপরে যজ্ঞকাষ্ঠগুলি বিন্যস্ত কর। অর্থাৎ ভাবনা কর যে তোমার এই দেহ রক্ত মাংস প্রভৃতির সমষ্টি নয়, কিন্তু ইহা হইতেছে মন্ত্রাক্ষরময়। এই মন্ত্রাক্ষরময়ী তনু হইবে তোমার জপতনু। ন্যাসক্রিয়ার দ্বারা এই আবশ্যক auto-suggestion-টি গোড়াতেই দিয়া লইতে হয়। কেন না, সমানে সমানে কারবার চলে, বিষমে বিষমে চলে না। সেই নিমিত্ত মন্ত্রাক্ষরের সঙ্গো তোমার যে সম্পর্কটি পাতাইতে হয় সে সম্পর্ক হইবে sympathetic. তোমার যন্ত্রগত antipathy দূর না হইলে জপের স্পন্দনগুলি তোমার উপরে সুষ্ঠুভাবে ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্য ন্যাস হইল বেদির উপরে যজ্ঞকাষ্ঠের বিন্যাস। তৎপরে অভিজ্ঞ যজ্ঞকারী প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করতঃ সেই বিন্যস্ত যজ্ঞকাষ্ঠে অগ্নি মন্থন করিবেন। তৎপর ভূতশুদ্ধি দ্বারা সেই অধোমুখ অগ্নিকে উর্দ্ধমুখ ও উর্দ্ধগামী করিয়া লইতে হইবে। যে শক্তির দ্বারা অধোগ শক্তি উর্দ্ধগ হইয়া থাকে সেটিকে বারাহী শক্তি পূর্বাপর বলা হইতেছে। সুতরাং

ভূতশুদ্ধিতে এই বারাহী শক্তিরই উদ্বোধন করিয়া সেটিকে প্রসন্ন করিতে হয়। রহস্যভাষায় ইহাই হইল কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। বস্তুতঃ এই জাগরণটি ঘটিতে কিছু সময় লাগে, তথাপি ভূতশুদ্ধিকালে এই ঊর্দ্ধগজাগরণের একটা auto-suggestion আমাকে কল্পনার অথবা ভাবনার মারফতেও দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কতকগুলি মন্ত্রাক্ষরও রহিয়াছে, এবং তাদের নিজস্ব একটা ভাবনানুকূল ক্রিয়াও রহিয়াছে। তৎপরে মানসপূজা, ধ্যান ইত্যাদি রূপ অন্তর্যাগ। ইহার দ্বারা সেই ঊর্দ্ধগ বহ্নিশিখায় হবিঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং তার ফলে সেই সমৃদ্ধ অগ্নি সেই বরেণ্য ভর্গোরূপ জ্যোতিতে যাইয়া মিলিত হয়। ক্রিয়াটিকে এইভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ইহা যথার্থভাবেই মন্ত্রোদ্ধার এবং মন্ত্রচৈতন্যের হেতু হইয়া থাকে।

মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে 'প্রসুপ্তামিব' চিৎশক্তিকে জাগাইয়া তোলাই মন্ত্রের সাধন। চণ্ডীতে ব্রহ্মার যে যোগনিদ্রার স্তুতি তার মুখ্য তাৎপর্য ইহাই

'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ'—যদি মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে এই বরণীয় ভর্গোরূপ জ্যোতিঃ অথবা চৈতন্য সত্য সত্যই না রহিত, তাহা হইলে কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই সেটির চৈতন্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হইত না। মন্ত্রাক্ষরে মধ্যেও স্বয়ং চিৎ শুদ্ধরূপে, শক্তিরূপে এবং ছন্দোরূপে অনুস্যূত রহিয়াছে, অগ্নিগর্ভা শমীবৃক্ষের মত মন্ত্রাক্ষরের গর্ভ হইতে সেই শাশ্বত অগ্নি যাহাতে ভূমিষ্ঠ হন সেই কর্মটি আমাদের করিয়া যাইতে হয়। এই কর্মটিরই নাম মন্ত্রের সাধন। অন্তর্নিহিত ঐ চিজ্জ্যোতি ক্রমে ক্রমে, শনৈঃ শনৈঃ স্ফুরিত হইতে থাকেন। যেমন যেমন প্রকাশাবরণের ক্ষীণতা সাধিত হইতে থাকে, তেমনই ইহার স্ফুরণটি অস্মদাদির জপাদি কর্মের ভিতর হইতে অনুভবগোচর হইতে থাকে। প্রথমে বৈখরীজপে স্থূলমন্ত্রাক্ষরের মধ্যে ইনি নাদরূপে প্রকটিত হন। তখন আমরা নাদের সন্ধান পাই; যে নাদের আধারে সকল শব্দই অভিব্যক্ত হইতেছে, এবং যে আধারেই আবার সকল শব্দ লীন হইয়া যাইতেছে। তৎপরে দ্বিতীয় অবস্থায় নাদের মধ্যস্থিত যে রস বা মধু সেটির ক্ষরণ আরম্ভ হয়, ফলে ভাবের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে, নাদের মধ্যে যে ভাব নিগূঢ় ছিল সে ভাব যেন মূর্ত হইয়া সাক্ষাৎ আস্বাদনের বস্তু হইয়া থাকে। তখন আমরা বলি—'নামে এত রস, এত মধু!' এইটি হইল অক্ষরের অভ্যন্তরস্থিত

চৈতন্যের দ্বিতীয় উন্মেষ। তৎপরে পূর্বে অনুভূত ঐ নাদ এবং ভাব এতদুভয়ের মন্থন কর্মটি আরম্ভ হয়, যেমন যজ্ঞে অগ্নির নিমিত্ত অরণিদ্বয়ের মন্থন। এই মন্থনক্রিয়াটি একান্ত এবং শান্ত ভাবে চলিতে থাকিলে যে অগ্নি প্রাদুর্ভূত হন, তাঁর নাম জ্ঞান। এই জ্ঞানরূপ জ্যোতি প্রাদুর্ভূত হওয়া মাত্রই কিন্তু চিতের সামগ্রী শেষ হইয়া যায় না। জ্যোতির পারে যে 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' রহিয়াছেন—যে জ্যোতিকে সূর্য, চন্দ্র, তারা, অগ্নি কেহই প্রকাশ করেন না, পরন্তু 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি'—সেই জ্যোতি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ না হওয়া পর্যন্ত এ যজ্ঞের অবসান নাই জানিবে।

(২৩)

পরোক্ষ শক্তিনির্ঝররূপ বীজ—"স্বঃ"

দন্ত্যসশ্চ বকারশ্চ রকার ইতি ত্র্যর্ণকম্।
বীজং স্বরিতি জানীয়াদদৃষ্টশক্তিনির্ঝরম্॥৬৩

'স্বঃ' এই অব্যয়শব্দটিকে বিশ্লেষণ করতঃ পাই দন্ত্য স, ব এবং র। এই তিন অক্ষর (অর্ণ) বিশিষ্ট যে বীজ, সেটিকে 'অদৃষ্ট', কিনা পরোক্ষ—সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হইতেছে না এমন—সত্তাশক্তি এবং ছন্দের নির্ঝর বা আকররূপে জানিবে। যে 'অব্যক্ত' ('সেই') হইতে সমস্ত কিছু 'ব্যক্তিমাপন্ন' ('এই'রূপে ব্যক্ত) হয়, সেটি স্বঃ।

ঐ বীজের বর্ণত্রয়ের বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা

দতা সংচ্ছিন্নরূপত্বং মহাপ্রাণস্য ব্যক্তয়ে।
বকারেণ নিগূঢ়ত্বং পারোক্ষ্যমপি গম্যতে॥
সকারঃ শক্তিপিণ্ডশ্চ রকারশ্চ নিরূপকঃ।
গূঢ়গাঢ়ত্ব মায়াতি রকারস্যান্তরান্বয়াৎ॥৬৪-৬৫

যেটি স্বয়ং মহাপ্রাণ, সুতরাং অবিভক্ত, অপরিচ্ছিন্ন রূপ (undifferentiated), সেটি 'দতা', কিনা দন্ত্যবৃত্তি আশ্রয় করতঃ, যেন পরিচ্ছিন্নরূপ (differentiated) হইতেছে। 'ব' কার সূচিত করে নিগূঢ়তা এবং পরোক্ষতা, এই দুটি। আচ্ছা, মহাপ্রাণ আপনাকে সংচ্ছিন্নরূপ করেই বা কেন? 'ব্যক্তয়ে'—ঐরূপ না হইলে 'ব্যক্তি' (individualized

manifestation) হয় না এইজন্য। কিন্তু এই 'ব্যক্তিতা' (individualization)টি 'একলাফে'ই হয় না। মহাপ্রাণকে যদি বল 'শক্তিসামগ্রী' (undifferentiated Power Continuum), তবে, সে ব্যোমবৎ শক্তিরাশিতে প্রথমতঃ বিচয় বা সংচ্ছেদ (differentiation)এর ফলে 'শক্তিপিণ্ড' বা নীহারিকা জাত হওয়া চাই। যেমন, এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিতে cosmic nebulæ or 'clouds'। 'দন্ত্য স' কার, ব্যক্তির মাধ্যমিক অবস্থা এই যে শক্তিপিণ্ড, তারই সূচনা করিতেছে। 'র'কার এই শক্তিপিণ্ডের 'নিরূপক'—রূপশিল্পী (Informing Factor) জানিবে। কিন্তু, নিরূপকটি রহিয়াও যেন 'হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে'! ঐ শক্তিপিণ্ডের মধ্যে কেহ যেন নিগূঢ়ভাবে রহিয়া তার যত কিছু নিরূপণীয়—নিরূপণযোগ্যরূপ সে সব 'আড়াল' করিয়া নেপথ্য রাখিয়াছে। সে যেন দৃশ্যমঞ্চের যবনিকাটি সরাসরি তুলিতে দিতেছে না! 'স'কার এবং 'র'কারের 'অন্তরা', কিনা মাঝে, থাকিয়া (অন্তরান্বয়াৎ) 'ব'কার এই নেপথ্য অথবা নিগূঢ় ভাবটি ঘটাইতেছে। 'ব' আপনাকে প্রথমতঃ 'উব্', আর, পরে—'উ' না করা পর্যন্ত পারোক্ষ্যের ঐ নিপাতিত যবনিকাটি সম্পূর্ণ উত্তোলিত হয় না। জলীয় বাষ্প তো বায়ুমণ্ডলে সর্বত্র ব্যাপিয়াই রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বারিবর্ষণ হবার আগে তার 'বাষ্পপিণ্ড', কিনা, মেঘরূপ হওয়া চাই। কিন্তু আবার মেঘ হইলেই তো বৃষ্টি হয় না। 'ব'কার যবনিকার কপিকলের দড়ি ঢিল করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত কেহই আসরে হাজির হন না। অধ্যাত্মসাধনেও এর দৃষ্টান্ত নানাভাবে ভাবনা কর। 'ব' বীজটিকে প্রসন্ন করিতেই হয় সাধককে।

(২৪)

'হযবলর' এই আকৃতিটি কেন আসিয়া থাকে? ইহার রহস্য বিশ্লেষণ

'হ' থেকে 'য'এ আসিলে তারপর তো 'র'ই রীতিমাফিক আসা উচিত। কিন্তু 'র' স্বয়ং এলেন না। যিনি দেখা দিলেন তিন 'ব'। মহাপ্রাণবর 'হ'কার ব্যোমবৎ। তিনি 'গতি' অথবা 'কলনবৃত্তিতা' স্বীকার করতঃ হইলেন 'য'। তার ফলে মিলিল 'ক্রিয়াসম্ভব সহকৃত শক্তিসামগ্রী'। কিন্তু পূর্বোক্ত 'ব্যক্তি' 'ব্যক্তি'রূপে রূপায়ণটি তদ্দণ্ডেই তিনি হইতে দিলেন না! তিনি সরাসরি 'নিগূঢ় পরোক্ষ' ভাবটি আশ্রয় করিয়া

বসিলেন। 'পিণ্ড' সাজিয়া এই অপরূপ ব্রহ্মাণ্ডটাকে যেন আপন 'ভাণ্ডোদরে' গর্ভোল্বন দ্বারা আবৃত করিলেন। এইটি 'ব'কার। 'ব'কার থেকেও সোজাসুজি 'র'কার (রূপায়ণ) নয়; মাঝে আসিয়া থাকে 'ল'কার (পিণ্ডের পক্ষে আবশ্যক plastic, mouldable condition)। 'নিগূঢ় নেপথ্য বাধনমের' অবস্থাটি কাটাইয়া তবে ইহাকে আসিতে হয়। তৎপরে—'র'কার। ধর অন্ন। অন্ন হইতেই শরীরযন্ত্রটা চলার নিমিত্ত আবশ্যক তাপাদি শক্তি পাইতে হয়। বাতাস, জল, মৃত্তিকা ইত্যাদিতে 'অন্ন' ব্যাপক এবং সচলরূপে আছে বটে, কিন্তু সেরূপে সেটি অস্মদাদির পক্ষে ঠিক 'আহার্য অন্ন' নয়, যদিও বৃক্ষলতাদির পক্ষে সেটি আহার্য বটে। অস্মদাদির পক্ষে আহার্য অন্ন হইতে গেলে সেটিকে ব্রীহিযব দুগ্ধাদিরূপ ধরিতে হয়। অর্থাৎ যে অন্ন 'হ য' আকৃতিতে ছিল, তাকে 'ব' আকৃতিতে পাইতে হয়। ব্রীহিযবাদিরূপে, ব্যাপক এবং সচল যে অন্ন সেটির যেন 'রুদ্ধভাণ্ডস্থ' অথবা বদ্ধগুদাম-জাত ভাবটি কোনপ্রকারে ঘটিয়াছে। তৎপরে, সেই 'নেপথ্যে রক্ষিত, সঞ্চিত' অন্নকে অস্মদাদির শারীর অথবা মানস শক্তিরূপে (অর্থাৎ, 'র'কার রূপে) পাইতে গেলে 'ল'কারের plastic, mouldable, assimilable form এর) মারফতেই সেটা পাইতে হয়। ভাস্করের অমন বিপুল, সচল মনোজব তেজোরাশি উক্ত 'হ য' আকৃতিবিশিষ্ট; কিন্তু সেরূপে সেটি আমাদের অন্নপাকাদির ইন্ধন হয় না। কাষ্ঠাদি, বিশেষভাবে পাথুরে কয়লা, পেট্রল এই সবের মধ্যে সেটিকে অগ্রে ঐ 'ব' রূপটি ধরিতে হয়। তারপর ঐ 'ল'এর মধ্যস্থতায় সেটি 'র' (ব্যক্ত অগ্নি বা তেজঃ) রূপে পরিণত হয়। জ্ঞান, ভাব, কর্ম,—এখানে জ্ঞান ঐ 'হ য' আকৃতিবিশিষ্ট, কর্ম 'ল র' আকৃতিবিশিষ্ট আর মাঝে ভাব 'ব' আকৃতিবিশিষ্ট। প্রণবে নাদবিন্দু 'হ য' রূপ, অর্দ্ধমাত্রা 'ব' এবং অ, উ, ম,—'ল'র—রূপ। বিশ্বস্পন্দনের যে বীচি-আকৃতি (হ য ব ল র) সেটি নিখিল অভিব্যক্তির মৌলিক আকৃতি। হ য র ব ল—এটি হইল ব্রহ্মের ঈক্ষণের ঋজু ধারা।

ব্রহ্মের ঈক্ষণের ঋজুধারা। তন্মধ্যে বকারের অনুপ্রবেশ।
অনুপ্রবিষ্ট এই 'ব'টিকে কিভাবে বুঝিতে হইবে?

কিন্তু ঈক্ষিতের মধে ঈক্ষিতার 'অনুপ্রবেশ' বশতঃ ঐ ঋজুরেখাটি কার্যতঃ ঋজু থাকে না। জপসূত্রে যে সূত্র করা হইয়াছে "তমেবাধিকৃত্যানুপ্রবেশো ব্রহ্মণঃ—সেইটিকেই

অধিকার করতঃ ব্রহ্মের আপন ঈক্ষণে বা সৃষ্টিতে 'অনুপ্রবেশ' হইয়া থাকে। সেইটি কোন্‌টি?—বিন্দু। এই বিন্দু একদিকে 'হ য' অপরদিকে 'ল র' এই দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টির সর্বত্র পূর্বোক্ত বীচি আকৃতিটি ঘটাইয়া দেয়। কাজেই, 'হযবলর'এর মধ্যস্থিত যে 'ব' সেটিকে কেবলমাত্র বরুণ বীজই ভাবিও না। তা ভাবিলে, মনে হইতে পারে 'অনধিকার প্রবেশ' বা অনধিকৃত্য প্রবেশ! কিন্তু বিন্দুগর্ভিত বরুণশক্তিরূপ এটি। অধিকৃত্য অধিকারি সম্বন্ধোপাধিক প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ। বিন্দু গর্ভিত বরুণ শক্তি? 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসুবীজমবাক্ষিপৎ'—এই সৃষ্টিক্রমটি স্মরণ কর। এতৎপ্রসঙ্গে জপসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় পাদের ১৭, ১৮, ১৯, ২০—এই চারিটি সূত্র কারিকা সহ আলোচ্য। পুনশ্চ অন্ত্যস্থ এবং বর্গীয় এই দুটি 'ব'কার উচ্চারণ করতঃ প্রাণপ্রযত্ন লক্ষ্য কর। সঙ্কুচৎ-আবৃত আকৃতিতে বিন্দু, প্রসরৎ-বিবৃত আকৃতিতে বরুণ। কাজেই, 'হ য ব ল র',—এস্থলে 'ব'টিকে মুখ্যতঃ সঙ্কুচৎ-আবৃত আকৃতিতে উচ্চারণ করিতে হইবে। কেননা, অনুপ্রবিষ্ট বিন্দুরই প্রাধান্য। শেষের আকৃতি 'ল র', কোথাও বা আবশ্যকমত 'র ল' রূপেও নিজেকে উল্টাইয়া লয় (যথা, ব্যাকরণে মাহেশ্বর-সূত্রে—'হ য ব র ট্। ল ণ্।' ব্যবহারক্ষেত্রেও এর দৃষ্টান্ত মেলান সহজ। ল আর র এর অভেদও এই কারণে বিবক্ষিত হইয়াছে। বিন্দুসম্বন্ধী ব্রহ্মের এই অনু-প্রবেশ নিম্নোক্ত কারিকাটিতে ভাবনা কর:—

ঋজ্বী ধারা হযরবলতো ব্রহ্মণো যেক্ষণায়
তস্যাং ব্যাজপ্রজনন মৃতে সম্ভবেন্নপ্রপঞ্চঃ।
পূর্ণং শূন্যং পরিণয়মিতো ব্রহ্মণোবিন্দুভাবে
তৎসম্বন্ধী হযবলরথা ব্রহ্মণোঽনুপ্রবেশঃ॥৬৬

ঋজুধারা অনৃজু বীচি আকৃতি (Wave Pattern) ইত্যাদি পরিগ্রহ করিল কিরূপে?

'হ য র ব ল' এই ভাবে, ব্রহ্মের সৃষ্টির নিমিত্ত যে ঈক্ষণ, তার 'ঋজুধারা' হইয়াছে জানিবে। কিন্তু পঞ্চীকরণাদি ব্যতীত এই প্রপঞ্চসৃষ্টির তো উপপত্তি সম্ভব হয় না। সুতরাং সেই ঋজুধারায় কোনও প্রকারে অনৃজুত্ব উৎপন্ন হইয়াছে—যার ফলে কোন কিছুই ঠিক সোজা চলিতেছে না, এঁকিয়া বেঁকিয়া চলিতেছে; বীচি-ভঙ্গীতে চলিতেছে;

চলিতে চলিতে ঘুরিয়া আসিতেছে, পাক খাইতেছে, আবর্তসৃষ্টি করিতেছে; গর্ভেশয়, গহ্বরেষ্ঠ হইতেছে। বিরাট এবং অণু উভয়েই 'অণ্ডাকৃতি' (sphere or spheroid pattern) পাইয়াছে। ঋজুরেখার এই প্রকার যে ব্যতিক্রম, তার সাধারণ নাম যদি দাও 'ব্যাজ' (ছন্দের সাধনে যেটিকে সারাইয়া লইতে হয়), তবে ব্যাজপ্রজনন সাপেক্ষ এই প্রপঞ্চসৃষ্টি, ইহা বুঝিতে হইবে। প্রপঞ্চে কুত্রাপি ঋজু বা সরলের কারবার চলিতেছে না। ব্রহ্মে কোনও প্রকারে বিন্দুভাবটি না আসিলে শুদ্ধ ঋজুস্থলে অনৃজু বা বক্র দেখা দেওয়া সম্ভবে না। ধর, একটা সরলরেখা। সেটাকে যতক্ষণ একটা অখণ্ড অবিভাজ্য বস্তু ভাবিতেছ, ততক্ষণ তার বেঁকিবার যো নাই। কিন্তু সেটাকে একটা বিন্দুর গতিপথ ভাব; বিন্দুটির সোজা চলিতেও বাধা নেই, যথেচ্ছ বেঁকিতেও বাধা নেই। ঘোরা-ফেরা, বীচি-আবর্ত, 'গুহা' 'অণ্ড' ইত্যাদি আকৃতি—এসব প্যাটার্নই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই। কাজেই, ব্রহ্ম অথবা ভূমাকে এই বিন্দুরূপটি ধরিতেই হয় প্রপঞ্চের বহুধা প্রপঞ্চিত করার খাতিরে। বস্তুতঃ এই ব্রহ্ম বিন্দুটি কি বস্তু?

ব্রহ্মবিন্দুটি কি বস্তু? নিখিল সৃষ্টিতে এটি কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট?

এত ব্রহ্মের পূর্ণত্ব এবং শূন্যত্বের অনির্বাচ্য মিথুনীভাবটি ঘটিয়াছে। বিন্দু একসঙ্গেই 'সদসৎ কাষ্ঠা'। বটের একটা বীজ নাও। বীজে কি বটবৃক্ষটি আছে, অথবা নাই? এর কি উত্তর দিবে চিন্তা কর। অন্বয় এবং ব্যতিরেক তো আলাদাই বটে, কিন্তু এমন একটা ঠাঁই আছে অথবা থাকা উচিত যেখানে অন্বয় বলে—'আমি পূরাভাবেই আছি', ব্যতিরেকও আবার সেই কথাই বলে। দুই-ই কাষ্ঠাপ্রাপ্ত সেখানে। ইচ্ছা হইলে একের কাষ্ঠাকে পূর্ণাব্যক্ত (অসৎ), অন্যের কাষ্ঠাকে পূর্ণব্যক্ত (সৎ) বলিতে পার। একটা ঋণমুখীধারার (Negation series এর) অবসান — ∞. অপরটা ধনমুখীধারার (Affirmation series-এর) অবসান + ∞. এই দুইকে যোগ করিলে হয় শূন্য। কিন্তু সেটি কীদৃশ শূন্য? সেটি 'পূর্ণশূন্য'—অর্থাৎ, তার কুক্ষিতে + ∞ এবং - ∞ দুইই মিলিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই ঐ দুইটি আনন্ত্য বিভিন্নমুখে (ধন ও ঋণ) প্রসৃত হইয়াছে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির আরম্ভ এবং অবসানও এই বিন্দুতে। বস্তুতঃ এটি নিরূপণযোগ্য নয়। কিন্তু বিন্দুরূপ পরম রহস্য বীজটিকে চাই-ই। ব্রহ্ম এই বিন্দুকে অধিকার করতঃই (অর্থাৎ এতদধিকৃত্যাধিকারিসম্বন্ধোপহিত হইয়াই) তদীয় ঈক্ষণে

এবং ঈক্ষিতে—সৃষ্টির সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট বুঝিতে হইবে। তদ্‌ঈক্ষণে বিন্দুরূপ—একোঽহম্। অনুপ্রবেশটি সামান্য এবং বিশেষ, দুই ভাবেই হয়। যথা—আকাশাদির বাচক হ, য আদি সামান্যভাবে বিন্দুকে আশ্রয় করতঃ হং যং ইত্যাদি হইল। আর, (হং যং) এবং (লং রং) এই দুয়ের মাঝে 'বং' রূপে প্রবেশ হইল বিশেষানুপ্রবেশ। জপসূত্রমে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় পাদে কতিপয় সূত্র এবং কারিকায় এ তত্ত্বগুলির যথাসম্ভব নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে। মন্ত্রে (প্রণবাদিতে) বিন্দুরূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ সবিশেষ ধ্যানযোগ্য।

(২৫)

অক্ষরে বিন্দুর অনুপ্রবেশ—নাদরূপে বিস্তার—অর্ধমাত্রারূপে নাদবিন্দুর মিথুনীকরণ

মন্ত্রাক্ষরে, বিন্দুমাধ্যমিক এই অনুপ্রবেশটি নীচের দুটি কারিকায় ভাবনা কর :—

সামান্যেনাক্ষরতিলকোঽবর্ত্তিযো বিন্দুলেখ
স্তেনৈবাপ্তং হি বিয়দনিলাদেঃ স্ববীজাক্ষরত্বম্।
বিন্দোর্দ্বিত্বেঽক্ষর মনুগতে নাদমৈচ্ছদ্ বিসর্গ
শ্চার্দ্ধামাত্রা শিবশশিকলা দ্বাবিমৌ চন্দ্রবিন্দুঃ॥৬৭
ব্যক্তের্ব্যক্তাং দধতি চ কলামক্ষরাদীনি বাচি
বিন্দোর্গুহ্যা ভবতি চ কলা গোপ্যবীজাদিগর্ভা।
সেতোরিন্দুং ভজতি চ কলা মৃগ্যনাদা বিসর্গান্
নাগ্রং নানু প্রবিশতি কলাবিন্দুনাদাতিগং তৎ॥৬৮

এক একটি অক্ষর যৎকালে অক্ষরতিলকবিন্দুকে তিলকবিন্দুর মতো স্বীয়ভালে ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ যখন, হ, য, র ইত্যাদি অক্ষর উক্ত তিলক বিন্দু ধারণ করতঃ হং, যং, রং ইত্যাকার রূপ ধারণ করিল—তখন কি হইল? তখন অক্ষরে ব্রহ্মের বিন্দুরূপে অনুপ্রবেশের ফলে, ঐ সকল অক্ষর কেবলমাত্র বিয়দাদির বাচক হইল না, বিয়দাদির স্ব স্ব বীজাক্ষর হইল। এটি বিন্দুর সামান্যতঃ অনুপ্রবেশের উদাহরণ। তারপর, ঐ

বিন্দুর দ্বিত্ব হইল (কারণে ও সূক্ষ্মে 'একোঽহং বহু স্যাম্'—ইত্যাদি প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হইল; স্থূলে একটা জীবকোষ ফাটিয়া দুইটি, দুইটি ফাটিয়া চারিটি হইতে লাগিল)। ফলে, এক বিন্দু দ্বিত্বে 'বিসর্গ' হইয়া নাদকে—বিতান বিস্তারকে পাইতে ইচ্ছা করিল (ঐচ্ছৎ)। শেষ, অক্ষরের মূর্দ্ধায় যে 'চন্দ্রবিন্দু' (হ্রীঁ ইত্যাদিরূপ), সেটি অর্দ্ধমাত্রারূপ সেতুটি হইয়া নাদ বিন্দু এই দুইটি কাষ্ঠাকেই (দ্বাবিমৌ) প্রাপ্ত হইতে, এবং তাদের ওপারে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এই অর্দ্ধমাত্রাকেই শশিশেখরের ভালে 'শশিকলা' বলিয়া জানিবে। 'অবর্ত্তি', 'আপ্তং' 'ঐচ্ছৎ'—এই তিন অতীতকালের দ্বারা কি সূচিত হইল তাও চিন্তা করিও।

কলাশক্তি—ব্যক্তগুহ্যাদি দ্বিবিধরূপে

বাক্যে অক্ষর 'ক' 'খ', 'গ' এইভাবে ব্যক্তিরূপটি (as individual sound and script) ধরার নিমিত্ত শক্তির যে কলা (aspect) আশ্রয় করিয়া থাকে, সে কলাটিকে 'ব্যক্তাকলা' বলিয়া জানিবে। এসব স্থলে অংশের সম্বন্ধে সমগ্রের যে অন্বয়, অনুমর্শ এবং অনুগ্রহ, সেইটি অনুপ্রবেশের রূপ বলিয়া জানিবে। অন্বয়াদি তিনটিকে ইংরাজিতে involution, implication, inspiration বলিতে পার। তারপর, গোপ্য যেসব ক্লীং হ্রীমাদি বীজ, সে সমূহে গর্ভিত যে শক্তি, সে শক্তি সাক্ষাৎ বিন্দু হইতেই লব্ধ, এবং বিন্দুশক্তিরূপা এই কলাটিকে 'গুহ্যাকলা' বলিয়া জানিবে। ব্যক্তাকলার সঙ্গে তুলনায় এখানে লক্ষ্য করিবে এই যে—বিন্দুসহকৃত অক্ষরে ব্যক্তি রহিল বটে, কিন্তু ঝোঁকটি (stress) এইবার পড়িল অংশাভিব্যক্তির উপর নয় (not on actual partial manifestation), কিন্তু সেটি পড়িল অন্তর্নিহিত সমগ্র শক্তিকুণ্ডলীর উপর (upon the whole potential base or background)। তারপর, বিন্দুর 'দ্বিভাবে' (inner polarization-এ) জাত যে 'বিসর্গ', সে বিসর্গকে আশ্রয় করতঃ কলানাদকে (বিতান, বিস্তারকে—the sense of Expansionকে) যেন অনুসন্ধান করে (মৃগ্যনাদা)। এইটিকে 'ঊর্ব্বীকলা' আখ্যাও দিতে পার। আবার, নাদবিন্দু এতদুভয়ের—কাষ্ঠায় লইবার নিমিত্ত সেতুরূপা যে 'অর্দ্ধমাত্রা' তিনি যে কলাটিকে ভজনা করেন, তার নাম ইন্দু বা 'ঐন্দবীকলা' (চন্দ্রবিন্দু)। এ সকলেই (সামান্যতঃ অথবা বিশেষতঃ বিন্দুকে অধিকার করতঃ) সেই পরমাক্ষরের ('তৎ') অনুপ্রবেশটি হইয়াছে বটে, কিন্তু, স্বরূপতঃ সেই 'তৎ' আবার

বিন্দুনাদকলাতীত তত্ত্বও বটে; সুতরাং, কি অগ্রে, কি পশ্চাৎ কোন ভাবেই, সেটির কোথাও 'প্রবেশ' তো সম্ভব হয় না।

যে তত্ত্ব বিকল্পরহিত তাহাতে সত্যমিথ্যাদি বিকল্পের উদয় কি প্রকারে হইল?

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্' বলা হইয়াছে। সে স্বরূপে অনুপ্রবেশাদির প্রসঙ্গ কিরূপে হইবে, এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কারিকাটি ভাবনা কর:—

আনন্ত্যং যদ্‌হ্যনবসরদং পাদমাত্রাংশসীম্নাং
সত্যং যদ্ বাপি নহি সহতে সত্যমিথ্যোত্থভাবম্।
জ্ঞানং যচ্চাপি ন হি বৃণুতেঽনাবৃতস্যাবৃতিং বা
তৎ স্বারূপ্যেঽঘটনঘটনী কীদৃশী কস্য শক্তিঃ॥৬৯

যে নির্বিশেষ আনন্ত্য পাদ, মাত্রা, অংশ অথবা সীমা (কাষ্ঠা) এ সকলের কোনটাকেই অবসর দিতে প্রস্তুত নয়; যে দ্বন্দ্বাতীত সত্য, সত্য এবং মিথ্যা এবং প্রকার বিকল্প হইতে উত্থিত কোন ভাবকেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়; যে শুদ্ধ নিরঞ্জন জ্ঞান, যেটি স্বরূপতঃ অনাবৃত সেটির আবৃতি বা আবরণ কোন ক্রমেই বরণ করিবে না; আচ্ছা, বল দেখি কাহারই বা কীদৃশী সে শক্তি, যেটি তৎ (নির্বিশেষ, দ্বন্দ্বাতীত, শুদ্ধ, নিরঞ্জন) স্বরূপে এইরূপ অঘটন ঘটনটি করিতে পটীয়সী হইয়াছে? পুনশ্চ—

সচ্চিদানন্দ বস্তু 'কিং কথং' প্রভৃতি জিজ্ঞাসার পারে। অথচ আশ্চর্য এই যে বুদ্ধি ও বাক্—সেই বস্তুটিকে লইয়া কেবলই 'কিং কথং' ইত্যাদি করিতেছে

প্রমাতা বাঽনপিহিতচিতি স্যাৎ প্রমেয়ং প্রমাণং
জিজ্ঞাসা বাঽনুপহিত সতি প্রাচি সত্ত্বং ন বা তৎ।
লব্ধা তং বা হ্নলসিতরসং কস্য বানন্দিশব্দো
নীতঃ স্কন্ধং স্বকমপি নয়েৎ কঃ কথন্তাদি পারম্॥৭০

যে স্বপ্রকাশ চিজ্জ্যোতিঃ কখনই আবরণ স্বীকার করে না (অনপিহিত), সেটি প্রমাতৃরূপে (জ্ঞাতা বা গ্রহীতারূপে) বিষয় প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু প্রমেয় (জ্ঞেয়, গ্রাহ্য—object) রূপে সেটি কি, প্রমাণরূপেই বা সেটি কি? যথা প্রত্যক্ষ, যেমন 'এই ঘট'—স্থলে প্রমাতা প্রভৃতি তিনটিকেই চৈতন্য-এর উপাধি বলা হয় বটে, কিন্তু ঐ তিন উপাধি স্বীকার এবং তন্নিমিত্ত তদনুরূপ ভূমিকা স্বীকার নিত্য অবাধিত প্রকাশমাত্ররূপ চিতে হইল কি করিয়া? এ জিজ্ঞাসার সম্যক উত্তর দানে কে কবে আগাইয়া আসিয়াছে? তারপর, নির্বিশেষ শুদ্ধ যে সৎ, সেইটিকেই যখন একমাত্র আছে, তখন বল দেখি—এই জিজ্ঞাসাই বা কেমন করিয়া হইল—'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ', অথবা 'অসদেব সৌম্য ইত্যাদি'? অর্থাৎ, শুদ্ধ নির্বিশেষ সতে সৎ, অসৎ, সদসৎ এ সব ভেদ আসিল অথবা আরোপিত হইল কি প্রকারে? পুনশ্চ, যে রস সাক্ষাৎ একরস ভূমা, সুতরাং যাহাতে অলসিতাদি হবার কোন প্রসঙ্গাই নাই, সে রস সম্বন্ধে, 'রসং লব্ধ্বা হ্যয়ং আনন্দী ভবতি' এ শ্রুতিবাক্য এবং অনুভূতির উপযোগ (relevancy) কি করিয়া হইল, তাই বা কে বলিয়া দিবে? কে (কোন্ বুদ্ধি অথবা বাক্) আপন স্কন্ধে আপনি চড়িয়া এবং সেইভাবে নীত হইয়া, 'কিং, কথং' ইত্যাদিরূপে জিজ্ঞাসিত হবার সম্ভাবনার পারে যে বস্তু সেখানে লইয়া যাইতে পারগ বল?

ব্রহ্মের বিন্দুরূপে সর্বত্র অনুপ্রবেশের পঞ্চবিধতা

পুনশ্চ—

প্রত্যেকং তৎ পরমপি কিমু প্রাবিশদ্ বা প্রতীচা
সর্ব্বস্মিন্ বা সমমপি কিমু প্রাবিশৎ তৎ সমীচা।
তির্য্যক্ত্বং কিং তদৃজুপরমং প্রাবিশদ্ বা তিরশ্চা
কিং বাহ্নুচা স্থিতমপি চিরং প্রাবিশৎ কিং পরাচা॥৭১

সেই পরমতত্ত্ব পর (সর্বাতীত—Absolute Transcendent) হইয়াও প্রত্যেক বস্তুটির (অণু হইতে বিরাট) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন কি, না (পরমপি কিমু প্রাবিশৎ)? যেটি 'পর' সেটি কিরূপে প্রত্যেকের মধ্যে প্রবিষ্ট (Universally Immanent) হইয়া 'প্রত্যক্' হইলেন? পরমের এই প্রত্যগ্বৃত্তিতা (প্রতীচা ভাবেন) না

হইলে বিশ্বে অণু কি বিরাট কেহই তার স্বভাব, স্বশক্তি এবং স্বধর্ম প্রাপ্ত হয় না, ইহা ঠিক; কিন্তু যেথায় দিগ্-দেশকাল সম্বন্ধাদি দ্বারা কোনই নিরূপণীয়তা নেই, সেখানে ঐ 'প্রত্যক্' বা 'প্রতীচা' রূপ নিরূপকটি সাবকাশ হইতেছে কি প্রকারে? মায়ানিমিত্ত কল্পনাদি বশতঃ? কিন্তু মায়া তো শুধু এইটুকুই জানাইয়া দেয় যে যাতে স্বরূপতঃ কোনই 'মান' নাই, তাতে কোনও প্রকারে মান আসিয়াছে, যেটি অমেয় সেটি মেয় হইতেছে। It is a simple statement that you have a desired frame of reference for appreciating the Alogical Given. 'মায়া' বলিতে সেই Alogical সত্যসত্যই তো Logical হইয়া গেল না! শুধু কি তাই? Alogical কেবল যে এড়াইয়াই যাইলেন এমন নয়; তোমার যে Frame of Referenceটি ভাগ্যে জুটিল, তার মধ্যেও তিনি ওতপ্রোত হইয়া ঢুকিলেন! কোন কিছুই—তা একটা ধূলিকণাই হৌক না কেন—তিনি পুরা তোমার ফ্রেমে, ব্রহ্মাদিরও ফ্রেমে পুরিতে দিবেন না—'হরিহরাদিভিরপ্যপারা।' এই কাণ্ডটি আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিব এই জপসূত্রের তত্ত্বসূত্রে এবং মায়া ও মহামায়া এই দুই সূত্রে। যাই হৌক্ এই 'প্রতীচা'টি স্বীকারের ফলে সেই পরম হইলেন প্রত্যগাত্মা। কেবল 'প্রতীচা' কেন, 'সমীচা' কথাও চিন্তা কর। যেটি আসলে নির্দোষসম, সেটি সর্বের মধ্যে সম্যগ্‌ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন—ইহাই বা কেমন কথা? সেই পরমসমতায় সম্যক্ অসম্যকের প্রবেশের অবকাশটি কোথায় মিলিল? এমন কি ছিল, কি আছে অথবা হইবে, যাতে সেটি ছিল না, নেই, অথবা থাকিবে না; অথবা সেটি থাকিয়াও অসম্যক্‌রূপে ছিল; যে জন্য, সেটিকে আবার অভাবে ভাবরূপ হইয়া, অসম্যক্‌কে সম্যগ্ ভাবরূপ হইয়া, তাহাতে বর্তিতে হইল? মায়া শুধু এই প্রকৃতিমুখরার মুখবন্ধ করার একটা চমৎকার ফিকির! ইন্দ্রজাল, রজ্জুসর্প ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অনির্বচনীয় খ্যাতির একটা বড় 'ফরমুলা' আওড়াইয়া, সত্যিকার অবুঝের একটা 'বুঝ' দেবার চেষ্টাকে ফিকির ছাড়া আর কি বলিবে বল? তবে ঐ পরম সমতাটি কি নেই? শ্রুতি, অনুভব দুইই বলেন আছে, নিশ্চয়ই আছে; সেটি আছে বলিয়াই সব কিছু আছে। সেটি না থাকিলে, কিছুই নাই। 'অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্'। কিন্তু এ অন্বয় ব্যতিরেক আত্মপ্রত্যয়ৈকসিদ্ধ। তোমার ঐ 'বহ্নিব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ব্বতঃ' ইত্যাদির সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলার বস্তু নয়। 'অধিষ্ঠান' এবং 'অধ্যাস' শব্দ দুটি বলিয়া, অবাঙ্‌মনসগোচরটিকে কোনও

গতিকে বাগ্‌বুদ্ধির 'ষ্টলে' গোচরে আনিবার 'লেবেল'টি লাগাইলাম মাত্র! অতঃপর, ঐ লেবেলের মারফৎই লেন-দেন খাসা চলিবে। লেন-দেনে খোদ বস্তুটির বায়না কেউ যেন না করিয়া বসেন! শুধু হুণ্ডিতেই কারবার! নগদামালের মুখাবলোকন নেই! নগদ মাল মজুদ অন্যত্র। কোনও গৌড়ব্রহ্মানন্দীতে কেউ সাক্ষাৎ ভূমানন্দী হন না; কোনও অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিতেও সাক্ষাদপরোক্ষ অদ্বয় বস্তু (যেটি দুই নয়, একও নয়, অনেকও নয়) 'সিদ্ধ' হন নাই। কেননা, ব্রহ্মানন্দের অথবা সাক্ষাদ্‌পরোক্ষ অদ্বৈত বস্তুর 'সিদ্ধি'ই সম্ভব নয়। যেটি Absolute Fact, তার আবার সিদ্ধি! উপলব্ধিকেই যদি সিদ্ধি বল, তবে সেও বিচার বিবরণের নাগালের মধ্যে আসে না। তবে কি বলিবে যে বিচার বিবরণের বালাই-এ কাজ কি? না, তাও বলিতে পার না। কেননা, যে বিচারাদি লইয়াই তোমায় চলিতে হইতেছে, 'বালাই' বলিয়া তাকে ছাড়িয়া পালাইবে কিরূপে? যতক্ষণ যেটি নইলে তুমি অচল, ততক্ষণ সেটিকে বিদায় করিয়া তুমি দাঁড়াইবে কোথায়? শুধু তাই নয়। যে বলে—'চালাই', সেই আবার আপনার প্রান্তভূমিতে আসিয়া নিজেই বলিবে—'এইবার আমি পালাই।' জ্ঞান হোক, প্রেম হোক—পরমতার প্রান্তভূমিটি পর্যন্ত—প্রমাণবিদগ্ধ এবং সিদ্ধান্ত বিচারকে দক্ষ বিশ্বস্ত দিশারীর মত সঙ্গে রাখিতেই হইবে। নচেৎ, চলার পথে বিপদ পদে পদে। জপাদির ক্ষেত্রেও এই কথা।

উক্ত পাঁচটির প্রথম দুইটি (সমীচা এবং প্রতীচা) এবং শেষের দুইটি (তিরশ্চা এবং পরাচা) এদের মধ্যে 'অনূচা' এইটি সন্ধি হইল কি ভাবে?

আচ্ছা, প্রবেশের রূপটি অস্মদাদির বুদ্ধির দরবারে বিবরণ দাখিল না করিলেও, এটা দেখা যাইতেছে, সেই পরম 'তৎ' বস্তু 'প্রত্যক্' এবং 'সম্যক্' এই দুইটি রূপ যেন অঙ্গীকারই করিয়াছেন; এবং অঙ্গীকার করতঃ প্রত্যগাত্মা এবং অখিলাত্মা সর্বভূতাত্মরাত্মা হইয়াছেন। প্রথমটিতে 'প্রতি' এবং দ্বিতীয়টিতে 'সম্' এই দুইটি ভেদক লিঙ্গ জানিবে। এই দুটি রূপে পরমতত্ত্বের ঐ দুই ভেদক-লিঙ্গ (differentia) দ্বারা উপহিত ভাবটি ঘটিলেও 'তিরোহিতমিব' ভাবটি ঘটে নাই। ঐ ঐ ভাবে সেটি সৎস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপেই আছে। কিন্তু 'তিরশ্চা' এবং পরাচা' এই দুটি উপাধি অথবা ভেদক লিঙ্গ স্বীকারে 'যেন তিরোহিত' ভাবটি ঘটে। যেটি

ছিল সম এবং ঋজু, সেটি যেন কি করিয়া, বিষম এবং বক্র হইল—অসমবৃত্তি এবং কৌণিকবৃত্তি স্বীকার করিয়া লইল। ফলে, ভোক্তাভোগ্য, কর্তাকার্য, অন্তর্বহিঃ, উচ্চাবচ, পরাবর ইত্যাকার ভেদসমূহ প্রপঞ্চিত হইল। কিন্তু আগের দুটি এবং শেষের দুটি—এ দুয়ের সন্ধি হইল কিসের দ্বারা?—'অনূচা'। অনু+গত্যর্থ অঞ্চ্ ধাতু+ক্বিপ্ = অন্বচ্ = অনুপ্রবিষ্ট। কাজেই, অনূচা লিঙ্গের দ্বারাই ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ। কি ভাবে?—বিভর্তা অব্যয়াত্মারূপে এবং নিয়ন্তা ঈশ্বররূপে। ইনি হইলেন ভূতভব্যানাং ভর্তা এবং ঈশানঃ। এইভাবে সর্বতঃ প্রবিষ্ট হইয়া তিনি ভোক্তৃভোগ্যাদি বিচিত্রভাবে এবং পরাবর উচ্চাবচাদি ভাবে সবই প্রপঞ্চিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সমীচা, প্রতীচা, অনূচা, পরাচা, তিরশ্চা-এই লিঙ্গ পঞ্চকের মাঝেরটি সাক্ষাৎ বিন্দুতত্ত্ব হওয়াতে, বিন্দুকেই আশ্রয় করতঃ ব্রহ্মের সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ, ইহা বলা হইয়াছে।

(২৬)

সৃষ্টির মূলীভূত মিথুনতত্ত্ব (Polarity Principle)— যোনি-লিঙ্গ ইহার প্রতীক

বিশ্বের মূলীভূত যে মিথুনতত্ত্ব (Polarity Principle) সেটির আদিম প্রতীকরূপে 'যোনি' এবং 'লিঙ্গ'কে এইভাবে ভাবনা কর :—

একং লিঙ্গং ভুবনকৃতয়ে লিঙ্গপঞ্চত্বমাপ
যোনিশ্চৈকা ভুবনভৃতয়ে যোনিপঞ্চত্বমাপ্তা।
পঞ্চানাং বা ভুবনরুচয়ে দ্বাদশত্বং বহুত্বং
যোনিং স্বাং তদ্ জিগমিষতি কিং বস্তুতোঽযোন্যলিঙ্গাম্॥৭২
বীজং ধত্তে সকলকলনাকাঙ্ক্ষয়া নিষ্কলং তদ্
জীবস্তুচ্চাপ্যসুসবনসুদ্ ব্যষ্টিতো বা সমষ্ট্যা।
ওঙ্কারার্দ্ধং বিশদবিচলং বিন্দুতো বা বিসর্গাদ্
ধ্যায়েন্নিত্যং দহরমহতো যোনিলিঙ্গাদ্যতত্ত্বম্॥৭৩

যে তত্ত্ব বস্তুতঃ (স্বরূপতঃ) অযোনি এবং অলিঙ্গ, তিনি আপনাকে যোনি এবং লিঙ্গ এতদুভয়ই কল্পনা করেন কি প্রকারে? 'মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং

দধাম্যহম্' মহদ্-ব্রহ্ম-রূপ 'নিজযোনি' এবং তাহাতে বীজপ্রদ পিতারূপে 'নিজলিঙ্গ' (ঐ অহম্)—এই আদি মিথুনীভাবটি জাগিল কি প্রকারে? একাকী নৈব রেমে—কাজেই, মিথুনীভূত হইলেন—'স্ত্রীচ পুমাংশ্চ'। কিন্তু অকাম অথবা আপ্তকামের এই 'কাজেই' টুকু অস্মদাদির বুদ্ধি বিবেচনা কোন কাজেই লাগাইতে পারিতেছে না যে! 'যোনিং স্বাং তদ্‌জিগমিষতি কিং বস্তুতোঽ যোন্যলিঙ্গম'—তাই শ্লোকটির শেষ চরণে ঐ চির-উন্মুখ চির অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা! এই শাশ্বতিক রহস্য আর ঐ শাশ্বতী জিজ্ঞাসা শিবলিঙ্গ বিগ্রহে বিগ্রহবান হইয়াছে। আচ্ছা, কোনো না, কোনোভাবে অযোনি-অলিঙ্গ তত্ত্বের 'যোনিলিঙ্গ' রূপটি না হয় হইল; কিন্তু 'এক' থাকিলেই কি চলিত না? না, তা তো চলে নাই দেখিতেছি।

যেটি এক সেটি দুই তিন পাঁচ ইত্যাদি সংখ্যা স্বীকার করিতেছে কি নিমিত্ত?

'ভুবনকৃতয়ে'—এই অপরূপ বিচিত্র ভুবনটিকে জন্ম দিবার নিমিত্ত ঐ একলিঙ্গ আবার পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন (পূর্বশ্লোকে যে পাঁচ প্রকারে দেখান হইয়াছে সেই পাঁচ প্রকারে, অথবা ওঙ্কারাদির পঞ্চাবয়ব ইত্যাদি প্রকারে)। আর প্রথমা যোনিটি একই রহিয়া দ্রৌপদীত্ব বরণ করিলেন, অর্থাৎ, পঞ্চলিঙ্গেরই ভজনা করিলেন? পুরুষরূপে 'নানা' হইলেন, আর প্রকৃতিরূপে একই রহিলেন?—না, তাও নয় দেখিতেছি। 'ভুবনভৃতয়ে'—ভুবনটি ভরণের নিমিত্ত প্রথমা যোনিও পঞ্চধা হইলেন (যেমন, পূর্বে এক শ্লোকে যোনিকে আদ্যা-গুহ্যাদি পঞ্চকলারূপে দেখিয়া প্রণাম করা হইয়াছে)। তবে ঐ পঞ্চসংখ্যাতেই কি শেষ?—না, তাই বা কেন? লিঙ্গ যেমন দ্বাদশ (যথা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ) এবং বহু (কোটি) হইয়াছেন, যোনিও তেমনি একপঞ্চাশৎ মাতৃকা ইত্যাদিরূপে আপনাকে বহুধা প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন? 'ভুবনরুচয়ে'—এই ভুবনের রুচির অনুরোধে। 'রুচীনাং বৈচিত্র্যাং'—সৃষ্টিতে রুচির বৈচিত্র্য রহিয়াছে এই বলিয়া?—না, তা নয়। মূলে যে ব্রহ্মরস, যে রুচি, সেটিকে বিচিত্রিত রূপে আস্বাদনের নিমিত্ত। এইরূপ বিচিত্রিত আস্বাদনের নিমিত্ত 'রস' বস্তুটি হন 'রাসবস্তু'। সুতরাং, একনাদব্রহ্ম যখন আপনাকেই 'যোনিলিঙ্গ', অর্থাৎ 'কলা' এবং 'নাদ' রূপে ঈক্ষণকরতঃ সেই কলায় 'বিন্দু' নিক্ষেপ করিলেন, নাদ-বিন্দুকলা

এই পরম ত্রিপুটী হইলেন, তখন তাহা হইতে নিখিল মাতৃকাবর্ণের এবং নিখিল সৃষ্টির সম্ভাবনা হইল। কেন? ঐ 'ভুবনরুচয়ে'। সানাই-এর ধ্রুব সুর—'পোঁ', নানা রাগে, বিচিত্র ছন্দে এইবার আলাপচারী করিবে, এই নিমিত্ত। 'রস' এবং 'রাসে' ঐ অপরূপ আলাপনের 'আ' কারটিকে চিনিয়া লইও।

কলনের আকাঙ্ক্ষা—কলাশক্তি। কলাশক্তি ও বিন্দুশক্তির সংযোগ কিরূপে আবশ্যক হইল? প্রণবে সম্পুটিত যোনিলিঙ্গরূপ

সেই পরমতত্ত্ব কি নিষ্কল অথবা নিত্যোদিত পূর্ণ পরমকল? একই অসীম আদি রহস্যের দুইটা 'দিক্' কি দেখিতেছি? দুয়ের যেটিই তিনি হন না, কেন, 'সকল' রূপে এই ভুবনকে কলনের আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি কি ঐ বিন্দুরূপ বীজটি আধান করিলেন? কলনের আকাঙ্ক্ষাটি কি বস্তু? ঐ 'যোনিলিঙ্গ' তত্ত্বের যেটি যোনিতত্ত্ব, তাহাই নয় কি? আকাঙ্ক্ষা না বলিয়া ইচ্ছা বলিতে পার। দুইয়েতেই 'আ'কারটি আছে, তবে আকাঙ্ক্ষাতে একবার নয়, দুইবার নয়, তিন তিনবার আছে। এ তিনের অবশ্য কিছু মানেও আছে। তা থাকুক। ইচ্ছা হইলে, 'ইচ্ছা' শব্দটির আগে 'অচিন্ত্য' বিশেষণটিও দিতে পার। যাইহোক, বিন্দু তো বীজ হইলেন, এবং সেইভাবে নিখিলকলনাকাঙ্ক্ষাতে প্রবিষ্ট হইলেন। মনে রাখিও—কোন আকাঙ্ক্ষাই বিন্দুকে বীজরূপে গর্ভে ধারণ না করিলে, বীর্যবতী সফলা হয় না। কোন কল্পনই সঙ্কল্পন হয় না। বীজের পাদপে আকাঙ্ক্ষা আছে; জপকর্তার সিদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষা আছে; রসিক সাধকের রাস-আস্বাদনে। কিন্তু বিন্দুরূপা সেই পরম উন্মুখী Potency-র (শক্তির) অনুগ্রহটি চাই-ই। বিতত বিরল Energyর কেন্দ্রীণ ঘনীভাবটি চাই-ই। আচ্ছা, বিন্দুরূপ ঐ আদিবীজটিকে 'আদিজীব' করিয়াও দেখ। ব্যষ্টি জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সমষ্টি জীব (হিরণ্যগর্ভ) পর্যন্তই দেখ। শ্রুতি হিরণ্যগর্ভের 'প্রাণ' আখ্যা দিয়াছেন। ব্যষ্টিতে বা ব্যক্তিতে তিনিই ব্যষ্টিপ্রাণরূপে জীবত্ব আকৃতিটি (Pattern) বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু ব্যষ্টি-সমষ্টিতে, 'অসু', কিনা প্রাণ—সবন বা হবনটি নিরন্তর চলিতেছে। 'এষ জাগর্ত্তি'। কিন্তু এখানেও ঐ প্রাণহবনভৃৎটি কে? পূর্বোক্ত পরমরাহস্যিক যোনিলিঙ্গতত্ত্ব। 'আমি জীব হইব'—এই আকাঙ্ক্ষারূপ যোনিতে বিন্দুশক্তি (Nuclear Creative Potency) রূপ বীজাধান

করিতেছেন। কে করিতেছেন? যাঁর স্বরূপে 'যোনি' অথবা 'লিঙ্গ' নাই, তিনি। অত্যাশ্চর্য কথা নয়? তারপর, বাক্‌প্রভব বিশ্বের মূল যে ওঙ্কার, তাঁর 'অর্দ্ধ' কিনা মধ্যেও তিনি বীজাধান করিয়াছেন। সেখানে অর্দ্ধমাত্রা স্বয়ং যোনিরূপা, এবং অর্দ্ধমাত্রারূপ যোনিতে নাদব্রহ্ম বিন্দুরূপ বীজাধান করেন ইহা জানিবে। সুতরাং প্রণবকেও সেই পরম যোনিলিঙ্গের সম্পুটিত রূপ দেখিবে।

সর্বাবস্থায় সর্বত্র শিবলিঙ্গের ধ্যান।
'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ইহার রহস্য ব্যঞ্জনা

অতএব, কি দহর (অণু), কি মহান দুয়েতেই 'যোনিলিঙ্গা'রূপ এই আদিমতত্ত্বটিকে নিয়ত ধ্যান করিবে। করিলে, উহা আর অনিত্য কামনা-সংবন্ধের হেতু হইবে না; নিত্য পরম জ্যোতীরস তত্ত্বেরই প্রত্যক্ এবং সম্যক্ স্ফুরক হইবে। সকল ভূমিতে, সর্ব অবস্থায় এবং সর্ব অধিকারে, এই 'শিবলিঙ্গা' ধ্যানটিকে পরমক্ষেমায় 'পরমশিবায়' বলিয়া জানিবে। পুনশ্চঃ—

শোণাং স্বীয়া মরণিমধরাং চোত্তরং স্বস্য শুক্লং
নির্মথ্যাত্যক্ষরমপি চলদ্রেতসে যোনিলিঙ্গাম্।
ততো যোনৌ জনিরপগতা যাতি লিঙ্গাং হ্যলিঙ্গাং
হৌমিত্যেকাক্ষরমনুতনু শ্চোর্দ্ধগোঽনাদিলিঙ্গাঃ ॥৭৪

সেই পরমতত্ত্ব অক্ষর, কিনা, ক্ষররহিত হইয়াও ক্ষর (চলৎ) হইলেন কি অভাবনীয় প্রয়োজনে ও উপায়ে তা কে বলিবে? কিন্তু দেখিতেছি, ক্ষর হইব এই কামনায় তিনি আদিতে 'যোনিলিঙ্গা' এই পরম রাহস্যিক মিথুনীভাব রূপ উপাধিটি অঙ্গীকার করিতেছেন। কেন? 'রেতসে'—আমি অক্ষর ব্রহ্ম, আমি বিন্দুরূপ হইয়া আমার নিখিল ক্ষরভাবে প্রবিষ্ট হইব, এবং অণু মহান সমস্ত কিছুই 'বীজ'রূপে যে আমিই ('সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম')—এটি দেখাইব এবং এটি দেখার প্রয়াসকে ভরণ করিব। কেন দেখাইব? যেটি ক্ষরিত হইল, চ্যুত হইল, সেটি সেভাবেও অক্ষর এবং অচ্যুত আমাতেই যেন স্বরূপতঃ যুক্ত, গ্রথিত থাকে, এই নিমিত্ত। কাজেই, ক্ষরিত হইয়াও সেটি 'ক্ষরিতমিব', চ্যুত হইয়াও সেটি 'চ্যুতমিব'। এই 'ইব'টুকু চিনিয়া বাছিয়া লওয়াই তো

যোগ, জ্ঞান ভক্তি সকল সাধনেরই সর্বথা সাধ্য। ঐ 'ইব'টিকে সরাইয়া 'এব' করাই তো সকল সাধকেরই 'সাধ্যশিরোমণি'! আচ্ছা, 'যোনিলিঙ্গা' আকৃতি (Pattern) টি অঙ্গীকার করতঃ বীজাধান কর্মটি করেন—আপন প্রকৃতিতে আপনি অধ্যক্ষতা করেন ('ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি'...) ; কি জানি কেন, তিনি 'ন বৈ রেমে'—সুতরাং 'রমণীরমণ' এই যুগলরূপটি ধরিলেন; ধরিয়াও (দুয়েতেই একাধারে আশ্রয় এবং বিষয় হইয়াও) তিনি 'রসো বৈ স ভূমা'রূপে দুয়েরই আশ্রয় এবং অধিষ্ঠানটি রহিলেনই। তাই না রসাস্বাদনের পরমতার ভূমি যে 'ন সো রমণ না হাম রমণী'—এই অভাবনীয় শাশ্বত পরম নিবিড় ভাবেরই ভূমি! সকল পরম নিবিষ্টতার ভূমিই এই পরমাশ্চর্য অদ্বৈত ভূমি। যৎকালে চিনি তুমি সত্যসত্যই খাইতেছ, তৎকালে চিনি শুধু নিজেকে খাওয়াইতেছে এমন নয়, তোমাকেও যে খাইতেছে; তোমার তুমিত্ব তার তত্ত্বে মিলিয়া যাইতেছে; অর্থাৎ, তৎকালে চিনি আর তুমি একই। সব কিছুতেই তাই। একটা ফুল দেখিতেছ, কি মনে একটা বেদনা বোধ হইতেছে—সর্বত্রই তাই। ভাবিতে গেলে, বলিতে গেলে,—এ আর সে করিয়াই ভাবিতে ও বলিতে হয়। সাক্ষাৎ অনুভব, নিবিড় আস্বাদন, গাঢ় সংবেদন, আর তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা, বলা কওয়া তো এক বস্তু নয়।

আত্মযাগে অরণিদ্বয়কে কিভাবে ভাবনা করিতে হইবে? পুনশ্চ এই মূল রহস্যটিকে 'মন্থন'রূপে ধ্যান কর। মন্থনে আবশ্যকীয় তিনটি কলা বা Component "ত্রেধানিদধেপদম্"

আচ্ছা ঐ যোনিলিঙ্গা উপাধিতে তিনি যেন ঐ আপন পরম ঘনীভাবরূপ বিন্দুটি নির্মন্থনের নিমিত্ত আপনাকে দুটি অরণিরূপে কল্পনা করেন। একটি 'শোণা', কিন্তু শোণিতবর্ণা। এটি অধরারণি—যোনিকলা। অপরটি শুক্ল অরণি—সেটি উত্তরারণি। অধ্যাত্ম অগ্নিবিদ্যায় বিদ্বান এ দুটি অরণিকে নানাভাবে সন্ধান, চয়ন ও দর্শন করুন। আত্মা, প্রণব, কলা, নাদ; ইত্যাদি। রসিক ও ভাবুকেরাও নানাভাবে এ অরণিমন্থনতত্ত্ব ভাবনা ও আস্বাদ করুন। এই ভাবনা ও আস্বাদনের ফল বলিতেছেন—ঐ সাক্ষাৎ উপলব্ধি এবং আস্বাদনটি ঘটিলেই, ঐ যোনিলিঙ্গা ভাবের যেন স্বীয় চরিতার্থতাটি ঘটিয়া যায়; তখন 'যোনি' আর জন্মের (জনি) ক্ষেত্র

(আধার) থাকে না, 'লিঙ্গ' ও তৎসম্পর্কে 'ক্ষেত্রী' (আধেয়) থাকে না; অর্থাৎ, কলা এবং নাদ এ দুয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট বিন্দুটিকে তত্ত্বতঃ ভাবতঃ জানিলেই নাদবিন্দুকলাতীত, অযোনি, অলিঙ্গ সেই পরমতত্ত্বে স্থিতি হইয়া থাকে। মন্ত্রযোগে, হৌঁ এই একাক্ষর মন্ত্রময়ী তনু, অথচ সেটিকে অতিক্রম করিয়া (ঊর্দ্ধগ) এবং আদিম আধাররূপে, যে অনাদিনিধন শম্ভুলিঙ্গ রহিয়াছেন, তাঁর জপধ্যান কর। তাতেই উক্তফল ক্রমশঃ সমধিগত হইবে জানিও। পুনশ্চ :—

দ্বন্দ্বব্যক্ত্যায়ুদধিমথনে জায়তে যোনিলিঙ্গাং
তেন ত্রেধা দিবি কিমমৃতং ভূর্ভুবঃ স্বর্নিধাতুম্।
অগ্রে পঞ্চাবতরণকৃতো বিভ্রতি হ্যাত্মযোনিং
পঞ্চান্তে যে নিদধতি ততশ্চাসকৃদ্ বাত্মলিঙ্গাম॥
প্রাণাপানাবরণিযুগলং চন্দ্রসূর্য্যাখ্যনাড্যা
বগ্নীষোমাবপি মনুজপে ব্যাহৃতৌ ভাবমন্থঃ।
হংসঃ সোঽহং কুললয়কৃতৌ দৃগ্‌দৃশের্বা সমাধৌ
রাসোল্লাসে পদপরিচয়ে গীর্ষুতচ্ছম্ভুলিঙ্গাম্॥৭৫-৭৬

নিখিল সৃষ্টিতে (অণু কিংবা বিরাটে সর্বত্র) যে দ্বন্দ্ব (Polarity), সেটিকে বিশেষভাবে এবং বিচিত্রভাবে ফুটাইয়া তুলিবার নিমিত্ত (ব্যক্ত্যৈ), অর্থাৎ, বিষ-অমৃত, আলোক-অন্ধকার, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি নানারূপে দ্বন্দ্বটিকে প্রপঞ্চিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, সেই অযোনি-অলিঙ্গ পরম-তত্ত্ব 'যোনিলিঙ্গ' এই মূল দ্বন্দ্বটি যেন স্বীকার করিলেন; এবং সেইভাবে 'গম্ভীরাম্ভঃ' স্বরূপ যে অব্যাকৃত, অব্যক্ত (undifferentiated, unmanifest), সেটিকে মন্থন করিলেন। এটি শাশ্বতিক ব্যাপার—নিরন্তর সর্বস্তরেই চলিতেছে। উপাদানটি 'মাতৃকা' (Matrix) রূপে সমস্ত কিছুই গর্ভে ধরিয়া আছে; সেটির মন্থনের যে 'হেতু' (লিঙ্গ), সেটি (যেমন পরের চরণে বলা হইয়াছে) 'ত্রেধা নিদধে পদম্'; তিনটি কলা বা Component এ সেটি ব্যাপারবান হইয়া থাকে—'দণ্ড' বা অক্ষ, অক্ষ'পীঠ' বা আধার এবং 'রজ্জু'। এ তিনটিই রহস্য সঙ্কেত, এবং সর্বত্রই অনুস্যূত। Axis, Base, Coefficient—এ তিনটি কোন না কোন ভাবে চাই-ই সর্ববিধ 'মন্থনে'। এর মধ্যে শেষের Factorটি

দুটি বিরোধী (+ –) কার্যকরী শক্তিরূপেই নিজেকে প্রকট করিয়া থাকে। মিছরি দানা বাঁধিবে; nebulae এক জগৎ সৃষ্টি করিবে; বীজ অঙ্কুর হইবে; সুষুপ্তি এইবার জাগৃতি হইবে; অলসিত রস এইবার উল্লসিত হইবে, মূক আলোচনা জ্ঞান এইবার বিজ্ঞান হইবে;—সর্বত্র ঐ 'ত্রেধা নিদধে পদম্' অন্বেষণ কর।

"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—ইহার তাৎপর্য

আচ্ছা, 'ভূর্ভুবস্বঃ' এই তিন খ্যাতিতে 'আক্রমণ' করতঃ যে তত্ত্বটি 'পদ' ত্রিবিধ কলায় বিন্যাস করিলেন, তিনি কি সেই 'ত্রিপাদস্য অমৃতং দিবি' তত্ত্ব, যাঁর কথা ঋঙ্মন্ত্র ভূরিশঃ কীর্তন করিয়াছেন? 'দিবি' বলিতে, 'অমৃতং' বলিতে 'অস্য' বলিতে, এবং 'ত্রিপাৎ' বলিতে যে কি বুঝিতে হইবে তা চিন্তা করিও। মন্থনে তো বিষের সঙ্গো পাল্লা দিয়া অমৃত উঠিতেছে, আর অমৃতের সঙ্গো পাল্লা দিয়া বিষ; কিন্তু এমন একটা ঠাঁই নেই কি, সেখানে পাল্লারহিত ভাবেই প্রতিযোগিবিহীন অমৃত চির বিদ্যমান? এখানে (ভূর্ভুবস্বঃ ভূমিতে) একটি পদেরি তিনটি কলা (Aspects); ওখানে 'ত্রিপাৎ' (এটি সৎচিৎ-আনন্দ; সত্যজ্ঞান অনন্ত; হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ; ইত্যাদি নানা দৃষ্টিতেই দেখা হইয়াছে) বলিতে 'পাদ মাত্রা কলাকাষ্ঠা' এই বর্গচতুষ্টয়ের অন্তর্গত যে পাদ, সেটি বুঝিলে চলিবে না।

যজ্ঞফলামৃত রূপ যে অমৃত সেটি লাভ করিতে হয় কিরূপে?

দিবি যে অমৃত সেটি আপনাকে 'যজ্ঞফলামৃত' রূপে ব্যক্ত করিবে যে উপাধিকে আশ্রয় করিয়া সে উপাধি হইতেছে পূর্বোক্ত 'যোনিলিঙ্গাম্', এবং ঐ উপাধিটি আকৃতিমান হয় 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' এই ব্যাহৃতি ত্রয়াত্মক অন্তর্বহিঃ সর্ববিধ যজ্ঞে। ঐ ব্যাহৃতি ত্রয়কে সেই মৌলিক পুরুষযজ্ঞের যথার্থ আকৃতিরূপেই আমরা চিনিয়াছি।

যজ্ঞকে 'অমৃতফলায়' ভরণের নিমিত্ত
শ্রীভগবানের অবতার। দশাবতার তত্ত্ব

তারপর, প্রসিদ্ধ দশমহাবিদ্যা এবং ভগবানের দশাবতার। দশমহাবিদ্যা স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে। এখানে দশাবতারের তত্ত্বটি এই আকৃতিতে ধ্যান কর। অপিহিত

দৃষ্টিতে অবতার নৈমিত্তিক বটে, কিন্তু আততদৃষ্টিতে ইহা নিত্য এবং সার্বজনীন। দশাবতারের মধ্যেও ঐ পরমরাহস্যিক 'যোনি-লিঙ্গাম্' তত্ত্বটি কে দেখিবে? আদি পঞ্চাবতারে ভগবান 'আত্মযোনি', কিনা সৃষ্টির মূল কারণতা রূপটি বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন, আর শেষ পঞ্চাবতারে তাঁর তৎসম্পর্কে মূল কারকরূপটি ('আত্মলিঙ্গাম'); প্রথমটিতে তাঁর আত্মপ্রকৃতির (নিজমায়া বা স্বমায়ার) পূর্ণ উপযোগ, পরেরটিতে সেই আত্মপ্রকৃতিতে তাঁর আপন অধ্যক্ষতার পূর্ণ উপযোগ। এই 'আত্ম' বা 'স্ব' এবং 'মায়া' বা 'প্রকৃতি'কে একেবারে আলাদা করিয়া দেখিও না। প্রথম পঞ্চাবতারে স্বপ্রকৃতির প্রধানীভাব আর অধ্যক্ষতার গুণীভাব, শেষ পঞ্চাবতারে স্বপ্রকৃতির গুণীভাব, অধ্যক্ষতার প্রধানীভাব। এটি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। এভাবে দশাবতারে পারম্পর্য, পৌর্বাপর্য নেই।

মন্ত্রলয়যোগাদি সর্ববিধ অধ্যাত্মসাধনে যোনিলিঙ্গ তত্ত্বের ধ্যান

শেষকালে, সর্বসাধনের তত্ত্বাশ্রয়রূপে 'যোনিলিঙ্গাম্' ভাবনা কর। প্রাণায়ামে প্রাণ ও অপানকে এবং চন্দ্রনাড়ী (ইড়া) এবং সূর্যনাড়ী (পিঙ্গলা) কে ঐ যোনিলিঙ্গের প্রতীক অরণিযুগল ভাবনা করিও। অরণিমিথুনের মন্থনে উক্ত সাধনে যে কিরূপ 'অগ্নি' (সৌযুম্ন) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাও চিন্তা করিও। মন্ত্রজপে কি ভাবনা করিবে? মন্ত্রাক্ষরে (যথা-হ্রীঁ) নিহিত অগ্নি ও সোম পরস্পরে 'সঙ্গাত' হওয়া চাই, সুসঙ্গাত হওয়া চাই; অন্যথা, আপৎ। পুনশ্চ, মন্ত্রের ব্যাহরণ এবং মন্ত্রের অর্থ ও ভাব (অর্থভাবন), এ দুয়ের মিত্রচ্ছন্দে ও মধুচ্ছন্দে মন্থনটি হওয়া আবশ্যক। অতঃপর, লয়যোগে, 'কুল' (কুলকুণ্ডলিনী অথবা ব্রহ্ম) লয়ের নিমিত্ত যে 'হংসঃ সোঽহম্' সাধনটি করিতেছ, তাহাতেও আদিতে সৌষ্ঠব, মধ্যে সৌষম্য (সৌযুম্ন) এবং অন্তে 'সামরস্য' আসা আবশ্যক। এখানেও যোনিলিঙ্গাম্ তত্ত্বটিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করিও।

ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগেও অনুরূপভাবেই ধ্যান করিতে হইবে

আবার, রসাশ্রয়ে যে সাধন, তাতেও অলসিত রসবস্তুটিকে উল্লসিত বিলসিত করিবে কি প্রকারে? অন্তর্লীন রসের মন্থনটি আবশ্যক হয়—গোপীজন এবং গোপীজনবল্লভ

এই পরম মিথুনীভাবটির অনুগ ভাবটি সমাশ্রয় করিতে হয়। শেষকালে, তুমি যে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার করিতেছ, তাতেও 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদের সম্যক্ পরিচয়ের নিমিত্ত কি আবশ্যক হয়, সেটিও চিন্তা কর। এখানেও ত্বং পদার্থ অধরারণি এবং তৎ পদার্থ উত্তরারণি; এবং 'অসি' পদের দ্বারা উভয়ের মন্থন। তলাইয়া বুঝিও।

কর্ণমল ও মানসমল—এদের লক্ষণ ও প্রতীকার

সুতরাং, যোনিলিঙ্গাম তত্ত্বের বিগ্রহ শিবলিঙ্গাকে 'সর্ব্বতো ব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠ-দ্দশাঙ্গুলম্' ভাবেই ধ্যান করিও। তা হইলেই সর্বাভীষ্টসিদ্ধি। ভুক্তি, মুক্তি, শুদ্ধা ভক্তি—যাহাই অভীষ্ট হৌক্, তাহারই সিদ্ধি। পাশ্চাত্য গুরুবর্গ লিঙ্গপূজাটি 'phallic worship', 'erotic symbolism' ইত্যাদি বলিয়া কানে যে মন্তোর দিয়াছেন, সে মন্তোরে শুধু 'কর্ণমল' নয় মানসমলও অজস্র জমিয়াছে এবং পুঞ্জীভূতও হইয়াছে। কাজেই, শ্রোত্র মনোরসায়ন উক্ত পরম কল্যাণপ্রদ 'শিবায়ন' অথবা 'লিঙ্গায়ন'টি বধির কর্ণে এবং সংমূঢ় মনে সহজে প্রবিষ্ট হইতেছে না। শিবনির্মাল্যপূত ত্রিশূল শলাকা দিয়া হৃৎকর্ণের সংস্কারটি অগ্রে করিয়া লও। শিব-নির্মাল্য? ওঙ্কার। ওঙ্কার বা তদ্বাচক নামের মতো পরম শিবপ্রদ নির্মাল্য (নির্মলীকরণ) আর কি আছে বল? আর ত্রিশূল? ত্রিপাদ গায়ত্রী। ওঙ্কার দ্বারা ত্রিবৃৎকৃত গায়ত্রী জপটি সংযতচিত্ত হইয়া অগ্রে করিয়া লও। ওখানেও কি পাশ্চাত্য গুরুবর্গের কৃপালব্ধ 'Solar Myth' ইত্যাদি ঢুকাইয়া বসিয়াছ? ত্রিশূল শলাকাদ্বারাই সর্বপ্রযত্নে সে 'শেল' উদ্ধার কর, স্বস্থ হও। তোমার গায়ত্রীতে অধিকার নাই বলিতেছ? সকল দীক্ষিতেরই আপন গায়ত্রী আছে। আর—'শিব শিব শিব', 'হর হর হর,' 'কাশী, গঙ্গা, বিশ্বনাথ' এই সকল নামজপই তা হইলে ঐ নির্মলীকরণ ত্রিশূল জানিও। বিষ্ণুকর্ণমল থেকে মধুকৈটভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; আর, তোমার কর্ণমল থেকে প্রাদুর্ভূত হয় অশুশ্রূষা ও অবজিজ্ঞাসা। আর, মানসমল থেকে প্রাদুর্ভূত হয়—অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা—যার ফলে তুমি হও অশ্রদ্দধান এবং বিবুৎসু। তাই তোমার পরমার্থে apathy ও antipathy. এইবার নীচের কারিকাটিতে ঐ পরম রহস্য যোনিলিঙ্গা প্রতীক শিবলিঙ্গা যথোক্ত মন্ত্রে জপধ্যান কর:—

সর্ববিধ নির্মলীকরণে উপায়স্বরূপ শিবলিঙ্গ ধ্যান এবং মন্ত্রাদি জপদ্বারা অর্চনা

শান্তাদ্বৈতং শিবমিতি জপন্ যাহ্যলিঙ্গাং পরং তদ্
হৌমিত্যেকং মনুমনুজপং স্তারকণ্ঠৈকলিঙ্গাম্।
শক্ত্যা সার্দ্ধং শিবসমরসং হৌংসইত্যর্ণ যুগ্মং
পঞ্চার্ণঞ্চ ত্রিপুরহরণং ত্র্যম্বকং মৃত্যুমৃত্যুম্॥৭৭

'ওঁ শিবং শান্তং অদ্বৈতম্' এই শ্রুতিমন্ত্র জপধ্যান করতঃ (জপন্) লিঙ্গারহিত যে পরমতত্ত্ব (অলিঙ্গাং পরং তৎ) তাতে প্রবিষ্ট হও (যাহি)। শ্রুতি স্বয়ং দেখাইয়াছেন যে এ জপটি প্রণবজপেরই 'অমাত্র' বা মাত্রাতীত পর্যবসান। এই পর্যবসানের নিমিত্ত 'অর্দ্ধমাত্রা' রূপ সেতুটির সমাশ্রয় আবশ্যক হইয়াছে, যদিও শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে সেটি শুনান নাই। শান্তাদ্বৈতভূমির ঠিক অগ্রে যে ভূমি সেটি রহস্যভাষায় 'একলিঙ্গা' ভূমি। সেটি তারক। প্রণবই তার বা তারক। নাদ-বিন্দু এই কাষ্ঠায় পরিপূর্ণকলা অর্দ্ধমাত্রারূপে। 'হৌং' এই একাক্ষর 'মনু' বৈখরী থেকে পশ্যন্তীর শেষ প্রান্তভূমি পর্যন্ত জপকরতঃ (অনুজপন্) উক্ত তারকটিকে মাত্রাত্রয়ের পারে তোমাকে উত্তীর্ণ করিতে দাও। এসকল ভূমির 'অলিঙ্গা পর্য্যবসান', 'একলিঙ্গা পর্য্যবসান' ইত্যাদিকে সাংখ্যাদির অলিঙ্গা-পর্যবসানাদির সঙ্গে গুলাইও না। বিবেচন (discrimination) টি করিয়া লইও। 'অলিঙ্গা', 'অযোনি' শব্দগুলির পদার্থ ঠিক ঠিক শোধন করিয়া চলিও। তারপর শিবশক্তির (যোনিলিঙ্গের) 'সামরস্য'—(যেটি শৈবাদ্বৈতাগমে লক্ষ্য হইয়াছে)—সেটিতে প্রবিষ্ট হবার নিমিত্ত শক্তি-শক্তিমানের তাদাত্ম্যবোধক 'হৌংসঃ' এই দ্ব্যর্ণ মহাবীজটি জপধ্যান করিও। অলসিত আনন্দের উল্লাস-সমুল্লাস-বিলাস-পরমবিলাসের নিমিত্ত, এবং জ্যোতির সাথে রসকে অভিন্নভাবে আস্বাদের নিমিত্ত, এই জপধ্যানটি একান্ত সমর্থ জানিবে। আবার, 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপধ্যান করতঃ ত্রিপুর (জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি) সজ্জিত তোমার যে পঞ্চগেহ (পঞ্চকোষাদি), সেটিকে হরণ করিতে যত্ন কর। এরা তো 'হরণ' (minus) আকৃতিতে রহিয়াছে; অগ্রে সেই হরণের হরণে পূরণ (plus), তৎপরে সেই পূরণেরও হরণে পরম কৈবল্য বা শান্ত শিবাদ্বৈত

স্থিতি। শেষকালে, মৃত্যুরও যে মৃত্যু (সাক্ষাৎ নিরুপাধি-অমৃত) সেটিকে প্রাপ্তির নিমিত্ত কি করিবে? 'ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি শ্রৌত মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র এবং 'ওঁ জুংসঃ' এই ত্র্যক্ষর বীজও জপধ্যান কর।

লক্ষ্য কর যে পরম লক্ষ্য সর্বস্থলেই এক। তবে, পাঁচটি প্রস্থানভেদ (lines of approach) কারিকাটিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমাদ্বৈত, একাদ্বৈত, দ্বয়াদ্বৈত, ত্রিবৃদদ্বৈত বা ত্রয়াদ্বৈত (ত্র্যম্বকং) এবং প্রপঞ্চাদ্বৈত বা পঞ্চাদ্বৈত।

(২৭)

প্রগুণিত প্রকরণম্

॥ অদ্বৈতাদ্বৈত দশকম্॥

যদি জ্ঞানে দ্বৈতং তদপি কিমবৈতি ত্রিপুটিতং
যদি জ্ঞানেঽদ্বৈতং কথমহমিদং বা বিমৃশতি।
যদি স্বাদেঽপ্যেবং রসরসভুজৌ কীদৃশরসৌ
যদি দ্বৈতাদ্বৈতং গহনতরতাং যাতি গহনম্॥

পৃথগ্ জ্ঞানং কিঞ্চিৎ স্ফুরদিব দিতং ভানমখিলং
যথা বিশ্বে বোধেঽপ্যভিজিদিতি নক্ষত্রচয়নম্।
ঋতে দৃশ্যং দ্রষ্টেতি পৃথগুদয়ং কিং বিষয়কা
প্রমাতুর্ধীর্গীর্বা হ্যনবসরদং ভানমুভয়োঃ॥
ক্বচিৎ স্বাদং ভোক্তে দদতি কণিকাঃ স্বাদু মধুনো
[দদতি চ পৃষন্তীষ্টমধুনঃ]
যত্তৎ স্মারং স্মারং মনসি মধুচক্রং রচয়তি।
ঋচা ধারা মাধ্বী ক্ষরতি মধুমত্যা ক্বচিদপি
ক্বচিল্লব্ধানন্দী রসমিতি ঘনীভাবগমনম্॥

স্বয়ং মন্যে স্বাদী শ্রয়তি ময়ি তৎ স্বাদবিষয়ং
ন চেন্ মন্যে দ্বৈতং রসরসভুজোর্বিগলতি।
বিমৃশ্যৈব দ্বৈতং তদনুভবমাত্রং স্পৃশতি ন
ন বা দ্বৈতাদ্বৈতং কিমপি সহতে স্বাদনিবিড়তা॥

অনির্বাচ্যখ্যাতি প্রকটয়তি ভানং স্ববিষয়
মসামগ্রব্যাপ্তির্ভবতি সুধিয়াং বোত্তমগিরাম্।
অনির্বাচ্যাস্বাদং স্ফুটতমরসাবেদনমপি
ন বা সম্যগ্ যুক্তং সুরসিক রসাস্বাদ ভণিতম্॥

অবর্ণেনায়াতি প্রমিতি বিষয়ং কিঞ্চিদপি ন
উবর্ণে নোদেতি ক্রমপরিণতির্ব্যস্তবিষয়া।
মবর্ণেন জ্ঞাতা মনতি বিষয়ং ক্রাম্যদিতর
দধো যাঽর্দ্ধা তস্যা মুখরমখিলং মূক উপরি॥

কবর্ণাদ্ যো ভূমা নিরতিশয় সুখাখণ্ডনিলয়
স্ততো লাদ্ হ্লাদিন্যা রসবিলসনং রাসমভিতঃ।
ইদীর্ঘাদ্রাসাজ্ঞং স্ফুটশতদলং চিত্রবিততৌ
তদিন্দোর্বিন্দোঃ কিং নিপুটিতদলং কোরকমিব (ঘনম্)॥

অধিষ্ঠানে ব্যক্ত্যে সকলজগতাং ব্যঞ্জনমুখে
পরিস্পন্দঃ শান্তে করণকলনায়াগ্নিমনুনা।
সিসৃক্ষেক্ষেবর্ণাদপি শশিকলায়া উপশমো (জনিলয়ো)
যদাদ্যাবীজং তন্ নিবিড় রস রাধাধর জুষঃ॥

যদি ব্রহ্মামূর্ত্তং শ্রুতিষু পিহিতং রুক্মরজসা
ভবেল্লক্ষ্যং সাক্ষাৎ প্রণবধনুষা বেধরভসাৎ
কুতো নাদস্ফোটং ধনুষি শৃণুয়া জ্যার্পণমৃতে
কলাং ভিত্ত্বা বিন্দুং কথমপি বিশের্বা পরতরম্॥

উদাহনারোপ্যোর্ব্বী মম ধনুষিতে জ্যাং প্রথমতো
ন চেদ্ বিধ্যের্নাদং নদিত গুণ চাপাদগুতমম্।
গুণীভূতো বিন্দু র্ন চ সপদি বিব্যৎসতি কলাং
কলা তুর্য্যা জ্যা চেৎ সকলকলনান্তং কুত ইতঃ॥৭৮-৭৯

জ্ঞান ও ভান দুয়ে পার্থক্য

যদি বল, জ্ঞান হইতে গেলেই কেহ জ্ঞাতা এবং কোন কিছু তার জ্ঞেয় (Subject and Object)—এইরূপ দ্বৈত নহিলে হয় না; আর শুধু তাই নয়,—যে জানিতেছে এবং যাহা জানিতেছে, এ দুয়ের কোন এক প্রকার 'সম্বন্ধ' ও আবশ্যক, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই ত্রিপুটীই আবশ্যক; তা হইলে বলিবে কি—জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের পরস্পর ঐ প্রকার সম্বন্ধটি জানিতেছে কে? জ্ঞেয় বিষয়—যথা ঐ ঘট? তা অবশ্যই বলিবে না। তবে কি বলিবে যে সম্বন্ধ নিজেই নিজেকে জানিতেছে? কিন্তু তাই বা বলিবে কি প্রকারে? অঙ্কুরোদ্গমে আগে বীজ কারণ রূপে বিদ্যমান—এ সম্বন্ধটি যাহা জানিতেছে, সেটি অবশ্য বীজও নয়—কেন না, অঙ্কুরোদ্গমে বীজ আর বীজ থাকে না; সেটি অঙ্কুরও নয়—কেন না, তার উদ্গমের পূর্বে সে ছিল না; আবার, সেটি বীজের অঙ্কুরাকারে পরিণামটিও নয়—কেন না ঐ পরিণামও ক্রমে ক্রমে এক অবস্থার বিলয়ে অন্য অবস্থার বিকাশে হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐ চলচ্চিত্রের পর পর সব 'ছবি' প্রকাশ করিবার কোন এক প্রকাশক অবশ্যই আছে, যেটি স্বয়ং 'পূর্ব্ব পর' ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বয়ং পতিত বা অন্তর্ভুক্ত নয়। বীজাঙ্কুরাদির বেলায় যেরূপ, আন্তর ব্যাপার—যেমন 'আমি বীজের অঙ্কুর আগে দেখি নাই, এইবার দেখিতেছি'—সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয়টিকেও জানে এবং তার সঙ্গে নিজের 'কারবার'ও সে জানে—এ সমাধানও অচল। লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে—যখন একটা গাছ বা অন্য কিছু জানিতেছ, তখন (অর্থাৎ ঠিক সেই ক্ষণেই) 'আমি জানিতেছি' এ জ্ঞানটি সচরাচর থাকে না। তৎকালে মুখ্যতঃ ঐ জ্ঞেয়বস্তুটিই জ্ঞান। ভাবিতে গেলে ও বলিতে গেলে (in judgment and discourse) অবশ্য 'আমি জ্ঞাতা এবং ঐ বিষয়টি জ্ঞেয়' এই ভাবেই ভাবিতে-কহিতে হয়। না-ভাবিয়া-কহিয়া যে জ্ঞান আর ভাবিয়া-কহিয়া যে জ্ঞান—এ দুই একই জ্ঞান নয়। অথচ, সেই ভাবেই সেটি 'সজীব তথ্য' (living fact)। বলিতে কহিতে গেলে সেটির অবচ্ছেদ প্রতিচ্ছেদাদি (limitation, cross-section) করিতেই হয়। অন্যথা সেটি অব্যবহার্য। সেটিকে এই গ্রন্থে (এবং জপসূত্রকারের ইংরাজি Approaches to Truth, Patent Wonder প্রভৃতি গ্রন্থে) 'ভান' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

Approaches to Truth নামক গ্রন্থে সবিশেষ বিশ্লেষণ বিচার করতঃ ইহাকে Fact এই নাম দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই তিনই ঐ ভান চৈতন্যের কুক্ষিগত ('Fact-sections'), এবং ভান চৈতন্যের মধ্যেই ত্রিপুটী রূপে উদ্ভূত ও প্রকাশিত। কাজেই, জ্ঞাতা আপনাকে, আপনার বিষয় ও সম্বন্ধকে প্রকাশ করিতেছে না। ভানই প্রকাশ করিতেছে। 'তদপি কিমবৈতি ত্রিপুটিতম্'—এই প্রশ্নের উত্তর ইহাই।

ভানে প্রকাশ ও বিমর্শ

তবে কি বলিব—ভান হইতেছে শুদ্ধ প্রকাশ বা প্রকাশ মাত্র? তা বলিলে শুদ্ধ প্রকাশে 'অহং' 'ইদং' ইত্যাকার দ্বৈত (polarity) উদিত হয় কিরূপে—এ প্রশ্নের কোন জবাব মিলে না। অতএব প্রকাশের সঙ্গে 'বিমর্শ' না মানিলে 'সজীব তথ্য'কেই অস্বীকার করা হয়। প্রকাশটাই সত্য, কেন না কালত্রয়ে অব্যভিচারী, আর বিমর্শ ব্যভিচারী—কদাচিৎ থাকে কদাচিৎ থাকে না—কাজেই মিথ্যা, এ তর্ক বর্তমান স্থলে অপ্রাসঙ্গিক। 'ভান' (total actual experience) এ দুই-ই সচরাচর আছে। সুষুপ্তি বা তুরীয়ের কথা না হয় আপাততঃ নাই তুলিলাম।

প্রকাশ-বিমর্শের গহন সম্পর্ক

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানে দ্বৈত অথবা জ্ঞানে অদ্বৈত, এ দুয়ের কোন পক্ষ আশ্রয় করতঃ নির্ব্যূঢ় যথার্থ যেটি সেটিকে পাই না। তবে কি বলিবে—দ্বৈতাদ্বৈত? 'ভান' সামগ্রী বা অখণ্ডভাবে এক, কিন্তু তার ভিতরে দুই বা বহু নানাভাবে উদিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে—Synthetic Unity? সাধারণ বিবৃতি হিসাবে কথাটা চলিতে পারে বটে। আসলে, ঐরূপ বলায় যাহা 'গহন' (দুর্বোধ্য), সেটি আরও গহন হইতেছে মাত্র (গহনতরতাং যাতি গহনম্)। শুদ্ধ প্রকাশ এবং অহমিদমাদি বিমর্শের সম্বন্ধটাই একান্ত গহন; ভানে দুই-ই রহিয়াছে বলিলে, তথ্যের বিবৃতি দেওয়া হইল সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকাশ-বিমর্শের সম্বন্ধের রূপটা বিন্দুমাত্রও স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত হইল না। বরং, শুদ্ধ প্রকাশ ধারণা করিলেও করা যায়, বিমর্শও বোঝা যায়, কিন্তু দুয়ে এমন ভাবে মিলিল, সহগ হইল কি প্রকারে—এ সমস্যা আরও গাঢ় হইল মনে হয়।

পুনশ্চ, এক বা দুই বা অনেক—এসব সংখ্যাবাচক নিরুক্তি অনিরুক্ত ভান-সামগ্রীতে স্বরূপতঃ অনবকাশ (irrelevant)—ইহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কাহাকে এক বা দুই বলিতেছ, এবং কেই বা বলিতেছে—এটি মনে রাখিও। সমগ্র ভানের কোনও 'অংশ' বা আন্তরবৃত্তি (immanent process) দ্বারা সেটিকে সমগ্র এবং সত্য ভাবে ব্যাপ্ত করা যায় না (অর্থাৎ, সেরূপ processএর কোনও total অথবা transcendental application সম্ভবপর নয়)। অতএব, দ্বৈত, অদ্বৈত, অথবা দ্বৈতাদ্বৈত—কোনও রূপ নিরুক্তি করিতে গিয়াই ভানচৈতন্যের মাঝে 'হালে পাণি' পাইবে না।

আস্বাদের ব্যাপারেও এইরূপ। যেখানেই আস্বাদন, সেখানেই আস্বাদক-আস্বাদ্য এই দুটি পক্ষ থাকিবেই, অর্থাৎ যুগ্ম বা যুগল এই আকৃতিটি না রহিলে আস্বাদন ব্যাপারটাই সম্ভবে না—এরূপ 'ভাবিতে' এবং 'কহিতে' আমরা একরূপ বাধ্য আছি সন্দেহ নাই। কিন্তু আসলে আস্বাদন এমন এক জিনিষ যার স্বরূপ দ্বৈত, অদ্বৈত কিংবা দ্বৈতাদ্বৈত এ সকল 'সাংখ্য' নির্বচন সহ্য করিতে নারাজ। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে সত্যকার আস্বাদন এবং আস্বাদনের মনন-বিশ্লেষণ এক বস্তু নয়। প্রথমটির বেলা অপরটির 'অনধিকার', দ্বিতীয়টির বেলা প্রথমটি প্রায় 'নিরুদ্দেশ'। রস এবং রসভোক্তা, এ দ্বৈতটি যে রস বা আনন্দের আধারে উদিত হইয়া পরস্পরকে বিষয় এবং আশ্রয় সম্পর্কে নিরীক্ষণ করিতেছে, সে আধার স্বয়ং সম্বন্ধাতীত (রসরসভুজৌ কীদৃশ-রসৌ)। সেটি সম্বন্ধে দ্বৈত, অদ্বৈতাদি কোনও পক্ষ আশ্রয় করিয়াই সমাধান হয় না।

ভানের অখিলত্ব। উদাহরণ

এই ভানের অখিলত্ব (অনির্বাচ্য অখণ্ডত্ব) বিশেষ ভাবে চিন্তা কর। ধর, রাত্রিকালে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উজ্জ্বল অভিজিৎ নক্ষত্রটি দেখিতেছ। এস্থলে, ঐ নক্ষত্রটি তোমার বিশেষ অভিনিবেশ বা মনঃসংযোগের বিষয় বটে (focal object of visual perception), কিন্তু বস্তুতঃ উহাই কি তোমার সমগ্র দৃষ্টিপট? অর্জুনের লক্ষ্যবেধে যেরূপ হইয়াছিল, তোমার আমার সচরাচর সেরূপ হয় না। একটা বড় ছবিই মনের ক্যামারাতে ওঠে, তবে যেখানটায় তাগিদ অথবা গরজ সেইখানটাতেই

মনঃসংযোগ করি (অভিজিদিতিনক্ষত্রচয়ন)। বাকিটা থেকেও না থাকার মত হয়। ভাবি ঐ উজ্জ্বল তারাটাই দেখিতেছি, বলিও তাই। আচ্ছা, তৎকালে তোমার সমগ্র অনুভূতি জগৎটা (total universe of experience) কি আকাশে ঐ বড় ছবিখানা, যার ভিতর অভিজিৎ তারাকে বাছিয়া আপন জ্ঞানের বিশেষ বিষয় ভাবিতেছ ও কহিতেছ? না, তাও নয়। অনেক বাহ্য (শব্দস্পর্শাদি) এবং আন্তর (বেদনা কল্পনাদি) অনুভবও তার সঙ্গে জড়িত আছে; এগুলো অবশ্য অভিনিবেশের কেন্দ্র হইতে তফাৎ যেন এক ছায়ালোকে সরিয়া আছে, অথচ সমগ্র অনুভবের বাহিরে নয়। কাজেই, অখিল (অখণ্ড) ভান যেন আপনাকে টুকরা করিয়া (দিতমিব) এটা-ওটা পৃথক বস্তুরূপে প্রমিতি বিষয় করিয়া থাকে। ভানচৈতন্যে 'এটি দৃশ্য, এটি দ্রষ্টা' এভাবে পৃথক উদয়টি হয় বলিয়া বুদ্ধি ও বাক্যের ভাবার এবং বলার অবকাশ মিলিয়া থাকে; পৃথক উদয়টি না ঘটিলে বুদ্ধি ও বাকের কোন বিষয় আর থাকে না (Fact-review and report সম্ভবে না)। কিং বিষয়কা প্রমাতুর্ধীর্গীর্বা? ভান অখণ্ড, সমগ্রভাবে বুদ্ধি অথবা বাক এ দুয়ের কাহারও ব্যাপারের অবসর অবশ্যই দেয় না। হ্যনবসরদং ভানমুভয়োঃ। অথচ, ভানের 'কুক্ষি'তেই যাবতীয় ব্যাপার ঘটিতেছে।

আস্বাদে বা ভোগে আশ্রয় ও বিষয় সম্বন্ধ কিভাবে থাকে? ভাবে অবগাহন

যদি মনে ভাবি অথবা কল্পনা করি যে আমি নিজে আস্বাদক (মন্যে স্বয়ং স্বাদী—enjoyer), তবে অবশ্য এও ভাবিতে হয় যে আমাকে অথবা আমার অনুভবকে আশ্রয় করিয়া ঐ স্বাদের বস্তু বা বিষয়টি রহিয়াছে (শ্রয়তি ময়ি তৎ স্বাদবিষয়ম্—এস্থলে বিশেষ করিয়া আধারবিবক্ষা, কাজেই কর্ম না হইয়া 'ময়ি' এ সপ্তমী বিভক্তি হইতেছে)। কিন্তু যদি নিজেকে স্বাদী না 'ভাবিয়াই' অর্থাৎ উক্ত কল্পনা দ্বারা অনুপহিত ভাবেই কেবল আস্বাদন করি, তা হইলে (সেরূপ নিরুপাধি আস্বাদন মাত্রে) রস এবং রসভোক্তার যে দ্বৈত (duality) সেটি বিগলিত হইয়া, সুতরাং অনুদিত হইয়া থাকে। কাজেই আস্বাদেরও 'কল্পনা সহিত' এবং 'কল্পনারহিত' দ্বিবিধ ভাব আছে; তন্মধ্যে দ্বিতীয়টিই মৌলিক (Basic)। প্রথমটি, অর্থাৎ আশ্রয়-বিষয় সম্বন্ধ কল্পনা সহকারে যে আস্বাদন, সেটি প্রকৃত আস্বাদন নয়, আস্বাদনের review—আলোচন। আস্বাদন

ও আস্বাদনের আলোচনকে না গুলাইয়া ফেলা উচিত। আলোচনেরও অবশ্য এক নিজস্ব 'ঋত' আছে—অর্থাৎ আলোচন হইতে গেলে কোন কোন নির্দিষ্ট আকার-প্রকারেই হইয়া থাকে। দ্বৈত বা ত্রিপুটী ঐ প্রকারের আলোচনভঙ্গী। ভঙ্গীটি আস্বাদন স্বরূপে থাকিবে এমন কোন কথা নেই। এই জন্য বলা হইতেছে যে—'বিমৃশ্যৈব দ্বৈতং তদনুভববিষয়ং স্পৃশতি ন'। সুতরাং বিমৃশ্যাস্বাদন এবং অবিমৃশ্যাস্বাদন—এই ভেদটি সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। অবিমৃশ্যকারিতায় কর্ম পণ্ড হইতে পারে; কিন্তু আস্বাদনে 'অবিমৃশ্য' ভাব যাবৎ এবং যে মাত্রায় থাকে, আস্বাদনের গাঢ়তা ও সজীবতা সেই সেই অনুযায়ী বজায় থাকে। আস্বাদন এবং আলোচন (enjoyment and review of enjoyment) এর পরস্পর অনুপাতটি বিপ্রতীপ (inverse ratio)। তাই বলিয়া আলোচন অনাবশ্যক নয়। সাক্ষাদ্ ভাবে এবং সমকালে না হইলেও, পরোক্ষভাবে এবং পরে, ইহা দ্বারা আস্বাদনের শুদ্ধি এবং পুষ্টি দুই-ই হইতে পারে। স্বয়ং আস্বাদনটি মুখর না হইয়া 'মূক' হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সেটিকে 'মূঢ়' হইয়া থাকিতে নেই। সর্বদাই মনে রাখা উচিত যে, জ্যোতিঃ জ্যোতিঃই নয় যতক্ষণ সেটি=রস নয়, এবং রস রসও নয়, যতক্ষণ সেটি=জ্যোতিঃ নয়। 'জ্যোতীরস'—এই পরমাব্যক্তে দুইকে দুই-ও বলা যায় না, এক-ও বলা যায় না বটে, অর্থাৎ সেখানে কোন 'সংখ্যান' চলে না বটে, তবে, আমাদের অনুভবে ও পরিচয়ে আলোর ধারা আর পুলকের ধারা পাশাপাশি রহিয়াও যেন মিশিতে চায় না। একটায় 'অবগাহন' ও 'নিমজ্জন' কালে অপরটা থেকে যেন কথঞ্চিৎ আপনাকে গুটাইয়া লইতে হয়। তথাপি তাদের চরম ও পরিপূর্ণ মিলন ঘটিতে গেলে, একের দ্বারা অপরের অনুকূল সহযোগটি করিয়া যাইতে হয়; পুলককে আলোকেই পালন-পোষণ করিতে হয়, আবার আলোককেও পুলকের মধু পরশ-শিহরণাদি দ্বারা সজীব ও সরস করিয়া লইতে হয়। আলোকের ঋতচ্ছন্দঃ এবং পুলকের মধুচ্ছন্দঃ—এদুয়ে মিশিয়া তবে না পরিপূর্ণ সত্যচ্ছন্দঃ!

অখণ্ড, সমগ্র অনুভূতি (ভান)-এর অনির্বচনীয় খ্যাতি

ভান, অথবা আমাদের অখণ্ড, সমগ্র অনুভূতি তার আপন অশেষ বিষয় প্রকাশ করিতেছে বটে, কিন্তু সেটি নিজে অনির্বচনীয় খ্যাতি। অর্থাৎ সেটির নিজের সম্বন্ধে বুদ্ধি ও বাকের কোনরূপ ব্যবহার চলে না; সেটির সমগ্রত্বও অবগুণ্ঠিত করিয়া তার

অংশ বিশেষই আমাদের দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সে তার সবখানি আমাদের কিছুতেই দেখিতে দিবে না। এ দেখা মানে অবশ্য বুদ্ধি দ্বারা অবলোকন এবং বাকের দ্বারা আলোচন। শুধু আবার তাই নয়, ভানের মধ্যে যে অংশবিশেষটিকে আমরা দেখিলাম মনে করিতেছি, সেটিও তার সব খানি আমাদের দেখাইতে নারাজ। একটি ছোট ঘাসের ফুল অথবা একটি শিশিরের কণা নিজেকে বিশেষভাবে আমাদের দেখাইতেছে বটে কিন্তু সে কতটুকু? সেটিকে ভাল করিয়া দেখিবে এই সঙ্কল্প করিলে সে দেখার তো কোনও দিনও অন্ত মিলে না! না মেলারই কথা, কেননা এই ক্ষুদ্র পুষ্পকলি অথবা শিশিরকণা এই সমগ্র বিশ্বরূপ মহা বিস্ময়েরই এক ঘনীভূত বামন রূপ। যিনি ক্রান্তদর্শী ঋষি তাঁকে প্রাচীনরা বলিতেন কবি। এই কবির দৃষ্টিতে একটি ক্ষুদ্র পুষ্প অথবা শিশিরবিন্দু এক সীমাহীন প্রেক্ষাগৃহ, যাঁর দ্বার অতি সঙ্কীর্ণ এবং নগণ্য বটে, কিন্তু যাঁর অভ্যন্তরে এই বিশ্বের নিখিল রহস্যই 'দহর-মানে' নিপুটিত রহিয়াছে। সুতরাং কি সমগ্র অনুভূতি জগৎ অথবা তার মাঝে কোন একটি ক্ষুদ্র দৃষ্ট বস্তু—কাহারও সম্বন্ধে পূরা বিবৃতি দেওয়া অসম্ভব। এর সম্বন্ধে মহাসুধী ব্যক্তিরও শ্রেষ্ঠ বাণী কুণ্ঠিত ও অপারগ বুঝিতে হইবে (অসামগ্র্য ব্যাপ্তির্ভবতি সুধিয়াং বোত্তমগিরাম্)। কেবল জ্ঞানের বেলাতে নয়, আস্বাদনের বেলাতেও এইরূপ। আস্বাদন স্বরূপে অনির্বাচ্য। সুতরাং যে স্থলে আমাদের পরিস্ফুটতম রসের আবেদনটি হইল মনে করিতেছি সে স্থলে সে রসের সমগ্র এবং সজীব অনুভূতি অথবা আস্বাদটি মননের ও কথনের বাহিরে। এই জন্য কোন মহাশিল্পীই তাঁর রসের আবেদন, নিবেদন দ্বারা সেটিকে সম্পূর্ণ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। যতটা তিনি বলিতে পারেন তাহা দ্বারা আস্বাদনের যে চমৎকারিতা ও অপূর্বতা তার যেন আসলটাই অবলা রহিয়া যায়! (ন বা সম্যগ্ যুক্তং সুরসিকরসাস্বাদভণিতম্)।

ভানের বিশ্লেষণ কেন আবশ্যক এবং কিরূপে সম্ভব?

ভান অথবা অখণ্ড অনুভূতি বিশ্লেষণের যোগ্য নয় বটে, তথাপি বুদ্ধি এবং বাক্যের ব্যবহারের খাতিরে এটির বিশ্লেষণ আমাদের করিতেই হয়। বিশ্লেষণ মানে সমগ্রের উপেক্ষা পূর্বক অংশতো গ্রহণ—acceptance of a given feature by ignorance of the whole—এ ব্যাপার অবশ্য পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যেমন

রাত্রিকালে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিতেছি—ঐ অভিজিৎ নক্ষত্র। এ স্থলে সমগ্র অখণ্ড ভানে আমার তৎকালে মনোযোগ নাই, মনোযোগ দিলে বুঝিতাম যে সেটি ধারণার অথবা কহিবার যে গণ্ডী তাহার ভিতরে আসিতে নারাজ। কাজেই আমার ব্যবহার চালাইবার গরজে সেটি উপেক্ষিত হইয়াই থাকে। যেটিতে বিশেষ ভাবে মনঃসংযোগ ঘটে, যেমন ঐ অভিজিৎ নক্ষত্রে, সেইটিকেই আমি আমার জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই মানিয়া লই। কিন্তু জ্ঞান অবশ্য ঐ একটা বস্তুতেই চুপ করিয়া থাকে না; সে একটা থেকে অপর আর একটায় চলিয়া যায়। যেমন অভিজিতের পর দেখিতেছি ধ্রুবতারা, সুতরাং অনুভবের ক্রমপরিণতি অথবা (series or stream) রূপটি অবশ্যই দেখা দিয়া থাকে।—কিন্তু এই ক্রম বা ধারাটিকে জানিতেছে কে? ক্রম বা ধারা অবশ্য নিজেই নিজেকে সে ভাবে জানিতে অপারগ।—সেটিকে জানার জন্য এমন কেহ উপস্থিত থাকা আবশ্যক যে স্বয়ং ধারার সঙ্গো সঙ্গো গড়াইয়া যায় না, কিন্তু স্বতন্ত্র রহিয়া সাক্ষিরূপে ধারার পূর্বাপর সকল অবস্থাই দেখিতে পারে এবং সে গুলিকে দেশ, কাল, কার্যকারণাদি সম্বন্ধে আবশ্যক মত জুড়িয়া গাঁথিয়া লইতে পারে।

প্রণব সহকারে পরীক্ষা। অনুভূতি মাত্রেই প্রণবের স্থান

এইবার এই ভূমিকার উপরে প্রণব বা ওঁকারের অকারাদি মাত্রাগুলিকে ভাবনা কর। আমরা দেখিয়াছি যে ওঁকার স্বয়ং ব্রহ্মেরই বাচক অর্থাৎ বাক্‌রূপ। সুতরাং ব্রহ্ম যেরূপ তাঁর সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট, তাঁর বাক্‌রূপ প্রণবও তদ্রূপ। একটা বীজের অভ্যন্তরে প্রণবের মাত্রা সমূহ যে কি ভাবে বিদ্যমান এবং ক্রিয়াশীল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে ভাবিয়া দেখ যে আমাদের প্রতিটি অনুভবে বা জ্ঞানে প্রণব কি ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছেন। প্রণবের আদ্য মাত্রা অকার 'অয়ং' বা এইরূপে যে কোনও বিষয়কে আমাদের সমগ্র অনুভূতির বা ভানের আধারপটে যেন চিহ্নিত করিয়া ধরে। অর্থাৎ অকার যেন বলে—ঐ যে আকাশে অভিজিৎ নক্ষত্রটি, সেটিকেই কি তুমি দেখিলে? সুতরাং অকারের কাজ হইল অখণ্ডের মাঝে কোনও এক বিশেষ খণ্ডে বা অংশে আমাদের মনঃসংযোগ সংঘটন। সুতরাং এটির অভাবে আমাদের অনুভূতি বা জ্ঞানে কোনও বিষয়বিশেষে উদয়ের সম্ভব হয় না। তারপর উকার। অনুভবে যে ক্রমপরিণতি বা ধারার কথা আগে বলা হইল সেটির মূলে রহিয়াছে প্রণবের এই

মধ্যমাত্রা উ বর্ণ। এটি না থাকিলে বিশ্বচিত্রে গতি বা ক্রম বলিয়া কোন অবস্থা সম্ভাবিত হইত না। 'অ' এবং 'উ' এই দুইটি স্বর উচ্চারণ করতঃ এই দুই মৌলিক ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা কর। অকার অঙ্গুলি নির্দেশ করতঃ কোন কিছু দেখাইয়া দেয়; বলে 'অয়ম্' ঐ যে। উকারের বৃত্তি গতিরূপা—এটি ইহা হইতে উহাতে আমাদের লইয়া যাইতে নিয়ত উন্মুখ। তারপর, প্রণবের তৃতীয় মাত্রা 'ম' কার। সেটি কি করে? আগে যে ক্রম বা ধারার জ্ঞানের নিমিত্ত এক স্বতন্ত্র সাক্ষী আমিকে মানিতে হইয়াছে, ম কার সেই আমির স্থলাভিষিক্ত এবং তার কর্মটি করিয়া থাকে। এই খানেই কি শেষ? তা তো নয়।—মকারের পর নাদবিন্দু বা অর্দ্ধমাত্রা—যিনি শাস্ত্রের ভাষায় 'অনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ'। তিনি সচরাচর আমাদের উচ্চারণের গণ্ডীতে আসিতে নারাজ, কিন্তু তিনি তো আছেনই এবং যোগনিদ্রারূপিণী অর্দ্ধ মাত্রাকে প্রসন্ন না করা পর্যন্ত প্রণবাদি কোন জপই পূর্ণ এবং সমর্থ হয় না। এই অর্দ্ধমাত্রাকে আমরা একাধিক স্থলে 'সেতু' রূপে কল্পনা করিয়াছি। সেতু বলিতে এপার এবং ওপারের কথা আসিয়া থাকে। এখন, অর্দ্ধমাত্রা রূপ যে সেতু তার এপার যে অনুভূতির জগৎ, সেটি মুখর জগৎ, কিন্তু ওপারে যে তত্ত্বটি রহিয়াছে সেটি একান্ত ভাবেই মূক—'দধো যাহূর্দ্ধা তস্যা মুখর মখিলং মূক উপরি।'

ক্লীঁ বীজ লইয়া পূর্বানুরূপ পরীক্ষা

আমাদের অনুভব মাত্রে প্রণবের মাত্রাগুলি যে কি ভাবে প্রবিষ্ট এবং ক্রিয়াশীল, সেটি আমরা পূর্বের কারিকায় দেখিলাম। এইবার ক্লীঁ এই বীজটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ। এ বীজে যেটি আদ্য অক্ষর 'ক' সেটি কি সূচনা করে? শ্রুতি বলিয়াছেন "কং ব্রহ্ম"। 'ক' এই বর্ণের দ্বারা নিরতিশয় সুখের অনন্তনিলয় স্বরূপ যে ভূমা—যেটিকে শ্রুতি 'রস' বলিয়াছেন—সেইটি লক্ষিত হয়। অর্থাৎ অগাধ অপরিসীম আনন্দের আধারভূমি (Background) যাহার উপর এই বিশ্ব এবং বিশ্বের অন্তর্গত প্রতিটি রেণু উদিত হইতেছে, বিকশিত হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই আনন্দরূপ যে মহাকাশ তার সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"এতস্মাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি"...ইত্যাদি। কিন্তু ভূত সকলের জন্ম, স্থিতি এবং লয়ের আধারস্বরূপ এই ভূমানন্দ মহাকাশের মতই শান্ত, স্পন্দহীন। 'ক' এই বর্ণের দ্বারা এবম্বিধ আনন্দাকাশই লক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু আনন্দ এইভাবে স্পন্দহীন অথবা নিস্তরঙ্গভাবে থাকিলে তাতে কোনরূপ লীলা অথবা বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা হইবে কিরূপে? সৃষ্টির প্রতিটি পদার্থ আনন্দের 'মাত্রা' আপন অন্তরতম স্থলে পাইয়াই তার বিচিত্র বিকাশ ও পরিণতির চিত্রটি দেখাইতেছে। অর্থাৎ তার বিচিত্র বিকাশ-পরিণতির মূলে রহিয়াছে রস এবং রসৈষণা। জীবে আসিয়া এই রসৈষণা আত্মসংবিৎ লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু একটা ধূলিরেণুর নিগূঢ় অন্তঃস্থলেও ঐ একই আবেগ বিদ্যমান। বিশ্বে কোথাও এতটুকু স্পন্দন সম্ভব হইত না যদি না তাহার পশ্চাতে ঐ নিগূঢ় আবেগটি রহিত! এই মৌলিক সত্যটি বুঝাইতে গিয়াই না শ্রুতি বলিয়াছেন—"কোহ্ন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ"...ইত্যাদি। অর্থাৎ আনন্দরূপ এক মহাকাশের পটভূমিকা রহিয়াছে বলিয়াই তাহার উপর বিশ্বের জীবনের যত চঞ্চলতা ও মুখরতা! এখন প্রশ্ন জাগে—যেটি স্বরূপে অমাত্র সুতরাং স্পন্দহীন, তাতে এত অশেষ মাত্রা এবং স্পন্দের বৈচিত্র্য উত্থিত হয় কি প্রকারে? এ প্রশ্নের অবশ্য কোন উত্তর নাই। কিন্তু কার্যতঃ দেখিতেছি যে এই অশেষ বৈচিত্র্য উদিত হইয়াছে। কাজেই আনন্দকে কেবল মাত্র একটা নির্ব্যূঢ় তত্ত্ব (Absolute Reality) রূপে দেখিলেই চলিতেছে কৈ? সেটিকে বিচিত্র লীলাসামর্থ্য বা শক্তিরূপেও অবশ্যই আমাকে পাইতে হয়। আনন্দ বা রসবস্তুকে এইভাবে শক্তিরূপে পাইলেই তবে না লীলাবৈচিত্র্যের উপপত্তি হইতে পারে। আনন্দের এবম্বিধ শক্তির রূপকে বলে হ্লাদিনী। ক্লীঁ এই বীজের যে 'ল'কার রহিয়াছে তদ্দ্বারা এই হ্লাদিনী সূচিত হইয়া থাকে। আগে এটিকে 'আসঙ্গ' অথবা 'কাম' বীজরূপে পাইয়াছি। দেখিলাম যে আনন্দ বস্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত হ্লাদিনী শক্তিরূপটি ধারণ না করিতেছে ততক্ষণ লীলা বলিয়া কোন কিছুর সম্ভাবনা হয় না। লীলা বলিতে কি বুঝিব? শুদ্ধ একরস যে বস্তু সেটি যেন কখনও আপনাকে আড়াল করিতেছে, কখনও বা নিজেকে প্রকাশ করিয়া ধরিতেছে। রসবস্তুর নিজেকে লইয়া এই লুকোচুরি আবার অশেষ বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপায়িত করিতেছে। তাতে কত না বিচিত্র সুর, কত না অপরূপ ছন্দ! পূর্বে আনন্দের এই লীলায়িত ভাবটিকে ঐঁ এবং শ্রীঁ বীজরূপেও দেখিয়াছি। এরূপ লুকাচুরি খেলার ফলে স্বলসিত আনন্দের কোথাও বা অলসিতরূপ, কোথাও বা আবার বিলসিত রূপ, আবার কোনও কোনও স্থলে উল্লসিত রূপ। এর মধ্যে রস যখন নিজেকে বিলসিত করিয়া দেখায় তখন রসের সেই বিলাসরূপকে বলা যায় রাস (রসবিলসনং রাসমভিতঃ)।

ক্লীঁ বীজের অবয়ব 'ঈ' কিসের সূচনা করে?

এইবার ক্লীঁ এই বীজের 'ঈ' কার। এটি কিসের সূচনা করে? রসবিলসনের ফলে রাস বিকশিত হয় সেটিকে যেন আমরা একটা শতদল কমলের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। কমল যখন ফোটে তখন সে তো একবারেই তার সকল পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দেয় না। রসবিলসনের ফলে যে রাসকমল উদিত হইল সেটি যে অনির্বচনীয় রসের প্রেরণায় আপন মুদিত শতদল একের পর এক করিয়া মেলিয়া দিতে থাকে, সেই মূল প্রেরণাটি ক্লীঁ এই বীজে 'ঈ'কার দ্বারা লক্ষিত হইতেছে (ইদীর্ঘাদ্রাসাজ্জং স্ফুটশতদলং চিত্রবিততৌ)। তারপর শেষকালে যে চন্দ্রবিন্দু, সেটি কি বলে? রসবস্তু নিজেকে বিলসিত রাস রূপে আস্বাদকরতঃ একটা পরম নিবিড়তার ভূমিতে যখন গিয়া পৌঁছায়, তখন তার নিখিল চঞ্চল মুখরতা সব যেন শান্ত হইয়া যায়, এবং পরমাশ্চর্য এক মহামৌনে নৃত্যপর নিখিল সুরছন্দের বিশ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। তখন কমলের প্রস্ফুটিত শতদল আপনার মধ্যেই গুটাইয়া আসে। রসাস্বাদন মাত্রেরই এই নিরতিশয় ভূমি। এর আগে আর কিছু কহিবার নাই [তদিন্দোর্বিন্দোঃ কিং নিপুটিতদলং কোরকমিব (ঘনম্)]।

ঐ বীজটির প্রকারান্তরে ধ্যান। রসবস্তু ও রাসবস্তুকে অন্য দৃষ্টিতে দর্শন। ক্লীঁ বীজ

এইবার ক্লীঁ বীজটিকে প্রকারান্তরে ধ্যান কর। পূর্বের কারিকায় সৎ চিৎ রসবস্তুর যেটি রসস্বরূপ আত্মা, সেটিকে আমরা রাসরূপে বিলসিত হইতে দেখিলাম। সেখানে বীজের যেটি 'ল'কার সেটি হ্লাদিনী রূপা যে লীলাশক্তি—যেটিকে বৈষ্ণবেরা শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির সার বলিয়া থাকেন—তারই অক্ষর-তনু। এইবার 'ল'কার স্থলে 'র'কার লইয়া দেখা যাক সেটি কিসের সূচনা করে। এই বিশ্বটাকে মহাশক্তির বিলাসরূপে দেখিতেছি। আপনার যেটি কেন্দ্র সেদিকে দৃষ্টি ফিরালেই বুঝিতে পারা যায় যে এই মহাশক্তি কদাপি জড় অন্ধশক্তি হইতে পারে না। এ শক্তির স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় বাহিরে কোথাও ঠিক ঠিক মিলিবার নয়। সেটি মিলাইতে হয় আপন সত্তার কেন্দ্রস্থলেই। সেই কেন্দ্রস্থলেই দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে সত্তার একটা শান্ত নিস্তরঙ্গ ভূমি বা আধার রহিয়াছে যার উপরে শক্তির সকল খেলাই বিচিত্র ভাবেই চলিতেছে।

সেই শান্ত, ক্ষোভ ও বিকারহীন আধারটিকে বলা যায় অধিষ্ঠান। এ অধিষ্ঠানের নিজের কোন ভাষা নাই, সুতরাং কোন অক্ষর বা বর্ণের দ্বারা এটির নিরূপণ হয় না। কিন্তু এই মহামৌন প্রতিষ্ঠানে যখন অভিব্যক্তির আবেগটি কোন অতর্কিত ভাবে সমুদিত হয়, তখন সেটিকে সূচনা করার নিমিত্ত কোন্ বর্ণ সর্বপ্রথমে নির্বাচিত হইবে? অর্থাৎ কোন্ বর্ণ সেই মূল ভাষাহীনকে ভাষা দিতে সর্বপ্রথমই আগাইয়া আসিবে? সে বর্ণটি অবশ্য হইতেছে সকল ব্যঞ্জনের মুখে বা আদিতে রহিয়াছে সেই 'ক' বর্ণ (অধিষ্ঠানে ব্যক্তে সকল জগতাং ব্যঞ্জনমুখে)। 'ক' বর্ণ নিস্পন্দ নিস্তরঙ্গা অধিষ্ঠানে আদিম পরিস্পন্দ বা তরঙ্গোত্থানের সূচনাটি করিল। যেটি অধিষ্ঠান মাত্র ছিল সেটি আপনাকে শক্তি ও শক্তিমান এই মিথুনরূপে দেখিল। যে মূল অনির্বচনীয় তত্ত্বে এই জগতের মাতৃত্বের কোন কল্পনা করা সম্ভবপর হইত না, এইবার সেই মূল তত্ত্ব আপনাকে জগন্মাতা আদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশিত করিলেন। 'ক' বর্ণের দ্বারা এই পরম বিস্ময়টি ধ্বনিত হইতেছে। এইবার জগতের যিনি আদিমাতা তাঁকে এই জগৎ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের নিমিত্ত কারণ ও উপকরণ সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যেটি জগতের আদি "কারণ" সেটি নিজেকে "করণ" রূপে অভিব্যক্ত করিবে। যিনি 'মাতা' তিনি হইবেন 'মাত্রা' (মাতৃ শব্দের প্রথমার একবচনে মাতা, তৃতীয়ার একবচনে মাত্রা এটিও প্রসঙ্গাতঃ লক্ষ্য কর)। 'মাত্রা' বলিতে কি বুঝিব? যদ্দ্বারা সকল কিছুর মান বা মাপ নিরূপিত হয় তাকে বলে 'মাত্রা'—Measure principle. কাজেই জগতের সত্তার ও শক্তির সম্বন্ধে যেটি Matrix, সেটি আপনাকে Measure রূপে evolve করিয়া লইতেছে। এই মৌলিক ব্যাপারটি যে বর্ণের দ্বারা সূচিত হয় সেটি হইল 'র' বর্ণ (করণ-কলনায়াগ্নিমনুনা)।

মাতা ও মাত্রা

মাতা তো 'র'কারকে আশ্রয় করিয়া মাত্রা হইলেন। কিন্তু এই বিশ্বের অভিব্যক্তি ব্যাপারে অপর কিছুরও প্রয়োজন আছে। সে অপর বস্তুটি কি? শুধুই কি সৃষ্টির ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা? শুধু তাই নয়। শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের ঈক্ষণের কথা বলিয়াছেন, সেই ঈক্ষণের আবশ্যক হয়। যেমন আমি কর্তারূপে কোনও একটি কর্ম করিব। তন্নিমিত্ত উপযোগী উপাদান ও করণ (instrument) আমার জুটিয়াছে। কিন্তু তাতেই কি কর্মটি

সম্পন্ন হইয়া গেল? ঈক্ষণ শব্দে যে 'ঈ'কার রহিয়াছে সেটি এই অত্যাবশ্যক বস্তুটির সূচনা করে। এই ঈকারকে আশ্রয় করতঃ যিনি জগতের মাতা তিনি মাহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী এই চতুর্ব্যূহ রূপটি পরিগ্রহ করেন। এক মূল ঈক্ষণেরই এই চারিটি ভাব। তারপরে চন্দ্র বিন্দু। এটি কি সূচনা করিতেছে? বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত এই বিশ্বের বিস্তার ও সঙ্কোচ এ দুইটি ঐ চন্দ্রবিন্দু দ্বারা লক্ষিত হইতেছে। একদিকে বিশ্বের আপন পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রগতি, অন্য দিকে ইহার আবার একান্ত সঙ্কোচ বা ঘনীভাবের দিকে প্রবণতা। বীজ কেবলই বলিতেছে—আমাকে অঙ্কুরাদি ক্রমে পরিপূর্ণ পাদপটি হইতে দাও। পাদপ আবার বলিতেছে—আমার মুকুলমঞ্জরী ফুটিতে দাও, যাতে আমি পুষ্পিত এবং ফলবন্ত হইয়া নিজেকে আবার নব সৃষ্টির বীজরূপে দেখিব। বিকাশের ও সঙ্কোচের এই অপূর্ব পালাভিনয়টি আমরা পাই চন্দ্রবিন্দু এই অবয়বে। কাজেই ক্রীঁ এই বীজমন্ত্র হইতেছে কার বীজমন্ত্র? যিনি জগতের মূল অধিষ্ঠান হইয়াও আবার আপনাকে জগজ্জননীরূপে অভিব্যক্ত করেন, যিনি আবার জগতের মাতা হইয়াও নিখিল মাত্রারূপে আপনাকে প্রপঞ্চিত করেন এবং সেই মাত্রার সাহায্যে বিশ্বটিকে বিচিত্র বিবিধ রূপে ঈক্ষণ করেন, এবং যিনি আবার অণু কি বিরাট সকল কিছুকেই আপন পরিপূর্ণ বিকাশ এবং নিগূঢ় সংগোপনের মাঝে লীলায়িত করেন—সেই আদ্যাশক্তিরই বীজ হইতেছে ক্রীঁ। কাজেই আদ্যাশক্তির যেটি বীজ সেটি নিবিড় রসঘন স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বীজ হইতে ভিন্ন নয়, পরন্তু অভিন্ন (যদাদ্যাবীজং তন্ নিবিড় রস রাধাধর-জুষঃ)॥

'ক' এই ব্যঞ্জন-প্রমুখের দ্বিবিধ ব্যঞ্জনা। রাস দৃষ্টি ও ভাসদৃষ্টি

(নিবিড় রসমাধুরীর পরিসীমাস্থল যে শ্রীরাধার অধরপুট, সেটিকে ভজনা করেন যে 'রসিকেন্দ্র চূড়ামণি' তাঁর যেটি বীজ, তাহা হইতে বর্তমান কারিকায় 'উদ্ধৃত' আদ্যাবীজটি অভিন্নভাবেই ভাবনা করিবে। অভেদের যেটি তাৎপর্য তাতেও ধ্যান দিও। নিরতিশয়াখণ্ড সুখবস্তুও 'ক' এই অক্ষর বাচ্য, আবার শুদ্ধ, শান্ত অধিষ্ঠানের যে স্বব্যঞ্জনমুখীনতা ('আবীরূপ')—শক্তি-শক্তিমান রূপে, সেটিও 'ক' অক্ষরের দ্বারা সূচিত। এর দ্বারা মূলে কি সূচিত হইল? ঐ অধিষ্ঠান কেবল যে সৎ ও চিৎ স্বরূপ

এমন নয়, উহা আনন্দস্বরূপ; আনন্দই উহার 'হৃৎ', 'আত্মা'। কাজেই ঐ আবীরূপটি, ব্যঞ্জনমুখীনতাটি আনন্দেরই স্বভাব, আনন্দের স্বতন্ত্র স্বতঃস্ফূর্ত ভাব। অর্থাৎ, অধিষ্ঠানে বা মূলে রস না রহিলে ব্যঞ্জনরূপতাই কুত্রাপি সম্ভব হইত না। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি'। তৎপরে ধ্যান লাগাইয়া 'ল' কার (হ্লাদিনী=মাধুর্য) এবং 'র' কার (ভাস্বতী=ঐশ্বর্য)—এ দুয়ের মূলতঃ অভেদটি চিনিয়া লও (অর্থাৎ, মধুর মধু যে বস্তু প্রাণের প্রাণও সেই বস্তু)। রসই এদিকে 'স্বীয় রাস' রূপে আপনাকে বিলসন করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে, নিজেকে 'স্বরাট্' রূপেও স্বে মহিম্নি প্রকটন করিয়াছেন। পুনশ্চ, দীঘ 'ঈ' বর্ণকেও লীলা ও ঈক্ষা এই দুই দৃষ্টিতেই সমীকরণ কর; এবং 'চন্দ্রবিন্দু'কে পূর্বোক্তরূপে রসের আপন পরিপূর্ণতার মাঝে স্বীয় নিবিড় নিমীলন, এবং আদ্যাশক্তির আপন অশেষ বৈষম্য সমতার মধ্যে আত্মবিশ্রান্তি (জনিলয় ও উপশম)—এই দুই ভাবে দেখিয়া লও। সমগ্র বিশ্বের মূলে যে রস, যে শক্তি তাদের ঐ ভাবে সমীকরণ ত করিবেই; অপিচ, বিশ্বান্তর্গত প্রতিটি বস্তু, বিশেষ করিয়া আপন সত্তাকে সাধ্য করিয়া এই ক্লীঁ ও ক্রীঁ বীজের সমীকরণটি সাধন করিতে থাক। বহির্বিজ্ঞান ও আত্মবিজ্ঞান এ দুয়ের সমন্বয় ঐ সমীকরণ দ্বারাই সম্ভাবিত হইবে, অন্যথা নয়। এই বীজদ্বয়ের সমীকরণ করিয়াই মহাসমন্বয়ি ছন্দঃ মিলিবে এবং সেটি পরম সমন্বয়িতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।)

অন্য অন্য বীজের প্রয়োজনীয়তা

আচ্ছা, রসদৃষ্টি এবং বিজ্ঞানদৃষ্টি না হয় ঐ বীজদ্বয়ের সাহায্যে মিলাইলাম। কিন্তু, প্রণব থাকিতে অন্য অন্য বীজের কি প্রয়োজন হইল? এই কারিকায় তাহা আলোচিত হইতেছে—'যদি ব্রহ্মামূর্ত্তং' ইত্যাদি। বিশ্বানুভূতির বা ভানের অধিষ্ঠান যে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ রূপ ব্রহ্ম, সেটি তো শ্রুতিসমূহে পরমাব্যক্ত ভাবেই (অনিরুক্ত, অলক্ষণ ইত্যাকারেই) শ্রুত হইয়াছেন বটে অথচ সেই আত্মপ্রত্যয়ৈকসার তত্ত্বটিকে সর্বথা ঢাকিয়াও (পিহিতং) অরুণের কনক কিরণ বিকিরণের মতো (রুক্মরজসা) খুলিয়াও বলিতে চাহিয়াছেন (সত্যং শিবং সুন্দরং ইত্যাদি সূচকের দ্বারা)। যে পরম জ্যোতীরসে কোন বর্ণাদি পরিব্যক্ত নয়, সেটিকে যেন 'হিরণ্যবর্ণ' বা 'রুক্মবর্ণ' করিয়া, মধুর ভাস্বর করিয়া দেখাইয়াছেন। এটি অবশ্য অস্মদাদির কল্পনার তুলিকায় রঙ্গাশিল্পন

নয়। অধিষ্ঠানে যে পরমাব্যক্ত, সেটি স্বয়ংই উক্তরূপ রুক্মবর্ণ (ভাস্বর-সুন্দর) হইয়াছেন। ক্লীঁ এবং ক্রীঁ এই বীজদ্বয়ের বিশ্লেষণে আমরা সেইরূপেই সেটিকে পাইয়াছি। 'রুক্মরজসা' পদের রহস্য ব্যঞ্জনাও আছে। সেটি পরে আলোচিত হইবে। এখন, অমূর্ত হইয়াও রুক্মবর্ণ যে ব্রহ্মবস্তু, সেইটিই যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে কি করিবে? শ্রুতির সেই প্রসিদ্ধ লক্ষ্যবেধটি তোমায় সাধিতে হইবে। "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।" অন্য ধনুঃ পুরোভাগে রাখিয়াও প্রণবকেই বিশেষ ভাবে তোমার সমর্থ ধনুঃ করিতেই হইবে। অপরাপর বীজ অথবা নাম—যথা, গোবিন্দ, হরিবোল, হর হর বম্ বম্ঃ—এদের মধ্যে শয়ান যে প্রণব তাঁকে সাক্ষাৎ জাগাইতে হইবেই। সদা স্মরণ রাখ যে—প্রণব নিখিল বাকে, বিশেষতঃ বেদবাকে, শয়ান রহিয়াছেন; এই নিমিত্ত প্রণব=কু+শ, প্রণবপুটিত অথবা প্রণবঘটিত বাক্=কৌশ। ব্রহ্মাণী এই 'কৌশান্তঃ, অর্থাৎ, প্রণবপুটিত বা প্রণবগর্ভিত মন্ত্র (অন্তঃ) ক্ষরণ করেন, যদ্ দ্বারা অসুরের তেজোহানি এবং সুরের (মিত্রচ্ছন্দের) তেজোবিবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

প্রণবধনু দ্বারা লক্ষ্যবেধ-সামর্থ্য। **অগ্র্যা বুদ্ধি এবং একাগ্রা রতি** পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্মবস্তুকে লক্ষ্য করতঃ প্রণবধনুতে আপনাকে (আপন 'অগ্র্যা বুদ্ধি'কে) শরযোজনা তো করিবে। কিন্তু বেধসামর্থ্য এবং সম্বেগটি আবশ্যক। এটি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং প্রগাঢ়ভাব ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, তোমার হৃদয়ের বা অন্তরের পূর্ণ সহযোগটিও চাই। তন্নিমিত্ত তোমার ব্রহ্মলক্ষ্যটিকে আনন্দ ও রস রূপে, সুন্দর ও মধুর রূপে পরিচয় পাইতে হইবে। অপিচ, সেটি তো সত্য এবং জ্যোতিঃ বটেই। এই সহযোগটি না ঘটিলে 'বেধরভস' এবং সে রভসে 'অপ্রমাদ' সম্ভব হইবে না। কাজেই প্রকৃষ্টা অগ্র্যাবুদ্ধিটি তোমার হইল না।

আচ্ছা, তোমার ধনুতে জ্যার্পণ না করিয়াই কি শরসন্ধান করিবে ভাবিয়াছ? সেটি তো হবার নয়। প্রণব ধনুতে জ্যারোপণ পূর্বক তার টঙ্কার (নাদস্ফোটং) অগ্রে শুনিতে হইবে তোমায় (কুতোনাদস্ফোটং ধনুষি শৃনুয়া জ্যার্পণমৃতে)। প্রণব ধনুঃ সহকারে ব্রহ্মলক্ষ্যবেধকারীর এইটিই প্রাথমিক ভূমিকা জানিবে—নাদব্রহ্মানুসন্ধান। তৎপরে, ক্রমে বিন্দু এবং কলা (কলনাত্মিকা বিমর্শ-শক্তি)—এই দুই ভেদ করতঃ

(ভিত্ত্বা), এ সকলের পরতর যে তত্ত্ব তাতে তোমায় প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং তোমার প্রণব-ধনুতে জ্যারোপণ কর্মে আদৌ যত্নশীল, কুশলী হও।

ধনুর জ্যা—প্রথমতঃ উকার

কিন্তু, সে ধনুর জ্যা করিবে কাকে? এই প্রশ্নের উত্তর শেষ কারিকাটিতে দেওয়া যাইতেছে। পর পর জ্যা বা 'ছিলা' পরাইবার কথা শোন। প্রথম জ্যা হইল উকার রূপ প্রণবের মধ্যম মাত্রা। 'অ' এবং 'ম' এদুটি ধনুর দুই কোটি বা প্রান্ত। উ মাত্রা দ্বারা এই প্রান্তমাত্রাদ্বয়কে 'সংহত' কর। 'উদা' কিনা উবর্ণ দ্বারা 'অম' ধনুষিতে— 'অম' কোটি বিশিষ্ট তোমার ধনুতে প্রথমে জ্যারোপণ কর। এটি উবর্বী জ্যা জানিও। এই জ্যা প্রকর্ষণ দ্বারা আদৌ কোন্ লক্ষ্য বেধ করিবে? প্রথম লক্ষ্য হইবে—নাদ। কঠশ্রুতি যে মুঞ্জাভ্যন্তরস্থ ঈষিকার কথা শোনাইয়াছেন, যে ঈষিকা চরমে আত্মা বা ব্রহ্মই বটে, কিন্তু গোড়ায় সেটিকে নাদরূপেই 'আবিষ্কার' করিতে হইবে। ঝিল্লীধ্বনি, তন্ত্রীধ্বনি, বেণুধ্বনি—ইত্যাদি গুরুবক্ত্রগম্য ক্রমে। ঝিল্লীধ্বনিরূপ আবরণের মাঝে ঝরীধ্বনি (ঝরণার শব্দ), তার মাঝে তন্ত্রীধ্বনি (অবিশ্রান্ত বীণাতন্ত্রী ঝঙ্কার, প্রথমে তরঙ্গায়িত, পরে নিস্তরঙ্গ), তার মাঝে আবার বেণুধ্বনি—কখন অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ সহকারে, কখনও কেবলমাত্র আধারভূত (আস্থায়ী) ধ্রুবস্বর বিতানে; এইভাবে নাদকে সন্ধান করিয়া যাইতে হইবে। নাদের পূর্ব পূর্ব রূপকে জ্যা করতঃ উত্তর উত্তর রূপকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

তারপর জ্যা—নাদ। নাদ ও বিন্দু সন্ধানের ক্রম

তারপর, নাদের ঠিক সন্ধান হইলে, সেই নাদকেই জ্যা করতঃ নাদের সূক্ষ্মতম পরম ঘনীভাব যে বিন্দু, সেটিকে লক্ষ্য করিতে হইবে (নদিত গুণ-চাপাদণুতমম্)। বিন্দু একাধারে অণুত্ব ও পূর্ণত্বের কাষ্ঠা, কাজেই একান্ত দুর্ব্যেধ্য। নাদ মিলিল, কিন্তু বিন্দু তো কৈ মিলিল না—এইভাবে ঠেকিয়া থাকিতে হয় অনেককেই। কিন্তু বিন্দুও জিত হওয়া আবশ্যক। এবং তার নিমিত্ত বুদ্ধিকে একান্ত 'অগ্র্যা' হইতে হয়। প্রণবের শুধু 'অম' আশ্রয়িণী যে বুদ্ধি সে বুদ্ধি 'ব্যগ্রা'; উকার আশ্রয়িণী হইলে হয় 'উগ্রা' ('গৃহীতোগ্র মহাচক্রে', 'নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ' ইত্যাদিতে 'উগ্র' শব্দটি লক্ষ্য কর);

আর, নাদ বিন্দু-কলা রূপ অর্দ্ধমাত্রাকে আশ্রয় করিলে হয় 'অগ্র্যা'। জ্যোতিঃকে প্রতীক বিন্দু রূপে দর্শন কদাচিৎ ঘটে বটে, কিন্তু নাদকে বিন্দুরূপে শ্রবণ? তার জন্য বুদ্ধিকে একটা perfect focussing mirror (অগ্র্যা) হইতেই হয়। বুদ্ধির scattering, canalising and focussing এই তিন রকমের ক্রিয়া ভাবিয়া দেখিও। একটা বটবীজকণিকায় বটমহীরুহ বিদ্যমান; এক রেতোবিন্দুতে একজন মহামানব; একটা এটমে এক মহাশক্তি ভাণ্ডার! কিন্তু কিরূপ বুদ্ধি সে ঘনীভাবে অবগাহন করিতে সমর্থ? অবগাহন কিন্তু না করিলেই নয়। কেন না, ঐ ঘনীভাবেই নিখিল ক্রিয়াকারক সামর্থ্যের শক্তি পুঞ্জীভূত। 'একোঽহম্'—এতে ঐ ঘনীভাবের আদিম ও মৌলিক সূচনা। নাদের বেলাতে যেমন, বিন্দুর বেলাতেও তেমনি 'মুঞ্জাভ্যন্তরে ঈষিকার সন্ধান' করিয়া চলিতে হয়। বিন্দুসন্ধানেরও ক্রম ধরিয়া যাইতে হয়। পূর্ব পূর্ব রূপ অধিগত হইলে পর পর রূপ লব্ধব্য হয়। বহির্বিজ্ঞানে তাই হইতেছে। সেখানে বিন্দুশক্তির কোন এক রূপকে 'গুণ' বা জ্যা করিয়া তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর কোন রূপ বেধের প্রয়াস চলিতেছে; আল্ফা রেজ, নিউট্রন পার্টিকেল প্রভৃতির দৃষ্টান্ত ভাবিয়া দেখিও। রেডিও আইসোটোপ জাতীয় পদার্থের nuclear fission তো ঘটিয়াছে; ফলে, বিন্দুশক্তিকে এক 'মহাবল দৈত্য'রূপে বহিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু এও তো বহিঃ প্রকোষ্ঠের বহিষ্কার! অন্তঃ প্রকোষ্ঠগুলি—প্রাণ ও চেতনার স্তরপরম্পরা—বেধ হইবে কিরূপে? আমার বীজমন্ত্রেরও জড়তা এবং জড়বেগ কাটাইব কিরূপে? সেই নিমিত্ত আবশ্যক ঐন্দ্রীশক্তি ('মহাবজ্রে সহস্র নয়নোজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে...')। ঐন্দ্রী = কেবল মাত্র ইন্দ্রের মহিষী মনে করিও না; (ঐঁ+দ্+র্+ঈ)—এই আকৃতিটিতে ধ্যান দিও। ঐঁ = বাগ্ভব; দ্ = দন্তবৃত্তি = সংছেদক; র্ = তৈজসবৃত্তি; ঈ = দীর্ঘতালব্য বৃত্তি। ফলে পাইতেছি—যে বাগ্ভব (লক্ষণায় যে কোন স্বাভাবিক নাম) দ্বারা কোনও সুদৃঢ় অবষ্টম্ভক (বৃত্র) বিদীর্ণ হইয়া অন্তর্নিরুদ্ধ তেজের ঊর্দ্ধতন 'তল'গুলিকেও সমর্থ-ব্যাপারবান করিয়া তোলে। কিরীটিনী = অর্দ্ধমাত্রালাঞ্ছিত ঐ বাগ্ভব; মহাবজ্রা = ঐ দ্কার+র্কার; সহস্র নয়নোজ্জ্বলা = ঈকার (= ঝরী অথবা প্রস্রবণের আকৃতি; কাজেই, তেজঃ সহস্রধারায় উৎসারিত হইতেছে)। বলা বাহুল্য, এ সকল রহস্য মূর্তির ব্যঞ্জনা এই এক ভাবেই সমাপ্ত নয়। এতৎ প্রসঙ্গে দ্রীঁ এই বীজটিও নিপুণভাবে পরীক্ষা করিও।

পূর্বোক্ত বিশ্লেষণরীতিতে এটি বজ্রায়ুধ বা বজ্রশক্তির সূচক। অদ্রি = পর্বত (দৃঢ় অবষ্টম্ভকের রূপ); এইটিকে বিদীর্ণ করে দ্রীঁ = বজ্রশক্তি। শীর্ষদেশে কিরীটরূপে যে চন্দ্রবিন্দু (অর্দ্ধমাত্রা) বিরাজমান, ঐটিকেই বিশেষভাবে সমর্থ করিতে হইবে। কেন না, পরম লক্ষ্যবেধের দ্বিতীয় ও তৃতীয় জ্যা ঐ অর্দ্ধমাত্রা হইতে যোজনা করিতে হইবে। অর্দ্ধমাত্রাই বিশেষভাবে আরোপিত গুণ ধনু বুঝিবে। যথা—'শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ'। শঙ্খ = 'শ', চক্র = র্, গদা = ঈ, অর্দ্ধমাত্রা = চন্দ্রবিন্দু। পাইলাম—শ্রীঁ বীজ (লক্ষ্মী)।

লক্ষ্যবেধ সমাপন কোথায় হইবে? কলা বা বিমর্শ শক্তি। দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত পরম

আচ্ছা, এইখানেই লক্ষ্যবেধের সমাপন? কলা বা বিমর্শশক্তি—দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত পরমতত্ত্বে অদ্বৈতদ্বৈতাদি সকল প্রসঙ্গাই সমুদিত হইতেছে—সেটিকেও বেধ করা আবশ্যক। তা না হইলে 'সকলকলনান্তং কুত ইতঃ'—নিষ্কল-সকলাদি নিখিল কলনের অন্তে—পরম তুষ্ণীম্ভাবে—কেমন করিয়া উপনীত হইবে বল? কাজেই কলা তোমার তুরীয়া জ্যা। এই শেষ জ্যার্পণ ব্যতিরেকে মাত্রাতীত তত্ত্বে স্থিতি-বিশ্রান্তি সম্ভবপর হয় না। এই লক্ষ্যবেধক্রমে বিন্দুই 'মর্ম-স্থান' (Key position) জানিও। কিভাবে বিন্দু জিত হয়—ইহাই তোমার মুখ্য চিন্তা হউক। অর্দ্ধমাত্রা বা চন্দ্রবিন্দুর আকৃতিতে তাই না ধনুটি নীচে, বিন্দুটি উপরে। ধনুতে প্রথমে 'উ', পরে নাদ জ্যা রোপণ ও কর্ষণ সাধিতে হইবে। প্রথমে, নাদের (ঐ ধনুর যেটি কোদণ্ড) ভিতরেই গর্ভিত বিন্দু। ধারাবৎধ্বনি বহিতেছে (continuous); তার মধ্যেই বিন্দু বিন্দু (as quanta) অনুভূতি হইতে লাগিল (নাদাদ্ বিন্দুঃ); আবার বিন্দু বিন্দুগুলি অব্যবধানে ধারাই হইল (বিন্দোর্নাদঃ)। ধারা ও বিন্দুর অন্যোন্যভাবিত্ব সৃষ্টির সর্বস্তরে অনুস্যূত জানিবে। যথা আলোকরশ্মির এই সূক্ষ্ম রূপটি আকস্মিক বা অহেতুক নয়। এই যুগ্ম অনুভূতির পর বিন্দুকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। কালীরূপের হস্তে ন্যস্ত মুণ্ডটি ইহার নির্দেশ দিতেছে। খড়্গ নির্দেশ দিতেছে—ঐ বিন্দুরূপা শক্তিকেও ছেদন কর। বর = পূর্ণকলা; অভয় = কলাতীত। কাজেই পাইতেছি—বৈন্দবীশক্তিকে কোন সমর্থ উপায় দ্বারা (উকার, ঈকার ইত্যাদি) উদ্‌বুদ্ধ কর, অভীদ্ধ কর; ফলে, কলাশক্তির পূর্ণ উন্মেষ (বর), এবং তদনন্তর অথবা

তৎসহকারেই, দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিত যে পরম মাত্রাতীত, তাতে অচ্যুতস্থিতি (অভয়)। পুনশ্চ, করস্থিত বিন্দুরূপ মুণ্ড = কং। খড়্গ প্রয়োগে (রী) এটি হইল ক্রীং। বরে ঐ অনুস্বার অর্দ্ধমাত্রা (চন্দ্রবিন্দু) হইল, সুতরাং পূর্ণকলাশক্তির উন্মেষ ঘটাইল (ক্রীঁ), এবং চরমে, মাত্রাতীতেও লইয়া যাইল (অভয়)। এটি কালিকার বীজ। 'কং' রূপ মুণ্ড 'রী' রূপ খড়্গ দ্বারা ছিন্ন হইয়া এবং বরানুগ্রহ লাভ করতঃ সর্বসিদ্ধি এবং কৈবল্য এতদুভয়েরই প্রাপক হইল। প্রণবে, মুণ্ড = মকার। খড়্গ (উকারাদি) দ্বারা 'ম'কে উদ্বুদ্ধকরণ, উত্তোলিত কর অর্দ্ধমাত্রা (বরমুদ্রা), এবং সেই অর্দ্ধমাত্রা সেতু (অভয়মুদ্রা) হউক পরমাব্যক্তে যাইবার নিমিত্ত। এইরূপ কামবীজে কং = সর্বাকর্ষক যে পরম রস বস্তু, তৎসম্বন্ধী জীবের যে স্বাভাবিক কাম, সেই কামের 'অলসিত ভাব'; 'লী' (মুরলী) দ্বারা যে অলসিত কাম উল্লসিত-বিলসিত হইল। ফলে, হইল ক্লীং। কিন্তু এ ভাবের পরিসীমা কোথায়, কোন ভূমিতে? অর্থাৎ, কোন ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে রসবস্তু রাসবস্তু হইবে, এবং তারও আধার যে দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জিত 'রসো বৈ ভূমা', তাতেই বিকশিত রাসশতদল আবার 'মুদিত' হইয়া যাইবে? এ মুদিততা অলসিততায় ফিরিয়া যাওয়া নয়। রসিক তা বুঝিবেন। প্রাকৃত, জড়ীয় সম্ভোগাদিতে ঐ অপ্রাকৃত, চিন্ময় রস ও রাসবস্তুর 'গুণ্ঠিত কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত' রূপটি দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দঘন তনুতেই ক্লীঁ এই বীজাক্ষর সমূহ সন্দর্শন করিও। যেমন ধারা আগে কালীরূপে করিলে।

জপের ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বে অধিরোহণ।
লক্ষ্যবেধ পর্ব ও অধিরোহণ

পুনশ্চ, জপকে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বে উত্তরোত্তর উত্তোলন করা আবশ্যক, তা পূর্বে বলা হইয়াছে। এতন্নিমিত্ত প্রণবাদি বীজকে ধনু কল্পনা করতঃ তাতে উপযুক্ত গুণারোপণ কর্মটি সাধিত হয়। প্রণবের বেলা, 'স্তব্ধ' (static) 'ওম্' এর স্থলে 'অউম' জপ হইলে স্তব্ধ (inert) ভাব কাটিয়া 'সাবলীল' (সলিল) ভাব আসিবে। উঁকারের উর্দ্ধগা বৃত্তি (vertical moment) এর সঙ্গে 'মন্থন' আকৃতিটি (churning pattern) সংযুক্ত হইলে (অর্থাৎ, উ = উগ্র হইলে) তৈজসভাব অধিগত হইবে। তদনন্তর বায়ু এবং বিয়ৎ—এ দুয়ের নিমিত্ত এবং তদুত্তীর্ণ পদবীতে উত্তরণের নিমিত্ত অর্দ্ধমাত্রা বিশেষতঃ সমাশ্রয় করিতে হইবে। এইরূপ পঞ্চপ্রাণতত্ত্ব বিষয়েও। প্রথমে, ধর প্রণবের

যেটি উকার সেটিকে উদান (Lever Function) রূপে ব্যবহার করতঃ অকার (অপান) এবং মকার (প্রাণ)—এই দুই বাহ্য ও আন্তর বৃত্তির সমতা (harmonic equation অথবা balance) সম্পাদন করিতে যত্ন কর। তদনন্তর অর্দ্ধমাত্রা সহায় হইয়া ঐ ছন্দোগ সমতাটি বিপুলের এবং সূক্ষ্মের কাষ্ঠা পর্যন্ত লইবার সাধনটি কর (নাদ সাধন ও বিন্দু সাধন)। এর দ্বারা মুখ্য প্রাণের সমান এবং ব্যান ভাবদ্বয় শুদ্ধ ও সমর্থরূপে অধিগত হইবে। মুখ্য প্রাণদ্বারা এবম্বিধ 'পঞ্চত্ব' প্রাপ্তির উপায়কে জপসূত্রে দীক্ষার লক্ষণ করা হইয়াছে। প্রাণের প্রসঙ্গে এসব আরও বিশদ হইবে।

(২৮)

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচণ্ডীর নারায়ণী স্তব বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গাতঃ লক্ষ্য কর যে, শ্রীচণ্ডীতে শিবদূতী প্রণামে 'ঘোররূপে' এবং 'মহারাবে' এই রহস্য শব্দ দুটি ব্যবহৃত হইয়াছে। শিব স্বয়ং অঘোর, কিন্তু তাঁর দূতী ঘোররূপা। এই অঘোর-ঘোরা রহস্যটি সব দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিও। জপের ক্ষেত্রে, 'ক' (ব্যঞ্জনের আদি বর্ণ) ব্যক্ত বা বৈখরী জপ রূপে ধরিলে, 'ঘ' (কবর্গের তুরীয় বর্ণ) কি নির্দেশ করে? বাচিক, উপাংশু ও মানস—সাধারণ এই ত্রিবিধ জপের অবসানে যে 'তনুমানস' নামা তুরীয় ভাবটি হওয়া আবশ্যক, সেটি ঐ ঘকার দ্বারা সূচিত হয়। এই গ্রামে আসিয়া তবে না ধ্বনি সত্যকার সমর্থভাবে ঘোষবৎ ও মহাপ্রাণ হইবে! আগেও 'উ'কে লইয়া প্রণব জপিতেছিলাম; কিন্তু যেই পৃথু মানসভূমি থেকে তনু-মানসে যাইলাম, সেই সেটি তৈজসমাত্রা (রকার) বিশেষ ভাবে অর্জন করিল ('উগ্র' এবং 'ঘোর' এই প্রাণিক বৃত্তি দুটি পরীক্ষা কর)। প্রথমটিতে চক্রাবৃত্তি, দ্বিতীয়টিতে শঙ্খাবৃত্তির আকৃতি স্পষ্ট। নৃসিংহ তাপনীর নৃসিংহ মন্ত্রে 'উগ্রং' ও 'বীরং' এই পদ দুটিও প্রাণিধানযোগ্য।

'মহারাব' কি বুঝায়?

ঘোর রূপা হইয়া 'মহারাবা' হইতেছে। মহারাব বলিতে রাব বা রবের অতিগামী গ্রাম (super or ultra) গুলিই বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে ধ্বনি, বর্ণ ইত্যাদির স্পন্দন সাধারণতঃ প্রতীত গ্রাম ছাড়াইয়া তবে বিশেষভাবে (অসামান্য) সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। তখন তাদের শক্তি অদ্ভুত, অতর্কিত। সুতরাং, 'ঘোররূপ'

এবং 'মহারব' না হওয়া পর্যন্ত সেটি 'হতদৈত্যমহাবল' হয় না। দৈত্য = Shearing Force; যেটি সংহত, 'সমূহ' ভাবে বিদ্যমান এবং শ্রেয়ঃ সাধনে সক্রিয়, সেটিকে disrupt (বিশীর্ণ) করিতে উদ্যত শক্তিই দৈত্য। অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন রূপ। সবই স্পন্দনগত বৈরূপ্য। মহারাব ব্যতিরেকে এ বৈরূপ্যের যথার্থ সমাধান ঘটে না। মহারাব = চীৎকার নয়। 'হিঙ্কার', 'হুঙ্কার', 'ঘণ্টশঙ্খনাদ' ইত্যাদি রহস্য ধ্বনি বীজ দ্বারা এটি নানাভাবে লক্ষিত। 'হুঙ্কারেণৈব ভস্মসাৎ', 'ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি' ইত্যাদি চিন্তা কর। পূর্বোক্ত তনু-মানসে অধিরূঢ় না হইলে দৈত্যবল বিনাশী এই মহারাব সম্ভাবিত হয় না। আবার, তনু-মানসা ভূমি অনুত্তীর্ণ থাকিতে মধ্যমার সেতুটিও সম্পূর্ণ পার হওয়া যায় না। শ্রদ্ধাপূর্বক উপযুক্ত ছন্দঃ সহকারে প্রণবাদি জপ চলিতে থাকিলে, তার সাক্ষাৎকার্যকারিতা দ্বারাই সে জাপকের কায়, প্রাণ ও মনের স্থূল, পার্থিব ভাব (rigid, coarsegrained, inelastic condition) পরিবর্তিত করতঃ সেটিকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ছন্দোগবৃত্তির উপযোগী করিয়া লইতে থাকে। যন্ত্রটিরই ক্রমশঃ গভীরতর ও উচ্চতর 'পরদায়' রণনের এবং অনুরণনের সম্ভাবনাটি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সব 'deeper key' গুলির সন্ধান আগে তো কৈ মিলে নাই। এবম্বিধ progressive attuningএর ফলে তনুমানস জাগ্রত হয়, সংবিৎ লাভ করে ('কুশ' হয় 'কৌশ')। ইহাই সত্ত্বগুণের 'আপূরণ'। বহির্বিজ্ঞানে গবেষণার নানাক্ষেত্রে এই 'পূরণ' এবং 'আপূরণ' কর্মটি সবিশেষ কুশলী হইয়াছে। সুতরাং জপাদির লক্ষ্যই হইবে কিসে জাপকের আপন প্রকৃতিতে এই 'আপূর্য্যমাণতা' পরিলক্ষিত হইতে থাকিবে। 'স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ'। পূরণের সঙ্গে হরণটিও আবশ্যক। বৈরূপ্য-বৈগুণ্যের হরণ। হরণ-পূরণ পরস্পরাপেক্ষি। তনুমানসা হইলেই সত্ত্বাপত্তি, অন্যথা নয়। ভীমনাদ, ভৈরবনাদ, তুর্যনাদ, তুমুলাদি শব্দও অতিগস্পন্দনের অবস্থাবিশেষ উদ্দেশ করতঃ নানা স্থলে প্রযুক্ত হইতে দেখি।

পূরণী ও হরণী শক্তি। নারায়ণী স্তবে নব শক্তির দৃষ্টান্ত

হরণ-পূরণের সুসমঞ্জস অনুপাতটি সর্বক্ষেত্রেই রক্ষিত হওয়া চাই—যথা, এই শরীরে ক্ষয়-পোষণের অনুপাত। অনুপাতে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইলে সমস্ত কিছুই 'সংগৃহীত' হইয়া থাকে। এই সংগ্রহশক্তিকে পূর্বে কোন কোন স্থলে বিশ্বানুস্যূত কৌর্মশক্তি বলা

হইয়াছে। এটি ধারা (continuity) হিসাবে পঞ্চগঙ্গার অন্যতমা। শ্রীচণ্ডীতে পূর্বালোচিত নারায়ণীস্তবে যে নবশক্তি (ব্রহ্মাণী থেকে চামুণ্ডা পর্যন্ত) বন্দিতা হইয়াছেন, লক্ষ্য করিও যে, তাঁদের মধ্যে প্রথম চারিটি (বৈষ্ণবী পর্যন্ত) পূরণ এবং সোমপ্রধান (পূরণী); আর শেষোক্ত চারিটি (নারসিংহী থেকে চামুণ্ডা) হরণ এবং অগ্নিপ্রধান (হরণী)। মাঝখানে সন্ধি ও সেতুরূপা রহিয়াছেন—বারাহী। এই বারাহী শক্তিকে মুখ্যতঃ সমাশ্রয় করতঃ জপাদি সাধনে এবং নিখিল ক্রিয়াদি ব্যবহারে সমঞ্জস অনুপাতটি (ছন্দোগত্ব) রক্ষা করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ইনি 'যজ্ঞবারাহী'। যেমন— ব্যাহৃতিত্রয় এবং প্রণবত্রয় সহকৃত যে গায়ত্রী জপ, তাতে সপ্ত সোমমাত্রা এবং সপ্ত অগ্নিমাত্রা রহিয়াছে। এই সপ্ত-সপ্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গায়ত্রী জপ করা আবশ্যক। আধার অথবা যন্ত্রে তমের লক্ষণগুলি সবিশেষ থাকিলে অগ্নিমাত্রা সপ্তকে জোর দিয়া জপ কর; রজের লক্ষণ উগ্র বা বিশাল হইলে সোমমাত্রা সপ্তকে। আদি ও অন্ত ব্যতীত মধ্যেও এক প্রণব গ্রহণ করিলে তিনে তিন সোমমাত্রা; অন্যথা, প্রথম প্রণব একমাত্রায় উচ্চার্য, এবং তদনুপাতে শেষ প্রণব দ্বিগুণ মাত্রায়। সত্ত্বোদ্রেক হইলে সামঞ্জস্য বা ছন্দোগত্ব। সত্ত্বোদ্রেকটি গায়ত্র্যাদি জপ সৌষ্ঠবের কারণও বটে, আবার কার্য বা ফলও বটে। যন্ত্রে সত্ত্বপ্রবণতা রহিলে জপে উক্ত সৌষ্ঠব স্বচ্ছন্দে হইয়া থাকে। যত্নপূর্বক জপে ধ্যানাদিগত সৌষ্ঠব আনিতে পারিলেও যন্ত্রটি তার ফলে উর্জিতসত্ত্ব হইয়া থাকে। ভাব ও ভঙ্গী অন্যান্যের পোষক হইয়া থাকে। পূরণাদির বিশেষ বিশেষ আকৃতি (যথা—অনুপূরণ, প্রতিপূরণ, আপূরণ, পরিপূরণ ও সম্পূরণ) পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে। প্রণবের পঞ্চ অবয়ব (অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু) এইগুলি যথাক্রমে উদাহৃত।

পরমা বিশ্রান্তির স্থান। পরমাশ্চর্য শূন্য

যে অদ্বৈতাদ্বৈত বিশ্রান্তির প্রসঙ্গে এ সমস্ত সাধনরহস্য আলোচিত হইতেছে, সে বিশ্রান্তি কিরূপে হইবে? হরণী ও পূরণী এ দুয়ে মিলিয়া যেখানে 'শেষ' ও 'শান্ত' হইয়া যায়, কোনটিরই 'জের' অথবা অপূর্ণ বেগ সংস্কার (basic momentum) রহিয়া যায় না, সেইখানেই পরম বিশ্রান্তি। উভয়ের সমতায় যেটি হয় সেটিকে 'শূন্য' বলিতে পার, কিন্তু সে শূন্য পরমাশ্চর্য শূন্য। এটি বিশেষভাবে সূত্রিত ও বিবেচিত হইয়াছে। পরিশেষে এটি লক্ষ্য কর যে, 'সাধকানাং হিতার্থায়' শ্রীচণ্ডীতে যে নবধা

নারায়ণীস্তুতি (ব্রাহ্মণী থেকে চামুণ্ডা) আছে, তাতে মাত্র 'ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা' নয়, পরন্তু বীজমন্ত্র এবং তাদের রহস্যের ইঙ্গিতও আছে। সে ইঙ্গিতের কোন কোন দিকে অনুধাবনের যত্ন এই পরিচ্ছেদে হইয়াছে। চামুণ্ডা রূপটি ভাবনা কর। 'দংষ্ট্রাকরালবদনে'—এতে 'ক' এবং 'রফলা' লইলে হয় 'ক্র'। 'শিরোমালা বিভূষণে'—এতে শিরঃ বা তালুতে উচ্চারিত 'ঈ'কার, 'মালাবিভূষণ'—এতে 'ম'কার অথবা 'চন্দ্রবিন্দু' লইলে হয়—ক্রীঁ এই বীজ। পুনশ্চ, 'দংষ্ট্রা' হইতে ষ, রফলা এবং 'আ', আর করাল থেকে 'ক' এবং 'শিরোমালা' থেকে 'ওম্' লইয়া 'ক' অক্ষরকেই 'বদন' বা মুখ (আদি) করিয়া উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত করিলে পাই— স্ক্রৌঁ বীজ। এ সমস্ত যদৃচ্ছা কল্পনা অথবা কষ্ট কল্পনা মনে করা উচিত নয়। ত্রিপুরাতাপিন্যাদিতে গায়ত্রীর 'ধীমহি' ইত্যাদি এবং 'জাতবেদসে' ঋকের এবং 'ত্র্যম্বকং' মন্ত্রের মধ্য হইতে অক্ষর চয়নপূর্বক কি ভাবে ত্রিপুরা বীজ 'ব্যাহৃত' হইয়াছে, প্রণিধান করিও। একে যদি কল্পনা বল তো ইহা সম্বাদিনী, বিসম্বাদিনী নয়।

বীজোদ্ধারে শিষ্টসম্মত রীতি

এতৎপ্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে—বীজ ও রহস্যাদি 'উদ্ধার' সম্বন্ধে এই প্রকার রীতি পূর্বাপর শিষ্টসম্মত। বেদে সংহিতাভাগের মন্ত্র এবং মন্ত্রার্থাদি এবম্প্রকার রীতিতেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎ 'পরোবরীয়ান্' ক্রমে 'ভাঙ্গিয়া' দেখাইতেছেন। অগ্নিমন্থনের অরণি থেকে অশ্বমেধের অশ্বটি পর্যন্ত কাহাকেও ছাড়েন নাই। পদের অক্ষরমাত্রাদি লইয়াও রহস্যনামের দোহনে তাঁরা বিদগ্ধ ছিলেন। এ পক্ষে ব্যবহারিক ব্যাকরণের গণ্ডী উল্লঙ্ঘনেও তাঁদের অহেতুক কুণ্ঠা ছিল না। আগমে (তন্ত্রে) তো কথাই নাই! স্বয়ং 'অনুভবী' না হওয়া পর্যন্ত অগাধ রহস্যসিন্ধুর কুলে বসিয়া 'উপলখণ্ড' লইয়া নাড়াচাড়া করা চলে মাত্র; তাতে অবগাহন পূর্বক 'মণিমুক্তা' উদ্ধার করিবে কে? ('দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরে')। কোথা সে বারাহী শক্তি?

'নৃসিংহ' নামের দৃষ্টান্তে পরীক্ষা

একটা ছোট দৃষ্টান্ত লইয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। ধর, 'সিংহ' এই শব্দ। শব্দার্থ বিশ্লেষণের বহুধা রীতির মধ্যে যেটি মৌলিক সেইটিই সাধারণতঃ আমরা গ্রহণ

করিয়া আসিতেছি। শব্দের মূলে প্রাণপ্রযত্ন, কাজেই প্রাণপ্রযত্নের বিশ্লেষণটি হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রাণপ্রযত্ন বলিতে কি বুঝিব? স্থূলতঃ আস্য (কণ্ঠাদি) প্রযত্ন বটে, কিন্তু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায় যে, তৎ তৎ প্রযত্নের মূলে এক এক প্রকার 'শক্তি আকৃতি' (Power Picture or Pattern)। এটি আবার স্থূলতঃ ও মুখ্যতঃ 'দৈহিক' বটে, কিন্তু শক্তির বৃত্তি বিশেষ (particular function) পরিচ্ছিন্ন (restricted) ভাবে গৃহীত হইলেও, মূলতঃ এবং তত্ত্বতঃ শক্তি অখণ্ড ও অসীম। এর স্তর বা শ্রেণীবিভাগও অস্মদাদির বোধব্যবহারসৌকর্যার্থে। ব্রহ্মবস্তু শক্তিরূপ (as Power) হইলে যদি তার আখ্যা দেওয়া যায় প্রাণ (প্রাণব্রহ্ম), তবে কণ্ঠপ্রযত্ন দ্বারা উচ্চারিত যে 'হ' বর্ণ, সেটি হইল প্রাণের মহত্ত্বের সীমার 'সূচক' (প্রাণেশ)। অর্থাৎ এটি সাক্ষাৎ নির্দেশ করে—অপরিসীম, অতল শক্তি সিন্ধু (Unlimited Power Continuum)। যাবতীয় শক্তির অভিব্যক্তি এই আধারেই হইতেছে, আবার এই আধারে লয় পাইতেছে বটে, কিন্তু এর সঙ্গে 'সক্রিয় সংযোগ' (effective contact) অধিকাংশ স্থলেই বাধিত হইয়া থাকে। কাজেই সচরাচর শক্তির ব্যাপারগুলিকে 'স্বল্পমান' (অল্পপ্রাণ) বলিয়াই বোধ হয়। সিন্ধুর যেন বুদবুদাদি লইয়াই সচরাচর কারবার; বীচিতরঙ্গাদিও বিজ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে সন্ধান করিয়া পাইতে হয়। আর, স্বয়ংসিদ্ধা সিন্ধুসত্তা তো 'হরিহরাদিভিরপ্যপারা'!

'হ'কার 'স'কারাদির ব্যঞ্জনা

অপরিমেয় শক্তিভাণ্ডারকে (Magazine of unlimited Power) 'হ' এই মহাপ্রাণবর বর্ণ নির্দেশ করিল; এটি শক্তির সার্বভৌম 'সমস্ত' রূপ। আর 'স্' (দন্ত বৃত্তি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হসন্ত) নির্দেশ করিল শক্তির পরিচ্ছিন্ন, ব্যস্তরূপ। যেমন, সমুদ্রবারি আর নদী অথবা বর্ষণ বারি। একটা হইল Power Field, অপরটা তৎসম্পর্কে radiation, emanation, charge. মানস, প্রাণিকাদি সর্বক্ষেত্রেই এই ভেদটি (সমস্ত ও ব্যস্ত) উদাহৃত। যেমন, বাকের উচ্চারণে। 'ই'কার দ্বারা বুঝিব 'তালব্য বৃত্তি', অর্থাৎ যে মূল-আধারে শক্তি রাশি রহিয়াছে, তাহা হইতে কোন নির্দিষ্ট 'তলে' তার কিছুটার উত্তোলন। যেমন, সূর্যতাপে সমুদ্রবারির গগনে উন্নয়ন। 'অনুস্বার' দ্বারা বুঝিতে হইবে ঐ 'উত্তোলিত' শক্তির কেন্দ্রীকরণ, ঘনীভাব

(focussing, condensing etc.)। শক্তিপ্রক্ষেপ (যথা বারিবর্ষণ, সরিৎপ্রবাহ) হইতে গেলে এই 'অনুস্বারের' মাধ্যমিকতাটি আবশ্যক। মানস, প্রাণিকাদি সর্বস্থলেই এর দৃষ্টান্ত চিন্তা কর। সমস্ত শক্তি ব্যস্তরূপ হইতে গেলে (Power আপনাকে specific discharge রূপে দেখাইতে গেলে) মধ্যে 'ইঙ্কার'রূপ ঐ আকৃতিটি (Functional Pattern) আবশ্যক হয়ই। শ্রুতির পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় এই ইঙ্কারের রূপটি কি তা প্রসঙ্গাতঃ চিন্তা করিও। 'ই' তালব্যবর্ণ, তার মানে এখানে শুধু এ নয় যে, এটি তালুর সাহায্যে উচ্চারিত হইতেছে। লক্ষণায় এর বৃত্তি অন্যত্রও ব্যাপ্ত ও অন্বিত বুঝিতে হইবে।

'হিংস্' এবং 'সিংহঃ' এ দুয়ের তুলনা

আচ্ছা, এইবার 'হিন্স্' এবং 'সিংহঃ' এ দুটিকে পূর্বোক্ত রীতিতে পরীক্ষা কর। প্রথম স্থলে পাইলে সমস্ত শক্তিরাশি হইতে একটা প্রক্ষেপ (discharge)। এটি হরণ, বিয়োগ, ক্ষয়, সংহারের আকৃতি। ক্রমাগত চলিতে থাকিলে এটি আনে শ্রম, অবসাদ মৃত্যু। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ'—আমাদের পরাগ্‌বৃত্তিতে এই অবিরত 'আত্মহিংসা'টি চলিতেছে, তাই না ব্যতৃণৎ=হিংসিতবান! অমৃতের অন্বেষণে ধীর হইয়া এই constant running downটি রোধ করিতে হইবে। 'হিন্স্'কে উল্টাইয়া 'সিংহঃ' করিতে হইবে। যেটি প্রক্ষিপ্ত (discharged subtracted), সেটি শক্তির মূল আধারে আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বিয়োগের যোগ, হরণের পূরণ, ক্ষয়ের পোষণ (পুষ্টিবর্দ্ধনম্) সাধিতে হইবে।

সিংহের মৌলিক ধ্যান। মহাশক্তির বাহন

যেটি ক্ষিপ্ত (প্রাণ, চিত্ত ইত্যাদি রূপে), সেটিকে ('স'কার) অগ্রে উত্তোলন কর; পরে ঘনীভূত, কেন্দ্রীভূত কর; শেষে, সেটিকে মহাশক্তিরাশিতে 'নিঃক্ষেপ' কর। এই প্রক্রিয়ায় বর্ষণের বারি আবার অনন্ত বারিরাশিতে প্রত্যাবৃত্ত হইল, এক ফোঁটাও নষ্ট হইল না। 'হিন্স্' constant run downএর রূপ, 'সিংহঃ' complete come back ('মৃত্যোর্মূক্ষীয় মাহমৃতাৎ') এর রূপ। এইজন্য নৃসিংহ মন্ত্রে 'মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্'। এইজন্য সিংহ মহাশক্তির 'বাহন'। এঁর ধ্যানও অপূর্ব। অসুর=ব্যস্ত, ব্যগ্র শক্তিপ্রধান,

সুতরাং 'হিংস্' আকৃতি। এর সংহারে 'সিংহঃ' বাহন হওয়া চাই। সেটি সমস্ত, উগ্রশক্তির রূপ ('উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং')।

'ই' এবং 'ইং' উচ্চারণ করতঃ শুধু 'উত্তোলন' এবং উত্তোলনপূর্বক 'ঘনীকরণ' ও 'প্রবণীকরণ'—এই দুইটি আকৃতিভেদ পরীক্ষা কর। অজপার যেটি 'হংসঃ' তাতে ইং স্থলে অং। প্রণবে উম্। এ আকৃতিভেদগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সাধারণতঃ অকার=তলবৃত্তিতা, ইকার=লম্ববৃত্তিতা, উকার=বেধবৃত্তিতা বুঝিতে হইবে। 'হংসঃ' এই অজপায় লক্ষ্য কর যে—হকার এবং সকার এ দুয়ের মধ্যে তলগত (planar) ভেদ হ্রস্ব (unpronounced); 'হিংস্' ও 'সিংহ' তলগত পার্থক্য (biplanar emphasis) অধিক। কোনও charge যেন তার 'আকর' (generating source) হইতে 'উৎক্ষিপ্ত' হইয়া high potential হইতেছে; পরে সেটি আবার 'প্রক্ষিপ্ত' বা 'নিঃক্ষিপ্ত' হইতেছে। একটা খড়্গ যেন মাটিতে পড়িয়া আছে; সেটিকে উত্তোলন করিলাম; পরে সজোরে কোন কিছুর উপরে সেটিকে পাতিত করিলাম। এইটি 'হিংস্' আকৃতি। ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, মূঢ় ত্রিবিধ চিত্তবৃত্তিকে একাগ্র ও নিরুদ্ধ করিলাম। এটি 'সিংহঃ' আকৃতি। 'হংসঃ' জপে অজপার 'হংসঃ'এর সমতালিক ব্যবধান (coplanar interval) নিয়ন্ত্রিত ছন্দোগ (rhythmic) করিয়া লইতে হয়। 'হৌংস' জপের সঙ্গেও এটি তুলনীয়।

(নৃ+সিংহ) আকৃতি পরীক্ষা

'নৃসিংহঃ' নামটিও পরীক্ষা কর। দন্ত্য ত বর্গের পঞ্চম (অনুনাসিক) 'ন' বর্ণ, মূর্দ্ধন্য 'ঋ'কার যোগে কি সূচিত করে? 'নৃ' ঠিকভাবে উচ্চারণ করতঃ প্রাণপ্রযত্নের আকৃতিটি লক্ষ্য কর। নিখিল বিশ্বানুস্যূত শক্তিই প্রাণ। সুতরাং আমার মধ্যে প্রাণ-প্রযত্নের যে আকৃতি, তার কেবলমাত্র যে ব্যষ্টি-ব্যঞ্জনা (isolated individual significance) আছে, তা ভাবিও না। তার বৈরাজ-ব্যঞ্জনা (total cosmic significance) অবশ্যই আছে। এটি পরে সবিশেষ প্রদর্শিত হইবে। ত, থ, দ, ধ—এইরূপে প্রাণরূপ অদিত (অখণ্ড) সামগ্রীকে দিত (কিনা, ছিন্ন) করিয়া যাইতেছে। এই দিতি (দতা ছিন্নীকরণ) কর্মটি কোথাও অল্পপ্রাণ ও মধ্যপ্রাণ, কোথাও বা মহাপ্রাণ; চতুর্থবর্গে বিশেষ করিয়া মহাপ্রাণ। পঞ্চমবর্ণ 'ন'কারে কি হইল? ঐ দিতি কর্মটি আপনাকে সম্বরণ করিল। এটি উপসংহার সম্বরণের স্থান। Moving and working

Energy এ স্থলে আসিয়া বলে, আর না, আমি জিরাইব—Rest Energy হইব। একভাবে দেখিলে, এটি নিষেধ বা Negationএর স্থান। 'ন' এবং 'নো' অব্যয় দুটি মুখ্যতঃ তাই বলে। অন্য ব্যঞ্জনাও আছে। এক দিক দিয়া যেটি Rest Energy অন্যদিকে সেটি Arrested (প্রতিনিবৃত্ত, সম্বৃত) Energy. এই সম্বৃত প্রাণধারা বিশ্রান্ত অবস্থাতেও বিভিন্ন স্তর বিন্যাস পূর্বক বিদ্যমান থাকে (কুন্তলীকৃত ভুজগের মত)। যেমন, প্রণব সংকালে ঐ প্রকার 'ন' আকৃতি স্বীকার করতঃ প্রসুপ্ত থাকেন, তখন তাঁর রূপটি হয় 'সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকার' (অর্দ্ধ কিনা অর্দ্ধমাত্রা সহ 'ত্রিবলয়'= ত্রিমাত্রা)। প্রণবে গায়ত্রী, ব্যাহৃতি ত্রয়ও ত্রিপাদসহ সম্পুটিত থাকেন। ইত্যাদি।

পরমাভিমুখী প্রবণতার পথে সর্ববিধ বাধানিরসনী আকৃতি 'নৃসিংহঃ'

এইবার 'ঋ' যোগ কর। ঋ=গতিমাত্র বুঝিও না। মূর্দ্ধন্য ভূমি প্রাপিকা তৈজসী বৃত্তি—Intensive Energy reaching or tending to reach the Apex or highest level. এ Energy মুখ্যতঃ স্বগত—Intrinsic, আগন্তুক (Impressed Force) নয়। কেন না, 'ন' এই আকৃতির অভ্যন্তরেই এটি ক্রিয়াশীল হয়। তৃ বা তৃ, দৃ বা দৃ ধৃ—এই সকলের সঙ্গে নৃ এই 'ফরমূলাটি' পরীক্ষা পূর্বক তুলনা করিয়া দেখ। নৃ শব্দের সাধারণ অর্থ মানুষ। নৃ-শব্দের প্রথমা একবচনে 'না', এবং অস্মৎ শব্দের কতিপয় স্থলে বৈকল্পিক 'নঃ' এই দুটি রূপও প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য। ঋকারের গুণ হইয়া 'নর'। যাই হোক, নৃ এই আকৃতির মৌলিক ব্যঞ্জনা কি? প্রাণ আপনাকে 'দিত' (canalize) করিয়া তদনন্তর সেই দিত বৃত্তিকে সম্বৃত করিতেছে; কিন্তু সম্বৃত সেই প্রাণসম্বেগ (Vital Urge or Elan) আড়ষ্ট (dormant) হইয়া থাকিতেছে না। তার অভ্যন্তরে (intrinsic) একটা ক্রমোর্দ্ধগামী সম্বেগ (urge) রূপে সেটি অভিব্যক্ত হইতেছে। সব কিছু সৃষ্ট পদার্থেই এই সম্বেগটি (as Urge of Evolution) বিদ্যমান বটে, কিন্তু নৃ আকৃতিতে সেটি বিশেষভাবে লব্ধাবকাশ এবং প্রান্ত বা সীমা পর্যন্ত যাইতে 'উদ্যত'। মানুষ এই আকৃতি সম্পন্ন, কাজেই মানব সৃষ্টিতে স্রষ্টার পরম চরিতার্থতা। কিন্তু, ঐ সম্বেগটি প্রকট প্রবণতারূপেই বিদ্যমান। মানবে আসিয়া আত্মসংবিৎ, শুভাশুভবিচারণা, পুরুষার্থৈষণা ইত্যাদি উন্মেষিত হয় বটে, কিন্তু পরম

ও পূর্ণ পরিণতিটি কত না সাধন সাপেক্ষ! (নৃ+সিংহঃ) এই আকৃতিতে ঐ পরমাভিমুখী প্রবণতার পথে সর্ববিধ বাধা (ব্যাজ ও বিঘ্ন) বিদীর্ণ করিবার চরম সামর্থ্য লাভ করিতেছে। এই আকৃতিতে এটি 'বজ্রাধিকনখস্পর্শ'।

'নৃসিংহ' এই মহানামে বেদমন্ত্র (ঋক্) কিরূপে মিলিত হইয়াছেন তাও ভাবনা কর। গায়ত্রী ও মধুমতী ঋক্‌দ্বয় হইতে কি দোহন করিতেছেন? 'ন' এই আদিম বর্ণ (ধিয়ো নঃ এবং মধুমতীর নঃ উদ্দেশ কর)। হংসবতী ও সৃষ্টিসূক্ত ('ঋতং বৃহৎ' এবং 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ') দিতেছেন—ঋকার। 'জাত-বেদসে সুনবাম সোম' এবং 'সহস্রশীর্ষা' ইত্যাদি ঋক্‌দ্বয় হইতে স-কার। গায়ত্রীর 'ধীমহি' এবং 'ত্র্যম্বকং যজামহে' হইতে ইকার এবং অনুস্বার। হংসবতী হইতে এবং সৃষ্টিসূক্ত হইতে হ-কার ও বিসর্গ ('অথো স্বঃ')। সুতরাং সাকল্যে সাতটি ঋক্ গাভীরূপে আপনাদিগকে দোহন করিতেছেন। 'নৃসিংহঃ' এই মন্ত্রেও অক্ষরাবয়ব চিন্তা করিলে এতে সপ্তব্যাহৃতিরূপা সপ্তখ্যাতিও মিলিবে। তবে সে বিশ্লেষণের এখানে চেষ্টা হইল না।

মহারহস্যের সন্ধানে দিগ্‌দর্শন কোথায় মিলিবে?

যতটুকু দেখা হইল, সে তো মহারহস্যবারিধির উপকূলে বিক্ষিপ্ত কয়েক খণ্ড উপলমাত্র। নৃসিংহ, গোপাল, ত্রিপুরা তাপিনী প্রভৃতি উপনিষদ বারিধিতে অবগাহন পূর্বক অমূল্য নিধি আহরণ করা হইয়াছে। মন্ত্রাদিকে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিধা দৃষ্টিতে আলোচনা করার রীতি পূর্বাপরই চলিয়া আসিতেছে। যথা—'শিব' এই শব্দটিকে রস বা পারদরূপেও দর্শন। 'বেদ ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধ সমূহে বহু বৈদিক শব্দের আধিভৌতিক দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস হইয়াছিল। জপসূত্রে মুখ্যতঃ 'প্রাণিক' (vital) বিশ্লেষণের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। মূলতঃ সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তখ্যাতি অনুসারী বিশ্লেষণই অনুসন্ধাতব্য। তার মধ্যে ব্যাহৃতিত্রয় আকৃতিটি ঘন (ধ্রুব) রূপা, আর ব্যাহৃতিসপ্তক আকৃতিটি বিস্তার (তান) রূপা। 'নৃসিংহঃ' নামে নৃ=স্বঃ, হঃ=ভূঃ, সিং=ভুবঃ ইত্যাদি। আবার, তানে—বিসর্গসমেত 'হ'কার=ভূঃ, 'ই'কার স্বঃ, অনুস্বার ভুবঃ, 'স'কার ও 'ন'কার=মহঃ, জন, তপস্ এই ত্রিপুটী; 'ঋ'কার=সত্যম্। এ নির্দেশগুলি 'যেমন খুসি' মনে করিলে চলিবে না।

নিম্নের কারিকাটি স্মরণ করিয়া সমাপন কর:—

গম্ভীরাম্ভঃ রাশিতে প্রবেশভয় থাকিলে স্বাতী মুক্তা মেলে কি?

নিত্যোদ্বেলান্ নিধিনিলয়তঃ সন্নিধীনুদ্দিধীর্ষু
র্মন্দোচ্ছ্বাসে সতি কিমুপলং বিন্দসে শম্বুকং বা।
গম্ভীরাম্ভঃ প্রবিশসি ন চেদ্ ধ্বান্তনক্রাদিভীতঃ
স্বাতীমুক্তা কিমমলরুচি স্তেঽপি পাণৌ গৃহীতা॥৮৮

নিরন্তর উদ্বেল যে নিধিনিলয় (রত্নাকর) তাহা হইতে আসল মুক্তা (সন্নিধীন্) উত্তোলন করিবে বলিয়া উৎসুক হইয়াছ দেখিতেছি; কিন্তু সিন্ধু এইবার মন্দীভূত হইল ভাবিয়া সিন্ধুসৈকতেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া কি মিলাইলে আপনার করে? কয়েক খণ্ড উপল আর কয়েকটি শম্বুক (শামুক) নয় কি? সিন্ধুকুক্ষিতলে গাঢ় অন্ধকার (ধ্বান্ত) এবং কুম্ভীর মকরাদি রহিয়াছে এই ভয়ে গম্ভীরাম্ভরাশিতে যদি নাই প্রবেশ কর, তবে বল দেখি— স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দুপাতে যে মুক্তার উদ্ভব, সেই অনিন্দ্য অমলকান্তি মুক্তারাণীর 'পাণিগ্রহণ' (পাণিতে গ্রহণ) কিরূপে তুমি আবার করিতে পার?

দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক

দার্ষ্টান্তিকে—নিধিনিলয়=মহারহস্যবারিধি। সন্নিধি=যথার্থ ও অখণ্ডতত্ত্ব। নিত্যোদ্বেল= ব্যবহারিক বুদ্ধি (বেলা) কে নিরন্তর প্লাবিত (অভিভূত) করে। মন্দোচ্ছ্বাস=বুদ্ধিতে আক্ষিপ্ত যে রহস্য অপেক্ষাকৃত কমী 'গহন' বিবেচিত হয়। উপল=স্থূলবাহ্যার্থ। শম্বুক=কল্পিত বক্রার্থ। গম্ভীরাম্ভঃ=অতি গহনা রহস্যানুভূতি। ধ্বান্ত=অপিহিত ভাবার্থ, দুর্জ্ঞেয়ত্ব। নক্রাদি=ব্যাজার্থ, রূপক, আখ্যায়িকাদি যে সব সাধারণ বোধকে বিভ্রান্ত করে। স্বাতীমুক্তা=অভ্রান্ত, শ্রৌত্রাগমতত্ত্বগর্ভিতা বাক্।

কল্পিতার্থ কি না?

এসকলই কি শাস্ত্রের কিংবা অস্মদাদির কল্পনা মাত্র? অর্থাৎ, নৃসিংহ, গোপাল, ত্রিপুরা- এসব নামও তাঁদের তত্ত্বতঃ 'নাস্তি', কেবল শাস্ত্র অথবা অস্মদাদির বুদ্ধি ঐ ঐ রূপে কল্পনা করিয়াছে মাত্র, এবং সেরূপ কল্পনা আমাদের কোন না কোন কাজে লাগিয়াছে মাত্র (pragmatic fiction)? এ আশঙ্কা তুলিতে যাইয়া ভুলিও না যে—সর্ববিধ ব্যবহারের

মূলই কল্পনা। তত্ত্বে না হইলেও তথ্যে যে নব বিজ্ঞান এত বড় বিদগ্ধ বিশারদ মহাজন, সে বিজ্ঞানও কল্পনা ছাড়িয়া একটি পাও চলিতে অক্ষম। তবে কল্পনা বিসংবাদিনী না হইয়া সংবাদিনী হউক—ইহাই কাম্য। যথা, শ্রীচণ্ডীতে 'বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ' স্থলে বিষ্ণুকর্ণমূলোদ্‌ভূতৌ' কল্পনা বিসংবাদিনী। পূর্বে যাস্কাদি এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক অপরাপর নিঘণ্টুকারেরা যথাসম্ভব সংবাদিনী কল্পনারই আশ্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে, কথঞ্চিৎ প্রকারান্তর হইলেও, আমরা যথাজ্ঞান তাই করিতেছি। এইবার এই কারিকাটি—

নিখিলের কল্পনামূলত্ব

বিশ্বং ক্‌ঌপ্তং হ্যৃতমিতি যতো ব্রহ্মণাকল্পি পূর্বং
ভেদাঃ ক্‌ঌপ্তা অপি নিজমনো জৃম্ভিতে ব্যষ্টিবিশ্বে।
মন্ত্রং ক্‌ঌপ্তং বরদশিবদং ব্রহ্মণা স্বস্যরূপং
পাশাঃ ক্‌ঌপ্তা স্ত্ববরমনসা কল্পনা কল্পবল্লী॥৮৯

বেদে সৃষ্টিসূক্তে 'ঋতং' বলিয়া সৃষ্টির যে আদিম ভাবটি নিশ্চিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (হিঋতং ইতি), সেই আদিম ভাবাশ্রয় করতঃ 'ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ'—ধাতা যথাপূর্ব তাঁর বিশ্বসৃষ্টি কল্পনা করিয়াছিলেন (যতো ব্রহ্মণা অকল্পি পুর্ব্বং)। সুতরাং এই বিচিত্র বিশ্ব 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এই আধারেই কল্পিত (ক্‌ঌপ্ত) বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ, ব্রহ্মকল্পিত এই ঋতং-সত্যং ভাবাশ্রিত বিশ্বে (অর্থাৎ সমগ্র সমষ্টি বিশ্বে—Basic Cosmic Patternএ) প্রত্যেকে আপন মানস সংস্কার সহকারে আপন ব্যষ্টি বিশ্ব (individual universe) কল্পনা করিতেছে; এই ব্যষ্টি বিশ্বসমূহ পরস্পর ভিন্ন, এবং প্রতিটির মধ্যেও আবার নানা অবান্তর ভেদ। এ ব্যষ্টি কল্পনার বিশ্বগুলি তত্ত্ব ও তথ্য উভয় দিক দিয়া ঋতঞ্চ সত্যঞ্চের প্রায়শঃ অনুরূপ নহে। ব্রহ্মকল্পনাকে ঋত কল্পনা বলিলে জীব কল্পনাকে (সচরাচর) অনৃত কল্পনা বলিতে হয়।

অনৃতাদি কল্পনাভেদ। অকুশল ও কুশল কল্পন

এই পরে কল্পনা (অনৃত কল্পনা) প্রায়শঃ অবর (পরাক্‌-প্রবণ) মনের কল্পনা, যাহা দ্বারা আপনার বন্ধনের নানা পাশ সৃষ্টি করিতেছে (পাশাঃ ক্‌ঌপ্তা

অবরমনসা)। কিন্তু কোন কোন জীবের এই অনাদি অনৃত কল্পনাজনিত পাশ হইতে মুক্তির বাসনা জাগে; তখন তার চিত্ত প্রত্যক্ প্রবণ হয়। এবম্বিধ প্রত্যক্প্রবণ জীবের নিমিত্ত ব্রহ্ম কি উপায় করিয়াছেন? জীবের বরদ ও পরম শিবদ আপন নামরূপ গুণ লীলাদি এবং সাধনোপায় মন্ত্রতন্ত্রাদি স্বয়ংই কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মের রূপাদি এবং মন্ত্রাদি জীব কল্পনা, সুতরাং অনৃত কল্পনা, নহে। এটি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বস্তুরই 'আত্মামধিকৃত্য' (অধ্যাত্ম বা স্বভাব) কল্পনা। কাজেই, সত্য কল্পনা। জীবের জপাদি সাধনের লক্ষ্য— কিসে মায়িক অনৃতকল্পনা ঋতের অভিমুখীন হইয়া ব্রহ্মের সত্যকল্পনায় সমাশ্রিত হইতে পারে। শ্রীগুরুশক্তি এই শ্রেয়ঃ সমাশ্রয়ের অপরিহার্য উপায়। 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নির্বিকল্পভাবও অধিগত হইয়া থাকে। সুতরাং কল্পনাকে কেবলি বিসংবাদিনী কুহকিনী ভাবিও না। কল্পনা কল্পবল্লরী যেভাবে সমাশ্রয় করিবে সেই ভাবে ইহা তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবে। কল্পনাকে কেবলি প্রশ্ন করিবে—অনৃত, অসত্য, তমসার পারে অপ্রাকৃত নিত্যধামে তুমি আমায় লইয়া চলিতেছ তো?

গায়ত্রীজপে ঋত্যাদি কল্পনা উদাহৃত

অতঃপর গায়ত্রী জপধ্যানে ইহার প্রয়োগ ভাবনা কর:—

ত্রৈধং ক্ৢপ্তং প্রথমত ঋতং ব্রহ্মণা ভূর্ভুবঃ স্বঃ
সত্যং ক্ৢপ্তং সবিতুরিতি সৎ তৎপুরশ্চৌং বরেণ্যম্।
ভর্গঃ ক্ৢপ্তং দিবিবিলসতো ধীমহীতি প্রধাম্না (প্রসাদাৎ)
হ্যভ্যারোহো ধিয় ইতি চ নো যেন ক্ৢপ্তঃ প্রচোদ্যাঃ॥৯০

ব্রহ্মা প্রথমতঃ 'ঋতম্'কে ত্রিভাবে (ত্রৈধং) কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁদের আকৃতি হইল—ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎপরে, 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং' দ্বারা আপন (তত্ত্ব ও সত্ত্ব) সত্য স্বরূপটিকে কল্পনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে, 'সবিতুঃ' এই বাক্ হইতে 'সৎ' এই সার দোহন কর; 'তৎ' পূর্বে (অগ্রে, পুরঃ), এবং তারও অগ্রে 'ওঁ' গ্রহণ কর। হইল 'ওঁ তৎসৎ' (ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ নির্দেশঃ স্মৃতঃ)। তদনন্তর, ভর্গঃ (অনাদি-অবিদ্যা-সংস্কারবীজ ভর্জ্জনকৃৎ ব্রহ্মণ্য তেজঃ) ক্ৢপ্ত হইতেছেন। কি ভাবে? 'ধীমহি' এই

(জপ) ব্যাহরণ এবং অনুধ্যান দ্বারা। কার তেজঃ এবং কীদৃশ সে তেজঃ? 'দিবি বিলসতঃ', কিনা 'দেবস্য'। কীদৃশ ভর্গঃ? ব্রহ্মের 'প্রধাম্না' কল্পিত। অর্থাৎ গায়ত্রীশিরঃ যে 'আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং' কীর্তন করিতেছেন, তাহাকেই 'ধীমহি' ইহা বুঝিতে হইবে। তাহাতে কি হইবে? অভ্যারোহ, কিনা, অনৃতাদি হইতে ঋতাদিতে অভিসম্পন্নতা। 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ'—এই চরম পাদটি উক্ত অভ্যারোহের নিশ্চয় (হি) অভিসম্পত্তি সূচিত করিতেছে।

প্রণবজপে আধারভূতা মাত্রাদি ধ্যান

প্রণবজাপক এইভাবে ধ্যান করিও:—

ওঙ্কারস্য প্রথমতপসো ব্রহ্মণোঽদিত্যভীদ্ধা
দাবীরূপাদৃতমুদয়কৃদ্ ব্যাকরোতীহ্যুবর্ণঃ।
সম্পদ্যেত স্বরসমভিত শ্চান্তিমস্পর্শবর্ণা
ন্নিষ্পদ্যেতোত্থিতমপি পরং জ্যোতিরর্দ্ধাবকাশাৎ॥৯১

ওঙ্কার জপকালে ভাবিতেছ কি যে এক সাধারণ 'মামুলি' কর্মই তুমি করিতেছ? তৎকালে তুমি যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মেরই মত স্বয়ং স্রষ্টা! তুমি প্রাণ এবং বাক্প্রযত্ন দ্বারা যে অবর্ণ ('অদিতি') প্রথমে উচ্চারণ করিলে, সে অবর্ণ নিখিল সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মের যে 'অভীদ্ধ তপঃ' (সৃষ্টিসূক্তে শ্রুত) তাহাই। অমাত্রা তোমার প্রাণবাঙ্ময় তপের আদিম রূপটি, ইহা মনে রাখিও। 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ'—তোমার স্বরূপ 'অসৎ' (তমঃ এবং মৃত্যু রূপে) রহিয়াছে যে, দেখিতেছ না! সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ ও রসরূপে ইহাকে মিলাইতে হইবে তো! তুমি প্রণব সহায় হইয়া সেই বরীয়সী সৃষ্টিতেই প্রবৃত্ত হইলে যে! এর নিমিত্ত বিশেষ করিয়া মাধ্যমিক মাত্রা যে উকার তাকে সমাশ্রয় কর। এই উবর্ণই অনাদি তমোভূতা রাত্রিরূপের নিরসন পূর্বক আবীরূপ (সৎস্বরূপাভিমুখীনতা) আনয়ন করেন এবং পর-প্রত্যন্মুখ উদয়ের হেতুভূত (উদয়কৃৎ) হইয়া পরম প্রকাশের নিমিত্ত আবশ্যক যে ঋতচ্ছন্দ, সেটিকে অস্মদনুভূতিতে (ইহ) ব্যাকরণ করেন (ব্যাকরোতি)। (সৃষ্টিসূক্তটি আবার প্রণিধান কর।). ধর, উকারের ক্রিয়া ঋতচ্ছন্দেই চলিতেছে। এইবার অন্তিম স্পর্শবর্ণ

(মকার)ও আসিলেন। ইনি কি করিলেন? স্বরূপে যে রসবস্তু রহিয়াছেন, তাঁর সমীপে (অভিতঃ) আমাকে আনিয়া দিলেন। ফলে, শ্রুতিসিদ্ধা ঘনপ্রজ্ঞা সুষুপ্তিতে যেমন, তেমনি আমি আমার স্বরূপগত আনন্দে 'অভিসম্পন্ন' হইলাম। সমর্থ ঋতচ্ছন্দে অ, উ, ম জপে, সুষুপ্তির সঙ্গে তুলনীয় এই স্বরস-অভিসম্পন্ন ভাবটি ঘটিয়া থাকে অবশ্যই। এটি কিন্তু আসলে যোগনিদ্রা। যোগনিদ্রারূপিণী অর্দ্ধমাত্রায় এটি আমায় উপনীত করিয়া দেয়। নাদ শ্রবণ থেকে বিন্দুতে বিলয় পর্যন্ত, পুনশ্চ বিন্দু থেকে নাদ—এঁর ভূমিকা বিস্তারিত (ঋধ্যমানা) রহিয়াছে জানিও। কিন্তু 'ম'কারের ঊর্দ্ধে যে অর্দ্ধমাত্রা, তাঁকে (উক্ত যোগনিদ্রাকে) প্রসন্ন করিলে, কেবলমাত্র যে 'আবৃত' এমন নয় (not only veiled Ananda), পরন্তু সুখঘন সে 'নিদ্রা' হইতেও উত্থিত যে 'পরং জ্যোতিঃ', অথবা জ্যোতীরস সেটিও নিষ্পন্ন হইয়া যায়। অর্দ্ধমাত্রার যে 'অবকাশ' (কিনা, নাদ-বিন্দু-কলা), তাহা হইতে 'উত্থিত' হইয়া এই 'পরং' জ্যোতিঃ নিষ্পত্তিতে স্থিত হইতে হয়। শ্রুতি এই 'উত্থানের' কথাই তো বলিয়াছেন। এই পরমা স্থিতিতে তোমার সৃষ্টি ও লয় দুই ভূমিকারই যুগপৎ অবসান।

বাধাবিঘ্নসঙ্কুল নিশিত ক্ষুরধারের মতো তোমার সাধনমার্গে তোমার পরম সম্বল দুইটি—শ্রীগুরুরূপে তাঁর কৃপা এবং তাঁর দেওয়া মহানাম। এতদর্থে নীচের এই কারিকাদ্বয় পাঠ কর:—

তমঃ কন্দরেষু কঃ সদা তমোনুন্ (কশ্চিরং)
মরৌ বালুকাসু বারিবৃট্ প্রকামম্।
সরোহধীশ্বরঃ কোঽপি ঘোরেষু দাবে
হৃতে ত্বাং মহোর্ম্মিমৎসু পোতনাথঃ॥
গিরৌ গহ্বরে ন রৌতি যামঘোষো
যদা সানুকম্পকারি সিংহনাদঃ।
ধমৌঙ্কার শঙ্খ মিষ্টদেবদত্তং
হ্যুদাত্তং যতো ন যাতুধান শব্দাঃ॥৯২-৯৩
(বিধূয় যাতুধান শব্দান্)

তসমাচ্ছন্ন কন্দরমাঝারে কে সদা (উদয়াস্তহীন) তমোঽপহারী (তমোনুৎ) ভাস্কররূপে বিরাজমান তা জান? সীমাহীন মরুর তপ্ত বালুকারাশিতে অজস্র কামবর্ষী কোন্ শুভমেঘের উদয় চিরতরে হইল তাই বা কি জান? ঘোর দাবানলে ভীত তোমার অভয় ও শান্তির তরে কোন্ অমৃত সরোবরের অধীশ্বর তোমায় পথ দেখাইয়াছেন, তাও স্মরণ করিবে না? তাই বল—মহোর্ম্মিমান্ এই যে দুস্তর বারিধি তাতে সুখে উত্তরণের তরে, তুমি ছাড়া (ঋতে ত্বাং) পারের তরীর স্বামী (পোতনাথঃ) কে আছে আমার! [ভয়সমূহকে তামস-রাজস, তনু-বিশাল সব রকমই বলা হইল। আঁধারের ভয়ে গহ্বর ছাড়িয়া ময়দানে আসিলে, কিন্তু সেও যে মরুর তপ্ত সিকতারাশি! অন্ধ আচার ছাড়িয়া শুষ্ক বিচারে আসিয়া পাইলে কি? আচারে 'আলো' চাই, বিচারে 'রস' চাই। এ দুই-ই তিনি ছাড়া দিবেন কে? তারপর দাবভয়ে জলাশয়ে ঝাঁপ দিলে, কিন্তু জলাশয় যদি মহোর্ম্মিপাশে তোমায় আপন কুক্ষিতে কবলিত করে, তবে উপায়? জলাশয়, ধর, কোন গাঢ়ভাব; তাতে উচ্ছ্বাসাদি আছে; কিন্তু কেবল বিহ্বলতায় (নেশায়) যদি ডুবিয়া যাও, তবে 'ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং' যে পরমোজ্জ্বল রসবস্তু তাতে তো কৈ মিলনটি ঘটিল না (তোমার ভাব তো মহাভাবাশ্রিত হইল না)। এর উপায়ও তিনিই করেন।]

তিনি আছেন, তাঁর নামটি আছে। কে বড় কে ছোট তা নিয়ে ভাবিও না। ভাবিয়া দেখ—গিরিসানুদেশ প্রকম্পিত করিয়া যখন সিংহনাদ হয়, তখন গহ্বরের শৃগাল কি ডাকিতে পারে? স্বয়ং শ্রীগুরু (ইষ্টদেব) অহেতুক করুণা-পরবশ হইয়া যে ওঙ্কারাদি মহানামশঙ্খ তোমায় তুলিয়া দিয়াছেন, সেই শঙ্খ বাদন কর (ধম)—এমন উদাত্ত স্বরে বাদন কর (অর্থাৎ 'অভীদ্ধেন তপসা') যাতে রাক্ষস, নিশাচর (যাতুধান) দের বিকট অমঙ্গল শব্দ একান্তই (হি) সম্ভবপর না হয়।

[পূর্বকারিকার মত এটিরও ভাবরহস্যে অবগাহন করিতে যত্ন করিও। একটি বিশেষতঃ সংবাদিনী অর্থকল্পনা এই—গিরি=এই দেহ। গহ্বর=নাসাগহ্বর, মুখগহ্বর ইত্যাদি। যামঘোষ=বৃথা শ্বাসবাক্যাদি (প্রাকৃত সংস্কার দ্বারা বাধ্য, সুতরাং 'যাম')। গিরিসানু=সৌষুম্নমার্গ। কম্পকারী সিংহনাদ=কুণ্ডলিনী জাগৃতি বিধায়ক মহামন্ত্র শক্তি। উদাত্ত—'উ'কারাদি বারাহী শক্তি সহায়ে ঊর্দ্ধখ্যাতিতে সমুত্তোলিত। যাতুধান=বক্র-বিষমগ, বৈরূপ্য-বৈগুণ্য জনক স্পন্দ (ছন্দঃ) সমূহ—অরিচ্ছন্দঃ।]

বাচাদিকে অগ্র্যা করিবে কিরূপে?

অগ্র্যা গিরঃ সতি জপে স্বসপত্নবর্জ্জং
চাগ্র্যং মনঃ সতি রসে বরবৈরবর্জ্জম্।
প্রাণাস্তথা সতি জবেঽসুরবেগবর্জ্জং
বুদ্ধিস্তথা সতি পথীতর লক্ষ্যবর্জ্জম্॥৯৪
(সতি নয়েঽপরপোষবর্জ্জম্)

তোমার জপ স্তোত্রাদির বাক্যসমূহ (গিরঃ) অগ্রগা (উত্তম) হইবে কি হইলে? ঐ সমস্ত বাকের যেটি আপন ছন্দঃ ও ভাব, তার বিরোধী (অরি, সপত্ন) নয় এমন জপাদি দ্বারাই বাকের ঐ অগ্রগা, উত্তমা ভূমি লব্ধ হইবে, অন্যথা নহে (স্বসপত্নবর্জ্জং)। মন অগ্র্য হইবে কিরূপে? যেটি বর, কিনা বরণীয় শ্রেষ্ঠ তাতে বৈমুখ্য (বৈর) নাই এমন যে রস (শ্রদ্ধা, অভিনিবেশ, রতি), সেইটি হইলে, অন্যথা নহে (বরবৈরবর্জ্জং)। প্রাণ অগ্র্য হইবে সুরদ্বেষী (অসুর, Brute, Lower Vital) যে বেগ সেটি নয়, এমন সম্বেগ (জব, উদ্যম) জাত হইলে, অন্যথা নহে। আর শ্রুতিসিদ্ধা যে অগ্র্যা বুদ্ধি, সেটি জাত হইবে যদি বুদ্ধির সমাশ্রিত নীতি অথবা পথ এমন হয়, যাতে পর বা পরম প্রাপ্তির উপায়েরই পোষণ হয়, অথবা যাতে পরম লক্ষ্য ছাড়া ইতর লক্ষ্যের পথ উন্মুক্ত প্রসারিত না হয় (অপরপোষবর্জ্জং অথবা ইতরলক্ষ্যবর্জ্জং)। সুতরাং অবমে অথবা ইতরে লক্ষ্য নাই এমন যে নীতি ও পথ সেইটি সর্বতোভাবে সমাশ্রয় করিবে। যেমন শব্দের দিক দিয়া 'অ উ ম' হইল পর, 'অবম' অপর। দ্বিতীয়টিতে 'অ' ও 'ম' এই দুই বর্ণের 'পার্শ্বচাপ' দ্বারা 'ব' সঙ্কুচিত; প্রথমটিতে, পার্শ্বচাপ অপনীয়মান, কাজেই 'উ' প্রসারিত, ঋধ্যমানতাধর্মী)।

(২৯)

সুভদ্রদশকম্

ভজনসুভদ্রঝরীপরিসেবনশীতলবিমল মনাংসি।
ন জহতি জলধিসুতাপতি-পঙ্কজপেলবপাদরজাংসি॥

গিরিশনিবাস-সুষমাসিতসুন্দরমানসসরসি পয়াংসি।
অপি দধতু রমাধবচরণ-লুণ্ঠিত-পরিমলভাঞ্জি যশাংসি॥

দুস্তর বারিধিবক্ষসি তরিতুং
দুর্গম গহনবনে সুখমটিতুম্।
প্রবিষ্টভুজঙ্গগৃহেঽপি শয়িতুং
(ভুজগসমাকুলগৃহেঽপি শয়িতুং)
তরণী সরণী দয়া দীপনী॥
নির্বাত-বাতায়ন-হীনকক্ষে
গুরুঘূর্ণিবাতাহত-বেদিবৃক্ষে।
প্রমত্ত-বাতাঝিতরঙ্গতাণ্ডবে
প্রাণানিলো বিষকূপে চ দাবে॥

খদ্যোততনুচ্ছটেব চটুলং
বাতাহতলঘুবারিদচপলম্।
ন হরতি চেত ঋতে তচ্ছরণং
ধ্রুবস্য ছায়াপথস্য গর্ব্বম্॥

মরুভূবি কো হৃদি তৃষাবিদীর্ণে
ন পিবেদুপবন নির্ঝরবারি।
চেতসি সতি বিষদহনবিশীর্ণে
ভজেন্নবাহ মৃতমাময়হারি॥
নভসি যদি চপললঘুমেঘাৎ
পততি পৃষদেক মতিলোলম্।

তদপি খলু তৃষিত খগ মৃগ্য-
মপি জলধিবারি কিমগাধম্।

যদি মৃদি সরসায়াং যত্নতঃ সেবিতাপি
নবরুচিতুলসীয়ং মঞ্জরীষু ম্রিয়েত।

কুরু নতু পরিতাপং সন্তি বীজানি তত্র
বত মৃদি বিরসায়াং মঞ্জরী মঞ্জু শোভা॥
সপদি বিরমতূর্ম্মিশ্রেণিভঙ্গোঽর্ণবস্য
প্রহতজলধিবেলা স্বাপমেতু প্রশান্তা।

গদতু চিরমপেক্ষ্যাশঙ্কমানো বগাহে
স্বপিতু সপদি চেতো মা গদীঃ সন্ততোর্ম্মি॥

ধ্যানে নয়নং প্রেমণি শরণং
কর্ম্মণি নিষ্ঠা বিরতৌ শমনম্।
ভজনে ভাবঃ শমথো মননে
পূর্ণমপূর্ণং সর্ব্বং জপনে॥৯৫-১০৩

বঙ্গানুবাদঃ—ভজনরূপ সুমঙ্গলনির্ঝর নিষ্ঠাসহকারে সেবা করতঃ যে মন শীতল ও বিমল হইল, সে মন জলধিসুতাপতির (কমলাপতি শ্রীহরির) পঙ্কজ-পেলবপাদরজঃ ছাড়িয়া আর কোথাও যায় না। (কাজেই, ভজনসুভদ্রঝরী সর্বতোভাবে সেবা কর)। গিরিশনিবাস যে কৈলাস তার শুভ্রোজ্জ্বল সুষমা প্রতিফলিত হইয়া মানসসরোবরের বারিবক্ষঃও শুভ্রসুন্দর হইয়াছে বটে, কিন্তু, সে সিতসুন্দর বারিবক্ষঃ রমাপতির চরণসরোজ লুণ্ঠিত পরিমলকে ভজনা করে যে যশঃ, সে যশের দ্বারাও মণ্ডিত হউক! অর্থাৎ, তোমার মানসসরঃ জ্ঞানের আলোক এবং প্রেমের পরিমল এ দুয়েতেই মণ্ডিত হইয়া ধন্য ও পূর্ণ হউক। দুস্তরবারিধিবক্ষে তরিবার তরণী, দুর্গমগহনবনে সুখে চলিবার সরণী (পথ), ভুজগসমাকুলগৃহেও শয়ন করিবার জন্য অনির্বাণ দীপ (দীপনী)—কেবল দয়া, আর কিছুই নহে।

গৃহে রহিয়াছ, কিন্তু সে গৃহ যদি বায়ুহীন, বাতায়নহীন কক্ষের মত বোধ হয়, তবে? গৃহের বাহিরে, সাধনবেদিবৃক্ষতলে সমাসীন আছ, কিন্তু সে বৃক্ষও যদি গুরুঘূর্ণিবাতাহত হয়, তবে? এ পারে কাজের সুরাহা হইল না, যাই পারাবার পারে—এই ভাবিয়া সাগরে পাড়ি দিতে যাইয়া প্রমত্ত প্রভঞ্জন উদ্বেলিত তরঙ্গতাণ্ডবে যদি নিপতিত হও, তবে? আর ভাগ্যদোষে যদি বিষবাষ্পকূপে অথবা দাবাগ্নির জ্বালা

করাল ধূমজালে পতিত হও, তবে? এ সকল সঙ্কটেই তিনি আছেন তোমার প্রাণানিল রূপে। সঙ্কটপঞ্চককে পড়িয়া এটি যেন ভুলিও না।

চিত্তে কদাচিৎ একটুখানি আলোর স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু সে আলো ঘোর অন্ধকারে খদ্যোতের তনুচ্ছটার মতই চটুল! আর, অবসন্ন মন যখন চলিতে আরম্ভ করে, তখন সে হয় কেমন? না, বায়ুতাড়িত আকাশের লঘু মেঘের মতই চপল! এ নিতান্ত চটুল চপল মন, তাঁতে শরণ লওয়া ব্যতীত, আকাশের ঐ ধ্রুবতারা, আর ঐ ছায়াপথের যে অচঞ্চল দ্যুতি ও প্রশান্ত মহিমা, তাদের গর্ব হরণ করিবে কিরূপে? তদেকশরণ হইলে এ অঘটনও অবশ্য ঘটিয়া থাকে জানিবে।

মরুভূমিতে নিদারুণতৃষ্ণাবিধুর কোন্ ব্যক্তি নিকটে মরুদ্যান আছে শুনিয়া সেখানে যায় না, এবং তথাকার নির্ঝরবারি প্রাণ ভরিয়া পান করে না? চিত্ত যদি নিরন্তর বিষের দহনে বিশীর্ণ হয়, তবে কে এমন আছে যে সকল আময়হারি অমৃত ভজনা করিতে সমুৎসুক হয় না?

আকাশের একখণ্ড চপল লঘু মেঘ হইতে যদি একটি ফোঁটাও অতিলোল জল পতিত হয়, তবু সেটি হয় তৃষিত চাতকের কাম্য, প্রার্থিত। জলধিতে তো অগাধ জলরাশি রহিয়াছে, কিন্তু সেদিকে তো পিয়াসী চাতক ছুটিয়া যাইবে না! আকাশের এক বিন্দু বারি হইতেছে—একটি মুহূর্তের শ্রীগুরুকরুণাকটাক্ষ! জলধি হইতেছে—সর্বতোব্যাপী ব্রহ্মসত্তা অথবা অনন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান। এই বারিধি এবং বারিদ সম্বন্ধটি পূর্বে এক কারিকায় কথিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধ নানাদিক দিয়া দেখিও।

তোমার সরস মৃত্তিকায় সযত্নসেবিত নবীনকান্তি তুলসী যদি কোন কোন মঞ্জরীতে শুখাইতে থাকে, তাতে পরিতাপ করিও না। কেননা, মঞ্জরী শুখাইল বটে, কিন্তু বীজ ছড়াইয়া গেল তোমার সরস ভূমিতে। কালে, তুলসী কাননই হইবে। কিন্তু তোমার মৃত্তিকাই যদি শুখাইয়া বিরস হয়, তবে হায়! দুদিনের এই মঞ্জরী মঞ্জু শোভা তোমার সাধের তুলসীমঞ্চে!

উদ্বেল সিন্ধুতটে দাঁড়াইয়া যে জন অপেক্ষায় আছে এই ভাবিয়া—তটে সিন্ধুর অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গ এইবার নিবৃত্ত হউক, তরঙ্গাঘাতে নিরন্তর প্রহৃতা বেলাভূমি এইবার প্রশান্ত হইয়া ঘুমাক; তখন আমি স্বচ্ছন্দে শান্তসমুদ্রে অবগাহন করিব এবং মুক্তাদি আহরণ করিব! উদ্বেল সাগরে অবগাহনে ভয় পাইয়া এবং চির অপেক্ষায়

রহিয়া, কেহ যদি এরূপ বলে, তা সে বলুক। কিন্তু স্বপ্নজাগরণে নিরন্তর তরঙ্গায়িত (সন্ততোর্ম্মি) মনটি আমার এইবার ঘুমাইয়া পড়ুক, শান্ত হউক, তখন আমি সে মনে সুখে অবগাহন করিব—এরূপ কথা কদাপি বলিও না (মা গদীঃ)।

ধ্যানে দৃষ্টির উন্মেষ হয়, প্রেমে শরণাগতি, কর্মে নিষ্ঠা, বিরতি বা কামনা নিবৃত্তিতে শম, ভজনে ভাব, মননবিচারে তত্ত্বান্বেষিণী বুদ্ধি স্ফুরিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু সকল সাধনেই যেটি অপূর্ণ রহিয়া যায় সেটি পূর্ণ হয় কিসে? জপনে। কাজেই, সকল অপূর্ণের পরিপূরক জপকে ছাড়িও না। জপসংখ্যা পূরণ কেবল বাহিরের কর্ম নয়; এ পূরণ নিখিল অপূর্ণের পূরণেরই প্রয়াস, ক্রম ও উপায় জানিও। জপ্য মহানামের কৃপাই এই অঘটনঘটনী পরিপূরণী শক্তি।

জপসূত্রম্

॥ প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদঃ ॥

(১)

'অভীপ্সম্' তথা 'তপঃ' সূত্রে

১৬। আভিমুখ্যে চাভীপ্সত্বম্॥

নৈর্লক্ষ্যং চাপি বৈলক্ষ্যং চোপলক্ষ্যং ততঃ পরম্।
বিহায় চাপলক্ষ্যঞ্চ সংলক্ষ্যে ধীরবৃত্তিতা॥৫৮

ন্যাসেন মুণ্ডনৈর্লক্ষ্যং চাপেতং প্রাণকর্ম্মণা।
ভূতশুদ্ধ্যা চ বৈলক্ষ্যং চোপলক্ষ্যং গুরুং শ্রয়াৎ॥৫৯

আদ্যামাত্রা হি নৈর্লক্ষ্যং বৈলক্ষ্যং মধ্যমা জয়েৎ।
তৃতীয়া চার্দ্ধমাত্রাহি দ্বেহপরে জয়তস্ততঃ।
ইতি প্রণবমাশ্রিত্য সংলক্ষ্যস্থিতিমিচ্ছত॥৬০

চতুর্ণাং প্রতিষেধার্থ মভ্যাসঞ্চ বিচারণাম্।
বুদ্ধিযোগঞ্চ ভাবঞ্চ হ্যাশ্রয়ত যথাক্রমম্॥৬১

মণিসরোজ বিলাসসমুৎসুকোহ
টসি বৃণোষি বিষাদমিতস্ততঃ।
বিষবিতানশুচো ন সুধাকরোহ
বতি ভুজঙ্গভিয়োহপি সরোরুহম॥৬২

জহৎ কর্ম্মোপাত্তং ফলমুপরি কিঞ্চান্তরতৃষো
জহৎ তৃষ্ণামুর্ব্বী মহমিতি তনুগ্রন্থিমজহৎ।

ন জহ্যাস্তে জ্যোতীরস মিথুনযাগে জপহুতং
যতো ধর্ম্মাঃ কর্ম্মাণ্যখিলমিয়ুরিষ্টৈকশরণম্॥৬৩

১৭। তেজস স্তথাত্বে তপস্ত্বম্॥

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ব্রহ্ম খল্বিদমঞ্জসা।
ব্রহ্মণোঽনুপ্রবেশাদ্ধি সর্ব্বতোঽস্তি তপো ধ্রুবম্॥৬৪

খ্যাতয়োভূর্ভুবঃ পূর্ব্বাঃ সপ্ত সর্ব্বেষু নিষ্ঠিতাঃ।
তদ্ ব্যাপ্য বৃত্তিমত্ত্বেঽপি ন সর্ব্বং ব্যক্ত বৃত্তিমৎ॥৬৫

অগ্নিস্তেজঃ পুনশ্চার্চ্চি র্বর্চ্চশ্চোর্জ্জো যথান্বয়ম্।
ওজশ্চ ভর্গ ইত্যেবং ভূরাদৌ তপসো গতিঃ।
একস্মিন্নেক মুখ্যত্বেঽহ পরেষাং গুণতা স্থিতা॥৬৬

প্রতি মখেষু জুহোষি হুতাশনং
প্রতি জপেষু জুহোষি পরাং গিরম্।
প্রতি ভবেষু জুহোষি ভবোদ্ভব
মিতি করোষি তদেব পরং তপঃ॥৬৭

গীতাদিষু তপস্ত্রৈধং শ্রৌতং জ্ঞানময়াদিকম্।
মহাব্যাহৃতিভিঃ সর্ব্বং সংগৃহ্যতে হি মূলতঃ॥৬৮
প্রণবাদিষু বীজেষু ভূর্ভুবসুবরোমিতি।
ত্রয়ী হি শিরসা ক্৯প্তা তস্মাজ্জপঃ পরং তপঃ॥৬৯

জপন্ মন্ত্রং বাঢ়ং মনসি যদি তুচ্ছং নিজকৃতং
শ্রয়ন্ ন্যাসং ধ্যানং হবনমপি চেন্নৈষি শরণম্।
স্তুবন্ স্তোত্রং হৃদ্যং হৃদি বিগুণতাং চেদুপগতঃ
স্মর জ্ঞানপ্রেমাগ্নি যজনপরং দ্ব্যক্ষরজপম্॥৭০

মন্ত্রং ভূরিতি সন্ধেয়ং ভুবশ্চ দৈক্ষ চোদনা।
স্বরিতীষ্ট সমাপত্তির্যেনাত্মা সম্প্রসীদতি।
তেজস্ত্রেধং তপস্ত্রেধং যো বেদ বেদ সোঽখিলম্ ॥৭১

উপরিলিখিত সূত্রদ্বয় এবং কারিকাসমূহের অনুবাদ

১৬। অভিমুখীন হইলে হয় অভীদ্ধ।। (Leaping and Aspiring Flame)

নৈর্লক্ষ্য, বৈলক্ষ্য, উপলক্ষ্য এবং অপলক্ষ্য—এই চারি পরিহার পূর্বক সংলক্ষ্যে ধীরবৃত্তিতা হওয়া আবশ্যক। [এইরূপ হইলে বুঝিবে যে তোমার উদ্দেশ্যের উপকারক (অভিমুখীন) যে ছন্দঃ সে ছন্দঃ 'অভীদ্ধ' হইয়াছে।] জপাদি সাধনে অঙ্গন্যাসাদি ক্রিয়া দ্বারা নৈর্লক্ষ্য পরিহার কর; ভূতশুদ্ধি দ্বারা বৈলক্ষ্য; প্রাণায়াম দ্বারা অপলক্ষ্য (অপেতং); এবং ধ্যানযোগে শ্রীগুরু সমাশ্রয় করতঃ উপলক্ষ্য হইতে উত্তীর্ণ হও। প্রণবের যেটি আদ্যামাত্রা (অকার) সেটির ব্যাহরণে নৈর্লক্ষ্য দূরীভূত হয়, অর্থাৎ লক্ষ্যাভিমুখীনতার অনুক্রমটি আসিয়া থাকে। মধ্যমমাত্রা উকার বৈলক্ষ্য (বিবুদ্ধ, ব্যর্থলক্ষ্য) নিরসনকরতঃ অভিমুখীনতাটিকে ঋজুগামিনী ও সতেজ করে। তৃতীয়া (মকারমাত্রা) এবং অর্দ্ধমাত্রা অপর দুটিকে (অপলক্ষ্য—অপকৃষ্ট হীন লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য—কথঞ্চিৎ সমীপবর্তী অথচ বস্তুতঃ অবান্তর লক্ষ্য) জয় করিয়া থাকে (জয়তস্ততঃ)। অতএব প্রণবাদি বীজ, মহানাম সমাশ্রয় করতঃ সংলক্ষ্যে স্থিতি ইচ্ছা কর (ইচ্ছত)। (সহকারী উপায়রূপে) ঐ চারিটির (নৈর্লক্ষ্যাদির) প্রতিষেধার্থ যথাক্রমে অভ্যাসযোগ, বিচারণা, বুদ্ধিযোগ ('বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ') এবং ভাব (ভক্তিযোগ—'মামেকং শরণং ব্রজ') যথাসাধ্য সমাশ্রয় কর।

আচ্ছা, তুমি তো ('সহস্রারে কর্ণিকারে' ইত্যাদি রহসি ধ্যানের বস্তু) মণিসরোজ (মণিপদ্ম) বিলাসে সমুৎসুক হইয়াছ, অর্থাৎ তাহাই তো তোমার সংলক্ষ্য; কিন্তু তাই যদি হয় তো এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? (অটসি ইতস্ততঃ)—লক্ষ্যহীনের মত বেড়াইতেছ কেন? শুধু তাই নয়, যাতে আত্মার সম্প্রসাদ না হইয়া নিশ্চিত বিষাদই হইবে, তাই কেবলই বরণ করিতেছ কেন? (বৃণোষি বিষাদং)—এটি বৈলক্ষ্য তো বটেই। তারপর দেখ, সুধাংশুর স্নিগ্ধকিরণে তোমার অঙ্গসন্তাপ তুমি জুড়াইবে ভাবিয়াছ বটে, কিন্তু (পূর্বসংস্কার কল্পিত) বিষবিতান (বিষবিকিরণকারী বিষ চন্দ্রাতপ) ছাড়িয়া

বাহির তো হইলে না আজও। কাজেই স্বয়ং সুধাকর তোমায় বিষ চন্দ্রাতপ দুঃখ (শুচঃ) হইতে রক্ষা করেন কিরূপে (ন অবতি)? এটি অপলক্ষ্য। শেষ কালে দেখ—কোনও পুরুষ সরোবরে প্রস্ফুটিত এক কমল দেখাইয়া বলিলেন, ঐ কমলমৃণালমূলে এমন এক নিধি আছে, সেটি পাইলে সর্বভূতে অভীঃ (ভয়হীন) হওয়া যায়। তুমি তাই শুনিয়া পদ্মটি তুলিতে সরোবরে নামিলে। কিন্তু ছিল এক হিংস্র কৃষ্ণসর্প—সে তোমায় তাড়া করিল। তুমি যদি পদ্মমৃণালমূলে মণিটিকে হস্তে ধারণ না করিয়া পদ্মটিকেই ধারণ কর তা হইলে উদ্যতফণ কৃষ্ণসর্প তোমায় রেহাই দিবে কি? এটি সমীপবর্তী অথচ অবান্তর লক্ষ্যের (উপলক্ষ্যের) দৃষ্টান্ত। (ন অবতি ভুজঙ্গভিয়োঽপি সরোরুহম্।)

(আবার ভাবিয়া দেখ—ইষ্টে একান্তাভিমুখ্যরূপ যে সংলক্ষ্য তাতে স্থিতি কত না সাধনে অর্জন করিতে হয়!) কর্মের দ্বারা উপাত্ত যে ফল (কর্মফল) তুমি না হয় (উপরি, বাহ্যতঃ) ত্যাগ করিয়াছ (জহৎ), কিন্তু অন্তরতৃষ রহিয়া গেলে যে! আবার, উরুরূপা (উর্ব্বীং) তৃষ্ণাকে যদিই বা ছাড়িতে পারিয়াছ, তার সূক্ষ্ম (তনু) বীজভূত 'আমি' রূপ মূলগ্রন্থি তো ছাড়িতে পার নাই (অজহৎ)। আচ্ছা, ঐ তনুগ্রন্থি তো অল্পে যাবার নয়। (ও গ্রন্থি লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিও না।) ওটি যদি নাই ছাড়িতে পারিয়া থাক, তবু জ্যোতিঃ এবং রসের মিথুনযাগটি শ্রীগুরু তো তোমায় ধরাইয়া দিয়াছেন, সে যাগে (নিষ্ঠাপূর্বক) জপরূপ হবনটি চালাইয়া যাও (ন জহ্যাঃ)। ঐ এক উপায়েই (যতঃ) তোমার ধর্মকর্মাদি অখিলরূপেই (ক্রিয়াকারক ফলসম্ভার সহ) ইষ্টৈকশরণাগতিতে সমাপন লাভ করিবে (ইয়ুঃ)। সুতরাং ঈদৃশ সংলক্ষ্যসাধন আর কি আছে? (এটা ছাড়িয়াছি, কিন্তু ওটা তো ছাড়িতে পারি নাই ভাবিয়া নৈর্লক্ষ্যাদিতে বিমূঢ় রহিও না।)

১৭। তেজঃ যদি অভীপ্স হয় তবে সেটি হয় তপঃ॥ (Power as directed to and realizing an End).

'তপসাচীয়তে ব্রহ্ম', 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এবং 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবাঽনুপ্রাবিশৎ'—তপের দ্বারা ব্রহ্মবস্তু যেন উচ্ছ্বসিত হইলেন, নিজেকে চয়ন বা ব্যাহরণ করিলেন; এ সমস্তই ব্রহ্ম বৈ আর কিছু নয়; ব্রহ্ম যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাতেই তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। এ বাক্যগুলির মর্ম আগে বুঝিতে কতক চেষ্টা হইয়াছে, পরে আরও হইবে। তবে এই তিনটি সূত্র হইতে নিগমণ হইল যে সৃষ্টির সর্বাবয়বেই ব্রহ্ম

তপোরূপে রহিয়াছেন। অর্থাৎ তপঃ বিশ্বানুস্যূত সত্য—Immanent Cosmic Principle. একভাবে তপোরূপে ব্রহ্ম যেরূপ সর্বগ, অন্যভাবে ভূর্ভুবরাদি সপ্ত 'খ্যাতি' রূপেও তিনি সর্বত্র 'নিষ্ঠিত'—নিগূঢ়ভাবে এবং নিশ্চিতরূপে স্থিত। (যেমন, একটা বীজে অথবা এক ধূলিকণাতেও ঐ সাতটি নিগূঢ় নিয়ামকভাবে বিদ্যমান।) ঐ সপ্তকের দ্বারা ব্যাপ্য হইয়াই (অন্তর্বহিঃ বিশ্বে) সব কিছু বৃত্তিমৎ হইতেছে সন্দেহ নাই (তদ্ব্যাপ্য বৃত্তিমত্ত্বেঽপি), কিন্তু সচরাচর ব্যবহারে সবকিছুতে ঐ সপ্তককে ব্যক্ত, প্রকট অবস্থায় থাকিতে দেখা যায় না (ন সর্বং ব্যক্তবৃত্তিমৎ)। (যেমন, সূর্যরশ্মিতে যে সপ্ত বর্ণালি) তপঃ এবং ব্যাহৃতি উভয়থা সর্বত্রগ রহিয়াছেন বলিয়া, ভূরাদি প্রত্যেক ব্যাহৃতিতেই তপের এক এক 'রূপ' অবশ্য রহিবে। সেগুলি এই—ভূঃতে অগ্নি, ভুবঃতে তেজঃ, স্বঃতে অর্চ্চিঃ, মহঃতে বর্চ্চঃ, জনতে ঊর্জ্জঃ, তপঃতে ওজঃ এবং সত্যে ভর্গঃ। এক বিশেষ সূত্র (Principle) আশ্রয় করিয়া এই প্রকার বিশেষ বিশেষ নির্দেশ হইতেছে বুঝিতে হইবে। সে সূত্র পরে পরিস্ফুট হইবে। এখানে লক্ষ্য করিও যে অগ্নি প্রভৃতি পরস্পরের ব্যাবর্তক নয়। এক এক খ্যাতিতে এক একটির মুখ্যতা, কিন্তু গৌণভাবে প্রত্যেকটিই অন্যত্র রহিয়াছে (অপরেষাং গুণতা স্থিতা)।

এইবার দেখ—দ্রব্যযজ্ঞাদি বিবিধ যজ্ঞে ভৌমাগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাপর ঊর্দ্ধভূমিক হুতাশনে (গায়ত্রীতে সাক্ষাৎ ভর্গঃই তোমার হুতাশন) হবন করিতেছ (জুহোষি)। জপকালে হবন করিতেছ কোন্ অগ্নিকে উদ্দেশ করিয়া জান? সে অগ্নি হইলেন 'তনূনপাৎ'—সাক্ষাৎ পরাবাক্ সে অগ্নির শাশ্বতী তনু (প্রতি পরাং গিরম্)। আবার জন্মে জন্মে লোকে লোকে কাকে উদ্দেশ করতঃ জীবন হবন করিয়া যাইতেছ বল দেখি? বেদের এই চিরন্তনী জিজ্ঞাসা—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম! সে কোন্ দেবতা? সে দেবতা—'ভবোদ্ভব'—যত ইমানি ভূতানি ইত্যাদি। সেটি নিখিল সৃষ্টিস্থিতিলয়ের মূলে যে পরম রহস্য আবেগ তাই—যাকে 'আনন্দ' বলাও হইয়াছে। শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে পঞ্চাগ্নি তার মূলও তো এইখানেই! আচ্ছা, এসব করিয়া আসলে কি কর্মটি করিতেছ বল দেখি? পরং তপঃ। ব্রহ্মের তপঃ হইতে উৎপন্ন অণু মহান সকল কিছুই সেই আদিম ব্রহ্মের তপঃকেই বিভিন্নরূপে উদ্দেশ করিয়া পরোক্ষ পরমে পুনর্মিলনের যে আপন তপঃ সেটি ঋজু কুটিল নানা ছন্দে করিয়া চলিয়াছে! কবে ঋতচ্ছন্দঃটি, মধুচ্ছন্দঃটি তার মিলিয়া যাইবে, এখনি তার ঠিকানা দিতেছে কে বল?

সে ঠিকানা মিলাইবার নিমিত্ত তপসের সাথে মেধসকেও মিলাইতে হয়। অর্থাৎ, তপসকে ব্যাহৃতিসপ্তকের চরমভূমি যে 'সত্যং' সেই পর্যন্ত ফুটাইয়া লইতে হয়—'ভর্গো দেবস্য ধীমহি' রূপে অভিব্যক্ত হইতে হয়।

গীতা যে বাচিকাদি ত্রিবিধ তপের কথা বলিয়াছেন, শ্রুতিতে 'তস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' ইত্যাদি যেসব রূপ কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই ভূর্ভুবস্বঃ এই মহাব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা সমাসতঃ সংগৃহীত হইয়াছে জানিবে। অর্থাৎ, তপসের মূল আকৃতি ভূর্ভুবস্বঃ।

গায়ত্রীশিরঃ বলিয়াছেন—'ভূর্ভুবঃ সুবরোম্'। সুতরাং ওঙ্কার (এবং অপরাপর বীজমন্ত্রে) উক্ত ত্রয়ী (ব্যাহৃতিত্রয় এবং যথাক্রমে ঋক্ যজুঃ, সাম) কল্পিত হইয়াছে। অতএব, প্রণবাদি জপই পরং তপঃ।

পুনশ্চ, মন্ত্রকে ভূঃ এইরূপে জানিও। শ্রীগুরু মন্ত্রে যে শক্তিসঞ্চার করেন দীক্ষা দানকালে বিশেষতঃ (দৈক্ষচোদনা), সেটি ভুবঃ। আর, ইষ্টে যে অনন্ত জ্যোতীরস সেটিকে ধারারূপে অবিচ্ছেদে 'দোহন' (ইষ্ট-সমাপত্তি)—ইহা স্বঃ বলিয়া জানিবে। এইভাবে তেজের ত্রিধাত্ব এবং তপের ত্রিধাত্ব যে যথার্থ জানে, তার জানিতে বাকি কি থাকে? দৃঢ়ভাবে মন্ত্র জপ করিয়াও যদি ভাব (মনসি) আমার কর্ম (নিজকৃতং) কোন কাজেরই হইতেছে না (তুচ্ছং); যদি ন্যাস, ধ্যান, হোম এসব আশ্রয় করিয়াও (শ্রয়ন) মনে হয়—আমার শরণ নেওয়াই তো হয় নাই (ন এষি শরণম্); যদি হৃদয়ের অনুকূল (হৃদ্যং) স্তোত্র গান করিয়াও (স্তুবন্) ভাব—কৈ আমার হৃদয়ের বিগুণতা তো গেল না (বিগুণতাং চেদুপগতঃ), তবে (ওগো ভাববিধুর জপসাধক) স্মরণ কর যে 'জপ' এই অক্ষর দুটিই যেন তোমায় ডাকিয়া বলিতেছে—তোমার সকল কর্ম (জপাদি) 'যজন'রূপে ভাবনা করিতে অভ্যাস কর (যজন পরং—জকার ও পকার)। ভাল, কিন্তু কোন্ অগ্নিতে? জ্ঞানাগ্নি ও প্রেমাগ্নি (যথাক্রমে জকার ও পকার লও)! [যথা—যেই বলিলে ওঁ আত্মনে নমঃ, অমনি ভাব আত্মাকে স্থূলাভিমানী ব্যষ্টি-সমষ্টিচৈতন্যরূপে বিশ্ববিরাট; ওঁ অন্তরাত্মনে নমঃ বলিয়া ভাব সূক্ষ্মাভিমানী ব্যষ্টিসমষ্টিচৈতন্যকে-তৈজসহিরণ্যগর্ভ; ওঁ পরমাত্মনে নমঃ বলিয়া ভাব কারণাভিমানী ব্যষ্টিসমষ্টিচৈতন্য প্রাজ্ঞ-ঈশ্বর। প্রেমযাগেও অনুরূপ ভাবনা কর—জীবাত্মার সন্ধিনী, সংবিৎ, হ্লাদিনী ত্রয়কে যথাক্রমে পূর্ণৈকসচ্চিদানন্দস্বরূপেই আহুতি দিতেছি ইত্যাদি।]

শেষে এই কারিকাটির অর্থ ভাবনা করতঃ ১৬।১৭ সূত্র দুইটির অর্থ বিস্তারে মনোনিবেশ কর:—

বীজ-মুচ্ছূনতাং যাতি বিশ্বণ্যাপি তথাগতি।
ঋধ্যতি প্রণবে মাত্রা তপসা তদ্ধি চীয়তে॥৭২

বীজ পুঁতিয়া দেখি সেটি অঙ্কুরোদ্গমের আগে ফুলিয়া উঠিতেছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজাণু, বীজকোষ প্রভৃতিতেও তাই দেখি (Swelling before cell division); জড়াণু প্রভৃতিতেও খুব সম্ভবতঃ তাই। উচ্ছূনতাটি বাড়া কমা দুদিকেই হইতে পারে। আবার বিরাট বিশ্বকেও উচ্ছূনধর্ম্মী (Expanding) দেখা যাইতেছে। প্রণবাদিতে অর্দ্ধমাত্রারূপে মাত্রার ঋদ্ধি হইয়া থাকে—নাদ ও বিন্দু এই দুই পরম সীমাভিমুখে। কেন এসব? যেহেতু (হি) মূলে যে (তৎ) ব্রহ্মবস্তু (উপাদানের উপাদান, নিমিত্তের নিমিত্ত), সেটি 'তপসা চীয়তে'।

ব্যাহৃতি সপ্তক সূত্রাণি

১৮। অয়মিতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং ভূরিতি॥
১৯। অসাবিতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং স্বরিতি॥
২০। উভয় প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং ভুবরিতি॥
২১। উভয় প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং মহরিতি॥
২২। অসীতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং জন ইতি॥
২৩। অস্মীতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং তপ ইতি॥
২৪। অস্তীতি প্রত্যয়প্রতিযোগিত্বং সত্যমিতি॥

অথ কারিকাবলী
(সামান্যতো দিগ্‌দর্শনী)

বিধূয় ক্ষিপ্রং ধূলিকণমবরং ব্রহ্ম দহরং
পদা পিষ্টাং বল্লীং শবলকুসুমাং বোপনিষদম্।

সকৃৎ ত্যক্তং পত্রাৎ পৃষদপি বৃহচ্ছান্দস মৃতং
ন মন্যে গুল্মে গুঞ্জিত মশরুতং সাম সুমহৎ॥৭৩

মহা ব্যোম্নি ব্যক্তং নয়ন পথগং চিত্রমখিলং
তদপ্যান্তে সর্ব্বং রহসি কণিকায়াং নিপুটিতম্।
ইহান্তে যত্তস্য ক্বচিদপি বিসৃষ্টৌ ন বিরহোঽ
ত একার্ণং বিদ্ধি শ্রুতি-নিবহ-বাচো বিবিদিষুঃ॥৭৪

ব্রহ্মার্ণং তং পরিগণয় যো ব্রহ্মরূপৈক বর্ণো
ব্রহ্মাণ্ডে যৎ তদপি তদতীতং নিধত্তে মহিম্নি।
একার্ণর্ত্তং প্রথয়তি বহিশ্ছন্দসা বহ্বৃচাং বাক্
সাম্নোদ্গীতঃ স্বরইতি যজুর্যাজয়েদ্ ভূর্ভুবঃস্বঃ॥৭৫

বঙ্গানুবাদ

ভূরাদি ব্যাহৃতি অথবা প্রণবাদি বীজের অবয়ব তো কয়েকটি মাত্র অক্ষর লইয়া গঠিত। তার ভিতরে এত তত্ত্ব, শক্তি ও আকৃতির ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করিতে যাওয়া কি কল্পনার 'কসরৎ' মাত্র নহে? আচ্ছা, আকারে ছোট বলিয়া তো কেহই এতদিন এক ক্ষুদ্র বটকণিকা অথবা মাতৃজঠরে এক জীবাণুকে 'নগণ্য' মনে করে নাই; আর, হালের বিজ্ঞান তো এক ধূলিরেণু, জলবিন্দু অথবা তদপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র পদার্থে মহাবিস্ময়কর ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইতেছে, শুধু থিওরিতে নয়, বাস্তব প্রয়োগেও। এইজন্য প্রথম কারিকায় বলা হইতেছে—পদসংলগ্ন একটা ধূলিকণ তো তাড়াতাড়ি ঝাড়িয়া ফেলি (ক্ষিপ্রং বিধুয়), কিন্তু একটিবারও মনে ভাবি নাই তো (ন মন্যে) যে সে নগণ্য ধূলিকণ দহর (সূক্ষ্মরূপ) ব্রহ্মই! পথে চলিতে নবোদ্গত শষ্পরাজির মাঝে লুকান নানাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমে অলঙ্কৃতা কোন লতিকাটিকে (বল্লীং শবল কুসুমাং) পদে নিষ্পেষণ করিয়া যাই (পদা পিষ্টাং), কিন্তু একটিবারও মনে ভাবি নাই তো (ন মন্যে) যে—ঐ পিষ্ট লতিকা এক মহতী মৌন-উপনিষৎ (বোপনিষদম্)! আবার, ঐ যে পত্রচ্যুত (পত্রাৎ) একটি বিন্দু জল (পৃষৎ) আমার অঙ্গে একটিবার (সকৃৎ) পতিত হইল, কৈ ভাবি নাই তো (ন মন্যে) যে—ঐ

ক্ষরিত বিন্দুটি হংসবতী ঋকে উদ্দিষ্ট (ছান্দস) 'ঋতং বৃহৎ', তার এক কণাও কম নয়! পুনশ্চ, ঐ যে গুল্মে মশকটি গুন গুন রব করিতেছে (গুঞ্জিত মশরুতং), সেটি যে আবার সুমহান সাম গান (সাম সুমহৎ), তাও তো কোনোদিন ভাবিলাম না!

ক্ষুদ্রের দিক হইতে দেখিলে, বিরাটের দিক হইতেও দেখ। মহাব্যোম আমার নয়ন সমক্ষে প্রসারিত (ব্যক্তং নয়নপথগং) যে অখিলের ছবি (চিত্রমখিলং), সে মহাবিপুলের ছবি, সেটি সমস্তই (তদপ্যাস্তে সর্ব্বং) রহিয়াছে সূক্ষ্ম গুপ্ত চিত্রের মত গুটান' (রহসি নিপুটিতং) একটি কণিকার ভিতরেই। আবার, এখানে যাহা আছে (ইহাস্তে যৎ), ঐ বিচিত্র সৃষ্টির মাঝারে (বিসৃষ্টৌ) কোথাও (ক্বচিদপি) তার বিরহ (অভাব) নাই। 'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ'। এইজন্য (অতঃ) বেদাগমাদির নিখিল বাণী (শ্রুতি নিবহবাচঃ) যদি জানিতে চাও (বিবিদিষু), তবে কি করিবে? একটি অক্ষর বা বর্ণকেই তত্ত্বতঃ জান (একার্ণং বিদ্ধি)।

অতএব প্রণবের অকারাদি, ব্যাহৃতির বকারাদি এক একটি বর্ণকে 'ব্রহ্মার্ণ' বলিয়া পরিগণনা করিও। প্রত্যেক বর্ণই ব্রহ্মরূপ, কাজেই নিখিল শক্তি ও ব্যঞ্জনা তাতে নিহিত। ব্রহ্মার্ণ আপন মহিমাতে (মহিম্নি) কেবল যে ব্যক্তাব্যক্তরূপ ব্রহ্মাণ্ডের নিধান (নিধত্তে) এমন নয়, ব্রহ্মাণ্ডেরও অতীত (transcendent) যাহা কিছু (তদতীতং) তারও নিধান। এই নিমিত্ত মন্ত্রের ব্রহ্মাণ্ড পাটনী শক্তি আছে। আমরা দেখিয়াছি যে, বিশেষতঃ অনুচ্চার্যা যে অর্দ্ধমাত্রা তাঁর আশ্রয়েই এটি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। একটি অর্ণের যেটি ঋতং, কিনা যথার্থ-গতি-স্থিতি-পরিণতিরূপ, সেটিকে বহুমন্ত্রময়ী ছন্দো গ্রথিতা যে ঋক্ (বহ্বৃচাং বাক্), সেই ঋঙ্মন্ত্র যেন বাহিরে (স্থূল বৈখরীরূপে) বিস্তার করিয়াছেন (প্রথয়তি বহিঃ)। সাম বর্ণের যেটি স্বাভাবিক স্বর, সেটিকে উদ্‌গান করিয়াছেন। আর, যজুঃ সেই ঋতং এবং স্বর সমন্বিত অর্ণদ্বারা 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' এইভাবে যাগ করিয়াছেন (যজু র্যাজয়েদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতি)।

ধ্রুবস্বরাদ্ যথা রাগা স্তায়ন্তে ভৈরবাদয়ঃ।
সিতাদ্ বা বর্ণবৈচিত্র্যং সংখ্যানমেকতো যথা॥৭৬
একস্মাদেব মুখ্যাচ্চ প্রাণাঃ পঞ্চ দশাপি বা।
চৈকস্মান্ মহতস্তদ্‌বদ্ ব্রহ্মার্ণাদ্ বাঙময়ং জগৎ॥৭৭

রসায়নে যথা সংখ্যাকৃত্যাদিভির্নিরূপ্যতে।
মৌলিক স্পন্দরূপাণাং সঙ্ঘাতস্য বিশিষ্টতা॥৭৮
ব্রহ্মার্ণানাং তথা সংখ্যা কৃত্যাকাঙ্ক্ষাঃ প্রসজ্যতা।
ব্যাবৃত্তি-ব্যাহৃতী যড়্ভি রেতাভিরিদমর্থতা॥৭৯

অনুবাদঃ—কোনো ধ্রুবস্বরকে আধার করিয়া ভৈরবাদিরাগের যেমনধারা তায়ন (রূপায়ণ) হইয়া থাকে, সেইরূপ অ, উ প্রভৃতি এক একটি বর্ণকে আধার করিয়া শক্তি, আকৃতি ও ভাবের (অর্থের) অশেষ বিচিত্র অভিব্যক্তি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। (ঐ এক ধ্রুবস্বর বা অকারাদি একটি বর্ণ আধার হইল বটে, কিন্তু 'আকর' হইল কি? তাই বলা হইতেছে—) একমাত্র শুভ্রবর্ণ যেমন পীতলোহিতাদি অশেষ বর্ণালির আকর হইয়া থাকে অ, উ, প্রভৃতি এক একটি বর্ণও তদ্রূপ। (আচ্ছা, আধার ও আকর এই দুই না হয় হইল, কিন্তু আপূরক?) 'এক' এই আদিম সংখ্যা যেমন আপনাকে পূরণ হরণ করতঃ অনন্ত সংখ্যা বিস্তার করে, অকারাদি এক একটি বর্ণও তদ্রূপ। সুতরাং আধার-আকর-আপূরক সর্বতোভাবেই একটি মহান ব্রহ্মার্ণ হইতে এই অশেষ বৈচিত্র্যময় বাঙ্ময় (অর্থপ্রত্যয়সহ) জগৎ প্রপঞ্চিত হইয়াছে জানিও। [আচ্ছা, ঐ তিনটি কর্ম ছাড়া 'ব্যাহরণ' (বিবিচ্য আহরণং) রূপ সৃষ্টির আসল কর্মটিও তো চাই।] তাই, একই মুখ্যপ্রাণ যেমন আপনাকে পাঁচ, দশ ইত্যাদিরূপে অভিব্যক্ত করে, অকারাদি বর্ণও তদ্রূপ মুখ্যপ্রাণ-ধর্মী। [বেশ, একটি বর্ণ বহুই হইতেছে কিরূপে, আবার সে বহুও (মূলবর্ণগুলি) অশেষ যৌগিক (সংযুক্ত) আকার পাইতেছে কেন? উপমা দেওয়া ছাড়া এ 'কেন'র উত্তর নাই।] যেমন, রসায়ন বিজ্ঞানে দেখি—মূলে কতিপয় স্পন্দ-আকৃতি (vibratory pattern) থেকে সংখ্যা, আকৃতি (number and form) ইত্যাদির বিচিত্রতা বশতঃ অশেষ পদার্থ বৈচিত্র্য (সঙ্ঘাত) সম্ভাবিত হইয়া থাকে। জৈববিজ্ঞানের অনুরূপ হইতে দেখি। এ দৃষ্টান্তে যেরূপ, দার্ষ্টান্তিকেও তদ্রূপ—কোনও একটি বর্ণ (ধর, অ, ই, উ, ক) কোথায় কিরূপ শক্তি (অভিধাদি) অভিব্যক্ত করিবে, সেটি নির্ভর করিতেছে এই ছয়টি লিঙ্গের উপরঃ—সংখ্যা, আকৃতি, আকাঙ্ক্ষা, প্রসজ্যতা, ব্যাবৃত্তি (প্রতিষেধ) এবং ব্যাহৃতি। এ ছয়ের মধ্যে শেষেরটিই মুখ্য, তাতেই অন্য পাঁচটির অন্তর্ভাব। ঐ ছয়টির দ্বারা নিরূপিত হইবে—

এই স্থলে এই বর্ণের এইটি অর্থ বা ভাব (ইদমর্থতা)। এ ছয়টির পরিচয় পূর্বে কিছু মিলিয়াছে, পরেও মিলিবে।

(বিশেষতো বিশ্লেষণী)

শক্ত্যাকৃতিক্রিয়াভির্হি পূর্ণাভির্বিন্দুরূপতঃ।
ব্রহ্মানুপ্রাবিশৎ প্রাণাং স্ততোঽর্ণা অসুভৃদ্‌বরাঃ॥৮০
হংসোহংস ইতি শশ্বদবশো যো জপোঽসুভিঃ।
এষ জাগর্ত্তি তেনার্ণঃ স্বাপে বিশ্বস্য বৈ পুমান্॥৮১
অসূন্ বিভর্ত্তি চার্ণোঽয় মস্বগ্ন্যোরপ্যনন্যতা।
প্রাণাগ্নিহোত্র নিষ্পত্তে র্বাচোঽগ্নি র্দৈবতং হ্যতঃ॥৮২
প্রণবশ্চ রসো বাচামগ্নি-দৈবত উচ্যতে॥৮৩
অপ্রমেয়ানিরুক্তস্যাদিমেয়ং মানদা যতঃ।
ব্যঞ্জনাদি স্বরাদিভ্যামতোহি মাতৃকা মতা॥৮৪
মেতি চিচ্ছক্তি রাদ্যা যা কার্য্যকারকতা চ কা।
তৃকারাদ্ দন্ত্যমূর্দ্ধন্যাদ্ দ্বয়োর্ব্যাপ্রিয়মাণতা।
কা ভূঃ মা স্বরিতি দ্বন্দ্বে তৃর্ভুবরিতি যোজনা॥৮৫

অনুবাদ ঃ—ব্রহ্ম আপন প্রাণরূপেও অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি যে অনুপ্রবেশ বিন্দুকে অধিকার করতঃই হইয়া থাকে। ক্রিয়া শক্তি ও আকৃতি তিনেতেই পূর্ণ (অর্থাৎ কোন ভাবেই ন্যূনতা বা পরিচ্ছেদ নাই এমন) বিন্দুরূপে তিনি প্রাণে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এবম্প্রকার প্রাণে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশই 'অর্ণ'। সুতরাং, অর্ণই প্রাণসমূহের মুখ্য ভর্তা। অন্নরসাদি গৌণ। **অর্ণই প্রাণের মুখ্য অন্ন।**

"হংসঃ হংসঃ" এই যে নিরন্তর (শশ্বৎ) অজপা জপ প্রাণেরা অবশের মত করিয়া চলিয়াছে, (সকল মাতৃকাবর্ণ সম্পুটিত) সেই জপের দ্বারা ঐ 'অর্ণ' রূপ পুরুষ (পুমান্) জাগিয়া থাকেন (জাগর্ত্তি)। (অজপা জপটি প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃকামালা জপ, 'হংসঃ' ইহার সম্পুটিত রূপ। বিসর্গ এই মালার 'মেরু'। এই 'মেরু' লঙ্ঘন করতঃই আমাদের সাধারণ অজপা জপ (শ্বাসক্রিয়া) হইতেছে। ফলে, হরণের

আধিক্য—running down. 'মেরু লঙ্ঘন না করিয়া জপে কি হয়? 'হংসঃ সোঽহম্'।) এই প্রসঙ্গে এই কারিকাটি স্মরণ রাখিও:—

হংসোহংস ইতি শ্বাসেঽজপাং জপ্ত্বা মুমূর্ষসি।
রুমেরু 'প্যাপ্যনুলঙ্ঘ্য জিজীবিষেঃ শতং সমাঃ॥৮৬

তোমার শ্বাস ক্রিয়ায় 'হংসঃ হংসঃ' এই অজপা অবশে জপ করতঃ মরিতে ইচ্ছা করিয়াছ; কিন্তু বিসর্গ (রু) রূপ মেরুটি লঙ্ঘন না করিয়া (শ্রীগুরুদত্ত উপায়ে) ঐ অজপা জপে শত বর্ষ (সমাঃ) বাঁচিতে (অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু হইতে) ইচ্ছা কর।

বাকের দেবতা অগ্নি কেন তা বলা হইতেছে। অর্ণরূপী পুমান্ 'অসুন্' প্রাণসমূহকে ভরণ করিতেছেন (হরণ পূরণের অনুপাত রক্ষা করিয়া) এবং অসুকে অন্নরূপে বরণ করতঃ বর্ণও হইতেছেন। অসু এবং অগ্নি এতদুভয়ের অনন্যতা (মূলতঃ অভেদ) ও শ্রুতি, অনুভব এবং বিচার সিদ্ধ। প্রাণাগ্নি হোত্র (ওঁ প্রাণায় স্বাহা) এই অভেদ ভাবনা ব্যতিরেকে নিষ্পাদিত হয় না। সুতরাং মূলে যাইয়া সন্ধান লইলে বুঝা যায় যে—বাকের দৈবত অগ্নি। [এ স্থলে কারিকার অনুবাদ মাত্র দেওয়া হইল, তবে এই প্রসঙ্গে অপর এক কারিকার্থও ভাবনা কর:—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী দগ্নি র্দিবৌকসাং মুখম্।
মুখং সমাশ্রিতো বর্ণো হ্যতোঽগ্নির্দৈবতং গিরাম্॥৮৭

বেদে পুরুষসূক্ত বলিতেছেন—'ব্রাহ্মণ' তাঁর 'মুখ' হইয়াছিলেন। বেদে অগ্নি দেবতাদিগের পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) এবং 'মুখ' রূপে বহুধা শ্রুত হইয়াছেন। বর্ণময়ী যে বাক্ সেটি বিশেষভাবে 'মুখ'কেই আশ্রয় করিয়াছে। সুতরাং, ('মুখ' এই তত্ত্বটিকে গভীর ও অভেদ দৃষ্টিতে দেখিলে) অগ্নিই বাকের (গিরাং) দেবতা।] [পূর্ব্বের এবং এই কারিকার মধ্যে যথাক্রমে 'অসু' (প্রাণ) এবং 'মুখ' এই দুটি শব্দকে গভীরভাবে গ্রহণ করতঃ বাক্ এবং অগ্নির সম্বন্ধ যোজনা করা হইল, এটি লক্ষ্য করিও। মুখের নামান্তর 'আস্য' ইহাও স্মরণ রাখিও। কাজেই, 'অসু' এবং 'আস্য' এই দুইটি হইতেছে, যথাক্রমে যোজক লিঙ্গ।] পুনশ্চ—

সূর্য্যাগ্নিসোমলিঙ্গাভি র্মন্ত্র্যতে মাতৃকা পরা।
ঋগ্‌ভির্হি ত্রিপুরা বাচা মগ্নির্দেব স্ত্রিরূপকঃ॥৮৮

যেহেতু (হি) পরমা মাতৃকারূপিণী ত্রিপুরা সূর্য (সবিতা), অগ্নি এবং সোম (সোমার্দ্ধধারি—ত্র্যম্বক)—এই তিনের নিরূপক তিনটি ঋঙ্‌মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রিতা, সুতরাং ঐ তিনরূপে অভিব্যক্ত অগ্নি বাক্ সকলের দেবতা জানিবে। আবার—

চেতোঽধরারণিং কৃত্বা প্রাণাং শ্চোত্তরারণিম্
বাচোহি মন্থনং তস্মাদ্ দেবস্তুল্যভবোঽনলঃ॥৮৯

উত্তর এবং অধর অরণিদ্বয়ের মন্থনে অনল উৎপন্ন হন; সেইরূপ চেতঃ এবং প্রাণ এই দুই অধর ও উত্তর অরণি মন্থনে বাক্ উৎপন্ন। বাক্ ও অগ্নির এইরূপ 'তুল্যভবতা' আছে বলিয়া, অর্থাৎ উভয়েই যোগ্য অরণিদ্বয় মন্থনে আবির্ভূত বলিয়া, অগ্নিকে বাকের দেবতা বলা হইতেছে। 'অরণিদ্বয়' এক সাধারণ আকৃতি (generic pattern); এদের মন্থন এক সাধারণ ক্রিয়া (generic function); অগ্নির আবির্ভাব এর সাধারণ ফল (generic resultant)। চেতঃ এবং প্রাণ, তাদের মন্থন, এবং মন্থনোৎপন্ন বাক্—ঐ তিনের এক বিশেষ বিশেষ রূপ। সামান্যাধিকারীকে বিশেষের সম্বন্ধে 'দেবতা' ভাবনা প্রাচীন শিষ্টকল্পনাজুষ্ট। যথা, আদিত্য দর্শনেন্দ্রিয়ের দেবতা। পুনশ্চ—

অগ্নির্যথা বিশ্বচক্রস্য নাভি
ররাংশ্চ নেমিঞ্চ ধত্তে বিসৃজ্য।
তথা প্রপঞ্চং হি বাচাং পরাবাক্
সূতে বিধত্তে চ বীজাত্মশক্ত্যা॥৯০

শ্রুতি অগ্নিকে এই বিশ্বচক্রের নাভিতে বসাইয়াছেন; অগ্নি নাভিতে রহিয়া বিশ্বচক্রের অরসমূহ বিস্তার করিয়াছেন, এবং অর ও নেমি এ দুই-ই ধারণ করিয়াছেন। পরমা যে বাক (যথা ওঁঙ্কার), তাও কি বাক্‌প্রভব এই বিশ্বকে সেইভাবেই নিখিলের নাভিস্থিতা আপন বীজশক্তি দ্বারা প্রপঞ্চিত করেন নাই? অবশ্যই

তিনি সেটি করিয়াছেন। সুতরাং বিশ্বের নাভিরূপতা, অগ্নির মত বাকেরও রহিয়াছে। বিশেষ এই যে, যখন 'রূপের' বিসৃষ্টি ও বিধান করেন, তখন তাঁকে বলি অগ্নি; আর, 'নামের' বিসৃষ্টি ও বিধানকারিণী হইলে তিনি বাক্।

ওঁঙ্কারের ও 'অগ্নির্দেবতা' সম্বন্ধে নীচের কারিকাটি ভাবনা কর:—

অকারপূর্ব্বো ম উকার মধ্যো
নাদশ্চ বিন্দুশ্চ কলা চ চোর্দ্ধম্।
এতাঃ শিখাঃ সপ্ত তথা চ ধাম্নাং
ছন্দাংসি সপ্তেতি বিদুস্তমগ্নিম্ ॥৯১

অগ্রে অকার এবং মধ্যে উকার লইয়া প্রণবের মকার—এই ত্রিমাত্রা; নাদ, বিন্দু, কলা এবং কলাতীত (চোর্দ্ধং); প্রণবের এই সপ্ত অবয়ব ব্রহ্মরূপ অগ্নির সপ্তশিখা (সপ্তধা বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ)। অগ্নি ভূরাদি সপ্তধাম (খ্যাতি) রূপে অভিব্যক্ত; প্রণবের ঐ সপ্ত অবয়ব ঐ সপ্ত-ধামে অন্বিত (অর্থাৎ, অকার ভূঃ, উকার ভুবঃ, মকার স্বঃ, নাদ মহঃ, বিন্দু জন, কলা বা কলন শক্তি তপঃ এবং তদুর্দ্ধ সত্য)। আবার, অগ্নির সপ্ত ছন্দোরূপে যে প্রকাশ, তার সঙ্গেও ঐ সপ্ত অবয়বের অন্বয় রহিয়াছে (পর এটি বিশেষ ভাবে দেখা যাইবে)। সুতরাং এই অগ্নিকে (ঋষিগণ) প্রণবেরও দেবতারূপে জানিয়াছেন (বিদুঃ)।

প্রণবমূলা বাকের দেবতা যে অগ্নি কেন, সে সম্বন্ধে উপরের কয়েকটি রহস্য কারিকায় দিগ্‌দর্শন করা হইল মাত্র। পরে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবকাশ আসিবে। বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' প্রপঞ্চিত হইয়াছে। বাকের দেবতা অগ্নি—এই প্রসঙ্গেও প্রকারান্তরে সেই 'পঞ্চাগ্নি' ভাবনা করিও।

আদৌ বাগিন্ধনে তেঽলসিতহুতভুজং দীপয়ের্মন্থনেন
স্বাকূত্যা শ্রীগুরোর্বাক্ স্ফুরদনিলসখৈ র্মোচয়ে ধূর্মজালম্।
শ্রদ্ধাবেদৌ নিধায় প্রথয় চ হবিষা বীজরূপেণ বাচং
ভস্মন্যঙ্গারশেষে ভবসি ন মণিকৃদ্ বহ্নিপঞ্চাবিদগ্ধঃ ॥৯২

(বহ্নিপঞ্চারসজ্ঞঃ)

বৃথাভাষণ, মৃষাভাষণ ইত্যাদি—অনৃত আচরণের ফলে তোমার বাক্‌রূপ ইন্ধনে অগ্নি (তেজঃ, উর্জ্জঃ ওজঃ ইত্যাদি রূপা শক্তির উৎস) অলসিত (নির্ব্বাপিত প্রায়) হইয়াই রহিয়াছেন যে! তোমার বাক্ তাই নিঃসত্ত্বা অথবা তুচ্ছসত্ত্বা হইয়া রহিয়াছে। তার স্তিমিত অগ্নি (বীর্য) কে যদি উদ্‌বুদ্ধ করিতে চাও তো প্রথমে কি করিবে বল দেখি? আপন যে আকুতি (ঋত সত্য ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হবার যে আন্তর আস্পৃহা), তার দ্বারাই আপন বাক্‌রূপ ইন্ধনকে সযত্নে মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ, ঋত হইতে, সত্য হইতে প্রমাদে পতিত না হই—এই শুভ এবং দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা তোমার আপন বাক্‌কে সংস্কৃত কর। ইহাই তোমার বাগিন্ধনের প্রাথমিক অগ্নিকর্ম। এই প্রথম কর্মটির সমারম্ভ তোমাকে নিজেই করিতে হইবে। এর সমাপন অবশ্য পরের কথা। প্রথমটির ঠিক ঠিক সূচনা হইলেই তবে না শ্রীগুরুশক্তির ঠিকানা মিলে! ঠিকানা মিলিলে আরব্ধ হয় দ্বিতীয় পর্ব (এই বাক্‌রূপ ইন্ধনে অগ্নিমন্থন কর্মে)। তোমার বাক্ আপন শুভাগ্রহে এবং প্রযত্নে সংস্কৃত হইয়া একটুখানি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে বটে, এবং তাতে কিছু কিছু শক্তির সাড়া (অগ্নিস্ফুলিঙ্গা) পাইতেছ বটে, কিন্তু সে অগ্নি আবির্ভাব তো নিয়ত নয়, সম্যক্‌ও নয়; আর, তদুপরি তোমার 'ভিজা কাষ্ঠে' আগুন তোমাকে ধূমে আকুল করিতেছে! সে আগুন জ্বালাইতেও প্রাণান্ত, জীয়াইতেও প্রাণান্ত! সেইজন্য—শ্রীগুরুবাক্য তোমার আত্মেন্ধনে শক্তিসঞ্চার করা চাই-ই। শ্রীগুরুবাক্য হইতে স্বতঃস্ফূর্ত যে দিব্যঅগ্নি সেটি অগ্নি এবং অগ্নিসখা যে বায়ু এ দুয়ের কর্মটি নির্বাহ করিয়া থাকে—তোমার অগ্নিকে অনির্বাণ উদ্দীপিত করে, এবং তার ধূমজাল (তামস রাজস মল) ও বিদূরিত করে (শ্রীগুরোর্বাক্ স্ফুরদনিলসখৈ র্মোচয়ে র্ধূমজালম্)। শ্রীগুরুবক্ত্র হইতে যে বাক্‌রূপী অগ্নি নির্গত হন, সেটি অগ্নি ও বায়ুর সম্মিলিত রূপ; এইজন্য 'অনিল সখৈঃ'।

এইবার সেই শ্রীগুরুকৃপাসঞ্জাত অগ্নিকে শ্রদ্ধাবেদিতে স্থাপন করিয়াছ (শ্রদ্ধাবেদৌ নিধায়), এবং শ্রীগুরুদত্ত বীজরূপ হবিঃ নিষ্ঠাসহকারে তোমার জপযাগাগ্নিতে প্রক্ষেপ করিয়া তাকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করিতেছ (প্রথয়সি)। এইটি তোমার অগ্নিকর্মের তৃতীয় পর্ব।

কিন্তু ইহাতেই কি শেষ? ইন্ধন হবিঃকে সহায় পাইয়া বেশই তো জ্বলিতেছে! কিন্তু ক্রিয়া মাত্রকেই আপন প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হইতে হয়ই যে! ইন্ধন তো পরিমিত,

পরিণামী পদার্থ! সে পুড়িয়া ভস্মের মাঝে অঙ্গার হইয়া পড়িয়া থাকিতে চায় যে। এটি প্রকৃতির আপন প্রবণতা। তুমি এ থেকে রেহাই পাইবে কিরূপে? ভস্মের মাঝে যে অঙ্গার শেষ, সেটিকে কোনও অদ্ভুত আন্তর রসায়নে যদি হীরা বানাইয়া লইবার উপায় মিলাইতে পার তবেই না প্রকৃতির প্রবণতার পাশটি তুমি একান্তভাবে কাটাইলে! অঙ্গারকে 'পরম রসায়নে' হীরা করিতে হইবে। হীরা হইলে সেটি স্বতঃ সমুজ্জ্বল, ক্ষয়হীন, চ্যুতিহীন।

কিন্তু, সে নিমিত্ত পূর্বোক্ত ঐ তিনটিই নয়, আরও দুটি পর্বে (জ্যোতিঃ এবং রস, বিজ্ঞান এবং বিভাব) তোমার বহ্নিকর্মটি সমাপন করিতে হইবে। অর্থাৎ বহ্নিপঞ্চকে তোমায় রসজ্ঞ (বহ্নি রসায়ন পারগ) ও বিদগ্ধ হইতে হইবে। অন্যথা 'ভবসি ন মণিকৃৎ'! আচ্ছা, এ পরম বহ্নিরসায়ন কে মিলাইবেন? শ্রীগুরুই মিলাইবেন। তুমি তৃতীয় পর্বে আসিয়া আপন ক্রতুসিদ্ধি অভিমানে আপনাকে 'ভস্মে অঙ্গার শেষ' করিয়া ফেলিয়া রাখিও না যেন। এই শ্লোকটিকে প্রণবাদি জপে আবশ্যক পঞ্চমাত্রারূপেও বুঝিয়া দেখিও। ছন্দঃ পঞ্চকের শেষ দুটির কথাও মনে করিও।

বাগিন্ধনের মন্থন এবং উদ্দীপনরূপ বহ্নিকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ তৃতীয় পর্বটিতে (অর্থাৎ সমন্বয়ি ছন্দে) আসিয়া বিশেষতঃ সাবধান হইতে হয়। ঐ স্থলে তোমার যেটি এত সাধনের অগ্নীন্ধন তার ভস্ম ও অঙ্গার রূপ হবার এক প্রাকৃত প্রবণতা আছে জানিও। তোমার নিজের ভিতরে (subjectively) প্রায়শঃ অভিমান আকারে এর সূচনা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এটা কেবল তোমার ঘরোয়া কারণেই ঘটে না। এর পিছনে এক দুরতিক্রম্য প্রাকৃত প্রবণতাও আছে। বৈজ্ঞানিকেরা 'জড় শক্তি'র তরফ হইতে Entropy বা Cosmic Running down বলেন। উর্দ্ধগ্রামের শক্তিপুঞ্জ এর ফলে অধোগ হইতে চায়; শক্তির উন্নয়ন ও ঘনীভাবের স্থলে অবনয়ন ও বিরলভাব দেখা দিতে থাকে। এটি Objective Law, তোমার কর্মে, সাধনাতেও উদাহৃত হইতেছে। তাই সমিদ্ধ অগ্নি—অগ্নীন্ধন ভস্ম ও অঙ্গার হইতে যায়। সেটি কাটাইবার জন্য তোমাকে 'আঙ্গিরস-রসায়নে' শ্রীগুরুপ্রসাদে বিদগ্ধ হইতে হইবে। সব কিছুর যাহা যাহা 'অঙ্গা' (constituent) তাদের 'রস' (Essence together with basic pattern) টির নিষ্কর্ষ যাতে করিতে পার তাই করিতে হইবে। বিশেষভাবে অনুগ্রহশক্তির একান্ত সমাশ্রয় ব্যতীত এটি ঘটিবার নয়। ছন্দের শেষ দুটি পাদে তোমায় লইয়া

যাইবেন তিনিই—যাঁর 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' তাঁকে ছাড়িয়া এতটুকু 'হামবড়া' ভাব থাকিতে ঐ অঙ্গারপরিণাম থেকে বাঁচিবার যো নেই।

যদিন্ধনং তদঙ্গারঃ স্বভাব স্বাঙ্গ ধর্ম্মতঃ।
অঙ্গারে মণিবজ্রত্ব মাঙ্গিরস রসায়নাৎ॥৯৩

স্বভাবের স্বাঙ্গ, কিনা আপন অঙ্গীভূত যাহা কিছু তাদের ধর্মই এই যে যেটি ইন্ধন সেটি অঙ্গার হইবে। কিন্তু অঙ্গার মণিবজ্র (হীরক) হইবে কি উপায়ে বল তো? এই আঙ্গিরস রসায়ন দ্বারা। এই আঙ্গিরসরসায়নশালায় প্রবেশ করিয়া নিজেকে এইভাবে ক্রমাগত 'পরখ' (test) করিয়া যাইও:—

কিমধুনা মধুনা মধুরা গিরো
বিসদৃশা সদৃশা দৃশিগা দৃশা।
অপহৃতং সুহৃদাপি হৃদাহৃতং
চিররুচৌ চিতি চারু বিচারণা॥৯৪

আমার জপ এবং ভজনাদির যে বাণী (গিরঃ) তাহা কি মধুচ্ছন্দে এবং বাকের নিগূঢ় আন্তর মধুরসে (মধুনা) এখন (অধুনা) মধুর সুমধুর হইতেছে? আমার নয়নের দৃষ্টি (দৃশা) কি তার (ইষ্টচ্ছন্দঃ—আদি বিষয়ে) বিসদৃশভাব পরিহার করতঃ ইষ্টৈকসদৃশভাবে আসিতেছে এবং নিত্যপ্রকাশরূপ যে শ্রীগুরু এবং শাস্ত্র (দৃশি), তাঁরই ঐকান্তিক অনুগমনে সমর্থ হইতেছে? এ পর্যন্ত দৃষ্টি তো দৃশ্যেই গমন করিয়াছে, কাজেই দৃশিসম্পর্কে সেটি বিসদৃশা ছিল, কিন্তু এইবার কেবলদৃশ্যগা সেটি দৃশিগা হইল কি? হৃদয়ও তো এতদিন অপহৃত হইয়াই ছিল, এবার বুকের পরশমাণিক হইয়া তার চিরসুহৃৎ কি তাকে সকল হারানিধিমিলান আপন বুকের কাছে ফিরাইয়া আনিতেছেন? বাহ্য ও তুচ্ছ বিষয়ে অশোভন বিচারণায় ব্যাপৃত যে বুদ্ধি, সে কি এবার নিত্যপ্রকাশ চিরসুন্দর (চিররুচি) যে চিদানন্দ সত্তা (চিতি), তারই বিচারণায় আপনাকে সুশোভন (চারু) করিয়া লইল?

এ কয়টি আত্মজিজ্ঞাসার নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর যদি বা না পাও, তবু দুর্মনাঃ হইও না। শ্রীগুরুরূপী মহতের একটি কৃপাস্পর্শ যখন লাভ করিয়াছ, তখন যা তোমাতে

হবার নয় মনে করিতেছ, তাও একদিন হইয়া যাইবেই—এই ভরসাতে বুক বাঁধিয়া সাধন তৎপর হও। দেখ—

ন দৃষদি পৃষদেকং শীতলং প্রজ্বলন্ত্যাং
ন চ তমসি তড়িৎত্বিড়্ বিস্ফুরন্তী মুহূর্তম্।
ন চ মরুসিকতাসু প্রাবৃষাং দূরবাতো
মনসি সুমনসাং স্পৃক্ শান্তয়েকা ত্বশান্তে॥৯৫

জ্বলন্ত পাষাণে (দৃষদি) এক ফোঁটা শীতল বারি (পৃষদেকং) পড়িলে শান্তি হয় না, ঘোর আঁধারে এক নিমেষের বিদ্যুৎ চমকেও সেটি হয় না, মরুর তপ্ত বালুরাশিতে কোন্ সুদূর বর্ষার এক পথভোলা স্নিগ্ধ বায়ুর ছোঁয়াচটুকু লাগিলেও সেটি হয় না। ঠিক বটে, কিন্তু (তু) তোমার অধীর অশান্ত মনে (মনসি অশান্তে) যাঁরা সুমনাঃ তাঁদের একটিমাত্র (একা) করুণাপরশ (স্পৃক্) শান্তিসুধা ঢালিয়া দিবে যে! তাঁদের করুণাস্পর্শমাত্র অন্তরে চিরশান্তির উৎসের মুখ খুলিয়া যাবে যে! সুমনস্ মানে যদি 'ফুল' নাও, তবে সে ফুলটি এবং তার পরশটি যে কি বস্তু তাও ভাবিয়া দেখিও।

পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের ভাবার্থ-বিস্তার।
আভিমুখ্য বলে কাহাকে? সংলক্ষ্য এর লক্ষণ

১৬। অভিমুখীন হইলে হয় অভীপ্ষ॥

নৈর্লক্ষ্য, বৈলক্ষ্য, উপলক্ষ্য, এবং অপলক্ষ্য এই চারিটিকে বর্জন করিয়া সংলক্ষ্যে যে ধীরবৃত্তিতা তাহাকে বলে অভিমুখীনতা। গতি যদি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবিহীন হয়, তবে হয় নৈর্লক্ষ্য। জপাদি সাধন করিতেছি কিন্তু ঠিক ধারণা নাই, কিসের জন্য কি উদ্দেশ্যে করিতেছি। হয়তো আর দশজনে করে বলিয়াই আমি করিতেছি। এরূপ লক্ষ্যহীনতাকে পরিহার করিতে হইবে। তারপর বৈলক্ষ্য। লক্ষ্য একটা আছে বটে কিন্তু সেটির অনুসরণে ঋজু পথ ছাড়িয়া আমার বক্রগতি হইল, সুতরাং লক্ষ্য হইতে ন্যূন, অপকৃষ্ট, অবান্তর, এমন কি বিসদৃশ কোনও কিছু আমার লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া পড়িল। এই বৈলক্ষ্যেরই অপর দুইটি প্রকার হইতেছে উপলক্ষ্য এবং অপলক্ষ্য। প্রথমটিতে যেটি আমার প্রকৃত লক্ষ্য সেটির বিসদৃশ, বিপরীত অথবা

বিরুদ্ধ কোন কিছু অনুসরণ করিলাম না বটে, কিন্তু মুখ্য লক্ষ্য যেটি সেটির স্থলে কোন এক গৌণ, অবান্তর লক্ষ্য বসাইলাম, কিন্তু তার ফলে মুখ্যের যেটি সাধন সেটি গৌণের সাধনে পর্যবসিত হইল। ইহাতেও লক্ষ্যহানি। দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ অপলক্ষ্যে, মুখ্যের সঙ্গে বিরোধী বিসম্বাদী কোন এক লক্ষ্য আশ্রয় করিয়া বসিলাম। যেমন জপাদি সাধন দ্বারা কায়, বাক্ এবং চিত্তকে সংযত এবং শান্ত করিব, এইটি হইল আমার মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু এইটি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যদি অপর এমন কোন এক লক্ষ্য আমি আশ্রয় করি যার ফলে আমার কায়, বাক্ এবং মনের অস্থিরতা এবং তার সংস্কার বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে আমি এক অপলক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়াছি। বৈলক্ষ্য এবং তার এই দুইটি রূপকেই যত্নপূর্বক পরিহার করিতে হইবে। এই চারিটি পরিহার পূর্বক যেটিকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতে হইবে, সেটির নাম সংলক্ষ্য। 'সম' এই উপসর্গের দ্বারা এইটি বুঝিতে হইবে যে লক্ষ্য সম্বন্ধে আমার অভিনিবেশ এবং যত্ন সম্যক্‌রূপে এবং সঙ্গতভাবেই হইতেছে। পূর্বে যে 'সমূহ' এবং 'সমর্থের' লক্ষণ আমরা করিয়াছি, আমাদের সাধনে এবং আমাদের লক্ষ্যে সেই লক্ষণ পূরাপূরি বর্তিবে। সেরূপ হইলেই লক্ষ্যটি হয় সংলক্ষ্য। যে ছন্দের দ্বারা এই সংলক্ষ্যে আমরা ধীরভাবে স্থিত হইতে পারি সেই ছন্দকে বলে অভীদ্ধ। ব্রহ্মের অভীদ্ধ তপঃ হইতেই ঋত এবং সত্য জাত হইলেন, একথা শ্রুতি বলিয়াছেন। ব্রহ্মের যেটি 'অভীদ্ধ' তাতে অবশ্য নৈর্লক্ষ্যাদি চতুষ্টয়ের কোন সম্ভাবনাই নাই। ব্রহ্ম সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। আমাদের পক্ষে নৈর্লক্ষ্যাদি চতুষ্টয় আয়াস সহকারে পরিহার করতঃ সংলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার যত্ন করিতে হয়। সংলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠার সংস্কার যখন দৃঢ় হয় তখন হই ধীর, তার পূর্বে নয়।

তপঃ কাহাকে বলে? সৃষ্টিতে তপের স্থান গোড়ায় কেন?

১৭। তেজঃ যদি অভীদ্ধ হয় তবে সেটি হয় তপঃ॥

শ্রুতি বলিয়াছেন—"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"। আবার বলিয়াছেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। পুনশ্চ, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। ব্রহ্ম তপের দ্বারা আপনাকে সঞ্চিত অথবা উপচিত কিনা, বর্দ্ধিত করিলেন। কিন্তু নিরতিশয় ভূমা যে বস্তু সেটি আবার নিজেকে আহৃত, সঞ্চিত, বর্দ্ধিত করিবে কোথায়, কিরূপে? তাহা তো ধারণা করা

যায় না। তবে অবশ্য ব্রহ্মে এই বিশ্ব অব্যাকৃত বীজ ভাবে থাকিতে পারে, আবার তাঁহা হইতে ব্যক্ত বিশ্বরূপে আবির্ভূত হইতে পারে। বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনরূপ কল্পনা করিতে যাইয়া আমাদের বুদ্ধিকে এবংবিধ কল্পনাই করিতে হয়। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে বিশ্বের যেটি অব্যাকৃত অবস্থা (Undifferentiated condition) সেটিকে বলা যায় অদিতি। ইহার এখন পর্যন্ত ছেদ হয় নাই কিন্তু ইহাই আবার আপনাকে অন্ন এবং অন্নাদ ইত্যাদি রূপে ছেদ করিবে। এই ছেদনটি চৈতন্যের অধ্যক্ষতাতেই অবশ্য ঘটিতে পারে, কেননা চৈতন্য ব্যতিরেকে ভোক্তা এবং ভোগ্যের এবং অন্য কোন সম্পর্কের কোন মানে হয় না। অদিতিতে উপহিত যে চৈতন্য, যে চৈতন্যের অধ্যক্ষতায় অদিতি হইতে নিখিল সৃষ্টি হইয়া থাকে সেই চৈতন্যকে বলে কশ্যপ। কশ্যপের দুই ভার্যা—অদিতি ও দিতি। যেটি এখনও বিভক্ত (Differentiated) হয় নাই সেটিও চৈতন্যের অধ্যক্ষতায় রহিয়াছে। চৈতন্যের বাহিরে এবং চৈতন্যনিরপেক্ষভাবে কোন কিছুরই সত্তা অথবা বৃত্তি নাই।

কশ্যপ—অদিতি ও দিতি

এইবার দেখ যে অদিতি এবং দিতি—যেটি অবিভক্ত এবং যেটি বিভক্ত—এই দুইতেই যে "ত" এবং "দ" বর্ণদ্বয়, তাহাদের উচ্চারণ স্থান হইল দন্ত। দন্ত এবং দৎ মূলতঃ একই শব্দ। দন্ত শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন হইতে দন্ত স্থানে বিকল্পে দৎ আদেশও করিয়াছেন বৈয়াকরণেরা। দন্তের মুখ্যবৃত্তি হইল যেটি অন্ন সেটিকে ছেদন করা। সুতরাং "ত" কারের প্রয়োগ করিয়া এইটি সূচিত হইতেছে যে, যে বস্তুটি অদিতি অথবা অব্যাকৃতরূপে বিদ্যমান সেটি এইবার যেন আপনাকে ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। সেটি যেন এইবার আপনাকে বলি দিবে। কিন্তু বলি বা ছেদন কর্মটি এখনও হয় নাই।

তপস্ শব্দের বর্ণ-বিশ্লেষণ এবং ব্যঞ্জনা

তারপর "প" এই বর্ণটির বিচার কর। এটি হইল ওষ্ঠ্য বর্ণ। অন্নগ্রহণ কালে অথবা বাক্যপ্রয়োগ কালে আমরা ওষ্ঠকে কখনও বা ব্যাকৃত বা ব্যাদিত করি, কখনও বা আবৃত বা সংবৃত করি। সুতরাং ওষ্ঠ হইল দ্বিবিধ ক্রিয়ার প্রতীক—যেটি আবৃত রহিয়াছে

সেটিকে ব্যাকৃতকরণ এবং যেটি ব্যাকৃত রহিয়াছে সেটিকে আবৃতকরণ। অর্থাৎ কূর্মের যেটি বৃত্তি, সঙ্কোচ ও প্রসার, সেটি ওষ্ঠ নির্বাহ করিয়া থাকে "Cosmic Valve"। সুতরাং "প" এই বর্ণের দ্বারা বিশ্বসৃষ্টির মূলীভূত যে কূর্মবৃত্তি সেটিকে আমরা পাইলাম। দন্ত যেটিকে ছিন্ন, বিভক্ত করিবে, ওষ্ঠ সেটিকে হয় আবীরূপে প্রকাশিত করিবে অথবা রাত্রিরূপে আবৃত করিবে। সৃষ্টির অবিভক্ত মূল হইতে যৎকালে বিভাগের ফলে সৃষ্টি পরিণামটি প্রবর্তিত হয়, তখন সেটি ওষ্ঠ্য, কিনা কূর্মশক্তিকে মধ্যস্থ করিয়াই প্রবর্তিত হয়। এই সৃষ্টিধারার মধ্যে যে স্থলেই আমরা দৃষ্টি নিবন্ধ করি না কেন, সেই স্থলেই দেখিতে পাইব যে এই সঙ্কোচ-বিকাশরূপ কূর্মশক্তিটি মাঝখানে রহিয়া পরিণাম প্রবাহটিকে ঊর্মি ভঙ্গীতে (wave pattern-এ) নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সব কিছু ঘটনাই অব্যক্ত হইতে অভিব্যক্তিতে ধীরে ধীরে আসিয়া আবার শনৈঃ শনৈঃ অব্যক্তের কুক্ষিতে লীন হইয়া যাইতেছে। প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম যন্ত্রাদিতে 'ভালভের' মত এই ওষ্ঠ ('ওষ্'=বহির্ভাব বা অন্তর্ভাববৃত্তি+স্থ=যেটি স্থির বা নিয়ন্ত্রিত, কনট্রোল করে)।

শেষকালে হইল 'স' কার অথবা বিসর্গ। 'স' কারের উচ্চারণস্থানও দন্ত। 'তপঃ' এই শব্দের অন্তে হসন্তরূপে অথবা বিসর্গরূপে 'স' কার রহিয়া এইটি সূচিত করিতেছে যে ছেদন অথবা বিভাজন কর্মটি আর কেবলমাত্র সম্ভাবনা মাত্র নয়, কিন্তু সেটি বস্তুতঃই হইয়াছে এবং হইতেছে। অব্যাকৃতের ভিতরে যা কিছু লুকাইয়া ছিল,—পরস্পর ওতপ্রোত অভিন্নভাবেই ছিল—যেমনধারা আমাদের সুষুপ্তিতে চিত্তের সংস্কারগুলি থাকে—সেগুলি এইবার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্বের বিপুল অভিব্যক্তির মাঝারে যেন আপনাদের বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে, যেমনধারা আবার সুষুপ্তি হইতে জাগ্রতে ফিরিয়া আসিলে হইয়া থাকে। সুতরাং 'স' কারের দ্বারা এই বিপুল বিসর্গটি বুঝাইতেছে। 'তপস্' এই শব্দের তিনটি বর্ণে আমরা পাইতেছি অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত যে বিশ্ব তার আবির্ভাবের পূর্ণ রহস্য চিত্রটি (inside picture of cosmic emergence).

তপঃ মূল কারণের সত্তা, জ্ঞান এবং আনন্দ এই তিন ভাবে আবির্ভাবের মূল প্রয়াস ও আকৃতি

কেবল মাত্র সত্তার দিক দিয়া নয়, জ্ঞান এবং আনন্দের দিক দিয়াও তপঃকে দেখ। জ্ঞানের দিক দিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই চারিটি অবস্থা প্রসিদ্ধ।

তুরীয় তো নিত্য, কিন্তু সৃষ্টির সম্বন্ধে সুষুপ্তির মত একটা অব্যক্ত অব্যাকৃত অবস্থা আছে, যেটিকে অদিতি বলা যাইতে পারে। যাহা দ্বারা বিশ্বসুষুপ্তি হইতে বিশ্বজাগ্রদাদি সম্ভাবিত হইয়া থাকে—acosmicity হইতে cosmicity দেখা দিতে পারে সেটি হইল তপঃ। পুনশ্চ, বিশ্ব এবং বিশ্ববোধের মূলে যে অখণ্ডাধার-রূপ আনন্দ রহিয়াছে—যে আনন্দ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি' ইত্যাদি সে আনন্দ ও যদ্বারা বিশ্বের এবং বিশ্বচ্ছন্দের অভিব্যক্তিতে উল্লাস বিলাসে লীলায়িত হইয়া থাকে, সেটিও তপঃ।

সুতরাং, তপঃ হইল মূল বস্তুর আবীরূপে আবির্ভাবের সঙ্কল্প, শক্তি এবং প্রয়াস। সঙ্কল্প শক্তি এবং প্রয়াসরূপে সেই মূল কারণই হইল তপঃ।

'দন্ত', 'ওষ্ঠ', 'তপঃ' প্রভৃতিকে স্বারসিক রহস্য ভাবে দেখা ছাড়া উপায় নাই। 'স্বারসিক' বলাতে ইহা বুঝায় যে এদের যেটি 'রস' কিনা তাৎপর্যনিষ্কর্য, সেটি এদের নিজেদের মধ্যেই—যেমন পদ্মকোরকে, মধুচক্রে—নিহিত রহিয়াছে, বাহির হইতে অধ্যাহার করিতে হয় না।

[এটি নিয়তই স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'তপঃ' 'ঋতম্,' 'সত্যম্' ইত্যাদি শব্দ কতকগুলি যদৃচ্ছাকল্পিত বস্তু অথবা ব্যাপারের সঙ্কেত (symbol) মাত্র নয়। প্রত্যেকটি এক একটি প্রাণন (Pranik function)—যাহা পরে বিবেচিত হইবে। প্রত্যেকের কেবল মাত্র অর্থব্যঞ্জনা (connotation) আছে এমন নয়, শক্তি ও ভাবব্যঞ্জনা (dynamic, creative import and impetus) আছে। যেমনধারা, গণিত শাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'আন্তরাকৃতি' (formulae) এবং সমীকরণগুলির। (equations)। dy/dx এর অথবা Fdx এর বাহ্যতঃ কোনও ব্যঞ্জনা নাই। প্রত্যেকে একটি একটি 'নির্ব্বহণ-সূত্র' (index or sign of operation)। নির্বাহণের দ্বারাই এদের নির্বাচন। মন্ত্রবিধানে (বেদে এবং তন্ত্রে) শব্দের (অক্ষর স্বরচ্ছন্দঃ ইত্যাদি সহ) প্রাধান্য এই নিমিত্ত। শব্দযোগ (সুতরাং নাদানুসন্ধান) মুখ্য ভাবেই সমাশ্রয় করিতে হয়। জপবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভূমি এইটি। এইটিকে আদৌ মুখ্যতঃ আশ্রয় করতঃ অর্থভাবনা এবং পরিপক্ক ভূমিতে 'অর্থভাবন' করিতে হইবে। এইরূপ নিষ্ঠার ফলে 'নামের কৃপা' হইয়া থাকে এবং নাম ও নামীর অভেদও প্রতিপাদিত হয়।]

সৃষ্টির মূল তপঃ এবং সপ্ত ব্যাহৃতি সৃষ্টির সব কিছুতে অনুস্যূত

"এ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম এই সব সৃষ্টি করিয়া এদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন" —এবংবিধ বাক্য দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম কেবলমাত্র নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দরূপে সকলের অধিষ্ঠান হইয়া নাই, পরন্তু ব্রহ্ম (পূর্বালোচিত) তপোরূপেও সর্বত্র রহিয়াছেন এবং সব কিছু হইয়াছেন। শ্রুতি যে বলিয়াছেন "রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব" এইটি তপের মূর্তি যে অগ্নি তাঁহার সম্বন্ধেই। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ ইত্যাদি যে সপ্তব্যাহৃতি, তন্মধ্যে তপঃ হইতেছেন ষষ্ঠ ব্যাহৃতি। কিন্তু এখানে আমরা যে তপোব্রহ্মের প্রসঙ্গ করিতেছি তিনি এই সাতটিরই মূলে এবং তাঁহা হইতেই এই সাতের অভিব্যক্তি। এই সাতটির মধ্যে প্রথম তিনটি হইল তাঁর অবম অভিব্যক্তি, তারপরে তিনটি হইল তাঁর মধ্যম অভিব্যক্তি এবং স্বয়ং সত্য হইলেন তাঁর উত্তম অভিব্যক্তি। বেদের "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" তুলনীয়। এখন বুঝিতে হইবে যে এই তপঃসপ্তক, কিনা, সপ্তব্যাহৃতি বিশ্বের যাবতীয় পদার্থেই নিহিত হইয়া রহিয়াছেন। সকল পদার্থেরই যাহা কিছু বৃত্তি সেটি এই তপঃসপ্তকের দ্বারা ব্যাপ্ত এবং ব্যাহৃত (বিশেষরূপে আহৃত) রহিয়াছে বলিয়াই সপ্ত মহাব্যাহৃতি নামটি হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ধূলিরেণুর যে বৃত্তি সেটিকে সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া এবং আহরণ করিয়া সপ্ত ব্যাহৃতি বিদ্যমান। সুতরাং একটি ধূলিরেণুর ভিতরেও সত্তা শক্তি এবং বৃত্তির সাতটি লোক বা স্তর রহিয়াছে। কিন্তু এই সাতটির মধ্যে কোন কোনটি মাত্র কোন কোন পদার্থে উন্মীলিত, কিনা ব্যক্তভাবে বৃত্তিমান, অন্যগুলি সেখানে সেখানে নিমীলিত অব্যক্তের মত বিদ্যমান থাকে। মানুষের মত জীবের মধ্যেও সচরাচর—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনটি মাত্র 'লোক' বা স্তর প্রকাশিতরূপে রহিয়াছে। এ তিনের মধ্যেও আবার সাধারণতঃ প্রথমটি কিনা, ভূঃ-র গুরুত্বই হইয়া থাকে বেশী। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়জন্য যে স্থূলবৃত্তি তার স্তরেই মানুষ সাধারণতঃ বাধ্য হইয়া বিচরণ করে। 'পরাঞ্চিখানি' ইত্যাদি। সুতরাং মানুষের যেটি সমগ্র সত্তা এবং শক্তি এবং চেতনা তার একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র মানুষের প্রকাশ্য ব্যবহারে খাটিতেছে। মানুষ তাই অল্প লইয়াই আছে এবং এই অল্প থেকে যদি কণাটুকুও হারায় তবে সে 'হায়' 'হায়' করিয়া মরে। অল্পে সুখ নাই আর সে অল্পের যদি হানি ঘটে তো দুঃখ। সুখই যেখানে স্বভাব

ও স্বরূপ সেখানে অল্প লইয়া ব্যস্ত মানুষের নৈরাশ্য গুমরিয়া বলে 'সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং'! আপনার ভিতরে একটু খানিতে তার অভিনিবেশ বলিয়া অপর সব কিছুতেও সে অল্পই দেখিতে পায়। যেমন দেখি তেমনি দেখায়। এই নিমিত্ত একটি ধূলিরেণু তার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র, নগণ্য রেণু মাত্র, কিন্তু ব্রহ্ম নয়। এই দৃষ্টিকার্পণ্য দূর হইলে দেখিব যে যিনি সাক্ষাৎ ভূমা, যিনি ব্রহ্ম, তিনি আমার অল্পের খেলার গরজে নিজেই যেন অল্প হইয়া সাজিয়াছেন। আপনার ভিতরে ব্রহ্মের এই মহাসপ্তব্যাহৃতি রূপকে যখন আমি ফুটিতে দেখিতে থাকিব, তখন উপলব্ধি করিব যে বিশ্বে ক্ষুদ্র বা মহান এমন কিছুই নাই যাতে এই সপ্তমহাব্যাহৃতি অধিষ্ঠিত হইয়া নাই। এই দৃষ্টিতে সব কিছু ক্ষুদ্রত্ব বা অণুত্বের দিকেও অফুরান, আবার মহত্ত্বের দিকেও অফুরান. এই অফুরান ভাবটি তার ব্রহ্মত্ব।

তপের জ্যোতী-রূপে সপ্তধা অভিব্যক্তি

যেহেতু তপঃ শক্তিস্বরূপ, শক্তির গোড়ার রূপ, সুতরাং সৃষ্টিতে সব কিছুই একটা জড় অণু পর্যন্তও—অফুরান শক্তির ভাণ্ডার। সপ্তব্যাহৃতি তথায় রহিয়াছে বলিয়া, শক্তির ভাণ্ডারটি (Magazine of Power) হইতেছে 'সাত মহল'। ঐ অফুরান শক্তিরাশির সামান্য এক রত্তি মাত্র কাজে খাটিতেছে (Kinetic Energy); প্রায় সবটাই 'কেন্দ্রীণ' হইয়া যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এইটাকে বলে কুণ্ডলী শক্তি। 'কু' কিনা ব্রহ্মে লীন হইয়া, 'শয়ন' করিয়া রহিয়াছে বলিয়া, এটি কুলকুণ্ডলিনী। সাতটি ব্যাহৃতি, 'চক্র' অথবা 'কেন্দ্রে' ইনি বৃত্তিমতী। বিজ্ঞান সম্প্রতি এটম্‌কে বিদীর্ণ করিয়া তার কুণ্ডলী শক্তিকে অংশতঃ—জাগরিত করিয়াছে, ফলে বর্তমান যুগে এক মহামারণাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। হরজটাজালে জড়িত কালভুজঙ্গাকে এইবার যেন জাগানো হইল। তার উদ্যত ফণা হইতে প্রলয় কালাগ্নিও নিঃসৃত হইল। কিন্তু হরজটাজালের অভ্যন্তরে নিগূঢ় সঞ্চারিণী সুর শৈবলিনী এখনও জাগেন নাই তো! অর্থাৎ আমরা ভূর্লোকের শক্তিটাই অথবা তার খানিকটাই এখনও ব্যবহার করিতেছি। অপরাপর 'লোকে' 'তপঃ' শক্তির যে আরও মহীয়ান, আরও বরীয়ান রূপ রহিয়াছে, তার সন্ধান এখনও মিলে নাই। 'Energy level' এখনও পর্যন্ত শক্তির অবম বা অধম গ্রামেই অর্ব্বাঙ্‌মুখে রহিয়াছে। অর্জুন তপস্যা দ্বারা মন্ত্র সহিত

পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। কঠোর ব্রহ্মচর্য এবং তপস্যায় লাভ করিতে হয় এবং সিদ্ধ সমর্থ মন্ত্র দ্বারা উদ্দীপিত এবং প্রতিসংহৃত করিতে হয় যে অস্ত্র, সে অস্ত্র কি আণবিক বোমা জাতীয়? তার Energy level কোথায়, কোন গ্রামে? বশিষ্ঠ ব্রহ্মতেজের দ্বারাই বিশ্বামিত্রের সকল আয়ুধ নিবৃত্ত করিলেন। এই ব্রহ্মতেজ কোন জাতীয়, কোন স্তরের? মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব সৃষ্টিবিনাশী কালকূট আপন কণ্ঠে ধারণ করিলেন—এ 'কণ্ঠ' কোথায়, কি বস্তু? কাজেই, বিজ্ঞানের দ্বারা জড়াণুর কেন্দ্রীণ শক্তি বাহির করা হইয়াছে বলিয়া এটা যেন না মনে করি যে কুলকুণ্ডলিনীর যথার্থ জাগরণটি ঘটিয়াছে। কুণ্ডলী শক্তি= Static or Potential Energy। এটি কিয়ৎ পরিমাণে জাগিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবর্চ্চঃই তাঁর বপুঃ। এঁর জাগরণ কবে কি উপায়ে হইবে? এঁর জাগরণ হইতে গেলে আগে মানুষের নিজের মাঝে (মূলাধারে) সে মহারহস্য জাগরণটি হওয়া আবশ্যক। মানুষ আপনাতে 'কুল,' কিনা ব্রহ্মকে (শক্তি-শক্তিমানের অভেদে) উপলব্ধি করিবে—'কৌল' হইবে, 'হইবে, 'অবধূত' হইবে—তবে সে জীবন্ত, জাগ্রৎ, স্ফুরৎ দেখিবে সব কিছুতেই কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বকে। সাতের অর্দ্ধ সাড়ে তিন—সার্দ্ধত্রি। সাতের মধ্যে যে 'মিথুনতত্ত্ব' (Polarity Principle) রহিয়া তাদের অভিব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথুনের 'অভিষ্বঙ্গা' (coalescence) হইলে সাত হয় সাড়ে তিন। মূলাধারে তপঃসপ্তক এইভাবে সার্দ্ধ-ত্রিবলয়াকারা কুলকুণ্ডলিনী হইয়াছেন। জপসূত্রে এ সকল কথা যথা স্থানে আলোচিত হইবে। ভূরাদি সপ্তস্তরে বা লোকে জ্যোতিঃ (এক অদ্বিতীয় হইয়াও) সাতটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন—তাপ (অগ্নি), তেজঃ, অর্চ্চিঃ, বর্চ্চঃ, ঊর্জ্জঃ, ওজঃ এবং ভর্গঃ। তপঃ অথবা জ্যোতিঃ (তপোজ্যোতিঃ) সপ্তরূপেই সর্বস্তরেই বিদ্যমান বটে, কিন্তু এক একটিতে এক একটির মুখ্যতা। যথা ভূঃস্তরে তাপেরই মুখ্যতা। অপর রূপগুলি সঙ্গে রহিয়াও যেন 'নেপথ্যে' রহিয়াছে। সপ্তলোক দ্বারা সপ্তধাকৃত এই জ্যোতিঃ হইতেছে আলোকজ্যোতিঃ (অর্থাৎ যতদূর লোক ততদূর অবধি)। আর, যেটি এভাবে ব্যাকৃত, রূপায়িত নয়, সেটি অলোকজ্যোতিঃ। কিন্তু সর্বস্তরেই আধাররূপে অলোকজ্যোতিঃ বিদ্যমান। সন্ধিতে যেটি, সেটিকে বলে লোকালোকজ্যোতিঃ।

সুতরাং তপোযাগ—ঐ সপ্তার্চ্চিঃ শিখায় হবন

জ্যোতির এই সপ্তার্চ্চিঃ বা সপ্তশিখায় আহুতি দাও, পূর্বোক্ত সপ্ত মান্দ্য সমিধ্। অথবা ব্যাধি, স্ত্যান, দৌর্মনস্যাদি অন্তরায়গুলিকে; অথবা, জড়তা (অবসন্নতা), অলসতা, অরোচকতা, অসারতা, অনির্ব্বিণ্ণতা, অনৃজুতা, অনৃততা—এই সাতটিকে সমিধ কল্পনা করতঃ হবন কর। মন্যু হইতে জাত যে সকল কায়িকাদি পাপ তাদেরও হবন কর 'সূর্য্যে—জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা' এবং 'সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা' এই মন্ত্রে হবন কর এই সপ্তার্চ্চিঃ জ্যোতিতেই। লক্ষ্য কর যে মনু=মন্ত্র ইত্যাদি, কিন্তু মন্যু ('য'কার যুক্ত মনু) ঐ 'য' কারটির দ্বারা ব্যাজ-বিঘ্ন-বিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং মনু আর ঋজুগতি নাই, বক্রগতি ব্যাল হইয়াছে। তাই বলিয়া যেখানে 'য', সেখানেই বক্রতা এবং ব্যাল—এ মনে করিলে ভুল হইবে। যেখানে 'য' সেখানেই সাপের ভয় নয়। 'জ্যোতি' 'জ্যোগ জীবতি' ইত্যাদিতে 'য' কারের বৃত্তি তো ব্যালবৃত্তি নয়। জড় রসায়ন-বিজ্ঞানে যেমন, প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানেও তেমনি, যেগুলি 'মৌলিক' (elements) তাদের মিশ্রণের স্থান, ক্রম, অনুপাতাদির উপর যেটি 'যৌগিক' (compound) তার স্বরূপ এবং গুণকর্ম সম্বন্ধ নির্ভর করে। 'Bio-chemic Function' কথাটা আমরা এ প্রসঙ্গে ব্যবহার করিতে পারি বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ অর্থে নয়। এইজন্য, 'Pranic Function' কথাটাই ব্যবহার করিব। 'জ্যোতিঃ' শব্দে বর্গীয় এবং অন্তঃস্থ দুইটি 'জ য' কারের সমবায় ঘটিয়াছে। 'জ য' দুইটিই তালব্য এবং ঘোষবৎ; কিন্তু জ মহাপ্রাণ, য অল্প প্রাণ। এই তালব্য (ঊর্দ্ধাভিঘাত জন্য) ঘোষবৎ বা সঘোষ বর্ণদ্বয়ের মধ্যে একটি মহাপ্রাণ অপরটি অল্প প্রাণ বলিয়া এদের 'সাজাত্য' (compatibility) টাই মুখ্য, যে বৈজাত্য (incompatibility) রহিয়াছে, সেটি গৌণ এবং মুখ্যের উপকারক; সুতরাং আসলে তার অনুপযোগ নাই, উপযোগই আছে। দুইটি মহাপ্রাণে অথবা দুইটি অল্প প্রাণে, অনেক ক্ষেত্রে বিষম দ্বন্দ্ব (antipathy relation) ঘটে, মনে রাখিতে হইবে।

জ্যোতিঃ শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা

জ্যোতিঃ' শব্দের 'জ য' এই মিথুনে (Phonetic Coupleএ) বুঝিতে হইবে যে মহাপ্রাণ কোনও নির্দিষ্ট স্তর বা লোকে (given planeএ) যে সংখ্যানে (Energy

value(তে) 'ভূমিষ্ঠ' দেখা যাইতেছে, সে সংখ্যানটি কিছু যেন হ্রস্ব বা খর্ব করিয়াই তাকে অধঃ বা ঊর্দ্ধ কোনও স্তরে 'প্রকট' হইতে হইবে। ই+অ=য। 'ই' অর্থ গমন। অ=অগ্রতঃ, আগে। ঊর্মিকে লক্ষ্য কর। ক বিন্দুতে ঊর্মিচূড়া রহিয়াছে, যদি ঊর্মিচূড়া 'ক' হইতে 'খতে' যায়, তবে তাকে 'উপত্যকায়' (wave valley'তে) নামিয়া আবার উঠিতে হইবে। এই প্রাণন ব্যাপারটি হইল 'জ য' অথবা 'জ্য' এই 'রূপটি' (formula)। 'মন্যু'র বেলা 'য' নিমিত্ত বক্রতা অন্য কারণে, এবং সেটা সাধক নয়, বাধক। 'ন' বর্ণ দন্ত্য (সুতরাং মধ্যাভিঘাত এবং অর্ব্বাগভিঘাত জন্য), অঘোষবৎ এবং অল্প প্রাণ; এর সঙ্গে 'য' কারের উক্তভাবে মিশ্রণে বিষমতা জন্য বক্রতা ঘটিয়াছে। তারপর জ্যো=জ্+য্ (=ই+অ)+ও(অ+উ)। এই সমীকরণ (equation) টি পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে 'ই অ' এবং 'অ উ' হইতেছে একটা পূর্ণ ঊর্ম্মিরূপ (complete wave pattern), যার চূড়া বিন্দুদ্বয় হইল 'ই' এবং 'উ', আর উপত্যকা হইল 'অ, অ'। গত্যর্থ 'ই' দ্বারা প্রাণের ইন্ধ হওয়াটি, এবং 'উ' দ্বারা ('উদেতি')—উদিত হওয়া সূচিত হইতেছে। সুতরাং, বেদমন্ত্রে 'উদ্যুত্যং জাতবেদসং' অথবা 'উদগাদনীকং' ইত্যাদি রূপে মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির চক্ষুঃ স্বরূপ এবং স্থাবর জঙ্গমের আত্মা যে সূর্যজ্যোতিঃ উদগীত হইয়াছেন, তিনিই 'জ্যো' এই রাহস্যিক শব্দ দ্বারা বাচ্য হইতেছেন। এই 'জ্যো' এবং গায়ত্রী মন্ত্রের 'ধিয়োযোনঃ' এর অন্তর্গত 'যো' তুলনীয়। শেষেরটিকে 'ই-ও' অথবা 'ই-অ-উ' ভাবেই উচ্চারিত করিতে হইবে। অন্যথা যে 'জ্যো' বরেণ্য ভর্গোরূপে সর্বতঃ রহিয়াছেন, তিনি তাঁর স্বতঃসিদ্ধ মহাপ্রাণতা দ্বারা 'ধিয়ো নঃ', আমাদের বুদ্ধিরূপ আধারগুলিতে অনুগৃহীত, অভিষিঞ্চিত করিতেছেন—এই 'অবতরণ'টি সূচিত হইল না। 'য' কে জ এর মত করিয়া উচ্চারণ করিলে, আমাদের বুদ্ধি যেন 'অল্প প্রাণ' হইয়াও মহাপ্রাণতার দম্ভে ফুলিয়া উঠিল। বিন্ধ্যগিরি যেমনধারা মাথা তুলিয়া সূর্যজ্যোতির গতি রোধ করিতে চাহিয়াছিল, আমরাও যেন তাই করিলাম। প্রপত্তি,—surrender-না হইলে মহাপ্রাণ যে জ্যোতিঃ তাঁর অবতরণ কোন 'ঘটেই' ঘটে না। ঘটের বস্তুটি ঢালিয়াই ঘট ভরিতে হয়। এটা necessary precondition.

অপর দৃষ্টান্ত

পুনশ্চ, 'ধিয়োযোনঃ' একটি সুষমক্রম—homogeneous function। এর মাঝে 'যো' কে 'জ' কারের মত করিয়া বলিলে সুষমক্রমহানি ঘটিল—প্রাণের এবং স্বরের স্বচ্ছন্দগতির মাঝে যেন একটা 'উৎপাত' আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং ছন্দঃ ক্ষুণ্ণ হইল।

তারপর 'জ্যোতিঃ' শব্দের শেষার্দ্ধের বিচার প্রসঙ্গক্রমে অন্যত্র আমরা করিব। এবং ইহাও আমরা দেখিব যে শব্দনিষ্ঠ 'প্রাণিক' ব্যাপারগুলির বিশ্লেষণ (analysis) করিতে হইলে প্রাণের স্বরূপ প্রক্রিয়া এবং অভিব্যক্তি সমূহের একটা আলেখ্য সম্মুখে রাখিয়াই করিতে হয়, নচেৎ অবাস্তব (অবস্তুতান্ত্রিক)—conventional and arbitrary হবার আশঙ্কা আছে। যেমন—'ত্র্যম্বকং যজামহে', এস্থলে 'ত্র্য' বর্ণটিকে ত্রিয় এভাবে কেন উচ্চারণ করিতে হইবে? আবার, সর্বদা উচ্চারিত 'গোবিন্দ' বা 'হরিবোল' নামে 'গ' এবং 'ব'তে যে ওকার তাকে বিশেষভাবে ঘোষবৎ; মহাপ্রাণ করিব কেন? শিবের যে 'বম্ বম্' তাতে 'ব' কেও এক বিশেষভাবে কেন উচ্চারণ করিব? ওঁকারের অনুগ্রহলাভার্থ? এ সকল বিশেষ ভাবে অনুসন্ধাতব্য॥

অতঃপর ভূঃ, ভুবঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতির লক্ষণ দেওয়া যাইতেছে:—

ব্যাহৃতিসপ্তকের ভাবার্থবিস্তার

১৮। "অয়ম্" বা "এই" বলিয়া যে প্রত্যয় হইতেছে, সে প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কিনা, বিষয়, সেটি ভূঃ॥

সর্ব্ববিধ সৃষ্টির আপনাকে 'এই' রূপে প্রকাশের নিমিত্ত 'ভূঃ' এই আদিম ব্যাহৃতির অপেক্ষা

"ভূ" শব্দে যে ক্রিয়া বোঝায় তার সঙ্গো 'র'কার যোগ করিয়া 'ভূঃ' এই অব্যয়টি পাইয়া থাকি। মুখ্য প্রাণ 'ভূ' এই ক্রিয়াটিকে আশ্রয় করিয়াই সব কিছু হইয়াছেন, হইতেছেন এবং হইবেন। ভূঃ এই শব্দ প্রাণের সমগ্র সৃষ্টিব্যাপারে যেটি রহস্য সেটিকে সূচিত করিতেছে। 'ভ'কার হইল 'প'কারাদি ওষ্ঠ্য বর্ণের

চতুর্থ বর্ণ। 'ওষ্ঠ' এটি যে কিসের সঙ্কেত তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। যেটি অব্যাকৃত সেটিকে ব্যাকৃত করে, যেটি অব্যক্ত-মৌন তাকে ব্যক্তমুখর করে এই ওষ্ঠ। উত্তর এবং অধর ওষ্ঠ যাবৎ পরস্পর সংলগ্ন, তাবৎ কোন 'বাক্' নির্গত হইতেছে না, সুতরাং কিছুই ব্যক্ত হইতেছে না। কিন্তু ওষ্ঠাধার যখন বিযুক্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে শব্দ এবং শব্দজন্য যে সৃষ্টি সেটি হইল। "প" বর্গের চতুর্থ বর্ণ যে 'ভ'কার সেখানে আসিয়াই প্রাণের আপনাকে শব্দরূপে অভিব্যক্তির চেষ্টাটি সর্বাধিক বেগবতী হইয়া থাকে। 'ভ'কারের সঙ্গে 'উ'কারের (এটিও ওষ্ঠ্যবর্ণ) সংযোগে এই সংবেগটি এ পরিমাণে উর্জ্জিত হইয়া থাকে যে, সৃষ্টির মুখে, কোন কিছু হবার পথে কোন বাধাই তখন তাকে আর আটকাইয়া রাখিতে পারে না। লক্ষ্য কর যে সংযোগটি সুষম, বিষম নয় (homogeneous, sympathetic relation)। উকার যুক্ত 'ভ'কার একটি চরম বেগের (critical efficiency) প্রতীক। যেমন জলের উত্তাপ ক্রমশঃ কমাইয়া যাইতেছি, কিন্তু উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী পর্যন্ত যতক্ষণ না নামিল, ততক্ষণ জল কিছুতেই বরফে পরিণত হইল না। জলের বরফ আকারে রূপান্তর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শৈত্যের উপর নির্ভর করে; শৈত্যের শক্তি ঠিক ততটা না হইলে জল কিছুতেই বরফ হইবে না। সকল কিছু আবির্ভাবের পূর্বেতেই শক্তির এবং তার বেগের একটা নির্দিষ্ট মাত্রার অপেক্ষা থাকে। জপ কখন বৈখরী হইতে মধ্যমায় যাইবে, কখন আবার মধ্যমা হইতে পশ্যন্তীতে, সেটা নির্ভর করে একটা না একটা সমর্থ এবং সাধক মাত্রার উপরে।

'ভূঃ' এই অব্যয়ের ব্যাপ্তি দ্বিবিধা—সাধারণী ও অসাধারণী

'ভূ' এই শব্দটি হইল সেই নির্দিষ্ট সমর্থ সাধক মাত্রাটির রহস্য বাক্। 'ভূ'এর সঙ্গে 'র' অথবা বিসর্গ যোগ করিলে, সেই 'র'কার ক্রিয়াটিকে রূপায়িত করে এবং বহিঃ প্রসারিত করে। বিসর্গ বিহীন যে 'ভূ' সেটি ক্রিয়া এবং তিঙন্তাদি প্রত্যয়ে তার বিবিধ রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বিসর্গযুক্ত যে 'ভূঃ', সেটি অব্যয়—সব কিছু হবার এবং রূপান্তর প্রাপ্ত হবার সমর্থ বীজ এটি, কিন্তু সকল কিছু হওয়ার মধ্যে 'বীজমব্যয়ং' রূপে এটি ঠিকই থাকে। যেন কোন গাছ বা লতার গোড়াটি, মূল। গোড়া থেকে

অনেক ফেঙ্ড়া বেরোয়, সেগুলো কেটে দিলে গোড়াটি থেকে যায়, এবং তা থেকে আবার নতুন নতুন ফেঙ্ড়া বেরোয়।

যেটি নেপথ্যে, অন্তরালে রহিয়াছে, কাজেই যেটি এখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে না সেটিকে সাক্ষাৎ অনুভবের মধ্যে হাজির করিয়া দেয় এই অব্যয় 'ভূঃ'। ইহার দ্বারা যেটি 'নেই' বা 'সেই', সেটি হয় 'এই'। সুতরাং অয়ং প্রত্যয়ের—এই যে ইহা হইয়াছে, হইতেছে, রহিয়াছে—এবম্বিধ অনুভবের মূল হইল ভূঃ। কেবল কি জাগ্রৎই ভূঃ? তা তো নয়। স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিও তৎ তৎ কালে ' ভূঃ'। পরে অবশ্য স্মৃতিতে সে সব 'এই' না হইয়া 'সেই' হইয়া যায়, এমন কি 'নেই'ও হইয়াও যায়। সকল স্তরের অনুভূতিতে যে গোচরতা সেটি ভূঃএর দ্বারা ব্যাপ্ত বটে, কিন্তু এর ব্যবহারিক, চলতি ব্যাপ্তিটি হইল ইন্দ্রিয়জন্য যে প্রত্যক্ষ তাতেই। সর্বস্তরেই যে ব্যাপ্তি, সেটি সাধারণী, আর স্তর বিশেষে ব্যাপ্তি অসাধারণী। যেমন, জপ যৎকালে বৈখরী ভূমিতে চলিতেছে, তৎকালে সেখানেই 'ভূঃ' অসাধারণী ব্যাপ্তিতে রহিয়াছে। যখন মধ্যমায় থাকিবে তখন মধ্যমাতেই, ইত্যাদি। 'ভূঃ' এর যে সর্বভূমিতে সাধারণী ব্যাপ্তি সেটি সার্বভৌম যে অনুভূতি তাতে প্রতিভাত, অন্য ক্ষেত্রে সেটি অবরোধ প্রতিরোধাদি বাধা নিমিত্ত অবগুণ্ঠিত, আবৃত। জপ করিতেছি বা জপ হইতেছে—এ স্থলে 'এই যে হইতেছে' ভাবে ভূঃকে আমরা পাইতেছি বটে, কিন্তু জপক্রিয়া দ্বারা যে 'সংস্কার' জন্মিতেছে, যে 'অপূর্ব' সৃষ্টি হইতেছে, অথবা যে সংস্কার সমূহ আশ্রয় করিয়া বর্তমান জপক্রিয়াটি হইতেছে—এক কথায়, উক্ত ক্রিয়ারেখাটির আদি ও অন্ত—এদিক ওদিক—আমি দেখিতেছি না; সুতরাং জপে 'এমন ধারাটি' ঘটিতেছে কেন, তাহা বুঝিতেছি না, এবং জপে যে কি হইল অথবা হইবে, তাহাও জানিতেছি না। কিন্তু গুরু হয়তো সেটি দেখিতেছেন, অথবা অপর কোনও 'আতত দৃষ্টিতে'ও সেটা ছাপা ঢাকা নেই। কাজেই আমার কাছে 'ভূঃ'এর ব্যাপ্তি এবং শেষোক্ত দৃষ্টিতে 'ভূঃ'এর ব্যাপ্তি এক নহে।।

'অসৌ' প্রত্যয় বলিতে কি বুঝিতে হইবে?

১৯। "অসৌ", কিনা 'ঐ' প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কিনা, বিষয়, সেইটি স্বঃ।।

নিখিল চরাচর বিশ্ব 'ইদং' অথবা 'অয়ং' রূপে জ্ঞানের বিষয় হইতেছে বটে, কিন্তু এই ইদন্তা দ্বারা সীমাবদ্ধ যে অনুভব জগৎ, সেইটি কি একমাত্র জগৎ? একটা অদৃষ্ট অজানা জগৎ অবশ্যই রহিয়াছে যেখান হইতে এই জানা-দেখা জগৎ আসিতেছে এবং যেখানে যাইয়া আবার লয় হইতেছে। এই অদেখা ও অজানার মাঝে যে বস্তুটি রহিয়াছে, সেটি অদেখা অজানা হইলেও সেটিকে আমরা কোনমতেই অস্বীকার করিতে পারিনা। এসব কোথা হইতে আসিল এবং কোথায়ই বা যাইবে—এ প্রশ্ন করিলে ঐ দিকেই আমাদের আঙুল দিয়া দেখাইতে হয়। আমাদের মনে করিতে হয় যে 'ঐ' থেকেই 'এই' হইতেছে বা আসিতেছে এবং 'এই' আবার 'ঐ'তে যাইয়াই নেপথ্য হইতেছে। সুতরাং 'এই' কে প্রসব করিয়া, এর প্রভব, আধার এবং নিলয়রূপে যেটি বিদ্যমান, সেইটি হইল স্বঃ বা সুবঃ। স্ব এই শব্দে যে 'সূ' ধাতু আছে তাহার অর্থ প্রসব করা। স্বয়ং নেপথ্যে থাকিয়াও এটি প্রসব করে। আগেকার বেলায় যেমন 'ভূ' এখানে তেমনিধারা 'সূ'। 'ভূ'এর মতন 'সূ'এর শাব্দিক বিশ্লেষণ করিয়া অন্তর্নিহিত রহস্যটি দোহন করা যাইতে পারে।

'স্ব' শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা। 'ব'কার ও 'উ'কার। সঙ্কোচ ও প্রসার রহস্য

"সূ" এই শব্দে দন্ত্য'স'কার রহিয়াছে এবং 'ঊ'কার রহিয়াছে, তদুভয়ের সংযোগে এইটা বুঝায় যে প্রাণ যেন কোথাও হইতে বেগবান হইয়া বহির্দেশে উৎসারিত হইতেছে। একটা বীজের ভিতর হইতে প্রাণ যখন এইভাবে বেগবান হইয়া আপনাকে বাহিরে উৎসারিত করে তখনই বীজ হইতে অঙ্কুরাদি প্রসূত হইল। কিন্তু প্রাণ এইভাবে বাহিরে সবেগে ছুটিয়া আসিতেছে কোথা হইতে? সে স্থানটি অবশ্য অদেখা স্থান, নেপথ্য। জড় পরমাণুর ভিতর হইতে এইরকম ধারা এক তেজো নিঃসরণের ফলে বিশ্বের আলোক তাপাদি শক্তিধারার বিকিরণ ঘটিতেছে। আমাদের চেতনার মধ্য হইতেও যে সমস্ত বৃত্তি সমুত্থিত হইতেছে, সেগুলিও এইভাবে একটা অব্যক্তের ভূমি হইতে প্রকাশের ভূমিকায় চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টির সর্বত্রই এইরূপ। সর্বত্রই একটা নেপথ্য হইতে প্রকাশ্যে

আগমন ঘটিতেছে। ‘সূ’ এই শব্দ দ্বারা বাহিরে সবেগে নির্গত হওয়া এটি সূচিত হয় বটে, কিন্তু যেটি নেপথ্য, যেটি প্রকাশের অন্তরালে, সেটির ব্যঞ্জনা ইহাতে নাই। ‘ব’কারকে সম্প্রসারিত করিলে হয় ‘উ’কার এবং ‘উ’কারের সঙ্কোচনে হয় ‘ব’কার। ইগ্‌যণঃ সম্প্রসারণম্। সঙ্কোচন বলিলে কি বুঝিব? একটা গাছ তার বীজের ভিতরে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে, অথবা একটা atomএ তার সত্তাশক্তি (mass energy) কেন্দ্রে অথবা nucleusএ যেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের একটা সংস্কারে বা সঙ্কল্পে না জানি কতখানি শক্তি এইভাবে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং সম্প্রসারিত উ বর্ণে যে প্রাণশক্তি তল এবং লম্বকে আশ্রয় করিয়া কাজ করিতেছে, সঙ্কুচিত ‘ব’কারে সে শক্তি নিজেকে তল এবং লম্বের দিক দিয়া যেন গুটাইয়া বেধ অথবা depth dimension-এ ঘনীভূত করিতে চায়। একটা বৃত্তের যেগুলি ব্যাস সেগুলিকে হ্রস্ব করিতে থাকিলাম। এ স্থলে বৃত্তের উপরে যে শক্তিটি সক্রিয় রূপে (kinetic) বিদ্যমান, সে শক্তিটির পরিমাণ হ্রাস যদি না ঘটে, অথচ বৃত্তের আয়তনটি যদি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে তবে এটা অবশ্য মনে করিতে হইবে অবয়ব সঙ্কোচের ফলে শক্তির নিবিড়তা বা গাঢ়তা (density) বর্দ্ধিত হইতেছে। আগে বৃত্তের যে কোন এক নির্দিষ্ট স্থলে শক্তির যে মাত্রা ছিল, বর্তমানে আয়তন সঙ্কোচের ফলে বৃত্তের যে কোন স্থলে শক্তির সে মাত্রাটি বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই প্রকার শক্তির ঘনত্ব অথবা বেধাভিমুখে (depth dimensionএ) চাপের বৃদ্ধিকে আমরা প্রাণের ‘ব’ এই শব্দ প্রক্রিয়া দ্বারা সূচিত করিতে পারি। সুতরাং ‘সূ’ যখন ‘স্ব’ আকার গ্রহণ করে তখন পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রকাশ্যে যেটির গুরুত্ব কমিয়া গেল নেপথ্যে সেটির গুরুত্ব বাড়িয়া গেল। এই ‘স্ব’ শব্দের সঙ্গে ‘র’কার অথবা বিসর্গ যোগ করিয়া এইটি বুঝান হইতেছে যে প্রাণ নেপথ্যে যাইয়া কেবল যে কূর্মবৎ স্থির হইয়া আছে এমন নয়, কিন্তু ‘র’ কিনা, অগ্নির মত সৃষ্টির মুখে সকল প্রতিবন্ধক দগ্ধ করিয়া আপন মহীয়ান তেজে আপনাকে বিসৃষ্ট করিতেছে। এই ‘স্বঃ’ হইলেন সপ্ত মহাব্যাহৃতির তৃতীয় ব্যাহৃতি। ‘অসৌ’ হইল ইহার দিগদর্শন। ইনি অব্যয়।

স্বাভাবিক শব্দ, স্বাভাবিক রূপ, স্বাভাবিক ক্রিয়া—মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র

সুতরাং যিনি নিজে অদৃষ্টধামা, কিনা অপ্রকট-প্রভাব হইয়াও আপন 'ধাম্না', কিনা প্রভাবের দ্বারা এই চরাচরকে প্রসব করেন, তাঁর স্বাভাবিক নাম স্বঃ। 'ব'কার এবং 'উ'কারের উচ্চারণগত বৈলক্ষ্যণ্য এবং সেটির রহস্য আমরা আগে দেখিয়াছি। এই দুটি বর্ণের যেটি আবার চাক্ষুষরূপ 'আকৃতি' বা শরীর তাতেও এ বৈলক্ষ্যণ্যটি পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব'কার নিজেকে সংবৃত করিয়া যেন ঢাকিয়াই রাখিয়াছে, কিন্তু 'উ'কারে সে রূপটি তার নাই। 'উ'কারে সে আপনাকে যেন মুক্ত করিয়াছে, বাহিরে নিজেকে প্রসারিত করিবার জন্য। প্রসঙ্গক্রমে এটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রত্যেক পদার্থে যেমন একটা স্বাভাবিক শব্দরূপ আছে, সেইরূপ তাহার আবার একটা স্বাভাবিক কায়রূপ আছে। এ দুটি ছাড়া তাহার আবার একটা স্বাভাবিক ক্রিয়ারূপও আছে। প্রথমটি হইল সেই পদার্থের মূলমন্ত্র, দ্বিতীয়টি মূলযন্ত্র, শেষেরটি মূলতন্ত্র। 'স্বঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা যিনি ব্যক্ত হইতেছেন, তাঁর একটি নিজস্ব যন্ত্ররূপ অথবা কায়াও আছে, এবং একটা নিজস্ব তন্ত্ররূপ অথবা ক্রিয়া সমভিব্যাহার রূপও আছে। আমরা মুখে 'স্বঃ' এই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম, অথবা সেটি শ্রবণ করিলাম। এই কথিত এবং শ্রুত শব্দটি কি স্বাভাবিক 'স্বঃ' এই শব্দের স্বভাব বা প্রকৃতি? তা তো নয়। তা যদি হইত, তাহা হইলে স্বাভাবিক শব্দের এবং তার যেটি বাচ্য তাহার অবিনাভাববশতঃ 'স্বঃ' এই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই 'স্বঃ' পদার্থটিও বিদ্যমান হইত। মহাকবি কালিদাস বাক্ এবং অর্থের অবিনাভাব সম্পর্কটি বলিতে গিয়া জগতের যাঁরা মাতা এবং পিতা সেই পার্বতী পরমেশ্বরের উপমাটি দিয়াছেন। অর্থাৎ শিব-শক্তি যেমন অভেদে বর্তমান, তেমনিধারা বাক্ এবং অর্থও, নাম ও নামীও অভেদে বিদ্যমান। তবে 'স্বঃ' এই শব্দটি উচ্চারিত অথবা শ্রুত হইয়া তার বাচ্য যে পদার্থ সেটিকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিয়া দিতেছে না কেন? নিশ্চয়ই আমাদের উচ্চারিত বা শ্রুত 'স্বঃ' এই শব্দ এবং তার যেটি বাচ্য এতদুভয়ের মধ্যে একটা যেন ব্যবধান (hiatus) কি কারণে ঘটিয়াছে। যাহার দ্বারা ব্যবধানটি ঘটে, তাকে বলে অন্তরীক্ষ। এই অন্তরীক্ষের কথা পরের সূত্রে আলোচিত হইবে। এখানে আমরা পাইতেছি যে, 'স্বঃ' প্রভৃতি স্বাভাবিক শব্দের ঠিক যথার্থ উচ্চারণ বা শ্রবণ ঘটিতেছে না। আমাদের উচ্চারণাদির যন্ত্রের এবং যন্ত্র ব্যবহারী চিত্তের

কার্পণ্যবশতঃই এটি ঘটিতেছে। শ্রদ্ধাবীর্যপূর্বক নিরন্তর সাধনের দ্বারা এই কার্পণ্য বিদূরিত হইবে। বিদূরিত হইলে আমাদের আহ্বানে যিনি আহূত তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া হাজির হইবেন। বর্তমানে তিনি 'রবাহূত' কিন্তু 'সমাহূত' কিনা সম্যকরূপে সমাদরে আহূত হইতেছেন কৈ? মন্ত্র সম্বন্ধে যে কথা, যন্ত্র এবং তন্ত্র সম্বন্ধেও সেই কথা। যে মন্ত্রের সহায়তায় অথবা যে ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সেটিকে অধিগত করিতে যত্ন করিতেছি, সে যন্ত্র বা তন্ত্র এখন পর্যন্ত যথার্থ রূপে তাঁকে লাভ করার পক্ষে উপযোগী হয় নাই। বিদ্যা শ্রদ্ধা সহকারে ব্যবহারেই তাদের উপযোগ সাধিত হইবে।

স্বঃ এবং সুবঃ এ দুয়ের তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত বৈলক্ষণ্য। 'ব', 'উ' ও 'উব্'—এই তিন আকৃতি

'স্বঃ' এই শব্দটির মত বেদাদি মন্ত্রশাস্ত্র 'সুবঃ' এই শব্দটিও ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন গায়ত্রীর যেটি শিরঃ তাতে আছে "ব্রহ্ম ভূ র্ভুবঃ সুবরোম্।" কিন্তু সৃষ্টিসূক্তে রহিয়াছে—"যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ" এই দুইটি শব্দের বাচ্য একই হইলেও প্রয়োগে (applicationএ) কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। 'স্বঃ' এই শব্দের যেটি 'ব'কার সেটি 'উব্' এই রূপ ধারণ করিয়াছে দেখিতেছি। বৈয়াকরণেরা 'উ' বর্ণের স্থলে স্বরাদি বিভক্তি পরে থাকিলে অনেক স্থলে 'উব্' এই বিধানটি করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাই:—যথা স্তু+অন্তি=স্তুবন্তি, নু+অন্তি=নুবন্তি ইত্যাদি। কিন্তু প্রাণ-প্রক্রিয়ার দিক হইতে দেখিতে গেলে এই 'উব্'টিকে আমরা কিভাবে দেখিব? 'উব্' হইল 'উ' বর্ণ এবং 'ব' বর্ণের মিথুন। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে 'ব'কারে অথবা 'উ'কারে যেটি সমস্ত (undifferentiated) ভাবে ছিল, সেটি 'উব্' এই আকারে আসিয়া নিজেকে ব্যস্ত (differentiated) করিল। অর্থাৎ সঙ্কোচন এবং প্রসারণে দুইটি আর শুধুই তাহাই রহিল না, তারা একটা পরস্পরাপেক্ষি যুগ্মকে (Polarityতে) আপনাদিগকে যেন সাজাইয়া লইল। ইহার ফলে যেটি 'সঙ্কুচৎ'মাত্র ছিল সেটি হইল 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ'। 'সুবঃ' এই শব্দে মহাপ্রাণ যে 'স' কার—তার এই 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ।

সুবঃ 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' আকৃতি

'সুবঃ' এই শব্দে মহাপ্রাণ যে 'স'কার—তার এই 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ'-রূপটি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে অদেখা সত্তা এবং শক্তির ভাণ্ডারকে আমরা 'স্বঃ' বলিয়া অভিহিত করিতেছি, সেটিকে 'সুবঃ' এই নামে অভিহিত করিলে তার এবংবিধ কূর্মবৎ 'সঙ্কুচৎ-প্রসরৎ' রূপটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। 'সুবঃ' এর অন্তর্নিহিত কূর্মবৃত্তিটি এই দেখা জগতের সর্বত্র, কি স্থূলে, কি সূক্ষ্মে পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সমগ্রভাবে যে 'প্রসরৎ' (Expanding) এটি বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি নানা যুক্তিবলে সাব্যস্ত করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু শুধুই কি প্রসরৎ, সঙ্কুচৎ (Contracting) নয়? যে সমস্ত যুক্তিবলে ব্রহ্মাণ্ডে একদিকে প্রসারণ আছে মনে করিতেছি, সেই সমস্ত অথবা তদনুরূপ যুক্তিবলে প্রতিপাদিত হইবে যে ব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচৎও হইতে পারে। বিরাটের কথা বাদ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিখিল সজীব অথবা নির্জীব পদার্থে এই কূর্মবৃত্তি স্পষ্টতঃই দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে এই দেখা জগতের উৎপত্তি এবং বিবৃতির নিমিত্ত অদেখাটিকে কেবলমাত্র স্বঃ বলিলেই হইবে না, সেটিকে আমাদের 'সুবঃ'ও বলিতে হইবে। আরোহের দিক হইতে দেখিলে 'উব্' এই মিথুনটি তাহাদের ব্যবধান ক্রমশঃ যেন হারাইয়া এক অভিন্ন 'ব'কারেই পর্যবসিত হইতে চায়। কিন্তু আবার অবরোহের দিক হইতে দেখিলে সেই 'ব'কার আবার যেন নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া 'উ'কার এবং 'ব'কার এই মিথুনে পরিণত হইতেছে। জপাদি সকল সাধনেও এই 'স্বঃ' এবং 'সুবঃ' দুটিকে অন্বেষণ করিতে হইবে। এ দুটিকে অন্বেষণ করিয়া যে সাধক অগ্রসর হয় সেই কুশল সাধক। জপাদি ক্রিয়ায় বাক্-এর, চিত্তের এবং প্রাণের একটা কূর্মবৎ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ক্রিয়ার কিয়দংশ স্পষ্ট চেতনার আলোকে আপনাকে যেন প্রসারিত করে—তখন দেখিতে পাই ক্রিয়াটি এই ভাবে এই আকারে চলিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই ক্রিয়াটি যেন কূর্মবৎ আপনাকে অদেখার অন্তরালে গুটাইয়া লয়—তখন আর দেখিতে পাই না ক্রিয়াটি কিভাবে কিরূপে চলিতেছে। অন্ধকারে খদ্যোতের মত একটিবার জ্বলিয়া, ক্ষণেকের জন্য আপনাকে প্রকাশ করিয়া, সেটি আবার যেন নিভিয়া যায়। আবার জপকালে যেটি প্রকট, জপ সমাপনে সেটি আচম্বিতে অথবা শনৈঃ শনৈঃ অপ্রকট হইয়া যায়। শুধু জপক্রিয়া সম্বন্ধে নয়, সে ক্রিয়া যে সংস্কার অথবা ফল নির্মাণ করিয়া চলিয়াছে, তার সম্বন্ধেও

এই ভেদটি লক্ষ্য করিতে হয়। কোন কিছুরই পূর্ণ রেখাচিত্রটি আমাদের সামনে প্রতিভাত হইয়া নাই। সে রেখাচিত্রের এখানে একটু, ওখানে একটু, এখন একটু, তখন একটু, এইভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিকেই আমরা সাধারণতঃ আমাদের চোখের সামনে ভাসিতে দেখিতে পাই। যেমনধারা বাতাসে অদৃশ্য জলীয় বাষ্পরাশিকে আমরা খণ্ড খণ্ড আকারে দেখিতে পাই যখন সেটি মেঘরূপে এখানে সেখানে ভাসিয়া বেড়ায়। যেটি সমগ্র, যেটি মহান, সেটিকে দেখিতে না পাইয়া খণ্ড খণ্ড অনুভূতি লইয়াই আমাদের থাকিতে হয় বলিয়া আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাকে পদে পদে এতটা বিভ্রান্ত হইতে হয়। যে অনুভূতির স্তরে উঠিলে যেটি মহান সেটি মহানরূপেই আপনাকে প্রতিভাত করিবে, অনুভূতির সেই স্তরের নাম 'মহঃ' অথবা মহর্লোক, যার কথা আমরা পরের সূত্রে আলোচনা করিব। এ স্থলে 'স্বঃ' এবং 'সুবঃ' এই দুইটি শব্দের তত্ত্বগত এবং প্রয়োগগত বৈলক্ষণ্যটি স্মরণ রাখিতে হইবে।

২০। 'অয়ং' এবং 'অসৌ' এতদুভয় প্রত্যয়ের যেটি অপ্রতিযোগী, কিনা, বিষয়ীভূত নয়, সেটিকে বলে ভুবঃ।।

'এই' এবং 'সেই' এর ভিতর যে ব্যবধান, কি ভাবে সেটি ভাবনা করিতে হইবে? 'ব্যবধান' কি উদাসীন (Neutral)?

'অয়ং এবং 'অসৌ'—এই এবং ঐ—এই দুটি প্রত্যয় পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের অপেক্ষা রাখে অর্থাৎ একটা ব্যবধান মাঝে রাখিয়াই 'এই' এবং 'ঐ' পরস্পরকে আলাদা করিয়া রাখিয়াছে। ব্যবধান স্থূল হউক অথবা সূক্ষ্ম হউক, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু ব্যবধান একটা থাকা চাই-ই। ব্যবধানটি দেশগত, কালগত, বস্তুগত, অথবা সম্বন্ধগত হইতে পারে। যথা—ইহা যেখানে রহিয়াছে, উহা সেখানে নাই; এটি যখন ঘটিতেছে ওটি তখন ঘটিতেছে না; এটি একবস্তু ওটি অন্যবস্তু; এটি যে সম্বন্ধে রহিয়াছে ওটি সে সম্বন্ধে নাই। সুতরাং ব্যবধান বলিলে যেন কেবলমাত্র দেশের ব্যবধান (Space interval) মনে না করি। যদ্দ্বারা ব্যবধান ঘটে, অর্থাৎ যেটি 'এই' কে 'উহা' হইতে দেশে, কালে, বস্তুতে অথবা সম্বন্ধে তফাৎ করিয়া রাখে, সে ব্যবধানটিকে 'এই' অথবা 'ঐ' এ দুইএর কোন আখ্যাই দেওয়া

যায় না। অবশ্য যখন একটা ব্যবধানের সঙ্গে অন্য ব্যবধানের তুলনা করি (যেমন কোন এক ত্রিভুজের তিনটি কৌণিক বিন্দুর পরস্পর ব্যবধান), সেখানে এই ব্যবধান এবং ঐ ব্যবধান এরূপ ব্যবহার সম্ভাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু ক এবং খ দুইটি বিন্দুর মধ্যে যে ব্যবধান সেটিকে যৎকালে ব্যবধান বলিয়াই দেখিতেছি, অন্য কোন কল্পিত বা বাস্তব ব্যবধানের সঙ্গে তার তুলনা করিতেছি না, তৎকালে সেটি 'এই'ও নয় অথবা 'ঐ'ও নয়। এই ব্যবধান নিমিত্তই ক এবং খ এর পরস্পর দূরত্ব এবং তন্নিবন্ধন তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইতেছে। যেমন সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে যে বর্তমান ব্যবধানটি রহিয়াছে সেটি মোটামুটি একরূপ থাকিয়াই সূর্য এবং পৃথিবীর পরস্পর সম্বন্ধটি 'প্রায়' একরূপই বজায় রাখিয়াছে। 'প্রায়' বলা হইতেছে এই জন্য যে সূর্যের চারিধারে পৃথিবীর আবর্তন পথটি ঠিক বৃত্ত নহে কিন্তু বৃত্তাভাস (Ellipse)। সুতরাং দূরত্বটি সবসময় এক থাকে না এবং তার ফলে পৃথিবীর উপরে সূর্যের প্রভাব সর্বক্ষণ ঠিক একভাবেও থাকে না। একটা অণুর ভিতরেও কোনো nucleus বা কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া একাধিক ইলেকট্রন্ পাক খাইতেছে। সে স্থলে দেশের পরিমাণ এত যৎসামান্য যে কল্পনাতেও আনা কঠিন। স্থান অল্প হইলেও বেগটি কিন্তু ভীষণ। এত ভীষণ যে আলোকের গতির সঙ্গে সেটি তুলিত হইতে পারে। একটা ইলেকট্রনের গতিবেগের তুলনায় পৃথিব্যাদি জ্যোতিষ্কগুলিকে প্রায় পঙ্গু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মহাশ্চর্য রহস্য এই যে ঐ আণবিক দেশে (Atomic spaceএ) কেন্দ্রের সঙ্গে ইলেক্ট্রনগুলির এবং ইলেক্ট্রনগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রচুর ব্যবধান বিদ্যমান থাকে। কোন এক নির্দিষ্ট ইলেক্ট্রন কেন্দ্রের চতুর্দিকে যে ব্যবধানটি বজায় রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছে, সে ব্যবধানের যদি হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে তবে সে আণবিক জগতে একটা বিপ্লব ঘটিবে। অর্থাৎ ব্যবধানই হইল জগতে পদার্থ নিচয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ামক।

প্রণবের মাঝেও উদাহৃত

প্রাণের এবং চেতনার রাজ্যে আসিয়াও এই ব্যবধান তত্ত্বটিকে (Integral Principle) সম্পর্কের নিয়ামক ভাবেই আমরা দেখিতে পাই। অথচ এটি হইল স্বয়ং উদাসীন। প্রণবের 'অ'কার এবং 'ম' কারের মধ্যে 'উ'কার রূপে এটি বর্তমান। ইনি হইলেন ভুবঃ।

অন্তরীক্ষ—শূন্য মাত্র নয়

অতএব পাইতেছি যে ব্যবধান নিজে উদাসীন হইয়াও শূন্যমাত্র নয়। ব্যবধানটি ব্যাপিয়া ঈথারের মত কোন সূক্ষ্ম পদার্থ আছে অথবা নাই এটি আমাদের বিচারের বিষয় নয়। ঈথার যদি বা নাও থাকে ব্যবহিত পদার্থনিচয়ের পরস্পর প্রভাব এবং সম্বন্ধ নিয়ামক কোন একপ্রকার সংস্থা বিদ্যমান আছেই, এটি আমাদের মনে করিতে হইবে। যেমনধারা আইনষ্টাইনের 'আপেক্ষিকতাবাদে' যেখানেই কোন জড় পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, (যথা সূর্য) সেইখানেই তার সমীপবর্তী দেশে কোন এক নির্দিষ্ট আকারের এবং প্রকারের বক্রতা (curvature) রহিয়াছে। এই হেতু যখন কোন দূরবর্তী নক্ষত্র হইতে সূর্যের নিকট হইয়া কোন রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তখন সেটি ঠিক ইউক্লিডের জ্যামিতির সরলরেখায় আসিয়া পড়ে না, রশ্মিটি বক্র হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। নক্ষত্র হইতে সূর্য এবং সূর্য হইতে আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত যে অন্তরীক্ষ বা ব্যবধান সেটি শূন্যমাত্র হইলে রশ্মিটির বক্রতা হইবার কোন হেতু ঘটিত না। কিন্তু অন্তরীক্ষ তো শূন্য বস্তু নয়, তার নিজস্ব একটা আকৃতি-প্রকৃতি আছে।

বৈখরী মধ্যমা এবং পশ্যন্তী এই ত্রিবিধ জপে ঐ তিন ব্যাহৃতি কি ভাবে উদাহৃত? মধ্যে ব্যবধান—সেতু ও সন্ধি। ব্যবধানের নিয়ামকত্ব

বৈখরীজপে মন্ত্রের যেটি যথার্থ স্বরূপ—সেটি আমার কাছে প্রকাশিত থাকে না, এবং মন্ত্রের যিনি লক্ষ্য অথবা দেবতা তিনিও আমার কাছে অপ্রকট থাকেন। পশ্যন্তীস্তরে যাইতে পারিলে মন্ত্র এবং মন্ত্রার্থের স্বরূপটি দর্শনের বিষয় হইয়া থাকে। কিন্তু এ দুই-এর মাঝখানে একটা ব্যবধান বা অন্তরীক্ষ রহিয়াছে, যেটিকে বলে মধ্যমা। বৈখরী যদি হয় ভূঃ এবং পশ্যন্তী যদি হয় স্বঃ, তবে এই মধ্যমা হইবে ভুবঃ। কিন্তু এই ভুবঃ একটা ফাঁকা ব্যবধান মাত্র তো নয়। ভূঃ এবং স্বঃ, এই দুই-এর পরস্পর প্রভাব এবং তার সম্বন্ধটি নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছে এই ভুবঃ। অর্থাৎ মাঝখানে এই মধ্যমার ব্যবধানই নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেছে যে পশ্যন্তীর তুলনায় আমার জপ বৈখরীর ঠিক কোন্ অবস্থা বিশেষে চলিতেছে বা না

চলিতেছে। কোন কোন ভাগ্যবানের জপক্রিয়াটি বৈখরীর এত উচ্চ ভূমিতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে যে তথা হইতে পশ্যন্তীর দূরত্ব আর অধিক নহে। পশ্যন্তী নিকট হইয়াছে বলিয়া পশ্যন্তীর প্রভাব বৈখরী জপের উপর ঘনিষ্ঠ হইতে যেন ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে। পশ্যন্তীর জ্যোতিঃ এবং রস বৈখরীর মধ্যে যেন আপনাকে ঢালিয়া দিতে চায়। তার ফলে বৈখরীর মন্ত্র এবং বৈখরীর দেবতা পশ্যন্তীর জ্যোতিতে এতটা উজ্জ্বল এবং রসে এতটা মধুর হইয়া উঠিতেছে যে আমার জপে যেন আলোক-পুলকের অবধি রহিতেছে না। আমি ভাবিতেছি—হে আমার ইষ্টমন্ত্র! এই তো তুমি তোমার উজ্জ্বল রূপটি আমার কাছে প্রকট করিলে, দেখো এ রূপ যেন আর হারাইয়া না বসি! কেবল ইষ্টমন্ত্র নয়, আমার অভীষ্ট দেবতাকেও তখন যেন দেখিতে পাইলাম, মনে ভাবি। কিন্তু বৈখরীস্তরে এ অনুভূতিটি কদাচিৎ আসিলেও স্থায়ী হয় না। কেন না, তখনও কিছু ব্যবধান অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব দেখিতেছি যে বৈখরী জপেও সাধকের যেটি সংস্থা সেটি একরূপ হয় না বা থাকে না। উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে সংস্থা ত্রিবিধ মনে করা যায়। এই তিনটি সংস্থাতেই মধ্যমারূপ ব্যবধানটি অবশ্য একই হইতে পারে না। এই জন্য ভুবঃ 'এই' এবং 'ঐ' এই দুই এর কোনটাই না হইয়াও তাদের যেটি পারস্পরিক সংস্থান সেটির সংস্থাপক।

ভুবঃ শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা

ভুবঃ এই শব্দেও দেখিতেছি 'উ' কার 'উব্' এইরূপ গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ 'ভূঃ'তে যেটি 'উ'কার মাত্র সেটি ভুবঃ-তে—'উ'কার—এবং 'ব'কার, এই মিথুন রূপটি পাইয়াছে। এই মিথুন রূপের যেটি তাৎপর্য সেটি আমরা পূর্বে বুঝিয়াছি। 'ভুবঃ' শব্দে—'উব্' এই যুগ্মকটি থাকাতে ইহা সূচিত হইতেছে যে অন্তরীক্ষ অচল, নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিদ্যমান নাই। তার সঙ্কোচ এবং প্রসার ঘটিতেছে এবং তার ফলে পদার্থনিচয়ের যেটি সংস্থা (ensemble) সেটি পরিবর্তিত হইতেছে। প্রণবের 'অ'কার এবং 'ম' কারের মধ্যে 'উ' কার রূপে ভুবঃ বিদ্যমান রহিয়া অন্তরীক্ষের এই সমর্থ শক্তি বিগ্রহটি আমাদের কাছে প্রকাশিত করিতেছে।

২১ ॥ 'অয়ং' এবং 'অসৌ'—এতদুভয় প্রত্যয়েরই যেটি বিষয় সেইটি মহঃ ॥

'এই' এবং 'সেই' জড়াইয়া বৃহত্তর অনুভূতি কিভাবে হইতে পারে? অন্ধকারে বনে পথ চলার দৃষ্টান্ত। অংশতঃ ও ক্রমিক খ্যাতি এবং সমগ্র, অক্রমিক খ্যাতি

আমাদের সাধারণ অনুভূতিতে যেটা 'এই', সেটা তৎকালে 'ঐ' বা 'সেই' হয় না। আবার যেটা 'ঐ' বা 'সেই'রূপে রহিয়াছে, সেটা তৎকালে 'এই' হয় না। 'এই' রূপে যেটি এখন প্রত্যক্ষ-গোচর হইতেছে সেটি কোন না কোন ভাবে দূরে বা অন্তরালে সরিয়া না যাইলে সেটিকে 'সেই' বলিতে পারা যায় না। যে বৃক্ষটি দেখিতেছি সে বৃক্ষটি 'এই' বৃক্ষ না হইয়া 'সেই' বৃক্ষ হয় কি ভাবে? যখন সেটিকে আর দেখিতেছি না কিন্তু তার কথা স্মরণ করিতেছি। কিন্তু 'এই সেই দেবদত্ত' এই ভাবে যখন প্রত্যয়টি হইয়া থাকে, তখন সে প্রত্যয়ে 'এই' এবং 'সেই' দুই-ই একত্র হইতেছে দেখি। এই প্রত্যয় দুটি তুলনা করিলে দেখা যায় যে দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক ব্যাপক—বর্তমানে দৃষ্ট দেবদত্তকে ইহা যেমন বিষয় করিতেছে তেমনি আবার অতীতে দৃষ্ট দেবদত্তকেও এটি বিষয় করিতেছে।

অপর আর একটি দৃষ্টান্ত লও। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীতে পথ চলিতেছি। হাতে একটি টর্চ রহিয়াছে। সেটি মাঝে মাঝে জ্বালিয়া চলার পথে ঠিক সামনে কি আছে অথবা তার আশে পাশে কি আছে দেখিয়া লইতেছি। যখন যেখানটাতে টর্চের আলো পড়িতেছে, তখন সেই খানটা আমার কাছে 'এই' রূপে প্রতিভাত হইতেছে। টর্চের আলো যখন অন্য জায়গায় গিয়া পড়িল তখন আগের 'এই', 'সেই' হইয়া দাঁড়াইল—অর্থাৎ যেটা দেখারূপে বিদ্যমান ছিল সেটা অ-দেখারূপ পাইল। কিন্তু এইভাবে পথ চলিতে চলিতে যদি একবার মেঘে বিদ্যুদ্ বিকাশ হয় তাহা হইলে সেই বিদ্যুতের ছটায় আমার সমস্ত পথটি এবং পথের পরিস্থিতিটি এক সঙ্গেই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া 'এই' রূপে প্রতিভাত হয়। এই বিপুল 'এই' এর মধ্যে কত যে ছোট ছোট 'এই' 'সেই' স্থান পাইয়াছে তার ইয়ত্তা কে করিবে? এই প্রকার যে বিপুল অনুভূতি, যাতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'এই' এবং 'সেই' একত্র সম্মিলিত হইয়া

প্রকাশিত হয়, তার নাম হইতেছে মহঃ। বৃহদারণ্যকে আছে ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া তাঁর পূর্ব পূর্ব সকল জন্মেরই স্মরণ করিতেছেন—"মনুরভবম্"—ইত্যাদি। এ স্থলে তাঁর এই বিরাট অনুভূতিতে—কত অযুত জন্মের 'সেই' আসিয়া 'এই' এর মধ্যে আপনাদিগকে মিলাইয়া দিতেছে, যেমনধারা নানা দিগ্‌দেশ হইতে সরিৎ ছুটিয়া আসিয়া এক সিন্ধুতেই আপনাদিগকে মিলাইয়া দেয়। সুতরাং এই মহঃ হইল এমন একটা মহান প্রত্যয় যার মধ্যে 'এই' এবং 'সেই' আসিয়া এইভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকে।

বস্তু, শক্তি ও অনুভূতির দিক দিয়া মহর্লোকের ব্যঞ্জনা।
মহঃ কোনও স্থাণু (Static) সামগ্রী নয়,
কিন্তু বিবর্দ্ধিষ্ণু (Dynamic)

বলা বাহুল্য, মহঃ একটা রহস্য পরিভাষা। যেখানে কোন একটা ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ জ্ঞানে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন অবস্থায় লব্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগুলি সমাহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং যেখানে 'সেই' এবং 'এই' পরস্পর আলিঙ্গানাবদ্ধ হইয়াই যেন বিদ্যমান, সেইখানেই মহর্লোক। বিশেষ বিশেষ অনুভবগুলির সামান্যাধিকরণ্য হইয়া তৎতদ্ বিশেষ সহকৃত সামান্য জ্ঞান যদ্দ্বারা হয়, সেইটি হইল মহঃ। ছোট ছোট নিয়মগুলিকে একট বড় নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখায় এই মহঃ। কেবলমাত্র অনুভবের দিক দিয়া নয়, বস্তু এবং তার শক্তির দিক দিয়াও মহঃকে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। যেমনধারা জড়-জগতের অশেষ-প্রকার পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কতকগুলি মৌলিক উপাদান পাইলাম। সেগুলিকে আবার বিশ্লেষণ করিয়া পাইলাম শক্তি বা এনার্জি। এই প্রকার বিশ্লেষণ এবং সমীকরণের ফলে আমরা মহর্লোকের দিকেই অগ্রসর হইতেছি, সন্দেহ নাই। যাত্রা সুরু হইয়াছে বটে কিন্তু চলার পথটি এখনও অনেক বাকী। কীট পতঙ্গাদির তুলনায় মানুষের জ্ঞান মহঃ, আবার সাধারণ মানুষের জ্ঞানের তুলনায় বিজ্ঞানের জ্ঞান মহঃ। সুতরাং যেটি মহঃ তার একটা ক্রমোন্নত ধারা পাইতেছি। এ ধারার শেষ অথবা কাষ্ঠা কোথায়? যিনি 'মহতো মহীয়ান্' সেই নিরতিশয় পূর্ণ জ্ঞানই ইহার পরাকাষ্ঠা। তবে নিম্নস্তরেও পূর্বোক্ত লক্ষণ বিচার পূর্বক মহঃ এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

মহর্লোকের জ্ঞানের অসাধারণত্ব কিসে?

আমাদের সাধারণ জ্ঞানগুলি ক্রমিক, কিনা, একটার পর একটা হইতেছে। এই মুহূর্তে যে জ্ঞানটিকে 'এই' বলিয়া পাইতেছি পরমুহূর্তেই সেটি 'সেই' হইয়া স্মরণের বিষয় হইতেছে। অপিচ, ভবিষ্যতে যেটি অনাগত রূপে রহিয়াছে সেটি হয়তো এই মুহূর্তে সমাগত হইয়া 'এই' হইতেছে। জ্ঞানের এই ক্রমিকতা সত্ত্বেও বর্তমান মুহূর্তে আমরা অতীতের 'সেই'কে স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যতের 'ঐ' কে কল্পনা অথবা অনুমান করিয়া বর্তমানের 'এই' তে তাদের মিশাইয়া লইতে পারি। এবম্বিধ মিলনে মহর্লোকের একটা ছায়াচিত্র আমরা পাইলাম বটে, কিন্তু যথার্থ মহর্লোক অন্যরূপ। আমরা পূর্বে অন্ধকারে পথ চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে টর্চের ব্যবহার করিয়া একপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি কিন্তু যখন বিদ্যুদ্‌বিকাশ হইয়া সমস্ত পরিস্থিতিটি আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে, তখন আর এক স্বতন্ত্র রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের হইয়া থাকে। সে অভিজ্ঞতায় পূর্ব-পূর্ব 'সেই' গুলি কেবলমাত্র স্মৃতিরূপে উপস্থিত হইয়া 'এই' এর সঙ্গে মিলিত হয় না, পরন্তু অতীতের সকল 'এই' এবং ভবিষ্যতের সকল 'ঐ' বর্তমানের এক বিপুল 'এই' এর জ্ঞানে সম্মিলিত হইয়া আপনারাও 'এই' হইয়া যায়। স্মরণ অথবা কল্পনাদির বেলায় কিন্তু এমনটি ঘটে না। সিদ্ধ এবং ঋষিদের যে ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান, সেটি অস্মদাদির মত স্মৃতি এবং কল্পনা সম্বলিত জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে যে সুস্পষ্টতা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে সেগুলি স্মৃতিতে, অনুমানে অথবা কল্পনাতে থাকে না। বৈজ্ঞানিকেরা জগতের বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে অতীতের অবস্থা পরম্পরা বহুদূর পর্যন্ত অনুমান করিতে পারেন, এবং তদ্রূপ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একটা কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু এবম্বিধ জ্ঞান সুস্পষ্ট, অসন্দিগ্ধ জ্ঞান নয়। সিদ্ধ অথবা ঋষির যে জ্ঞান ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্টাদি বস্তু সম্বন্ধে, সেটি এজাতীয় জ্ঞান নয়। অন্ধকারে বিদ্যুদ্‌বিকাশের যে দৃষ্টান্ত আমরা লইয়াছি, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারা, আর্ষ-জ্ঞান যে কি প্রকার সেটি বুঝিতে হইবে। আমাদের প্রত্যক্ষজ্ঞানের তুলনায় আর্ষজ্ঞান কেবলমাত্র যে অধিক ব্যাপক এবং অক্রমিক এমন নয় কিন্তু সে জ্ঞানের সুস্পষ্টতা এবং সৌষ্ঠব বেশী। আমি আমার এই সামনের বৃক্ষটিকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি ঋষি কোন অতীত অথবা অনাগত বস্তু তার চাইতে বেশী সত্যভাবেই প্রত্যক্ষ

করেন সন্দেহ নাই। যেমনধারা আমার এই চর্মচক্ষে দৃষ্ট কোন পদার্থ অণুবীক্ষণ অথবা দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আরও সুস্পষ্ট এবং যথার্থভাবে আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং দেখিতেছি যে মহর্লোক স্তরে না যাইতে পারিলে এবংবিধ অক্রমিক, সুস্পষ্ট, যথার্থ জ্ঞানলাভের সম্ভারনাটি ঘটে না। এ স্তরে পৌঁছিলে যে জ্ঞানটি হয় সেটিকে বোধি, সম্বোধি, প্রাতিভজ্ঞান ইত্যাদি পর্যায়ে ফেলাই সঙ্গত।

মহঃ এই শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা

মহঃ এই শব্দের আদিতে 'ম'কার রহিয়াছে এবং পরে 'হঃ' এই 'র'কার যুক্ত হ'কার রহিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে 'অ'কার, 'উ'কার এবং 'ম'-কারের পর যেন একটা সন্ধিরেখা আছে। আমাদের সাধারণ বাক্ এবং সাধারণ অনুভূতি এই সন্ধিরেখাটি পার হইয়া যাইতে পারে না; তার এধারেই তাদের বৃত্তি সচরাচর হইয়া থাকে। বাকের দিক হইতে এই তিনমাত্রার পর যে অর্দ্ধমাত্রা, নাদ বিন্দু এবং অমাত্র রহিয়াছে, সেগুলির উন্মেষ সচরাচর ঘটে না যখন আমরা প্রণব অথবা অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করি। অনুভূতির দিক হইতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের ঊর্দ্ধে যেটি রহিয়াছে, সেটির খোঁজ আমরা পাই না। সুতরাং 'ম'কারের পর যেন একটা বাঁধ দেওয়া রহিয়াছে, যেটি অতিক্রম করিতে আমাদের বাক্য এবং মন সচরাচর অপারগ হয়। এই নৈসর্গিক বাঁধটি ভাঙিয়া দেয় মহাপ্রাণ স্বরূপ যে 'হ'কার সেটি। 'ম'কারে আসিয়া যে প্রাণবৃত্তি যেন ফুরাইয়াই গেল, 'হ'কার সেটিকে মহাপ্রাণময় করিয়া ঊর্দ্ধলোকে উৎসারিত করিয়া দিল। 'হ'কারের সঙ্গে যে 'র'কার যুক্ত রহিয়াছে সেটি অগ্নির বাচক। 'ম'কারে আসিয়া যে অগ্নিশিখা নির্বাপিত-প্রায় হইয়াছিল, সেই অগ্নিশিখা 'হ'কারের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইয়া অসীম ঊর্দ্ধলোকের অভিমুখে আবার আপন শিখা বিস্তার করিল। যেখানে শেষ হইল ভাবিয়াছিলাম সেইখানে আরম্ভ হইল নব নব মহান হইতে মহত্তর জ্ঞানরাশি। মহঃ এই রহস্য শব্দদ্বারা এই অভিনব আরম্ভ ও প্রকাশটি সূচিত হইতেছে॥৬০॥

জনি প্রত্যয় কি ভাবে বুঝিতে হইবে?
বিশ্ব-ব্যবহারের মূল কোথায়?

২২। অসি অথবা জনি প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী, কিনা, বিষয় তাকে বলে জন॥

জনি প্রত্যয় বলিতে কি বুঝিতে হইবে? বিশ্বে অহরহঃ সব কিছু জন্মিতেছে। জন্মিয়া কিন্তু একভাবে রহিতেছে না, নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। এই অবিরাম পরিণামধারায় জীবের বুদ্ধি আপন ব্যবহার চালাইবার নিমিত্ত ছয়টি ভাব বা অবস্থা কল্পনা করিয়া লয়। কোন কিছু জন্মিল, তারপর সেটি যেন আছে এই ভাবে মনে হইল, তারপর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেখি যে সেটি একভাবে স্থির হইয়া নাই, পরিবর্তিত হইতেছে, তারপর কিছু সময়ের জন্য মনে হয় সেটির পরিবর্তন বৃদ্ধির দিকে, অর্থাৎ সেটি বাড়িতেছে, তারপর দেখি সেটি আর বাড়িতেছে না, হ্রাসের দিকে যাইতেছে, অর্থাৎ ক্ষীণ হইতেছে, তারপর দেখি সেটি নষ্ট হইয়া বা মরিয়া গেল। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত এই পরিণামধারায় মোটামুটি ছয়টি ধাপ দেখিতে পাইলাম। পরিণামটিকে ছয়ভাবে দেখিলেও মূলে সেটি একেরই ভাব। "হওয়া" এই একটি ভাবই আপনাকে ছয় রকম করিয়া দেখাইতেছে। 'হওয়া' মাত্রই যদি 'হওয়া' ব্যাপারটি বন্ধ হইয়া যায় তবে তো পরিণাম বলিয়া কোন কিছুই ঘটিতে পারে না, সুতরাং ৩, ৫, অথবা ৬ কোন ভাবেই সেটিকে মনে করা সম্ভব হয় না। অতএব 'হওয়া'টিকে অবিচ্ছেদে রহিয়া যাইতেই হয়। ইহাকে বলে Continuity of Becoming। Being অথবা অস্তিতার যেমনধারা অখণ্ডতা আছে, Becoming বা হওয়ার ঠিক সেইভাবে অখণ্ডতা না রহিলেও প্রবাহরূপে অখণ্ডতা অবশ্যই রহিয়াছে মনে করিতে হইবে। কোন কোন দৃষ্টিতে এই গতি বা ধারারূপটি সত্য; অক্ষর, অপরিণামী, নিত্য বলিয়া কিছুই নাই। এদেশে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ এবং অপরাপর দেশেও প্রাচীন এবং অর্বাচীন কেহ কেহ এবংবিধ দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিয়াছে। পক্ষান্তরে, অন্য দৃষ্টিতে অক্ষর নিত্যই সত্য বস্তু, তাতে জন্মাদি যে পরিণাম হইতেছে মনে হয় সেটি কল্পিত। কিন্তু কল্পিত হইলেও সেটি ব্যবহারিক ভাবে সত্য, অর্থাৎ যাবৎ এই জগৎ প্রপঞ্চের জ্ঞান হইতেছে তাবৎ 'হইতেছে' এই ভাবেই জ্ঞানটি হইতেছে। সুতরাং যাবৎ ব্যবহার তাবৎ 'হওয়া' বা 'হইতেছে' এইটিকে ছাড়িয়া দিবার উপায় নাই। ব্যবহারের মূলেই এটি বিদ্যমান। এটি না রহিলে সব অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। নিখিল ব্যবহারের মূলীভূত এই যে "হওয়া"

বা "হইতেছে" বোধটি, এটিকে বলে জনি প্রত্যয়। এই জনি প্রত্যয়ের বিষয় হইল জন। এই জনলোকে উপস্থিত হইয়া আমরা জগদনুভূতির পঞ্চম ভূমিতে উপনীত হইলাম। প্রথমে "এই", তারপর "সেই", তারপর না 'এই' না 'সেই', তারপর "সেই এবং এই"—চারিটি ভূমি অতিক্রম করিয়া এই সর্ববিধ ব্যবহার যেটিকে আশ্রয় করিয়া হইতেছে, সেই তত্ত্বে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই তত্ত্ব হইল "হওয়া" বা হইতেছে কিনা, জনি।

'জনি' বা মূল 'হওয়া' কোন অধিকরণে সম্ভাবিত হইতে পারে? অস্তি ও অস্মি।

"একাঽহং বহু স্যাম্" এই বাক্যের মৌলিক বিশ্লেষণ

কোন একটি লতা ছিন্ন করিয়াও যদি তাহার মূলটি বজায় রাখিয়া দিই—তবে সেই মূল হইতে আবার লতার উদ্‌গম হইয়া থাকে, দেখি। এই ব্যাপারটি বার বার সংঘটিত হইতে পারে। সুতরাং বারবার লতাটি এমন একটা কিছু হইয়া রহিয়াছে যদ্দ্বারা এই বারবার হওয়াটি সম্ভাবিত হইতেছে। আমাদের চিত্তে নিয়ত অশেষ বৃত্তির উদয় এবং লয় হইতেছে। কিন্তু তাদের মূলগুলি সংস্কাররূপে রহিয়াছে বলিয়াই এই প্রকার উদয় এবং লয় হইতেছে। সুতরাং সকলপ্রকার বিশেষ হওয়ার মূলে এবং আধাররূপে একটা সামান্যভাবে 'হওয়া' থাকা চাই। যেমনধারা জলাশয়টি হইয়া রহিয়াছে বলিয়া তাতে বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং স্থানে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদির উদ্ভব হইতেছে। আবার জলাশয়টি হইয়াছে এই কারণে যে তৎপূর্বে জল এই বস্তুটি হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরম্পরাক্রমে আমরা এক মূল 'হওয়া'তে গিয়া উপনীত হই। সর্ববিধ 'হওয়া'ই হইল সেই মূল হওয়ার বিশেষ বিশেষ রূপ। যে ব্যাপারটিকে নষ্ট হওয়া বা লয় হওয়া নাম দিতেছি সেটিও এই মূল 'হওয়া'র একটা প্রকারভেদ মাত্র। সুতরাং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য এই—মূল, দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদহীন যে "হওয়া" তাহাতেই। সৃষ্টিসূক্তে বেদ যে বলিয়াছেন—অভীদ্ধ তপঃ হইতে ঋত এবং সত্য "অধ্যজায়ত", কিনা, তদধিকরণে জাত হইলেন, সেটি এই মূল জনি অথবা হওয়াকে উদ্দেশ করিয়াই। 'তদধিকরণে' বলা হইল এই নিমিত্ত যে

এবংবিধ হওয়ারও মূলে এবং তাহার আধাররূপে 'অস্তি' এবং 'অস্মি' এই দুইটি ভাব থাকার অপেক্ষা রহিয়াছে। আমরা পরের দুইটি সূত্রে সত্য এবং তপঃ এই দুইটি রূপে এ দুইএর পরিচয় পাইব। "একোঽহম্ বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতিতেও সপ্তব্যাহৃতির এই তিন মূল ব্যাহৃতি আমরা দেখিতে পাই। যে মূল বস্তুটি 'অস্তি' মাত্র রূপে চিরবিদ্যমান, তিনি 'একোঽহম্' এইভাবে নিজেই নিজেকে 'অস্মি' প্রত্যয়ের বিষয় করিলেন। এইটি তাঁর জ্ঞানময় তপঃ। তারপর—"বহু হইব" এই প্রকার সঙ্কল্পরূপ তিনি ধারণ করিলেন। এইটি হইল তাঁর মূল 'হওয়া'রূপ, যাহা হইতে সকল কিছুই হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। 'অস্তিতা' এবং 'অস্মিতা'র অধিকরণে এবংবিধ 'হওয়া'টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ 'আছে' এবং 'আছি' এই দুইটি ভাবকে আধার করিয়াই 'হইব' এই ভাবটি সম্ভাবিত হইয়া থাকে। এই অপেক্ষাটি স্মরণ রাখিয়াই "অসদেব ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 'অসৎ' মানে ঐকান্তিক শূন্য হইতে পারে না।

'জন' এর আগেকার চারিটি লোকে চারি প্রকারের রূপায়ণ

শব্দের দিক হইতে এটি লক্ষ্য করিতে হইবে ভূরাদি চারিটি তত্ত্বের যেগুলি নাম সেগুলির অন্তে 'র' জাত বিসর্গ রহিয়াছে, কিন্তু 'জন' এই তত্ত্বে সেটি আর নাই। পূর্বে চারিটি তত্ত্বে মূল 'হওয়া' আপনাকে চারিটি আকারে রূপায়িত করিয়া পরস্পরের সঙ্গে শক্তির আদান প্রদান করিতেছে। এই প্রকার রূপায়ণ এবং শক্তি বিনিময় 'র' জাত বিসর্গের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। 'র'কার অগ্নির বীজ, সুতরাং পূর্বোক্ত চারিটি তত্ত্বে অগ্নিকে বিশেষ এবং ব্যক্তরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু 'জন' এই তত্ত্বে অগ্নির এই বিশেষ এবং ব্যক্ত রূপ চতুষ্টয় এখনও আবির্ভূত হয় নাই। আমরা অগ্নির যে চারিটি রূপের সঙ্গে পরিচিত আছি তদ্দ্বারা ইহার ধারণা কতকটা হইতে পারে। জড় ব্রহ্মাণ্ডে অগ্নির যে সূক্ষ্ম ব্যাপক রূপটি আমরা জানিতে পারিয়াছি বিজ্ঞান তার নাম দিয়াছে তড়িৎ শক্তি। এ শক্তি স্বরূপে যে কি, বিজ্ঞানও তা জানে না। কিন্তু যে সমস্ত নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণে এই শক্তির জাগতিক বিকাশ ঘটিতেছে, সেগুলির কতক কতক বিজ্ঞান জানিতে পারিয়াছে। জড় বস্তু মাত্রেই এ শক্তির এক একটা বিগ্রহ এবং তাদের সর্ববিধ ব্যবহার এই শক্তিরই

আদান প্রদান মাত্র। জাগতিক শক্তিরূপে দেখিলে এইটি হইল মহঃ। একটা মহান সমুদ্রের মত এই শক্তি জড় জগতে সর্বত্র কেবলমাত্র যে বিদ্যমান, এমন নহে, পরন্তু সর্বদা সক্রিয়। তারপর এই তড়িৎ শক্তিকে আরও বিশেষ এবং ব্যক্ত আকারে যখন আমরা দেখি তখন সেটি হয় আলোক। আলোক বলিলে শুধু যে কেবল চোখে দেখা আলো বুঝিতে হইবে, এমন নয়; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পথে রেণুর মত অথবা উর্মির মত শক্তির সূক্ষ্ম বিকিরণ (Radiation) বুঝিতে হইবে। জাগতিক শক্তির দিক দিয়া এইটি হইল 'স্বঃ'। এই বিকিরণ ব্যাপারটিকে ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে একটি চক্রের কথা ভাবিতে হয়। চক্রের যেমনধারা নাভি, অর এবং নেমি এই তিনটি অঙ্গ থাকে তদ্রূপ শক্তির বিকিরণ স্থলে এই ত্রিবিধ অঙ্গ থাকা আবশ্যক হয়। বিকিরণ হইতেছে বলিলে কোন্ কেন্দ্র হইতে বিকিরণ, কিসের মধ্য দিয়া বিকিরণ এবং কিসের উপরে বিকিরণ এই তিনটি স্থানের অপেক্ষা অবশ্যই থাকে। বিকিরণকে নাভি বা কেন্দ্রস্থলে দেখিলে সেটি হয় স্বঃ, অবকাশ অথবা অন্তরীক্ষে দেখিলে সেটি হয় ভুবঃ, এবং এই যে আধারে সেই বিকিরণ আসিয়া ক্রিয়া করিতেছে এবং প্রতিক্রিয়া পাইতেছে, সেইটি হইল ভূঃ। এখানে আসিয়া জাগতিক শক্তি পার্থিব অগ্নিরূপেই প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং এই চারিটি লোকই হইল অগ্নিরই চারিটি ভূমি এবং চারিটি রূপ। অবশ্য আমরা দেখিয়াছি যে এই চারিটি তত্ত্ব কেবলমাত্র বহির্জগতের তত্ত্ব নয়, তথাপি বহির্জগতের যেটি কার্যকরী শক্তি তার চারিটি ভাব লইয়া ঐ চারিটি তত্ত্বকে আমরা বিশ্বের একাংশে উদাহৃত দেখিতে পাইলাম। শক্তি বিকাশ এবং বিন্যাসের দিক দিয়া সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, জড়ে হউক, প্রাণে হউক, অথবা মনে হউক, যে কেন্দ্র বা নাভিকে আশ্রয় করিয়া শক্তি উৎসারিত হইয়া থাকে, সেইটি হইল স্বঃ অথবা সুবঃ-এর স্থান; আর যে সকল নির্দিষ্ট ধারা সৃষ্টি করিয়া সেই কেন্দ্রশক্তি বিকীর্ণ হইয়া অন্য কোন বস্তুর অথবা আধারের উপর আঘাত করে এবং তাহা হইতে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হয়, সেগুলি আশ্রয় করে যে ব্যবধান বা অন্তরীক্ষকে, সেইটি হইল ভুবঃ, এবং ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সেগুলি যাহার উপর আসিয়া পতিত হয় এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপটি ধারণ করে, সেইটি হইল ভূঃ।

তান্ত্রিক দীক্ষার দৃষ্টান্ত

তান্ত্রিক দীক্ষায় ত্রিবিধ দীক্ষার প্রসঙ্গ আছে। প্রথমটি শাম্ভবী দীক্ষা। এ দীক্ষায় শিষ্যের সত্তায় যে মহাকুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে রহিয়াছেন, তাঁকে সাক্ষাৎভাবে চৈতন্যরূপিণী করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের লক্ষণ মত এ দীক্ষাকে আমরা স্বর্দীক্ষা বলিতে পারি; কেননা যে পরম কেন্দ্রে শিবশক্তি অভেদে বিরাজমানা, সেই সহস্রারই এ দীক্ষার স্থান। তারপর হইল শাক্তী দীক্ষা। এই দীক্ষায় শিষ্যের মূলাধারে যে ব্যষ্টি কুণ্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারারূপে রহিয়াছেন, তাঁকে জাগরিত করিয়া সুষুম্না মার্গে তাঁর অভ্যুত্থান সহস্রারাভিমুখে সংঘটিত করিতে হয়, অর্থাৎ 'ঐ' এবং 'এই' এর মধ্যে যে ব্যবধান বা অন্তরীক্ষ রহিয়াছে, চক্রের পর চক্র ভেদ করিয়া সেই ব্যবধানটি দূর করিতে হয়। সুতরাং এই দীক্ষাকে আমরা ভুবর্দীক্ষা বলিতে পারি। তারপর হইল মান্ত্রী দীক্ষা। এইটি সাধারণ দীক্ষা। শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই দীক্ষা দান করিতে হয়। শিষ্য তার জ্ঞানে সহস্রার অথবা মূলাধার এ দুই-এর কোনটিকেই আপাততঃ পাইতেছে না। বাহ্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি লইয়া তার যে প্রচলিত অভিজ্ঞতা, যেটিকে সে 'এই আমার জ্ঞান' বলিয়া মনে করিতেছে, সেই জ্ঞানকে আধার করিয়াই মান্ত্রী দীক্ষা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু দীক্ষা যদি যথার্থ শক্তিসঞ্চারিণী হয়, তবে সেটি অবশ্য এই স্তরেই নিজেকে আবদ্ধ অথবা সমাপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। এইটিকে আমরা বলিব ভূর্দীক্ষা।

মন্ত্রজপে কি ভাবে উদাহৃত?

মান্ত্রী দীক্ষা লাভের পর যে জপ আরম্ভ হইল সেটি বৈখরী জপ। এটিকে আমরা 'ভূর্জপ' বলিতে পারি, কেননা এই জপে "এই তো জপ চলিতেছে, ভালই চলিতেছে অথবা ভালভাবে চলিতেছে না, এই জপের বিচ্ছেদ বা বিরতি ঘটিল"—এ ভাবেই অনুভবটি হইয়া থাকে। "এই" প্রত্যয়টিকে আশ্রয় করিয়াই এ অনুভব। কিন্তু জপের লক্ষ্য কোন্ দিকে, তার আদর্শটি কোথায়? সেটি অবশ্য এখন পর্যন্ত ঐ অদেখার মধ্যেই আপনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সেটি হইল পশ্যন্তী এবং বৈখরী জপে সেটি "ঐ অদেখা" একটা কিছু ভাবে থাকে বলিয়া সেটি হইল

স্বঃ। সেইটিই বৈখরী জপের সব কিছু আপনা হইতে প্রসব করিয়া আমাদের সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে হাজির করিয়া দিতেছে। সাধারণ জ্ঞান দোষবহুল বলিয়া তার দেওয়া সামগ্রীটিকে স্বভাবে ও স্বচ্ছন্দে দোহন করিতে পারিতেছে না। পশ্যন্তীতে যে প্রণব নাদবিন্দুকলাত্মক রূপে পূর্ণ বিরাজমান তিনি বৈখরীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁর নাদবিন্দুরূপটি সংবৃত করিয়া লইয়াছেন, যে কলারূপটি বিবৃত করিয়া রহিয়াছেন সেটিও আবার বিকৃতভাবেই বিবৃত করিয়াছেন দেখিতেছি। সূর্যের যেটি বরেণ্য ভর্গঃ সেটি অন্তরীক্ষপথে আমাদের কাছে আসিতে রজস্তমের এবং তন্নিমিত্ত সংস্কারগুলির বিবিধ বাধায় যেন অনেকাংশে বাধিত হইয়াই গেল। অতএব বৈখরীতে যে প্রণব জপিতেছি অথবা শুনিতেছি সেটা আর যেন স্বমহিমায় বিদ্যমান নাই। "এই" এবং "ঐ" এর মধ্যে এই বৈয়র্থ্য ব্যবধানটি ঘটিয়াছে। এই ব্যবধানটি দুরীকরণের নিমিত্তই জপাদি সাধন। বৈখরী বা ভূর্জপ একেবারেই পশ্যন্তী অথবা স্বর্জপে আপনাকে পরিণত করে না। ব্যবধান বা অন্তরীক্ষ দূরীকরণের নিমিত্ত যে মধ্যমা জপ সেইটিই হয় উভয়ের মধ্যে সেতু। আমরা পরে দেখিব যে এই সেতুর আবার দুই মুখে দুইটি সন্ধি রহিয়াছে—একটি ভূঃসন্ধি অথবা ব্যঞ্জনসন্ধি, অপরটি স্বঃ-সন্ধি অথবা স্বরসন্ধি। মাঝখানে মধ্যমারূপ সেতুটিও স্বয়ং সন্ধিরূপ, এবং সেটি হইল বিসর্গসন্ধি।

কয়েকটি সাধারণ তত্ত্বের সূত্রাকারে নির্দেশ

ভুবর্জপের দ্বারা এই সন্ধিত্রয় অতিক্রম করিয়া তবে পশ্যন্তীতে পৌঁছিতে হয়। কয়েকটি সাধারণ তত্ত্ব ও তথ্য প্রসঙ্গাক্রমে লক্ষ্য কর:—

১। ভূরাদি সপ্তমহাব্যাহৃতিরূপে সৃষ্টির সর্বত্র অনুস্যূত—Basic Scheme, Pattern, Frame —মূল বিনিয়োগ, মূল আকৃতি এবং মূল সংস্থা—এই তিনভাবে।

২। সুতরাং জপাদি সাধনের যে বৈখরী প্রভৃতি ভূমি, তার প্রত্যেকটি উক্ত 'সপ্তক'স্তর রূপে বর্তমান। যেমন, গানে প্রধানতঃ তিনগ্রাম এবং প্রত্যেকে সপ্তসুর।

৩। সুতরাং বৈখরী প্রভৃতি প্রতিভূমিতেই প্রধানতঃ অবম, মধ্যম ও উত্তম বা পরম এই তিন সংস্থা রহিয়াছে।

৪। জপ যৎকালে অবম সংস্থায় তৎকালে সেই সংস্থাটিই 'এই' রূপে বৃত্তিমতী বলিয়া লক্ষণ মত ভূঃ। উত্তম সংস্থাটি স্বঃ, এবং মধ্যমটি ভুবঃ।

৫। অর্থাৎ, উক্ত সংস্থাত্রয়ের অনুরোধে ব্যাহৃতিসপ্তক আপনাকে ব্যাহৃতি ত্রয়ে সমাহৃত করিয়া লয়।

৬। জপ বৈখরীতে থাকা কালীন সমগ্র বৈখরীর অপেক্ষায় পশ্যন্তী স্বঃ আর মধ্যমা ভুবঃ।

৭। বৈখরীর নিজ উত্তম সংস্থা বা ভূমিকায় যে স্বঃ, তাতে জপ পৌঁছিলে, বৈখরীর বাহিরে মধ্যমার পারে যে পশ্যন্তীরূপ স্বঃ, সেই দুই স্বঃ এর সাজাত্যবশতঃ পরস্পরের নৈকটিক 'আলিঙ্গনে'র সম্ভাবনা ঘটে। যেমন কোনও দূরবর্ত্মাচারী ধূমকেতু বিততব্যোমে তুহিন তমিস্রায় চলিতে চলিতে কোনও ভাস্বর জ্যোতিষ্কের সন্নিকটে আসিলে হইতে পারে।

৮। ঐ প্রকার নৈকটিক সাজাত্য সম্পর্কের ফলে মধ্যস্থলে ভুবঃরূপে যে মধ্যমা বর্তমান (অচল, নিষ্ক্রিয়, শূন্যভাবে নয়), তার (অর্থাৎ সেই সেতুটির) ত্রিবিধ পরিণতি ঘটে। (ক) ব্যবধানত্বের অপচয়, (খ) আধানত্বের উপচয় এবং (গ) সন্ধানত্বের সঞ্চয়। দুটি তড়িৎভরা মেঘের মধ্যে যে ব্যবধান তার কথা চিন্তা কর, যৎকালে এক মেঘ হইতে অপরটায় বিদ্যুৎ চলিয়া গেল। উক্ত তিন পরিণামের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা না আসা পর্য্যন্ত বিদ্যুতের বিনিময় ওভাবে ঘটে না।

৯। সুতরাং উক্তস্থলে, বৈখরীজপের উত্তম ভূমিকায় পশ্যন্তীর 'স্পর্শ' এবং 'আবেশ'—পঞ্চগঙ্গার প্রতিগ্রহাখ্যা ধারার যে দুটি বৃত্তি—সম্ভাবিত হয়।

১০। জপ মধ্যমাগ্রামে আসিলেও সাধারণভাবে উক্ত ব্যাহৃতিসপ্তক এবং বিশেষভাবে উক্ত ব্যাহৃতিত্রয়কে অন্বেষণ করিয়াই চলিতে হইবে। যখন যে ভূমিকা বা সংস্থা বিশেষে জপ চলিতেছে, তখন সেইটিই ভূঃ। আর 'সেই' রূপে যেটি তার লক্ষ্য, সেটি স্বঃ। ব্যবধান বা hiatusটি ভুবঃ।

১১। মধ্যমায় প্রবিষ্ট হইয়া জপ সাধারণতঃ 'ফল্গুরূপ' ধরিতে চায়—অর্থাৎ কারবারী চেতনার আধাররূপে যে বিরাট চেতনা রহিয়াছে, তাতেই প্রবিষ্ট, সংগৃহীত, সুরক্ষিত হইতে চায়। জপের 'মালা' তখন বহির্জাপকের হাত হইতে অন্তর্জাপকের হাতে চলিয়া যায়। মধ্যমা সংগ্রহ, সঞ্চয়, উপচয় ঘটায়, কিন্তু নেপথ্যে। মধ্যমার যে

উত্তম সংস্থা বা স্বঃ, সেখানে আসিলে, পশ্যন্তীরূপ যে স্বঃ, তার সঙ্গে অতি নিবিড় সাজাত্যবশতঃ মধ্যমার (সেতুর) শেষ সন্ধিটি তার দুর্ল্লঙ্ঘ্য 'প্রান্তপ্রাচীর' রূপে থাকে না—পশ্যন্তীরূপ 'মহে রণায় চক্ষসে' সেটি মহাসন্ধান সুহৃৎ হইয়া দাঁড়ায়। 'সন্ধিকো পাক্‌ড়ো'—এই মহাসন্ধানসুহৃৎ সন্ধিটিকেই বিশেষভাবে।

১২। পশ্যন্তীতেও সপ্তব্যাহৃতি এবং বিশেষভাবে ব্যাহৃতিত্রয়।

১৩। সুতরাং জপযজ্ঞ সর্বভূমিতেই ব্যাহৃতি হোম।

১৪। জপসূত্রে প্রজ্ঞার পাঁচটি ভূমির প্রসঙ্গ হইয়াছে—(ক) বিশারদী, (খ) ঋতম্ভরা, (গ) সত্যম্ভরা, (ঘ) বিবেকপীবরী (কৈবল্যগর্ভা) এবং (ঙ) পারদৃশ্বরী। সাধারণতঃ ব্যাহৃতিসপ্তকের চতুর্থস্তরে (মহঃতে) প্রজ্ঞা বিশারদী হইতে থাকে। জন হইতে সত্য পর্যন্ত এই তিনটি 'আলোকস্তরে' ঋতম্ভরা, সত্যম্ভরা, কৈবল্যগর্ভা পর্যন্ত হয়। এ তিনের 'অতিগ' 'আলোকধামে' প্রজ্ঞা হয় পারদৃশ্বরী—বিশ্ব এবং বিশ্বোত্তীর্ণ দুই-ই সে প্রজ্ঞায় অকুণ্ঠ প্রতিভাত।

১৫। বৈখরী সিদ্ধজপে প্রজ্ঞা অনু-বিশারদী অথবা অন্বগ্ বিশারদী। 'অনু' এর দ্বারা অনুকূলতা, অনুগ্রহ এবং অন্বয় এই তিনের নির্দেশ। মধ্যমার সিদ্ধিতে সদ্যোবিশারদী অথবা উদগ্‌বিশারদী। তারপর পশ্যন্তীতে প্রত্যগ্‌বিশারদী অথবা সম্যগ্‌বিশারদী, ঋতম্ভরা ইত্যাদি।

১৬। আমরা পরে দেখিব যে, সপ্তব্যাহৃতিরও সংবৎসরের মত দ্বাদশবিভাগ। প্রত্যেকে অধিভূত, অধিদেব, অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাত্ম (অথবা, 'আয়তনবত্ত্ব', 'প্রকাশমত্ত্ব', 'অনন্তবত্ত্ব' এবং 'জ্যোতিষ্মত্ত্ব'), এই চারি প্রকার। এবং এদের প্রত্যেকে আবার সাংসিদ্ধিক, সাংস্থানিক এবং সাংসর্গিক ভেদে ত্রিবিধ। 'জন' এই শব্দের সঙ্গে 'যজ্ঞ' শব্দের তুলনা করিয়া শব্দের যেটি প্রাণ সেটি বুঝিতে যত্ন কর। 'যজ্ঞে'র আদিতে যে বায়ুবীজ 'য' (অর্থাৎ যাতে করে সব কিছু ক্ষরণশীল হয়, সেটি) এর আদিতে নাই। অক্ষরের মূল যে অকার সেটি ইহার দুইটি বর্ণকেই আশ্রয় দান করিয়াছে। অথচ, ভূরাদির মত এটি 'অব্যয়' নয়। সব কিছু 'হওয়ার' মূল আকুতি ও আবেগরূপ (Primordial Pattern & Impetus) এটি। Foundational Becoming.

শেষের দুটি ব্যাহৃতিতে বিশ্লেষণকে আরও গভীর রহস্যস্তরে নামিতে হইবে।

২৩। অস্মি প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কিনা বিষয় তার নাম তপঃ॥

'অস্মি' ও 'আমি আছি' এই দুই বোধের পার্থক্য

প্রণিধান করিলে বুঝা যাইতে পারে যে 'জনি' বা 'হওয়া' এই প্রত্যয়ের মূলে আর একটি প্রত্যয় থাকে যার নাম অস্মি প্রত্যয়—'আছি' অথবা 'আমি রহিয়াছি'। এই বোধটি ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে এটিকে ক্রিয়াকারকরূপে ব্যক্ত করিতে হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'অস্মি' এই বোধে ক্রিয়াকারকরূপটি অপরিস্ফুট হইয়াই থাকে। "আমি বলিতেছি" "আমি শুনিতেছি"—এই প্রকার প্রত্যয়ের সঙ্গে এটিকে এক পর্যায়ে ফেলিলে ভুল হইবে। এই প্রত্যয়ে ক্রিয়া ও কারক, প্রমাতা ও প্রমেয়, "আমি" এবং "রহিয়াছি" এ দুটি পক্ষ পরস্পরকে এমন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে (in intuitional coalescence) যে একটিকে অপর হইতে পৃথক করা চলে না। একই অভিন্ন সত্তার দুইটি দিক ইহারা। সে দুটি দিক বুদ্ধিবিমর্শ দ্বারা আমরা পৃথক করিয়া লই। থাকা বলিলে পর যেটি বুঝায় সেটি "আমি" মাত্র—এইরূপে আপনাকে উপনীত করিতেছে, পক্ষান্তরে "আমি" বলিলে যাহা বুঝায় সেটি আপনাকে 'থাকা' অথবা 'আছি' মাত্র এইরূপে আপনাকে দেখাইতেছে। দুটির বৃত্ত পরস্পরকে একাংশে ছেদ না করিয়া, পরস্পর মিলাইয়া রহিয়াছে।

অস্মি ও ভানের সম্বন্ধ। ভান ও ভাস

আমাদের অভিজ্ঞতায় সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার আরম্ভ এবং শেষ এই দুটি সন্ধিতে এবম্প্রকার পরস্পর অভিষ্বক্ত 'আমি' ও 'আছি' রূপ যে 'অস্মি' প্রত্যয় সেটির পরিচয় মিলিয়া থাকে। সে দুই সন্ধিতে 'থাকা' তার এটা-ওটা-সেটা রূপ সকল বিশেষ হারায়, এবং 'আমি' তার এ-অহং, ও-অহং, এখানকার অহং, তখনকার অহং ইত্যাদি সকল প্রকারতা ত্যাগ করে। এবং 'থাকা' এবং 'আমি' দুয়ে মিলিয়া 'অস্মি' বা 'আছি' মাত্র এই ভানরূপ ধারণ করে। জপসূত্রের এই পাদের শেষ দিকের এক সূত্রে তত্ত্বের যে লক্ষণ, সেই প্রসঙ্গে এবং অন্যত্র ভানের লক্ষণ করিতে যাইয়া বলা হইয়াছে ভান প্রত্যয় (Experience) রূপে বৃত্তিমান হইলেও তাতে, এটি অংশী এটি তার অংশ, এটি ধর্মী এটি তার ধর্ম, ইত্যাদিরূপে খ্যাতি (logical discrimina-

tion, judgment) স্ফুট হয় নাই; পুনশ্চ তাহাতে এটি সত্য অথবা মিথ্যা এ বিকল্পনাও স্পষ্টতঃ উদিত হয় নাই; অথচ সাক্ষাদপরোক্ষরূপ সামগ্রী (Given Whole) ভাবে এইটি প্রতিভাত। সুতরাং 'ভান' বলিতে চারিটি লিঙ্গ বুঝিতে হইবে:—(১) সমগ্রত্ব (wholeness), (২) সাক্ষাদপরোক্ষত্ব (immediate givenness), (৩) সত্যমিথ্যাদি বিকল্পনাশূন্যত্ব (neutral as regards validity or invalidity, etc.), এবং (৪) অংশাংশিত্বাদ্যখ্যাতিমত্ত্ব (indiscriminated by logical categories)। আমাদের অনুভূতিমাত্রেই সাক্ষাৎ এবং সমগ্রভাবে এবম্প্রকার ভানরূপ। তত্ত্বকে যদি 'Thing-in-itself' বলি, তবে ভানকে (Given whole of Experience or Presentation Continuum কে) বলিতে হয় Fact. ভান স্বরূপে ও স্বভাবে বুদ্ধিব্যাপারব্যাপ্য নয়, logical নয়, alogical. বুদ্ধিবিমর্শ দ্বারা (অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্মাদি 'পদার্থ'—categories—প্রয়োগ করতঃ) ভান-সামগ্রী বুদ্ধিব্যবহারার্হ (thinkable Fact, reviewing Fact ইত্যাদি) হইয়া থাকে। তখন এটি হয় প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়রূপ ইত্যাদি। পদার্থরূপে ভান তার সমগ্রতা প্রভৃতি উক্ত চতুর্লক্ষণ হারায়। তখন ভান হয় 'ভাস'—Fact-section or 'Factual'; অথচ, ভানসমষ্টি নির্বিশেষ-রূপে শুদ্ধব্রহ্ম এবং সমষ্টি সবিশেষ রূপে জগদ্ব্রহ্ম (Universe or Perfect Experience) আর, ব্যষ্টি নির্বিশেষরূপে সাক্ষিচৈতন্য এবং ব্যষ্টি সবিশেষরূপে অস্মদাদির অনুভবজগৎ বোধবিশ্ব। এইরূপ সমষ্টি-ব্যষ্টি, সবিশেষ-নির্বিশেষভাবে ভানকে লইতে গেলেও ভানের যেটি নির্ব্যূঢ়ত্ব (absoluteness) তার কথঞ্চিৎ হানি ঘটে, তথাপি মুখ্য অন্য লক্ষণগুলির অনুরোধে 'ভান' এই সংজ্ঞাটি চলিল।

বোধবিশ্ব ও বিশ্ববোধ

তত্ত্বসূত্রে বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গের অনুসরণ চলিবে। সেখানে দেখিব বুদ্ধিব্যাপারের মূল নির্বহণটি যদ্দ্বারা হইতেছে তার নাম বিমর্শ, এবং এই বিমর্শের পরামর্শাদি অপর বৃত্তি চতুষ্টয় আছে। ফলে, বৌদ্ধ ব্যাপারে (in the logical appreciation of the alogical) অবভাসাদি ভাসপুঞ্জক উত্থিত হইতেছে এবং এর ফলে, অস্মদাদির ভানরূপ বোধবিশ্ব অবভাসাদি রূপে বিশ্ববোধ হইতেছে।

ভান সম্বন্ধে বৌধ্ধ বিবৃতি সম্ভব হয় কি প্রকারে?

আমরা এখানে তপের লক্ষণে যে অস্মিপ্রত্যয় বলিতেছি সেটি ভানরূপেই রহিয়াছে, ভাস-পঞ্চকের অন্যতমরূপে অভিব্যক্ত হয় নাই। সুতরাং তার বৌদ্ধ-বিবৃতি (logical description) বস্তুতঃ দেওয়া যায় না। অবশ্য, সাক্ষাদনুভবের (প্রত্যয়ের) যেটি বিবৃতিবিহীন মৌনমগ্নতা তাহা হইতে 'নামিয়া আসিয়া' সেটিকে বুঝিতে ও বলিতে যত্ন করিতে হয়। অ-বলাকহার বস্তুকে বলাকহার মাঝে আনিতে গেলে গত্যন্তর নাই।

"অননূদ্যানুবাদ-নিবন্ধন"

সুতরাং তত্ত্বতঃ 'অস্মি'কে অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষ একবচন না ভাবি। যে রকম করিয়া ভাবা অথবা বলা হইল যেটি অননূদ্য (unrenderable) তাকে অনুবাদ (render) করার প্রয়াস মাত্র। বুদ্ধির পক্ষে এ প্রয়াস স্বাভাবিক। এর ফলে ব্যবহারে অর্থ-নির্বহণ ও-নির্বচন দুইটি সিদ্ধ হয়।

কেবল মাত্র, এই সৃষ্টিমূল অস্মি বলিয়া নয়, সকল সাক্ষাৎ অনুভবই সমগ্রভাবে (in its entireness) ভানস্বরূপ, ভাসরূপ নয়। ভাসরূপতা আসে পূর্বোক্ত অননূদ্যানুবাদ নিবন্ধন।

কাজেই, 'অস্মি'কে 'আমি আছি' বলিয়া অনুবাদ করিতেছি বটে, কিন্তু আসলে অস্মি অননূদ্য।

আমাদের সাধারণ বৌদ্ধ বোধের 'আমি আছি' আর ব্রহ্মের 'একোঽহং বহু স্যাম্' রূপ জ্ঞানময় তপঃকে এক পর্যায়ে যেন না ফেলি।

দ্বিতীয়টিতে (ক) অহং বা অস্মির কোন স্বগত, স্বজাতীয় অথবা বিজাতীয় দ্বিতীয় নাই,—অস্মদাদির অহং-এর যেরূপ থাকে।

(খ) তাতে অস্তিতারও অব্যাপ্তি অতিব্যাপ্তি নাই, ব্যাপ্তি-সমতাই আছে। অস্মদাদি ক্ষেত্রে অহমস্মি, ত্বমসি, ইদমস্তি ইত্যাদি।

(গ) তাতে অস্মিতার ও অস্তিতার কেবল যে সমব্যাপ্তি এমন নয়, তাদের সমব্যাপ্তি এবং সমবৃত্তি (identity in extension, in expression and in function)।

এটিকে শ্রুতি কোন কোন স্থলে রহস্য ভাষায় 'মহান্ আত্মা' (কঠকের 'যচ্ছেদ্ বাঙ্‌মনসি' ইত্যাদি মন্ত্রে) বলিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানেরও আহুতি এতে হয় বলিয়া এবং এর আপন আহুতি 'শান্ত-আত্মনি' হয় বলিয়া এটি হয় এক মহান আনন্দোল্লাস রূপ (Immense Joy of Creation).

নিখিল সৃষ্টির মূলে এটি।

সৃষ্টির মূলে যে বস্তু তাঁর স্বাভিনিবেশ মৌন আনন্দের মুখররূপতা

ইহাই 'মহৎ অস্মি'—ইহারই এক অভিব্যক্তি ষষ্ঠ ব্যাহৃতি তপঃ। জ্ঞানময় তপঃ যে বিপুল সীমাহীন, শান্ত মৌন আনন্দ আপনাকে যেন এই তো আমি আছি, আমি বৈ আর কিছু নাই, আমিই সব কিছু হইব, এই ভাবে জানিতেছে, 'আবিষ্কার' করিতেছে, উল্লসিত করিতেছে। ইহা হইল ভূমার স্বাভিনিবেশ।

[মূল এই যে অস্মি ও তপঃ, সেটিকে স্বরূপে 'প্রত্যয়' বলা যায় না; কাজেই, সেভাবে সেটি 'অস্মি প্রত্যয়' এর প্রতিযোগী বা বিষয় নয়। এইভাবে ব্রহ্মের আদি তপঃ এবং ষষ্ঠ ব্যাহৃতি তপঃকে এক ভাবিলে ভুল হইবে। প্রথমটি 'আবিঃ', দ্বিতীয়টি 'ব্যাহৃতি'। মূল যে তপঃ সেটি ব্যাহৃতিসপ্তকেই 'প্রকৃতি' রূপে অনুস্যূত।]

এখানে উপনীত হইয়া আমরা তপঃকে ব্রহ্মের মূল আবীরূপে পাইতেছি—যার ফলে অধিষ্ঠানে অখণ্ড 'সত্যম্' আপনাকে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপ সৃষ্টিধারার মূল মিথুনে অভিব্যক্ত করিলে অস্তির আধারে অস্মি দেখা দিয়া পরস্পর অভিব্যক্ত হইল।

অধিষ্ঠানে শান্ত, প্রপঞ্চোপশম, অদ্বৈত সত্য জ্ঞান আনন্দ (অস্তি ভাতি প্রিয়ং) আবীরূপে তপঃ হইয়া আনন্দের 'মৌনমগ্ন সমাধি'টি যেন ভগ্ন করেন। কেননা সৃষ্টি-মূলতঃ আনন্দেরই অভিব্যক্তি ('আনন্দাদ্ধ্যেব—'ইত্যাদি)। এ মৌনভঙ্গ বলিলে বুঝিতে হইবে কি?

শান্তে অধিষ্ঠানে সত্য-জ্ঞান-আনন্দ একান্ত অভেদে বিদ্যমান। সেখানে তিন নাই, এক। অথবা অনিরুক্ত অলক্ষণ যাহা তাকে একই বা বলি কিরূপে? সুতরাং মৌন—চুপ।

কিন্তু আবীরূপে যখন তপঃ তখন এই মৌনভঙ্গ হইয়াছে, মাঝখানে জ্ঞান যেন সুপ্তোত্থিত হইয়া দুইপাশে সত্য আর আনন্দ এই দুই-'দোসর'কে দেখিয়া লইল। এইটি স্বাভিনিবেশ, স্বাত্মসংবিৎ। এক পাশের দোসর অস্তিকে বলিল—তুমি আছো, ঠিকই থাকো, সব কিছুর অধিষ্ঠান হইয়াই থাকো, শবশিবরূপেই পড়িয়া থাকো। অপর দোসর আনন্দকে দেখিয়া বলিল—ওঠ ওঠ—তোমার মৌন এবার মুখর হৌক্ তোমার সমাধি এইবার ছন্দঃ হৌক্। তোমার শান্তি এইবার হৌক্ উল্লাস—বিলাস। এর ফলে আনন্দের মিলিল বাণী, মিলিল ছন্দঃ, মিলিল সুর। যার ফলে, এই অপূর্ব বিশ্বসঙ্গীত! এ মহাসঙ্গীতের নায়ক যিনি, তিনি তখন শুদ্ধ অধিষ্ঠানমাত্র নন, তিনি তখন 'কবিঃ পুরাণঃ অনুশাসিতা চ'। তিনি তখন স্বয়ং তপোনাথ। তাঁর জ্ঞানময় তপঃ হয় আনন্দের রাসলীলা। অস্তির শয়ন, প্রিয়মের উত্থান। সত্যের আধারে আনন্দের উল্লসিত্ব বিলসিত্ব। তাই না অনবদ্য অপরূপ বিরাট ছন্দোময়ী প্রকৃতি!

সর্ববিধ সৃষ্টিপ্রয়াসের মূলে কি? বস্তু Elan Vital

গান গাহিব। গাহিবার আগে অন্তরের কোন মৌন প্রকোষ্ঠ হইতে একটা বেদনা একটা পুলক বাহির হইয়া বলে এই দেখ, আমার পানে ফিরিয়া দেখ। কোন অতল আঁধারে আত্ম-সংবিৎ-হারা হইয়া গুমরিয়া ছিলাম আমি, দোহাই তোমার, তুমি আমায় দাও বাণী, দাও ছন্দঃ, দাও সুর! এই তো সেই চিরন্তন তপোনাথ আমার ভিতরে আমার আনন্দকে সৃষ্টির নব নব বিকাশে ফুটিবার মোহনস্পর্শটি মিলাইয়া দিতেছেন।

কেবলি কি গান? প্রয়াসমাত্রই শক্তির ভূমিতে নিগূঢ় গোপন কেন্দ্রে এবম্বিধ কুহকস্পর্শের অপেক্ষা রাখে। অন্দরে কোন্ অজানা কক্ষে আনন্দ সমাধি। স্তব্ধ মৌনভাব। বাহিরটা বেদনাবিধুর। সে চাহিতেছে রস, আনন্দ। কিন্তু আনন্দের সংবিৎ হইবে কখন? আনন্দের সংবিৎ মানেই আনন্দের উল্লাস। তখন আনন্দ আর গোপনে রহে না, জীবনে উৎসারিত হয় ভাবে, কর্মে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়। তখন হয় সৃষ্টি। আনন্দকে স্বসংবিৎ দান করিয়া তার গাঢ় সান্দ্রতাকে যেটি সাবলীল করিয়া ক্লান্তিহীন বিরামহীন সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, সেইটি অগ্নিরূপ তপঃ। যেটা joy congealed সেটি এর ফলে হয় joy outflowing & overflowing.

সর্ববিধ প্রাণের বিকাশের মূলেও এইটি নয় কি? সে প্রেরণাটির নাম Vital

Impetus অথবা Bergson-এর আরও ব্যাপক সংজ্ঞায় Elan Vital দিতে পারি, কিন্তু প্রাণের মূলে যে আনন্দ সেটি অস্মিরূপে—এই তো আমি আছি এইভাবে—আপনাকে 'আবিষ্কার' করিতেছে—এইটাই কি প্রেরণার প্রেরয়িতা নয়? যেটি সত্য সেটি ঋত (dynamic; প্রাণধর্মী) হইতেছে এই স্বসংবিদের ফলে।

জড়েও যত না শক্তিবিকিরণ (বিশেষভাবে, স্বতোবিকিরণ) তাহাই বা ঘটিতেছে কোন্ গোপন 'অস্মি' বা আত্মসংবিদের ফলে, তার সংবাদ কি বিজ্ঞান রাখে? Whitehead 'primordial creativity' বলিয়া কার আভাসটি দিতে চাহিতেছেন?

তপঃ জীবে এবং ব্রহ্মে। আনন্দ সংবিত্তি

বিজ্ঞান অথবা বৌদ্ধবিমর্শ জড়ের প্রান্তভূমিতে আসিয়া স্বয়ং জড়মূঢ়বৎই যেন হইয়া যায়। অনন্যোপায় হইয়া বলে—স্বভাব (Naturalism), অথবা যদৃচ্ছা (Indeterminism), অথবা অজানা রহস্য (Agnosticism)।

জড়াসঙ্গবিমূঢ় এই বৌদ্ধবিজ্ঞানকে সমিধ্‌রূপে কল্পনা করতঃ আহুতি দাও। কিসে? 'এই আমি মহান আনন্দরূপে আছি'—এই আনন্দসংবিদে। এই যে মহান 'অস্মি' এটি কিন্তু আনন্দের মহোল্লাস মূর্তি। বিশ্বভুবন এতে ফুটিতেছে, নাচিতেছে, লয় হইতেছে।

সাধ হয়তো এটিকেও আহুতি দাও—শান্ত আত্মনি। জ্ঞান আবার একপাশে সত্য বা অস্তি, অন্যপাশে আনন্দ বা প্রিয়র সঙ্গে অভিন্ন একরস হইয়া যাক। তখন নির্বিশেষ ভাব মাত্র, ভাসের কোনও গন্ধ নাই।

কিন্তু অস্মিতে একদিকে 'অস্', অন্যদিকে 'প্রিয়ম্' বা আনন্দের 'ম্'—এই দুয়ে এক অব্যক্ত মিথুনরূপ হয়। এবং সেটি আবীরূপ হয়—অর্থাৎ সকল সবিশেষ ভান ও ভাসের আবির্ভাব মূল হয় বলিয়া, 'আবিঃ' এর 'ই' (গতি এবং ইদ্ধত্ব) সেটি প্রাপ্ত হয়। অতএব সেটি হয়—অস্+ম্+ই=অস্মি।

জীবের এবং জড়ের যেটি প্রেরণা ও প্রয়াস তাও দেখিতেছি এই অস্মিরূপ তপঃকে আশ্রয় করিয়া। সমগ্র সৃষ্টির বেলা তো "সোঽতপ্যত"।

এই যে মূলতপঃ সেটিকে সাংসিদ্ধিক (কিনা, নিত্য) ভাবে দেখিলেও বিচারণার প্রয়োজন আছে।

কেননা, জীবের বা জড়ের প্রয়াসে যে তপঃ আর ব্রহ্মের যেটি তপঃ তাতে মূল লক্ষণগত মিল রহিলেও, স্পষ্টতঃ পার্থক্য দেখিতেছি।

প্রথম, জীবের বা জড়ের বেলা তপঃ স্পষ্টতঃ জ্ঞানময় তপঃ হয় না। কৃচ্ছ্র তপঃ আকার ধারণ করিয়া থাকে। অন্তস্তলে আনন্দ সংবিৎটি ঘটে সন্দেহ নাই, কিন্তু জীবের 'আপন' চেতনায় সেটি সর্বক্ষেত্রে প্রতিভাত হয় না। দুঃখ বা ক্লেশ নিবৃত্তি—এই ঋণাত্মক (negative) ভাবেই প্রায়শঃ তার বোধ হয়।

দ্বিতীয়, পরম্পরাক্রমে বাধা বা রোধ এর নিবর্তকরূপেই এটি প্রকাশ পায়। রোধের রোধ চূর্ণ ও দগ্ধ করিয়াই এ ক্ষেত্রে তপঃকে তার ভাঙা অথবা গড়ার কর্মটি করিতে হয়। এবং আগে ভাঙিয়াই তবে গড়িতে হয়, ঢালিয়াই তবে সাজিতে হয়।

তৃতীয়, লীলা স্বরূপটি আনন্দের নিজস্ব। যেটি, কোন ক্ষেত্রেই—এমন কি, জড়ের ক্ষেত্রেও—একান্তভাবে বাধিত হয় না বটে, কিন্তু বাধ্যতা (determinism) এবং পরস্পরাপেক্ষিতায় (correlativity) বন্ধন বিশেষভাবেই দৃঢ়।

চতুর্থ, সুতরাং জীবের তপঃ সাপেক্ষত্বধর্মী কার্যতঃ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মের তপঃ (১) সত্যের অধিষ্ঠানে আনন্দজ্ঞানময়, (২) অবাধিত; (৩) লীলা কৈবল্যধর্মী; এবং (৪) নিরপেক্ষ বা স্বতন্ত্র।

এই নিমিত্ত সাংসিদ্ধিকের তিনটি রূপ আমাদের ভাবিতে হয়।

১। পরম সাংসিদ্ধিক—যথা তপোব্রহ্ম।

২। সামান্য সাংসিদ্ধিক—ভূরাদি সপ্তমহাব্যাহৃতির সর্বতঃ ওতপ্রোত স্ব স্ব লক্ষণাক্রান্তরূপ (or Cosmic Pattern and Impetus)।

৩। বিশেষ সাংসিদ্ধিক—সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিতে উক্ত ব্যাহৃতিসপ্তকের যে বিশেষ বিশেষ আকৃতি এবং প্রত্যয়। প্রকৃতি ঠিকই থাকে সুতরাং বিশেষ বিশেষ হইয়াও সাংসিদ্ধিক। প্রকৃতি, আকৃতি, প্রতিকৃতি, প্রত্যয়—এ সবের লক্ষণ জপসূত্রে যথাস্থলে মিলিবে।

তপোরূপ আনন্দ জাগৃতি এবং ছন্দোরূপে আনন্দের সর্বত্র প্রকাশ ও লীলায়ন

অস্তি বা সত্যের আধারে এই অপরূপ ছন্দোলীলায়িত আনন্দ জাগৃতিটিই তপের

মূল আলেখ্য—এটি ভুলিয়া জপাদি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা। কেননা, সত্যের উক্ত আনন্দ জাগৃতিই সমাবৃত্তির সার নিষ্কর্ষ। সৃষ্টিতে প্রপঞ্চিত হইতে যাইয়া আনন্দজাগৃতি এবং আনন্দের উল্লাস তদীয় অপরূপ ছন্দোরূপটি অন্তর্বহিঃ, সূক্ষ্মে স্থূলে সর্বত্রই উদাহৃত করিয়াছে; ফলে, বিরাট নক্ষত্র জগৎ হইতে ক্ষুদ্র রেণুটি পর্যন্ত, চেতনে প্রাণে জড়ে এমন কিছু নাই যেটি ছন্দের (Law and Harmonyর) মূর্ত বিগ্রহ নয়। তৃণের উপরে ঐ মণিপ্রভা প্রভাত-শিশিরকণা? তাই না এক মূর্ত মূক উপনিষদ্! ঐ ক্ষুদ্র কুসুমকোরকটি? এক নিগূঢ় রস ও ছন্দে সমৃদ্ধ মহাকাব্য! ঐ বিহগ-কাকলী? এক অপূর্ব সঙ্গীতের মনোজ্ঞ একটি তান! এ সব কি অলঙ্কার, অতিশয়োক্তি? এ যুগের বৈজ্ঞানিক আণবিক বোমার সৃষ্টি করিয়া মহাত্রাসের হেতু হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ছাড়া কে আর এমন করিয়া বিশ্বের অন্তরে, বাহিরে, স্থূলে, সূক্ষ্মে সর্বত্র সত্যের আধারে আনন্দজাগৃতিরূপ তপোব্রহ্মকে এমনধারা অপরূপ ছন্দোনিপুণ নৃত্যপর নটরাজরূপে দেখিয়াছেন? আমরা ছান্দোগ্য পড়িতেছি কিন্তু যে ছন্দোগ নৈলে ছান্দোগ্য হয় না, সে ছন্দোগকে আমরা তো চিনিলাম না! ছন্দঃ শব্দের উত্তর কেবল গানার্থ গৈধাতু নয়, গমনার্থ গম্‌ধাতু দ্বারা ছন্দোগের ব্যুৎপত্তি সর্বথা করিতে আমরা তো পারগ হইতেছি না।

প্রকট বিশ্বের ছন্দোগরূপে দিশারী নববিজ্ঞান

বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক মনীষা অণু হইতে সুরু করিয়া বিরাট ব্রহ্মাণ্ড সর্বত্রই ছন্দোগ রূপটিই ওতপ্রোত দেখিয়াছে। একটা অণুর নিজস্ব আকৃতি (Patternটি) কি—জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে—কৈ, তা তো ঠিক ধরিতে পারি নাই, তবে এই দেখ তার ছন্দোগরূপটি। যে তড়িৎশক্তির ঘনবিন্যস্ত রূপ ওটিকে মনে করিতেছি, তারও প্রকৃতি জানিতে পারি নাই, কিন্তু তাকে ছন্দোগ রূপেই জানিয়াছি এবং বিনিয়োগ করিতেছি, 'সর্ব্বকর্ম্মসু'। বিরাটের বেলাও তাই। একদিকে Nuclear physics, অন্যদিকে Astral physics—সর্বত্রই ছন্দোগত্ব রূপেই জ্ঞেয়ত্ব, মেয়ত্ব ও ব্যবহার্যত্ব। সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে Quantum আর Wave Mechanics, আর স্থূলের ক্ষেত্রে Relativity— আগাগোড়াই, যেটি ছন্দোগ তার পাদ ও মাত্রা বিশ্লেষণ এবং সমীকরণ। সুতরাং, তার দৃষ্টিতে আপাততঃ ছন্দোগত্ব ছাড়া বিশ্বের আর যে কোন

বিবৃতি দেয়া যায় সেটির প্রমাণ দ্বারা অভ্যুপগমটি হইয়াছে মনে করা চলে না। সেরূপ বিবৃতি এখন পর্যন্ত প্রমাণের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া আছে ছাড়পত্রের অপেক্ষায়। কাজেই, বিশ্বের পশ্চাতে যদি কোনো বিশ্বকর্মাকে মানিতেই হয়, তবে তাঁকে মহাসংখ্যানকুশল এক অতিমানস (Mathematical Supermind) রূপেই স্বীকার করিতে বিজ্ঞান রাজি হইতে পারে।

কেবলই কি জড়ের ক্ষেত্রে? জড় তো তার পূর্ব-প্রখ্যাত জড়ত্বই হারাইয়াছে—সে হইয়াছে এক বিরাট সমীকরণের (Equation-এর) একটি 'করণীয়' (Unknown Term) মাত্র। সে সমীকরণের সমাধান পরীক্ষায় এবং অন্বীক্ষায় যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই দেখিতেছি সে 'করণীয়'টি পূর্ব-পূর্ব স্বীকৃত 'মান' (Value) গুলি অংশতঃ ত্যাগ করিয়া নূতন নূতন মান গ্রহণ করিতেছে। বাধ্যতা ও নিশ্চিততা (determinateness and certainty) এই দুটি বৃদ্ধশিষ্টদের স্বীকৃত লিঙ্গ সে ত্যাগ করিতে বসিয়াছে। সুতরাং তার ছন্দোগত্ব আনন্দজাগৃতির ফলে যে ছন্দোগত্ব (অর্থাৎ যাতে লীলাবীজত্ব নিহিত) সেটি হইতেও পারে।

প্রাণের এবং অন্তরের ক্ষেত্রেও মহাছন্দোগের কি অপূর্ব বিশ্বরূপটি সে আমাদের দেখায়! যে মিথুনতত্ত্ব (Polarity Principle) সৃষ্টির গোড়ায় তার সত্য পরিচয়টি জড়াণুর মধ্যে ঊর্মি-সমীকরণের termsগুলির Positive অথবা Negative বিবৃতির আড়ালে লুকাইয়া। জীবকোষ ও জনিকোষ (germplasm) এবং বর্তমান অবমানসতত্ত্বের (Psychology of the Subconscious) বিশ্লেষণে—পাইয়া তবে না সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া বলিতেছি—এই তো সেই! মিথুনের সম্পরিষ্বক্ত, সংস্বক্ত, অভিষ্বক্ত, অনুষ্বক্ত ও প্রতিষ্বক্ত—এই পাঁচটি অবস্থাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ক্ষেত্রে এই নববিজ্ঞানের মতো আর কে আমাদের ধরাইয়া দিতেছে?

কিন্তু এই আর সেই এর মাঝে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানে ব্যবধানটি দূর হয় নাই।

বিশ্বে ঋতি ও যদৃচ্ছা—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে

বিশ্ব ছন্দোগ সন্দেহ নাই—অনিশ্চয় বা Probabilityকেও এ বিশ্বমহানটনের সূত্রধর করিয়াও ছন্দঃকে ছাড়িবার যো নাই; কেননা, অনিশ্চয়েরও নিশ্চায়ক ছন্দঃ (Law of Probability) রহিয়াছে যে! একটা কড়ি বা পাশা ফেলিয়া দিলে তার কোন্ পিঠ্টা

সম্মুখীন হইবে তাহা অবশ্য অনিশ্চয়ের কোটিতে; কিন্তু বারম্বার কড়ি বা পাশাটিকে ফেলিতে থাকিলে তার এপিঠ বা অন্য পিঠ উপরে দেখা দিবার একটা নিশ্চায়ক ছন্দঃ ধরা পড়ে। ইহা আগে দেখিয়াছি। গড়কষা বা Statistics বিজ্ঞানটা এই অনিশ্চয়-নিশ্চায়ক ছন্দগুলির উপর নির্ভর করিয়াই গড়িয়া ওঠে।

বিশ্বের মূলে ঋতি (Law) অথবা যদৃচ্ছা (Chance)-এ লইয়া বিজ্ঞানের বিকল্পনা এখনও চলিতেছে। Heisenberg এর অনিশ্চয় সূত্র (Principle of Uncertainty) প্রমাণিত হওয়ার পরেও Planck, Einstein প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য ঋতি বা Lawকেই মূলে রাখিবার কথা ভাবিয়াছেন। যদৃচ্ছা তবে কি আভাসমাত্র? আমাদের জ্ঞানে পূরাচিত্রটি প্রতিভাত হয় না বলিয়াই কি ঐ অনিশ্চয়, যদৃচ্ছা? ঊনবিংশ শতাব্দী তাই মনে করিত। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণের গতি অন্যদিকে মনে করার হেতু মিলিতেছে। প্রয়োগের স্থলে, অর্থাৎ মূলের মামলা মুলতুবী রাখিয়া, Nature is a mixutre of Law & Chance—প্রকৃতির রাজ্যে ঋতি এবং যদৃচ্ছা দুয়ে মিলিয়া আপোশে ঘরকন্না করিতেছে—সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি পঙ্গান্ধন্যায়ে যেমনধারা করিয়া থাকে—এই মনে করিয়াই বিজ্ঞানের ব্যবহার চলিতেছে।

নিখিল বিজ্ঞানের ধ্যানবিগ্রহ—ছন্দোগ বিশ্বরূপ
(Cosmic Harmony)

এতে কিন্তু বিশ্বের ছন্দোগমূর্তিটি বিকল হয় নাই। কেননা, যদৃচ্ছাও তো নির্ঋতি (Negation of Law), ঋতির নিষেধাত্মক নয়। ব্যষ্টিভাবে কোনও ঘটনাতে যদৃচ্ছার অবকাশ থাকিলেও গুচ্ছ (group), শ্রেণি (series) এবং সমষ্টি (totality) ভাবে সবকিছু বিধিবিহিতভাবেই ঘটিতেছে, বিধি-বহির্ভূত ভাবে নয়, এবং ব্যবস্থিত ভাবেই রহিয়াছে, অব্যবস্থিতভাবে নয়।

বর্তমান যুগে গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান (Physics) প্রমেয় বিচারের যে প্রামাণিক কাঠামোটি তৈয়ারী করিয়াছে, সেই কাঠামোটাকেই আদর্শরূপে রাখিয়া অপরাপর বিজ্ঞান (যথা Biology, Psychology, Sociology, Economics প্রভৃতি) আপনাদিগকে রূপ দিবার প্রয়াস পাইতেছে। অর্থাৎ, যে যতটা সম্ভব আপনাকে প্রমাণ দ্বারা সাক্ষাৎ অভ্যুপগন্তব্য বিদ্যার (Positive Science) আকারে আনিতে চেষ্টা করিতেছে।

সকলেরি ধ্যানে—ছন্দোগের ঐ বিশ্বরূপ। সহস্রশীর্ষ সহস্রবাদের দুটি একটি পাদ মাত্র দৃষ্টিতে আসিলেও ধ্যান বিশ্বরূপের—Cosmic Harmonyর।

ঋতি ও যদৃচ্ছার সম্বন্ধটি সন্ধিমুখ্য অথবা বিগ্রহমুখ্য ?
(Sympathetic or Antipathetic)

কিন্তু ঋষিদের প্রজ্ঞানে যে ছন্দঃ—যে ছন্দঃ মূলে রাখিয়া এই বিশ্বসৃষ্টি হয় বেদ বারম্বার বলিয়াছেন,—সে ছন্দঃ যে ঠিক কি বস্তু তা বিজ্ঞানের জ্ঞানে এখনও সম্যক প্রতিভাত হয় নাই। বিজ্ঞানের Law or Chance—কোনও মূল মিথুনের প্রতিম্বন্ত অবস্থা, পরস্পর প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। তাতে কেবলমাত্র যে দ্বৈত (duality), দ্বন্দ্ব (polarity) আছে এমন নয়, প্রতিদ্বন্দ্ব (antithesis) আছে। প্রতিম্বঙ্গোর সন্ধিমুখ্য এবং বিগ্রহমুখ্য দুইটি ভাব আছে। প্রথমটিতে দ্বন্দ্বসত্ত্বেও সমানার্থতাবশতঃ সহযোগিতা বিদ্যমান (sympathetic polarity); দ্বিতীয়টিতে তাদের বিরোধিতা (antipathy) প্রবল হইয়া ওঠে। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিতে Law & Chance ঠিক সন্ধিমুখ্য হইয়াও নাই, বিগ্রহমুখ্য হইয়াও নাই। ব্যক্তিতে (individual-এ) দ্বিতীয়টি, কিনা যদৃচ্ছা, আপন স্বাধিকার বজায় রাখিয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্ঘে, শ্রেণীতে, সমষ্টিতে প্রথমটির কাছে আপন অধিকারটি ইস্তফা দিতেছে। কাজেই, বিশ্বে ঋতিরই রাজত্ব। এ ঋতি আরও ব্যক্তরূপে হয় রীতি, বিধি, ধারা, ধর্ম।

ছন্দের রূপ-বিজ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে

ঋতি এবং যদৃচ্ছার প্রতিম্বঙ্গো বিগ্রহমুখ্যত্ব ঘটিলে ঋতিকে বলিতে হয় নিয়তি (Determinism)। নিয়তি আবার পূর্বভবীয় (Pre-determinism) এবং পরভবীয় (Post-determinism or Finalism) এই দুইভাবে বিবেচিত হইতে পারে। শেষের কল্পে, সব কিছু আগে হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া নাই বটে, কিন্তু ভাবী কোনও লক্ষ্যানুরোধে (with respect to a given End) নির্দ্ধারিত হইয়া যাইতেছে।

এই উভয় প্রকার নিয়তির বিপক্ষ (antithesis) হইল যদৃচ্ছা।

এই দুই পরস্পর বিপক্ষ (thesis and antithesis) রূপ নিয়তি এবং যদৃচ্ছার প্রতিম্বঙ্গোর ঊর্দ্ধে অনুম্বঙ্গ (synthesis) এর ভূমিটি কোথায়?

সেইটি হইল ছন্দঃ।

বিজ্ঞান পরোবরীয়ান্ ভাবে বিশ্বের সর্বত্র ছন্দকে অনুস্যূত দেখাইতেছে বটে, কিন্তু যথার্থ ছন্দঃ যেটি সেটি এখনও তার দৃষ্টিতে প্রকট নয়।

সুতরাং প্রজ্ঞানের যেটি ছন্দোগ, তার দৃষ্টান্ত স্থূলে, সূক্ষ্মে বিজ্ঞান যেমনধারা দেখাইতেছে তেমনধারা আর কেহই দেখাইতেছে না বটে, কিন্তু যেটি স্বয়ং দার্ষ্টান্তিক, সেই ছন্দঃ—এখনও পূর্ণাবয়ব প্রকট হয় নাই।

তিনি সর্বভূতেষু গূঢ় হইয়াছেন; আনন্দের 'মাত্রা' সব কিছুতেই, এবং সেইটিই তার জীবন—এই আনন্দব্রহ্মের যে পাদমাত্রা—নিখিল প্রাণের যেটি 'ব্যাকরণ'—তাহা হইতেছে ছন্দঃ। জপসূত্রে বলা হইয়াছে—"ছন্দো ব্যাকরণং প্রাণানাম্"। সুতরাং আনন্দ এবং প্রাণের আধারেই ছন্দের অভিব্যক্তি এবং ছন্দোদ্বারাই অভিব্যক্তি।

মৌলিক ছন্দের লৌকিক প্রত্যয়ের ভূমিতে অবতরণ

সত্যের আধারে আনন্দের আবীরূপতা (অথবা 'জাগৃতি') হইতেই এবম্প্রকার অভিব্যক্তি সম্ভাবিত হয়। অর্থাৎ, মহাসাংসিদ্ধিক যে তপঃ তাহা হইতেই।

তখন তপঃ হইতেছে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ'।

ঋতং এবং সত্যং মিথুনরূপে সম্পরিষ্বক্ত হইতে অনুদ্বক্ত পর্যন্ত চারিটি ভূমিতে ছন্দঃ।

প্রতিদ্বন্দ্বোর সন্ধিমুখ্যত্বেও সেটি ছন্দোনুগ। কিন্তু বিগ্রহমুখ্যত্বে, অর্থাৎ দুটি পক্ষের সমন্বয়াপেক্ষাবাধিতত্বে (in the case of unworkable synthesis), সেটি তার ছন্দোরূপটি হারাইয়া ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

সত্যের অধিষ্ঠানে উর্জিত 'অস্মি' রূপ যে আনন্দ, তাই সৃষ্টিধারার সর্বত্র আপনাকে ছন্দোরূপে লীলায়িত করে। দেখিয়াছি যে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' ছন্দের আদি মিথুনাকৃতি (Primordial Polarised Prototype)। এখানে দেশকাল, এমন কি বস্তু পরিচ্ছেদটিও এ পর্যন্ত পরিস্ফুট হয় নাই। অর্থাৎ, সত্যং এবং ঋতং দুইটি বস্তুও হয় নাই। সৃষ্টিধারার অবতরণে 'সমুদ্রোহর্ণবঃ' ইত্যাকার বিবিধ আকৃতি (Pattern) প্রকাশ করিতে করিতে ছন্দঃ যেখানে লৌকিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে উপনীত হয়, তখন তাকে দেখি 'নিয়তি ও যদৃচ্ছা' এই যুগ্মরূপ—সম্প্রতি বিজ্ঞান

যেরূপে দেখিতেছে। বলা হইয়াছে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদৃচ্ছা (Chance বা Probability) ছন্দোহীনতামাত্র নয় (negation of Law নয়)। তথাপি, এই আকারে আসিয়া ছন্দের যথার্থ যেটি প্রকৃতি (সত্যের অধিষ্ঠানে উর্জিত 'অস্মি'রূপ আনন্দের পাদমাত্রাদি ক্রমে অভিব্যক্তি) অবলুপ্ত হইয়াছে। 'অব' অবধারণে, নিশ্চয়ে। সুতরাং অবলুপ্তিতে ছন্দের যেটি যথার্থ প্রকৃতি এবং যেটি যথার্থ প্রত্যয়, এ দুয়েরই নিশ্চয়ের হানি ঘটে, যেমন 'নিয়তি ও যদৃচ্ছা' এই যুগ্মতে ঘটিয়াছে।

অবতরণ তল হইতে উত্তরণের ক্রম

ইহা হইতে উত্তরণ, অধিরোহণ অথবা অভ্যারোহের ধারাটি আশ্রয় করিতে হইবে। তাহাই ব্যাবৃত্তি হইতে সমাবৃত্তি, অবলুপ্তি হইতে অবজ্ঞপ্তি (realisation)।

সমাবৃত্তি অথবা অবজ্ঞপ্তির প্রত্যগধারা ('পরাঞ্চিখানি' এর বিলোম ক্রমে) প্রবর্তিত হইতে থাকিলে, বিশ্বের নিয়তি এবং যদৃচ্ছা তার 'পরাক্ত'টি (Exteriorisation) পরিহার করিতে করিতে ক্রমশঃ 'অন্বক্ত' (Interiorisation) রূপটি পরিগ্রহ করিতে থাকে। অর্থাৎ, আদৌ যেটি 'অধিভূত' রূপে ছিল, সেটি ক্রমশঃ অধিদেব, অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাত্ম হইয়া দাঁড়ায়। এধারা চলিতে থাকিলে ছন্দঃ বাহির হইতে 'ব্যূঢ়' (imposed & ordained) না হইয়া ক্রমশঃ ভিতর হইতেই ব্যক্ত (evolved, manifested) হইবার রূপটি গ্রহণ করিতে থাকে।

অভ্যারোহীক্রম—অহল্যার পাষাণী তনু

জপসূত্রে সর্বভূতের যেটি স্থেষ্ঠ-নেদিষ্ঠ-মর্ম্মৌকঃ তাকে বলা হইয়াছে—হৃৎ। এবং এই হৃৎ বা হৃদি কোন বস্তুটি বিদ্যমান—শুধু তোমার আমার নয়, একটি ধূলিকণারও? আনন্দ।

জপসূত্রের দৃষ্টিতে আনন্দ চারিটি 'মাত্রা'য় রহিয়াছেন। যথা প্রণবঃ— (১) অমাত্র তুরীয়ানন্দ (শান্ত=স্বয়ং) লসিত, যেমন প্রকাশের দিকে স্বপ্রকাশ); (২) ঘনমাত্র আনন্দতপঃ—এটি উল্লসিত আনন্দ; (৩) অন্তর্মাত্র আনন্দচ্ছন্দঃ—এটি বিলসিত আনন্দ; (৪) বহির্মাত্র, (ক) আনন্দ পিণ্ড এবং (খ) আনন্দ ব্রহ্মাণ্ড—এটি অলসিত আনন্দ।

বাকের দিক থেকে—(১) মগ্ন মৌনানন্দ, (২) উর্জিত স্ফোটানন্দ, (৩) ব্যাকৃত মুখরানন্দ, (৪) ব্যাকৃত মূকানন্দ।

যাকে শিলা প্রস্তরাদি ভাবিতেছি, তারও হৃৎ আনন্দই, কিন্তু তাহা অলসিত, কিনা অতদ্রূপে প্রতিভাত, জড়বৎ, আত্মসংমূঢ়বৎ আনন্দ। সেখানে আনন্দসংবিৎ আসিলেই অহল্যা তখন আর পাষাণী নয়, মা—টি তখন আর মাটি নয়। তখন কেবল আণবিক শক্তি আর তার নিয়তি ও যদৃচ্ছা লইয়াই পদার্থ বিজ্ঞান নয়।

তখন অভ্যারোহ রীতিতে তার উত্তরোত্তর আনন্দোন্মেষ এবং তার ছন্দেরও বন্ধাদি শাপমোচন দেখিতে থাকিব।

তখন তাতে আর আমাতে সাত্মতা উপলব্ধি করিব, যার ফলে, 'সর্ব্বভূতস্থ-মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি'। সর্বত্র আনন্দসংবেদন এবং সমানচ্ছন্দঃ সংবেদনটি না ঘটা পর্যন্ত কেবলমাত্র অস্তিভাতিতায় এটির পরিসমাপ্তি হয় না।

আমার মধ্যে আনন্দকে আধার ও উৎসরূপে রাখিয়া 'পাংক্তকর্ম্ম'—'অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা' ইত্যাদি চলিতেছে। উহার ভিতরে এটি নাই, কেবল অন্ধ নিয়তি আর খেয়ালী যদৃচ্ছাই আছে—একি হয়?

আমার যেমন অদৃষ্ট ও কর্ম, উহারও তাই। তবে তার সম্পর্কে আমার বর্তমান বা ক্রিয়মাণ অদৃষ্ট (প্রারব্ধ), এবং আমার সম্পর্কে তার ক্রিয়মাণ অদৃষ্ট বা প্রারব্ধ, তাকে আমার বর্তমান 'ব্যবহারে' জড় মাত্র করিয়া রাখিয়াছে—ইহাই অহল্যার শাপ।

এ শাপমোচনের নিমিত্ত তার আর আমার মধ্যে অদৃষ্ট ও কর্মের বর্তমান ক্রিয়াকারকফলানুপাতটি বদলাইতে হইবে।

কর্মদ্বারাই এটি সম্ভাবিত হইতে পারে। 'কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ'—কর্মই প্রভু।

কিন্তু কর্মও যে শাপগ্রস্ত—অদৃষ্ট, বিশেষ করিয়া প্রারব্ধের পাশে সে যে আবদ্ধ! বিশেষতঃ, সে কর্ম অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা যে কর্তা তার কর্ম।

তবে উপায়?

প্রসঙ্গতঃ অহল্যার শাপ এবং শাপ-বিমোচন রহস্য

যদি সর্বতন্ত্রযন্ত্রস্বতন্ত্র আনন্দই আধারে এবং উৎসে না থাকিত, যদি তপঃ এবং ছন্দঃই আনন্দের আপন অভিব্যক্তিটি না হইত, তবে উপায় ছিল না।

কর্ম্মের যে পাশবন্ধতা সেটি কল্পিত, আরোপিত, আর, তার আনন্দোল্লাস-বিলাসরূপ যে স্বচ্ছন্দতা সেইটিই তার স্বরূপ। অতএব, আরোপ হইতে স্বরূপে যাও। ইহাই তো অভ্যারোহ।

যে পরিমাণে পরচ্ছন্দতা থেকে স্বচ্ছন্দতায়, পরবশতা থেকে স্ববশতায় অগ্রসর হইবে, সেই পরিমাণে তোমার কর্ম হইবে ছন্দোগ এবং বিশ্বও হইবে ছন্দোগ।

অতএব 'নিয়তি ও যদৃচ্ছা' এই বিরাট অথচ কল্পিত বহিঃপাশটি সর্বত্র মোচন করিতে করিতে অগ্রসর হও।

অভ্যারোহের প্রথম সোপানে হৌক্—'অদৃষ্ট ও কর্ম্ম'। দ্বিতীয় সোপানে—'দৈব ও পুরুষকার'। তৃতীয় সোপানে—'রীতি (Behaviour) ও নীতি (Principle)। চতুর্থ সোপানে—'পরধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম। পঞ্চমে ঋতি ও ধৃতি। যষ্ঠে তপঃ ও সঙ্কল্প বা কাম। সপ্তমে—তাবকীন ও মামকীন; অষ্টমে ভূমৈবৈকঃ।

সাতের অতীত ধামে অলোকধামে যেটি, তার উদ্দেশেই আগের সাতটিকে 'সপ্তান্নানি' রূপে কল্পনা কর।

শাপ এবং শাপবিমোচনের রহস্য এইভাবে অবগত হও।

তপ কৃচ্ছ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমোন্নত ধারা—অলসিত আনন্দ-জাগৃতি

জপসূত্র পরিশিষ্টে (৩৪) "ক্রিয়াকর্ম্মভ্যামদৃষ্টদৃষ্টফলত্বম্॥" এই সূত্রের উপর কারিকাগুলির মধ্যে কয়েকটি এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতেছে:—

স্থূলসূক্ষ্মাদিসংব্যূঢ় ভুবনচক্রনেমিষু।
অদৃষ্টনির্ম্মিতা সংস্থা হ্যাব্রহ্মস্তম্বদেহিনাম্॥
ব্যষ্টিসমষ্টিভেদেন চাদৃষ্টং গণ্যতে দ্বিধা।
বস্তূনামিহ প্রত্যেকং চাদৃষ্টকর্ম্মসম্পুটম্॥
সংস্থাবস্থে হ্যদৃষ্টেন ব্যবস্থা কর্ম্মণা ভবেৎ।
চক্রনেমিস্থিতে কীটে ন কর্ম্মানবকাশতা॥

ব্রহ্মত্বাদপি সর্ব্বস্য ন স্বভাবাপমর্দ্দনম্।
সর্ব্বংসংস্থাবশত্বেঽপি হ্যাত্মবশং স্বভাবতঃ॥
অদৃষ্টচালিতং সর্ব্বং চক্রেঽস্মিহ ভ্রমদ্ ভ্রমৎ।
হ্যবশমিব কর্ম্মাণি কুর্ব্বদদৃষ্টমশ্নুতে॥
অদৃষ্টাজ্জায়তে কর্ম্ম কর্ম্মণাদৃষ্টমূর্জ্জিতম্।
কর্ম্মাদৃষ্টকৃতে ঘূর্ণিপাকে সর্ব্বং নিপাতিতম্॥
তথাপি কর্ম্মণাং মূলে মাত্রাঽনন্দস্য নিশ্চিতা।
হ্যবশং প্লবমানস্য মোক্ষসম্ভাবনা যতঃ॥
আদৌ ময়ি ততো বাহ্যে বৈরাজে কর্ম্মকর্ত্তৃতা।
অন্তর্য্যামী ততঃ স্বামী ততো যঃ পরমেশ্বরঃ॥
পরমাত্মা প্রভুস্তস্মাদ্ যোঽভিন্নোঽহন্তরাত্মনঃ।
এবং প্রারব্ধপাশাদ্ বৈ কর্ম্মবিমোচনং কুরু॥
যাবন্নদ্যানদীনাথে নৈকান্তিক সমর্পণম্।
মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছ্বাসো বেতি জল্পনা॥

মহা বা পরম সাংসিদ্ধিকরূপে তপঃই সপ্তমহাব্যাহৃতি। সামান্য সাংসিদ্ধিকরূপে তপেও সপ্তব্যাহৃতি।

অর্থাৎ ভূস্তপঃ ভুবস্তপঃ ইত্যাদি। ভূরাদির লক্ষণ মত এই তপঃসপ্তক বুঝিতে হইবে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি কৃচ্ছ্রতপঃ, মহস্তপঃ এবং জনতপঃ এ দুটি বীর্যতপঃ, এবং তপস্তপঃ ও সত্যতপঃ এ দুটি দিব্য বা ঊর্জস্তপঃ।

কৃচ্ছ্রভূমিতে রোধপ্রাবল্য, Dominant Resistance Factor। ফলে তপঃকে 'রোধস্' কিনা 'তটসীমা' মানিয়াই আয়াসে কথঞ্চিৎ আড়ষ্টভাবে চলিতে হয়। এখানে অর্থাৎ বিশেষ সাংসিদ্ধিকস্থলে তপঃশক্তির Canalisation— তাটস্থ্য গতি, এবং সে শক্তি কৃচ্ছ্রাধ্বগা। উক্ত 'রোধঃ' (constraining factor) যে পরিমাণে 'কৃতবেধ' (pierced) হইয়া থাকে, তটস্থা তপঃশক্তি সেই পরিমাণে উদার স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয়। তখন, সেটি হয় প্রকৃত প্রস্তাবে মহাধ্বগা ও মূলাধ্বগা। যেথায় 'এই' এবং 'সেই' উভয় ধারা সম্মিলিত (মহঃ), এবং সকল

হওয়ার মূল যেখানে (জন), তপঃশক্তি 'রোধস্' কাটাইয়া সেই মূলপ্রবাহে উপনীত হয়।

তপঃ যে আনন্দের জাগৃতি সে আনন্দের স্বরূপ
(স্বলসিতাদি ভেদ)

এরও পরের দুটি ভূমিতে তপঃ অস্মি এবং অস্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বভাব উল্লাস এবং স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এই দুটিতে যথাক্রমে উর্জ্জোধ্বগা এবং সদধ্বগা। এরও পরে যে অধ্ব সেটিকে 'কোঽদ্ধা বেদ?' এই পণ্ডাধ্বগা তপোগঙ্গা সমাশ্রয় কর।

চলিত কথায় বলে—তপজপ বা জপতপ।

জপকে তপের অনুগ্রহলাভ করতঃ ছন্দোনুগ, ছন্দোগ ছন্দোরূপে স্বয়ং তপোময় হইয়াই তপের স্বভাব স্বাচ্ছন্দ্য গতিস্থিতিটি লাভ করিতে হইবে। অর্থাৎ, আনন্দের মূঢ় অলসিতা থেকে আনন্দের অবাধিত স্বয়ং লসিততায় যাইতে হইবে। তথায় জ্যোতিঃ এবং রস অভিন্ন। তথায় আনন্দ অপর কিছুর (এমন কি সাক্ষীরও) প্রকাশ্য নয়। সে স্বপ্রকাশ। আনন্দের স্বপ্রকাশতাই তার স্বলসিতত্ব। 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—এই শ্রৌত আনন্দ ব্রহ্মই, সুতরাং তাহাতে ইতরাপেক্ষার গন্ধও নাই। অর্থাৎ 'অস্তিভাতি' থাকিলে তবে না আনন্দ, এ দৃষ্টি ঠিক নয়। স্বরূপে আনন্দই অস্তি, আনন্দই ভাতি। আর, সবিশেষ ভাবে আনন্দই উল্লসিত, বিলসিত, অলসিত। আনন্দ স্বয়ং স্বলসিত। উল্লসিত রূপে অস্মি প্রত্যয় প্রতিযোগী ষষ্ঠব্যাহৃতি তপঃ, বিলসিতরূপে ছন্দঃ (বিশেষভাবে গায়ত্র্যাদি), আর অলসিতরূপে বিসর্গহীন ছন্দ ছন্ন, ছদি এবং বন্ধ, যাদের লক্ষণ আগে দেওয়া হইয়াছে। বর্চ্চঃ, তেজঃ, উর্জ্জঃ প্রভৃতি লসিতত্বেরই মাত্রা।

তপের আলোচনায় যে 'গহনগাঢ়তা' সেটি 'গহনতর' এবং 'গাঢ়তর' হইতেছে সত্যের আলোচনায়। সত্যোন্মুখী 'তাপসী' বুদ্ধিকে দিশারিণী করিয়া এতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সে প্রয়াসটিও বিশেষতঃ ফলপ্রদ।

২৪। অস্তি প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কি না বিষয়, তার নাম সত্য।।

ব্রহ্মত্বাদপি সর্ব্বস্য ন স্বভাবাপমর্দ্দনম্।
সর্ব্বংসংস্থাবশত্বেঽপি হ্যাত্মবশং স্বভাবতঃ॥
অদৃষ্টচালিতং সর্ব্বং চক্রেষ্বিহ ভ্রমদ্ ভ্রমৎ।
হ্যবশমিব কর্ম্মাণি কুর্ব্বদদৃষ্টমশ্নুতে॥
অদৃষ্টাজ্জায়তে কর্ম্ম কর্ম্মণাদৃষ্টমূর্জ্জিতম্।
কর্ম্মাদৃষ্টকৃতে ঘূর্ণিপাকে সর্ব্বং নিপাতিতম্॥
তথাপি কর্ম্মণাং মূলে মাত্রাঽনন্দস্য নিশ্চিতা।
হ্যবশং প্লবমানস্য মোক্ষসম্ভাবনা যতঃ॥
আদৌ ময়ি ততো বাহ্যে বৈরাজে কর্ম্মকর্ত্তৃতা।
অন্তর্য্যামী ততঃ স্বামী ততো যঃ পরমেশ্বরঃ॥
পরমাত্মা প্রভুস্তস্মাদ্ যোঽভিন্নোঽন্তরাত্মনঃ।
এবং প্রারব্ধপাশাদ্ বৈ কর্ম্মবিমোচনং কুরু॥
যাবন্নদ্যানদীনাথে নৈকান্তিক সমর্পণম্।
মামকস্তাবকস্তাবদুচ্ছ্বাসো বেতি জল্পনা॥

মহা বা পরম সাংসিদ্ধিকরূপে তপঃই সপ্তমহাব্যাহৃতি। সামান্য সাংসিদ্ধিকরূপে তপেও সপ্তব্যাহৃতি।

অর্থাৎ ভূস্তপঃ ভুবস্তপঃ ইত্যাদি। ভূরাদির লক্ষণ মত এই তপঃসপ্তক বুঝিতে হইবে। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি কৃচ্ছ্রতপঃ, মহস্তপঃ এবং জনতপঃ এ দুটি বীর্যতপঃ, এবং তপস্তপঃ ও সত্যতপঃ এ দুটি দিব্য বা ঊর্জস্তপঃ।

কৃচ্ছ্রভূমিতে রোধপ্রাবল্য, Dominant Resistance Factor। ফলে তপঃকে 'রোধস্' কিনা 'তটসীমা' মানিয়াই আয়াসে কথঞ্চিৎ আড়ষ্টভাবে চলিতে হয়। এখানে অর্থাৎ বিশেষ সাংসিদ্ধিকস্থলে তপঃশক্তির Canalisation—তাটস্থ্য গতি, এবং সে শক্তি কৃচ্ছ্রাধ্বগা। উক্ত 'রোধঃ' (constraining factor) যে পরিমাণে 'কৃতবেধ' (pierced) হইয়া থাকে, তটস্থা তপঃশক্তি সেই পরিমাণে উদার স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হয়। তখন, সেটি হয় প্রকৃত প্রস্তাবে মহাধ্বগা ও মূলাধ্বগা। যেথায় 'এই' এবং 'সেই' উভয় ধারা সম্মিলিত (মহঃ), এবং সকল

হওয়ার মূল যেখানে (জন), তপঃশক্তি 'রোধস্' কাটাইয়া সেই মূলপ্রবাহে উপনীত হয়।

তপঃ যে আনন্দের জাগৃতি সে আনন্দের স্বরূপ (স্বলসিতাদি ভেদ)

এরও পরের দুটি ভূমিতে তপঃ অস্মি এবং অস্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বভাব উল্লাস এবং স্থিতি প্রাপ্ত হয়। এই দুটিতে যথাক্রমে উর্দ্ধোধ্বগা এবং সদধ্বগা। এরও পরে যে অধ্ব সেটিকে 'কোহদ্ধা বেদ?' এই পণ্থাধ্বগা তপোগঙ্গা সমাশ্রয় কর।

চলিত কথায় বলে—তপজপ বা জপতপ।

জপকে তপের অনুগ্রহলাভ করতঃ ছন্দোনুগ, ছন্দোগ ছন্দোরূপে স্বয়ং তপোময় হইয়াই তপের স্বভাব স্বাচ্ছন্দ্য গতিস্থিতিটি লাভ করিতে হইবে। অর্থাৎ, আনন্দের মূঢ় অলসিতা থেকে আনন্দের অবাধিত স্বয়ং লসিততায় যাইতে হইবে। তথায় জ্যোতিঃ এবং রস অভিন্ন। তথায় আনন্দ অপর কিছুর (এমন কি সাক্ষীরও) প্রকাশ্য নয়। সে স্বপ্রকাশ। আনন্দের স্বপ্রকাশতাই তার স্বলসিতত্ব। 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'—এই শ্রৌত আনন্দ ব্রহ্মই, সুতরাং তাহাতে ইতরাপেক্ষার গন্ধও নাই। অর্থাৎ 'অস্তিভাতি' থাকিলে তবে না আনন্দ, এ দৃষ্টি ঠিক নয়। স্বরূপে আনন্দই অস্তি, আনন্দই ভাতি। আর, সবিশেষ ভাবে আনন্দই উল্লসিত, বিলসিত, অলসিত। আনন্দ স্বয়ং স্বলসিত। উল্লসিত রূপে অস্মি প্রত্যয় প্রতিযোগী ষষ্ঠব্যাহৃতি তপঃ, বিলসিতরূপে ছন্দঃ (বিশেষভাবে গায়ত্র্যাদি), আর অলসিতরূপে বিসর্গহীন ছন্দ ছদ্ম, ছদি এবং বন্ধ, যাদের লক্ষণ আগে দেওয়া হইয়াছে। বর্চ্চঃ, তেজঃ, উর্জ্জঃ প্রভৃতি লসিতত্বেরই মাত্রা।

তপের আলোচনায় যে 'গহনগাঢ়তা' সেটি 'গহনতর' এবং 'গাঢ়তর' হইতেছে সত্যের আলোচনায়। সত্যোন্মুখী 'তাপসী' বুদ্ধিকে দিশারিণী করিয়া এতে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। সে প্রয়াসটিও বিশেষতঃ ফলপ্রদ।

২৪। অস্তি প্রত্যয়ের যেটি প্রতিযোগী কি না বিষয়, তার নাম সত্য।।

বুদ্ধি ও তার বিমর্শ। সপ্ত ব্যাহৃতি রূপ সপ্তখ্যাতি কিভাবে সম্ভাবিত হইয়া থাকে?

এ সত্য সপ্তমহাব্যাহৃতির শেষ যে সত্য, সেই সত্য। 'সত্যম্‌জ্ঞানমনন্তম্' —এই স্বরূপ লক্ষণের যে সত্য, তার সঙ্গো একান্ত অভিন্ন যেন না করিয়া ফেলি। সে সত্য এর পরের সূত্রে 'সৎ' রূপে লক্ষিত হইয়াছে। এ সত্য 'অস্তি' বা 'আছে' এই প্রত্যয়ের বিষয়; সে সত্য কোনও প্রত্যয়েরই বিষয় নয়। প্রতি+গমনার্থ 'ই' ধাতু প্রত্যয়। কিন্তু সে সত্য সম্বন্ধে 'প্রতি' অথবা 'ই' এ দুয়ের কোনটারই—সাবকাশতা নেই। যেটি স্বয়ং ব্রহ্ম তার 'প্রতি' বা প্রতিযোগী হইয়া আর কি আছে, এবং অপর এমন কি আছে, যেটির অথবা যথা হইতে ব্রহ্মে গতি হইতে পারে?

বুদ্ধি বিমর্শের প্রান্তে আসিয়া তত্ত্ব হয় ভান। বুদ্ধি বিমর্শের মাঝে আসিয়া ভান হয় ভাস। সপ্তমহাব্যাহৃতিতে ভাসোন্মুখ ভানরূপতা। অর্থাৎ, এগুলি বুদ্ধি বিমর্শের প্রান্তভূমিতে রহিয়াও বুদ্ধি বিমর্শের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ-ধর্ম-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছে।

তা না করিলে যে আনন্দ সংবিৎস্বরূপ তার আবার 'অস্তি'র আধারে 'অস্মি'-রূপ জাগৃতির অর্থ-নির্বাহ হইবে কিরূপে?

যেটি স্বয়ং অপাঙ্‌ক্ত, অমাত্র, নিষ্কল, অনন্ত তাতে পাদ মাত্রা কলা কাষ্ঠা কল্পিত হইয়া ছন্দোরূপটি হয় কি প্রকারে?

যে আনন্দ সাক্ষাৎ অমেয় ও অসংখ্যেয়, সেটি মানার্হ (মাত্রা) ও সংখ্যেয় (পাদ) হয় কিরূপে?

বুদ্ধি বিমর্শের (logical appreciation-এর) যেটি প্রান্তভূমি, সেখানে যাইয়া বাক্‌ ও মন দুইই 'না পাইয়া' (অপ্রাপ্য) ফিরিয়া আসে (নিবর্ত্তন্তে)।

কাহাকে না পাইয়া? সমগ্র ভানকে (Fact or Given as a whole)।

বিমর্শ পঞ্চকের ভাস পঞ্চক লইয়াই ব্যবহার। অথচ বুদ্ধি এবং বুদ্ধিবিমর্শ এক নয়। বিমর্শের যেখানে সীমা, বুদ্ধির সেখানে সীমা নয়। বুদ্ধি বোধি এবং বোধরূপে তার আপন বিমর্শের পারগা।

বুদ্ধি বোধি (as Intuition, সহজ অথবা যোগজ) রূপে ভানকে 'গ্রহণ' এবং বোধরূপে তত্ত্বতে (the thing-in-itself) 'অবগাহন' করিতে চায়। ভানগ্রহণে তার

আদিতে 'উ' কারের স্থলে 'ও' কার হয়, এবং 'ক্তি' বিভক্তির 'ই' কারটি থাকে কিন্তু 'ত'টি চলিয়া যায়। তত্ত্বাবগাহনে 'ই'টি চলিয়া যায়, তৎস্থলে 'অ' হয়। বিশ্ববোধাদি হইতে এই বোধবিশ্ব, অববোধ, শুদ্ধবোধ এবং নিজবোধের বিলক্ষণতা ভাবনা কর। এই বোধপঞ্চকের জ্ঞানে নির্মলবোধ সমুদিত হয়।

পরিমাণে আনা ও অনুভবে আসা একই বস্তু? Process ও Perception কোথায় মিলিয়া যায়?

এ বর্ণগত পরিবর্তনের ব্যঞ্জনা ভাবিয়া দেখ।

শেষেরটিতে, অর্থাৎ বোধে, 'অবগাহন'। বোধিতে 'ই'কার গতিসম্ভাবনা (or possibility of Becoming) রূপে বিদ্যমান। বোধে সেটি 'অ'কার হইয়া অক্ষরমাত্র (Changeless Being) হইতেছে। অর্থাৎ, বোধে আসিয়া বুদ্ধি তার তিনটি মূল ব্যবহারনির্ব্বহণ লক্ষণ পরিহার করে—(১) 'উ'কার=ওষ্ঠ্য=ব্যাকরণ ও ব্যাহরণ; (২) 'ত'কার=দন্ত্য=ছেদন বা বিশেষণ এবং (৩) 'ই'কার=তালব্য=নিম্নতল হইতে উচ্চতলে গতি (যেটি 'মাত্রাস্পর্শ' মাত্র তাকে মাত্রাপাদাদিক্রমে মেয়তার ও জ্ঞেয়তার এবং সমীক্ষা-পরীক্ষা-সমীক্ষাক্রমে প্রমেয়তার উচ্চ স্তরে নয়ন)।

বোধে যে 'ও'কার সেটি প্রণবকে আশ্রয় করে। কেননা, প্রণব ব্যতীত আর কিছুরই তত্ত্বে প্রবিষ্ট হবার পক্ষে সাক্ষাৎ উপযোগ নাই। 'জ্ঞাতুং' দ্রষ্টুং' পর্যন্ত উপযোগ অন্যেরও আছে, কিন্তু 'প্রবেষ্টুং'এর উপযোগ প্রণবেই পরিনিষ্ঠিত।

পরিমেয়ত্ব এবং সংখ্যেয়ত্ব (measurability and knowability) এ দুয়ের ভেদ ও ব্যবধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা পরিমেয় তাহা জ্ঞেয়, এবং যাহা জ্ঞেয় সেটি পরিমেয় হইতেছে না। জগতে যাদের মাপ লইতেছি (যথা আণবিক বিকিরণ, তাড়িত চৌম্বকশক্তি ইত্যাদি) তারা বস্তুতঃ অথবা তত্ত্বতঃ যে কি তা জানিতেছি না; পক্ষান্তরে, সুখদুঃখ ইচ্ছাদিরূপে যাদের সাক্ষাৎ জানিতেছি, তাদের মাপ লওয়া সম্ভবপর হইতেছে না। Science is measurement—বিজ্ঞান পরিমাণ-বিজ্ঞান এ সূত্র স্বীকার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, পদার্থ বিজ্ঞান মানকুশলী কিন্তু ভানকুশলী নয়। দক্ষমাপক কিন্তু ভাসক ও জ্ঞাপক নয়। অর্থাৎ, সব-কিছুরই সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম পরিমাণটি লইতে বিজ্ঞানের কর্মকৌশল এবং ধ্যান কৌশল অসাধারণ; কিন্তু নিখুঁতভাবে পরিমিত

হইয়াও কোন কিছুই বলিতেছে না—'এই দেখ আমি এই বস্তু, এই তত্ত্ব। আর তুমি যে আমাকে মাপিতেছ, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক এই-টি সম্পর্ক।' বস্তুতঃ অজানাকে মাপের ও হিসাবের মধ্যেই জানাইবার এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে বিজ্ঞান। যেমন কোন গুণী কলাবতের সঙ্গীতালাপ। আলাপটি আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—এই চারিপাদে সম্পাদ্য। গণিতবিৎ আমি হয়তো সে আলাপের যে রাগ তা জানি না; আলাপের পাদচতুষ্টয়ে প্রকৃতি ও যোজনা সম্বন্ধেও অনভিজ্ঞ। তথাপি আলাপনের গতিতে কোনও এক কালিক ছন্দঃ আবিষ্কার করিলাম, এবং সে ছন্দের নাম দিলাম চৌতাল।

যদি আবার কম্পনাদির মাপের নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করি, তবে ঐ চৌতালটি ছাড়া আলাপের স্বরকলাপের কম্পনগত আরও সূক্ষ্ম ছন্দঃ হয়তো আবিষ্কার করিতে পারিব। অন্য কোনও রাগের আলাপের সাথে তার তুলনা করিয়া তাদের কম্পন মানগত সাজাত্য বৈজাত্যাদিও ধরিতে পারিব। কিন্তু এত করিয়াও রাগের যেটি বাণী, যেটি মূর্চ্ছনা, যেটি অনুভবসিদ্ধ রস, সেটি আমি জানিব না।

পাদ ও মাত্রা

জৈবধাতু বা প্রোটোপ্ল্যাজ্‌ম্‌কে বিশ্লেষণ করিয়া তার উপাদানভূত অণুগুলির সংখ্যা এবং সংমিশ্রণের অনুপাত জানিয়াছি। অর্থাৎ সেটি পরিমেয় হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞেয় হয় নাই, যেহেতু তদধিষ্ঠানে যে প্রাণ অভিব্যক্ত, তাকে জানিতে পারি নাই। সুতরাং জানিতে অক্ষম হইতেছি যে, উক্ত উপাদান সমূহ উক্ত অনুপাতে সংমিশ্রিত হইয়াই প্রাণ নামক ধর্ম বা গুণটিকে সৃষ্টি করিল, অথবা প্রাণ নামক কোন একটি পূর্বসিদ্ধ বস্তুই আপন প্রয়োজনে আপন উপযোগী উক্ত সংমিশ্রণটি ঘটাইয়া লইল। প্রথম পক্ষটি অবশ্য এখন পর্যন্ত অন্বয় ব্যতিরেকে প্রতিপন্ন হয় নাই। প্রথমতঃ জৈববস্তুকে নির্জীব করিয়া তবে রাসায়নিক পরীক্ষাপাত্রে তার বিশ্লেষণ সম্ভাবিত হয়, সজীব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ বিশ্লেষণের যোগ্যবস্তু হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, উপাদানগুলির যথানুরূপ সংমিশ্রণের ফলেও সজীবতা আসে না দেখিতেছি। কি যেন কি একটা অজানা ঘটক (unknown factor) না উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ অঘটনটি ঘটে না মনে হইতেছে। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষেই কল্পনা লাঘব এবং সম্ভাবনাগৌরব বেশী।

মস্তিষ্ক বা Brain এবং আমাদের চেতনা সম্বন্ধেও এই অনিশ্চয়কোটি এখনও কাটাইতে পারি নাই। Brain-এর গঠন এবং গতি সম্বন্ধে জ্ঞান, অর্থাৎ 'তাল' বা মাত্রাজ্ঞান আমাদের কিছু নিতান্ত অল্প হয় নাই।

এইজন্য মাত্রাজ্ঞান এবং পাদজ্ঞান দুইটি বৃত্তের মতো পরস্পরের বাহিরে না রহিলেও, পরস্পরকে অংশতঃ ছেদ করিতেছে, পরস্পর মিলিয়া যাইতেছে না। মাত্রা ও পাদের পরস্পর অব্যাপ্তি সর্বক্ষেত্রেই আমাদের বুদ্ধিব্যামর্শের হেতু হইতেছে।

পাদ কাহাকে বলে?

'যেন পদ্যতে'—যদ্দ্বারা সম্পাদিত হয়, সমগ্রভাবে জ্ঞাত হয়, উপলব্ধি হয়—তাহাই পাদ।

তিনরকমে বলা হইল, পাদকে ক্রিয়াঙ্গ, জ্ঞানাঙ্গ, এবং ভাবাঙ্গ—এই তিনরূপেই দেখিতে হইবে বলিয়া।

অথবা, শ্রুতির রহস্যভাষায় এক 'সম্পন্ন' (কোথাও বা 'অভিনিষ্পন্ন') শব্দটির মধ্যে ক্রিয়াজ্ঞানভাবের অন্তর্নিবেশ করিলে, বলা যায়—সম্পাদ্যতা বা অভিনিষ্পাদ্যতার আবশ্যক অঙ্গ (inseparable component or constituent) যাহা, তাহাই পাদ।

সুতরাং পাদসমূহের স্বচ্ছন্দ সংহতত্ব (incongruent composition) না হইলে উক্ত সম্পন্নতাটি হইবে না।

অনুষ্টুপছন্দে কারিকা লিখিব। কিন্তু তার পাদচতুষ্টয় স্বচ্ছন্দ-সংহত না হইলে কারিকা শ্লোকটি সম্পন্ন হইবে না। জপযাগাদি ক্রিয়ার বেলাও তাই।

তারপর আত্মাকে জানিয়া তাতে 'অবিনিষ্পন্ন' হইব। ব্যষ্টিভাবে জাগ্রৎ (বিশ্ব), স্বপ্ন (তৈজস), সুষুপ্তি (প্রাজ্ঞ) এবং তুরীয় এবং সমষ্টিভাবে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর এবং শুদ্ধচৈতন্য—এভাবে পাদচতুষ্টয়ের স্বচ্ছন্দসংহতিটি না হওয়া পর্যন্ত আত্মাকে জানিয়া তাতে অভিনিষ্পন্ন হওয়াটি হইবে না।

যেটি সপাদ সেটির পাদচতুষ্টয়রূপে অঙ্গীকার আবশ্যক

যিনি পুরুষসূক্তের 'সহস্রপাৎ' তিনি 'এতাবানস্য মহিমা' রূপ উক্ত হইয়াও 'সম্পন্ন' হইলেন না, 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' এই লোকোত্তর অমৃতরূপে ত্রিপাদের অপেক্ষা রহিল।

'সম্পন্ন' মানে তিনি তো নিত্যসম্পন্ন আছেনই, আমার জ্ঞান তাঁতে সম্পন্ন হইল। ভাবের দিক দিয়াও যদ্দ্বারা সমাপত্তি বা সমাপন্নতাটি ঘটিবে, সেই পাদের তদপেক্ষা আছে।

পাদ আবার স্বয়ং চতুষ্পাৎ—উপপাদ্যতা, প্রতিপাদ্যতা, সম্পাদ্যতা এবং নিষ্পাদ্যতা ভেদে।

'উপ' সমীপ বা তটস্থ করিয়া দেয়; 'প্রতি' সাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রতিযোগী ও সম্মুখীন করিয়া দেয়; 'সম্' তত্ত্বে সংপরিষ্বক্ত (existence in coalescence) করিয়া দেয়। 'নিঃ' তত্ত্বে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে নিবিষ্ট করিয়া দেয়—যথা 'নদ্যা নদীনাথে'। তখন সম্পাদ্যতা আর নাই।

ক্রিয়া, জ্ঞান এবং ভাব—যথাক্রমে এই তিন সম্বন্ধে পাদের পাদচতুষ্টয়কে নিষ্পত্তিচতুষ্টয়, সম্পত্তি বা অভিনিষ্পত্তিচতুষ্টয় এবং প্রপত্তি বা সমাপত্তিচতুষ্টয়রূপে দেখিবে।

যেটি অমাত্র এবং অপাদ তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু যাহা কিছু সপাদ সেটিকে ক্রিয়ায়, জ্ঞানে এবং ভাবে সর্বথা অঙ্গীকার করিতে হইলে পাদদ্বারাই, এবং পাদের আবার পাদচতুষ্টয়ক্রমেই, অঙ্গীকার করিতে হইবে।

জ্ঞানে ও আনন্দে ঐ চারিটি পাদকে কি ভাবে সমাপন করিতে হইবে?

পুনশ্চ, অন্বয় এবং ব্যতিরেক এতদুভয় রীতিতে সিদ্ধ না হইলে কোনও কিছুরই নির্ব্যূঢ় সিদ্ধি হইল মনে করা যায় না।

যেখানে খ গ ঘ আছে (যথা, জাগ্রৎ; স্বপ্ন, সুষুপ্তি) সেখানে ক কিনা তুরীয় আছে, আবার যেখানে খ গ ঘ (যথা বহিঃপ্রজ্ঞ, অন্তঃপ্রজ্ঞ, ঘনপ্রজ্ঞাদিরূপ ভাস) নাই, সেখানেও সর্ব প্রপঞ্চোপশমেও 'ক' কিনা তুরীয় আছে—এই ভাবে ক এর (তুরীয়ের) অঙ্গীকার না হইলে ক এর (তুরীয়ের) নির্ব্যূঢ় সিদ্ধি হইল না।

এই অঙ্গীকার (নিজবোধ রূপ অববোধ) আবার সাক্ষাৎ এবং ক্রমিকভাবে দ্বিবিধ।

ক্রমিক স্থলে, শ্রবণে উপপত্তি (কিনা, তটস্থজ্ঞান), মননে প্রতিপত্তি (বিচার-দৃঢ় সিদ্ধান্তরূপে জ্ঞান), নিদিধ্যাসনে সম্পত্তি (তত্ত্বের-সঙ্গে 'সম্পন্ন' যে জ্ঞান,

অর্থাৎ পার-দৃশ্বরী অবধি প্রজ্ঞা) এবং সাক্ষাৎকারে নিষ্পত্তি (কিনা, নিঃ=নির্গত বা নির্গলিত হইয়াছে পত্তি, কিনা, পদত্ব যেখানে; অর্থাৎ, এখানে পাদের পদ্যতার অবসান)।

এইরূপ আনন্দ। আনন্দ-স্বরূপে (অর্থাৎ, অপাদ অমাত্ররূপে) স্বলসিত। কিন্তু সেটির ভান হইয়াও যে হইতেছে না! বাহিরে এবং অন্তরে আনন্দের অলসিত ভাবেই যে বিমূঢ় রহিয়াছি! বিলোমে এই বিমূঢ়তা কাটাইয়া স্বরূপে উপনীত হও! আদৌ, অলসিতের আনন্দখ্যাপন কর। এইটি আনন্দের উপপত্তি বা তটস্থাপত্তি। তারপর, বিলসিতের (ছন্দোগের) আনন্দখ্যাতি হউক। ছন্দঃ আনন্দেরি বিলসন—এই ভান হৌক। এটি প্রতিপত্তি। কেননা, বিশ্বচ্ছন্দের আনন্দবিলাস রূপটিই আনন্দের প্রতিপত্তি। তারপর, বিশ্বের আদ্যাশক্তি যে আনন্দরূপিণী, মুখ্যপ্রাণ যে আনন্দেরি উল্লসিত, উর্জ্জিত রূপ, এইটির ধারণায় সম্পত্তি। তারপর, স্বলসিত আনন্দে নিষ্পন্ন হও। তখন, কঃ কেন কথং বা পদ্যতে?

অক্ষর বস্তুর অধিগম অধিভূতাদি পাদচতুষ্টয়েই সম্পাদ্য। এই নিমিত্ত শ্রুতি, প্রকাশমত্ত্ব, আয়তনবত্ত্বাদি কথা বলিয়াছেন।

জপে পাদচতুষ্টয়

জপসাধনায়, বৈখরী হইতে মধ্যমায় প্রবিষ্ট হইলে জপ উপপন্ন হইল। তখন জপ তার test বা proving-টি দেখিতে পাইল। কেননা তৎকালে কেবল বাক্ ও মনঃ নয়, উভয়ের সন্ধি ও সেতু যেখানে সেই প্রাণ জপক্রিয়াটির ছন্দকে স্বয়ং গ্রহণ করিল। জপ সত্যকার—'শ্বাসে শ্বাসে' জপ হইতে চলিল। যে প্রাণনবৃত্তির ফলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শ্বাস চলিতেছে, অনিচ্ছায় বক্ষঃ এবং নাড়ী সমূহ স্পন্দিত হইতেছে, জপচ্ছন্দঃ সেই প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত হইল। সুতরাং তখন কমলিকে ছাড়লেও কমলি ছাড়ে না—জপো জাগর্ত্তি।

তারপর মধ্যমা ও পশ্যন্তীর সন্ধিতে যাইয়া জপের 'প্রতিপত্তি' (আপয়িতা, সংবর্দ্ধয়িতারূপ)। পশ্যন্তীতে সম্পত্তি এবং পশ্যন্তীর পারে নিষ্পত্তি। সম্পত্তিতেও অশনায়া, সুতরাং ভয়ের বীজটি দূর হয় নাই। নিষ্পত্তিতে আর কোনও বালাই নাই।

জ্ঞেয় ও মেয়র অন্যোন্য এষণা

'ওঙ্কার—এবেদং সর্ব্বম্'—ইহা যখন সত্য, তখন বলিতে হইবে যে ওঙ্কার তাঁর পাদমাত্রা এতদুভয়রূপে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন। অর্থাৎ, পাদ ও মাত্রা বিশ্বের সর্বত্র অনুস্যূত—cosmic functions.

পাদ ও মাত্রা যথাক্রমে সম্পরিষ্বক্ত 'সত্যঞ্চ-ঋতঞ্চ', সত্য এবং ঋতের অভিব্যক্তি বলিয়া, বিশ্বে বস্তুতঃ পাদ ও মাত্রার পরস্পর বিধুরতা বা অব্যাপ্তি নাই। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখিয়াছি। যিনি সর্ববিৎ তিনি বিশ্বে সব তাতে পাদ ও মাত্রাকে পরস্পর ওতপ্রোত মিথুনরূপেই জানিতেছেন। তিনি সঙ্গীতের রাগটি জানেন, তালটি জানেন না, অথবা তালটি জানেন, রাগটি জানেন না, এমন হইতে পারে না।

সত্য কি না, অস্তি আপনাকে পাদরূপে, এবং ঋত কিনা ঋচ্ছতি, আপনাকে মাত্রারূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সত্যকে যদি পাইতে হয় তবে পাদাশ্রয়ে এবং ঋতকে মাত্রাশ্রয়ে পাইতে হইবে।

পাদও মাত্রা দুয়ে মিলিয়া ছন্দঃ। একটি ফোটা ফুল। ফুলটির অবয়বাদি বিন্যাসে যে ছন্দঃ (structural symmetry etc.) সেই একটা দিক, আর তার ফুটিয়া যাইয়া যে ছন্দঃ রূপায়িত হইতেছে (functional congruity), সেটি হইল আর একটা দিক।

আমাদের অভিজ্ঞতায় এ দুয়ের অংশতঃ সমব্যাপ্তি আছে, কিন্তু সর্বতঃ নাই। ফুলটির স্থূল ও সূক্ষ্ম গঠনটি মানযোগ্য হইতেছে, কিন্তু তার গুণক্রিয়াদি সমগ্র ও মৌলিক ভাবে নয়।

তা ছাড়া, আমাদের জ্ঞানে মেয়তা ও জ্ঞেয়তা পরস্পর হইতে দূরে রহিয়া পরস্পরের নিকট হইতে অভিন্ন হবারই প্রয়াস করিতেছে। তফাতে রহিয়া তাদের যেন স্বস্তি নাই। মূলে যে তারা অভিন্ন, পূর্ণ জ্ঞানেও তারা অভিন্ন।

যে স্তরে জ্ঞেয় যাইয়া ভাবিতেছে, এটা জ্ঞেয়ই, পরিমেয় নয়, সেখানে পরিমেয় ছুটিয়া যাইতেছে, বলিতেছে—তুমি কি শুধুই জ্ঞেয়, এই দেখ তুমি পরিমেয়ও বটে। বিজ্ঞানে এই প্রকার জ্ঞেয় ও মেয়র লুকোচুরি খেলা দেখিয়া আমরা অবাক হইতেছি। বিজ্ঞান সূক্ষ্মের দিকে এটম পর্যন্ত গিয়া মেয়কে বলিয়াছিল—বাস, এ পর্যন্ত তোমার গতি। পরে অবিভাজ্য এটম্ও বিভক্ত হইল, ইলেক্ট্রনাদি আসিল, তখন এটমের

ভিতরের মাপ লইতেই নূতন বিজ্ঞান তৈয়ারি হইল—Atomic Physics. ইলেক্‌ট্রনের নিজের মাপ আছে বটে, কিন্তু সেই ছিল মাপের প্রান্তসীমা। এখন, Wave Mechanics ইলেক্‌ট্রনাদিরও আভ্যন্তরীণ জরিপে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ফলে, ইলেক্‌ট্রন একটা 'ঊর্ম্মি-গুচ্ছ' ('wave packet'), এবং ঊর্মিটিও কোনও 'বাস্তব ঊর্ম্মি' না হইতে পারে, সম্ভাব্যতার ঊর্মি (wave of probability)। অর্থাৎ থাকা এবং না থাকা—এই দুই সম্ভাবনা—কোটির মধ্যে যে স্থলে পূর্বোক্ত সম্ভাবনায় 'ঘনত্ব' বেশী সেইখানেই মনে করিতে পারি 'ক' নামক বস্তুটি বা ধর্মটি বিদ্যমান। ঠিক যে কোথায় আছে তা জানি না। তবে O-বিন্দুতে না থাকার চাইতে থাকার 'ঊর্ম্মিগাঢ়ত্ব' অধিক। অতএব বলিতেছি, 'ক' পদার্থটি P, Q ইত্যাদি বিন্দুতে না রহিয়া O-বিন্দুতে রহিয়াছে।

জ্ঞেয় (সঙ্খ্যেয়) এবং পরিমেয়ের এবম্প্রকার অন্যোন্যৈষণা উচিতই বটে। কেননা, ওঙ্কারের জ্ঞেয় ও মেয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধে রহিয়াছে।

অর্চ্চ ও অর্চ্চিঃ

এইদুটি ধারাকে (সঙ্খ্যেয় পরিমেয়তার) মিলাইবার প্রয়াসই কেবল বিজ্ঞান নয়, সকল সাধনই তাই।

অতএব জপের সাধনও তাই। জপে স্থূল সংখ্যা এবং সূক্ষ্ম স্পন্দাদিরূপে যেটি পরিমেয়, সেটি প্রথমতঃ বাক্ ও মনের মিথুনীভূত প্রাণরূপে, তারপর প্রাণ ও মহদ্‌বুদ্ধির মিথুনীভূত বিজ্ঞানরূপে, শেষে বিজ্ঞান ও সংবেদনের মিথুনীভূত আনন্দরূপে সঙ্খ্যেয় (সম্যক্ খ্যাতিমান) হইবে। এই নিগূঢ় 'ফল্গু' ক্রমটির ভাবনা কর। পূর্ব পূর্ব মিথুনকে পরপর মিথুনে হবন কর।

'অর্চ্চ' শব্দে পূজা বলিলে তো আসল কথাটাই অ-বলা রহিয়া গেল।

অশনায়া জপ 'মহাগ্রাস' (শ্রুতি এ শব্দটিও প্রয়োগ করিয়াছেন, এটি মৃত্যুকেও গ্রাস করিয়া থাকে—'মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্') তো কিছু বাদ দেয় নাই।

যজ্ঞের যেটি অশ্ব সেটি তো অ+শ্বঃ, এখন আছে, কাল রহিবে না। ইহার যেটি মেধ, সেটি তো মহাগ্রাসে পড়িয়া হইয়াছে মা+ইধ্ (ইন্ধ্), অর্থাৎ তার ইন্ধনত্ব তিরোহিত হইয়াছে, যেমন ভস্মীভূত ইন্ধনে দেখি। সে বিশ্ব অথবা অশ্বের আবার ইন্ধনত্ব হইবে কিরূপে? মেধ কিরূপে হইবে মেধস্ (মেধাঃ)—যে তপসা

এবং মেধসা মহাগ্রাস হইতে আবার সৃষ্টি যজ্ঞ প্রবর্তিত হইয়াছে? ঐ 'স্' অথবা বিসর্গটি কিরূপ?

সেটি হয় ঐ 'অর্চ্চ' দ্বারা। অর্চ্চ হইতে অর্চ্চিঃ এবং অর্ক দুইই।

অর্চ্চকে প্রাণের এক মুখ্যবৃত্তিরূপে বুঝিতে চেষ্টা কর। তবে না তদ্দ্বারা 'উপাসনা' হবে, আত্মন্বী, মনস্বী ইত্যাদি অস্তিপ্রত্যয় প্রতিযোগী যে সত্য তাতে পাদে ও মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে, মহাগ্রাস কবলমুক্ত হয়ে।

অর্ক, অপ্ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বিশ্লেষণ ও ব্যঞ্জনা। সর্বকর্মসু অপের অপেক্ষা কেন?

ঋ ধাতুর অর্থ গতি, ব্যঞ্জনা ঋতম্। ঋকারের গুণে অর্, (অদেঙ্ গুণঃ)। এ গুণের ফলে কি হইল? ঋ মূর্দ্ধন্যমাত্র ছিল, সেটি কণ্ঠ্যমূর্দ্ধন্য হইল; অর্থাৎ, যেটি চরমব্যাহৃতি মূল অস্তিরূপে (অথবা নাস্তিরূপে) আত্মসংবৃত ছিল, সেটি আপনাকে সপ্তব্যাহৃতির (কণ্ঠ হইতে মূর্দ্ধা সকল ভূমির) সম্ভাবনাটি করিল। সম্ভাবনা, কিন্তু কার্যতঃ কি? ঐ অর্চ্চের 'চ', যেটি তালব্য। অর্থাৎ, সম্ভাবনারূপে অস্তিতারূপ সপ্তখ্যাতির প্রসজ্যমানতা ঘটিলেও কার্যতঃ আসিল চরমের ঠিক নিম্নের ব্যাহৃতি বা খ্যাতিটি। সেটি কি? তপঃ। এই তপে আসিয়াই অর্চ্চ হইল অর্চ্চিরাদি (বর্চ্চঃ, তেজঃ, ঊর্জ্জঃ ইত্যাদি)।

'কং' কাহাকে এ অর্চ্চিঃ বরণ করিবে? আত্মসংবেদনরূপ যে সুখ তাকেই। ইহাই মূল অর্ক বা অগ্নি যাতে অশ্বের মেধটি নিখিল সৃষ্টির গোড়ায় মেধস্ বা মেধারূপে পরিণত হইবে।

সুষুপ্তি থেকে যখন জাগরণে আস তখন অশ্বের মেধসমূহ হইল অব্যক্ত অবিবিক্ত সংস্কার রাশি। কোন্ অর্চ্চিঃ বা অর্ককে বরণ করিয়া এই অনিন্ধন মেধসমূহকে ইন্ধন করিয়া তোমার জাগরযজ্ঞটি আরম্ভ কর তাহা ভাবিয়া দেখ। সুষুপ্তির ভঙ্গে তুমি আত্মন্বী হও, মনস্বী হও কিভাবে?

আত্মসংবেদন (যেটিতে কংরূপে সুষুপ্তির ঘনপ্রজ্ঞ অবস্থায় সম্পন্ন হইয়াছিলে), সেটিকে জাগৃতিতে অর্করূপে পাইলে কি করিয়া?

একবারেই পাও নাই! মধ্যে অপ্, যেটি ঐ ঘনীভূত 'কং'কে রসরূপে 'ঋতায়িত' করিয়াছে। অপ্ কি জল? তেজের পরে তো অপের উৎপত্তি শুনি। তবে?

এ অপ্ পঞ্চভূতের অপ্ নয়। ব্যাকরণের রীতিতে এ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বহুবচনে প্রয়োগ কর, কিন্তু আসলে এটিও রহস্য সঙ্কেত।

অ+প্=কণ্ঠ্য+ওষ্ঠ্য। বাক্‌রূপ প্রাণ অগ্নি যে আধারে উত্থিত হইয়া সমন্তাৎ বিস্তারিত হইতে গেলেন, 'প' তাকে সংবৃত, রুদ্ধ করিতে গেল। এর ফলে মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্রের সৃষ্টি। যে শক্তি সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া আপনাকে বিলাইয়া দিতে চাহিতেছে, মন্ত্র তাকে বলে—তুমি এই বীজের মধ্যে সংহত হও, ঘনীভূত হও; যন্ত্র বলে, তুমি আমার মধ্যে গাঢ় হও বা বেগবতী হও; তন্ত্র বলে, তুমি আমার মধ্যে ছন্দঃ শাসিত হও।

এই অপ্‌টিকে না পাইলে তো কোন যন্ত্রই চলে না, কোনও মন্ত্রই সিদ্ধিদ হয় না, কোনো তন্ত্রই কুশল হয় না।

সুতরাং, এই অপ্‌কে পাইয়াই অশ্বমেধের যেটি অর্ক তার অর্কত্ব।

'তপঃ' এবং 'সত্যং' এই দুই ব্যাহৃতির ভানে খ্যাতির যে গ্রামে বা ভূমিতে যাইতে হয়, সে ভূমি মহাসমন্বয়ী ছন্দের অধিকারে। 'মহা' ও 'পরমের' সীমানাও এখানে। সীমানার পারে আর ভাষা নেই। মহাসমন্বয়ীর স্থান বলিয়া সত্যে সবকিছু ভেদ এবং দ্বন্দ্ব অবিরোধে, পরস্পরে সন্ধি করিয়া বিদ্যমান (অস্তি)। অথচ, প্রত্যেকের পূর্ণ ও শুদ্ধরূপটি সেখানে। পূর্ণ ও শুদ্ধ বলিয়াই সকল ভেদ ও দ্বন্দ্বের সন্ধি সমন্বয়। নীচের ভূমিতে অসঙ্গতি ও বিরোধ এই কারণে যে কোন কিছুরই পূর্ণ ও শুদ্ধরূপটি তথাকার খ্যাতিতে মিলিতেছে না। গোলাপটি আমার প্রিয়, কাঁটাটি তার অপ্রিয়; কালবৈশাখীর বর্ষণটি ভাল লাগে, ঝড়ে প্রমাদ গণি। পূর্ণ চিত্রটিতে গোলাপের কাঁটা, বৈশাখীর ঝড়—চমৎকার সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে। তাদের বাদ দেবার যো নেই। এই কথাকয়টি খোলসা করিয়া বুঝিতে হইবে।

বৃত্তিরূপ ও স্মৃতিরূপ

বিশ্বব্যাপারের স্থিরলেখরূপ আধার তো আছেই। 'সর্ব্বং ক্ষণিকং' মনে করিলেও রেহাই নেই। তাই, 'ছায়ারূপেণ সংস্থিতা'র সঙ্গে আধাররূপে 'শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'; 'বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা'র সঙ্গে 'স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা'। কি বিজ্ঞান, কি প্রজ্ঞান উভয় দৃষ্টিতেই অতীত অনাগত বিশ্বের ধ্রুবলেখরূপ 'সত্য লোক'টি আবশ্যক। নহিলে দুয়ের

কাহারও সম্যক্ উপপত্তি হয় না। বিজ্ঞানের Principle of Conservation-এর মূল এখানে। জড়ের মূল বস্তুতে Memory বা স্মৃতির মতো একটা কিছু আছেই। প্রজ্ঞানে মহান্ ও সূক্ষ্ম, সমূৰ্দ্ধ ও সমকালিক বা অক্রমিক জ্ঞানের ভূমিটিও এখানে। এটি সে যুগের ঈথার অবশ্যই নয়। 'লোক' বা 'খ্যাতি' বলা হইয়াছে এটিকে। গণিতে 'locus'এর সঙ্গে তুলনা করিও। যেমন, ধর দুটি বিন্দু। একটি ধর ধ্রুব (স্থির) আছে; অপরটি চলিতেছে। যদি সেটি এমন ভাবে চলে যে ধ্রুববিন্দুর সাথে তার দূরত্ব বরাবর একই থাকে, তবে সে সচল বিন্দুর গতিপথটি কি? বৃত্ত, যার কেন্দ্র ঐ ধ্রুববিন্দু। যদি বলিতাম—আচ্ছা, ঐ সচল বিন্দুটি এক ধ্রুববিন্দু এবং এক ধ্রুব রেখার সঙ্গে দূরত্ব বরাবর সমান বজায় রাখিয়া চলিবে, তবে তার গতিপথটি বৃত্ত না হইয়া প্যারাবোলা হইত ইত্যাদি। এখন, এই 'লোকসে'র ভাবটিকে কাষ্ঠায় লইয়া যাও। প্রশ্ন কর—বিশ্বের সব কিছু চলিতেছে, আসিতেছে যাইতেছে, নাইও হইতেছে, কিন্তু এমন কিছু কি নাই যার সম্পর্কে সে সবই আছে? রবীন্দ্রনাথের সেই 'কণাটুকু যেথা না হারায়' এমন কোনও বিপুল অব্যয় ধাম নাই কি? এ প্রশ্নের 'হাঁ' উত্তর দিতে হইবে. অন্যথা বিশ্বব্যবস্থাটাই অচল।

সত্যলোকখ্যাতি

আর তারা কিভাবে আছে? 'বীজ', 'সংস্কার', 'potential' এই সব নাম দিয়া থাকি। কেননা, আমাদের 'খ্যাতি' (Experience) ওখান পর্যন্ত যায় না। বীজকে বীজই বলি কেন? বীজের মধ্যে পাদপের আকৃতি, শক্তি, ছন্দঃ ও সত্তা—এর কোনটাই প্রত্যক্ষ করি না বলিয়া। প্রত্যক্ষ করিলে হয়তো বীজই বলিতাম না। নিখিলের বীজ আধাররূপে ওটি 'জনিপ্রত্যয়ের' বিষয়। তা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। কিন্তু 'অস্তি' এই খ্যাতি (actual experience) রূপে 'সত্যম্'—পূর্বালোচিত 'ধ্রুবলেখাধার'। 'লেখ' কথাটাও ব্যাপক অর্থে (আকৃতি, ছন্দঃ প্রভৃতি) অর্থে লইও। আমাদের খ্যাতিতে যেটির অনুমান করি, ঊর্দ্ধতন খ্যাতিতে তাকে পূর্ণ, পূর্ণতর রূপে প্রত্যক্ষ করি। যিনি সত্যলোক খ্যাতিতে অধিষ্ঠিত, তাঁর সম্পর্কে তাঁর 'লোকে' শুধুই বীজগুলিই আছে ভাবিও না, বীজ-অঙ্কুর-প্ররোহ-পাদপ সব কিছুই আছে। প্রথম খণ্ডের ২য় পরিশিষ্টের চিত্রটিও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

লোক ও লোকস্—দৃষ্টান্ত

এখন ভাবিয়া দেখ—'অস্তি প্রত্যয়ের প্রতিযোগী' বলিতে ঠিক কি বুঝিতে হইবে। ধর, এইক্ষণে কোনও অনুভববটি হইল। পরক্ষণে আর সেটি নাই। যেটি 'অস্তি', সেটি হইল 'নাস্তি'। বটে, কিন্তু সেটিকে পরে কোন সময় স্মরণ করিতে পারি। কাজেই, সেটি একান্তভাবে তো চলিয়া যায় নাই, কোন না কোন ভাবে 'অস্তি'। সেভাবে সেটিকে সংস্কার ইত্যাদি যা বলিবে বল। প্রশ্ন—কোথায় অস্তি? এই মস্তিষ্কের উপাদানে? Brain Substance-এ? তা বলায় অনেক মারাত্মক দোষ আসে। জন্মান্তর স্মৃতি ইত্যাদির তো কোনই উপপত্তি হয় না। 'সংযমের' দ্বারা পূর্বজাতিস্মরণ, প্রকৃত্যাপূরণ প্রভৃতি অনেক কিছুই ঐ 'মস্তিষ্ক বাদে' বাদ পড়িয়া যায়। সুতরাং অবশ্যই মনে করিতে হয় যে—এমন এক মহাবিপুল কোনও 'লোক' (locus) এবং 'খ্যাতি' (Ground Experiencc) রহিয়াছে, সেখানে সবকিছু ঘটনা, অনুভূতি, কল্পনা (সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে) আপন আপন 'বীজ' বা সংস্কারটি রাখিতেছে। মনে অথবা বাহিরে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে, সে সবই (সত্য হৌক, মিথ্যা হৌক) ঐ মহাবিপুল লোকে বীজরূপে অস্তি। যেমন বায়স্কোপের ছবির রীল। রীলে সূক্ষ্মভাবে সমগ্র ভূত, বর্তমান ও অনাগত ছবি জড়ান' আছে। আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, স্কোয়ার ট্রাঙ্গাল ইত্যাদিও অস্তি—কেননা, কল্পনায় অথবা কথায় তারা আসিয়াছে, আসিতে পারে। এ'লোক'টিকে 'মহাবিপুল' বলা হইল এই নিমিত্ত যে—সৃষ্টির আদিতেও 'যথাপূর্ব্বং অকল্পয়ৎ'—যেমন পূর্বে ছিল সেইভাবে সৃষ্টি কল্পিত হইল। কোথায় ছিল, যেখান থেকে সে সব স্মৃতিতে বা ধ্যানে পুনরায় আসিতেছে? কাজেই, অস্তিতার—যারা চলিয়া গেল তাদেরও কোন না কোন ভাবে থাকার—একটা আধারপট (Background) অবশ্যই মানিতে হয়। আগেকার দিনে বৈজ্ঞানিকেরা এক Perfectly Elastic Æther মানিতেন। সেরূপ ঈথার বর্তমানে প্রায় অচল। কিন্তু আমরা যে লোকের কথা বলিতেছি তার Elasticity বা স্থিতি-স্থাপকতা অদ্ভুত! সম্ভব অসম্ভব এমন কিছুই নাই, যাহা আপন 'স্থিরলেখাটি' ঐ অদ্ভুত আধারপটে না রাখিতেছে। এখানে বাস্তব-অবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভবের দ্বন্দ্ব নাই মনে হৌক, বাহিরে হৌক, কল্পনায় হৌক কিংবা কেবল বাক্যেই হৌক, এখানে সবকিছু অস্তি। বিশ্ব তো অতীত, বর্তমান, অনাগত ভাবে চলিতেছে। কিন্তু তার এক এবংবিধ 'স্থির সমগ্র-লেখ' এক অস্তিতার লোক (যথার্থ

অর্থে) আছে বলিয়া না রক্ষা! না থাকিলে নিয়ত-পরিণামিনী বিশ্বপরম্পরা তার 'কাঠামো'টা বজায় রাখিত কোথায়, কিভাবে? তার অন্তর্গত ঘটনাপুঞ্জ (Events) তাদের 'ছাপ' (impression, record) রাখিতই বা কোথায়? কর্ম্মের সংস্কার, 'অপূর্ব' ইত্যাদি কিভাবে সম্ভাবিত হইত? রীলে ছবি, রেকর্ডে গান, জারমপ্ল্যাজ্‌মে সংস্কার—এ সবই ওই অস্তিতালোকেরই অধিকারে এবং তাহারই দৃষ্টান্ত।

জপ-অনুধ্যানাদির সমগ্র লেখ

জপ-অনুধ্যানাদিতে ক্রিয়ার সমগ্র লেখটি (Complete picture) আমরা তো দেখি না। তাই, হয় হতাশ (despondent) হইতে থাকি, নয়তো মূঢ়াশ (complacent) বা স্ফীতাশ (over-confident) হই। জপকর্মের সমগ্র চিত্র দৃষ্টিতে ফুটিলে দেখিতাম—একটি অক্ষর, একটি ক্ষুদ্র স্পন্দনও 'লোপাট' হয় নাই, আছে; সঞ্চিত, রক্ষিত হইয়া আছে। থাকার ঠাঁই—ঐ সত্যলোক। সে ঠাঁই একটা যেন Eternal Now, যার কুক্ষিতে অতীত-অনাগত সংপ্রবিষ্ট। আচ্ছা, তা না হয় হইল। কিন্তু এই বিপুল অস্তিতার জঠরে ভাল-মন্দ, মিত্র-বৈরী, কল্পনা-জল্পনা, অসম্ভব-আজগুবি—সবই তো আছে! সেখানেও কি একরাশ ভূষির গাদায় গোটা দুই চার শাঁস বেমালুম মিশিয়া আছে? সত্যলোক তো দেখিতেছি এক নিরপেক্ষ 'অস্তি' বা 'আছে'র দেশ; সে দেশটি neutral—ভাল-মন্দ বেছে ঠাঁই তো সে দেয় না! তবে? সেখানে যেয়ে লাভটা কি? আমার জপকর্মের আগা-গোড়া পুরো চেহারাটা সেখানে পাইলাম। কিন্তু, অন্তরাত্মা জানেন—এতদিন জপে বসিয়া মনের ঘরে কি পাপই না করিয়াছি! সে ভরা পাপের নরক দেখে কি লাভ?

সমগ্র লেখ পাইয়া কি লাভ?

মা ভৈঃ—আশ্বস্ত হও। ভুলিও না যে সত্যলোক ব্যাহৃতির চরম ভূমি। কাজেই, শ্রীশ্রীধূমাবতী তাঁর হাতের কুলো ওখানে ফেলেন তো নাই-ই, বরং কুলোর কর্ম সেখানে তার সামর্থ্যের কাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ, সেখানে শাঁসও আছে ভূষিও আছে বটে, কিন্তু মোটেই মিশিয়া নাই। শাঁস শুদ্ধ অবিমিশ্র ভাবে 'ব্যাহৃত' রহিয়াছে। শাঁসে ভূষিতে তাল-গোল হবার জো মোটেই আর নাই। অর্থাৎ, সঙ্কর—যে সঙ্কর

'নরকায়ৈব'—তার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সঙ্কর হওয়াতেই তো যত গোল, যত বিপদ! সত্য খ্যাতিতে পৌঁছিয়া দেখিলাম—এই আমার জপের নাম অস্তি—শুদ্ধ স্বমহিমায় অস্তি; আর ঐ আমার অপরাধও অস্তি। সেও মহাবল অসুর বিক্রমে? না। তার বিক্রম ঐ সঙ্করে, যাহা দূর হইয়াছে—completely isolated হইয়াছে। শুদ্ধে সে 'অপাস্ত'। পলাইতে পাইলেই সে বাঁচে, কিন্তু অস্তির কুক্ষি থেকে যে মুক্তি পাইতেছে না। আগে এই লোক সম্বন্ধে দুটি নিরূপক বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে—স্থির ও সমগ্র। আরও একটি দাও—অমিশ্র বা তন্মাত্র। অবিমিশ্র নাম যে কি অদ্ভুত বস্তু তা এখানে সাধন পৌঁছিলে তবে খাঁটি করিয়া বোঝা যায়। একটি নামাক্ষরে পর্বতপ্রমাণ অশুভ সংস্কারাদি তুলার মতো নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়! শ্রীভগবানের নামাষ্টকের মধ্যে একটি নাম—সত্য। এই নামের কৃপা হইলে, বুঝা যায়—নামই সত্য, আর বিরোধী যা কিছু সে সব থাকিয়াও অসত্য। বস্তুতঃ এই খ্যাতিতে না আসা পর্যন্ত কোন কিছু খাঁটি খাঁটি সত্যও হয় না, মিথ্যাও হয় না। সুতরাং সত্য এমন এক খ্যাতি যেখানে সমস্ত কিছুই তার শুদ্ধ ও পূর্ণরূপে ধ্রুব (=অস্তি)। এই তিন নিরূপকের পরীক্ষা পরে সবিশেষ হইবে। ধ্রুবের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ (যদি থাকে তো) বিচার করিতে হইবে। তবে—'অস্তি প্রত্যয়' পদটা লক্ষ্য করিও। প্রতি+ই ধাতু থেকে প্রত্যয়। কাজেই অস্তিতায় যাহা রহিয়াছে এবং যাহা যাইতেছে—এই দুই ভাবেরই অন্তর্ভাব উহাতে। সত্যলোকটি static অথবা dynamic—এই সমস্যার বিচারও প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া থাকে।

সত্যলোক স্থির কি অর্থে? Basic Brain : Cosmic Memory

সত্যলোকের যে 'চিত্রলেখ' সেটি স্থির এই অর্থে যে তথায় যাহা 'রেখাপাত' করিয়াছে, সে রেখা রহিয়াই যায়, কদাপি মুছিয়া যায় না। ইহা এক Cosmic Reservoir of pictures and patterns, impressions and vestiges, seeds and potentials experienced as existent. আমাদের এই Brain এর মতো। কাজেই, একে cosmic Brain অথবা Basic Brain একভাবে ভাবিতে পারা যায়। আমাদের Brain তো static নয়; নূতন 'রেখাপাত' তাতে সর্বদাই হইতেছে। সত্যলোক সম্বন্ধেও সেইরূপ ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক। এটি শেষহীন, অন্তহীন নিত্য নূতনকেও ঠাঁই দিয়া চলিয়াছে! এ এক অদ্ভুত রহস্য! এক সাধারণ মানুষের আর এক মহাপণ্ডিতের Brain তুলনা

কর। ওজনে বা আকৃতিতে সামান্যই তফাৎ। কিন্তু শেষোক্তটি ঠাঁই দিয়াছে কত না বিশাল বিদ্যাবৈভব! চতুর্থ ব্যাহৃতি যে মহঃ, সেখানে আসিয়া শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতি তাদের সচরাচর পরিচিত চেহারা ও ধরণধারণ বদলাইয়া ফেলে। তখন তাদের আর আমরা সাধারণ মামুলি ফরমূলায় ফেলিতে পারি না। এখানে আসিয়া আমরা এক Basic Dynamics এর এলাকায় উপনীত হই—এক মৌলিক ছন্দোবিজ্ঞান।

Basic বলাতে ব্যঞ্জনা কতদূরে লইয়া যায়?

ইহার ব্যঞ্জনা যে কতদূর পর্যন্ত তাহা একটা দৃষ্টান্ত লইয়া ভাবনা কর। ধর "ওম্" অথবা "হরিবোল" অথবা "আল্লাহ" এইরকম ভগবানের কোন নাম জপ করিতেছি। জপের যেটি ধ্বনি অথবা যেটি ভাব সেটিকে স্থূলভাবে দেখিলে ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই মনে হয়। কণ্ঠযন্ত্রের (Larynx প্রভৃতি) কোন এক বিশেষ প্রকারের স্পন্দন জন্য ঐ ধ্বনি হইতেছে। স্পন্দনটি থামিয়া গেলে ধ্বনিটিও আর থাকে না মনে হয়। কিন্তু এরূপ ক্ষণস্থায়ী স্পন্দন এবং তজ্জন্য যে ক্ষণস্থায়ী ধ্বনি তদ্দ্বারা শব্দের যে অসীম ও অমোঘ শক্তি সেটি লব্ধ হইতে পারে কি প্রকারে? সুতরাং অবশ্যই মনে করিতে হয় যে স্পন্দনটিও সত্যসত্যই বিরত হয় নাই এবং তজ্জনিত ধ্বনিটিও একান্তভাবে শেষ হইয়া যায় নাই। উভয়ই সূক্ষ্মতার এমন এক স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছে যেখান পর্যন্ত আমাদের অনুভূতি সচরাচর যায় না। অর্থাৎ স্পন্দনটিও ধারারূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া চলিতেছে এবং তজ্জনিত ধ্বনিটিও তদনুপাতে এবং তদনুরূপ ভাবে চলিতেছে। আমাদের সাধারণ apparatus কে যদি বলি A_1, তবে অবশ্য A_2 A_3 A_4 . . . এইভাবে ক্রমিক সূক্ষ্মগ্রামের কতকগুলি apparatus স্বীকার করিতে হয়। A_1 এর স্পন্দন যখন বাহ্যতঃ নিবৃত্ত হইল, তখন A_2 এর স্পন্দন আরব্ধ হইল। অর্থাৎ প্রথমটির স্পন্দন সূক্ষ্মতার কোন এক গ্রামে আসিলে সে সেটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টি তার দেওয়া স্পন্দন নিজে চালাইয়া যাবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

সূক্ষ্মগ্রামে প্রতিপূরণ আপূরণাদি

শুধু চালাইয়া যাবার জন্য প্রস্তুত থাকে এমন নয় সেটিকে Resonance effect ইত্যাদির দ্বারা বর্দ্ধিত ও সমৃদ্ধ করিতেও প্রবৃত্ত হয়। এইভাবে দ্বিতীয় যন্ত্রটির কর্ম

যখন সমাধা হইয়া আসে, তখন তৃতীয় যন্ত্র বা A_3 উদ্বুদ্ধ হইয়া অনুরূপ ভাবে ক্রিয়াটিকে চালু করিয়া লয়। এইরূপ ক্রমবিন্যস্ত যন্ত্রপরম্পরার কল্যাণে গোড়ায় যেটি একটি সাধারণ স্পন্দন এবং তজ্জনিত উচ্চারিত ও শ্রুত ধ্বনি মাত্র, সেটি এক অতি সূক্ষ্মগ্রামের এবং মহাশক্তিশালী স্পন্দনে ও ধ্বনিতে ('Silent Sound' of tremendous potency) পরিণত হইতে পারে। তখন সাধারণ ধ্বনি অথবা sound, supersonics এর পর্যায়ে গিয়া উপনীত হয়। এরূপ ধ্বনিকে আমরা আগে 'মহারাব' রূপে চিনিয়াছি। মহর্লোকের সিংহদ্বার অবারিত না হইলে এই "হত দৈত্য মহাবল মহারাবের" সন্ধানটি মেলে না। এই বিশ্লেষণে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে আমাদের এই কারবারী স্থূল যন্ত্রের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতর ও মহত্তর যন্ত্র পরম্পরা বিন্যস্ত রহিয়াছে। এদেশের রহস্য বিজ্ঞান তাহাদের ষট্চক্রাদি নামকরণও করিয়াছে। কিন্তু সচরাচর এই সূক্ষ্ম অথচ সমর্থ পর্যায়ের আন্তর যন্ত্রগুলি (Inner apparatus) উদ্বুদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান নাই। শক্তির যে channel অথবা মার্গে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল যন্ত্রে উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে, সেই মার্গের সাধারণ নাম যদি দেওয়া যায় সুষুম্না, তবে জীবের সাধারণ ব্যবহারে ও অনুভূতিতে ওই সুষুম্না মার্গের মুখ অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে এক প্রবল রোধিকা শক্তি। সাধনের উদ্দেশ্য ওই রোধিকা শক্তিকে প্রসন্ন করিয়া সেটিকে সাধিকা শক্তিতে পরিণত করন।

আন্তর যন্ত্রগুলির আপন ছন্দঃ

ঐ সকল সূক্ষ্মগ্রামের যন্ত্রপরম্পরা (A1 A2 A3 . . .) কেবলমাত্র যে কোন ক্রিয়াকে ধারারূপে অবিচ্ছেদে চালাইবার নিমিত্ত রহিয়াছে এমন নয় পরন্তু ক্রিয়াটিকে শক্তিতে, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় উত্তরোত্তর গরীয়সী ও মহীয়সী করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত আছে। কিন্তু চাই সাধকের আপন আস্পৃহা ও প্রয়াসের দ্বারা ওই আন্তর যন্ত্রগুলির জাগৃতি ও প্রস্তুতি সংসাধন। ওই যন্ত্রগুলি যে নিয়মে পরস্পরে শক্তি বিনিময় এবং আপূরণ কর্মটি করিয়া থাকে, তাকে আমরা সাধারণ Dynamics এর formulaর ভিতরে সর্বথা পুরিতে পারি না বটে কিন্তু এটা স্থির যে, তাদেরও এক নিজস্ব Dynamics আছে যেটিকে আমরা Basic Dynamics নাম দিয়াছি। বর্তমান আণবিক বিজ্ঞানে এই Basic Dynamics এর কিছুটা আভাসও আমরা পাইতে আরম্ভ

করিয়াছি। স্থূলভূতবিজ্ঞানের সূত্র ও ছন্দঃগুলি সূক্ষ্ম আণবিক বিজ্ঞানে সর্বথা প্রযোজ্য হয় না দেখিতেছি।

বিশ্বক্ষেমের মহাভাণ্ডার

পূর্বোক্ত আলোচনায় এটি লক্ষ্য করিলাম যে কোনও স্পন্দন এবং তজ্জনিত ধ্বনি অথবা ভাব ক্ষণিকের মত মনে হইলেও সত্য সত্যই ক্ষণিক নয়। এমন এক লোক অথবা ভূমি অবশ্যই রহিয়াছে যেখানে বিশ্বের প্রতিটি স্পন্দন প্রকাশ্যে অন্তর্হিত হবার মত হইয়াও অবিনাশীভাবে নিজেকে রক্ষা করিয়া থাকে। শুধু আবার তাহাই নয়—স্পন্দনটি যদি কোন ক্রমবিন্যস্ত যন্ত্র-পরম্পরার সাহায্যে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর, মহত্তর এবং বীর্যবত্তর হইতে থাকে, তবে সে সমস্ত ফল বা effectsগুলি সঞ্চিত ও রক্ষিত হবার অবশ্যই এক ঠাঁই বিদ্যমান আছে। এই ঠাঁইটি হইল বিশ্বের সব কিছু পদার্থের এবং ঘটনার Conservation, Summation বা Accumulation এর Plane। এ Planeটি না থাকিলে বিশ্বের সব কিছুই ক্ষণিক, চপল, তুচ্ছ, অসার। সমস্ত কিছু রক্ষা এবং সঞ্চয়ের এই মহাভাণ্ডারটি না থাকিলে জীবনই বা কি, সাধনই বা কি, সিদ্ধিই বা কি! এইটি হইল সত্যলোক অথবা খ্যাতি।

সত্যলোককে বিশ্বের সম্বন্ধে 'সমগ্রা স্মৃতির' স্থান বলাতে এ যেন মনে না হয়—এটি এক বিশাল, বিরাট যাদুঘর, যেখানে যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার 'সংস্কার' গুলিই (relics, fossils ইত্যাদি) রক্ষিত হইয়া থাকে, তা নয়। এটি প্রাণ ও চেতনার অভিব্যক্তির এক ঊর্দ্ধতম খ্যাতি। কাজেই, নিখিলের (সত্যমিথ্যা, বাস্তব-কল্পিত সব কিছুরই) কেবল সংস্কার (রীল) নয়, পরন্তু স্মৃতিও (সমগ্র ছবি—বীজ থেকে পাদপ পর্যন্ত পর পর সকল পরিণতির) রহিয়াছে। সুতরাং সমগ্র স্মৃতি ও জ্ঞান সে ভূমিতে সিদ্ধ। যেহেতু, এ ভূমিতেও পরিণতি রহিয়াছে, চিত্রপট এবং তাদের 'রীল' দুয়েরি ক্ষেম (রক্ষা—conservation) এবং যোগ (addition and alteration) দুই-ই হইয়া চলিয়াছে, কাজেই, এই সমগ্রা স্মৃতি ও জ্ঞানের লোকটিকে 'ধ্রুবা স্মৃতি' এবং পূর্ণজ্ঞানের ভূমি বলা যায় না। এইজন্য, এখানে যে বিশ্ববোধের লেখ (picture) সেটি (পূর্বোক্ত অর্থে) স্থির বটে, কিন্তু ধ্রুব নয়; এবং জ্ঞানও সমগ্র বটে, কিন্তু পূর্ণ নয়। আবার যেহেতু, এখানেও সত্য-মিথ্যাদি 'অমিশ্র' বা অসঙ্কীর্ণ (unconfused) রহিয়াও ঠিক

তত্ত্বতঃ নিরূপিত ও ব্যবস্থিত হইয়া নাই (অর্থাৎ যেহেতু এখানেও সব কিছুর validity এবং value এ দুয়ের পরিপূর্ণ সমাধান হইয়া যায় নাই), অতএব এ 'লোক'কে খাঁটি 'শুদ্ধ'ও বলা যায় না। ধ্রুব, পূর্ণ ও শুদ্ধ—এ তিন লক্ষণ এখানেও পূরাপুরি (finally) পরিসমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং এখানে আসিয়াও 'অতঃ কিম'-এর সম্মুখীন হইতে হয়।

বিষয়, সম্বন্ধ, ভাব বা ব্যঞ্জনা, সত্ত্ব এবং তত্ত্ব (content, relation, meaning, reality and absoluteness)—এ পঞ্চ পাদে জ্ঞান পূর্ণ ও শুদ্ধ হইয়া থাকে। সত্যলোকে এই পঞ্চপাদ লক্ষ্যের নৈকটিক (approximate) হইয়াও লক্ষ্যে সর্বথা প্রবিষ্ট (consummated) হয় নাই। সেখানে এখন পর্যন্তও 'আপূর্য্যমাণতা', 'সিষাধয়িষা' (আপনাকে সিদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা) বর্তমান। এক Dynamic Series আপনাকে work out করিয়া চলিয়াছে; এ পর্যন্ত তার সমগ্র আকৃতিটিও দেখিতে পাইয়াছে; আপন নিয়ামক ছন্দেরও কথঞ্চিৎ সন্ধান পাইয়াছে; যে পরিপূর্ণ ও শুদ্ধ ফল constant perfect value তে যাইয়া সেটি চরম বিশ্রান্তি লাভ করিবে, তার আভাসও মিলিয়াছে। কিন্তু তথাপি সেই ধ্রুব পরিপূর্ণ ফলটি এখনও লব্ধ হয় নাই, সুতরাং চরমবিশ্রান্তিটিও ঘটে না। সত্য লোকের খ্যাতিতে আসিয়া বিশেষভাবে ওই পঞ্চপাদের শেষ দুইটি পাদ—সত্ত্ব এবং তত্ত্ব—সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায়। সত্যলোকে যিনি সিদ্ধ, তাঁর পক্ষেও এক চরম ও পরম সাধনার অপেক্ষাটি রহিয়া যায়। সেটি হইতেছে এই—ধ্রুব, শুদ্ধ এবং পূর্ণ সৎ (Reality) কি বস্তু? এবং যেটি সর্বতোভাবে স্বতন্ত্র ও অপর অপেক্ষাহীন বস্তু (Absolute) সেটিই বা কি পদার্থ? সুতরাং সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত সাধকের সাধন হইতেছে— "ওঁ তৎসৎ" এই ব্রহ্ম মন্ত্র এবং পরম ভাবের সাধন। সাধনের এই চরম ভূমিটি এখনও অধিগত না হইলেও ইহা স্থির যে যে-সাধক সত্যখ্যাতিতে অধিষ্ঠিত তাঁর মধ্যে স্মৃতি, জ্ঞান, মেধা, তপঃ, বীর্য এবং তুষ্টি এই এই সকল ঐশ্বর্যের এক বিপুল ও মহান বিকাশ অবশ্যই হইয়াছে। এবং যেহেতু এই সত্যখ্যাতিটি ব্যাহৃতি সপ্তকের শেষ খ্যাতি, অতএব এই খ্যাতিতে অভ্যুদয় সংঘটিত হইলে পূর্ব পূর্ব খ্যাতির যাহা কিছু দৈবী সম্পদ সে সবই (gathered) এবং সংহত (integrated) হইয়া যায়।

আগে যে Dynamic Seriesএর কথা হইল, সেটি যদি কূর্মাঙ্গন্যায়ে একবার সঙ্কুচৎ (convergent) আর একবার প্রসরৎ (divergent) ভাবা যায়, তবে

সমগ্রভাবে, এটি প্রকৃতিরই আকৃতি। কাজেই, সত্যলোকে যিনি অধিষ্ঠিত, তিনি প্রকৃতিজিগীষু, এবং প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্তে প্রকৃতিজয়ী। পূর্ব পূর্ব খ্যাতিতে অস্মিতাদি জিত হইয়াছে ভাবিতে হইবে। রসাশ্রিত সাধনে সত্যখ্যাতি অলসিত-উল্লসিত-বিলসিত রসের সমগ্র লেখটি দেখাইতে চায়; কিন্তু স্বলসিত রসে (ভূমায়) সে স্বয়ং প্রবিষ্ট হয় না। সত্যখ্যাতিতে ভেদাভেদ অচিন্ত্য হইয়াও আছে; এবং সেইভাবে খ্যাতিও আছে।

২৫। ভূরাদিভিরনন্তবত্ত্বম্॥
অবচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ-সমুচ্ছেদাদ্যসম্ভবাৎ।
আনন্ত্যং ব্রহ্মণি স্যাদ্ধ্যনন্তবত্ত্বং তু সপ্তসু ॥৬৮॥

২৬। অর্চ্চিরাদিভি র্জ্যোতিষ্মত্ত্বম্॥
অগ্নৌজ্যোতিষ্ট্বমস্ত্যেব কৃষ্ণবর্ত্মাপি স তথা।
ঊর্দ্ধগেন তেজসাগ্নি নির্ধূমঃ সোঽর্চ্চিরেবতু।
অস্মাদভ্যুদয়াদগ্নি র্যাত্যর্চ্চিরাদিমার্গতাম্॥৬৯॥

২৭। অক্ষাদিগ্রহণভূয়স্ত্বেন প্রকাশমত্ত্বম্॥
সমীক্ষা চ পরীক্ষা চান্বীক্ষেতি লৌকিকাদৃশিঃ।
বোধিশ্চর্ত্তম্ভরা প্রজ্ঞা সম্বোধিশ্চাপি যোগজা।
আধ্যাত্মিকা ইমাঃ নর্ব্বাঃ সন্ত্যাধিভৌতিকাদয়ঃ।
হেয়োপাদেয়তাহীনা স্বতঃসিদ্ধা দৃশির্মতা॥৭০॥

২৮। কায়াদিভিরায়তনবত্ত্বম্॥
আয়তনানি সত্যস্য সপ্তকায়াদিষু ক্রমাৎ।
নিখিলানি হি বস্তূনি সপ্তায়তনতামিয়ুঃ।
কতি ব্যক্তানি ভূতেষু কত্যব্যক্তানি চাসতে।। ৭১ ॥
জীবেষু পঞ্চকোষা যে তেঽপ্যেবং সমবস্থিতাঃ।
তে চ সপ্তাবিধাঃ সন্তি বাগ্‌জীবাভ্যাং সমন্বিতাঃ॥৭২॥

চাতুর্মাত্রিক বিশ্লেষণ

নব পদার্থবিজ্ঞানে যে কোন ঘটনার (Physical event) বিশ্লেষণের নিমিত্ত এক চাতুর্মাত্রিক আধার মানিয়া লইতে হইয়াছে। Space-এর সর্বপরিচিত তিনটি dimensions এবং তার সঙ্গে Time, এই চতুর্থ dimension মিলাইয়া এই চাতুর্মাত্রিক বিশ্লেষণটি (four dimensional analysis) নির্বাহিত হইতেছে। এইরূপ বিশ্লেষণের ফলে বাহ্যঘটনার বর্তমান বিবৃতি অধিকতর বাস্তব ও বিস্পষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই। Newton-এর যুগে বিজ্ঞানে (Classical Physics) এই অত্যাবশ্যক সমাহার ও সমন্বয়টি সংঘটিত হয় নাই বলিয়া তখনকার দিনের বিশ্লেষণ ও বিবৃতি অনেক পরিমাণে অবাস্তব (abstract) ও নৈকটিক মাত্র (only approximate) ছিল। কিন্তু বিশ্বের কোন ঘটনাই তো কেবলমাত্র, পুরাপুরিভাবে স্থূল এবং বাহ্য ঘটনা নয়! গাছ হইতে একটি পাতা খসিয়া পড়িল অথবা শরীরে একটা শিহরণ খেলিয়া গেল—এরূপ কোন ঘটনাকে কেবলমাত্র বহিরঙ্গভাবে দেখিলে সেটিকে সত্যকার দেখাই হইল না, বোঝা তো পরের কথা। এই নিমিত্ত কি আন্তর কি বাহ্য বিশ্বের প্রতিটি ঘটনাকে দেখার এবং বোঝার উদ্দেশ্যে এক সত্যকার সমগ্র এবং জীবন্ত আধার (a living complete frame of reference) আমাদের অবশ্যই ধারণা করিয়া লইতে হয়। নব পদার্থ বিজ্ঞানের আধারের মত আমাদের এই বিপুল প্রাণ ও চেতনার আধারটিও চাতুর্মাত্রিক ভাবিতে পারা যায়। যেখানেই যে ঘটনা ঘটুক না কেন সেটিকে মূলতঃ চারিটি দিক দিয়া আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হয়। প্রথম—এই স্থানে ও এই মুহূর্তে যে ঘটনাটি ঘটিল (event as here and now), সেটির আগেই বা কিরূপ এবং পরেই বা কিরূপ? বিকাশের দিকেই বা কি রূপ আবার সঙ্কোচের দিকেই বা কি রূপ? সেটি ঊর্ধ্বগামী হয় কতদূর অবধি আবার নিম্নগামী হয় কতদূর অবধি? এ সকলগুলিই ঘটনাটির সম্বন্ধে অবধি বা সীমার প্রশ্ন। আমাদের বিশ্লেষণে এইটিকে বলা যায় Co-ordinate of Continuity (যেটিকে সূত্রে 'অনন্তবত্ত্ব' বলা হইয়াছে)। দ্বিতীয়—এই ঘটনাটির পশ্চাতে কোন্ শক্তি অথবা আবেগ (Energy or Urge) কতখানি বিদ্যমান রহিয়াছে? এবং সেই শক্তির উত্তরোত্তর সমর্থ এবং যথার্থ রূপগুলি কি? যেমন কোন বাহিরের ঘটনায় যে-শক্তিটিকে স্থূলতঃ কার্যকরী দেখিতেছি সেটি হয়তো তাপ অথবা চুম্বকশক্তি,

কিন্তু আরও গভীর এবং ব্যাপক দৃষ্টিতে সে শক্তি তার কোন্ চেহারা আমাদিগকে দেখাইতে থাকিবে? শেষ পর্যন্ত "বরেণ্যং ভর্গঃ" অথবা ভাগবতী শক্তি না ভাবা পর্যন্ত এ অন্বেষণের অব্যাহতি আছে কি? জড় বিজ্ঞানের মত Inscrutable Power ভাবিলেই কি রেহাই মিলিবে? আমাদের বিশ্লেষণে এইটিকে বলা হইয়াছে জ্যোতিষ্মত্ত্ব (Co-ordinate of Energy value)। তারপরে তৃতীয়—যে ঘটনাটিকে অনন্তবত্ত্ব এবং জ্যোতিষ্মত্ত এই দুইদিক দিয়া বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াস করিতেছি সে ঘটনাটি আপনাকে ঐ ঐ ভাবে প্রকাশ করিবে কি প্রকারে এবং কাহার কাছে? অর্থাৎ, সেটির বৃহত্তর এবং মহত্তর ভাবে প্রকাশের নিমিত্ত তদনুরূপ দৃষ্টি এবং অনুভূতির ভূমিও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। আমাদের বিশ্লেষণে এইটি হইল প্রকাশমত্ত্ব (Co-ordinate of apprehension and comprehension—Realisation)। চতুর্থ—ঐ ঘটনাটি ঠিক কোন্ কায়া, অবয়ব অথবা আকৃতি (Magnitude, Form, Pattern) ধরিয়া আসিতেছে এবং সেগুলি কখন কি ভাবে বদলাইতেছে অথবা না বদ্‌লাইতেছে, এটিও আমাদের লক্ষ্য করিতে হয়। প্রকাশ্যে সেটি যে রূপ ধরিয়া আসিয়াছিল, নেপথ্যে যাইয়া সে রূপটি তাহার রহিল অথবা রহিল না—এ প্রশ্ন আমাদের করিতেই হয় এবং খুঁজিয়া দেখিতে হয় শেষ পর্যন্ত সে ঘটনার কোন এক ধ্রুব, পূর্ণ এবং শুদ্ধ লেখ (Picture) আছে কিনা। যদি থাকে তো কোথায় কোন্ ভূমিতে আছে? আমাদের বিশ্লেষণে এইটি হইল আয়তনবত্ত্ব (The Co-ordinate of Magnitude, Form and Pattern)।

উক্ত অনন্তবত্ত্বাদি মন্ত্রাদির অবয়ব, প্রয়োগ, এবং উপলব্ধি কি ভাবে উদাহৃত?

আমরা ইতঃপূর্বে পাদ, মাত্রা, কলা, কাষ্ঠা; মন্ত্র, ঋষি, দেবতা, বিনিয়োগ; মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা, মাত্রাতীত, পূর্ণমাত্রা;—ইত্যাদি কয়েকপ্রকার বিশ্লেষণের সূত্র প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু এ স্থলে-ছান্দোগ্য শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অনন্তবত্ত্বাদি যে চারিটি প্রসঙ্গ করা হইল সেগুলিকে বিশ্লেষণের মৌলিক সূত্র (Principles of Basic Analysis) মনে করা যাইতে পারে। অপরাপর সূত্রগুলি এই চারিটিরই অন্তর্গত এবং এই চারিটিরই বিশেষ প্রয়োগরূপ। যেমন ধর, কোনও মন্ত্র বা নাম। প্রথমতঃ

এটিকে 'অনন্তবৎ' রূপে দেখিতে হইবে ও পাইতে হইবে। সাধারণ যে কোনও শব্দের সঙ্গে মন্ত্রের বা নামের বিলক্ষণতা এইখানেই। সাধারণ যে কোনও শব্দকে এই মুহূর্তের কোনও ঘটনা মাত্র (Event as here and now) মনে করা চলে এবং সেরূপই আমরা মনে করিয়া থাকি। কিন্তু মন্ত্র সম্বন্ধে এইরূপ পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি একেবারেই অচল। তারপর মন্ত্রের বাচ্য কোনও দেবতা আছেন—সে দেবতাটি কি বস্তু? জ্যোতিঃ এবং লীলার কোনও ঊর্দ্ধতন ভূমি এবং খ্যাতিকেই দেবতা মনে করিতে হয়। সুতরাং 'জ্যোতিষ্মত্ত্ব' এই লক্ষণটিকে কোনও এক কাষ্ঠায় লইয়া যাইতে না পারিলে দেবতার কোনও পরিকল্পনা সম্ভব হয় না। তারপর আসিতেছেন ঋষি। এই ঋষি হইতেছেন 'প্রকাশমত্ত্বে'র অথবা দিব্য অনুভূতির এমন এক স্বচ্ছোজ্জ্বল অবস্থা, যেখানে ভ্রমপ্রমাদাদি সর্ববিধ কুণ্ঠাকার্পণ্যের সম্ভাবনা অপগত হইয়াছে। শেষকালে মন্ত্রের কোন একটি নির্দিষ্ট অবয়ব বা তনু বা কায়া অবশ্যই আছে মনে করিতে হয় এবং কোন এক নির্দিষ্ট ছন্দে ও আকৃতিতে মন্ত্রের বিনিয়োগও হইবে এটিও মনে করিতে হয়। মন্ত্রের অবয়ব ও বিনিয়োগের দিক দিয়া দেখিতে হইলে যে দৃষ্টিতে দেখিতে হয়, সে দৃষ্টির বিষয় হইল 'আয়তনবত্ত্ব' (Magnitude, Form, Pattern)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রণবের যে প্রথমমাত্রা অকার, সেটি হইল অনন্তবত্ত্ব; দ্বিতীয় মাত্রা উকার, আয়তনবত্ত্ব; তৃতীয় মাত্রা মকার, প্রকাশমত্ত্ব এবং নাদবিন্দু, জ্যোতিষ্মত্ত্ব। এইরূপ 'হ্রীঁ' এই বীজমন্ত্রে হকার হইল অনন্তবত্ত্ব, রকার প্রকাশমত্ত্ব, দীর্ঘঈকার আয়তনবত্ত্ব এবং চন্দ্রবিন্দু জ্যোতিষ্মত্ত্ব। এই নির্দেশগুলি মন্ত্রাক্ষর সমূহে গভীরভাবে প্রবেশ করিয়া তবে সম্যক অনুধাবন করিতে হইবে। যেমন প্রণবের অকারকেই অনন্তবত্ত্ব এবং 'হ্রীঁ' বীজে হকারকে অনন্তবত্ত্ব বলা হইতেছে কেন? পুনশ্চ ঐ দুটি বীজমন্ত্রে যথাক্রমে উকার এবং ঈকারকে আয়তনবত্ত্ব মনে করা হইল কেন? এ সকল প্রশ্ন, ঐ ঐ অক্ষরের এবং তাদের মূলীভূত যে মুখ্যপ্রাণ ব্যাপার সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাধান করিতে হইবে। অন্যথা অব্যবস্থার আশঙ্কা আছে। জপসূত্রে পরবর্তী কোন কোন স্থলে তল, লম্ব, বেধ এবং এ তিনের সমাহার ও সমন্বয়—এইভাবে সব কিছু বিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে। সে চারিটিকেও অনন্তবত্ত্বাদি এই চারিটির সঙ্গে মিশাইয়া লওয়া আবশ্যক। যথা, তল বা আধার হইল অনন্তবত্ত্ব, লম্ব অথবা ঊর্দ্ধগবৃত্তি হইল

আয়তনবত্ত্ব, বেধ অথবা depth dimension হইল প্রকাশমত্ত্ব এবং এই তিনেরই সমাহার ও সঙ্গতিতে হইল জ্যোতিষ্মত্ত্ব।

গায়ত্রীশিরঃ—রসকে প্রকাশমত্ত্ব মনে করা হইল কেন?

ইহা লক্ষ্য কর যে, দেশ কাল বস্তু ও সম্বন্ধ; অথবা সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ, এবং আকৃতি;—এই ভাবে সব কিছু বিশ্লেষণের যে চতুঃসূত্রী (Fourfold Scheme of Analysis) আমরা ইতঃপূর্বে ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, সেগুলিও গভীর দৃষ্টিতে অনন্তবত্ত্বাদি এই চারিটিরই সামিল হইয়া যায়। যেমন দেশ=আয়তনবত্ত্ব, কাল= অনন্তবত্ত্ব, ছন্দঃ=প্রকাশমত্ত্ব, এবং বস্তু=জ্যোতিষ্মত্ত্ব। এর ভিতরে ছন্দঃকে প্রকাশকের ভূমিকায় আনা হইতেছে এই নিমিত্ত যে, ছন্দঃই প্রকাশকের প্রতিকূল যাহা কিছু সেগুলিকে আচ্ছাদন করতঃ প্রকাশ-বিকাশের যেটি অনুকূল সেটিকে নিরুপদ্রব এবং সাবকাশ করিয়া লয়। এইরূপ, সত্তা=অনন্তবত্ত্ব, আকৃতি=আয়তনবত্ত্ব, ছন্দঃ= প্রকাশমত্ত্ব এবং শক্তি=জ্যোতিষ্মত্ত্ব। আগেকার সমীকরণ সমূহে যে জ্যোতিষ্মত্ত্বকে আমরা বস্তুরূপে পাইলাম (as Substance), শেষোক্তগুলিতে সেইটিকেই আবার শক্তিরূপে (as Power) পাইতেছি। গায়ত্রীমন্ত্রের "আপোজ্যোতীরসোঽমৃতম্"—এই ভাগটিকে শিরঃ বলা হয়। গায়ত্রীর শিরোভাগে এই যে চারিটি তত্ত্ব বিদ্যমান সেগুলিকেও যথাক্রমে আমরা আকৃতিমত্ত্বাদি ঐ চারিটির সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারি। যেমন আপঃ=আয়তনবত্ত্ব, জ্যোতিঃ=জ্যোতিষ্মত্ত্ব, রস=প্রকাশমত্ত্ব এবং অমৃত= অনন্তবত্ত্ব। এই সমীকরণে রসকে প্রকাশকের ভূমিকায় আনা হইতেছে এই নিমিত্ত যে সত্যকার রসবোধ বা আনন্দের স্পর্শ ব্যতিরেকে অন্তর্বহিঃ বিশ্বে প্রকাশ-বিকাশের অনুভূতিটি সম্ভব হয় না। কোন কিছুরই সমৃদ্ধ সমুজ্জ্বল অনুভূতি হইতে গেলেই যিনি অনুভবিতা তাঁর প্রাণে একটা রসের চেতনা অথবা আনন্দ-সংবিদ্ অবশ্যই হওয়া চাই। এই জন্যই বলিতে হয় যে কোনও কিছুকেই পূর্ণ ও প্রাণবন্ত করিয়া দেখিতে গেলে কেবলমাত্র বাহ্যদৃষ্টি অথবা মননের দৃষ্টি সম্বল হইলে চলিবে না, সে নিমিত্ত চাই আমার ভাব, বেদনা, সহানুভূতি ও সামরস্যের দৃষ্টি।

ঘটনার বামনরূপ ও বিশ্বরূপ

একদিকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, অন্যদিকে কবি ও ঋষি—এ দুয়ের দৃষ্টির, উপলব্ধির, এবং আস্বাদনের বিলক্ষণতা তো এই কারণেই। বিগত শতকে একটা আতাফল যে কেন ভূতলে পড়িল তার কৈফিয়ৎ দিতে বসিয়া বৈজ্ঞানিককে তার হিসাবের খাতায় একটা ছোট কল্পিত নক্সা (diagram) আঁকিয়া লইয়া হিসাব লইলেই চলিত। তখন আলোচ্য ঘটনাটিকে যথাসম্ভব পরিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করিয়া লওয়ারই রেওয়াজ ছিল। এই ব্যাপারের পারিভাষিক নাম ছিল—limitation of data. এইরূপ না করিলে হিসাব অসম্ভব রকমের জটিল হইয়া পড়িত, কাজেই এরূপ করা ছাড়া গত্যন্তর আছে মনে হইত না। কিন্তু এর ফলে আমাদের হিসাব অত্যধিক সঙ্কীর্ণ ও অবাস্তব (restricted and abstract) হইয়াই অবশ্য পড়িত। বর্তমান যুগে হিসাবের এই কৃত্রিম বাঁধ আমরা অনেক পরিমাণে ভাঙ্গিতে সমর্থ হইয়াছি। পৃথিবী ও আতাফল এ দুয়ের পরস্পরের টানাটানির বদলে আমরা বর্তমানে দেশ অথবা বিরাটের সংস্থিতিটাকেই এক অদ্ভুত জ্যামিতিক আকৃতিতে (intrinsic geometrical pattern) সাজাইয়া লইয়াছি। অর্থাৎ যে আধারে বহির্বিশ্বের ঘটনাপুঞ্জ ঘটিতেছে, সে আধারের যে একটা নিজস্ব আয়তনবত্ত্ব আছে এটা আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু নিখিল বিশ্বের এই যে আয়তন যার নাম দিয়াছি Space, সেটিকে অনন্ত বা অসীম মনে করিতে আমাদের বাধিতেছে। অর্থাৎ Space unbounded হইলেও unlimited নয়। ইহা একটা পরিমেয় ও পরিমিত বস্তু। এর সাথে কাল বা Timeকে জুড়িয়া লইয়া আমরা অনন্ত বা অসীমের তল্লাস করিতেছি। Space-এর হিসাবে যেটি পরিমিত, Time-এর হিসাবে কি সেটি তাই? Space ও Time এই দুইটিকেই এক করিয়া এক সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া হয় Continuum. এই Continuumটি সম্বন্ধে অনন্তবত্ত্ব লক্ষণটি কি পুরাপুরি বর্তিবে? এ প্রশ্নের নিঃসংশয় উত্তর দানে বিজ্ঞান এখনও প্রস্তুত হয় নাই মনে হইতেছে। আমি দ্রষ্টা (Observer), সম্মুখে একটি শিশির বিন্দু দেখিতেছি। ঐ শিশির বিন্দুটির সত্তা শক্তি প্রভৃতি আমার সম্মুখে ঐ স্থানটুকুতে এবং আমার মনোযোগের এই মুহূর্তটিতে কি পরিসমাপ্ত? বিজ্ঞান অবশ্য তা মনে করে না। এই বিরাট বিশ্ব সমগ্রভাবে এবং সমসূত্রেই প্রতিনিয়ত স্পন্দিত হইতেছে। এই স্পন্দনটিকে যদি একটা ঊর্মিরূপে

দেখিব মনে করি তবে অবশ্য কোনও দেশবিশেষ এমন কি কালবিশেষেও সে ঊর্মির পরিচ্ছেদ নাই, অন্ত নাই। তবে অবশ্য কোনও দর্শক-বিশেষের অভিনিবেশের সম্পর্কে সেই সীমাহীন ঊর্মি কোনও একটি স্থলে (here) এবং কোন একটি মুহূর্তে (now) নিজেকে ঘনীভূত (condensed) করিয়া দেখাইতেছে। তার এই ভাবে আপনাকে দেখানোই হইল আমার সম্মুখে ঐ ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু। আমার ব্যবহার অথবা কাজ চালাইবার খাতিরে যেটি স্বরূপে বিশ্বরূপ সেটিকে এইভাবে ক্ষুদ্র বামনরূপে আমার কাছে দেখা দিতেই হয়। যেটি স্বয়ং সীমাহীন অগাধ সিন্ধু, সেটিকে এইভাবে আমার প্রয়োজনের গরজে বৃষ্টিবারি, নদী, হ্রদ ইত্যাদি হইয়া আমার কাছে হাজির হইতে হয়।

প্রকাশ বা অনুভূতির উচ্চতর গ্রাম। সেগুলি খুলিবে কার কাছে, কোন্ দৃষ্টিতে? বিজ্ঞানের প্রান্তভূমিতে (At the Boundary line) কোন্ সঙ্কটের সম্মুখীন আমাদের হইতে হইতেছে?

আবার এও ঠিক যে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান, শক্তিকে (Energy) তার জড়তার পাশ হইতে মুক্তি দিতে একপ্রকার সমর্থ-ই হইয়াছে। অর্থাৎ বর্তমানে আর Energy কেবলমাত্র brute blind force মাত্র নয়, যার সম্বন্ধে Newton-এর যুগে সেই চিরাভ্যস্ত Equation এবং Formula-গুলি আওড়াইয়া গেলেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। জড়বিশ্বের মূল বস্তু যদি Electricity হয় তবে সেটিকে অবশ্য আমরা স্বরূপেও জানি না এবং সমগ্রভাবেও জানি না। সেটি যে আসলে প্রাণ অথবা চেতনার এক সার্বভৌম অভিব্যক্তি নয়, একথা আর আমরা জোর গলায় বলিতে পারিতেছি না। কাজেই জ্যোতিষ্মত্ত্বের মহত্তর এবং উজ্জ্বলতর রূপগুলির অন্বেষণ এখনই সুরু হইয়াছে মনে করা যায়। ঠিক সরাসরিভাবে না হইলেও গভীর ও নেপথ্যভাবে সেটি অবশ্যই সুরু হইয়াছে। অর্থাৎ বিজ্ঞান মুখে না হৌক্ অন্তরে ইহা ভাবিতে সুরু করিয়াছে—আমি শক্তির যে পরিচয়টি এ পর্যন্ত পাইয়াছি, সেটি তার সত্যকার পরিচয় নয়, সেটি তার বহিঃপ্রকোষ্ঠের বহিরঙ্গ পরিচয়। জ্যোতিষ্মত্ত্বের প্রান্তসীমায় আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি বটে কিন্তু কই জ্যোতির্ধামের সেই দিশারী, যে আমাকে এই অর্দ্ধজড়তা ও

অর্দ্ধচেতনার সঙ্কট হইতে মুক্তি দিয়া পরিপূর্ণ আলোকের মাঝে সকল কুণ্ঠা এবং দ্বিধার পারে আমায় লইয়া যাইবে? বিজ্ঞানের এই যে জ্যোতিষ্মত্ত্বের দিকে অভিসার তার পুরোগামী ও পুরোহিত হইবে কে? বিজ্ঞান তার যন্ত্রপাতি ও বিচার-মননাদির সাহায্যে যতটা অনুভূতি আপনাকে মিলাইতেছে, মাত্র ততটা অনুভূতি লইয়া থাকিলে তো বিজ্ঞানের কুণ্ঠা ও কার্পণ্য বিদূরিত হইবে না। এইজন্য আবশ্যক অনুভূতির উচ্চতর গ্রামগুলির উন্মেষ। এইটিই হইল ঋষির দৃষ্টি, যার ফলে প্রকাশমত্ত্বের পরম পর্দাগুলি আমাদের কাছে খুলিয়া যাইবে।

২৫। ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তখ্যাতি দ্বারা অনন্তবত্ত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে।

অনন্তবৎ বলিতে কি বুঝায়? সকল কিছুর আপন সীমার পারে যাইবার নিমিত্ত চিরন্তন আস্পৃহা

পূর্বে ৫ম সূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এমন এক পরমাশ্চর্য তত্ত্ব, যার সম্বন্ধে অবচ্ছেদাদি পঞ্চপ্রকারের ছেদ বা limitation-এর কোন প্রসঙ্গ নাই। এবং তত্ত্বতঃ ব্রহ্মবস্তু যদি সেরূপই হন, তবে তৎসম্বন্ধে সত্যম্ এবং অনন্তম্ এই দুই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ স্বরূপলক্ষণ পুরাপুরি বর্তিবে, তদপেক্ষা ন্যূন কোন বস্তু সম্বন্ধে বর্তিবে না। এই জন্য কারিকায় বলা হইল যে, আনন্ত্যম্ এটি সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই নিজস্ব ধর্ম। বলা বাহুল্য এটিকে ব্রহ্মের ধর্ম বলাতে ধর্ম ও ধর্মীর কোনও ভেদ কল্পিত হইল না। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অনন্ত এ দুটি তত্ত্বতঃ একই বস্তু, কেবল কহিতে গেলে দুই করিয়া কহিতে হইতেছে মাত্র। ব্রহ্মের স্বরূপগত এই যে আনন্ত্য বা ভূমত্ব, এর সঙ্গে ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতির যে অনন্তবত্ত্ব তার ভেদটি দেখাইবার নিমিত্ত কারিকায় বলা হইল 'অনন্তবত্ত্বং তু সপ্তসু'। অর্থাৎ অনন্তবৎ বলাতে এটি সূচিত হইতেছে যে কোন কিছুর অন্ত বা সীমা রহিয়াছে বটে (অন্তবৎ) কিন্তু সেটি ক্রমাগত অন্ত বা সীমার পারে আপনাকে লইয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ সে যেন বলিতেছে—তুমি আমাকে এই গণ্ডীর ভিতর এতটুকু করিয়া দেখিতেছ ও পাইতেছ বটে, কিন্তু এই দেখ আমি সেই গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেছি, বৃহত্তর ও মহত্তর হইতেছি—ক্রমশঃ "জ্যায়ান্", "বরীয়ান্" হইতেছি। পার তো তোমার দৃষ্টিটাকেও আমার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর

বিশাল করিয়া লও এবং তোমার পাওয়াটাকেও আমার সাথে সাথে উত্তরোত্তর মহীয়ান্ ও বরীয়ান্ করিয়া লও। 'ভূঃ' এই প্রথম ব্যাহৃতি আসিয়াই বলে, এই যে আমি তোমার সম্মুখে; তুমি আমাকে আপন করিয়া লও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেও সে কোন এক ঊর্দ্ধতন ধামের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া বলে—ঐ যে (অসৌ)। এটিকে আমরা স্বঃ ব্যাহৃতিরূপে পূর্বেই চিনিয়াছি। সুতরাং প্রথমব্যাহৃতি কোন কিছু সম্পদ আমার নাগালের মধ্যে আনিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলে—এই অন্তবৎ পরিমিত সামগ্রীটি লইয়া তোমার পড়িয়া থাকিলে তো চলিবে না, ঐ যে অসীম সম্পদের ভাণ্ডার তোমার কারবারের অগোচরে রহিয়াছে তার সন্ধানে তোমাকে অভিসারী হইতেই হইবে। যেটি অন্তবৎ তার আপন অন্ত বা সীমার পারে যাবার নিমিত্ত যে চিরন্তন আকুতি সেইটিকেই উদ্দেশ করিয়া বেদমন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—"অমৃতস্য পুত্রা অমৃতা অভূম।" এই আকুতি ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর প্রাণের ভিতর হইতে গুম্‌রাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিল "যেনাহম্ নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্।" কাজেই আমরা দেখিতেছি যে অনন্তবত্ত্বের মূলে রহিয়াছে এই গভীরতম আস্পৃহা। যেটি অনন্ত সেটি কোনমতেই কুত্রাপি কোন গণ্ডীতে চিরদিন চুপ করিয়া রহিবে না। সুতরাং এটি Dynamic, এটিকে Static বা আড়ষ্ট করিয়া দেখিলে একে বধ করিয়া ফেলা হয়। ব্রহ্মস্বরূপে যে অনন্তত্ব ধ্রুব এবং পরিনিষ্ঠিত, তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি রেণুতে সেই অনন্তত্ব আপনাকে হারাইয়া যেন পুনরায় নিজেকে মিলাইবার প্রয়াসে উদ্‌গ্রীব ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। ইহাও ব্রহ্মের তাঁর সৃষ্টিতে এক অভাবনীয়ভাবে অনুপ্রবেশ, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ।"

২৬। অর্চ্চিঃ প্রভৃতি দ্বারা যেটি জ্যোতিষ্মত্ত্ব সেটি লক্ষিত হইয়া থাকে।

অগ্নি—শুক্লবর্ত্মা ও কৃষ্ণবর্ত্মা। জ্যোতিঃ ও রসের পরস্পর সাহচর্য ও একাত্মতার ভূমি

পূর্ব সূত্রে আমরা যেটি অনন্ত বা ভূমা তার সন্ধান পাইলাম। বর্তমান সূত্রে সেই ভূমাকে জ্যোতিঃ এবং রস এতদুভয়ের পরিপূর্ণতা এবং অভেদ পরাকাষ্ঠারূপে আমাদের সন্ধান পাইতে হইবে। আমাদের সাধারণ অনুভবে জ্যোতিঃকে অগ্নি, তেজঃ, তড়িৎ ইত্যাদি ব্যক্ত ও অব্যক্ত বিবিধরূপে জানিয়া থাকি। বিজ্ঞানের যেটি প্রত্যক্ষ, সেটি

এসকলগুলিকে সূক্ষ্মতার ও বিপুলতার আরও গভীর ভূমিতে লইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে সন্দেহ নাই। বহির্বিশ্বে ক্রিয়াশীল যে শক্তি, সেটিকে আণবিক তেজঃ অথবা Nuclear Energy পর্যন্ত লইয়া যাইতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। আমাদের ব্যবহারে যেটি প্রাণ ও চেতনারূপে পরিচিত সেটির স্বরূপ সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত কোন সঠিক সমাচার দিতে অপারগ। শক্তির এইপ্রকার ত্রিধা অথবা বহুধা অভিব্যক্তির মূলে কোন সমতা ও সামঞ্জস্যের আধার ও উৎস আছে অথবা নাই, এ সম্বন্ধেও বিজ্ঞান আপাততঃ নিরুত্তর। তবু এটা ঠিক, তার সর্ববিধ সমীক্ষা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়া জ্যোতীর বর্ত্ম ধরিয়াই অগ্রগামী হইয়াছে ও হইতেছে। তবে মুস্কিল এই যে বিজ্ঞানের সন্ধানের বস্তু যে আলোক, সেটি অনেক সময় কেবলমাত্র যে আলেয়ায় পর্যবসিত হইতেছে এমন নয়, সেটি আমার অনুসন্ধানের প্রান্তভূমিতে আসিয়া নিজেকে এক গাঢ়তর তমসার কুক্ষিতে (inscrutable unknown) হারাইয়াও ফেলিতেছে। আত্মানুভূতি এবং বিশ্বানুভূতির সব চাইতে অন্তরঙ্গতম যে সত্য, সেটি তো বাইরের তাপ, আলোক, তড়িৎ এ সবের কোনটাই নয়; সেটা হইল প্রাণ এবং চেতনা। এ দুটিকে যতখানি সাক্ষাৎ ও নিবিড়ভাবে আমি জানি, বহির্বিশ্বের অন্য কিছুকেই তো আমি তেমন আপন করিয়া জানিতে পারিতেছি না। অথচ, এই দুটি সম্বন্ধেই বিজ্ঞানের সংশয় প্রগাঢ় এবং অজ্ঞতা অপরিসীম। সুতরাং দেখিতেছি যে, বিজ্ঞান তার গবেষণাবেদীতে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, সে অগ্নি সত্যসত্যই কৃষ্ণবর্ত্মা—ধূমে সমাবৃত। সে অগ্নির যে দীপ্তি সেটি দৃষ্টিকে যতটা স্বচ্ছ করিয়া দিতেছে, সেটি তাকে ততোধিক ধূমে ও জ্বালায় আকুল করিয়া দিতেছে। সুতরাং প্রশ্ন জাগে, নির্ধূম বা ধূমহীন অগ্নি কোথায়? এবং কেমন করিয়া সে অগ্নি আমি জ্বালাইব? সে অগ্নি কৃষ্ণবর্ত্মা নয়, পরন্তু সে অগ্নি শুক্লবর্ত্মা। এই শুক্লবর্ত্মা অগ্নির সাধারণ নাম দেওয়া হয় জ্যোতিঃ। আমাদের সাধারণ পরিচিত অগ্নি, তেজঃ, আলো প্রভৃতি এই জ্যোতিরই কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত ও গুণ্ঠিত রূপ। তাদের এই সচরাচর কুণ্ঠাদি জন্য যে কার্পণ্য, সেটি যদি কোন উপায়ে অপগত হয়, তখন আমাদের সামনেই জ্যোতির সন্ধানের যে পথ উন্মোচিত হয়, তার নাম অর্চ্চিরাদি মার্গ। যাঁরা যোগবলে তনুত্যাগ অথবা প্রয়াণে অভিলাষী, তাঁরা এই অর্চ্চিরাদি মার্গেরই প্রতীক্ষা করেন এবং এইটিকেই বরণ করেন। "শুক্লকৃষ্ণে গতীহ্যেতে"—গীতোক্ত এই দ্বিবিধা

গতির মধ্যে শুক্লাগতিকেই ভজনা করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র প্রয়াণকালে নয়, জীবনের যেটি সাধন, সেটিকেও সর্বতোভাবে এই শুক্লাগতির অনুসরণে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। এই শুক্লবর্ত্মে যতই অগ্রসর হইব, ততই দেখিব যে আমাতে ও বিশ্বে অভিব্যক্ত সকল প্রকার শক্তিই জড়, প্রাণ, চেতনা এক অভিন্ন পরমরসোজ্জ্বল মূলের অভিমুখী আমাকে লইয়া চলিয়াছে। জড়, প্রাণ ও চেতনার মাঝে যে দুস্তর ব্যবধান এবং সময়ে বিরোধ ভাসিয়া উঠিতেছে; ক্রমেই দেখিব যে আমার আলোকের অভিসার পথে সে ব্যবধানও দূর হইয়া যাইতেছে এবং তাদের বিরোধও এক অভিন্ন সত্যচ্ছন্দঃ ও মধুচ্ছন্দের শাসনে আসিয়া পরম সমন্বয় এবং অচ্ছেদ্য মৈত্রীতে পরিণত হইতেছে। সুতরাং জ্যোতিষ্মত্ত্বের পথ হইল The Way of Supreme Integral Yoga। আমাদের সাধারণ অযুক্ত, এমন কি যুঞ্জান অবস্থারও পরিচয়ে জ্যোতিঃ এবং রস, আলোক ও পুলক, এ দুটি যেন পরস্পরকে পাশ কাটাইয়া চলে দেখি। যদি বা কখন তারা পরস্পরে হাত ধরাধরি করিয়া চলে, তবু তাদের সে মিলন পরিপূর্ণ ও স্থায়ী হয় না। সুতরাং প্রশ্ন উঠে—আছে কি উপলব্ধির এমন এক পরমতার স্থান, যেখানে জ্যোতিঃ বলে আমি রসই, রস ছাড়া আমার স্বতন্ত্র সত্তা নাই; যেখানে আলোক বলে, পুলক শুধু আমার সাথী ও দোসর নয়, পুলক ও আলোক আমরা দুইই একাত্মা, একই বস্তু। এইখানে না আসা পর্যন্ত জ্যোতিষ্মত্ত্বের যে সন্ধান তার অবসান হয় না।

শুক্লবর্ত্মে অভ্যারোহে পরপর অনুভূতি এবং সে সকলের জপধ্যানাদির সাধনক্রম.

আমাদের নিত্যপরিচয়ের পার্থিব অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞানের তৈজস বস্তু (Radiant Matter or Energy), ধ্যানের (ধীমহি) বরণীয় ভর্গঃ, এবং শেষকালে তুরীয় ভাব বা সমাধির "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" পর্যন্ত ভাস্বর ও ভাস্বান-এর ক্রমঊর্দ্ধগামী ধারা চলিয়াছে। এ ধারার বিশ্রান্তি অবশ্য জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ যে পদার্থ তাতেই; কেননা, সেখানে জ্যোতিঃ সাতিশয়তা-রহিত বা নিরতিশয় এবং অন্যাপেক্ষারহিত বা নিরপেক্ষ (Light as Absolute)। আমরা পূর্বে এই সকল ক্রমোন্নত ভূমিপরম্পরাকে সপ্তার্চ্চিঃ অগ্নি রূপে চিনিয়াছি। বিভিন্ন

ভূমিতে এদের সংজ্ঞা বা নাম বিভিন্ন হইলেও, এদের সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যায় অর্চ্চিঃ (ঋক্ এবং অর্চ্চিঃ এই দুই শব্দের মূলগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করার বস্তু)। এই অর্চ্চির পন্থায় অগ্রগামী হইতে যাইয়া যে মন্ত্রটিকে আমাদের সর্বাগ্রে জপধ্যান করিতে হয়, সেটি হইল সেই অভ্যারোহ মন্ত্র "ওঁ তমসো মা জ্যোতির্গময়"। এই যোগে যখন আমি আরূঢ় হইতে সমর্থ হই, তখন আমার উপলব্ধি যে মন্ত্রে ও বাণীতে আমাকে অভিব্যক্ত করিতে চায়, সেটি হইল সেই প্রসিদ্ধ বেদবাণী "অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"—আমরা জ্যোতির লোকে উপনীত হইয়াছিলাম এবং সে লোকের যে দৈবীশক্তি ও বিভূতি সেটিকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিয়াছিলাম। তারপর এই ভূমিতে আরূঢ় হইয়া যখন নিজের সত্তাটিকেই জ্যোতিঃ এবং রসের সঙ্গে পরিপূর্ণ অভেদে উপলব্ধি করি, তখন আমার মন্ত্র এবং বাণী যেন ডাকিয়া বলে—"ওঁ জ্যোতীরহং বিরজা বিপাপ্মা বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ"—আমি স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আমাতে রজঃ এবং পাপ্মার লেশটুকুও আর নাই, সুতরাং আমি সম্পূর্ণরূপে মৃত্যু এবং শোকের পারে গিয়াছি।

বিজ্ঞানের দিক দিয়া বস্তু ও শক্তির বিশ্লেষণ ও সমীকরণ। এর কাষ্ঠা কোথায় মিলিবে?

আধুনিক জড়বিজ্ঞান বস্তু এবং শক্তির (Mass & Energy)—এদের সমীকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এবং সে শক্তিকেও অনেক পরিমাণে জড়তার পাশমুক্ত করিয়া তৈজস কলেবর ধারণ করাইতেও সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পদার্থের নাভিনিষ্ঠা শক্তি পরচ্ছন্দা না রহিয়া স্বচ্ছন্দাও হইয়াছে সন্দেহ নাই (Indeterminacy Principle)। কিন্তু তবু প্রশ্ন দিনের পর দিন অধিকতর উদ্গ্রীব হইয়া উঠিতেছে—আমার অন্তরতম পরিচয়ের সামগ্রী যে প্রাণ ও চেতনা, তার সাথে ঐ সকল equation এবং formulaর আকৃতি-বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের শক্তিসম্পর্কটা কি এবং কতখানি। বলা বাহুল্য যে, অর্চ্চির পথে যে সন্ধান অগ্রগামী হইয়া চলিয়াছে, সে কিছুতেই প্রাণ এবং চেতনাকে এড়াইয়া যাইবে না; বরং সেইটি উত্তরোত্তর উপলব্ধি করিবে যে শক্তির সত্যকার স্বরূপ এবং আকৃতি (Reality এবং Pattern) যদি কোথাও খুঁজিয়া পাইতে হয়, তবে সেটি পাইতে

হইবে প্রাণ এবং চৈতন্যের গভীরতর এবং বিপুলতর প্রকাশের মাঝেই, অর্থাৎ শক্তি আসলে বিশ্বে ওতপ্রোত, বিশ্বের আধার এবং নিয়ামক যে প্রাণ এবং চৈতন্য, তাহাই। এইটিকেই লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন, "প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানম্ বীজমব্যয়ম্।" বৈজ্ঞানিকের শক্তি এই ভাগবতী চিৎশক্তিরই একটি পাদ, একটি মাত্রা এবং একটি কলা মাত্র। কাষ্ঠা বা সীমার অন্বেষণটি চলিয়াছে, এখনও নিরস্ত হয় নাই, এইটুকু ভরসা। বিগত শতকের বিজ্ঞানে এক বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর কতকগুলি বামনাকার বিলিয়ার্ড বর্তুল সাজাইয়া, তাদের পরস্পরের ঠোকাঠুকি ধাক্কাধুক্কির দ্বারা এই বিরাট বিশ্বের সমস্ত কিছু সমস্যার সমাধানের প্রয়াস হইত। এখন সে নিরেট বর্তুলগুলি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তাদের স্থানে দেখা গিয়াছে কতকগুলি তৈজস আকৃতি (Energy Patterns)। কিন্তু এই তৈজসরূপগুলি যে ঠিক কাহার বা কাদের, তা এখনো আমরা জানিতে পারি নাই। আণবিক শক্তির আকারে সেটি আসুরী মূর্তিতেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু আসলে সেটি কি? আমরা কি কোনদিন বিজ্ঞানের কণ্ঠে সেই প্রাচীন বেদবাণীটি শুনিব—"অগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্"!

প্রকাশ ও প্রকাশয়িতা

নিত্যহবনের "ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা"—এই ভাবে গোচর ও অগোচর সর্ববিধ অগ্নিকেই জ্যোতির সঙ্গে অভেদ ভাবনা করতঃ যে মন্ত্রের বিনিয়োগ হইয়া থাকে, সেটি হইতে আরম্ভ করিয়া "ওঁ জ্যোতিরহং..." ইত্যাদি বিবিদিষা সন্ন্যাসের যে বিরজা হোম তাতে নিজের আত্মা এবং পরম জ্যোতির সাক্ষাৎ অভেদ ভাবনা পর্যন্ত এক ঊর্দ্ধবিশাল জ্যোতির্ধাম আমাদের অনুভূতিতে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া ওঠে দেখিতে পাই। ভূর্ভুবস্বঃ প্রভৃতি সপ্তব্যাহৃতি বা খ্যাতিকে এই ঊর্দ্ধবিশাল অসীম জ্যোতির্ধামের এক এক প্রান্ত ভূমি (leading stages) মনে করা যাইতে পারে। এখন এই প্রকার বিশাল হইতে বিশালতর, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রকাশের নিমিত্ত আমাদের মধ্যে যেটি প্রকাশক বা অবভাসক, সেটিরও কতকগুলি ক্রমবিন্যস্ত ভাব ও ভূমিপরম্পরা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সেই প্রকাশয়িতার কথাই পরের সূত্রে বলা হইতেছে।

২৭। অক্ষ অথবা ইন্দ্রিয় থেকে আরম্ভ করিয়া আমাদের বিষয় ও বস্তু গ্রহণের যে উপায়টি রহিয়াছে, তার উত্তরোত্তর উৎকর্ষের (ভূয়স্ত্ব) দ্বারা প্রকাশমত্ত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে।

গ্রহণ কাহাকে বলে এবং তাহার ভূয়স্ত্ব বলিতে কি বুঝায়?

কোন বিষয়কে আমাদের বোধে বা জ্ঞানে গ্রহণ করা যায় যার দ্বারা, তার সাধারণ নাম "গ্রহণ"। এই গ্রহণ সম্বন্ধে বিষয়টি হইল "গ্রাহ্য" এবং যে গ্রহণ করিতেছে কিম্বা যার বোধ হইল সে নিজে "গ্রহীতা।" বাহ্য রূপ রসাদি বিষয় সম্বন্ধে গ্রহণটিকে ইন্দ্রিয়ও বলা হয়। আর মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় স্বীকার করিলে সুখ দুঃখাদি আন্তর বিষয়ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয়ের আর একটি নাম অক্ষ, (যেমন ভগবানের "অধোক্ষজ" এই নামটিতে দেখি)। অক্ষ এবং গ্রহণ এই দুইটি শব্দের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ; অর্থাৎ গ্রহণ ব্যাপক, অক্ষ তার ব্যাপ্য। এ বলিতে এই বুঝায় যে আমরা চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা, এমন কি অন্তঃকরণের দ্বারাও যে সব বিষয় জানিয়া থাকি, আমাদের বোধ, অনুভব, জ্ঞান, মাত্র সেই সবেতেই সীমাবদ্ধ অথবা পরিসমাপ্ত নয়। আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান এবং মানস জ্ঞানের অতীত এবং তাদের ঊর্দ্ধে অবশ্যই অন্যপ্রকারের জ্ঞান আছে। সে প্রকারের জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং অতিমানস জ্ঞান বলা যাইবে। এবম্প্রকার supersensuous এবং supramental experience এর নিমিত্ত আমাদের ভিতরে নিশ্চয়ই অন্যবিধা প্রকাশ এর সম্ভাবনাটিকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই প্রকাশ ব্যাপারটির যদি সাধারণ নাম দেওয়া যায় গ্রহণ (owning an acceptance of what has been disowned and ignored), তবে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে গ্রহণের ব্যাপার এবং অক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সমপর্যায়ে নয়; তাদের অধিকারও বিভিন্ন এবং ছন্দঃও বিভিন্ন। এবং এও বুঝিতে পারা যায় ঊর্দ্ধতন প্রকাশের যে ভূমি, সেটির সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এমন কি বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাও একটি পাদ মাত্র; এবং তার যেটি ঋত এবং ছন্দঃ সেটি নিম্নতন ভূমির ছন্দের আনুগত্য করে না, বরং সেটি নীচের ছন্দঃকে আপনার অনুগত করিয়া লয়, আপনার সঙ্গে মিলাইয়া লয়। এটিকে বলে Integral Synthesis। এখন উপর এবং নীচ এবং মধ্য এ

সকল ভূমিকে আক্রান্ত করিয়া যে সমগ্র প্রকাশের রাজ্য, তার সম্বন্ধে যেটি প্রকাশক, তার সাধারণ নাম দেওয়া যাক দৃশি—যে দেখায়। আমরা দেখিলাম যে এই দৃশি কোনও অনড়, আড়ষ্ট বস্তুবিশেষ হইতে পারে না। এটি মুখ্যপ্রাণ এবং বিরাট চেতনার ধর্মে ধর্মী; সুতরাং এটি অবশ্যই Dynamic। এই নিমিত্ত ইহার সম্বন্ধে "ততোভূয়ঃ", "ততঃ কিম্", এবম্বিধ প্রশ্ন এবং প্রয়াস স্বভাবতঃই উপস্থিত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সূত্রে বলা হইল "অক্ষাদিগ্রহণ ভূয়স্তে ন"। "অক্ষাদিগ্রহণ"-রূপ প্রকাশ ধর্মটি ভূয়ঃ, ততোভূয়ঃ, ততোঽপি ভূয়ঃ, এভাবে এক অসীম সত্য শিব সুন্দরের পরাকাষ্ঠার পানে অগ্রসর হইয়াছে।

আধিভৌতিকাদি তিনপ্রকারের দৃষ্টি—দৃষ্টান্ত

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ এই ত্রিবিধ দৃষ্টিতে গ্রহণ অথবা দৃশিকে দেখা যাইতে পারে। যেমন চক্ষুঃ একটি গ্রহণ, আধিভৌতিক দৃষ্টিতে এটি আমাদিগকে বাহিরের যে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতপদার্থ সেটিকে দেখাইতেছে। যন্ত্রের সাহায্যে দেখাটিকেও আমরা এর সামিল করিয়া লইয়াছি। আমার মধ্যে এই যে দেখার ব্যাপারটি ঘটিতেছে, সেটি অবশ্য আমার ভিতরেই গণ্ডীবন্ধ কোন শক্তির প্রভাবে ঘটিতেছে ইহা মনে করা যায় না। এর আধার, অধিষ্ঠান এবং নিয়ামক রূপে অবশ্যই কোন বিপুলতর শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সে শক্তি প্রাণ এবং চেতনার পর্যায়েই পড়িবে, জড়ের পর্যায়ে অবশ্যই পড়িবে না; অর্থাৎ সেটিকে কোন Cosmic Material Agency ভাবিলে চলিবে না। সুতরাং এই দেখা ব্যাপারের পশ্চাতে এর অধিষ্ঠান এবং নিয়ন্ত্রীরূপে যে বিশ্বজনীন প্রাণ ও চেতনা শক্তি বিদ্যমান, সে শক্তিকে বলিতে হইবে দেবতা। এই ভাবে চক্ষুরভিমানী দেবতাকে বলা হয় আদিত্য। আদিত্যের অপর নাম প্রাণ, এবং প্রাণ, ব্রহ্মেরই গোড়াকার অভিব্যক্তি। এইটি হইল আধিদৈবিক ভাবে ব্যাপারটিকে দেখা। কিন্তু এভাবে দেখিলেও তো দেখার শেষ হয় না। কেননা, আগেকার দুই রকমের দেখাতেই আমি খুঁজিতেছি আমার বাইরে যেন আমার অনাত্মীয় কোন এক সত্তা এবং শক্তিকে। এইবার দৃষ্টি আপনার পানে ফিরাইয়া আপন আত্মার মাঝেই এ সবকিছুর মূল এবং প্রতিষ্ঠা এবং পরিণতি খুঁজিয়া পাইতে হইবে। ইহাই হইল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা।

আধিভৌতিক দৃষ্টির সীমা এবং তন্নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকের সঙ্কোচ

ভূত এবং ভৌতিক পদার্থকে অধিকারে আনিতে চায় যে দৃষ্টি, তাকে বলে আধিভৌতিক দৃষ্টি। বিজ্ঞান এই দৃষ্টির অনুশীলনে ও সম্প্রসারণে ব্যাপৃত রহিয়াছে। সমীক্ষা, পরীক্ষা এবং অন্বীক্ষা (observation, experiment, ratiocination)—এই তিনটি হইতেছে বিজ্ঞানের শিষ্টসম্মত গবেষণার পথ। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এবং গবেষণার উপায় ও পদ্ধতিগুলিকে যথাসম্ভব উন্নত ও মার্জিত করা সত্ত্বেও, ইহা বলা চলিবে যে বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত কোন তথ্য অথবা তত্ত্বই একান্তভাবে নির্ভরযোগ্য কিম্বা ধ্রুব নয়। সমীক্ষা ও পরীক্ষার নিমিত্ত বিজ্ঞান উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট যন্ত্র এবং তাদের প্রয়োগ-প্রণালী আবিষ্কার করিতেছে সন্দেহ নাই; এবং অন্বীক্ষা ও বিচারের নিমিত্ত বিজ্ঞান যে বিশেষ টেক্‌নিক্‌টি অবলম্বন করিয়াছে, তাতে ভ্রমপ্রমাদাদির সম্ভাবনা যথাসম্ভব নিরস্ত হইয়া তথ্যটিকে প্রায় নিখুঁৎভাবে আমাদের কাছে হাজির করিতেছে। তথাপি এই বিবিধ উপায়েই যেটি সীমা (limitations) সেখানে বৈজ্ঞানিক স্বয়ং যতখানি সজাগ, আমরা সাধারণ খবরদারেরা বোধ হয় ততখানি সজাগ নই। এই নিমিত্ত আমরা বিজ্ঞানের তথ্য এবং তত্ত্বগুলিকে যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়াইয়া ধরিতে প্রস্তুত হই, বিজ্ঞান স্বয়ং ততখানি নিষ্ঠাতে সায় অথবা উৎসাহ দিতে প্রস্তুত নয়।

যোগের পন্থাঃ—পরিপূর্ণতা ও নির্ব্যূঢ়তারই অভিমুখে লইয়া চলে

এই নিমিত্ত জ্ঞান ও অনুভূতির এক অভিনব উন্মেষ বিকাশের পন্থাও আমাদের খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। সেই পন্থার সাধারণ নাম হইল যোগ। এই যোগজ দৃষ্টি দ্বারাই আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে ক্রমোন্নত ভূমিগুলি আমাদের জ্ঞানের ও পরিচয়ের মধ্যে আনিতে পারা যায়। এ স্থলে আধ্যাত্মিক শব্দটিকে আমরা অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবেই লইতেছি। শাস্ত্রে অনেক স্থলে সাধারণ শারীর ও মানস ব্যাপারগুলিকেও আধ্যাত্মিকের কোঠায় ফেলা হইয়া থাকে, যথা আধ্যাত্মিক দুঃখ। কিন্তু বর্তমান স্থলে আমরা অধ্যাত্ম রাজ্যে ঊর্দ্ধতন স্তর ও ভূমিগুলিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি

(Realms of higher Psychic and Spiritual Phenomenon)। এই সূত্রের কারিকায় যোগজ অনুভূতির কতিপয় নাম দেওয়া হইল মাত্র—যথা, বোধি, সম্বোধি, ঋতম্ভরা ইত্যাদি। এ সকলের সবিশেষ বিভাগ ও বিশ্লেষণ পরবর্তী গ্রন্থে হইয়াছে। কারিকায় শেষকালে এটিও বলা হইল যে যিনি দৃশি বা দ্রষ্টা, যিনি স্বপ্রকাশ হইয়া সকল কিছুকে প্রকাশ করিতেছেন, তাঁর নিজের সম্বন্ধে কোনও প্রকার সাধন অথবা সিদ্ধির proving-এর প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না, এবং তিনি স্বরূপে হান (Elimination or Subtraction) এবং উপাদান (Addition or assimilation) এ দুয়েরই অতীত; অর্থাৎ তাঁহা হইতে বাদ দিবারও কিছু নাই এবং তাঁতে যুক্ত হবারও কিছু নাই। সিদ্ধি সাধন অথবা যোগ বিয়োগ অথবা হরণ পূরণ—এ সকল ব্যাপার যেখানে সাবকাশ, সেখানে সত্যকার পরিপূর্ণতা এবং নির্ব্যূঢ়তা (Perfectness and Absoluteness) নাই।

২৮। কায়াদি দ্বারা বিশেষভাবে নিরূপিত অথবা নিরূপণযোগ্য হওয়াই হইল আয়তনবত্ত্বের লক্ষণ।

কোষপঞ্চক কি ভাবে কোষসপ্তকরূপে গণ্য হইবে?

'সপ্ত' এই মূল সংখ্যান দ্বারা ভূরাদি ব্যাহৃতি, অর্চ্চিরাদি অগ্নি ইত্যাদি যেমন সপ্তবিধ হইয়াছে, কায়া দ্বারা লক্ষিত যে আয়তন সেটিও সেই প্রকার সপ্তবিধ হইয়াছে, এই কথাটি কারিকাতে বলা হইল। এই সপ্তবিধ আয়তন যে সর্ব স্থলেই ব্যক্ত বা প্রকট এমন নয়; এদের অনেকগুলিই অব্যক্ত বা সম্পুটিত ভাবে (enfolded) বিদ্যমান থাকে। সুতরাং এদের কতিপয়ের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক পরিচয় ঘটে, অপরগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে ঘটে না। তাই বলিয়া সেগুলি যে প্রভাবরহিত এমন নয়; বরং যেটি অগোচর অব্যক্ত (অসৌ বা স্বঃ) সেইটি দ্বারাই যেটি সম্মুখীন ও গোচর সেটি লালিত ও প্রভাবিত হইতেছে। জীবের ভিতরে সাধারণতঃ পঞ্চকোষের কথা বলা হয়; কিন্তু জীব স্বয়ং এবং বাক্ এই দুটিকে হিসাবের মধ্যে লইলে কোষপঞ্চকের স্থলে কোষসপ্তক হইয়া থাকে। এখানে জীব বলিতে কোষসপ্তকের যেটি নাভিনিষ্ঠকেন্দ্রী সত্তা ও শক্তি Nuclear Substance or Power manifesting itself as 'অহম্' বা 'The Self') সেটি বিশেষভাবে সূচিত হইল। এইটিকে নাভি বা কেন্দ্রেতে পাইয়াই কোষসমূহ আপনাদিগকে এক

বিশেষভাবে সাজাইয়া (organised) লয়; এবং এইটি কেন্দ্রে রহিয়াছে বলিয়াই সেই বিশেষ যন্ত্র বা Apparatus-টি এক বিশেষভাবে আপনাকে ব্যাপারবান করিয়া যাইতেছে। সুতরাং এটিকে বাদ দিলে কোষসমূহের মধ্যে সন্ধি ও সংযোগ বলিয়া কিছু থাকিল না, এবং তাদের নিয়ামক বলিয়াও কিছু রহিল না। সুতরাং জীব একাধারে co-ordinating and controlling Principle (যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ)। তারপর বাক্‌কেও এই যন্ত্র (organism) এর এক মুখ্যস্থানে অবশ্যই বসাইতে হয়। কেন না, বাক্ কেবলমাত্র যে উৎপাদ্য ফল (evolved resultant of other factors) এমন নয়; সে নিজে উৎপাদক (evolving agency)। অতএব জীব এবং বাক্ এ দুটির অন্তর্ভাব করিয়া কোষসপ্তকরূপে সপ্ত আয়তন আমাদের মিলিল।

সপ্তবিধ আয়তনের শেষের তিনটি কি এবং কিরূপে সেগুলি মিলিবে?

সূত্রে 'কায়াদি' শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। বলার উদ্দেশ্য এই যে, কায় শব্দটিকে কেবলমাত্র স্থূল গোচর অর্থে লইলেই চলিবে না; এটিকে বিভিন্নগ্রামে আমাদের বুঝিতে হইবে এবং উপলব্ধিতে পাইতে হইবে। যেমন শ্রীচণ্ডীতে যে প্রসিদ্ধ নারায়ণী স্তব আছে তাতে ভগবতীর বিভিন্নরূপের কথা বলা হইয়াছে এবং সেই সকল রূপকে বারবার নমস্কার করা হইয়াছে। 'কায়াদি' বলিতে এই সকল রূপের মধ্যে সাতটিকে আমাদের বিশেষভাবে ধ্যানে ধারণা করিতে হয়। প্রথম "ছায়ারূপেণ সংস্থিতা"—What is apparent। দ্বিতীয় "শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—What is manifesting as Power। তৃতীয় "জাতিরূপেণ সংস্থিতা"—What is evolved as type or pattern। চতুর্থ "বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা"—What manifests as function or process। পঞ্চম "স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা"—What is at the back as potency or predisposition। ষষ্ঠ "ব্যাপ্তিরূপেণ সংস্থিতা"—What pervades as the continuum। সপ্তম "চিতিরূপেণ সংস্থিতা"—What sustains as Divine Life and Consciousness। সুতরাং চণ্ডীর অপূর্ব এই নারায়ণী স্তবে আমরা কায় বা আয়তন বস্তুটিকে এই সপ্ত পর্যায়ে দর্শন করিলাম। সাধারণ বোধের দিক হইতে

দেখিতে গেলেও আয়তনকে আমরা প্রধানতঃ চারি রকমে পাই—দৈশিক, কালিক, বাস্তব এবং ছান্দস। বলা বাহুল্য আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যে বিজ্ঞান সব কিছু দেখিয়া চলিয়াছে, সে বিজ্ঞান এই চতুর্বিধ আয়তনের খোঁজ রাখে ও রাখার চেষ্টা করিতেছে। এর মধ্যে 'ছান্দস' বলিতে বুঝিতে হইবে সেই আয়তন বা আকৃতি যেটি ছন্দঃকে বিশেষভাবে অধিকার করে। বহির্বিজ্ঞান বিশ্বের এই ছান্দস আয়তনটিকে কতিপয় মৌলিক সমীকরণ সূত্র (equations) দ্বারা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। "বাস্তব" বলিতে কি বুঝিব? বিশ্বের যেটি আসল বস্তু সেখান পর্যন্ত আধিভৌতিক দৃষ্টি অবশ্যই যাইতে পারে না; কাজেই সেইটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কিছু বলার নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যবহারে যেটি এতকাল পর্যন্ত Mass-রূপে চলিয়া আসিতেছিল, সেটি সম্প্রতি Energy-রূপেই রূপান্তরিত হইয়াছে; অর্থাৎ বিজ্ঞানের বস্তু এবং শক্তি এ দুয়ের মধ্যে শক্তিই মৌলিক, বস্তু তার এক অবস্থান ও সংস্থান বিশেষ মাত্র। এ দুয়ের মধ্যে পরিমাণগত অনুপাতটিও স্থির হইয়াছে। সুতরাং যেটিকে আমরা "বাস্তব" বলিতেছিলাম, সেটিকে যদি "শাক্ত" বলি তাতে বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ সায় আছে। বিজ্ঞানের গবেষণা এই চারিটি আয়তন লইয়া শনৈঃ শনৈঃ সূক্ষ্মের এবং কারণের ভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আমার দৃষ্টির সম্মুখে কোন পদার্থের যে আয়তন বা রূপটি ফুটিয়া উঠিল সেটি কি পরিমাণে যথার্থ এবং কতখানি সমগ্র এবং পূর্ণের কাছাকাছি—এই সমস্যার সমাধানেই বিজ্ঞানের যত কিছু গবেষণা ব্যাপৃত রহিয়াছে। যেটি যথার্থ, যেটি সমগ্র ও পূর্ণ সেটি অবশ্য বহু দূরে। আমরা দেখিয়াছি যে সত্য খ্যাতিতে না উপনীত হইলে কোন কিছুরই লেখ স্থির, সমগ্র, অবিমিশ্রভাবে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান যে চারিটি আয়তনের খোঁজে ব্যাপৃত রহিয়াছে সে চারিটিকে অতিক্রম করিয়া অথচ সে চারিটিকে ব্যাপিয়া আরও ত্রিবিধ আয়তন আমাদের মিলাইতে হইবে। মিলাইতে পারিলে তবে ঐ সপ্ত সংখ্যাটি পূর্ণ হইল, নচেৎ নয়। আয়তনের আর একটি নাম যদি দিই "তনু" তবে উপরকার ঐ ত্রিবিধ তনুকে বলা যায় মান্ত্রী, শাক্তী ও ব্রাহ্মী তনু। প্রকাশমন্ত্রের সমুন্নত স্তরগুলির উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ত্রিবিধ মহীয়সী তনুর সন্ধান মিলিবার নয়। পূর্বোক্ত নারায়ণী স্তবে "চেতনা" এবং "শ্রদ্ধা" এই দুইটি রূপের দ্বারা মান্ত্রী তনু "শক্তি" এই শব্দের দ্বারা শাক্তী তনু, এবং "মাতৃ", "ব্যাপ্তি" এবং "চিতি" এই তিনের দ্বারা ব্রাহ্মী তনু লক্ষিত হইয়াছে জানিবে।

কাষ্ঠা বা সীমাকে চারি প্রকারে দেখা—অধ্যাত্মজীবনে সব চাইতে যেটি মর্ম্মী প্রশ্ন তার সাথে এর সম্বন্ধ

আয়তনতত্ত্বের উপলব্ধি এবং তার যাথার্থ্যের মধ্য দিয়া (in respect of validity and value) সাতটি সোপান অথবা পর্ব আমরা ধারণা করিয়া লইতে পারি। স্থূল-গোচরতা, সূক্ষ্মগোচরতা, পরিসংখ্যেয়তা (measurability), পরিকল্পনীয়তা (as scientific theory), নিদিধ্যাসিতব্যতা (validity and value as revealed in Yogic experiment), পরিনিষ্ঠিততা (as finally ascertained and established), এবং চরমে সাক্ষাৎ অপরোক্ষতা (as perfect and direct realisation)। এ সকল পর্বের বিবৃতি ও ব্যাখ্যান প্রয়োজন মত পরে করা যাইবে। এ স্থলে ইহাও লক্ষ্য কর যে, পাদ মাত্রা কলা ও কাষ্ঠা এই চারিটিকে যদি আয়তনের লক্ষণের মধ্যে প্রবিষ্ট করান যায় তবে শেষের যেটি অর্থাৎ কাষ্ঠাটিকে চারিরকম করিয়া না দেখিলে সেটির পরিপূর্ণতা ও বিশ্রান্তি হয় না। সে চারিটি দিক হইতেছে এই:—কাষ্ঠা বা সীমাকে সমগ্রভাবে কি লইতেছি? সেটিকে কি অখণ্ডভাবে লইতেছি? সেটিকে কি বিশুদ্ধভাবে লইতেছি? এবং সেটিকে কি পূর্ণ সমন্বয়ীভাবে লইতেছি? এই চারিটি প্রশ্নের উত্তর না মেলা পর্যন্ত কাষ্ঠা যেন কিছুদূর যাইয়া কাষ্ঠবৎ পঙ্গু হইয়া রহে, এবং সেরূপ কাষ্ঠায় আমাদের পূর্ণ নিষ্ঠা সম্ভব হয় না। যেমন কেবল জড়ের ক্ষেত্রে তুমি আমাকে যে কাষ্ঠায় লইয়া যাইলে, প্রাণ ও চেতনার দেশে সেই কাষ্ঠাই কি কাষ্ঠারূপে পরিগণিত হইবে? প্রকৃতির এলাকাতে (In the domain of Nature) কোন ব্যাপারকে কোন এক সীমায় লইয়া যাইয়া সেটিকে সেইখানেই দাঁড় করাইয়া রাখিলাম; কিন্তু প্রশ্ন উঠে—প্রকৃতির পারে অপ্রাকৃত অমায়িক কোনো ধাম আছে অথবা নাই? এপারে কার্যকারণাদির যে নিয়মগুলি চালু রহিয়াছে, অপর পারেও সে নিয়মগুলি ঠিক সেই ভাবেই সচল? প্রাকৃতিক নিয়মের এলাকা হইতে স্বতন্ত্র অথচ ইহার উপরে অধ্যক্ষতা করে এমন কি কোন উর্দ্ধতন লোক নাই, যেখানে তুল্যবল ঘাত-প্রতিঘাতের বদলে একান্ত শরণাগতি এবং অহেতুক কৃপার সন্ধান আমাদের মেলে? অধ্যাত্ম-সাধনের জীবনে এই প্রশ্নের চাইতে অধিক মর্মী প্রশ্ন আর কিছুই নাই।

সাধকের পক্ষে তার আয়তনের পর পর রূপান্তরের অবস্থা এবং তার ফলে উপলব্ধির পর পর ভূমির উন্মেষ

শেষকালে সাধকের জীবনে তার নিজ আয়তনটিকে কিভাবে ক্রমশঃ রূপান্তরিত (re-form and transform) করিয়া লইতে হয় সেটি বিবেচনা কর। আমাদের এই সাধারণ কারবারী যন্ত্রটীকে ভোগায়তন নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এটা অবশ্য অনড় সাড়ষ্ট কোন সামগ্রী নয়। শুভাশুভ কর্মের দ্বারা এটির পরিবর্তন নিয়তই ঘটিতেছে। প্রাকৃত ধর্মেও এটি নিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু প্রশ্ন এই—আমার নিজের এই আয়তনটির সদাক্ষণ এই যে পরিবর্তন সেটিকে আমি আমার সাধনের অনুকূলে লইব কিরূপে? জপধ্যানাদি ক্রিয়া দ্বারা অভীষ্ট পরিবর্তনটি (desired transformation) আমাকে সংসাধিত করিতে হয়। আমার নিজের প্রয়াস নিষ্ঠার সঙ্গে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে পূর্বোক্ত উর্দ্ধতনধাম হইতে এক পরমাশ্চর্য প্রেরণা ও সহায়তা আমার মিলিয়া থাকে। এইটি হইল সাধকের পক্ষে বড় ভরসার কথা। বাহ্য প্রকৃতিতে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। যেমন জলকে শৈত্যপ্রয়োগে ধীরে ধীরে বরফ করিবার চেষ্টা করিতেছি। শৈত্য এক নির্দিষ্ট মাত্রায় নামিয়া আসিলে জলীয় দানাগুলির (molecules) যেন সহসা এক বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, যার ফলে জলীয় দানাগুলি নিজেকে বরফের দানা রূপে সাজাইয়া লয় এবং তার ফলে কতকগুলি নূতন ধর্ম নিজের ভিতরে প্রকাশ করে। শুধু আবার তাহাই নয়, এই নূতন ব্যূহ রচনার ফলে যে শক্তি কার্যকরী হয় (molecular energy) সেটি এত প্রচুর যে ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এক শক্ত নিরেট ইস্পাতের গোলার মধ্যে জল পুরিয়া সেটিকে centigrade এর শূন্য ডিগ্রীতে লইয়া যাইলে ভিতরকার জল বরফ হইয়া তার ইস্পাতের আবরণও ফাটাইয়া ফেলে। প্রকৃতিতে এইভাবে কত না সুদৃঢ় প্রস্তর স্তর বিদীর্ণ ও বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এইরকম জল যখন আবার উত্তাপের ফলে বায়বীয় আকার ধারণ করে তখন কেবল যে তার দানাগুলির নতুন প্রকারের বিন্যাস ঘটে এমন নয়, সেস্থলেও এক প্রচণ্ড শক্তিকে আমরা আবির্ভূত ও কার্যকরী হইতে দেখি। এই শক্তির বলেই বাষ্পচালিত যন্ত্রগুলি চলিতেছে। Molecule ছাড়িয়া আরও সূক্ষ্ম পর্যায়ে যাইলে বস্তুর রূপান্তরটিও যেরূপ অভাবনীয় ভাবে ঘটে, শক্তির উদ্রেক এবং তার বিপুলতাও সেইরকম অভাবনীয় রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে Atomic

Energy-র কথা চিন্তা কর। এখন এই সকল বাহিরের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জপাদি সাধনের ঋত এবং মিত্রচ্ছন্দের দ্বারা আমাদের এই আয়তনটির যখন রূপান্তর সাধিত হয়, তখন কেবলমাত্র যে ইহার আকৃতি-প্রকৃতি বদলাইয়া যায় এমন নয়, তার ফলে অতর্কিত এক মহাশক্তির উৎস আমাদের পরিচয়ে এবং ব্যবহারের দ্বারে আপনাকে উন্মুক্ত করিয়া ধরে। এইটি হইল ঊর্দ্ধতন লোকের অতর্কিত সহায়তা (Unforeseen aid and assistance from Above)। এর প্রসাদে আমার আয়তনটির পরিবর্তন এত দ্রুত এবং বিপুল ভাবেতে সংঘটিত হয় যে আমি নিজেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই। মনে ভাবি—আমার কীই বা ছিল আর হে স্বামিন্! তোমার কৃপায় ও প্রসাদে সেটা এমনতরই হইয়া গেল। এই রূপান্তরটিকে লক্ষ্য করিয়া সাধকেরা সাধনদেহ, দিব্যদেহ, সিদ্ধদেহ, অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ এই সকল রাহস্যিক নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে এই প্রাকৃতমায়িক ভৌমদেহ ভজনের প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া প্রথমতঃ প্রাকৃতের যেটি প্রান্তসীমা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে আসিয়া সে বিরজা স্নানটি সমাপন করিয়া লয়। তখন সে হয় শুদ্ধ অপ্রাকৃত চিন্ময় লোকের অধিবাসী হবার যোগ্য। বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে বিরজার পারে ঊর্দ্ধতন এই অমায়িক ধামগুলিকে বৈকুণ্ঠ গোলোক এবং ব্রজ এইসব আখ্যা দেওয়া হয়। এসবেরই নিজ নিজ উপযোগী আয়তন অবশ্যই রহিয়াছে। অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের যেটি আয়তন সেটিকে গোলোকে যাইতে হইলে আপনাকে তদনুরূপভাবে রূপান্তরিত করিয়া লইতে হয়। ব্রজের আয়তনটিকে সকল রসের পরাকাষ্ঠা যেটি সেটির আস্বাদনের ভূমি মনে করা হয়। সুতরাং এই দৃষ্টিতে আয়তনের যেটি ছন্দ সেটিকে পঞ্চধা ধারণা করিতে পারি—ভৌমচ্ছন্দঃ, বিরজাচ্ছন্দঃ, বৈকুণ্ঠচ্ছন্দঃ, গোলকচ্ছন্দঃ এবং ব্রজচ্ছন্দঃ। এ সকলের আবার অবান্তর ভেদও আছে।

এই আয়তনবত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মাতঙ্গ রহস্যটিও বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। কেননা মাতঙ্গ হইল আয়তনেরই ক্রম বিবর্তনশীল রূপ।

কৃষ্ণং মূঢ়ং মতঙ্গাং মনতি বহুবলং পাতিতং ভিন্নতুণ্ডং
সিংহেনান্যঞ্চ ঘোরং মদচলিতমিভ ধ্বাঙ্কুশাচ্ছোণশুণ্ডম্।

পীযূষস্নাপনার্থং সিতকরিযুগলং হেমকুম্ভৈর্বিভ্রন্
মন্দাকিন্যাং মদারং গজবদনগজং দিগ্‌গজং বা গজেন্দ্রম॥ ৭৩॥
জাত্যং মন্ত্রাক্ষরাণাং সপদি পরিহরেদাদ্যমাতঙ্গামুণ্ডং
হিঙ্কারাদ্ ব্যাজবিঘ্নাবপিচ বিজয়াতাং ছন্দসাং বাগ্‌ভবেন।
সোমস্নানে দধীত প্রণবকরিযুগোত্তলিতং রুক্মরেত
উগ্রং ব্যগ্রং চ দুর্গং হরতি পরতরং শ্রীগণেশেভতুণ্ডম্॥ ৭৪॥

বেদাগমাদি আম্নায় এক কৃষ্ণবর্ণ মহাবল মূঢ় মাতঙ্গের কথা বলিয়াছেন, যেটিকে মাতঙ্গী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবীর ধ্যানে ছিন্নমুণ্ড হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখি (পাতিতং ছিন্নমুণ্ডং)। সিংহবীর্যদ্বারাই সেটি নিপাতিত ও বিমথিত হইয়াছে। আবার কেবল মূঢ় রূপে নয় (not only as static massive Brute Force), পরন্তু সেটিকে আবার ঘোর (রাজস্) রূপেও দেখিতে পাই; সেরূপে সেটি মদমত্ত হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে (মদচলিতমিভং)। এই ঘোররূপ মাতঙ্গের শাসনটি হয় অঙ্কুশ দ্বারা, যার ফলে ইহার শুণ্ড শোণিত বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে (অঙ্কুশাচ্ছোণশুণ্ডম্)। এর শাসনের উপায় যে অঙ্কুশ, সেটিকে আমরা দেবীর হস্তে আয়ুধরূপে অবশ্য দেখিতে পাই। কিন্তু সেটি আসলে যে কি তা ভাবিয়া দেখিও। আবার অন্যত্র দেখিতে পাই (যেমন মহাবিদ্যা কমলার ধ্যানে) যে দেবী এক প্রস্ফুটিত শতদলের উপরে মহামহিমময়ী হইয়া সমাসীনা রহিয়াছেন, আর দুইদিকে দুই শ্বেতহস্তী সুধা সিন্ধুতে হেমকুম্ভ ভরিয়া দেবীর পীযূষস্নানটি করাইয়া দিতেছে। এই শ্বেতকরিযুগলই বা কি আর এই পীযূষস্নানের রহস্যই বা কি? পুনশ্চ, যে সুরহস্তী ঐরাবত দেবী ইন্দ্রাণীর বাহন, সেই ঐরাবত একদা মদোদ্ধত হইয়া মন্দাকিনীর পাবন ধারাটিকে রোধ করিব এই স্পর্দ্ধা করিয়াছিল, কিন্তু তার সে স্পর্দ্ধা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল (মন্দাকিন্যাং মদারং)।

তারপর মাতঙ্গাকে আরও অন্য তিনরূপে আমরা দেখিয়াছি—একটি হইল তার দিগ্‌গজরূপ, অপরটি হইল তার সেই প্রসিদ্ধ গজেন্দ্রোপাখ্যানের আর্তিবিহ্বল রূপ, আর শেষেরটি হইল যিনি স্বয়ং গজবদন গণেশ তাঁর তুণ্ডে গজের যে রূপ, সেই রূপ। এ তিনেরই বা তাৎপর্য কি?

পূর্বশ্লোকে যে কৃষ্ণবর্ণ মূঢ় মহাবলী মাতঙ্গের কথা আগেই বলা হইল সেটি অবশ্য

গাঢ় পুঞ্জীভূত তামস শক্তির প্রতীক, কাজেই সেটি মন্ত্রাক্ষরের মধ্যে রহিয়াও মন্ত্রশক্তির পূর্ণ উদ্ধার এবং চৈতন্যের বাধা দান করিতেছে। এই নিমিত্ত মন্ত্রাক্ষরের এক প্রকার জাড্য বা জড়তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সিংহ হইল প্রাণশক্তির সমর্থতম রূপ। বর্ণসমূহের মধ্যে মহাপ্রাণবর যে হকার সেটি বিশেষভাবে এই সিংহবীর্যদ্বারা অনুগৃহীত জানিবে। কাজেই হিঙ্কার, হুঙ্কার, প্রভৃতি হকারমুখ্য মন্ত্রশক্তি দ্বারা আদিম ঐ কৃষ্ণ মাতঙ্গটিকে নিপাতিত ও বিমথিত করিয়া লইতে হইবে। তারপরে মাতঙ্গের যেটি ঘোররূপ সেটি হইল উগ্র রাজস রূপ, এর ফলে সাধনে ব্যাজ ও বিঘ্ন দেখা দিয়া থাকে। এটিকে নিরসনের নিমিত্ত অঙ্কুশের প্রয়োগ আবশ্যক। সে অঙ্কুশটি কি? সেটি হইল বাক্‌ভব, কিনা "ঐঁ" এই বীজমন্ত্র (দেবীর ধ্যানে যে সকল আয়ুধ আমরা দেখিতে পাই, সেগুলির তাৎপর্য মন্ত্রের দিক দিয়াও চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। যেমন ধনুঃ—প্রণব, ইত্যাদি)। "ঐঁ" হইতেছে, মহাসরস্বতীরও বীজ, কাজেই রজোগুণের তিরোভাব ঘটাইয়া সত্ত্বগুণের উদ্রেক ও বিশালতা সাধন করিতে এই বীজের বিশেষ শক্তি। কিন্তু সত্ত্বগুণের উদ্রেক ও বিশালতা ঘটিলেই সেটি নিরুপদ্রব হয় না, শুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি প্রাকৃত নিয়মের এলাকায় থাকিয়া যায়। অর্থাৎ সেটি "মর" রহিয়া যায় "অমর" হইয়া যায় না। এই নিমিত্ত "ঐঁ" প্রভৃতি সকল বীজ মন্ত্রেরই অমৃতস্নানটি হওয়া আবশ্যক। দশমহাবিদ্যার শেষ মহাবিদ্যা শ্রীশ্রীকমলার ধ্যানে এই অমৃতস্নানটি দেখানো হইয়াছে। সেখানে দুইদিকে দুই শ্বেতহস্তী হইল দুটি প্রণব। দুইদিক হইতে দুইটি প্রণব শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সেই হিরণ্যরেতঃ সাধকের বীজ মন্ত্রের উপরে বর্ষণ করিতে থাকে। যার ফলে সেই বীজমন্ত্রের মধ্য হইতে অমৃতশক্তি (নাদ) জাগরিত, উদ্বুদ্ধ হইয়া ওঠে (দুহানা অমৃতস্য ধারাম্)। অমৃতত্ব লাভ করিয়া, অমৃত স্নানে উদ্বুদ্ধ হইয়া বীজ মন্ত্র সকল প্রাকৃত বাধা ও অন্তরায়, মৃত্যু ও তমসার পারে স্বয়ং চলিয়া যায় এবং সাধককেও লইয়া যায়। তখন সত্ত্ব হয় শুদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ। এই শ্লোক দুটিতে মাতঙ্গের প্রসঙ্গে কৃষ্ণ, রক্ত এবং শুভ্র এই তিন বর্ণের প্রসঙ্গও করা হইয়াছে লক্ষ্য করিতে হইবে। এ তিন বর্ণের রহস্য গভীর ভাবে ধ্যানযোগ্য। বর্ণের শুভ্রতা দেখা দিলেই নিরাপদ হওয়া যায় না এটি দেখাইবার নিমিত্ত মাতঙ্গকে আরও তিনরূপে দেখানো হইয়াছে—উগ্র, ব্যগ্র, ও দুর্গ। এ তিনের মধ্যে শ্বেত ঐরাবত উগ্রের রূপ, দিগগজ ব্যগ্রের রূপ এবং গজকচ্ছপ উপাখ্যানের গজেন্দ্র হইল দুর্গের রূপ। শুদ্ধসত্ত্বে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি হইলেই এই তিন প্রকারের রূপ আর উপদ্রব সৃষ্টি করে না। উপদ্রবের সাধারণ নাম যদি

দেওয়া যায় বিঘ্ন, তবে বিঘ্ন বিনাশন শ্রীগণেশ স্বয়ং শুভ্র গজমুণ্ড পরিগ্রহ করতঃ ঐ ত্রিবিধ এবং আনুষঙ্গিক সকল প্রকার বিঘ্নের নিরসনের ভার লইয়াছেন। এবং এ সকলের পরতর যে গুণাতীত ভূমি, যেটিকে গীতা নিস্ত্রৈগুণ্য বলিয়াছেন, সেখানে লইয়া যাইবার ভারটিও শ্রীগণেশ লইয়াছেন। কেননা আমরা দেখিয়াছি যে শ্রীগণেশ হইলেন ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক যে প্রণব তারই পরিপূর্ণতম মূর্তি (একাধারে নাদ-বিন্দু-কলাত্মা এবং নাদ-বিন্দু-কলাতীত)। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও লক্ষ্য করিবে যে আমাদের প্রাকৃত সাধনের ক্ষেত্রে অশুভ কৃষ্ণ রক্তাদি যে যে বর্ণে দেখা দেয় সেটিকে নিবারিত ও বিবর্তিত (transform) করার জন্য ঊর্ধ্বতন ধ্যানের লোক হইতে কি কি প্রকারের বর্ণের প্রভাব অবতরণ করিয়া থাকে। যেমন, প্রাকৃত রজের বর্ণ রক্ত, কিন্তু ভাগবতী-শক্তি সে রক্তকে আত্মসাৎ করিবার জন্য স্বয়ং রক্তবস্ত্র-পরিধানা হইয়া দেখা দিতেছেন। কিন্তু প্রাকৃত রজের যে রক্তবর্ণ আর ধ্যানে আবির্ভূতা দেবীর আসন বসনাদির যে রক্তবর্ণ সে দুটি একপ্রকারের নয়। ধ্যানগোচর কৃষ্ণ-রক্ত-শুভ্রাদি বর্ণের সঙ্গে কোনও তুলনাই হয় না আমাদের সাধারণ অনুভবে যে সব বর্ণ তাদের। যেমন ধ্বনিগত, সেইরূপ বর্ণগত— এই মৌলিক প্রভেদটিও সকল সময় মনে রাখিতে হইবে।

২৯। হানোপাদান-বিরহ-প্রতিযোগিত্বাভাববত্ত্বংতত্ত্বম্॥

ন কিঞ্চিদ্ধীয়তে যত্র ন চোপাদীয়তেঽপিবা।
অনাবৃতি-পরামৃষ্টি সামগ্র্যং তত্ত্বমুচ্যতে॥৭৫॥

প্রত্যয়রূপবৃত্তিত্বে সত্যংমিথ্যেত্য বিকল্পিতম্।
অংশাংশিত্বাদ্যখ্যাতঞ্চ সাক্ষাচ্চাপ্য পরোক্ষকম্॥৭৬॥

ভাতীতি ভানরূপেণ সামগ্রী হি বিরাজতে।
ভানস্য ভাসতাপত্তির্ভাণতাপত্তিরেব চ।
প্রথমা ভেদজন্যা চ দ্বিতীয়া স্যাদ্ বিকল্পজা॥৭৭॥

দেশকালৌ চ ছন্দশ্চ বস্ত্বিতি ভেদকৈঃ পুনঃ।
শিথিলশ্চপলো ভাগো কুটিলো জটিলস্তথা।
দৈশিকঃ কালিকশ্চেমে ছান্দসো বাস্তবঃ ক্রমাৎ॥৭৮॥

কিংবা ভাতি ন ভাতি বিশ্বমখিলং ভাত্যেব ভাসা ভৃশং
কিংবাঽভাত্যবভাসতে খলু পুনর্ভাত্যেব নির্বৃঢ়ভাঃ।
কিংবা প্রত্যবভাসতে ধিয়ি ন বা ভাত্যেব সাক্ষী ধিয়াং
কিংবা পূর্ব্বমিদং পরং বিলসিতং ভাত্যেব ভানুঃ সনাৎ॥৭৯॥

প্রতিভাসঃ পরামর্শাদবভাসোঽবমর্শনাৎ।
আভাসশ্চাপ্যপামর্শাদনুভাসোঽনুবমর্শনাৎ।
ভাসঃ প্রপঞ্চিতশ্চৈবং বিমর্শাৎ প্রত্যবাদিকঃ॥৮০॥

যো বিশিনষ্টি লিঙ্গেন পরামর্শঃ স উচ্যতে।
বিশ্লেষয়তি চ সংশ্লিষ্টং বিশ্লিষ্টং সংযুনক্তি যঃ।
বৌদ্ধব্যাপারমূলত্বাদ্ বিমর্শঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥৮১॥

নিরাকুর্ব্বন্নধিষ্ঠান মপাকুর্ব্বংশ্চ কল্পিতম্।
অনিরূক্তং নিযুঙ্ক্তে যঃ সোঽপামর্শো নিগদ্যতে॥৮২॥

প্রতিমর্শানুমর্শৌ দ্বৌ সঙ্কল্পস্মরণাত্মকৌ।
নিশ্চিনোত্যবপূর্ব্বো যো বিদ্ধেবং মর্শপঞ্চকম্॥৮৩॥

অবিমর্শাদ্ধি নৈষ্কল্যং সাকল্যঞ্চ বিমর্শনাৎ
তয়োর্দ্বন্দ্বে মৃশৎ সর্ব্বমদ্বন্দ্বে মর্শনং কুতঃ॥৮৪॥

সদিতি পরনৈর্দ্বন্দ্ব্যং সামগ্র্যং পরমঞ্চ তৎ।
মূল বিমর্শ ভাবশ্চ বিদ্ধীতি প্রণবঃ পরঃ॥৮৫॥

নাদবিন্দুকলাত্মা স নাদবিন্দুকলাতীতঃ।
তয়োঃ সেতুরর্দ্ধমাত্রা যাঽপ্য সকল নিষ্কলা॥৮৬॥

ওঁ তৎসদিতি জানীয়াদ্ তনুর্মাত্রী হি ব্রহ্মণঃ।
শাক্তী তনুর্মহামায়োপরিষ্টাৎ সূত্র্যতে চ যা॥৮৭॥

অতঃপর তত্ত্বসূত্রের এবং তদন্তর্গত কারিকাগুলি সংক্ষেপে বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। এর প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু পূর্বেই কতক আলোচিত হইয়াছে এবং পরবর্তী গ্রন্থে আরও হইবে।

হান (Subtraction) উপাদান (Addition), এদুয়ের যেটি বিরহ কিনা অভাব, সে অভাবের অপ্রতিযোগী হওয়াকে (অর্থাৎ হান উপাদান এতদুভয়ের রহিত হওয়াকে) তত্ত্ব বলিয়া জানিবে। পরমভাবপদার্থ অলক্ষণ, তাই অভাবরূপে লক্ষিত হইতেছে। তত্ত্ব স্বরূপে অব্যবহার্য কিন্তু প্রত্যয়রূপে ব্যবহারযোগ্য হয়

প্রথম কারিকাটিতে সূত্রে লক্ষিত তত্ত্বপদার্থকে বিশ্লেষণ করতঃ বলা হইতেছে যে সামগ্রী অথবা সমগ্রত্ব হইতে (as Absolute Wholeness) কিছুই বাদ কিংবা যোগ দেওয়ার থাকে না; যেটি নিজে "আবৃতি" (veiling) এবং "পরামৃষ্টি" (stressing) এই দুই হইতে মুক্ত, সেটিকে তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে (Thing in Itself, Absolute Thatness)। আগে যে সামগ্র্য (Wholeness unveiled and unconditioned) এর কথা বলা হইল, সেটি স্বয়ং সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ (Direct Self-revealed) সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্যবহারে প্রত্যয়রূপে (as usable experience) সেটি বৃত্তিমৎ হইতেছে; অর্থাৎ যেটি নিজে "অব্যবহার্য" সেটি প্রত্যয়রূপে আমাদের ব্যবহারে আসিতেছে। এই ভাবে ব্যবহারে আসিবার ফলে যেটি নিজে সত্য মিথ্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত তাতে "এটি সত্য" "ওটি মিথ্যা" এই প্রকার বিকল্পনার সম্ভাবনা ঘটিতেছে; এবং যেটি স্বয়ং অখণ্ড সামগ্রী মাত্র (Seamless Whole of Being-Experience) তাতে "এইটি অংশ এবং এইটি অংশী" এবম্প্রকার নানাবিধ সম্বন্ধের অভিব্যক্তিও ঘটিতেছে। সুতরাং যেটিকে আমরা প্রত্যয়রূপে জানিতেছি, সেটি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ যে তত্ত্ব তাতে অস্মদাদির ব্যবহারানুরোধে নিরূপিত এক রূপ মাত্র।

ভান, ভাস এবং ভাণ এ তিনের লক্ষণ ও সম্বন্ধ

তত্ত্বরূপ যে সামগ্রী "ভাতি বা প্রকাশ" রূপে দেখিলে তাকে বলা যায় "ভান"। আগে "অদ্বৈতাদ্বৈত দশকম্" ইত্যাদি নানাস্থলেই এই ভানবস্তুটি আমাদের কাছে পরিচিত হইয়াছে। এই ভানবস্তুতে তত্ত্বের যে সমগ্রত্ব ও অখণ্ডত্ব লক্ষণ তাতে সেটি

বজায় থাকে। ইহা আমরা পূর্বে দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে যত্ন করিয়াছি এখন এই ভানবস্তু আবার আপনাকে "ভাস" কখনও বা "ভাণ" রূপে দেখাইয়া থাকে। এ দুয়ের মধ্যে প্রথমটি দেখা দেয় যখন দ্বৈতাদ্বৈত বর্জিত (Alogical) ভান সামগ্রীর মধ্যে কোনও প্রকারে "অহম্" "ইদম্" ইত্যাকার ভেদ অথবা দ্বৈত আসিয়া দেখা দিয়া থাকে; অর্থাৎ ভাস হইল ভান এর সেইরূপ যেখানে "অহম্ ইদম্" ইত্যাকার দ্বৈতসম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়াছে এবং সেইভাবে সমগ্র বোধটিকে বিভাগ করিয়া লইয়াছে। আর যেটি "ভাণ" সেটি হইল বিকল্প হইতে জাত। যেখানে বিকল্প সেখানে বস্তু সুস্থির বা নিশ্চিত ভাবে নাই। সুতরাং সেটির সম্বন্ধে সংশয় ও অনিশ্চয়তা (Doubt and Uncertainty) বিদ্যমান রহিয়াছে। "ভাসতাপত্তি"র মূলে যে ভেদ (Differentiation) সেটিকে আমরা অহম্ ও ইদম্ এই একপ্রকারে দেখিলাম বটে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে দেশ, কাল, বস্তু এবং ছন্দঃ এই চারিটিই সচরাচর ভেদক (Categories of Differentiation) হইয়া থাকে। বিকল্প জন্য যে ভাণরূপতা (Doubt, uncertainty, misapprehension, misrepresentation) ঘটিয়া থাকে, সেটিকে চারিপ্রকারের করিয়া দেখিতে হইবে:—শিথিল, চপল, কুটিল এবং জটিল। এ চারিটির মধ্যে যদি বিকল্প (উক্ত uncertainty প্রভৃতি) দেশ সম্বন্ধে (As regards Spatial relations) হয় তবে সেটির নাম দেওয়া যায় "শিথিল" (Incompact, Incoherent)। যদি কাল সম্পর্কে হয় তবে সেটিকে বলা হয় "চপল" (unabiding, Arbitrarily variable); যদি ছন্দঃ সম্পর্কে হয় তবে সেটিকে বলা যায় কুটিল (Unrhythmic, Unharmonic) আর যদি সেটি বস্তু সম্বন্ধে হয় তবে সেটিকে বলা যায় জটিল (Complicated, confused)।

[ভান, ভাস এবং ভাণ এই তিনের প্রসঙ্গ এইখানে সংক্ষেপে করা হইল। কেবল মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ দিক দিয়া নয়, আমাদের অধ্যাত্মসাধনের সঠিক পরিচয়টি পাবার জন্য এই তিনটিকে ভালমতে চিনিয়া রাখা ভাল। ভান হইতেছে সমগ্র অখণ্ড বোধ, যেটি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ কিন্তু যার সম্বন্ধে বুদ্ধির অথবা বাক্যের (Categories or Predicables) পুরাপুরি ভাবে প্রয়োগটি হয় না। It is undivided alogical whole of experience. তথাপি সূত্রে তত্ত্বের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তার সঙ্গে এই ভানের একদিক দিয়া বিলক্ষণতাও আছে। তত্ত্বকে বলা হইয়াছে হানোপাদান

রহিত। কিন্তু আমাদের অনুভূতিতে যেটি ভানরূপে আবির্ভূত হয় সেটিতে এ লক্ষণটি বর্তে না বলিয়াই মনে হয়। অর্থাৎ ভানকে আমরা এক moving continuum রূপেই পাইয়া থাকি। এর অন্তর্গত অনেক কিছু চলিয়া যাইতেছে এবং এতে প্রকট নয় এমন অনেক কিছু আসিয়া এতে সংযুক্ত হইতেছে। অর্থাৎ এটি সম্বন্ধে হান এবং উপাদান নাই একথা বলা চলে না। সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে যেটি ভান সেটির সম্বন্ধে পরাকাষ্ঠা কোথাও আছে ইহাই মনে করিতে হয়। সেই পরাকাষ্ঠা হইল ভানরূপ ব্রহ্ম, যেখানে বোধ স্বতঃসিদ্ধ এবং নিত্যপূর্ণ (Eternally Realised and Perfect)। তারপর 'ভাস' হইল ভানের সেই রূপ যাতে বুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের ব্যবহার (বিমর্শাদি) আরব্ধ হইয়াছে—Logically appreciated Experience. শেষকালে 'ভাণ'— এটিকে পূর্বালোচিত ব্যাজের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। সাধারণ ছল কপট অর্থে একথাটি লইলে চলিবে না। অর্থাৎ ভাণ মানে conscious or unconscious sophistication of fact মাত্র নয়। এটিকে cosmically and basically বুঝিতে হইবে। যেখানেই মূলে দ্বিধা বা সংশয় থাকার দরুণ বোধটি আপনাকে ঋজু যথার্থ এবং নিশ্চিত ভাবে ফুটাইতে পারিতেছে না সেইখানেই ভাণের এলাকা বুঝিতে হইবে। দেশ কালাদির দিক দিয়া এই ভাণকে আমরা চারিপ্রকারে দেখিলাম—শিথিল, চপল ইত্যাদি। কেবলমাত্র ব্যবহারিক বোধেই নয় অধ্যাত্মসাধনের অনুভূতিগুলিতে ভাণকে তাহার এই চারিটি মূর্তিতে খুঁজিয়া দেখিতে হইবে এবং খুঁজিয়া পাইলে বোধের শোধন ও সংস্কারটি করিয়া লইতে হইবে। এখানে এই 'ভাণ' কথাটির সঙ্গে নারায়ণী স্তবে "লজ্জারূপেন সংস্থিতা" এর "লজ্জা" কথাটির তুলনা করা যাইতে পারে। ওখানে লজ্জা বলিতে আমরা সচরাচর যা বুঝি সেটি অবশ্যই নয়। দেবীর "জাতি"রূপের কথা বলিয়া তারপর "লজ্জা"রূপের কথা বলা হইয়াছে এবং তারপর "শ্রদ্ধা" রূপের কথা। এই পারম্পর্যের অবশ্যই এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আছে। প্রাচীন Plato প্রভৃতি দার্শনিকদের মত ইহা যদি মনে করা যায় যে আমাদের লৌকিক অনুভূতিতে প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের এক শুদ্ধভাবরূপ বিদ্যমান আছে (Pure archetypal form) তবে সেটিকে আমরা 'জাতি' এই নাম দিতে পারি। এখন কোন এক জাতির সম্পর্কে তার যেমন স্বজাতীয় কিছু আছে তেমনি আবার তার বিজাতীয় কিছু আছে। বৈজাত্যের দ্বারা বিদ্ধ এবং অভিভূত হইলে শুদ্ধ যে জাতি

(Pure Type) সেটি জাতিসঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়—যাহা সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন—"সঙ্করো নরকায়ৈব"। এখন এই বৈজাত্যের (What is incompatible, incongruent) স্পর্শ এবং বেধ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য প্রতিটি জাতিতে যে স্বাভাবিক ক্ষেমপ্রবণতা (Tendency to self-preservation) তাকে বলে "লজ্জা"। লজ্জাকে এইভাবে ধ্যান করিয়াই প্রাচীনেরা বলিতেন 'লজ্জা হইল নারীর ভূষণ' এবং ভগবতীর যে বিবিধ শক্তিরূপে অভিব্যক্তির কথা বলা হয় হ্রী বা লজ্জা হইল তাহার অন্যতমা। এই হ্রীর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে আদ্যাশক্তির মূল বীজটি পাই হ্রীঁ। এটিকে লজ্জাবীজও বলা হইয়া থাকে।]

মূল ও নিত্য প্রকাশরূপতা কোথায়?

এই অখিল বিশ্ব বোধে উদিত হউক আর না হউক যেটি তৎ ও সৎ বস্তু সেটি আপন জ্যোতিতে (ভাসা) সম্যক্‌রূপে (ভৃশং) প্রকাশমান আছেই (ভাত্যেব); বিশ্ববোধের যেটি অখণ্ড ভূমা আধারপট তাতে কোন ছায়াচিত্র ফুটিয়া উঠুক আর নাই উঠুক সে আধার স্বয়ং আপন নিঃসংশয় মহিমায় জ্যোতিষ্মান্ হইয়া আছেই (ভ্যাত্যেব নির্ব্যূঢ় ভাঃ); অস্মদাদির বুদ্ধিতে এমন কি সমষ্টি মানসেও (হিরণ্যগর্ভ) বিমর্শাদি বশতঃ যে সব প্রত্যয় হইতেছে অথবা হইতে পারে সে সকলের শুদ্ধ নিরঞ্জন সাক্ষীরূপেও সেটি বিরাজমান (ভাত্যেব সাক্ষী ধিয়াং); আবার কালের সম্বন্ধে এই বোধ বিশ্ব অথবা বিশ্ববোধ পূর্বেই প্রপঞ্চিত হউক অথবা পরে হউক শুদ্ধচৈতন্যরূপ সেই ভানু স্বয়ং পূর্বাপর সম্বন্ধাতীত হইয়া এবং এ সকল সম্বন্ধের প্রকাশক হইয়া বিদ্যমান আছে (ভাত্যেব ভানঃ সনাৎ)।।

পঞ্চ প্রকারের মর্শ ও ভাস—তাদের পরস্পর সম্বন্ধ

অতঃপর পরামর্শাদি মর্শ পঞ্চকাদির সঙ্গে প্রতিভাসাদির ভাস পঞ্চকের সম্বন্ধ কারিকায় বলা হইতেছে:—পরামর্শ (limiting and conditioning of what is otherwise unlimited and unconditioned) রূপ ধী বৃত্তি হইতে আমাদের পূর্বালোচিত ভাস যে আকার ধারণ করে, সেটির নাম দেওয়া হইতেছে প্রতিভাস (experience as related to a given frame of reference); সকল সংশয়, বিকল্প নিরসন করিয়া, অর্থাৎ ভাগের

সম্ভাবনাটি নিরস্ত করিয়া বুদ্ধির (Pure Reason) যেটি স্বাভাবিকী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি সেটি যখন উদিত হয় তখন বুদ্ধির সেই রূপটিকে বলে অবমর্শ (অব=অবধারণে); এই অবমর্শের ফলে ভাস (experience) যে আকারটি ধারণ করে তাকে বলা হইল অবভাস। লক্ষ্য কর যে এখানে "অব" এই উপসর্গটি অবধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, অপরাপর অর্থে নয়। তারপর অপামর্শ হইল বুদ্ধির সেই ব্যাপার যার দ্বারা আবৃতি এবং আক্ষেপ (Suppressing and ascribing) এই দুটি ঘটিয়া থাকে এবং তার ফলে আমাদের বোধ যে আকার ধারণ করে তার নাম দেওয়া হইল আভাস (What appears)। তারপর বুদ্ধির অপর এক ব্যাপার হইতেছে জ্ঞাত বা অনুভূত বস্তু সম্বন্ধে অনুধ্যান (Refection) করা, এবং যেটি অতীত সেটিকে আবার নূতন করিয়া জ্ঞানে ও অনুভবে আনার প্রয়াস করা (Recollection)। এই ব্যাপারের ফলে আমাদের বোধ যে আকার ধারণ করে, সেটিকে অনুভাস বলা হইল। আগে বুদ্ধির যে চারি প্রকার ব্যাপার (function) এর কথা বলা হইল সে সকলেরই মূলে হইতেছে বিমর্শ (Discussing analytically or otherwise)। এই বিমর্শের প্রসঙ্গ আমরা আগে করিয়াছি। এই বিমর্শরূপ মৌলিক ব্যাপারের ফলেই যেটি স্বরূপে ভান সেটি আমাদের পরিচয়ে ও ব্যবহারে (In appreciation and usage) ভাসরূপে দেখা দিয়া থাকে। সুতরাং বিমর্শ ব্যতিরেকে ভাসের (experience not indeed as actually given but as understood and appreciated by us) এর সম্ভাবনাটিই ঘটে না। অতএব মূলে এই বিমর্শকে লইয়া যেমনধারা একদিকে বুদ্ধির পরামর্শাদি পঞ্চবিধা দেখিতে পাই সেইরূপ আবার অন্যদিকে তৎ তৎ সম্বন্ধে আমাদের বোধেরও ভাস প্রতিভাসাদি পঞ্চ আকার দেখিতে পাই।

মর্শপঞ্চকের লক্ষণ। বিমর্শ ও প্রণব। পরব্রহ্মের মান্ত্রী ও শাক্তী তনু

যেটি কোন প্রকার লিঙ্গা, হেতু, অথবা সূচক (Index) দ্বারা কোন বস্তু বা বিষয়কে বিশেষিত (qualify) করে, তার নাম পরামর্শ। এই পরামর্শ ব্যতিরেকে কোন জ্ঞান বা বোধ সম্পর্কে কোন প্রকার অনুমানাদি করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সে সম্বন্ধে কেন, কিরূপে, কোথা হইতে ইত্যাকার প্রশ্নগুলির কোন প্রকার সমাধান হয় না। পরামর্শ অনুমর্শাদি যে কোন প্রকারের বৌদ্ধ ব্যাপার (Process of Reasoning)

হউক না কেন তাদের সকলের মূলে বীজ ক্রিয়ারূপে যে ব্যাপারটি রহিয়াছে তার নাম বিমর্শ। যেটি সংশ্লিষ্ট (undifferentiated) সেটির বিশ্লেষণ (differentiation, analysis) হয় যার দ্বারা এবং যেগুলি আবার বিশ্লিষ্ট (differentiated, discrete, manifold) সেগুলি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট (Integrated, unified) হয় যে মৌলিক প্রক্রিয়া (Bsic function) দ্বারা, সেটিকে বলে বিমর্শ। যেটি অধিষ্ঠান (Ground Consciousness-Being), সেটিকে স্বরূপে আবরণ করতঃ (নিরাকুর্ব্বন্) কল্পিত রূপ গুণ সম্বন্ধাদি যেটি আরোপ করে (অপাকুর্ব্বন্), এবং সেই রূপ করিয়া যেটি অনিরুক্ত, অলক্ষণ, অব্যবহার্য তত্ত্বকেও আপন কল্পিত ব্যবহারে আনিয়া লয় (নিযুঙ্ক্তে), সেটিকে অপামর্শ নাম দেওয়া হইতেছে। প্রতিমর্শ অনুমর্শ এবং অবমর্শ এই তিনের লক্ষণ এইবার বলা হইতেছে:—প্রথমটির মূলে হইল সঙ্কল্প; দ্বিতীয়টির মূলে সংস্কার ও স্মরণ; তৃতীয়টির মূলে "ইহা অন্য কিছুই নয়" এই ভাবের নিশ্চয় বা অবধারণ। সুতরাং এই সকলগুলিকে লইয়া পাঁচ প্রকারের "মর্শ" বলা হইল। যেখানে কোন প্রকার বিমর্শের লেশ নাই (অবিমর্শাৎ) সেখানে অবশ্য কলারহিত ভাব (নৈষ্কল্য); বিমর্শ দেখা দিলেই সকল ভাব বা সাকল্য দেখা দিয়া থাকে। আগমশাস্ত্রে নিষ্কল এবং সকল শিবতত্ত্বটি এই বিমর্শের সূত্র দ্বারাই বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ যতক্ষণ বিমর্শের লেশটুকুও নাই ততক্ষণ পরমতত্ত্ব বস্তুকে শিব-শক্তি এই ভাবে দুই করিয়া দেখা ও বলা যায় না; ততক্ষণ শিব-শক্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত সামরস্য। বিমর্শের ফলে যেটি পরম তুষ্ণীম্ ভাব তার মাঝে প্রথমে নিষ্কল ও সকল এই দ্বন্দ্ব (Polarity, কলাশক্তি) দেখা দিয়া থাকে। এই দ্বন্দ্ব বা Polarityকে আধাররূপে পাইয়াই সব কিছু ভাস প্রতিভাস ইত্যাদি রূপে ব্যাপারবান হইতেছে (মৃশৎ সর্ব্বম্); কিন্তু একান্ত দ্বন্দ্বাতীত যে পরমতার ভূমি সেখানে এই মর্শনের অবকাশ কোথায় (অদ্বন্দ্বে মর্শনং কুতঃ)? অতঃপর "ওঁ তৎসৎ" এই ব্রহ্মবাচক যে মন্ত্র সেটি প্রসঙ্গক্রমে আসিতেছে। দ্বন্দ্বাতীত যে পরম ভূমি (পরনৈর্দ্বন্দ্ব্যম্) সেটি হইল সৎ; সেই ভূমির যেটি সামগ্র্য অর্থাৎ অখণ্ডত্ব ও ভূমত্ব সেটি হইল তৎ এবং এই অখণ্ড দ্বন্দ্বাতীত ভূমার অধিষ্ঠানে যে আদিম বিমর্শের আরম্ভ ও বিকাশ সেইটিকে প্রণব বা ওঙ্কার বলিয়া জানিবে। সুতরাং প্রণবকে আশ্রয় করিয়া সেই পরম অধিষ্ঠানে নিখিল বিশ্বের উদয় স্থিতি এবং লয় ঘটিতেছে। দেশ-কালাদি সর্ববিধ নির্বচন-এর মূলেও

এই আদিম বিমর্শরূপী প্রণব। কাজেই এই ওঙ্কারকে পুরতঃ বা অগ্রে রাখিয়াই "তৎসৎ"রূপী যে পরম সত্য এবং তত্ত্ব তাতে যাইতে হইবে। প্রণবকে বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে—যে ইহা নাদ-বিন্দুকলাত্মা (কেননা এই ভাবেই গোড়ায় বিমর্শটি হইয়া থাকে); কিন্তু প্রণব নাদ-বিন্দু কলাত্মা হইয়াও সেই ত্রিতয়ের অতীত। প্রণবের যে এই দুটি ভাব এদের মধ্যে সেতুস্বরূপা হইয়াছে অর্দ্ধমাত্রা, যেটিকে সকলা এবং নিষ্কলা এ দুয়ের কোনটাই পুরাপুরি বলা যায় না (যাহৎপ্য সকল নিষ্কলা)। একদিকে সকল বা কলাবিশিষ্ট যাহা কিছু, অপরদিকে নিষ্কল যেটি এ দুয়ের মাঝে সেতুরূপা হওয়াতে অর্দ্ধমাত্রা অনির্বাচ্যা (অনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ)। এইবার উপসংহারে বলা হইতেছে যে "ওঁ তৎসৎ" এইটিকে ব্রহ্মের মান্ত্রী তনু বলিয়া জানিবে, এবং পরব্রহ্মের যেটি শাক্তীতনু, সেটি মহামায়া। পরের পদের গোড়াকার সূত্রেই এই মহামায়া কথিত হইয়াছেন।

আগেই সূত্রাকারে যে মর্শপঞ্চক ও ভাসপঞ্চকের কথা বলা হইল সেইগুলিকে কেবলমাত্র বৌদ্ধব্যাপারে বিশ্লেষণ (analysis of logical process) মনে করা চলবে না। জপধ্যানাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। যেমন জপে অথবা ধ্যানে কোনপ্রকার জ্যোতি দর্শন হইল বা কোন অশ্রুতপূর্ব শব্দ শ্রবণ হইল। প্রশ্ন ওঠে এটি কি আভাস, mere appearance? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে গেলে পূর্বোক্ত ভাসপঞ্চক এবং তাদের মূলীভূত মর্শপঞ্চকের বিশদ পরিচয়টি লইয়া রাখিতে হয়। আভাস বলিতেছি কাকে? আমার এই যে কারবারী চেতনা, এর আধারে যেসব ছবি হইতেছে, তার সব না হৌক অধিকাংশই তো আভাস মাত্র। এই আভাসের ধাঁধা কাটাইয়া এর পেছনে তৎসৎরূপে যে পরম সত্য বিদ্যমান তার পানেই আমাকে ধাপেধাপে অগ্রসর হইতে হইবে। অর্থাৎ জপ বা ধ্যানের দ্বারা আমার এই সাধারণ চলতি আভাসের প্রতি এমন কোন সমর্থক প্রক্রিয়া চালাইতে হইবে যার ফলে সেটি রূপান্তরিত এবং শোধিত হইয়া চরমে যেটি পূর্ণভান (Perfect Experience) তাতে বিবর্তিত হইতে পারে (Transformed, Sublimated)। এই অত্যাবশ্যকীয় বিবর্তনের পরপর সোপান এবং উপায়গুলি দেখাবার জন্যই পূর্বোক্ত ভাস এবং মর্শ পঞ্চকের প্রসঙ্গ এখানে করা হইল বুঝিতে হইবে। আমরা সচরাচর যে জপধ্যানাদি করি তাতে প্রায়শঃ আমাদের এই আভাস বিশ্বের (Apparent Universe) মাঝেই রহিয়া যাই। যদি বা কখনও একটুখানি আলোক পুলকাদি অনুভূতি মেলে তবে সেটিকে এই

আভাস বিশ্বের মাঝে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারি না, কাজেই সেটাকে একটা প্রক্ষেপ (interpolation) মনে করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রদ্ধাভাব সহকারে কাজটি চলিতে থাকিলে বুঝিতে পারি যে আভাস বিশ্বের এই বিরাট বুদ্বুদটি যেন এইবার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন আমার ক্রিয়ার মধ্য হইতে এক অভিনব শক্তির বাহু যেন উদ্গত এবং প্রসারিত হয়। সেইটাকে প্রত্যক্ প্রবণতা বলা হইয়াছে। এর ফলে যেটি সত্যকার ভাস (Experience as Real) তার "প্রতি" এক প্রিয়োন্মুখতা দেখা দিয়া থাকে। এই সূচনাটিকে "প্রতিভাস" বলা হইয়াছে। এই প্রতিভাসটি দেখা দিলে লক্ষ্য রাখিতে হয় কোন্ পথে কি ভাবে সেটি অগ্রসর হইতেছে। গতির মুখটি তিনদিকে হইতে পারে। প্রথম, সকল সংশয়ের পারে যেন পরম নিশ্চয়ের ভূমি (Realm of Absolute Certainty), সেই দিকে। দ্বিতীয়, অবচেতনায় সংস্কারভূমিতে যেসকল শুভমিত্র সংস্কার সুযোগের প্রতীক্ষায় এতদিন রহিয়াছে, তাদের সাথে সন্ধি-স্থাপনের দিকে। প্রথম স্থলে গতির মুখটি যে উপরের দিকে; দ্বিতীয় স্থলে সেটি গভীরতার দিকে। প্রথমটির ক্রমপরিণতির ফলে মিলে প্রত্যবভাস, অবভাস, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান। দ্বিতীয়টির ক্রমপরিণতির ফলে মিলে শরণ, অনুঃসরণ (অনুভাস) এবং ধ্রুবাস্মৃতি। গীতা এইটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "ব্যহরন্ মা অনুস্মরন্"। প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ জপ আভাসের গণ্ডীমুক্ত হইয়া প্রতিভাসের ক্ষেত্রে না পৌঁছিলে সেটিকে সত্যকার "ব্যহরন্" বলা যায় না; সেইরূপ আবার ধ্যানও এই ক্ষেত্রে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাকে অনুধ্যান বা অনুস্মরণ বলা যায় না। এ দুইটি ছাড়া তৃতীয় আর একপ্রকারের পরিণতিও হইতে পারে কিন্তু সেটি বাঞ্ছনীয় নয় এবং সেটির নিমিত্ত সাধককে সতর্ক রহিতে হয়। সেটিকে বলে "প্রত্যপভাস।" এস্থলে যেটি যথার্থ ভাস (Experiecne as Real) তার সন্নিকট হইতে থাকি না পরন্তু যেটি ভাসের অপলাপ বিভ্রম অবাস্তব কল্পনা ইত্যাদি তারই মধ্যে গিয়া বেমালুম ডুবিয়া যাইতে থাকি। অনেক সাধকের জীবনে স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাসে এই অপপরিণামটি ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিয়া থাকে। সাধনলব্ধ অনুভূতির যাথার্থ্যের বিচার এর পরের সূত্রে কিয়ৎপরিমাণে করা হইয়াছে।]

পূর্বে এক সূত্রে সপ্তব্যাহৃতির শেষ ব্যাহৃতি রূপ যে সত্য সেটির লক্ষণ করা হইয়াছে। অতঃপর "ওঁ তৎসৎ" "সত্যম্‌জ্ঞানমনন্তম্"—অথবা সচ্চিদানন্দের যেটি

'সৎ' ব্রহ্মের এই স্বরূপলক্ষণে যেটি সত্য, সেটি সপ্তব্যাহৃতির অন্তর্গত ঐ সত্য অথবা তাহা হইতে স্বতন্ত্র অন্য কিছু, এইটি প্রদর্শনের নিমিত্ত পরের সূত্র করা হইতেছে:—

৩০। বাধমাত্রবিরহপ্রতিযোগিকত্বাভাববত্ত্বং সত্ত্বমিতি॥

বাধমাত্র রহিত, অর্থাৎ কোন প্রকার বাধ সম্ভাবনা যাহাতে নাই এবংবিধ সত্যকে বলে 'সৎ'। (৫ম সূত্র তুলনীয়)

সত্য কিংবা মিথ্যা এ প্রশ্ন আসে কিরূপে?

সত্য এবং সত্যত্বের মধ্যে এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যাহা কিছু 'অস্তি' বা 'আছে' রূপে প্রতিভাত হইতেছে তাহাকেই আমরা সত্য বলিতে পারি এক অর্থে। সেটি ভ্রম হউক অথবা প্রমা হউক, তবু অস্তি বা আছে এইরূপে সেটির সম্বন্ধে কোন সংশয় আসিতে পারে না। যেমন অন্ধকারে রজ্জুসর্প পরক্ষণেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু রজ্জুর সর্পরূপে যে ভাবটি হইতেছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। এইরূপ যখন আকাশকুসুম অথবা বন্ধ্যাপুত্র মনে কল্পনা করিতেছি তখন কল্পনার বাহিরে তার অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও সেটি কল্পনায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশকুসুম যে কল্পনাতেও নাই এমন কথা তো কেহ বলিবে না। পরস্পর বিরোধী দুটি ভাবকে—যথা বৃত্ত এবং চতুষ্কোণ—কল্পনাতেও একসঙ্গে মিলান সম্ভবপর হয় না বটে, কিন্তু বাক্ সে অসাধ্যসাধনটিও করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। সুতরাং সেটি কল্পনাতে রহিল না বটে কিন্তু বাক্যে রহিল। এই সব উদাহরণে আমরা দেখিতেছি যে কেবলমাত্র অস্তি এইরূপে অনুভূতিমাত্রেই সত্য। কোন অনুভূতি সত্য অথবা মিথ্যা এ প্রশ্ন যখন আমরা উত্থাপন করি তখন সে প্রশ্ন অনুভূতিটি আছে কি নাই এ সম্পর্কে নয়; কেন না, অনুভূতিটি যে আছে সে সম্বন্ধে কোন সংশয় বা প্রশ্নের অবকাশ নাই। রজ্জুসর্প দেখিলাম বলিয়াই প্রশ্ন করি—যাহা দেখিলাম তাহা কি সত্য? যদি কিছুই না দেখিতাম, অর্থাৎ কোন অনুভূতিই না হইত, তবে এ প্রশ্ন করার অবকাশও আসিত না। অনুভূতিকে অন্যের অপেক্ষারহিত করিয়া কেবলমাত্র অনুভূতিরূপে গ্রহণ করিলে সেটি অস্তি, আছে, সুতরাং সত্য। কিন্তু যখনই কোন অনুভূতিস্থলে অপর কিছুর অপেক্ষা করিতে যাই তখনই সে অনুভূতি সম্বন্ধে

সত্য মিথ্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন সম্ভাবিত হইতে পারে। যথা উক্ত রজ্জুসর্প স্থলে আমার নিজের দেহের অনুভূতি প্রভৃতি অথবা হস্তস্থিত দণ্ডের অনুভূতির সঙ্গে পুরোভাগে দৃষ্ট ঐ রজ্জুসর্পের অনুভূতিটি যখন তুলনা করিতে যাই তখনই সেটি যে মিথ্যা বা প্রাতিভাসিক ইহা স্বীকার করিতে হয়। আমার নিজের দেহ বা হাতের যষ্টি যেভাবে রহিয়াছে পুরোভাগে রজ্জুসর্পটি সেভাবে নাই।

অসাধারণ অনুভূতির দৃষ্টান্ত

গাঢ়ভাবে জপ অথবা ধ্যান করিতে করিতে ভিতরে বিশেষ কোন এক প্রকার অনুভূতি হইল। কোন জ্যোতি বা মূর্তি দর্শন হইল, কোন ধ্বনি শ্রবণগোচর হইল অথবা কোন গন্ধ বা স্পর্শ অনুভূত হইল। অনুভূতি যে হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই। সেটি অস্তি সুতরাং সত্য। কিন্তু অনুভূতি হওয়ামাত্রেই অথবা পরে মন স্বতঃই এই প্রশ্ন করিতে চায়—যাহা দেখিলাম বা শুনিলাম সেটি কি সত্য অথবা স্বপ্নবৎ অলীক অথবা নিছক কল্পনামাত্র? বলাবাহুল্য এবংবিধ প্রশ্ন তুলিতে গেলেই মনকে সত্য মিথ্যার একটা লক্ষণ বা মাপকাঠি ভাবিয়া লইতে হয়। যথা—আমি চোখ খুলিয়া সামনে প্রদীপের আলো যেমন দেখিলাম চোখ বুজিয়া যে আলো দেখিলাম ভাবিতেছি সে আলোক কি ঐরূপ বাস্তব একটা কিছু? এ প্রশ্ন তুলিতে গেলেই বাস্তবের একটা লক্ষণ আমাকে চিন্তা করিয়া লইতে হয়। চর্মচক্ষু দ্বারা যেটি দেখিব একমাত্র সেটিই বাস্তব, বাস্তবের এই লক্ষণ করিলে চোখ বুজিয়া যেটি আমি দেখিলাম সেটিকে অবাস্তব বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। যদি বলি আমার মত আর দশজনে যাহা দেখিতে পাইতেছে কেবল সেইটিকেই বাস্তব বলিব, তাহা হইলেও আমার ঐ নিজের আন্তর অনুভূতিটিকে অবাস্তবই বলিতে হয়। কেননা, উহা কেবল আমিই দেখিতেছি, অপর কেহ আমার নিকটে উপস্থিত থাকিলেও দেখিতেছে না। তবে কি সত্যই এটি অবাস্তব? বাস্তব ও অবাস্তবের এই কারবারী হিসাবটি খুবই মোটামুটি হিসাব। সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ হিসাব আমাদের ছাড়িয়া দিতে হয়। যেমন বিজ্ঞানাগারে অনেক গবেষণায়। বিজ্ঞানাগারে কোন নূতন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া আমি যাহা যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহা হয়তো অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র সাহায্যেই দেখিতে পাইলাম, মাত্র চর্মচক্ষে নয়। আবার যৎকালে সেটি দেখিতে পাইলাম তৎকালে

একমাত্র আমিই দেখিলাম, অপরে নহে; কিন্তু মাত্র এ কারণে সেটিকে অবাস্তব বা মিথ্যা বলিতে হইবে কি? ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে আমি বিজ্ঞানাগারে যে উপায়ে যে ভাবে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি অপরেও সেই উপায়ে সেই ভাবে উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অবস্থাপুঞ্জ একই প্রকার হইলে ফলটিও একই প্রকার হইবে, এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়াই যে কোন পরীক্ষার সত্যতা অথবা অসত্যতা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। জপাদি সাধনে যে অনুভূতিগুলি আসিয়া থাকে সেগুলিও এই জাতীয়। সে ক্ষেত্রে অণুবীক্ষণাদি দ্বারা আমাদের সাধারণ দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করিতে হয় না বটে কিন্তু তাহা প্রসারিত করিবার অন্য উপায় সুষ্ঠুভাবে আশ্রয় করিতে হয়। বিজ্ঞানের যন্ত্র প্রসাদে যেরূপ ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট পদার্থ সমূহের দর্শন সম্ভবপর হইয়াছে, যোগের সংযমাদি প্রয়োগেও (অর্থাৎ ধ্যান ধারণা সমাধি দ্বারা) সেরূপ দর্শন সম্ভাবিত হইতে পারে। তাহা যদি হয় তবে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা ও প্রসারের নিমিত্ত বাহিরের যন্ত্রের অপেক্ষা সেক্ষেত্রে না থাকিতে পারে।

সর্ববিধ পরীক্ষায় ত্রিবিধ দোষ সম্ভাবনা ও ত্রিবিধ পরিহার

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে ভ্রমপ্রমাদের অপেক্ষা অল্পবিস্তর থাকে এবং তার হেতুগুলিকে যত্নপূর্বক পরিহার করিতে হয়। দোষগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, যে যন্ত্র এবং উপায় দ্বারা পরীক্ষাটি হইতেছে তারা সদোষ হইতে পারে। এই নিমিত্ত যন্ত্র শুদ্ধি এবং উপায় শুদ্ধি আবশ্যক। দ্বিতীয়, যে অবস্থাপুঞ্জের মধ্যে পরীক্ষাটি হইতেছে সেগুলি হয়তো সুনিরূপিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই; অর্থাৎ অবস্থাপুঞ্জ ঠিক এইরূপ অন্যরূপ নয় এ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারা যায় নাই, অথবা অবাঞ্ছিত কোন অবস্থা যদি বিদ্যমান থাকে সেটিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন উপায়ও দেখা যায় নাই। তৃতীয় যিনি পরীক্ষক, তাঁর নিজের সংস্কারগত অথবা অনবধানাদি নিমিত্ত দোষ। এই ত্রিবিধ দোষের সম্ভাবনা অল্পবিস্তর থাকে বলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কোন দৃষ্টফলকে সরাসরি গ্রহণ করা চলে না। পরীক্ষায় যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়াও পরীক্ষককে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের অপেক্ষা রাখিয়া চলিতে হয়। প্রথম যে বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিতেছি সে সম্বন্ধে যে প্রামাণিক শাস্ত্র রহিয়াছে তার সমর্থন মিলিল কিনা। দ্বিতীয়, সেই বিষয়ে অথবা তদনুরূপ বিষয়ে

পূর্বাচার্যেরা পরীক্ষায় যে ফল পাইয়াছেন, আমার লব্ধ ফলের সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে কিনা। তৃতীয়, যদি অসঙ্গতি থাকে তবে সে অসঙ্গতির যথেষ্ট এবং সঙ্গত হেতু বর্তমান ক্ষেত্রে বিদ্যমান আছে কিনা। আধ্যাত্মিক সাধনে আমরা যে অসাধারণ অনুভূতিগুলি লাভ করি, সেগুলি সম্বন্ধে ভ্রমপ্রমাদের আশঙ্কা আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মত পূর্বোক্ত ত্রিবিধ কারণে তাতে দোষের সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে পরীক্ষকের বাহিরে যে হেতুগুলি রহিয়াছে (objective conditions) সেইগুলিরই প্রাধান্য; পরীক্ষকের নিজের আন্তর ত্রুটি বশতঃ পরীক্ষায় ভ্রমপ্রমাদাদি সম্ভাবিত হইলেও সেগুলি পূর্বোক্ত হেতুগুলির তুলনায় গৌণ; কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনের বেলায় বাহ্যযন্ত্রের (Apparatus-এর) প্রয়োগ থাকে না, সাধকের আপন শারীর এবং মানস অবস্থার উপরেই পরীক্ষার ফলাফল প্রধানতঃ নির্ভর করে। দেশ-কালাদি পারিপার্শ্বিক হেতুগুলির যে একান্তভাবে অপেক্ষা নাই এমন নয়, কিন্তু প্রধানতঃ সাধকের প্রাণময় মনোময় এবং বিজ্ঞানময় এই ত্রিবিধ কোষের উপযুক্ততার উপরেই সাধনের সফলতা বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং সাধককে তাঁর প্রাণময় কোষটিকে সর্বাগ্রে সাধনের অনুকূল অবস্থায় আনিতে হয়। এই নিমিত্ত আহারাদি শুদ্ধির এবং আসন প্রাণায়ামাদির অভ্যাসের প্রয়োজন হইতে পারে। দেহে প্রাণের প্রবাহগুলি অনাবিল ও শান্ত হইলে সাধনের প্রথম ভূমিকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। যম, নিয়ম, আসন এবং প্রাণায়াম এই চারিটি যোগাঙ্গ এবংবিধ অনাবিল ও শান্ত প্রাণ-প্রবাহ প্রবর্তনের সহায়ক। তৎপরে সাধকের মনোময় কোষ শোধিত হওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য মনের বা চিত্তের মল হইতেছে রজঃ এবং তমঃ।

চিত্তের মল কিরূপে অপগত হয়? সাধনায় কল্পনার ক্রমিক শোধন ও বোধন

দীর্ঘকাল নিরন্তর সৎকারপূর্বক সম্যক্‌ভাবে সাধন ভজন চলিতে থাকিলে চিত্তের এই দুইটি মল অপগত হইয়া যায় এবং চিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণোপেত হইয়া থাকে। ইহার ফলে চিত্ত সাতিশয় প্রকাশশীল হয়। এবংবিধ চিত্ত যে বিষয়টি যেভাবে গ্রহণ করে, সে বিষয়টি সেইভাবে সত্যসত্যই বিদ্যমান। সুতরাং এবংবিধ চিত্তের লব্ধ

যেটি জ্ঞান তাহাই যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা। মূঢ়, ক্ষিপ্ত অথবা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় চিত্তের জ্ঞান হইয়া থাকে সে সকল জ্ঞান শুদ্ধ ও যথার্থ জ্ঞানরূপে গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু এই মনোময় কোষেই শেষ হইলে চলিবে না। বিজ্ঞানময় কোষকেও তন্নিম্ন কোষগুলির সংস্কারপাশ হইতে মুক্ত করিয়া আপন শুদ্ধ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্ন করিতে হয়। সাধারণতঃ জীবের বিজ্ঞানময় কোষ অন্নময়াদি নিম্ন কোষগুলির বিচিত্র ভোগপ্রবণ যে সংস্কার, তাহার দ্বারাই বদ্ধ হইয়া থাকে। বুদ্ধি স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণাত্মক হইলেও সে সত্ত্বগুণ নীচেকার কামনা বাসনাদি (Subconscious-এর negative momenta) দ্বারা সমাবৃত হইয়া বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া থাকে। এই রাহুগ্রাস হইতে বুদ্ধিকে মুক্ত করিতে না পারিলে বুদ্ধি কেবলমাত্র আমাদের বন্ধন সংস্কারেরই পোষকতা করিয়া যায়, মোক্ষ বা মুক্তি·সংস্কারের কোন উপায় করিয়া দিতে অপারগ হয়। আমাদের সাধারণ জ্ঞানের যেটি দৈন্য ও কার্পণ্য সেটিও মুখ্যতঃ এই বুদ্ধিদোষেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধিকে নির্দোষ না করা পর্যন্ত আমাদের কোন জ্ঞান বা অনুভূতি যথার্থ বিজ্ঞানরূপে অভিহিত হইতে পারে না। সচরাচর আমরা নিজেদের রাগদ্বেষের সংস্কার চালিত হইয়াই যুক্তি বিচারের সূত্র অনুসরণ করি। কাজেই সেই সূত্র আমাদের বিজ্ঞানের সন্ধান দেয় না। আলোকের সন্ধান দিবার ভরসা দিয়া সেটি আমাদিগকে আলেয়ার পিছনেই ধাবমান করে। অতএব সাধকের পক্ষে তার শারীর এবং মানস যন্ত্রের অনুকূলতা লাভই হইল মোক্ষসাধন। যন্ত্রটি যে পরিমাণে অনুকূল ও উপকারক হইবে, সেই পরিমাণে যন্ত্রলব্ধ ফল, অর্থাৎ অনুভূতি সত্য হইবে। বলা বাহুল্য ইহাতে একটা ক্রমের অপেক্ষা রহিয়াছে। ক্রমের অপেক্ষা আছে বলিয়া সাধনের যেটি সফলতা সেটিও ক্রমের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে। অর্থাৎ, সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম প্রথম যে অনুভূতিগুলি আমরা পাইয়া থাকি সেইগুলিকে পূর্ণ এবং একান্তভাবে সত্য মনে করা যায় না। প্রাণময়াদি উক্ত ত্রিবিধ আভ্যন্তরীণ যন্ত্র এই সবেমাত্র অনুকূল হবার দিকে একটা প্রবণতা লাভ করিতেছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনুকূল এখনও হয় নাই। বিরোধী সংস্কার নিমিত্ত বাধা এখনও প্রচুরভাবে বিদ্যমান। পাতালাদি "নিম্ন" তল বৃত্তি স্বরাদি 'ঊর্ধ্ব' তলবৃত্তির সঙ্গে এখনও congruent হয় নাই। সুতরাং এবংবিধ যন্ত্র-সাহায্যে যে ফলটি পাইলাম সেটিকে আবশ্যকমত

শোধনাদি করার অপেক্ষা থাকে। লব্ধ অনুভূতিটির সঙ্গে অনেক মিথ্যা কল্পনাদিও বেমালুম জড়ীভূত হইয়া থাকে। অনেক সময় কতটা কল্পনা আর কতটা বাস্তব তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। হয়তো কল্পনাকেই অজ্ঞাতসারে সত্য অনুভূতিরূপে নিজের কাছে চালাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারি না। আমরা পরে দেখিব যে সাধারণতঃ যাকে আমরা কল্পনামাত্র বলি আর ব্রহ্মকল্পনা যদ্দারা "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" ক্রমে এই নিখিল সৃষ্টি রচিত হইয়াছে—এ দুইএর মধ্যে অনেকগুলি ক্রমোন্নত স্তর বা ধাপ আছে। সে ধাপগুলি পরপর অতিক্রম করিয়া যে পর্যন্ত আমাদের অনুভূতি ব্রহ্মকল্পনায় উপনীত না হয়, সে পর্যন্ত বিশ্বের সত্যতা সম্বন্ধে পূর্ণ এবং অভ্রান্ত জ্ঞান সম্ভাবিত হইতে পারে না। সেই পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞানের নাম বেদ। বলা বাহুল্য এ বেদ নিত্য অপৌরুষেয়। ঋষিদের দর্শনে এটি প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধনা লব্ধ সকল অনুভূতিরই চরম লক্ষ্য হইল এই পূর্ণ অভ্রান্ত জ্ঞান। কিন্তু লক্ষ্য যখন দূরে তখন সাধককে অবশ্যই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, যেমন জপের সাধনে প্রথমে বৈখরীজপ লইয়াই আরম্ভ। তখন মধ্যমা, পশ্যন্তী বা পরার কোন সন্ধানই নাই। তখন, কয়টি মাত্র শব্দের আবৃত্তি করিয়াই হয়তো জপ চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা বা ভাবনা করিবার যে বস্তুটি গুরু নির্দেশ করিয়া দেন, মলিন ও চঞ্চল মন সেটিকে কল্পনা বা ধারণা করার একটা প্রয়াস করিয়া যায় মাত্র। কিন্তু ঠিকভাবে জপটি চলিতে থাকিলে বৈখরীজপ যেমন ধারা মধ্যমার সেতুতে গিয়া উপনীত হয় এবং সেতুপারে পশ্যন্তী লোকের স্পর্শ লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে জপঃশক্তির অসাধারণ পরিচয়ও কিছু কিছু পাইতে আরম্ভ করে। মনের কল্পনাও সেইরূপ ক্রমশঃ স্থির এবং স্বচ্ছ হইয়া দৃঢ় ভাবনায় নিজেকে ঘনীভূত করিয়া লয়। তখন জপকালে সাধকের বাহ্যসংজ্ঞা অল্পাধিক তিরোহিত হইয়া যায় এবং সাধক তখন ধ্যানলোকে যাইয়া প্রবিষ্ট হন। এই সময় যেটিকে ধ্যানরস বলে সেটির আস্বাদ সাধকের মিলিতে আরম্ভ করে। পূর্বের ভূমিতে নানা বিরোধী অরিচ্ছন্দের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে সাধকের যে অভ্যুদয়টি হইতেছিল, সেটিকে আমরা কৃচ্ছ্রোদয় নাম দিয়াছি। কিন্তু ধ্যানরসের আস্বাদ পাইতে থাকিলে এই কৃচ্ছ্রোদয় পর্বটির অবসান হইয়া যায়।

জপের বিভিন্ন ভূমিতে বিভিন্ন খ্যাতি ও ছন্দঃ—
শ্বাসে শ্বাসে জপ

আমরা পূর্বেই সপ্তব্যাহৃতির আলোচনায় দেখিয়াছি যে উক্ত সপ্তব্যাহৃতি বিশ্বজনীন সত্য; কাজেই বিশ্ব-অনুভূতির দিক দিয়া এগুলিকে সপ্তখ্যাতি বলিতে পারা যায়। সুতরাং জপাদি সাধনেরও এই সপ্তখ্যাতি রহিয়াছে এবং প্রত্যেক খ্যাতিস্থলে একটি নির্দিষ্ট ছন্দও রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে "সপ্ত সপ্ত" বা ৭ × ৭ এই আকৃতিটি আমরা বিবেচনা করিব। বৈখরীজপে যে বিশেষ খ্যাতিটি এবং ছন্দটি বিদ্যমান থাকে, মধ্যমা অথবা তদুর্দ্ধ কোন গ্রামে জপ পৌঁছিলে জপের সে খ্যাতি এবং ছন্দটি পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই খ্যাতি এবং ছন্দের পরিবর্তনের ফলে জপের রূপ এবং ফলটিও বদলাইয়া যায়। অর্থাৎ নিম্নভূমিতে জপ যে আকারে বা প্রকারে চলিতেছিল উচ্চতর ভূমিতে জপের সে আকার প্রকার সেরূপ থাকে না। নিম্নভূমিতে সংখ্যা রাখিয়া আয়াস সহকারে জপাক্ষরগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতে হয় কিন্তু উচ্চতর ভূমিতে যত্নপূর্বক কোন সংখ্যা রাখিয়া জপাক্ষর আবৃত্তি করার প্রয়োজন চলিয়া যায়। তখন আমার চেষ্টায় জপ না চলিয়া জপের প্রসাদে আমি চলিতে থাকি। জপ তখন আমার প্রাণ-প্রবাহটিকে আপন ছন্দে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লয়। তখন এই দেহযন্ত্রের তাগিদে অথবা আমার জপক্রিয়ার গরজে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে না, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস, স্বচ্ছন্দ জপে যেন লয় হইয়া যায়। যেমন ভালো সঙ্গীতের বেলা গীত এবং বাদ্যের লয় হইয়া যায়। জপের ছন্দ এবং শ্বাসের ছন্দের এবংবিধ সমীকরণকে বলে "শ্বাসে শ্বাসে জপ"—যখন জপের প্রসাদে চিত্তের গাঢ় তন্ময়তা আসিয়া থাকে তখন যেমন জপের সংখ্যাবৃত্তি লয় হইয়া যায়, সেইরূপ তখন আমাদের এই স্বাভাবিক অজপাও স্থির হইয়া কুম্ভকে পরিণত হইয়া থাকে।

কল্পনার ও ভাবনার 'তিনটি' স্তর—শেষ, সমাপত্তি

খ্যাতি বা অনুভূতির দিক দিয়া দেখিলে জপের ভাবনাকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি ভূমিকায় দেখিতে পারি। প্রথম, কল্পনার ভূমিকা। এটির আবার তিনটি স্তরঃ—মলিন স্তব্ধ কল্পনা, চপল ব্যস্ত কল্পনা এবং দৃঢ় সমস্ত বা সমগ্র কল্পনা।

প্রথমটিতে যেটি কল্পনা করিতে চাহিতেছি সেটি অস্পষ্ট আড়ষ্টভাবে করিতে পারিতেছি মাত্র। দ্বিতীয় স্থলে কল্পনা চঞ্চল হইয়া ধ্যেয় বস্তুর এখানে একটু ওখানে একটু অথবা একবার এই নাম অন্যবার আর এক নাম এইভাবে ছুটাছুটি করিতে থাকে মাত্র। মধুকর যেমনধারা পুষ্পের চারিধারে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়, তেমনি ধারা। কখনও বা সে পুষ্প ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যান্তরেও ধাবিত হয়। পূর্বে যে বৈলক্ষ্যাদি দোষের কথা আলোচনা করিয়াছি, সেই দোষগুলি এই অবস্থায় বিশেষভাবে আমাদের পাইয়া বসে। তাহার পর কল্পনা দৃঢ় এবং শান্ত হইলে সে ধ্যেয় বস্তুটিকে সমগ্রভাবে কল্পনা করিতে সমর্থ হয় বটে তথাপি সে এখন পর্যন্ত কল্পনাই। এই নিমিত্ত এই কল্পনার ভূমি কাটাইয়া সাধককে ইহার উপরের ভূমিকায় আরূঢ় হইতে হয়। সে ভূমিকার নাম ভাবনা। ভাব গাঢ় না হইলে এই ভাবনাটি হয় না। ভাবনা হইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে সাধকের বস্তুতে রসবোধ হইতেছে। মধুকর এখন আর গুন্ গুন্ করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় না। সে ফুলের মধু গন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতেই সে বসিতে চায়। এই ভাবনা ভূমিকারও তিনটি স্তরঃ—প্রথম অযুক্ত ভাবনা, দ্বিতীয় যুঞ্জান ভাবনা, তৃতীয় যুক্ত ভাবনা। এর শেষের দুইটিকে মোটামুটি আমরা ধারণা এবং ধ্যান বলিতে পারি বটে কিন্তু যুঞ্জান এবং যুক্ত বলাই সুবিধাজনক। যুক্ত ভাবনার পরেও আর একটি ভূমি আছে—সেটিকে আমরা ভাবন-ভাবনা অথবা সমাপত্তি বলিতে পারি। এই সপ্তম স্তরে পৌঁছিলে ধ্যেয় সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষানুভূতি হইতে পারে। যথা 'ক্রীং' এই কালীবীজ জপ করিতে করিতে যখন এই সপ্তমভূমিতে খ্যাতি বা অনুভূতি আসিয়া উপনীত হয়—তখনই মা আমার শুধু আর মন্ত্রাক্ষররূপিণী, কল্পনারূপিণী অথবা ধ্যানরূপিণী হইয়া রহেন না, তিনি সাক্ষাৎ প্রাদুর্ভূত হন। বালক ধ্রুব নারদের নিকট দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র পাইয়া জপ করিতে করিতে ধ্যানে বাসুদেবের প্রথম দর্শন পাইলেন বটে কিন্তু সেরূপ পাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বাসুদেব ধ্রুবকে সাক্ষাৎ দেখা দিলেন, তাঁকে স্পর্শ করিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা কহিলেন। এই সাক্ষাৎকালে আন্তর অনুভূতি (Subjective Experience) এবং বাহ্য অনুভূতি (Objective Experience) এই দুইএর ব্যবধান ও দ্বন্দ্ব তিরোহিত হইয়া গেল।

সাধকের আন্তর অনুভূতির স্থলে নিজেকে কি কি প্রশ্ন করিয়া তার সদুত্তর পাইতে হইবে? সত্য অনুভূতির পাঁচটি লক্ষণ

যতক্ষণ বাহ্য এবং আন্তর অনুভূতির এই ব্যবধানটি দূর না হইতেছে ততক্ষণ সাধককে আপন লব্ধ অনুভূতিটি পরখ করিয়া লইতে হয়। মোটামুটি তিনটি সূত্র ধরিয়া এই পরখের কাজটি করিতে হয়। প্রথম আমার ভিতরে যে অবস্থাটি হইল, সে সম্বন্ধে শাস্ত্র কি বলেন? দ্বিতীয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব পূর্ব সন্ত মহাজনেরা কি সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন? তৃতীয়, এ সম্বন্ধে আমার আপন গুরুর কি অভিমত? এই পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গো অধ্যাত্ম জীবনের যেটি পরীক্ষা, সেটির মিল রহিয়াছে। কিন্তু সাধনের বেলায় এই তিনটি সূত্র ছাড়াও আপন লব্ধ অনুভূতির আকার প্রকার সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ ও সাবধান হইতে হয়। যেমনধারা স্বপ্নের বেলা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্তমান দেখিলে সে স্বপ্নকে আর অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না, সেইরূপ সাধনলব্ধ আন্তর অনুভূতি বা অবস্থা যদি বিশেষ কতকগুলি লক্ষণাক্রান্ত হয় তবে সেটিকে কল্পনা বলিয়া মনে করা চলে না। অভীষ্ট লক্ষণগুলিকে মোটামুটি পাঁচ (৫) ভাবে ধরিতে পারা যায়। প্রথম, অনুভূতির সুস্পষ্টতা এবং ঔজ্জ্বল্য। দ্বিতীয়, অনুভূতির স্থিরতা বা স্থায়িত্ব। তৃতীয়, অনুভূতির সুষমতা ও সঙ্গতি। চতুর্থ, অনুভূতির উত্তরোত্তর উন্মেষ অথবা বিকাশ। পঞ্চম, জীবনের সমগ্র অনুভূতিধারার উপরে সেই অনুভূতিটির প্রভাব এবং শাসন। এই পঞ্চলক্ষণের পরিমাণের সঙ্গো কতখানি বিশ্বাস হইবে না হইবে, তার মাত্রা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। যেটি সত্য অনুভূতি তার সাথে জ্যোতিঃ এবং আনন্দ ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং সাধকের কোন আন্তরঅনুভূতি হইলে পর—তিনি আপনাকে আদৌ এই দুইটি প্রশ্ন করিবেন—প্রথম, এটি কি আমাকে অজানা এবং অবোঝার তমঃ হইতে জ্ঞানের এবং বোধের আলোকে লইয়া গেল? যেখানে কিছুই না পাইয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছিলাম সে স্থান কি আলোকে উদ্ভাসিত হইল? দ্বিতীয়, না জানা এবং না পাওয়া যে অস্বস্তি এবং অশান্তি সেটি কি বিদূরিত হইয়া আমার চিত্তকে সুস্থ এবং শান্ত করিয়া দিল? বলা বাহুল্য—বিজ্ঞানাগারের মত সাধনক্ষেত্রেও যে যে অনুভূতি বা অবস্থাগুলি আসিয়া

থাকে, সেগুলির সবই অভীষ্ট বা বাঞ্ছনীয় নহে; তার মধ্যে কোনো কোনোটি হয়তো বা প্রেয়স্কর হইতে পারে কিন্তু শ্রেয়স্কর নয়। কতকগুলি আবার প্রেয়স্করও নয়। এরূপস্থলে বুঝিতে হইবে যে কেবলমাত্র মিত্র ও মধুচ্ছন্দে নিরুপদ্রবে সাধনটি ঘটিতেছে না, অরিচ্ছন্দটিও বিদ্যমান রহিয়াছে। অরিচ্ছন্দ বিদ্যমান থাকিলে অশুভ সংস্কারগুলি বিরোধী ভাবে ক্রিয়াশীল হবার সুযোগ পায়। তার ফলে নানাবিধ অশুভলক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। অশুভ নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত সাধকের পক্ষে মলিন সঙ্কর-ধারা মুক্ত হইয়া শুভ্র শঙ্কর-ধারায় প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর হয় না। বহুদূর পর্যন্ত এই দুইটি ধারা পাশাপাশি অথবা পালাক্রমে চলিতে থাকে।

সত্য অনুভূতিরও ক্রমিকতা

সত্য অনুভূতির যে পাঁচটি লক্ষণ করা হইল—কেন? একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে উহাদের প্রত্যেকটিরই ক্রমিকতা ও তরতমতার অপেক্ষা রহিয়াছে। ধর, কোন আন্তর অনুভূতি উজ্জ্বল ও বিস্পষ্টরূপেই হইল। কিন্তু প্রশ্ন উঠে—কোথায়, কি পরিমাণে, কোন্ ভাবে, কোন্ সম্বন্ধে ওটি উজ্জ্বল ও বিস্পষ্ট? আমি চক্ষু মেলিয়া কোনও বস্তুকে যেভাবে উজ্জ্বল ও বিস্পষ্ট দেখিতে পাই, আমার ধ্যানগোচর বস্তুটি কি সেই ভাবেই উজ্জ্বল ও বিস্পষ্ট? অথবা তার তুলনায় বেশী বা কম? সংক্ষেপে বলিতে গেলে ঐ পাঁচটি লক্ষণের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পাদ, মাত্রা এবং কলা এই তিন বিষয়ক প্রশ্ন উত্থিত হয়, এবং তা যদি উত্থিত হয় তবে এ জিজ্ঞাসা স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে—এর কাষ্ঠা বা সীমা কোথায়? অর্থাৎ অনুভূতি কোন্ মাত্রা পাদ এবং কলায় ফুটিয়া তবে নিরতিশয় বা যথার্থতম অনুভূতি হইতে পারে? যে উপায় দ্বারা সত্যের অনুভূতি হইয়া থাকে, সেটির সাধারণ নাম যদি দেওয়া যায় বুদ্ধি তবে অবশ্য এই প্রশ্ন করিতে হয়—বুদ্ধি কতখানি বিশারদী হইলে তবে সে সত্যকে নিরতিশয়রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে?

সত্য চতুষ্পাৎ—সত্তা, শক্তি, আকৃতি, ছন্দঃ

আমাদের অনুভবে সত্য চতুষ্পাৎ হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই চারিটি পাদকে আমরা সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি এই চারি নাম দিয়াছি। সুতরাং সত্যকে পূর্ণভাবে

উপলব্ধি করিতে গেলে সেটিকে এই চারিদিক দিয়াই পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। জীবের বুদ্ধি এই চেষ্টাতে নিরন্তর ব্যাপৃত আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রায়শঃ সে ছায়া লইয়াই বিভ্রান্ত হইয়া থাকে, কায়ার সন্ধান কদাচিৎ তার মেলে। এরূপ বুদ্ধিকে সত্য সম্বন্ধে 'অযুক্ত' বলা হইয়াছে। কিন্তু যে বুদ্ধি ছায়ার বিভ্রম কাটাইয়া 'কায়ার' সন্ধানী হইতে চায়, এবং সেই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তদুপযোগী উপায় আবিষ্কার করিতে সযত্ন হয়, সে বুদ্ধিকে 'যুঞ্জান' বলা হইয়াছে। এই যুঞ্জান ভূমিতেও সত্যের সঙ্গে তার ব্যবধান বিদ্যমান, কিন্তু সে ব্যবধানটি ক্রমে হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে। এই ব্যবধানের দূরীকরণই হইল সর্ববিধ বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞানের লক্ষ্য। শেষকালে ধর, বুদ্ধি এমন এক বিশারদীভূমিতে আসিয়া পৌঁছিল যেখানেতে সত্যের সঙ্গে তার ব্যবধান সর্বথা আর নাই। এই ভূমিকে 'যুক্ত' অবস্থা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে আসিয়াই কি যাত্রার অবসান? স্বয়ং গীতাও যুক্ত, যুক্ততর এবং যুক্ততম এই তিন ভূমিকার কথা বলিয়াছেন। কাজেই 'যুক্তভূমি'তে আসিয়াও তরতমতার পারে এখনও আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই বলিতে হয়। তখনও বুদ্ধিকে বলিতে হয়—আমি তো সত্যে যুক্ত হইয়াছি, কিন্তু যুক্ততর হইব কি উপায়ে? এবং অন্তিমে যুক্ততমই বা হইব কিরূপে? ইহা কি শেষ পর্যন্ত একটা অফুরান পথচলা? পরিপূর্ণ সত্য কি শেষ পর্যন্ত আমাকে এড়াইয়াই যাইবে? কোন কোন দার্শনিক মতে সত্যের পানে এই জ্ঞানের অভিযানটিকে অন্তহীনই ভাবিয়াছে বটে, এবং আমাদের বুদ্ধিও সচরাচর ক্রমিকতার ও ধারাবাহিকতার মধ্যে কারবার করিতে অভ্যস্ত; এতে মনে হয় সত্যের সম্বন্ধে বুদ্ধির এই আকুতি ও অভিযান কস্মিন্ কালেও হয়তো শেষ ও চরিতার্থ হবার নয়।

বুদ্ধি—সাধারণী সমঞ্জসা ও সমর্থা।
তুরীয়খ্যাতি কোথায় আরম্ভ?

কিন্তু বুদ্ধিকে আমরা 'সাধারণ কারবারী'রূপে চিনি বলিয়াই এরূপ মনে করিতে বাধ্য হই। বুদ্ধি আপন সাধারণ ব্যবহারে কতকগুলি 'সূত্র' (Categories) অনুসারে চলিতেই আপনাকে বাধ্য রাখিয়াছে, কিন্তু এ বাধ্যতার পাশ থেকে আপনাকে মুক্ত করার একটা সত্যকার আকুতি ও সম্ভাবনাও তার ভিতরে বিদ্যমান। তাই সাধারণী বুদ্ধিরূপে যেটিকে আমি এক অনন্ত শ্রেণী বা ধারারূপে পাইতেছি, বোধি অথবা

সম্বোধিরূপে সেটিকে অক্রমিক সমগ্র এবং পূর্ণরূপেও আমার পাইতে বাধা নাই। আগের এক সূত্রে অন্ধকারে বনের ভিতর চলিতে চলিতে টর্চের সাহায্যে পথ দেখিয়া চলা এবং বিদ্যুদ্‌বিকাশে পথ দেখিয়া চলার পার্থক্যটি লক্ষ্য করিয়াছি। বস্তুতঃ বুদ্ধি মহঃ এই তুরীয়খ্যাতিতে উপনীত হইলেই তার আপন 'আকার প্রকার' বদলাইয়া ফেলে। আগে যেখানে কত সঙ্কোচে কত আয়াসে তাকে একটির পর একটি পা বাড়াইয়া চলিতে হইতেছিল, এখন এই চতুর্থ খ্যাতিতে উপনীত হইয়া সে দেখিতে পায় যে তার ভিতরে বামনরূপী যে পুরুষটি এতদিন শয়ান ছিলেন, তিনি এইবার সাক্ষাৎ উরুক্রমরূপে জাগরিত হইলেন এবং 'ত্রেধা নিদধে পদং'—তাঁর একটি পদেই তিনি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই ত্রিভুবন অধিকৃত করিয়া বসিলেন। তখন নিজেই অবাক হইয়া ভাবিতে হয়—'এতাবানস্য মহিমা'! যে বুদ্ধি আমার এতদিন সামান্য এটা সেটা লইয়া মাপাজোকায় ব্যাপৃত ছিল, সেই বুদ্ধি আজ অতর্কিতে এমন এক মহা বিপুলের সন্ধান পাইয়াছে যার সম্বন্ধে তার কোনও মাপকাঠিই (Measures, Preconceptions) আজ আর অবকাশ খুঁজিয়া পাইতেছে না! বুদ্ধির সেই পরম সত্যকে বরণ করার নিমিত্ত এবম্প্রকার যে 'অভিসার', সেটিকে নায়িকার অভিসারের সঙ্গে তুলনা কর নিম্নের এই কারিকাটিতেঃ—

ব্যস্তং ছন্দঃ ক্রমিকবিষয়ং যাতি সাধারণী ধী
বৈরাজং যাঽনুসরতি সমা চাঞ্জসা মধ্যমা সা।
পূর্ণংহ্যর্থং ভজতি মহসা ছন্দসো যা সমর্থা
ত্রেধাত্মানং ত্বতিজিগমিষু র্নায়িকা সা তুরীয়া॥৮৮॥

সাধারণী নায়িকার মত জীবের এই সাধারণ বুদ্ধি কার অনুসরণে চলিয়াছে? বুদ্ধির অনুসরণের বস্তু সকল স্থলেই ছন্দঃ, ছন্দঃ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ঐ সাধারণী নায়িকা কিরূপ ছন্দে অনুসরণ করিতেছে? সেটি হইল ব্যস্ত ছন্দঃ—অর্থাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা ছন্দঃ—যাদের ব্যাপ্তি স্বল্প এবং হয়তো যাদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতিরও অভাব আছে। জীবনের ব্যবহারটি চালাইবার নিমিত্ত এরূপ ছন্দের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু এরূপ ছন্দের দ্বারা জীবনের ব্যবহারটি অবশ্য সৌষ্ঠবের

সহিত চলিতে পারে না। কাজেই, সাধারণী নায়িকাকে পদে পদে বহির্বাধা, স্ববিরোধ এ সবের সম্মুখীন হইতে হয়। আমরা আগে ছন্দের যে পাঁচটি পর্বের আলোচনা করিয়াছি তার মধ্যে বড় জোর প্রথম দুইটি মাত্র সাধারণী বুদ্ধি সাধিয়া উঠিতে পারে—অর্থাৎ পরিণয়ি ও অন্বয়ি। এই সাধারণী বুদ্ধির যেটি কার্পণ্য তাকে কাটাইয়া ওঠে যে বুদ্ধি তাকে বলা যায় সমঞ্জসা। এই সমঞ্জসা নায়িকাটি কার অনুসরণ করে? বৈরাজ ছন্দের, অর্থাৎ যে ছন্দঃ এখানে একটু ওখানে একটু এভাবে কুণ্ঠায় দেখা যায় না, পরন্তু যেটি স্থূল ও সূক্ষ্ম সমগ্র বিরাটের মাঝে অকুণ্ঠ অনুস্যূত—সেই সমন্বয়ি ছন্দঃ। বিজ্ঞানের যে বুদ্ধি সেটি এবম্প্রকার সমন্বয়ি ছন্দেরই অনুসরণে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছে। কিন্তু বহুদূর অগ্রসর হইয়াও অকুণ্ঠের অভিসারিকা এই সমঞ্জসা বুদ্ধি আপন কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না দেখিতেছি! বিশ্বের সকল ঘটনাই ছন্দের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু বিশ্বের মূলে যে ঋতম্, যে সত্যম, সেটি? অণু মহান্ সব কিছুর মূলে যে পরিপূর্ণ সত্যার্থ (Complete Meaning or Significance) সেটিকে আপন মহান ছন্দের দ্বারা ভজনা, বরণ এবং উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় যে বুদ্ধি সে বুদ্ধি বিজ্ঞানের বুদ্ধিরও ঊর্দ্ধে।

বিজ্ঞানের ঊর্দ্ধে প্রজ্ঞান। সমঞ্জসার পর সমর্থা

এটি হইল প্রজ্ঞানের বুদ্ধি এবং এটি সমর্থা নায়িকা। এ বুদ্ধি ছন্দের যে পর্বে অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয় সেটিকে আমরা মহা-সমন্বয়ি রূপে জানিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি শেষ? বুদ্ধি নিজেকে এই ত্রিবিধ নায়িকার ভূমিকায় সাজাইয়া ছন্দোরূপী সত্যকে তিনভাবে ভজনা করে। কিন্তু আপনার এই তিনটি ভূমিকারও পারে বুদ্ধি নিজেকে প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করে যে (অতি জিগমিষুঃ) এত করিয়াও সে যেন এখনও পরম সত্যটিকে একান্ত আপনার করিয়া পায় নাই! এই নিমিত্ত বুদ্ধির একটা তুরীয় ভাবও রহিয়াছে এটি মনে করিতে হয়। বলা বাহুল্য এভাবে আসিলে বুদ্ধির মানমেয়াদি সকল স্বভাব ব্যবহার অপগত হইয়া যায়। তখন বুদ্ধি যেন আপন স্বভাবকেই অতিক্রম করিয়া বসে (transcends itself)। কাজেই, যে পরম উপলব্ধি ও আস্বাদনটি তখন তার হয়, সেটি সম্বন্ধে বুদ্ধির অথবা তার অনুগামিনী ভাষার

কোন বিবৃতি দেওয়ার কিছু থাকে না। এই পরমভূমিতে আসিয়া বুদ্ধির যে ছন্দের সাক্ষাৎ পরিচয় মিলে, সেটিকে আমরা পরম সমন্বয়ি রূপে জানিয়াছি।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তার দুশ্চিন্তা

সচরাচর বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক চিন্তা বুদ্ধির ঐ সমঞ্জসা ভূমিকা পর্যন্ত স্বীকারেই প্রস্তুত হইয়াছে। সমর্থার সংবাদে সে ভয় পাইয়াছে, অথবা অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়াছে; আর তুরীয়া তো তার কল্পনাকে পর্যন্ত স্পর্শ করে কই! বুদ্ধিকে Intellect, Understanding এমন কি Reason রূপে দেখিলেই এইভাবে এক এক সীমান্তে থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। পশ্চিমে Kant প্রমুখ দার্শনিকেরা শেষের দুটিকে পায়ে শিকল বেড়ি পরাইয়াই রাখিতে চাহিয়াছেন। বুদ্ধি আপন শুদ্ধিরূপে (as Pure Reason) যে সব মহত্তর 'অক্রমিক' সত্যের সন্ধান আমাদের দিতে চায়, সেগুলি সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইতেই Kant প্রভৃতি 'প্রকাশ্য' পরামর্শ দিয়াছিলেন। অবশ্য Kant স্বয়ং প্রকারান্তরে (যেন ঘোমটা পরাইয়া) এবং তাঁর পরবর্তী কেহ কেহ অনেকটা সরাসরি ঐ সব মহত্তর সত্যের অনুভূতিকে আমলে ও আসরে আনিয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি বলিতে হয় যে তাঁদের চিন্তায় ও ধ্যানে বুদ্ধির ঐ সমর্থা ও তুরীয়া এই দুই সর্বোত্তম ভূমিকার অবগুণ্ঠনটি সম্যক্ উন্মোচিত হয় নাই। বুদ্ধিকে তার আপন মানস সংস্কারের উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে না পারা পর্যন্ত, অথবা Supramental ভূমি অধিগত না হওয়া পর্যন্ত, সত্যের 'মহান' এবং 'পরম' এই দুটি রূপই আমাদিগকে এড়াইয়া যাইবে।

এইবার বুদ্ধিকে 'ত্রিনেত্রা' রূপে ধ্যান কর নিম্নের এই কারিকায়ঃ—

উরসি শিরসি চাস্যে ত্রীণি চক্ষূংষি তেষাং
দৃশিপটরসভাসঃ কঃ প্রধীর্নিশ্চিনোতি।
বহিরিতি চ সদেকং ভাশ্চভর্গো বরেণ্যং
রস ইতি রসভূমা কস্য তারশ্চ তৎসৎ॥৮৯॥

তোমার মুখমণ্ডলে যে চক্ষুর্দ্বয়, তদ্দ্বারা বহির্বিশ্বের যে বিচিত্র চিত্রপট, সেটি তুমি দেখিতেছ, এবং তা দেখিয়া তোমার মন ও বুদ্ধি তাদের সাধারণী বৃত্তিটি

চালাইতেছে। কিন্তু তোমার হৃদয়ে (উরসি) এবং ভালে (শিরসি) আরও দুইটি চক্ষুঃ আছে তা জান তো? একটি ভাবের চোখ—সে তোমায় দেয় রসবোধ, রসানুভূতি; অপরটি জ্ঞানের নেত্র—সে তোমায় দেয় আলোকের, জ্যোতির সন্ধান। তুমি সাধারণী নায়িকাটির ভজনায় এমনি ভুলিয়াছ যে—অপর দুটি নেত্রের সাড়া প্রায়ই তোমার কাছে পৌছায় না। অথচ, এ দুটি নেত্র না ফুটিলে বুদ্ধি তো সমঞ্জসা-সমর্থা হইবে না!

তাই কারিকায় বলা হইতেছে—কে এমন প্রধী (প্রকৃষ্ট ধী-সম্পন্ন) আছে, যার ধী ঐ ত্রিবিধ দৃষ্টির বিষয়বস্তু যে দৃশ্য পট, রস এবং জ্যোতিঃ (ভাঃ), এ তিনকেই নিশ্চয়পূর্বক গ্রহণ এবং আপন পরম প্রয়োজনে বিনিয়োগ করিতে পারে (নিশ্চিনোতি)? সেই পরম প্রয়োজনটি কতদূরে এবং সেটি কি? অন্তরে বাহিরে তো অফুরান বিচিত্র এক ছবি দেখিয়া যাইতেছ, ফলে পাইতেছ ঘাত-প্রতিঘাত, হাসি-কান্না কত কি? কিন্তু এ সবই সেই এক সদ্‌বস্তু (সদেকং),—সবই তিনি—ইহা জানিয়া শান্ত হও। ললাটের আঁখি গুরু কৃপায় জপাদি সাধনে যদি তোমার ফোটে, এবং তা দিয়ে যদি তুমি আলোকলোকের আলোর সন্ধান পাও, তবে জানিও সে আলো (ভাঃ) সেই 'বরেণ্যং ভর্গঃ' যার কথা গায়ত্রীমন্ত্র শুনাইয়াছেন। আর, হৃদয়ের নেত্রে যদি রসের (ভাবপুলকাদির) পরশ পাও তো জানিও, সে রস 'রসো বৈ স ভূমা।' তখন বুঝিবে—'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি!'

বস্তুরূপে যেমন জানিলে, মন্ত্ররূপেও সেই পরম সত্যকে জান—'ওঁ তৎ সৎ'। কিন্তু যে বুদ্ধি এভাবে জানিবে, সে বুদ্ধি কই? (কস্য)। পূর্বের কারিকায় বুদ্ধির ভূমিকাগুলি এই ভূমিকাগুলির সাথে তুলনা কর।

বাইরের ও মনের চলচ্চিত্রে যতক্ষণ বেশী অভিনিবেশ থাকে (শ্রুতির সেই 'পরাঞ্চি খানি' আবারও স্মরণ কর), ততক্ষণ অপর দুটি দৃষ্টি সম্যক্ ফুটাইবার নিমিত্ত 'আবৃত্তচক্ষুঃ' হবার সাধনটি করিতে হয়। অর্থাৎ, সত্যকার জ্যোতীরসের (অমৃতের) অভিলাষীকে 'ধীর' ও শান্ত হইতে হয়। কিন্তু জ্যোতীরস সম্বন্ধিনী যে দৃষ্টি তার পূর্ণ উন্মেষটি হইলে পরাক্ বা বহির্মুখও আর সেরূপ থাকে না। তখন 'বহিরিতি সদেকম্'। আবার, ভাবনেত্র এবং জ্ঞাননেত্র—রসের অনুভূতি এবং জ্যোতির উপলব্ধি—এ দুয়ের কোনটাই 'অন্ধ' হইলে হইবে না।

বুদ্ধিকে ‘নায়িকা’ (Leading Light) রূপে দেখিলে সমর্থার পরেও তুরীয়া ভাবটিকে স্বীকার করা হইয়াছে; সেইরূপ, ‘ত্রিনেত্র’ (Three Meanings) রূপে দেখিলেও, ঐ তিনেরও অতীত এক ‘তুর্য্যগা’ দৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়। ‘তুরীয়া’ এবং ‘তুর্য্যগা’ এই দুয়েতেই বুদ্ধি চায় আপনাকেই যেন অতিক্রম করিতে।

প্রপঞ্চোপশম মদ্বৈত মধিষ্ঠানং তুরীয়য়া।
তত্র তুর্য্যগয়া পূর্ণং ধ্রুবং শুদ্ধমপীষ্যতে॥ ৯০॥
মহাসমন্বয়ো যত্র পারম্যমবগাহতে।
সর্ব্ববিত্ত্বং চ সার্ব্বজ্ঞ্যং তত্র নিরঞ্জনী স্থিতিঃ॥ ৯১॥
বিষয়ঃ সন্ধিভাবৌ চ তাৎপর্য্যং পরমার্থতা।
দ্বেহন্তিমে নিষ্ঠিতে যত্র তত্র তৎ সৎ ব্যবস্থিতম্॥ ৯২॥
বিচিনুতে হন্তিমখ্যাতিং সত্যাদ্ যঃ সৃষ্টি সূক্তগাৎ।
তপশ্চৈবং সতঃ সত্যং তস্যোংতৎসদিতি স্থিতিঃ॥ ৯৩॥
স্থিরত্বাদীনি লিঙ্গানি ত্রীণি ব্যাহৃতিমূর্দ্ধনি।
ধ্রুবত্বাদীনি সংলক্ষ্যে লক্ষ্যশেষে হ্যলক্ষণম্॥ ৯৪॥
অভ্যারোহায় সত্যে স্যাৎ সব্যাহৃতি জপক্রতুঃ।
সৌক্তে তু ব্যাহৃতীর্হিত্বা চৌং তৎসদিতি তৎপরম্॥ ৯৫॥
অভ্যাসো ব্যাহৃতৈঃ কুর্য্যা ধীমহীতি চ ভর্গসা।
বি-ব্যাহৃতিং তপশ্চোরং হিত্বৌংতৎসদিতি স্থিতিঃ॥ ৯৬॥

ভূমাকাশং স্বভাবান্ নিরতিশয়সুখং তত্র ভাবাশ্চ নানা
শুদ্ধ জ্ঞানং স্বধাম্না প্রমিতি পরিমিতং বা প্রমাতৃ প্রমেয়ম্।
শুক্লং কৃষ্ণঞ্চ ধূম্রং সদিতি ভবতি কিং বস্তু চৈকং বিচিত্রং
ভর্গোদেবস্য পাদান্ কতিবিধনিলয়ান্ মিৎসমানা ধিয়ো নঃ॥ ৯৭॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যঃ পরম উপশমো বা প্রপঞ্চস্য তস্মি-
ঞ্ছাখাবিস্তারমূলং সদসদিতি মহাবীবুধো নির্ব্বিশেষম্।
মায়াহনির্ব্বাচ্যমূলং তদপি বদসি কং মায়িনং বা মহেশং
ক্লেশাদ্যৈস্তত্র নৃণাং দনুজদিবিষদাং বা পরামৃষ্টিলেশঃ॥ ৯৮॥

ন বেত্তি মাতা সুতাশ্রুধারং
ন ধরতি ধাতাঽবলস্যভারম্।
ন পাতি পাতাঽতুরং বিপাকে
শরণং কুতো বাস্তীহলোকে॥ ৯৯॥

বঙ্গানুবাদ ও ভাবার্থ বিস্তার

নিখিল প্রপঞ্চের উপশম ভূমি অবশ্যই আছে। কেবল বেদাগম নয়, আত্মপ্রত্যয়ও তার সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়। এটি সকল বোধের অধিষ্ঠান এবং দ্বৈতলেশহীন। এটি স্বপ্রকাশ, তথাপি তুরীয়া দৃষ্টিতেই প্রকাশের আবরণ সরিয়া গিয়া থাকে। এই অধিষ্ঠানে যে পূর্ণ, শুদ্ধ ও ধ্রুব তত্ত্ব বিদ্যমান, সেটি উন্মেষিত হয় যে দৃষ্টিতে, সেটি তুর্য্যগা বা পারীণা। বিশ্ববোধে সব কিছুই এক কাষ্ঠার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া থাকে। সবাই বলে—আমি তো 'এই' মাত্রা, পাদ ও কলায় অভিব্যক্ত হইতেছি, কিন্তু আমার পরাকাষ্ঠা (পূর্ণতা, শুদ্ধি ও ধ্রুবত্ব) কিসে এবং কোথায়? এই পরাকাষ্ঠাটিকেও 'ন স্যাৎ' করা যায় না।

ছন্দের সোপানাবলি অধিরোহণ করিয়া মহাসমন্বয়িতে উপনীত হইলে। সেখানে ছন্দঃ আসিয়া বলে—এইবার আমি পরমতায় অবগাহন করিব। এই যে মহারহস্যময় 'মহা' ও 'পরমের' মিলনভূমি, এখানে কি দেখিলে? একদিকে সর্বজ্ঞত্ব-সর্ববিত্ত্বরূপ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা (শক্ত্যাদিরও বটে), অন্যদিকে একান্ত প্রপঞ্চোপশমরূপ 'নিরঞ্জনী স্থিতি'।

পাঁচটি প্রশ্ন এবং তাদের উত্তর। তৎপরতা ও পরমার্থতা

কোন ভান অথবা বোধকে পাঁচটি প্রশ্ন করিতে পারঃ—তোমার বিষয় (Content) কি? তোমার 'সন্ধি' অথবা সম্বন্ধ (Relation) কি? তোমার ভাব (লক্ষ্য, হেতু, কারণ, নিদান—Meaning or Intent) কি? কি, কিভাবে এবং কেন (What, How and Why) ঘটিত এই তিনটি প্রশ্ন। এই তিন প্রশ্নের অনুসরণ করিতে করিতে যে কাষ্ঠা বা সীমার পানে অগ্রসর হই, সে তিনটি কাষ্ঠা যথাক্রমে—বিরাট,

হিরণ্যগর্ভ এবং ঈশ্বর। প্রত্যেকটি সত্তা, শক্তি, ছন্দঃ এবং আকৃতি—এই চারিদিক দিয়া চতুষ্পাৎ। আচ্ছা, প্রশ্নের অবসান কি এখানেই? না, এর পরও আর দুটি প্রশ্ন আসে। এতক্ষণ মুখ্যতঃ Empirical Analysis ও Synthesis (ব্যবহারদৃষ্টিতে বিশ্লেষণাদি) চলিতেছিল। এইবার Metaphysical Meaning—তত্ত্বতঃ দৃষ্টি। বিশ্লেষণ এবং সমন্বয় তো বোধের (Experience-এর) মূলীভূত কারণভূমি পর্যন্ত আসিয়াছে কিন্তু অতঃপর? আপনাকে কার্য-কারণরূপে দেখাইয়াও স্বয়ং কার্যকারণাতীত কোনও ভূমি? Absolute-এর এলাকা? বোধের বিষয় বা 'What'কে Absolute 'That' রূপে (শুদ্ধ, হানোপাদানহীন 'তৎ' রূপে) জানার উপায় কি? 'তৎ' পদার্থের পরমশোধনটি হইবে কিরূপে? তারপর, 'How' and 'Why'—সম্বন্ধ ও ভাব—এ দুয়েরি বা ধ্রুব এবং পরিপূর্ণ পর্যবসান কোথায়? অর্থাৎ, সম্বন্ধ কোথায় যাইয়া বলিবে—আর আমার কোন অপেক্ষাই নাই; ভাব বলিবে—আমার পূর্তি শেষ, আর আমার সঙ্গে অভাবও নাই? এই পরমতার ভূমিকে বলে 'সৎ'। এটি 'বাধমাত্রবিরহী'। কেননা, ইহা মাত্রাদির পারংগত—transcending all measure. এই শেষের দুটিকে কারিকায় 'তৎপরতা' এবং 'পরমার্থতা' বলা হইয়াছে। এ দুয়ে নিগমন করে যে বস্তু, সেটি হইল—পরব্রহ্ম। 'ওঁ তৎ সৎ'—এই মন্ত্রে ইহার নির্দেশ। 'মহামায়া,' 'ভগবত্তা'—এ সব 'তৎ সৎ' এর প্রকাশ। শেষের এ দুটি দৃষ্টিতে ন্যূনতা বা আধিক্যের কোনও প্রসজ্যতা নাই। অর্থাৎ, এখানে আসিয়া কাকে উপরে কাকে নিম্নে রাখিবে—এ 'ঝামেলা' তুলিও না। তাতে যেটি 'তৎ সৎ' তার স্বরূপহানি ঘটিবে।

'ওঁ তৎ সৎ'—এই পরব্রহ্মবাচক মন্ত্রের জপধ্যানে কার স্বভাবতঃ স্থিতি, তাই বলা হইতেছে। সপ্তখ্যাতির শেষ খ্যাতি যে 'সত্যম্', আর সৃষ্টিসূক্তের 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' এর যে 'সত্যম্'—এ দুটিকে যে বিলক্ষণ করিয়া জানে (অর্থাৎ ঐ দুটির কোথায় অন্বয় এবং কোথায় ব্যতিরেক); আবার, দ্বিতীয় খ্যাতি 'তপঃ' এবং সৃষ্টিসূক্তের 'তপঃ'—এ দুটিকেও যে ঐ ভাবে জানে; পুনশ্চ, 'সৎ' এবং 'সত্য'—এ দুইকেও যে মনন ও উপলব্ধিতে বিলক্ষণ করতঃ জানে;—সেই ব্যক্তিরই পরব্রহ্মবাচক মন্ত্রে যথার্থতঃ স্থিতি জানিও।

সংলক্ষ্য বা লক্ষণের পরাকাষ্ঠা কোথায়? Supreme Logical বা Perfect Harmony কি বস্তু?

বিলক্ষণতার রীতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে:—স্থিরত্ব, অসঙ্করত্ব এবং সমগ্রত্ব এই তিনটি 'লিঙ্গা' সপ্তম খ্যাতিতে (ব্যাহৃতি মূর্দ্ধনি) নিরূপিত হইয়াছে। এ তিনের সংলক্ষ্য, কিনা, চরমত্তার ভূমি (পরাকাষ্ঠা) কোথায়? অর্থাৎ, কোন্ ভূমিতে স্থির হইবে ধ্রুব, অসঙ্কর হইবে শুদ্ধ, আর সমগ্র হইবে পূর্ণ? ঐ লক্ষণগুলির (স্থিরত্বাদির) একটা ক্রমিকতা (progression) আছে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে—কোথায় তাদের সীমা? সীমা যেখানে, তাহাই ব্রহ্মের 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ' রূপ। ঋতম্ এবং সত্যম্, আর তাদের সংযোজক 'চ'কারদ্বয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। আর, 'লক্ষ্যশেষে', অর্থাৎ আর লক্ষণ বা লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতা আর চলে না, সেখানে 'অলক্ষণম্'—তুরীয়। ব্যাহৃতি পর্বের যেটি শেষ, সেখানে যাইয়া বিশ্ববোধের একটা complete analytic-cum-synthetic view মিলিল বটে, কিন্তু সেটা বিশ্বের একটা complete logical apprehension; comprehension বা appreciation এর পূর্ণ সমাধানটি সেখানেও হয় নাই। এইজন্য এক Supreme Logical-এর অপেক্ষা তখনও থাকে। এই Supreme Logical হইতেছে সত্য, শ্রীভগবানের রূপ। Harmony বা ছন্দঃ কথাটি এই গ্রন্থে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই, সত্য হইতেছে ছন্দোগত্বের যেটি পূর্ণতা ও পরমতা তাই। কিন্তু আধার বা Background রূপে রহিয়াছে 'অলক্ষণম্'—Alogical—দ্বৈতাদ্বৈতাদিবিবর্জিত।

জপাদি সাধন-ব্যাহৃতি সহযোগে এবং তদতীত রূপে

যতক্ষণ পর্যন্ত অভ্যারোহ অথবা লক্ষ্যাভিমুখী অধিরোহণ পর্বটি চলিতেছে, অর্থাৎ গীতার ভাষায় বলিতে গেলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 'আরুরুক্ষু' অথবা 'যুঞ্জান', ততক্ষণ পর্যন্ত আমার জপাদি অনুষ্ঠান (জপক্রতুঃ) অবশ্যই আমাকে ভূ র্ভুবস্বঃ প্রভৃতি ব্যাহৃতি সহযোগে করিতে হইবে—যথা গায়ত্রী জপে। অথবা গায়ত্রী এবং মধুমতী এ দুয়ের সম্মিলিত জপে (যেমন ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক করিতে বলিয়াছেন)। এই ভূমি অতিক্রম করতঃ যখন আমি সৃষ্টিসূক্তাদি প্রসিদ্ধ "ঋতঞ্চ

সত্যঞ্চ” অনুভূতিতে উপনীত হইব, অর্থাৎ যখন যুঞ্জান অবস্থা হইতে যোগারূঢ় অবস্থায় পৌঁছিব, তখন ব্যাহৃতির অপেক্ষা আর রহিবে না (সৌক্তে তু ব্যাহৃতীর্হিত্বা)। এরও পারে যদি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম আমার লক্ষ্য হন, তা হইল পরব্রহ্মের বাচক যে “ওঁ তৎসৎ” এই মন্ত্র সেটিকে আমায় আশ্রয় করিতে হইবে। অর্থাৎ যোগযুক্ত অবস্থায় এই মন্ত্রের জপ এবং ধ্যানই আমার সাধন। সাধন বলা হইল এইজন্য যে, উপলব্ধির যেটি পরম বা চরম ভূমি সেটি এখনও সম্যক্ অধিগত হয় নাই; অর্থাৎ তখনও গীতার ভাষায় “যুক্ততর” এবং “যুক্ততম” হইবার অপেক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে।

গায়ত্রী জপে পূর্বোক্ত ক্রমের দৃষ্টান্ত

পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটি গায়ত্রী জপের দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইতেছে। যতক্ষণ অভ্যাসযোগপরায়ণ রহিয়াছি, ততক্ষণ ‘ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ’, এই ব্যাহৃতি সহকারী জপধ্যান করা আমার কর্তব্য। তারপরে যখন অভ্যাস আমাকে ধ্যানের গভীরতায় লইয়া যাইয়া স্বয়ং নিরস্ত হইতে চায়, তখন “বরেণ্যং ভর্গঃ” এইটিকেই ধ্যানযোগে সমাশ্রয় করিতে হয় (ধীমহীতি চ ভর্গসা)। তৎপরে, যখন ধ্যান এতখানি গভীর, শান্ত এবং সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে যে তার ভিতরে ধ্যাতা এবং ধ্যান এ দুটিকে আর আলাদা করিয়া রাখা সম্ভব হয় না, তখন “ওঁ তৎসৎ” এই পরম ভাবেই আমার ব্রাহ্মীস্থিতি সংসাধিত হইয়া থাকে। তখন “ওঁ তৎ সবিতুঃ”—গায়ত্রীর এই আদিম পাদে যে “বি” এবং “উর্” এই দুটি ভাগ রহিয়াছে (যথাক্রমে ব্যাহৃতি এবং উর্দ্ধগা তপঃশক্তির সূচক) সে দুটি স্বভাবতঃই নির্গলিত হইয়া যায়। সুতরাং তার ফলে “ওঁ তৎসৎ”—ইহাই শেষ আশ্রয়রূপে অবশিষ্ট থাকে।

[মন্তব্য:—অভ্যাসযোগপরায়ণ অবস্থায় বিশেষভাবে ব্যাহৃতিকে ভজনা করিতে হয় কেন? এটি বুঝিতে গেলে ব্যাহৃতির মূল কথাটি আবার ভাবিয়া দেখিতে হয়। সাধকের পক্ষে কতকগুলি ছন্দঃ যেমন অনুকূল অথবা মিত্রভাবে সহায় হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার অপরাপর অনেক ছন্দঃ হয় উদাসীন নয়তো প্রতিকূল ভাবে সাধকের অগ্রগতি ব্যাহত করিতে প্রবৃত্ত থাকে। সাধকের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিতে গেলে দুটি দিকে মনোযোগী হইতে হয়। প্রথম—অরি, মিত্র এবং উদাসীনের জটলার মধ্য

হইতে মিত্রটিকে বাছিয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়—ঊর্ধ্বতম লোকে মিত্র ছন্দের এবং সহায়ক শক্তির যে মহাভাণ্ডার বিদ্যমান রহিয়াছে, তার সাথে সাধকের জীবনে সাক্ষাৎভাবে কার্যকরী যে মিত্রচ্ছন্দঃ ও শক্তি তার সজীব সংযোগটি ঘটাইয়া লইতে হয়। এখন লক্ষ্য কর যে প্রথম ব্যাহৃতি "ভূঃ" কি বলে? সে বলে—এই তোমার মিত্রচ্ছন্দঃ, তোমার সাধনের সহায় ও সুহৃৎ; এটিকে আমি সমগ্র বাধা এবং অন্তরায়—এর মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সম্মুখে হাজির করিয়া দিয়াছি। এখন সর্বপ্রযত্নে তুমি এটিকে রক্ষা ও পোষণ কর। যারা অরি এবং উদাসীন তারা এই মুহূর্তের জন্য সরিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু তারা তো নিরস্ত হয় নাই। তারা যে প্রতীক্ষায় রহিয়াছে অতর্কিত আক্রমণে তোমার সাধনটিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত! তবে উপায়? তখন "স্বঃ" এই ব্যাহৃতি সাধককে আশ্বাস দিয়া বলে—এই যে তোমার দৃষ্টির অগোচরে আমি রহিয়াছি এক ঊর্ধ্বতন জ্যোতির্ধামের দিশারী হইয়া; তোমার আকুতি (aspiration) আমার পানে তার শিখা মেলিয়া সমুত্থিত হউক, আমি তাতে দিব্যলোকের বরণীয় ভর্গঃ এবং ছন্দঃ আহুতি দিতে থাকিব, যার ফলে তোমার ভিতরে ভাগবতী সত্তা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে তুমি উপলব্ধি করিতে থাকিবে। "ভুবঃ" এই মধ্যম ব্যাহৃতিটি কি করে? আমার সাধনের যেটুকু সামান্য সম্পদ সেটিকে এক মহীয়সী দৈবী সম্পদের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া দেয়। এই এবং সেই এ দুয়ের মধ্যে সে হয় সেতু বা সন্ধি। সুতরাং দেখিতেছি যে "ভূ র্ভুব স্বঃ" এই আকৃতিটির (pattern) মধ্যেই উপরি উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সিদ্ধিরই উপায়টি সুনির্দিষ্ট ভাবে দেওয়া রহিয়াছে।

ভূমা স্বরূপে ও বুদ্ধির পরিমাপে

শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে ভূমা অথবা আকাশ সেটি তো নিরতিশয় সুখস্বরূপই বিশ্বের এবং বিশ্ববোধের অধিষ্ঠান ও আধার হইয়া বিদ্যমান আছে। কিন্তু এও দেখিতেছি যে সেই আধারের উপর অশেষবিধ ভাবের লহরীও খেলিয়া যাইতেছে। (তত্র ভাবাশ্চ নানা)। এক শুদ্ধ নির্বিশেষ নিরঞ্জন জ্ঞানও স্বমহিমায় স্বপ্রকাশ; এর হ্রাস-বৃদ্ধিও নাই, উদয়াস্তও নাই, ইহা ঠিক। তথাপি দেখিতেছি যে এই অপ্রমেয় শুদ্ধ জ্ঞান যেন বিশ্ববোধ বা প্রমিতির খাতিরে পরিমাণ অঙ্গীকার করতঃ নিজেই প্রমাতা এবং প্রমেয়

(Subject and object) এ দুইই হইয়াছে। এইভাবে আবার এক শুদ্ধ বিকারহীন সৎবস্তু (সদিতি বস্তু চৈকং) বিদ্যমান। স্বরূপে সেটি নিরঞ্জন বটে কিন্তু তথাপি তাহাতে শুক্ল, কৃষ্ণ, মিশ্র (ধূম্র) এই সব অশেষ বর্ণবৈচিত্র্যের উদ্ভবও হইতেছে; অর্থাৎ এক শুদ্ধ সৎবস্তু কোন্ লীলাচ্ছলে বলিতে পারি না আপনাকে যেন সত্যমিথ্যাদি নানা ভূমিকায় বিশ্বদৃশ্যপটে প্রতিফলিত করিতেছে। যিনি দেবতার দেবতা (পরব্রহ্ম) তিনি তো স্বরূপে পরম জ্যোতীরসস্বরূপ বটেই, কিন্তু তাহা হইয়াও তিনি তাঁর এই বিশ্বে এবং আমাদের বিশ্ববোধে না জানি কত পাদ বিস্তার করিয়াছেন এবং না জানি কত না আধার বা ভূমিতে তার সেই পাদসমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে (পাদান্ কতিবিধনিলয়ান্)! যেটি ভূমা শুদ্ধ এবং অসীম, তার স্বরূপমহিমার সম্মুখীন হইতে অপারগ হইয়া আমাদের এই বুদ্ধি কত রকমে না সেটিকে লইয়া মাপাজোকা, হিসাব-নিকাশ করিতেছে (মিৎসমানা ধিয়ো নঃ)।

সত্তার জ্ঞান ও আনন্দের দিক হইতে সবিশেষ ও নির্বিশেষ ভাবে কোথাও কি সঙ্গতি নাই?

শ্রুতি এক সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ পুরুষ এবং তাঁহার জ্ঞানময় তপের কথা বলিয়াছেন। সেই সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্, পুরুষটি কীদৃশ এবং তাঁর জ্ঞানময় তপটিই বা কীদৃশ? তিনি নিখিল প্রপঞ্চের পরম উপশমের ভূমি, ইহা অবশ্য ঠিক বটে, কিন্তু কেবলমাত্র তাহা হইলেই তো বুঝা যায় না যে, তিনি কেমন করিয়া সর্বজ্ঞ সর্ববিৎ হইয়াছেন, এবং কেমন করিয়াই বা সৃষ্টির আদিতে তাঁর জ্ঞানময় তপটি তিনি করিলেন। সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ বলাতে এটি সূচিত হয় যে, তিনি সব কিছু যে সামান্যভাবে জানেন এমন নয়, পরন্তু তিনি সমস্ত কিছু বিশেষভাবেও জানেন; অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাহিরে নেই বা থাকিতে পারে না। যেটি অধিষ্ঠানে নিরঞ্জন শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র, তাতে এই অসীম অকুণ্ঠিত জ্ঞানৈশ্বর্যের সম্ভাবনা কি করিয়া হইল? শুধু আবার তাহাই নয়, সৃষ্টির নিমিত্ত সঙ্কল্প ও তপঃ তাঁতে কী করিয়া সম্ভাবিত হইল? সে তপের মূলে আনন্দ, সে তপের রূপ জ্ঞান এবং সে তপের ফল "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ"। মূলীভূত যে আনন্দ তাঁর এবম্প্রকার লীলাকৈবল্য কেমন করিয়া বুঝিব? এইজন্য অবশ্যই ভাবিতে হয় যে গোড়াকার তত্ত্বটি নির্বিশেষ ও সবিশেষ, অমূর্ত ও মূর্ত

এই দুই ভাবেই নিজেকে অভিব্যক্ত করিতে পারেন ও তাই করিয়াছেন। ক্ষর এবং অক্ষর তাঁর এই দুইটি ভাব হইতেও তিনি স্বয়ং উত্তম বলিয়া তাঁকে বলা হইয়াছে পুরুষোত্তম। এ তো গেল জ্ঞানের দিকের কথা। সৎ অথবা সত্তার দিক থেকেও সেই মূল তত্ত্বটিকে সবিশেষ ও নির্বিশেষ এবম্প্রকার সকল দ্বন্দ্বেরও ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলে কি ভাল হয় না? বিশ্বরূপ এই যে মহা বীরুধ (লতিকা), এর অশেষ শাখা বিস্তারের মূল অথবা বীজ হইতেছেন তিনি; কিন্তু সে মূল বা বীজটিকে একান্তভাবে নির্বিশেষ ভাবিলে এই বিরাট বিশ্ববল্লী এবং তার অশেষ বিচিত্র বিস্তার কি আদৌ বুঝা যাইবে? যদি বল তিনি স্বয়ং এর মূল অথবা বীজ নন, তাঁর মায়াই—তাঁর অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াই এর মূল, তবে তাঁর নিজের স্বরূপের সাথে এই অনির্বচনীয়া মায়াশক্তির যে কেমনধারা সম্বন্ধ তাই বা কে বুঝাইয়া দিবে? 'অনির্বচনীয়' এই কথাটি ব্যবহার করিয়া ঐ মহারহস্যের তো কোনও সমাধানই করা গেল না! মাত্র এইটুকু স্বীকার করা হইল যে, তাঁতে এবং তাঁর মায়াশক্তিতে যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ এত গহন যে তাতে প্রবেশ করাই অসম্ভব। অথচ শ্রুতি এবং আত্মানুভূতি দুই-ই একবাক্যে বলিতেছে যে তিনি যে মায়াতীত এমন নন, তিনি মায়াধীশ, মায়ী এবং মহেশ্বর। সুতরাং অবশ্যই মনে করিতে হয় যে তিনি সকল সম্বন্ধের অতীত হইয়াও (as Absolute) শক্তি-শক্তিমান ইত্যাদি নিখিল সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন এবং তাদের নিয়ামকও হইয়া রহিয়াছেন। মায়াধীশ এবং মহেশ্বর এ দুটির দ্বারা তাঁর এই পরমোত্তম স্বভাবটি সূচিত হইতেছে না কি? শেষকালে আবার রস বা আনন্দের দিক দিয়াও দেখ। তিনি তো সর্বভূতান্তর্যামী মহেশ্বর কিন্তু এইভাবে কেবলমাত্র শুদ্ধ স্বলসিত যে আনন্দ তাতে অচ্যুতস্থিতি হইলেই কি হইবে? নিখিল সৃষ্টির যত কিছু বিচিত্র ব্যথা বেদনা সে সবই তাঁকে একটুখানি স্পর্শ না করিলেই কি এই বিশ্ব-মহানাট্যের যেটি নিগূঢ় মর্মার্থ ও আবেদন সেটি সম্যক্ ধারণায় আসিল? কোথাও বা ঈশ্বরের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে যে—তিনি এমন এক পুরুষ যাঁকে জীবের ক্লেশ কর্ম বিপাক এবং আশয় এই চারিটির কোনটিই কোনকালে পরামৃষ্ট করে না। তাই যদি হয় তবে জগতের করুণানিদান আদি গুরুরূপে ক্লেশবিদ্ধ জীব তাঁতে শরণ লইবে কি প্রকারে এবং কি উদ্দেশ্যে? সুতরাং এটিও মনে করিতে হয় যে তিনি স্বীয় ব্রহ্মানন্দে স্থিত রহিয়াও জীবের প্রতিটি ব্যথা

বেদনা, আর্তি আকুতির সমাচার অবশ্যই রাখিয়া থাকেন এবং তার সকল সঙ্কটেই তিনি তার একমাত্র শরণ সহায় এবং সুহৃৎরূপে বিদ্যমান আছেন।

(ক্লেশাদ্যৈস্তত্র নৃণাং দনুজ দিবিষদাং বা পরামমৃষ্টিলেশঃ)

যিনি জগতের মাতা তিনি যদি তাঁর সন্তানের বিগলিত অশ্রুধারের কোনও খোঁজ না রাখেন (ন বেত্তি); যিনি জগতের ধাত্রী তাঁর যদি এই-ই স্বরূপ ও স্বভাব হয় যে তিনি অবলের ভার বহন করিতে পারেন না; যিনি জগতের পাতা অথবা পিতা তিনি যদি বলেন—ওগো আর্ত আতুর! তুমি তো বিপাকে পড়িয়াছ দেখিতেছি, কিন্তু তোমাকে পালন করার ইচ্ছা বা শক্তি আমার নাই, তবে বল দেখি এই মহাসঙ্কটসঙ্কুল লোকে কোথায় কী-ই বা আমার শরণ আছে?

তুচ্ছং ন নেত্রাদ্ গলিতাশ্রুবারি
তুচ্ছং ভবেচ্চেৎ তথামন্যমানম্।
তুচ্ছা ন চার্ত্তি র্হৃন্‌মন্থনী বা
তুচ্ছা ভবেচ্চেন্ মথ্‌নাতি শর্ম্ম (ভাবম্)॥ ১০০॥
প্রশান্তাম্বুরাশৌ বড়বানলোঽপি
ক্ষমো ন বোঢ়ুং তৃণং মাতরিশ্বা।
দ্বারে চ ভিক্ষুর্জগতাং স নাথঃ
কিমাশ্চর্য্যমেভ্যঃ পরং বদাস্তি॥ ১০১॥
রাকেন্দুতুল্যো নয়নাশ্রুবিন্দু
রানন্দসিন্ধোরুল্লাসকারী।
তুভ্যং তৃণায় সদা হৈমবত্যাঃ
কারুণ্যশৌর্য্যংসুরগর্ব্বহারি॥ ১০২॥

তোমার নেত্র হইতে বিগলিত ব্যথার বা পুলকের অশ্রুবারি সেটি অবশ্য তুচ্ছ নয়। কিন্তু সেটি তুচ্ছই হয় যদি তুমি নিজে সেটিকে তাই-ই মনে কর (তথামন্যমানম্) অর্থাৎ তোমার যেটি ক্ষণিকের ব্যথা ও পুলকের অশ্রুবিন্দু তার সাথে দরদের যোগ রাখিয়া রহিয়াছে এমন এক মহাসিন্ধু যেটি একাধারে অসীম ব্যথা এবং পুলক।

কাজেই এই সমদরদী মহানের কথাটি যদি মনে রাখিতে পার তা হইলে তোমার নয়ন হইতে যে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল সেটি কখনও মিথ্যা নয়, অকিঞ্চিৎকর নয়। আবার তোমার সারা হৃদয়টি মথিত করিয়া যে আর্তি দেখা দিতেছে সেটি অবশ্য তুচ্ছ নয়; সেটি তুচ্ছ হয় যদি সে তার মর্ম বা ভাবটিকেই মথিত নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে (মথ্নাতি শর্ম্ম)। অর্থাৎ তোমার হৃদয়ের এই যে আর্তি তার নিগূঢ় মূলটিই বা কোথায় এবং তার সত্যকার পরিণতিটিই বা কিসে এটি মনে রাখিলে তোমার আর্তি আর তুচ্ছ হয় না।

মহাসাগরের যে প্রশান্ত জলরাশি তারও বুকের মাঝারে বাড়বাগ্নি লুকাইয়া থাকে; এই বিশ্বরূপ মহামহীরুহটিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ যে বায়ু তিনিও শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সেই যক্ষের নির্দেশে সামান্য একটি তৃণকেও বহন করিতে সমর্থ হইলেন না দেখি (ক্ষমোন বোঢ়ুং)। পুনশ্চ যিনি জগতের নাথ ও স্বামী তিনিও দেখি দ্বারে আসিয়া ভিক্ষুকের সাজে দাড়ান (যেমন বামনরূপে বলির দ্বারে)। এখন বল দেখি এসবের চাইতে অধিক আশ্চর্য আর কি আছে বা হইতে পারে? এই সৃষ্টির মূলে যে ভাগবতী সত্তা, সেটি যে অনন্ত আনন্দ এবং শান্তির পরমতার ভূমি সে পক্ষে তো কোনও সন্দেহ নাই কিন্তু মহাসাগরের মত সেই অসীম ও গভীর প্রশান্তির মাঝখানে বিশ্বের প্রতিটি ব্যথা বেদনার যে চেতনা তার প্রতি দরদে, করুণায় ভরা কোনও বাড়বানল কি চিরসজাগ হইয়া বিদ্যমান নাই? জগতের যিনি মাতা ও ধাত্রী ও পালয়িত্রী তিনি কি তার আপন আনন্দ ও প্রশান্তির মাঝখানে এতটাই বিভোর যে তিনি তার আপন বিশ্বের অনন্ত দুঃখরাশির পানে বিমুখ, উদাসীন! আবার যিনি নিখিল জগতের স্বামী তিনি কি ঐ একবার বলির দ্বারে ভিখারীর বেশে আসিয়া তার অভিনয়ের পালাটি শেষ করিয়া গিয়াছেন? তিনি কি প্রতিটি জীবের হৃদয়-দুয়ারের কাছে শাশ্বত ভিখারীর বেশে দাঁড়াইয়া নাই? তিনি কি ঐ একটি বার মাত্র মদোদ্ধত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের দম্ভচূর্ণ করার নিমিত্ত তুচ্ছতা ও লাঘবের একান্ত প্রতীক যে তৃণ সেই তৃণটি দেবতাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন? আনন্দসিন্ধুরূপে তিনি তো স্ব-মহিমায় স্বলসিত রহিয়াছেনই তথাপি সেই স্বলসিত আনন্দরাশি নিজেকে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত না দেখিলে তার সাধটি যেন মেটে না। তাই তিনি যেন অপেক্ষায় রহেন—কখন তোমার নেত্র হইতে একটি বিন্দু অশ্রু তাঁর

পানে গড়াইয়া পড়িবে আর সেটি পূর্ণিমার শশীর মত তাঁর চিরশান্ত সমাহিত চিদাকাশে উদিত হইয়া তাঁকে তোমার পানে আকৃষ্ট ও উদ্বেল করিয়া লইবে। আর তুমি যদি আপন অহঙ্কার ও দম্ভ একান্তভাবে বিসর্জন দিয়া আপনাকে একটি তৃণের মতই তাঁর দৃষ্টি এবং প্রসাদের নিম্নে ফেলিয়া রাখ তবে নিশ্চয় জানিও যে তোমার একান্ত শরণাগত ঐ তৃণরূপ সত্তাটির পিছনে রহিয়াছে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সেই উমা হৈমবতীর অসীম অমোঘ করুণাশৌর্য যেটিকে জানিতে ও বুঝিতে না পারিয়া অগ্নি-বায়ু-প্রমুখ দেবতাদের গর্ব স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সে গর্ব আবার লজ্জায় ধুলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

পরিশিষ্ট (ক)

নাদানুসন্ধান সম্বন্ধে জপসূত্রকারের এই ষোলটি কারিকা প্রয়োজনীয় বোধে সানুবাদ পরিশিষ্টে দেওয়া যাইতেছে।

আদিমচ্চ যদুৎপাদ্যং বিকার্য্যং ব্যভিচারি চ।
ব্যপদেশবিকল্পার্হ মপায়ীনি হি তানি ষট্॥১
ভূরাদ্যে রন্তবত্ত্বঞ্চ জন্যত্বঞ্চ তদাদিভিঃ।
বিকারং ব্যভিচারঞ্চ ভর্গ আদি ত্রিভিঃ পদৈঃ॥২
ব্যপদেশ্যং ধিযোয়োনো বৈকল্পিকং প্রচোদয়াৎ।
যণ্মাত্রঃ প্রণবঃ ষড়্বৈ গায়ত্রী দুদুহেঽমৃতম্॥৩-৪
মূলস্পন্দস্বরূপা যা ধ্বনিঃ সুরধুনী ধ্রুবা।
তস্যামুপরি তায়ন্তে বীচয়ো ইব যা গিরঃ॥৫
বীতি বিয়দি শব্দোযোঽক্ষরোঽখরোঽজরোঽমরঃ।
মাত্রাস্পর্শাৎ ক্ষরন্ খে স বিখরোঽভূদ্রুবন্ রুদন্॥৬
আমূর্দ্ধকণ্ঠ ঘাতোত্থা স্থূলা সূক্ষ্মাতি বৈখরী।
নাদাদ্ বহিরক্ষা সা বিষমা বীচিসন্ততিঃ।
ধ্রুবাক্ষাভিন্নপশ্যন্তী নিরক্ষৈব পরা মতা॥৭
মেয়স্পর্শান্ জয়েজ্জাপান্ মানস্পর্শাংশ্চ ধারণাৎ।
মাতৃস্পর্শান জয়েদ্ ধ্যানা দস্পশঞ্চ সমাধিনা॥৮
বিখরাপ্যায়নং কুর্য্যাদ্ জপাদোং জাতবেদসে।
হংসবত্যা স্ততো মধ্যাপ্যায়নং হ্যমৃতম্ বৃহৎ॥৯
জ্যোতীরসে পশ্যন্ত্যা ঋগ্ ভ্যামাপ্যায়নং কুরু।
সর্ব্বস্যাপ্যায়নং নাম স্বয়মাপ্যায়নং পরা॥১০

উপরি স্পৃগন্ত্য চাধঃ স্বরাদ্যো
রতং বিপ্রতীকং তয়ো রুকারাৎ।
চেছিদ্যমানা সকৃচ্ছিরো মুদঃ
পীযূষধারাং পেপীয়মানা
(হৃখিলো নাদধারাং পেপীয়মানা) ॥১১

অর্কেন্দুশক্তী দ্বে পায়য়ন্তী স্বয়ংপিবন্তী মধ্যমাং সুষুম্না।
মুক্তাং ত্রিবেণী মপি যোজয়ন্তী পশ্যন্তীপারে পরা তুরীয়া ॥১২
নীচৈর্মনোভূ রুপরি বিকল্পনা তন্মৈথুনাচ্চেৎ চ্যুতমস্তি চেতঃ।
স্বয়ং রুক্ষরেতোঽচ্যুতং পিবন্তী কামকলা দ্বে পরা পায়য়ন্তী ॥ ১৩ ॥
প্রণবে চ বীজে গায়ন্ মনৌ বা মাত্রাহি সন্তি পিহিতাশ্চতুর্দ্দশ।
গর্ভেগিরাং নাদ কলে চ বিন্দু র্দেদীপ্যতে তে চিতি দীপমালা ॥ ১৪ ॥
নাদস্তথা বিন্দু কলে চ কাল আকাশ শূন্যে জ্যোতিঃসদেকম্।
আলম্বনেম্বেম্বনপায় ধাম্নঃ প্রত্যঙ্ নাদোহি সুগমঃ সুভদ্রঃ ॥ ১৫ ॥

স্পন্দঃ পরব্যোম্নি রেতোঽখিলস্য
সবিতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ।
প্রাণেষু ভর্ত্তা রসয়িতা রসেষু
ব্রহ্মাসি প্রত্যঙ্ নাদ প্রসীদ ॥১৬॥

অনুবাদ

অনেক বস্তু বা ভাব আসিয়া আবার চলিয়া যায়, স্থায়ী হয় না। এরা আগমাপায়ী। যেটি আসিল (আগত) সেটি চলিয়া যাইবেই (অপায়ী হইবে) যদি তাতে এই ছয়টি ধর্ম বিদ্যমান থাকে—যদি তার সত্য সত্যই একটা আদি বা আরম্ভ থাকে (আদি মৎ), যদি সেটি উৎপাদ্য বা জন্য হয়, যদি সেটির বিকার সম্ভব হয় (বিকার্য্য), যদি সেটির ব্যভিচার দেখা গিয়া থাকে (ব্যভিচারী), যদি সেটি কেবলমাত্র প্রতীক, সঙ্কেত বা চিহ্নমাত্র হয় (ব্যপদেশ্য) এবং যদি সেটির সম্বন্ধে বিকল্প বা সংশয়ের অবকাশ থাকে ॥ ১ ॥

প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের যে ভূরাদি ব্যাহৃতি তদ্দ্বারা আদিমত্ত্বকে পরিহার করিবে, কেননা, ব্যাহৃতিদ্বারা আদিমত্ত্ব এবং অন্তবত্ত্ব এ দুয়েরই পরিহার ঘটিয়া থাকে। তারপর "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" এই তিনটি পদের দ্বারা উৎপন্ন হওয়া এই ভাবটিকে পরিহার করিবে। "ভর্গদেবস্য ধীমহি" এই তিনের দ্বারা বিকার ও ব্যভিচার এ দুয়ের পরিহার ঘটাইবে। তদনন্তর যেটি ব্যপদিষ্ট বা অতাদৃশ সেটিকে তাদৃশ বা যথার্থ করিবে "ধিয়োয়োনঃ" এই পদের দ্বারা। শেষকালে বিকল্প বা সংশয় নিরসনের নিমিত্ত "প্রচোদয়াৎ" এই পদের স্মরণ লইবে। এ স্থলে 'পদ' বলিতে পদ এবং পদের ভাব এ দুই-ই বুঝিতে হইবে। প্রণব একাই তাঁর ছয়টি মাত্রা দ্বারা (অ, উ, ম, নাদ, বিন্দু, কলা) ঐ ছয় প্রকারের অযথার্থ অনিত্যকে পরিহার করিতে সমর্থ জানিবে। বেদমাতা গায়ত্রী অনিত্য নশ্বরের ভয়ে ভীত অমরদিগকে এই ভাবেই আবার অমৃত মিলাইয়া দিয়াছিলেন।।২-৩।।

আমরা যে সব বাক্ উচ্চারণ করি (যা গিরঃ) সেগুলি স্পন্দনরূপা এবং এই বিবিধ বিচিত্র স্পন্দনগুলি তরঙ্গের মত উঠিয়া খেলিয়া যাইতেছে অবশ্যই কোন এক আধারে। সে আধার হইল ব্রহ্মাকাশে জ্ঞানময় তপরূপ যে মূল স্পন্দ, তাহাই। এই মূল স্পন্দ নিজেকে নাদ বা ধ্বনি রূপে অভিব্যক্ত করিতেছে। বলা বাহুল্য এর ধ্বনি সাধারণ শ্রুত ধ্বনি নয়। এ ধ্বনি-রূপা সুরধুনী ধ্রুবা বা সনাতনী। "তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং" এইটি হইল—এই ধ্বনির পরা ভাব; ব্রহ্মলোকে যে কুণ্ঠাহীন দিব্য অনুভূতি সেইটি হইল পশ্যন্তীভাব; হরজটাজালাভ্যন্তরে অবগুণ্ঠিত হইলে হয় মধ্যমা; শেষে ভগীরথের শঙ্খনিনাদে গোমুখী নিঃসৃতা হইলে হয় বৈখরী। আমাদের সকল বাক্ অথবা শব্দই এই ধ্রুব ধারার বক্ষে বীচিবৎ উত্থিত হইয়া আবার লীন হইয়া যাইতেছে। অতএব সাধক! মূল স্পন্দরূপা সেই "ধ্বনি-সুরধুনী-ধ্রুবার" সন্ধান করিতে যত্ন কর॥৪॥

ব্রহ্মাকাশে (বিয়দি) মূল স্পন্দরূপ যে শব্দ সেটি স্বভাবতঃ অক্ষর, অখর, অজর এবং অমর। বিবিধ মাত্রা স্পর্শ বশতঃ সেই মূলশব্দ যেন ক্ষরণশীল হয়; তখন মনে হয় যেন সে শব্দ আকাশে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। অর্থাৎ "বি" কিনা "বিয়দি", যে শব্দ অখর সেটি মাত্রা স্পর্শ বশতঃ আকাশে খর হইয়া

ব্যক্ত হইতেছে। (খে স ক্ষরোঽভূদ্রুবন্ রুদন্)। এইরূপে যেটি মহামৌন সেটি বিশ্ব কলরব (cosmic disturbance) রূপে মুখর হইতেছে॥ ৫॥

মাত্রা স্পর্শ যে কি তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। মূর্দ্ধা থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত যে যন্ত্র তাতে অভিঘাতের ফলে বৈখরী বাক্ প্রকট হইয়া থাকে। বাচিক উপাংশু জপে বৈখরী স্থূলা, মানসজপে সূক্ষ্মা অর্থাৎ মানস জপেও যন্ত্রের অভিঘাত এবং তজ্জন্য স্পন্দন সূক্ষ্মভাবে থাকে। সচরাচর বৈখরীর স্পন্দন সুষম নয় কিন্তু বিষম। এই বিষম তরঙ্গগুচ্ছ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। এই তরঙ্গগুচ্ছের যেটি অক্ষ (Axis) সেটি সচরাচর নাদধ্বনির বাহিরেই থাকে (নাদাৎ বহিরক্ষা সা)।।৬।।

পূর্বোক্ত বৈখরী সাধারণতঃ ইড়া ও পিঙ্গলা এ দুয়ের সাহায্যেই চলিতেছে। কিন্তু নাদের যেটি আপন অক্ষবর্ত্ম, সেই সুষুম্নায় বৈখরীর প্রবেশ সচরাচর ঘটে না। কিন্তু নাদের এই আপন বর্ত্মের মধ্যে গমন করিতে যে বাক্ সমর্থা হয়, সে বাক্ হইল মধ্যমা (মধ্যমেতি)। আবার দেখ প্রণবের শেষ বর্ণ যে ম কার সেখানে যাইয়া বৈখরী বাক্ স্তব্ধ হইয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু অনাহত ধ্বনিরূপ যে নাদ তার মধ্যে "ম"কে লইয়া যায় বলিয়া মধ্যমাকে 'মধ্যমা' বলা হয়। মধ্যমা বাকের যেটি অক্ষ সেটি নাদে প্রবিষ্ট হইলেও নাদের যেটি ধ্রুব অক্ষ তার সঙ্গে একান্ত মিলিয়া যায় না। যখন বাক্ সেই ধ্রুব অক্ষ একান্তভাবে আশ্রয় করে তখন সেটি হয় পশ্যন্তী, আর যখন কোনও অক্ষই আর তার থাকে না, তখন সেটি হয় পরা (নিরক্ষা চ পরা মতা)। সুতরাং অক্ষের দিক দিয়া বিচার করিলে চারি প্রকার বাকে আমরা চারি প্রকারের সংস্থা দেখিতে পাই—বহিরক্ষা, অন্তরক্ষা, ধ্রুবাক্ষা এবং নিরক্ষা॥ ৭॥ ('অক্ষ' বলিতে ইন্দ্রিয় বা করণও বুঝায়)।

মাত্রা স্পর্শের কথা বলা হইতেছে, কিন্তু মাত্রাকে তিনরূপে জানিতে হইবে—মেয়, মান ও মাতা। মেয় যে সকল বিষয় রূপরসাদি তাদের যেটি স্পর্শ (শীতোষ্ণ সুখদুঃখ ইত্যাদি) সেটিকে জয় করার নিমিত্ত প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার জপাভ্যাস করিবে (বৈখরী)। মান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি করণ নিমিত্ত যে স্পর্শ (বাধা, সঙ্কোচ, ইত্যাদি) সেটিকে জয় করার নিমিত্ত ধারণা অভ্যাস করিবে (নাদানুসন্ধানরূপ

মধ্যমায় স্থিতি)। মাতা অর্থাৎ আমির যেগুলি সংস্কার সংকল্প বিকল্প আদি সেগুলির স্পর্শ জয় করার জন্য আন্তর দিব্য অনুভূতিরূপ যে ধ্যান সেই ধ্যানের অভ্যাস করিবে আর এই ত্রিবিধ স্পর্শেরই পারগামী হইতে গেলে পরা বাক্ এবং শান্ত আত্মায় সমাধির সাধন করিবে॥ ৮॥

অতঃপর "আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি" এই শান্তিপাঠ মন্ত্রের যে "আপ্যায়ন" সেটি কি ভাবে সাধিতে হইবে তা বলা হইতেছে। যেটি "বিখর" কিনা বিশেষ ও বিবিধ ভাবে "খর", সেটির আপ্যায়নের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ "ওঁ জাতবেদ সে. .." ইত্যাদি মন্ত্র জপধ্যান করিবে। কেননা, ঐ মন্ত্রে অগ্নি এবং সোম ইড়া ও পিঙ্গালা, প্রাণ ও অপান ইত্যাদি সকল বিষম দ্বন্দ্বের সুষমতা সম্পাদনরূপ যে আপ্যায়ন সেটি বিহিত হইয়াছে। তারপর, হংসবতী ঋকে স্থূল সূক্ষ্ম অনু বিরাট সর্বত্র ওতঃপ্রোত যে "ঋতম্ বৃহৎ", সেটির জপধ্যানের দ্বারা মধ্যমার আপ্যায়ন সাধন করিবে, "হংসঃ সোঽহং স্বাহা" এই মন্ত্র বিশেষভাবে সমাশ্রয়ণীয়। তারপর পশ্যন্তীর আপ্যায়ন সম্মিলিত গায়ত্রী এবং মধুমতী এই দুই ঋকের যে অভিন্ন জ্যোতীরস তাহা দ্বারা নিষ্পন্ন হউক। ওঙ্কার অথবা ভগবানের কোনও নামের দ্বারা সর্ববিধ আপ্যায়নই সাধিত হইয়া থাকে জানিও (সর্বস্যাপ্যায়নং নাম)। আর যেটি পরাবাক্ সেটি স্বয়ং আপ্যায়ন স্বরূপ, সুতরাং অপর কিছু দ্বারা সেটির আপ্যায়নের অপেক্ষা নাই (স্বয়ং আপ্যায়নং পরা)॥ ৯—১০॥

অতঃপর সর্বত্র নিগূঢ় যে ছিন্নমস্তাতত্ত্ব সেটি নাদানুসন্ধানে কিভাবে উদাহৃত তাহা দেখাইবার নিমিত্ত কয়েকটি কারিকা অনূদিত হইতেছে:—উচ্চারিত যে 'ম'কার তার অন্তে বা পরে রহিয়াছে 'অ'কার; এই অকার কে অধঃ কিনা আগে লইয়া যাও আর তার উপরি হসন্ত ম কে স্থাপন কর (অম্)। স্পৃক্ কিনা স্পর্শ বর্ণের অন্তিম বর্ণ যে মকার আর স্বরের আদিবর্ণ যে 'অ'কার এ দুয়ের বিপরীত করণ হইল এইপ্রকারে। এইবার এই স্বরাদ্য (অকার) এবং স্পৃগন্তা (ম-কার) এ দুয়ের মাঝখানে উকার কে বসাও। এই উঁকারের দ্বারা অকার ও মকার এই দুই বর্ণের যে বিপরীত রমণ সংঘটিত হইল তদ্বারা অবশ্যই এক উল্লাসের সূচনা হইয়া থাকে। কিন্তু এই উল্লাস খণ্ডিত, চিরন্তন নয়। এই বারেকের উল্লাসকে ছিন্ন করিয়া তার মধ্য হইতে অখণ্ড উল্লাস রূপ যে পীযুষধারা (অখিল নাদ ধারা)

সেটিকে নিরন্তর পান করাইবেন যিনি তিনি হইলেন মহাবিদ্যা ছিন্নমস্তা। ইনি বারেকের যে উল্লাস তাকে একান্তভাবে ছেদন করিয়া (চেছিদ্যমানা সকৃচ্ছিরোমুদঃ) তার অভ্যন্তরে নিরন্তর বহমানা অখণ্ড নাদরূপিণী যে পীযূষধারা সেটিকে নিরন্তর পান করিয়া থাকেন (পীযূষধারাং পেপীয়মানা)॥১১॥

অখণ্ড নাদরূপ এই পীযূষধারা আবার ত্রিধা বিভক্ত হইয়া ত্রিধারায় পীত হইতেছে দেখিতেছি। মহাবিদ্যা স্বয়ং সুষুম্নারূপে যেটি মধ্যগা ধারা সেটিকে পান পরিতেছেন। আর ইড়া ও পিঙ্গালা (চন্দ্র ও সূর্য নাড়ী) এ দুয়ের যে দ্বিবিধা শক্তি তাদিগকে অপর দুটি ধারা পান করাইতেছেন। তার ফলে সাধারণ বৈখরী জপ ধ্যানও সুধারসে অভিষিঞ্চিত হইয়া যায়। আবার এই যে মুক্ত ত্রিবেণী ধারা তাকে আপন শক্তিতে পুনরায় সংযুক্ত করিয়া (মুক্তাং ত্রিবেণীমপি যোজয়ন্তী) তিনি পশ্যন্তীর ওপারে যে তুরীয়া পরাবাক্ রহিয়াছে তাতে যাইয়া বিশ্রান্তি লাভ করে॥১২॥

বাকের দিক্ থেকে দেখিলে এইবার মনের দিক থেকেও দেখ। মনের দ্বিবিধ বৃত্তি—সংকল্প (কাম) এবং বিকল্প (বিকল্পনা)। এই কামকে নীচে রাখিয়া (নীচৈর্মনোভুঃ) আর বিকল্পনারূপ রতিকে উপরে লইয়া তুমি জপধ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। এস্থলে কাম হইল তোমার Aspiration আর রতি হইল তোমার Devotion। এ দুয়ের রমণের ফলে তোমার এই সাধারণ মন (চেতঃ) যদি নিজেই চ্যুত কিনা গলিত হইয়া যায় তবে তাতে আশ্বস্ত হইও, কেননা এই মনের চ্যুতি বাঞ্ছনীয়। এই মনের চ্যুতি ঘটিলে এক অচ্যুত হিরণ্য রেতসের ধারা নিঃসৃত হইয়া থাকে যেটিকে মহাবিদ্যা পরমা কামকলারূপে নিজেই পান করিতে থাকেন (পিবন্তী) এবং সাধক সন্তানের যে বাক্ ও বুদ্ধি সে দুটিকেও সে ধারা পান করাইয়া থাকেন। (দ্বে পায়য়ন্তী)॥১৩॥

নিত্য স্থিতি ও চির বিশ্রান্তির স্থান যেটি সেটিকে বলে অনপায়ধাম। এই অনপায়ধাম লাভ করার নিমিত্ত সাধককে তার জপধ্যানে কোন না কোন সূত্র অবলম্বন করিতে হয়। সেটিকে বলে আলম্বন। আলম্বনকে মোটামুটি আট প্রকারে দেখা যাইতে পারে:—নাদ, নাদের পরম সূক্ষ্মভাব যে বিন্দু সেটি, কলাশক্তি যার দ্বারা সমস্ত কিছু আকলিত হইতেছে, আক্রমিক ধারারূপ কাল, নির্লেপ আকাশ,

শূন্য, জ্যোতিঃ (যার শেষ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ) এবং সবকিছুতে অনুস্যূত শুদ্ধ যে সৎ তাই (সদেকম্)। ভাব ও নিষ্ঠা সহকারে জপধ্যানের ফলে যখন অনাহত ধ্বনিরূপে নাদ সাক্ষাৎ আবির্ভূত হয় (প্রত্যঙ্ নাদঃ), তখন সেই নাদই ঐ সকল আলম্বনের মধ্যে সব চাইতে বেশী সুগম এবং সুমঙ্গল হয় জানিবে। অন্য আলম্বনগুলি ঠিকভাবে ও নিয়ত মেলানোই মুস্কিল। কিন্তু নাদ একবার উপলব্ধিতে আসিলে সে আমার সমগ্র সত্তাকে যেন ধরিয়াই রাখে, বিচ্ছিন্ন ও বহুমুখী হইতে দেয় না। এই নিমিত্ত নাদানুসন্ধান অধোমুখী ধারাকে ঊর্দ্ধমুখী করার পক্ষে প্রকৃষ্ট সাধন বলিয়া জানিবে। নাদকে আশ্রয় করিলে তার মধ্য হইতেই জ্যোতি প্রভৃতি অপরাপর আলম্বন যথাসময়েই মিলিয়া যায়॥ ১৪ ॥

শেষকালে জপ ও অনুধ্যানকে যে কিভাবে এক অপূর্ব আন্তর দীপমালায় পরমের আরতিরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তা বলা হইতেছে। প্রণব অথবা কোন বীজমন্ত্র কোন নাম অথবা গায়ত্রী—এ সকলেরই মধ্যে নিগূঢ় অথবা প্রকটভাবে চতুর্দশ মাত্রা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ যে গায়ত্রীমন্ত্র তাতে এই চতুর্দশ মাত্রা প্রকটভাবে বিদ্যমান। প্রণবাদিতে এই চতুর্দশ মাত্রা নিগূঢ়ভাবে যে রহিয়াছে (সপ্তব্যাহৃতি এবং প্রত্যেক ব্যাহৃতির দ্বিবিধা গতি ইত্যাদি ভাবে) সে পক্ষেও যাঁরা অভিজ্ঞ সাধক তাঁদের সংশয় নেই। এখন এক একটি মাত্রাকে এক একটি দীপের মতন আন্তর জ্যোতিতে জ্বালাইয়া লও। দীপের যেটি আধার সেটি হইল বাক্, কলা বা শক্তি হইল দীপের স্নেহ স্থানীয়, নাদ হইল তার বর্তি, এবং সেই নাদের যেটি সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ভাব সেটি হইল সেই বর্তির মুখ। নাদ প্রকট হইয়া যদি না তার সূক্ষ্মতা ও শুদ্ধির একটা কাষ্ঠায় যাইয়া উপনীত হয়, তবে সে নাদ আপনাকে জ্যোতীরূপে বিবর্তিত করিবে না জানিও। এই যে চতুর্দশ দীপের অপরূপ জ্যোতির্মালা তুমি জ্বালাইলে, সেটি জ্বলিল কোথায়? এবং তাদ্বারা আরতিই বা করিলে কার? তোমার আপন ঊর্দ্ধ চেতনার মাঝে এ দীপ জ্বলিয়াছে এবং পরা যে চিচ্ছক্তি, তাঁরই আরতি এই চতুর্দশ দীপমালাদ্বারা হইল জানিও (দেদীপ্যতে তে চিতি দীপমালা)। এই 'চৌদ্দ প্রদীপ' না জ্বলিলে সাধকের ভূতের ভয় সত্য সত্যই তো কাটে না।।১৫।।

পরব্যোমে অথবা ব্রহ্মাকাশে পরাবাক্‌রূপ যে মূলস্পন্দ তা তুমিই, অখিলের রেতঃ কিনা বীজ এবং ওজঃ শক্তি, তাও তুমি, সেই পরম দেবতা সবিতার যে বরেণ্য ভর্গঃ সেটিও তুমি, তুমিই নিখিল প্রাণের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া সে সকলের মুখ্য এবং ভর্তা হইয়া রহিয়াছ, তুমিই সকল রসের মধ্যে তাদের রসয়িতারূপে বিদ্যমান; সুতরাং সকল কিছুতে অনুস্যূত অথচ প্রকট রূপে তুমিই ব্রহ্ম; হে নাদ তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও!॥১৬॥

পরিশিষ্ট (খ)

হংস

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ.

মানুষ যখন নিজের ভাবে থাকে, তখনই সুখ পায়। এ সময়ে তার জীবন-স্রোত সমান হয়ে চলে, কোনো রকম বাধা পায় না—স্বচ্ছন্দভাবে, 'সহজ'ভাবে বহিতে থাকে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বেদ বলিয়াছেন—"সমানং সাম ভবতি—দেবলোকো বৈ সাম"। জীবনের এই 'সম' ভাব যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ স্বস্থ ভাব আসিতে পারে না। জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের এই 'সমান স্পন্দ' ভাব লাভ করাই হার্দ উদ্দেশ্যে। 'চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্'—মহাভারতের এই নীতি সকলেরই অনুকরণীয়।

কিন্তু এই সহজ-ভাব লাভ করিতে মানুষের আয়াস প্রয়োজন। এই সহজ-ভাব আমার মধ্যে সর্বসময়েই বর্তমান, অথচ তাহা আমার জ্ঞানে আসে না। প্রাণবায়ু সততই একবার একদিকে, পরে অন্য দিকে প্রবাহিত হইতেছে ও এইভাবে এক 'সহজ-জপ' সৃষ্টি করিতেছে। প্রাণবায়ু এটি করিবে, কারণ, 'প্রাণা বৈ সজাতা।' আমি না করিলেও এই 'দোলন' বা স্পন্দন আপনি আপনি জপ সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া ইহার নাম 'অজপা। কিন্তু এই 'অজপা' অবোধ-পূর্বক হইতেছে, তাহা 'বোধ'সহ করা প্রয়োজন, ইহাই প্রাথমিক 'অজপা' সাধন।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—আমাকে আনিতে হইবে 'শান্ত' মন, কিন্তু প্রাণবায়ুর উপর এত জোর দেওয়া হইতেছে কেন? দর্শনের দিক হইতে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। আমাদের দেহ ও মন একেবারে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন পদার্থ নহে—ইহাদের মধ্যে পরস্পরের উপকার্য্য-উপকারক ভাব, এক 'অবিনা ভাব' সম্পর্ক বর্তমান। ব্যবহারিক অনুভূতিতে এটি বুঝা যাইবে। যখন কোনো বিষয় ভাবিবার চেষ্টা করি, তখন মনোযোগ দিতে হয়। এই মনোযোগ শরীরে ইচ্ছাশক্তির স্বাভিমত প্রদেশে সঞ্চালন ও এই সঞ্চালন

ব্যাপার 'ক্রিয়া' ছাড়া কিছুই নহে। এই ক্রিয়া 'ভাব' স্পর্শ করে ও ক্রিয়া স্থূল বা সূক্ষ্ম ভাবে হউক্ 'শব্দ' উৎপন্ন করিবে। ক্রিয়া হইতেছে অথচ শব্দ নাই—ইহা অন্ততঃ প্রত্যক্ষীকৃত ব্যাপারে দৃষ্ট হয় না। অতি সূক্ষ্ম, Atom-proton কৃত Waves of Probability-তে যে 'শব্দ' নাই তাহা কোনো বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, ব্যবহারিকভাবে ভাব-ক্রিয়া-শব্দ এই ত্রিতয় সমাবেশ লক্ষিত হয়। ইহার একটিকে ধরিলে অপরগুলি আসিবে। ধ্যাতব্য বিষয়টি 'বুঝিয়াছি' এই assentই নীরব ওঁঙ্কার এবং এই ওঁঙ্কারাত্মক 'শব্দ'ই আলোচ্যমান ব্যাপারটির সার নিষ্কর্ষ। অপরোক্ষ অনুভূতিতে লব্ধ এই বিষয়টি এতই স্বতঃসিদ্ধ যে বোধহয় সকলপ্রকার শাস্ত্রই এটি মানিয়া লইয়াছে।

এই তত্ত্বটি বেদে পরিস্ফুট হইয়াছে এইভাবে—'প্রজাপতি হি বাক্'। এখানে প্রজাপতি অর্থ জগৎকারণ পরমাত্মা, তাঁহা হইতেই যজ্ঞ ও জাগতিক ব্যবহারের সমস্ত ব্যাপারই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই প্রাথমিক বাক্ 'তা-তা-ততমম্' (ঐতরেয় আরণ্যক) মনের সহিত সংযোজিত হইলে হয় সরস্বতী। ইহা প্রাণ-অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইলেই 'ক্ষেত্র' বা শরীরের স্বামী বা অধিপতির স্থান গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের নিম্নলিখিত উক্তি সায়নকৃত ভাষ্যের সহিত একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

'যো দেবো দেবেষু বিভুরন্তঃ। আবৃদৃদাৎ ক্ষেত্রিয়ধ্বগৎ অধ্বগন্ত্ব বৃষা। তমিৎ প্রাণং মনসোপশিক্ষত। অগ্রং দেবানাম্ ইদমস্তু নো হবিঃ'।

'দীব্যন্তি ইতি দেবাঃ প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রাদয়ঃ। তেষু মধ্যে যো মুখ্যঃ দেবঃ প্রাণঃ শ্বাসকর্ত্তা সো অয়ম্ অন্তরাবৃদাৎ পুনঃ পুনঃ বহিশ্চ আবর্ত্তমানত্বাৎ বিভুঃ কৃৎস্নদেহব্যাপী, ক্ষেত্রী ক্ষেত্রস্য স্বামী বৃষা শ্রেষ্ঠঃ। তস্য দৃষ্টান্তঃ—অধ্বগং যথা লোকে অধ্বগঃ নাঃ আলস্যগমনং করোতি ইত্যেবং প্রাণঃ প্রতিক্ষণং উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসং করোতি। তমিৎ তমেব প্রাণং মনসা উপশিক্ষত ভক্তিপুরঃসরং উপচরত। স প্রাণো দেবানাম্ মধ্যে অগ্রং প্রথমং নো অস্মৎ ইদং হবিরত্তু ভক্ষয়তু'। (সায়ন)

স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলেও এখানে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসঘটিত অজপার কথা বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শরীর স্বস্থ হয় ও মনের সহিত এক অবিরুদ্ধ সমতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মন ও দেহ একসুরে গাঁথা হইলে যে ভাব লব্ধ হয় তাহাই মানুষের 'সহজ'ভাব—কখনো কখনো এই ভাব আমাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে। শরীর সমভাব

প্রাপ্ত হইলেও মন অবান্তর চিন্তা দ্বারা এটি নষ্ট করিবার চেষ্টা করে—এজন্য ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—

রপৎ গন্ধর্বী অপ্যা চ যোষণা নদস্য নাদে পরিপাতু মে মনঃ।
ইষ্টস্য মধ্যে অদিতি র্নিধাত নঃ ভ্রাতা নঃ জ্যেষ্ঠ প্রথমং বিবোচতি॥

ঋষি যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতেছেন। এই আহুতিরূপ 'বারি' উত্তমলোকে আরূঢ় হইয়া শ্রদ্ধাদেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন। 'ভক্তি'রূপিণী এই দেবী উদ্গীথ বা তারস্বরে বেদধ্বনিতে পরিণত হইয়া ক্রমে মাধ্যমিক বা 'গন্ধর্ব্ব' ঘাটে আরূঢ় হন ও মাধ্যমিক স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা স্তোতৃবর্গের মন নির্মল করিয়া দেন। ইহাই 'নদস্য নাদে পরিপাতু মে মনঃ।' শব্দের শেষ ঝঙ্কার বা নাদের দ্বারা মন পরিষ্কৃত হয় ইহাই এখানে সূচিত হইতেছে।

এখানে শব্দের বিভিন্ন অভিব্যক্তি—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীর কথা উঠিলেও সংক্ষেপের জন্য সংযত করিব। তবে অ উ ম—প্রণবের এই সার্দ্ধ ত্রিমাত্রা নাদ প্রথমে শ্রুতিগোচর হয় বা 'বৈখরী'ভাব ধারণ করে, পরে 'ওঁ' এ ভ্রমরগুঞ্জনধ্বনি জন্মে (পশ্যন্তী), শেষে 'পরব্যোমে' মিশিয়া যায় ও 'পরা' ভাব ধারণ করে (বাক্যপদীয় দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক—বাক বা ছন্দে তাঁহাদের (ঋষির) এই হার্দ্দ ছিল যে তাঁহারা ব্রজ বা গোস্থান—তাঁহাদের স্বাভাবিক বিহারভূমিকে 'ছন্দ'ভাবে দেখিতেন—'ছন্দাংসি বৈ ব্রজো গোস্থানঃ।'

এখন প্রাণবায়ু বা বাক্‌ঘটিত কাজ কোন্ দেবতায় প্রত্যক্ষ হয়—এটি লইয়া বিচার করিব। বেদে প্রধানতঃ এই ভাবের দুই দেবতা পাওয়া যায়—মিত্রাবরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। একটি বা দুইটি বা বচন উদ্ধৃত করিব। সামবেদে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি আছে:

পাতং নো মিত্রা পায়ুভিঃ উত ত্রায়েথাং সুতত্রাং।
সাহ্যাং দস্যুং পায়ুভিঃ।

মূল পঞ্চম মণ্ডলে নিম্নলিখিত ঋক্‌টি আছে:—

পাতং নো রুদ্রা পায়ুভি উত ত্রায়েথাং সুতত্রাং।
তূর্য্যাম দস্যুন তনুভিঃ।

এই মন্ত্রে মিত্রাবরুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। এখানে মিত্রাবরুণ দেবতা হইলেও আমাদের শরীর সম্বন্ধেও ইহা ঘটিতে পারে। কারণ, আমাদের শরীর দেবতার সহিত ঘনসন্নিবিষ্ট। শরীর না হইলে আমাদের অন্তর্নিবিষ্ট মনোময় দেবভাব বুঝিতে পারি না। সুতরাং সামবেদোক্ত এই মন্ত্রটিতে আমরা শরীরের সঙ্গে মনোময়ভাব একসঙ্গে আছে—এই বলিয়া শারীরিক ভাব, প্রাণ-অপানবায়ুঘটিত দস্যুভাব নিরাকরণের নিমিত্ত প্রার্থনা পাইতেছি।

ইহ স্পষ্টই মণ্ডলে নিম্নলিখিত মন্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিতে পাই—

সোমস্য মিত্রবরুণা উত্ ইতা সুরে আদদে
তৎ আতুরস্য ভেষজম্।

'সুরে সূর্য্যে উদিতে সোমস্য সোমম্ আদদে স্বীকরোমি। তত্র হেতুমাহ—তৎ স্বীকাররূপং কর্ম আতুরস্য অস্মদাদে র্ভেষজম্ ঔষধম্ হিতকরম্ ইত্যর্থঃ'।

এখানে প্রাণ ও অপানকে সংযত করার কথা স্পষ্টই বলা হইতেছে। প্রাণ ও অপানবায়ুকে শরীর রক্ষার নিমিত্ত সংস্কার করার কথা বা ঠিক করার কথা বলা হইতেছে। এই সংস্কারটি কিরূপভাবে হয় তাহা পূর্বে উল্লিখিত 'যো দেবো দেবেষু' এই ব্রাহ্মণাংশের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাণ ও অপান—এই দুই বৃত্তির একীভাবের উপর আমরা এত জোর দিতেছি কেন? প্রথমে বেদই বলিয়া দিতেছেন এই প্রাণ ও অপান দিন ও রাত্রি। ইহারা দিবারাত্রের মত নিরন্তর শরীরকে একযোগে গ্রথিত করিতেছে। এই দিবারাত্র—ইহারা প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগে হইয়া থাকে। এই বিষয়ে বেদে মিত্রাবরুণের সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের একযোগ লক্ষিত হয়। প্রথমে হয়তো অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃতিত্ব এখানে বেশী ফুটিয়া উঠে; কারণ অশ্বিনীকুমারদ্বয় উষার কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকেন। পরে যখন এই জীবন-ঘটিত বা প্রাণবায়ুঘটিত ব্যাপারের উপর জোর পড়িল, তখন মিত্রাবরুণ এই দুইয়ের মধ্যে বেশী ফুটিয়া উঠেন। যেমন অধ্বগ দিনরাত চলাচল বায়ু একদিকে চলিতেছে ও শরীরের বাহিরের ভাবটা খুব জাগাইয়া দিতেছে, তেমনি প্রাণ ও অপানবায়ুর সংযোগাত্মক অবস্থাটাই এখানে অহ বা দিনরাত এই দুই ব্যাপারের সহিত একযোগ স্থাপন করিল। এইভাবে প্রাণ ও অপানের

এক মিলনযোগই দেহ-আত্মার একত্র সংযোগের স্থান হইয়া পড়িল। যতদূর বোধ হইতেছে—বেদে প্রাণ ও অপানের সহিত মিত্রাবরুণের এই সম্বন্ধ পাওয়া যায়। তন্ত্রে ইহার খুব বিস্তৃত পরিণতি হইয়াছে। তন্ত্রের কথা বলিলে এখানে আর কুলায় না। আমি কেবল "বিজ্ঞান-ভৈরবে"র—'ব্রজেৎ প্রাণো বিশেজ্জীব ইচ্ছয়া কুটিলাকৃতিঃ' এই টীকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব—

"পরা দেবী অন্তঃপ্রবেশদশায়াং 'হং'কারস্য মস্তকোর্দ্ধে 'অম্ ইত্যনুস্বারঃ' ইতি কৃতলক্ষণানুস্বাররূপা কেবলবিন্দুতয়া অজপ্যা। এবং বহিঃনিঃসরণদশায়াং সঃকারপার্শ্বে 'অঃ ইতি বিসর্জনীয়ঃ' ইতি কৃতলক্ষণবিসর্জনীয়াত্মিকা অকারং বিনা বিন্দুদ্বয়স্য অনুচ্চার্য্যত্বাৎ অজপ্যা।" "সোমঃ অপানো-হকারঃ সকলবেদ্যবর্গ-পোষকত্বাৎ, জ্ঞাতৃত্বাৎ সকারাত্মা সূর্য্যঃ হংকার-সঃকারয়োঃ অন্তংগতয়োঃ সতোঃ মধ্যতুটিঃ উদ্ধর্তব্যা—মাণিক্যমালিন্যাদিবৎ। সকারস্য অন্তং গমনং স্বহৃদয়ে বিসর্জনীয়ে হকারস্য চ স্বহৃদয়সম্পুটীকরণলক্ষণে অনুস্বারে যদা বিশ্রান্তিঃ তদা মধ্যমা তুটিঃ—বিভজ্যাবস্থানলক্ষণো যঃ কালখণ্ডঃ স উৎত্রুটিতব্যঃ, তদানীম্ 'অহং সঃ' ইতি বিমর্শ উৎপদ্যতে। হংসমন্ত্রাশ্লিষ্টং অহং সঃ, সোহহম্ ইতি মহামন্ত্রঃ, স এব বিমৃষ্টব্যঃ স্বাত্মপ্রত্যভিজ্ঞানোপায়ত্বাৎ।"

ভাষ্যকার অক্ষরের কুটিলাকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণকে এক পর্যায়ে স্থাপন করিয়া যেভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে সহজে বুঝা যায় তান্ত্রিক ব্যাপারটি কিরূপে বৈদিক পর্যায়কে বিশদ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় তান্ত্রিক পর্যায়টি কিরূপভাবে আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইয়াছে। বৈদিক মিত্রাবরুণ ঋষির দেহ লইয়া অত নাড়াচাড়া ব্যাপার স্পষ্ট বুঝা যায় না। ফল্গুভাবে থাকিলেও তন্ত্রে ইহা একটি সাধনের ক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের নিকট 'হংস'জপ একটি শরীরমনঘটিত ক্রিয়াবিশেষ। ইহা আমাদের কার্যকে শোধন করিয়া থাকে। একটি উদাহরণযোগে এবার শেষ করিব। কবীর সাহেব তাঁহার নিম্নলিখিত ঝুলনায় একটি বর্ণনায় বলিয়াছেন—

'দো সুর চলে সুভাবসেহি নাভিসে উল্‌টা আবতা হ্যায়্
ইংলা পিংলা তিন নাড়ী সুষ্মনসে ভোজন পাবতা হ্যায়্

পূরাক্রারে কুম্ভক্রারে রেচকক্রারে ঝৈ যাওতা হ্যায়্
কারণ 'কবীর' ক্যা ঝুলনাজী দয়া মূলপরে পচিতাবতা হ্যায়্।'

ইহা একটি নিছক তান্ত্রিক সাধন-ক্রিয়া। কবীর যাহা আরম্ভ করিয়াছেন বাংলার সাধনযন্ত্র তাহা দেখাইতেছেন। সাধক রামপ্রসাদ "মন কি কর ভবে আসি" এই গানে

'হবর্গ পুরকে হয় সবর্গ রেচকে হয়
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলি,

এই চরণে এই সাধনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং বৈদিক মিত্রাবরুণ আজকার তান্ত্রিক ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে।

ইংরাজিতে Coleridge কৃত ইংরাজী অভিমত দর্শন করিলে ইংরাজি ভাষায় এটি কিরূপ দাঁড়ায় তাহাও আমরা বুঝিব। কিন্তু এখানে বাহুল্য ভয়ে সে আলোচনা হইতে নিরস্ত হইলাম। সুতরাং বোঝা গেল 'হংস'-তত্ত্ব সর্বব্যাপী এবং বিশ্বের সর্ববিধ সাধনার মূল সূত্র।



শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী জন্ম ১৮৮০ সালের ২৭ আগস্ট, বর্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত চান্ডুলি গ্রামে। পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল প্রমথনাথ। নিজেই বিরজা হোম করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। শৈশবেই অধ্যাত্ম চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। যখন সন্ন্যাসী হলেন, তখন তিনি বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি মন্থন করে সারস্বত সাধনার শিখরে আসীন।

দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর সংস্কৃত কলেজের টোলবিভাগে ভরতি হন প্রাচ্যের দর্শনশাস্ত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক, ধর্ম ও বিজ্ঞানের যোগসূত্র অন্বেষণে সচেষ্ট ছিলেন। রিপন কলেজে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আহ্বানে অধ্যাপনার কাজ করেন কিছু দিন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্র ধরে স্বদেশী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। স্বদেশী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার ফলে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরাগভাজন হয়ে তাঁকে জেলেও যেতে হয়। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শুরু হয় তাঁর পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম জীবন। সর্বদা একান্ত নির্জনে ওঙ্কারের অনাহত নাদের ঝংকার শ্রবণে মগ্ন থাকতেন। শান্ত পরিবেশ খুঁজতে শেষ জীবনে গড়িয়ায় থিতু হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে ২০ অক্টোবর কলকাতায় এক ভক্তের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। তিনি লিখেছেন: *India: Her Cult and Education, Metaphysics of Physics, Science and Sadhana* (6Vols.), *বেদ ও বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অভিব্যক্তি* প্রভৃতি। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর লেখা বিশাল বই ছয় খণ্ডের *জপসূত্রম*।

জীবান্তর্যামিভেদাদ্ দ্বিবিধগতিরসৌ সংপ্রহাথৈকধারা।
গুহ্যান্তরাদিতশ্চ প্রতিলিখনবলাল্লভ্যতে যা দ্বিতীয়া।
সা স্পর্শাবেশবৃত্তিবিপরিসহচরী যা তৃতীয়া তুরীয়া
যৈষা পূর্বানুযোগাৎ প্রবহতি পরমেতৎসমেৎ পন্তগঙ্গাম॥

যীনো বীজানি ধৃত্বা প্রসরতি পয়সি প্রধরে গুরুসন্ধি
নর্মদাবাসীন ঈষ্টেই খিলমিহ কণ্ঠে সংজরীগৃহ্যতে চ।
উচ্চৈর্ধত্তে বরাহো ভুবমনিলনির্ধেইন্তি দেবানৃসিংহো
যোস্মাকীনং সুভদ্রং সপদমপি পরিচ্ছন্দসাং মাসুরবরাং॥

আবীরাসেন নাদঃ সমজনি বিততং [illegible] ঃ।
গহ্যাখ্যা সোঽহমিহ হংসো জগদুদয়লয়ক্রান্ত [illegible] নাম বা [illegible]
ধূপানাং চিত্রশালাং স মনসি চ বহির্নির্মমে নাম বা [illegible]
সর্বেষাং লীনশোকঃ সলিলমিহি পুনর্ধারিণেহভূদ ধরিত্রী॥


সাহিত্য সংসদ

₹ 450.00


ISBN 978-81-7955-199-8
9 788179 551998